ষাণ্মাসিক সূচী

শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৬৮—চৈত্র ১৩৬৮

সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

৩৪শ বর্ষ,
১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৮

সংবাদ-সাহিত্য

'শনিবারের চিঠি'র নববর্ষ

১৯২৪ সনে (১৩৩১ সাল) যখন সাপ্তাহিকরূপে 'শনিবারের চিঠি' আবির্ভূত হয় তখন আমাদের সমস্যা ছিল গান্ধী না রবীন্দ্রনাথ—চরখা না বেহালা। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তুলি ছাড়িয়া কলম ধরিয়া 'শনিবারের চিঠি'র গোড়াতেই বেহালার "ব্রিফ" হাতে এই সমস্যার মীমাংসায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে আজ সাঁইত্রিশ বৎসর আগের কথা। মধ্যে এক বৎসর (১৩৩২) মৌন থাকিয়া ১৩৩৩ সালে কয়েকটি বিশেষ সাময়িক সংখ্যার মহড়া দিয়া ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন মাসিকপত্ররূপে ইহার নবজন্ম হয় তখন বাংলা সাহিত্যে চরখা-সমস্যা উপেক্ষিত, সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—ধ্রুপদ-খেয়াল না ঠুংরি-গজল। সে সমস্যার মীমাংসা আজিও হয় নাই, অধিকন্তু বিলাতী জ্যাজ-পল্‌কা ঠুংরি-গজলের সহিত মিলিয়া সমস্যা জটিলতর করিয়াছে। বিগত চৌত্রিশ বছরের এই ইতিহাস এক বৎসরের (১৩৩৭ সাল) পূর্ণ সমাধির দ্বারা খণ্ডিত হইয়া মাসিক 'শনিবারের চিঠি' তেত্রিশ বৎসরের জীবন সম্পূর্ণ করিয়া আজ চৌত্রিশে পদার্পণ করিল। এখন সমস্যা পরমাণবিক বা দানবিক। মেগা-ওমেগা আমরা বুঝি না, মস্কোটন না ওয়াশিংটন ইহা ভাবিয়াই আমরা দিন কাটাইতেছি। এমন অবস্থায় যতটুকু স্থৈর্য ও সন্তোষ বজায় রাখা সম্ভব ততটুকু লইয়া আমরা আমাদের শত্রু মিত্র উভয় পক্ষকেই নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমরা লাইট ব্রিগেডও নই, ক্যাসাবিয়াঙ্কাও নই, কাজেই নিশ্চিন্ত মনে প্রলয়ের প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছি না, এই যা দুঃখ।

বিজয়া

একই সঙ্গে ৺বিজয়ার প্রণামাদিও নিবেদন করিতেছি এবং ৫৬ বৎসর পূর্বে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের "বিজয়া-সম্মিলনে"র সম্ভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদেরও বক্তব্য পেশ করিতেছি। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২১ কার্তিক, বিজয়ার ঠিক পরদিনই কলিকাতা বাগবাজারস্থিত পশুপতি বসুর ভবনে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণ দেন। ইহা ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্তিক-সংখ্যা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলেন :

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত

দেবালয়ে যে-পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূলউপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচি-রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্।"

ধম্মম্ শরণং গচ্ছামি

অনেকদিন পরে গোপালদার চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, শেষ পর্যন্ত বাদশাহীর অক্ষয়ধাম, কলিকাতামারী নয়া আজব শহর নয়াদিল্লীতেই আসিয়া পড়িয়াছি এবং শুনিলে আশ্চর্য হইবে, ধর্মের টানে আসিয়াছি। কাগজে দেখিয়া থাকিবে এখানে বিশ্ব-ধর্মীয় সম্প্রদায়-পরিষদের (ওয়ার্লড্ কাউন্সিল অব চার্চেস) অধিবেশন বসিয়াছে। দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, সোভিয়েট রাশিয়ার পাঁচ কোটি মানুষের ধর্মগুরু দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম অনুচরবর্গসহ প্রকাশ্যে ধর্মের শরণ লইতে আসিলেন। ক্রুশ্চেভী শাসন ও স্টালিনী শাসনে যে আসমান-জমিন ফারাক তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। মার্কসীয় অনুশাসন সত্ত্বেও এতগুলি লোক যে অন্তরে অন্তরে এত-কাল মার্কস্‌বাদের নাম্বার ওয়ান শত্রু যীশুকে ভজনা করিয়া আসিয়াছেন তাহা শুনিলেও আনন্দ হয় এবং নিঃসংশয়ে বিশ্বাস জন্মে যে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, পরমাণুবাদ ও অভ্রংলিহ-অহংবাদ সত্ত্বেও মানুষ সেই বৈদিক যুগের চিরন্তন মানুষই আছে এবং প্রবল লোকায়ত চার্বাকশক্তির প্রচণ্ড শাসন ও অনুশাসন সত্ত্বেও মনে মনে এখনও বলিতেছে যে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র পথ সেই পুরুষং মহান্তংকে জানা এবং ইহা ছাড়া বাঁচিবার অন্য পথ নাই। প্রাচীনকাল ও মধ্যযুগের কথা ছাড়িয়া দিই, বর্তমান যুগের বাংলার চারি জন মহামননশীল মহাপুরুষ তাঁহাদের জীবনব্যাপী অনুশীলন ও আত্মিক অনুভূতির ফলে ধর্মের পক্ষে যে চরম ও পরম বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধির বিপুল-বিচিত্র বিকাশ ধীরে ধীরে যাঁহাদের বাণীর প্রতি এদেশের মানুষকে বিমুখ করিয়া তুলিতেছিল এবার এখানে আসিয়া আবার যেন তাহাতে আস্থা ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম (১) বঙ্কিমচন্দ্র কেন বলিয়াছেন—'ধর্মের মূর্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতিসাধন। আপনার আনন্দবর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর আছে?' ভায়া হে, তোমাদের ইউ এন. ও., তোমাদের নেহরু-নাসের-টিটো-ইকেদা ভক্তিকে বাদ দিয়া পৃথিবীতে প্রীতি ও শান্তি আনিতে চাহিতেছেন। তাহা হয় না, হইবার নহে।

মনে পড়িল, আমাদের (২) রবীন্দ্রনাথের অন্তিমভাষণ—'সভ্যতার সংকটে'র সর্বশেষ ঘোষণা, মহাভারতের উদ্ধৃতি দিয়া যাহার সমাপ্তি। সে ঘোষণা এই :

'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অর্থহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি॥'

অর্থাৎ অধর্মের দ্বারা আপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাত মঙ্গল দেখা যায়, বিপক্ষকে আপাত জয় করা যায় কিন্তু অধর্ম শেষ পর্যন্ত সমূলে বিনাশ ঘটায়।

আজ আমার মনে হইতেছে মানুষ সমূলে বিনষ্ট হইবার পূর্বেই ধর্মকে আবার আশ্রয় করিবে, রুশ প্রধান ধর্মযাজকের ভারতাগমনে বোধ হয় তাহাই সূচিত হইতেছে।

মনে পড়িতেছে (৩) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ; ভারতের চিরন্তন বাণী : 'Highest of all gifts was spirituality ; a degree lower, intellectual knowledge ; and all kinds of physical and material help come last.' অর্থাৎ সর্বোত্তম দান [মানুষকে] ধর্মদান, মননশীল জ্ঞান তাহার পরের স্তরের এবং তাহারও পরে দেহ ও বিষয়গত দান।

সর্বশেষে, মহাপুরুষ (৪) শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ বাণী আমার মনে পড়িল, 'অহং যখন উপলব্ধি করে যে, তাহার ইচ্ছাশক্তি শুধু যন্ত্রমাত্র, তাহার জ্ঞান অজ্ঞানতারই নামান্তর এবং বালচাপল্য মাত্র, তাহার সুকৃতি এক বিরাট অশুদ্ধিরই নামান্তর এবং যখন তাহার উর্ধ্বে যে সত্তা রহিয়াছে তাহারই উপরে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে শিখে, তখনই তাহার মুক্তি হয়।' (অনুবাদ)

শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, ঋষিকল্প এই চারি জন মানুষই এই বিশ্বাসই মানুষের মনে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। ধর্মের মার অতি সূক্ষ্মপথে চলে। স্টালিনের আমলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে তিনি যেমন হাতুড়ির আঘাতে ট্রট্স্কির মস্তক চূর্ণ করাইয়াছিলেন তাঁহার মাথাও তেমনি চূর্ণ হইবে ; হোক না তাহা মৃত্যুর পরে—সমাধি-শয়নে। দেখিয়া শুনিয়া আমার আজ এই বিশ্বাস জন্মিতেছে যে ক্রুশ্চেভের মধ্যে যদি পাপ থাকে, যদি তিনি সত্যকার মানবধর্মকে অতিক্রম করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার মাথা নিশীথশয়নে অথবা সমাধিশয়নে চূর্ণিত হইতে বেশি বিলম্ব হইবে না। একশ মেগাটনের শতাধিক পরমাণু বোমা বা হাজার হাজার চন্দ্রলাঞ্ছন রকেটও এই চরম পরিণতি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তিনি যে আজ ধর্মকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতেছেন তাহাতেই আমার ধারণা হইতেছে শ্রীঅরবিন্দের কথায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যে যন্ত্রমাত্র, তাঁহার জ্ঞান যে অজ্ঞানতারই নামান্তর মাত্র এই মহাসত্য ক্রুশ্চেভ যেন উপলব্ধি করিতেছেন। আমার মনে হইতেছে, মেগাটন বোমা লইয়া তিনি দিল্লগি করিতেছেন মাত্র, আসলে দানব আবার মানবায়িত হইতেছে।"

বিস্ফোরণ, বিষ-ফোড়ন ও বিস্ফারণ

বিগত ৩০ অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন অতি উচ্চ বায়ুপরিমণ্ডলে পঞ্চাশ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণ করিয়াছে—রয়টারের সংবাদ। ৩১শে অক্টোবর স্বয়ং মহামতি ক্রুশ্চেভ প্রুফ করেকশন করিয়া বলিলেন, "৫০ মেগাটন নয়। বৈজ্ঞানিকেরা ভুল করিয়া আরও অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন বোমা ফাটাইয়াছেন এবং এই ভুলের জন্য তাঁহাদের শাস্তি হইবে না।" ইউ. এন. ও-র তখন অধিবেশন চলিতেছিল, সেখানে হাহাকার, আর্তনাদ, হুহুঙ্কার উঠিল। পণ্ডিত জওহরলাল তখন নয়াদিল্লীর এক হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতেছিলেন, তিনি বিক্ষুব্ধ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "এই বিস্ফোরণের ফলে শুধু আকাশ-বাতাসই বিষাক্ত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজের হৃদয়ও হলাহলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

বিস্ফোরণের পর বিষ-ফোড়ন। ৭ই নবেম্বর তারিখে নবেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিকী দিবসে ক্রুশ্চেভকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করিলেন আণবিক পরীক্ষা বন্ধ হইবে কি না। মহামতি রসিকতা করিয়া বলিলেন, "আমরা রাত্রিবেলা পরীক্ষা বন্ধ করি আবার সকাল হইলে আরম্ভ করি।" সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ম্যালিনভস্কি পরম গাম্ভীর্যের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন, একশো মেগাটন শক্তির বোমা আমাদের শতাধিক প্রস্তুত আছে এবং রকেট যাহা আছে ...ইত্যাদি। সর্বাধিক বিষ-ফোড়ন দিলেন ১২ই নবেম্বর রসায়নে নোবেল পুরস্কারজয়ী বৈজ্ঞানিক লিনাস পলি, বোস্টন হইতে। তিনি বলিলেন, "পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার ফলে পরবর্তী বংশক্রমের আড়াই লক্ষ শিশুর মানসিক বৈকল্য অথবা শারীরিক পঙ্গুতা ঘটিবে।"

এই সকল বিষ-ফোড়ন পড়িয়া শুনিয়া আমরা যখন

ঘোরতর আতঙ্কিত তখন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু দন্ত-বিস্ফারণ করিলেন, বলিলেন, "এই বোমার তেজস্ক্রিয়তা হইতে কলিকাতার ভয়ের আশঙ্কা নাই।" আমরাও আপাততঃ দেঁতো হাসি হাসিয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়া রহিল, আমাদের জাতীয় অধ্যাপকের এই সান্ত্বনা মেগাটন বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফল নয় তো?

সন্দেহ আরও নানা আকারে দেখা দিতেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অবৈধ আচরণ সত্ত্বেও বাংলা দেশের যে সকল মহা-মহা করটক-দমনক-সাহিত্যিকেরা একেবারে "নিশ্চুপ" ছিলেন দেখিতেছি বোমা বিস্ফোরণের পর তাঁহারা মায়ের অপমান চুলায় গেল, মায়ের বাছার প্রতি দরদে বিগলিত হইতেছেন। ইঁহাদের সোনা ফেলিয়া আঁচলে গেরো দেওয়ার আর তো কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না।

আরও সন্দেহজনক ঘটনা এই যে, ভারতে চীনের ক্রমানুপ্রবেশ, পশ্চিমে ও পুবে পাকিস্তানের অন্যায় হামলা, আমেরিকা-ইংলণ্ড-ফ্রান্সের পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ-পরীক্ষা যাঁহারা এতকাল নীরবে ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখিয়াই আসিয়াছেন বাংলা দেশের সেই উদার-চরিত সাহিত্যিকের দল আজ যে হঠাৎ রুশ-মেগাটন বোমার বিরুদ্ধে খেপিয়া বদ্ জোবান ছুটাইতেছেন, তাহাও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে না, নিশ্চয়ই ইহা মেগাটন-তেজস্ক্রিয়তারই ফল বলিয়া ধারণা জন্মিতেছে।

"ফাঁকা হাত"

একমাত্র অধ্যাপক বসু মহাশয়ই এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সমীচীন ভাবেই অন্য দিক দিয়া ভারতের অসহায়তার কথা সাহসের সঙ্গে সকলের গোচরে আনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (৭ নবেম্বর 'যুগান্তর') :—

"মেগাটন বোমার ভস্মরাশির তেজস্ক্রিয়তা অপেক্ষা আজ ভারতের চারিপাশে যে সঙ্কটপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির সৃষ্টি হইয়াছে ভারতের পক্ষে তাহা আরও বিপজ্জনক। ভারতের একদিকে পরমাণু-অস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তান, অন্য দিকে চীন রহিয়াছে, ভারত কিন্তু ফাঁকা হাতে দাঁড়াইয়া আছে।"

অবস্থা সাংঘাতিক সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কৈফিয়তও আছে। যাঁহারা বিশ্বনিরস্ত্রীকরণের দেবদূত হইয়া অস্ত্রে বিশ্বাসী বিভ্রান্ত মানবকে সৎপথে আনিবার মিশন লইয়াছেন তাঁহারা কোন্ লজ্জায় ভরা হাতে তাহা করিবেন! তাই যখন মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখিতে পাই ভারতবর্ষও অণুর পশ্চাৎ-অনুধাবন করিতেছে তখন জওহরলালের জন্য দুঃখ হয়। তখন মনস্বী বারট্রাণ্ড রাসেলকে সত্যই হিংসা হয়। তাঁহার মাত্র এক নৌকা, এক ঢোল এক কাঁসি। দুই নৌকায় পা দিয়া অথবা কনসার্ট পার্টিতে বহু বাদ্যোদ্যমের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত হইতে হয় না। ফাঁকা হাতে তাঁহার লজ্জা নাই।

কিন্তু জওহরলাল একা নহেন, তিনি চল্লিশ কোটি মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। চারিদিকে হিংস্র জানোয়ারেরা হাউ মাউ খ্যাক্ খ্যাক্ করিতেছে। ফাঁকা হাতে ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করার জন্য যে সেক্রেডনেস, যে মাহাত্ম্য দরকার, তিনি সেক্যুলার হইয়া তাহা আয়ত্তে আনেন নাই। সত্যই তিনি অসহায়।

দেখিয়া সুখী হইলাম যে কাশ্মীরে পাকিস্তানী হামলার চিত্ররূপ তিনি সারা ভারতবর্ষে রিলিজ করিবার সাহস অবলম্বন করিয়াছেন। হাত আর ফাঁকা রাখা চলিবে না।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ

বঙ্গসাহিত্যভূতলে শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বৃন্দাবনের কালিন্দী-কল্লোল-কেলি-অবসানে বহু রূপে ও বহু ছদ্মবেশে একাধিক বরদ ও করদ রাজ্যে বিলাস-লীলা সমাপনান্তে আবার স্বরূপে বৃন্দা-বনে হাজির হইয়াছেন দেখিয়া গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সঞ্জয়ের কথায় আমরাও পুলকিত চিত্তে বলিতে পারিতেছি "স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ"—পুনরায় স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

কিন্তু কলির ভগবান মিথ্যা-কল্মষহীন হইতে পারিলেন না। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা জানেন, প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' বিশ্বহিতায় শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাভাষণ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যুবক রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে কটু বলিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্তে আমরাও সবিনয়ে কলির শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিবাদ করিতেছি।

বেথুন-বিদ্যালয় প্রকাশিত স্মারক-গ্রন্থ 'রবীন্দ্র-শতায়নে' [হঠাৎ-দৃষ্টে নামের শেষাংশটাকে "শয়তান" ভ্রম হইয়াছিল] প্রেমেন্দ্র মিত্রের "নেপথ্যনায়ক রবীন্দ্রনাথ" বাহির হইয়াছে। ইতিহাসকে এমন আজগুবী গল্প, লর্ড ডানসানির 'জরকেন্‌স্'-মারী ঘনাদাই বানাইতে পারেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন কল্লোল-কালিকলমের দল রবীন্দ্রবিরোধী ছিল না। "কারণ কালিকলম-কল্লোল অজানায় পাড়ি দেবার যে পাল সেদিন তুলেছে, তার হাওয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই সেই সমুদ্র যার ঢেউ কল্লোলিত দুঃসাহসে নতুন তীর খুঁজতে বেরিয়েছে।"

ইহা ঘনাদার কথা। আসল ইতিহাস অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল-যুগে' ও সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে, বিরোধ সত্ত্বেও পরস্পর পরিপূরকভাবে আছে। "হাওয়া" রবীন্দ্রনাথ "পাল" অতিআধুনিক তরুণদের সম্বন্ধে তখন কী মত পোষণ করিতেন তাহার সামান্য কিছু নমুনা দিতেছি :

এরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন তার প্রধান কারণ— এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে'— এটা তরুণের ধর্ম।

—"সাহিত্যে নবত্ব", ভাদ্র, ১৩৩৪

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক-সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেছে। ...আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রীধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখতে শুরু করেচে। তারা বলচে, আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,— আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখেচি বলে।

"পত্র" মাঘ ১৩৩৪

আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে। যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের।

"পত্র" ফাল্গুন ১৩৩৪

যে দুইটি "বিচার-সভা"র উল্লেখ প্রেমেন্দ্র মিত্র করিয়াছেন, তাহার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-লিখিত রিপোর্ট 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে বিধৃত আছে। দুই দিনের রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ-যুগান্তর কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে 'যুগ' বলে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে— বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এই রকমের কোনো-একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না।—"সাহিত্যরূপ"

যে জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়।...

ঈশ্বরকে মানি নে, ভালোবাসা মানি নে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না, অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।—"সাহিত্য-সমালোচনা"

বহুরূপীর ছদ্মবেশ ফুঁড়িয়া বুকে সঞ্চিত বিষ-বাষ্পের ধাক্কায় "সড়া অন্ধা" কিন্তু ধরা পড়িয়াছে :

"একদিকে রবীন্দ্রনাথকে সামনে রাখার ছল করে নতুন আন্দোলনের সাফল্যে ঈর্ষাপরায়ণ বিদ্বিষ্ট অক্ষম অযোগ্যদের আস্ফালন ও বিষোদ্গার আর একদিকে তরুণদের সপক্ষে স্বয়ং শরৎচন্দ্র ও ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত..."

এই অক্ষম অযোগ্যদের দলে তখন যাঁহারা ছিলেন এবং পরে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান মহাকাল নির্ধারণ করিয়াছেন। ক্ষমতা-শালীর পদলেহনে সে ইতিহাস কলঙ্কিত নয়।

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহসা কোনও কার্য করিবে না, এই প্রাচীন ঋষিবাক্য মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু সর্বাধিক প্রযোজ্য গবেষণার ক্ষেত্রে। পুরাতন পুথিপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার নিজের অজ্ঞাত কিছু আবিষ্কার করিয়া গবেষক যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং সমধর্মীদের এই নূতনের আস্বাদ দিবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা জন্মে, তখন হঠকারিতার বিপদ এড়াইবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অধ্যবসায়, স্থৈর্য ও ধীরতার। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'যুগান্তরে' প্রকাশিত তাঁহার "সচিত্র গুলজারনগর" প্রবন্ধে এই হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। সত্য বটে এই অধুনাবিস্মৃত গ্রন্থখানির গল্পের সারাংশ দিয়া তিনি এ যুগের পাঠকদের কৌতূহল ও কৌতুক উদ্রিক্ত করিয়াছেন কিন্তু প্রসঙ্গতঃ নিজের ভ্রান্ত মত অধৈর্যের সহিত প্রচার করিয়া তিনি পূর্বগামীদের প্রতি সুবিচার করেন নাই। আরও পরিশ্রম, আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল। পথের ধারে অন্ধকারে যাহাই চকচক করে তাহাই যে মণি নয় এই বোধ তিনি নিশ্চয়ই ঠেকিয়া ঠেকিয়া অর্জন করিবেন। আপাততঃ তথ্যের দিক দিয়া তিনি কোথায় ভ্রান্ত তাহাই সবিনয়ে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। "সচিত্র গুলজারনগর"কে জাহির করিবার জন্য তিনি মুখবন্ধ করিয়াছেন :

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সব বইয়ের আলোচনা থাকে তাদের বাইরে এমন অনেক উল্লেখযোগ্য বই আছে যারা এখনো উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। নির্দিষ্ট কয়েকজন লেখক এবং বিশেষ কয়েকটি পুস্তকের আলোচনার মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস নিবদ্ধ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অস্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। অথচ পুরনো গ্রন্থাগারে এখনো এ জাতীয় অনেক বই পাওয়া যায়। তাদের মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না।

এমনি একটি হারিয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ অনালোচিত বই 'সচিত্র গুলজারনগর।' একালের কোন সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক এ বইটির উল্লেখ করেছেন বলে জানি না। উনবিংশ শতকের কোনো পুঁথিপত্রে এর উল্লেখ আছে বলে জানা নেই। এমন কি বাংলা সরকারের ত্রৈমাসিক ক্যাটালগ থেকেও এর সন্ধান পাইনি।...

'সচিত্র গুলজারনগর'ই বোধ হয় কলকাতার চলিত ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। অবশ্য একালের অর্থে এর কাহিনী পাঠকদের নিকট হয়ত উপন্যাসের মর্যাদা পাবে না।"

উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে তিনটি মারাত্মক ভুল আছে।

(১) "একালের কোন সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক এ বইটির উল্লেখ করেছেন বলে জানি না।" জানা উচিত ছিল এই কারণে যে এই জাতীয় গ্রন্থের একমাত্র উৎস 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের "ভূমিকা"য় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'সচিত্র গুলজারনগরে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। বইখানি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আমিই সম্পাদন করিয়াছিলাম এবং "ভূমিকা" আমারই লেখা। 'হুতোমে'র সম্পাদন-কালে এই জাতীয় বহু পুস্তক-পুস্তিকা আমাদের ঘাঁটিতে হইয়াছিল এবং কয়েকটির পুনর্মুদ্রণও আমরা করিয়াছিলাম। 'সচিত্র গুলজারনগর'ও দেখিয়াছিলাম এবং উহা আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহেই ছিল। ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' হইতে ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত 'আনন্দ লহরী' পর্যন্ত দশখানি এই জাতীয় গ্রন্থের তালিকায় 'সচিত্র গুলজারনগর' নবম স্থান পাইয়াছে—অবশ্য কালানুক্রমিক ভাবে।

(২) "উনবিংশ শতকের কোনো পুঁথিপত্রে এর উল্লেখ আছে বলে জানা নেই।" ইহা জানা একটু কঠিন বটে। জানিতে হইলে উনবিংশ শতকের শেষ ত্রিশ বৎসরের সাময়িক পত্রিকা ঘাঁটিতে হয়। বইখানি বাহির হয় ১২৭৮ সালে। ১২৭৮ সালের ২২ কার্তিক তারিখের 'সুলভ সমাচার' ঘাঁটিলেই নিম্নের "বিজ্ঞাপন"টি দৃষ্ট হইবে—

"সচিত্র গুলজার নগর। ভাঁড় প্রণীত। হাস্যরসের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। যাহাতে কলকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম ও শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বান্ধায়ের মূল্য ৸০ মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।"

(৩) "'সচিত্র গুলজারনগর'ই বোধ হয় কলকাতার চলিত ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।" ১৮৬২ সনে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশিত হইবার পর ইহার অনুকরণে লেখা নক্‌শা ও কাহিনীতে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র ছাইয়া যায়। 'হুতোম' তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণের "ভূমিকা"য় ইহা লইয়া গর্বমিশ্রিত ব্যঙ্গ করিয়াছেন। প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুকরণটিও নক্‌শা, ১৮৬৩ সনে প্রকাশিত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ'। ইহা কালীপ্রসন্নকে নিছক গালাগালি এবং এই পুস্তক দৃষ্টেই মধুসূদন তাঁহার বিখ্যাত চতুর্দশপদী কবিতা "চাঁড়েলের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে" লিখিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সনে ক্ষেত্রমোহন ঘোষ 'হুতোমে'র ভাষায় লিখিত 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' প্রকাশ করেন। ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং 'সচিত্র গুলজারনগরে'র ছয় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত। কিন্তু যিনি "হুতোমী" ভাষার ব্যবহারে বাংলাদেশে সর্বাধিক খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং কালীপ্রসন্নের সহযোগী সেই অক্লান্ত সাহিত্যসাধক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "নিশাচর" ছদ্মনামে ওই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই 'সমাজকুচিত্র' 'নক্‌সা প্রকাশ করেন।' 'হুতোমে'র সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের শেষে এই গ্রন্থটি আমরা সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়াছি। এই ভুবনচন্দ্রই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে 'হুতোমী' বা চলতি ভাষায় লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস 'এই এক নূতন। আমার গুপ্তকথা' প্রকাশ আরম্ভ করেন এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দেই এই উপন্যাসের প্রথম তিন পর্ব প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস 'জোসেফ উইলমটে'র অনুকরণে রচিত হইলেও দেশীয় পরিবেশে উহা সম্পূর্ণ একটি দেশী গল্প এবং এই গল্পই পরে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নামে বিখ্যাত হয়।

'সচিত্র গুলজারনগরে'র ছয় বছরের অগ্রজ 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

"কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী।
প্রথম ভাগ
উৎপস্যতেস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।
ভবভূতিঃ।
শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৭৮৭ শকাব্দা।
Calcutta :
Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press.
Pottuldanga Nemoo Khanshama's
Lane No. 26
1865."

গ্রন্থের ভূমিকাটি কৌতূহলপ্রদ। তাহা এইরূপ :

"অগ্রে মুখপাতখানি দেখে নিন

পূর্ব্বে বহুকালাবধি আমি কোতরঙ্গের বড় তালগাছে বাস কত্তেম। বিধির বিড়ম্বনায় গত আশ্বিনের সাইক্লোনে আমার সেই প্রিয় বৃক্ষ গোড়া উপড়ে গঙ্গার গর্ভে গমন কল্লেন—দেখে দুঃখে 'কা কা' শব্দে চ্যাচাতে চ্যাচাতে আমার গলা চিরে গ্যালো। শেষে সেই ঝড়ে পাখা ছিঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে নিমতলার নিমগাছে আশ্রয় পেলেম; তদবধি এখানে এক রকম দুঃখে সুখে কাল কাটান যাচ্চে।

সম্প্রতি এক সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের পরবশ হইয়া আমি আমাদের ঠাকুরমার আমলের 'এক রাজা তাঁর দো সো দুই রাণী' প্রকার গল্পের দিকে না গিয়ে এক নূতন রকমের কাহিনী প্রকাশ কচ্চি—সরলান্তকরণ পাঠকগণ কোন দোষ ধরে আমাকে খোঁচাখুঁচি না করে বরং অনুগ্রহপূর্ব্বক একদফা একস্‌কিউজ কর্ব্বেন।

নিমতলার নিমগাছ।
১৭৮৭ শকাব্দা।"

ভুষুণ্ডীকাকের গল্পের একটু নমুনা দিতেছি :

"ক্রমে কৃপারাম পূর্ণযৌবন হলেন—দেখে তাহার জননী কিরূপে তাহার বিবাহ দিয়ে ঘরে বউ নিয়ে আহ্লাদ আমোদ কর্ব্বেন, তার ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—মন্ মন্ মেয়ের অনুসন্ধানেও রইলেন; কিন্তু নিজে মেয়ে মানুষ তার উপায় কিছু না কত্তে পেরে শেষে ছেলের বের জন্য

আত্মীয় কুটুম্বদের ধরে পড়লেন তাহাতে সকলেই কৃপারামের বিবাহের উদ্যোগী হলেন। কিছুদিন পরে প্রজাপতির অনুগ্রহে বের ফুল ফুটলো; গঙ্গার ওপারে নিধিরাম বাঁড়ুয্যের কন্যার সহিত কৃপারামের সম্বন্ধ স্থির হলো—উত্তম দিন দেখে তাহার শুভ বিবাহ হয়ে গ্যালো; এখন জননী চার হাত একত্র দেখে বাঁচলেন।"

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র মতই ইহাও খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র শ্লোকটিও ভুষণ্ডীকাক হুতোমের দেখাদেখি আখ্যাপত্রে ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন 'হুতোমে'র ভূমিকা হইতে 'সচিত্র গুলজারনগরে'র লেখক "ভাঁড়"কে বাহির করিয়াছেন খণ্ডশঃ প্রকাশিত 'হুতোমে'র ১ম খণ্ডের "বিজ্ঞাপন" হইতে তেমনই ভুষণ্ডীকাককেও বাহির করা যায়। "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ ছিল :—

"হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজতে পারবেন, হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোমকে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।"

'সচিত্র গুলজারনগরে'র অব্যবহিত অগ্রজ 'এই এক নূতন' গ্রন্থের নামও 'হুতোমে'র ভূমিকা হইতে গৃহীত। ভাঁড়ের মুখ দিয়াই কথাটি বাহির হইয়াছিল।

'এই এক নূতনে'র ভাষার একটু নমুনা দিতেছি :

"১৮৭১ খৃঃ।

পাঠক মহাশয়! জগদীশ্বরের অনুগ্রহে, সরস্বতী দেবীর কৃপায়, আর আপনাদের দশ জনের শুভ দৃষ্টিতে "আমার গুপ্তকথা"র প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হলো।—ইংরাজী নূতন বৎসরের এক হপ্তা পূর্ব্বে "এই এক নূতন" ধূয়া দিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে হাত দিয়েছিলেম,—যে দুরারোহ সাহিত্যশিখরে আরোহণ কোত্তে চেষ্টা কোরেছিলেম, বাঙ্গালা বৎসরের দ্বিতীয় মাসে তার প্রথম কক্ষ উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় কক্ষে আজ পদার্পণ কোল্লেম।

বালক হরিদাস আমার কাছে যেমন যেমন আত্মকাহিনী প্রকাশ কোচ্ছেন, আমিও অবিকল সেইগুলি আপনাদের নয়ন-দর্পণের সম্মুখে হাজির কোচ্চি। তাতে আপনাদের মনে সন্তোষ জন্মাচ্চে কি না, এখনো আমি সেটা ভাল কোরে জান্তে পারিনি। হরিদাস এত দিন যতগুলি কথা বোল্লেন, সকলগুলিই গোলমাল,—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এ পর্য্যন্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে স্বর্গভ্রষ্ট আংটীর মত তার নিশ্চিত স্থানটী ঠিক হয় নাই। পাঠক মহাশয়! আপনার কি ধৈর্য্য শিথিল হোচ্চে? আমি অনুমান করি, তাই হওয়াই সম্ভব।—কেন না, ক্রমাগত চার পাঁচ মাস এক রকম জিনিষের আস্বাদন কোত্তে কোত্তে রসনার অরুচি অবশ্যই হোতে পারে।—ক্ষমা করুন,—অপেক্ষা করুন,—আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন,—নূতন নূতন রসের আস্বাদন পেয়ে তুষ্ট হোতে পার্‌বেন।—বিন্দু বিন্দু কোরে নানা ফুলের মধু লয়ে এই একটী নবীন মধুচক্র রচনা করা যাচ্চে,—এ পর্য্যন্ত যদিও সেটী অসম্পন্ন ভিন্ন আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্চেন না, কিন্তু ক্রমেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। এই অর্দ্ধ চক্রের মধু আনন্দে পান করুন, অল্পে অল্পে পান করুন, ঠাণ্ডা হবেন,—গা জ্বালা কোর্‌বে না,—ঠাণ্ডা হবেন।"

এই ভাবে এই গল্প প্রায় হাজার পাতায় সম্পূর্ণ হইয়া বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত স্তরের পাঠকদের চিত্ত জয় করিয়াছিল।

আসলে, মহাকালপ্রবাহে এই সকল স্রোতের শ্যাওলা ক্ষণকালের রৌদ্রালোকে চমক হানিয়াই কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রথম পাথকৃৎরাই বাঁচিয়া আছেন, নকলের এবং অপকৃষ্ট নকলের যে নাকাল হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে এইগুলিকে টানিয়া তুলিয়া সমসাময়িক কালের বিচারকে ধিক্কার দিবার মত বস্তু এগুলি নয়। বর্তমানের দিবালোকে এগুলি পুনঃপ্রচারেরও উপযুক্ত নয়, প্রত্নশালার অন্ধকার কক্ষই ইহাদের উপযুক্ত স্থান। আশা করি অত্যুৎসাহী শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশঃ এই তথ্যটি উপলব্ধি করিবেন।

—

বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথ যখন ১৩৪১ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁহার 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের "আভাসে" স্মৃতিভ্রংশ বশতঃ উপাধ্যায়ের মুখ দিয়া "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে" বলাইয়াছিলেন তখন এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ব্রিটিশ-শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতে বিপ্লবের কবচকুণ্ডলসহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশমাতার বন্ধনমুক্তির জন্য তাঁহার সেই বিপ্লবের স্বরূপ ছিল "তরবারির বিপ্লব"। মাত্র ষোল-সতর বৎসর বয়সে তিনি সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনদের কনষ্টিট্যুশনাল বা সংবিধানসম্মত বা বৈধ আন্দোলনে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া আনন্দমোহনের মুখের উপরেই বলিয়াছিলেন, "Not through pen but through sword" অর্থাৎ স্বাধীনতা-যুদ্ধের অস্ত্র হইতেছে তরবারি—লেখনী নহে।* জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁহার এই আবাল্যের বিশ্বাস এক মুহূর্তের জন্যও টলে নাই। সুতরাং বিপ্লবাত্মক সক্রিয় আন্দোলনে তাঁহার যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পতন-উত্থানের প্রশ্নই উঠে না। বিপ্লবই তাঁহার ধর্ম ছিল, তিনি কখনও স্বধর্মচ্যুত হন নাই।

"বিপ্লব" শব্দের আভিধানিক অর্থ "আমূল পরিবর্তন—revolution," 'অমরকোষে'র অর্থ "রাজশূন্য যুদ্ধ"। স্বদেশবাসীর "খাঁচায়বদ্ধ অহিফেনাসক্ত পশুর জীবনযাপন" তাঁহার অসহ্য ছিল সুতরাং দেশের শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তাঁহার কাম্য ছিল। ব্রিটিশ-রাজকে উচ্ছেদ করিতে রাজশূন্য যুদ্ধ চালাইবার জন্যই তাঁহার 'সন্ধ্যা' পত্রিকার উদ্ভব। "মুকুটহীন" সুরেন্দ্রনাথকে তিনি কখনই রাজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারত-বাসীর সমবেত চেষ্টায় দেশ শৃঙ্খলমুক্ত হউক এবং তজ্জন্য বোমাবারুদগুলিগোলালাঠিতরবারি যাহার যাহা শক্তি তাহাই প্রয়োগ করুক।

কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক কাম্য ছিল দেশের লোকের, বিশেষ করিয়া দেশের নেতাদের মনোবল, ভেজালহীন, আপোষহীন দৃঢ় মনোবল। যখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন নেতারা ভুল পথ ধরিয়াছেন, যখনই বুঝিয়াছেন কয়েকজন ইংরেজের মৌখিক সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া নেতারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে বিভ্রান্ত করিতেছেন তখনই বজ্রনির্ঘোষে সকলকে সতর্ক করিয়াছেন। তাঁহার সেই অভীঃ মন্ত্রোচ্চারণের কয়েকটি নমুনা বিভিন্ন তারিখের 'সন্ধ্যা'র সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত করিবার পূর্বে ভারতউদ্ধারের জন্য প্রস্তুতির পরিচয়—স্বপ্নে ও বাস্তবে, তাঁহার আত্মকথা 'আমার ভারত উদ্ধার' হইতে শুনাইতেছি :

"আমি বিদ্যাসাগরের কালেজে এফ. এ. কেলাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। পড়া খুব ভাল হয়। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, প্রসন্ন লাহিড়ী, নবীন পণ্ডিত মহাশয়—আমাদের পড়ান। কালেজ খুব জমজমাট—আমার মন কেমন উধাও। সুরেন বাঁড়ুজ্যের লেকচার শুনিয়া—দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি—নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা—বড়ই মিষ্ট লাগে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে তাঁহার লেকচারে—প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—তোমাদের মধ্যে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি কে হবে—আর আমরা [উৎসাহে] হাততালি দিয়া বলিতাম—সকলে সকলে (all all)। এমনি আমার প্রাণটা পুরিয়া উঠিয়াছিল যে—আমি মনে মনে স্থির করিলাম—বিবাহ করিব না—বি-এ, এম্-এ পাশ করিব না—প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।"···

সুতরাং "প্রাণের আবেগে কালেজ ছাড়িয়া" উপাধ্যায় আবার গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। আগ্রা হইতে ধোলপুর এবং সেখানে হইতে উটের গাড়িতে গোয়ালিয়র।

"সেই উটের গাড়িতে বসিয়া বসিয়া—আঠার বৎসরের বাঙ্গালী যুবকের মনে—কতই না আশার কল্পনা জাগিতে

---

* "কলমবাজিতে হইবে না—তলোয়ারবাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে।"—ব্রহ্মবান্ধব।

লাগিল। চম্বল নদী পার হইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য পড়িল। চারিদিকে বিজন প্রান্তর—মেটে মেটে পাহাড় ও গুল্মের ঝোঁপে পরিপূর্ণ। মনে হইতে লাগিল কবে এই প্রান্তর মারাঠা অশ্বারোহীতে ছাইয়া পড়িবে—আর অশ্বারোহণে সেনাদল চালনা করিব। ঐ যে দূতেরা আসিয়া খবর দিল—শত্রুদল তাদের বড় বড় কামান, তোপ লইয়া আসিতেছে। আমি অমনি পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে হুকুম দিলাম—রাস্তার এক মাইল দূরে লুকাইয়া থাকিয়া যেন পাহারা দেয়। শত্রুর চর দেখিলেই যেন তীরের দ্বারা তাহাকে ঘাল করে—বন্দুকের আওয়াজ না হয়। দুষমনেরা যেন মনে করে যে—প্রান্তরে জনপ্রাণীও নাই। আর এক হাজার সওয়ার লইয়া—পাঁচ শত পাঁচ শত করিয়া—আগু পিছু এক ক্রোশ ব্যবধানে ঘাঁটি বাঁধিলাম। আর আমি মাঝখানে এক সহস্র সেনা লইয়া আড্ডা গাড়িলাম। শত্রু আসিল—দুই হাজার বন্দুক—পাঁচ সাত শত সওয়ার—ছয়টা বড় বড় কামান। প্রথম ঘাঁটি তাহারা পার হইল। মাঝের ঘাঁটির কাছে যাই তোপখানা আসিল অমনি কামানের ঘোড়া আর গোলন্দাজগুলা ধরাশায়ী। একটিও বেশী গুলি ছাড়িতে হইল না—যে কয়টি ঘোড়া, আর যে কয়জন গোলন্দাজ, ততগুলি আওয়াজ হইল। একটি অধিক নয়—একটি কম নয়। তারপরে এক মিনিটের মধ্যেই একবারে গুলিবৃষ্টি—আগু পিছু মাঝখান হইতে—একেবারে আগুন ছুটিতে লাগিল। তীরন্দাজরাও খুব কাজ করিল। যত বড় বড় পালকওয়ালা টুপিপরা জাঁদরেলদের টুপ টুপ করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপরে—একেবারে রণ্‌ রণ্‌ ব্যাপার। সে যে তলোয়ারের চকমকানি—দুষমন একেবারে কচুকাটা হইয়া গেল। কল্পনায়—এই রকম কতই ছবি আঁকিতে লাগিলাম। এখনও উহা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ মানস-সৃষ্টির আনন্দে উটের গাড়িতে বসিয়া চলিলাম—চোখে একটুও ঘুম নাই। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী'—'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনীতে—মন ভরিয়া ছিল। মনে হইতে লাগিল—যেন অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টিতে অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া চলিতেছি—কত বিপদে পড়িতেছি, শত্রু নিপাত করিতেছি।—অনেক রকম ছবি দেখিলাম, তবে কোন তিলোত্তমা আবিষ্কার করি নাই বা কোন সরলাকে দেখিবার জন্য ঘাটে নৌকা লাগাই নাই! ঐটুকু কঠোরতা আমার ভারত উদ্ধারে আছে। ঐ নির্মমতা, এই বুড়া বয়সেও আমাকে ছাড়ে নাই।"

ভবানীচরণ দেশের জন্যই সংসারধর্ম পালনে বিরত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য নয়, ভারতের মুক্তি-সন্ধানীর সন্ন্যাস।

বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য বাংলাদেশের সর্বত্রব্যাপী প্রবল আন্দোলনকে ব্রিটিশ বুরোক্রাসি যখন উপেক্ষা করিল তখনও বাংলাদেশের তদানীন্তন নেতারা মর্লি-মিন্টোর মুখ চাহিয়া ছিলেন। ১৯০৫ সনের শেষভাগে মহামতি গোখলে বাংলাদেশের হইয়া বিলাতে গেলেন মর্লিকে দিয়া পুনর্বিচার করাইতে। এই সব আবেদন-নিবেদন ব্রহ্মবান্ধবের কাছে ঘৃণ্য ছিল। তিনি দেশবাসীকে সচেতন করিবার জন্য নেতাদের হইতে ভিন্ন সুর ধরিলেন। যে ব্যর্থতায় সকলে "হায় হায়" করিতেছিল তিনি এইভাবে সেই ব্যর্থতারই জয় ঘোষণা করিলেন :—

দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আর কি কারো ভয় রেখেছি?

আমরা যে সেই ভগবানের অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি—তিনি কি আমাদিগের মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারেন। আমরা যে স্বাবলম্বনের পথ ধরিয়াছি—তিনি কি আমাদিগের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন? আজ বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে—তিনি তাই তাঁহার বিচিত্র উপায়ে আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যে ডাল ধরিতেছি সেই ডালই তিনি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, আর পরোক্ষভাবে এই উপদেশ করিতেছেন যে পর-প্রত্যাশীদিগকে আমি এইরূপ কশাঘাত দ্বারাই সৎপথে আনিয়া থাকি। "অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" বাঙ্গালী তুমি যত দিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস ত দূরের কথা—সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্য্যন্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্মপ্রত্যয়

নাই আপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের মহানুভবতা যাহার সম্বল কেহই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ সেই উদারতার অনন্ত প্রস্রবণ মূর্ত্তিমান্ সাম্যমৈত্রী মর্লী আমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন, ইহাতে যে আমরা কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে কি বঙ্গভঙ্গে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই? তবে কি বানরিপাড়ার* পিটুনী পুলিসের অত্যাচারে —তবে কি সেখানকার পুরনারীর আর্ত্তনাদে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই? তবে কি বরিশালে গুর্খার গুঁতায় আমরা সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জ্জন করি নাই? তা নয় আমরা এত দিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব।

এত দিন ভগবান স্বহস্তে আমাদিগের চোখের ঠুলি খুলিয়া দিলেন। এত দিনে আমরা ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া দিবার প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিব এই ভাবিয়া ত আমাদের আর আনন্দ ধরিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গ! কে বলে তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ? আমরা ত তোমাকে আরও বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। বরিশালের বানরীপাড়ার সংবাদ কে রাখিত। আর আজ কলিকাতার আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে সেই বানরীপাড়ার কথা। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণ উৎসবে ঐ বানরীপাড়ার নিগৃহীত লোকদিগের জন্য টাকা উঠিতেছে। আজ বরিশালের অশ্বিনীকে, মাদারীপুরের কালীপ্রসন্নকে, বল্লার স্বদেশী বীরদিগকে, জলপাইগুড়ির আশুনাথকে, ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত বঙ্গদেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙ্গা বাংলা আর কেমন করিয়া জোড়া লাগাইতে হয়। যাহাদিগের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না, তাহাদিগকে আমরা প্রাণের বন্ধু হৃদয়ের দেবতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাদিগের বেদনায় দুঃখ জানাইতেছি—যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছি। এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোন উপায়ে সম্ভব হইতে পারিত। ফুলার যতই ঘা মারিবেন, ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। মিন্টো মরলী যতই পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। ফিরিঙ্গি যতই নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন—ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদিগের প্রতি যতই নির্য্যাতন হইবে—ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। মৃত্যুতে জীবন! আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই অস্বাভাবিক ফিরিঙ্গি প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কারের মৃত্যু না হইলে, আমরা জীবন লাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের দৃষ্টি, আমাদিগের ধ্যান ধারণা, আমাদিগের কাজ কর্ম্ম সব বহির্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আপনাতে আপনি নাই। সাধক বলিয়াছেন,—

আপনাতে আপনি থাকো
যেও না মন কোনখানে
যা চাবে তাই খুঁজে পাবে,
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

বাহিরের মায়া একেবারে না কাটিলে আমরা অন্তর্মুখীন হইতে পারিব না। বাহ্য বস্তুতে আসক্তির—সামান্য মাত্র কারণ থাকিলে আমাদের আত্মদৃষ্টির উন্মেষ হইবে না। তাই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাঁহার জমিদারী এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে অমনি ৺জয়কালীর বাড়ী একশ করিয়া পাঁঠা বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাত্মনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি— আজ আমাদের ভুয়া রাজনৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে, আজ আমাদের মরলী-প্রীতি ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ বাহিরে আমরা সব শূন্য দেখিতেছি, আজ ইংলণ্ডের কুয়াশাবৃত-অম্বরে ভারতবাসীর আশাসূর্য্য একেবারে ডুবিয়া গেল, আজ ইংলণ্ডের মহাসভার উদার নৈতিক মন্ত্রী সমাজের উদারতম সদস্য মরলী আমাদিগের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন—তাই আজ যদি আমাদের চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি, আজ যদি আমরা আমাদের সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি, আজ যদি আমরা মানুষ হইবার পথ খুঁজি, তাই বলি দে জয়-কালীর বাড়ী একশ পাঁঠা।

—২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬

তখন পুলিস-হাঙ্গামার ভয়ে অনেক বড়লোক কারিগরি শিক্ষার ওজুহাতে ছেলেদের বিদেশে পাঠাইতে-

* বানরিপাড়া বরিশাল শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরের একটি গ্রাম ১৯০৫ সনে নবেম্বরের মাঝামাঝি গুর্খা পুলিস দ্বারা গ্রামবাসীর উপর নির্ম্মম অত্যাচার সাধিত হয়।

ছিলেন এবং তাহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষা নিষ্ফল হইতেছিল। দেশের মনোভাব যখন বিদেশমুখী বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব তখন বেসুরা গাহিলেন :—

কোন কালে নাই মনসাপূজা, একেবারে দশভুজা।

এখন ছেলে বুড়ো সকলেরই বিশ্বাস যে, সেকেলে বামুণদের মতন ঘটত্ব পটত্বের কচ্‌কচি নিয়ে থাকিলে আর চলিবে না। কালাপানি পার হয়ে ঘট ও পট তৈয়ারি শিখে না এলে আর রক্ষা নাই। ভাল ভাল ছেলে বাছাই করে বিলাত কি জাপান পাঠাইয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মা করে না আনিতে পারিলে ঐ সেকেলে নরুণের ঠুকুর ঠুকুরে আর কারিকুরিতে বড় হওয়া যাইবে না। কারিকুরি বিদ্যাটা বিলাতেরই একচেটে। ঐ তমসা নদীর তীরেই বিজ্ঞানলক্ষ্মী তাঁর মনের মতন পেচা পাইয়াছেন। ঐ সেইখানে গিয়া তাঁর কাছে ধন্না দিতে না পারিলে পৃথিবীতে আর কোন দেশে কারুর মাথায় বিজ্ঞানবুদ্ধি গজাইবে না। এ একটা বেহদ্দ গোলামের কথা। বলি, জেমস্ ওয়াট্ কার ঘরের কেটলীর ধোঁয়া দেখে এন্‌জিন গড়ার বুদ্ধি মাথায় আনিয়াছিল? গরুর রাখালই বা কোন দেশ থেকে বিদ্যা বুদ্ধি ধার করে এনে সেই ইঞ্জিনের উন্নতি করেছিল? যদি একটা কোন কাজের উপর ঝোঁক থাকে, আর সেই কাজের মধ্যে পড়া যায়, তবে সেটা কি করিয়া ভাল করে করা যায়, তার সব সুলুক সন্ধান আপনা থেকেই এসে যোগায়। আদত কথা আমাদের শিল্পের উন্নতি করিব এই বলে আগে কাজে লেগে যেতে হয়। যে কাজ যে ভাবে চলিতেছে, তারই একটা হদ্দ মুদ্দা দেখিতে হয়, তারপর ঐ কাজ করিতে করিতে নূতন রকমের কলকব্জা করিবার বুদ্ধি আপনা থেকেই এসে যোগায়। আমাদের এই ছাপাখানার জমাদার প্রেস-ম্যানদের মধ্যে দুই একজন এমন কলকব্জা বোঝে যে, দুপুর রাত্রিতে কল বিগড়ে গেলে তারা আপনা থেকেই একটা বুদ্ধি বার করে সব ঠিক করে নিতে পারে। যে সকল ছেলেপিলের কারিকরিতে মাথা আছে, তাহাদিগকে হয় তাঁত বুনিতে, না হয় চরকা কাটিতে, না হয় কোন ঢালাইয়ের কারখানায়, না হয় ঐ রকম অন্য কোন একটা কাজে জুড়িয়া দিতে হয়। তারপর কাজ করিতে করিতে তাদের আপনা থেকেই বুদ্ধি খুলে যায়। তখন নূতন কি রকম কি করিলে কাজটা শীঘ্র বা সহজে হইতে পারিবে, সে সকল ফন্দী বাহির করিবার চেষ্টা হইবে। তখন বরং তাহারা বিদেশে গিয়ে কোন শিল্প রীতিমত শিখে আসিতে পারিবে। নইলে কোথায়ও কিছু নাই, দুদশজন পুঁথি মুখস্থ-করা ছেলেকে বিদেশে শিল্প শিখিতে পাঠিয়ে যে বিশেষ কি লাভ হইবে, তা ত বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি আর উল্টাপাল্টা কাজ। আগের কাজ আগে না করে, আগের কাজ পাছে, আর পাছের কাজ আগে। কোন দিন মনসা পূজা করিলাম না, কিন্তু খেয়াল চাপিল ত একেবারে দুর্গাঠাকুর ঘরে নিয়ে আসিলাম। আর দেশে আগে ছোট ছোট কাজ আরম্ভ কর, দেশী কারিকর দিয়ে সেইগুলি যতদূর চলে চালাও, তারপর আপনাদের ছেলেপিলেকে সেইগুলির ভার দিয়া, তাহাদিগকে সে বিষয়ে এলেম জন্মাইতে দাও। তখন ইংলণ্ড জর্ম্মণী জাপান যাওয়ার কথা উঠিলে তবে বুঝতে পারি যে যাদের ওদিকে মতিগতি এবং শক্তি আছে, তারা বিদেশ থেকে নূতন হদিস্ পেয়ে এসে আপনাদের কাজ কারবারের একটা উন্নতি করিতে পারিবে। এদেশে যারা বি, এ পরীক্ষা বা এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় বিজ্ঞান পড়ে, তাদের হাতে হাতুড়ে কাজ করিবার কোন ক্ষমতাই জন্মে না। কেজো রকম বিজ্ঞানের চাষ এদেশের ফিরিঙ্গি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই—এ কথা অধ্যাপক র‍্যামসে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তবে ওরই মধ্যেই যাঁদের আদত শিখিবার বা কিছু করিবার মতলব আছে, তারা কাজ গুছাইয়া লইতে পারেন। কলিকাতায় "বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে"র কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই কারখানায় বিলাতী ঔষধ বৈজ্ঞানিক রকমে তৈয়ারী হয়। সম্প্রতি মাণিক-তলায় এই ঔষধ তৈয়ারীর যে নূতন কারখানা হইয়াছে, তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, বিদেশ যাইয়া একটা কেষ্টো বেষ্টো হওয়ার আগেও এখান থেকে কল কারখানায় কিছু না কিছু কাজ করা যায়। এই কারখানায় সম্প্রতি ঔষধ তৈয়ারীর আরও ফলোয়া রকম ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু তৈয়ারী হইতেছে। সালফিউরিক এসিড তৈয়ারীর নূতন

কারখানা হইতেছে। এলো মেলো কাণ্ড কিছু নাই, আস্তে আস্তে পা বাড়ান হইতেছে। আজ এটা কাল সেটা করিয়া সমস্ত আবশ্যক ঔষধ এবং যন্ত্রাদি তৈয়ারীর উপায় হইতেছে। এদিকে অপব্যয় কিছু নাই, পাকা ব্যবসাদারের মত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ সেখানে রাঙ্গামুখও নাই, বিলাতফেরত আস্তিনকাচা দেশী ফিরিঙ্গিও কাহাকে ড্যাম শুয়ার বলে না, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে সেখানে কোন কাজ আটকায় নাই। সেখানে যা কিছু কাজ আটকাইতেছে—টাকার জন্য আর দেশের লোকের দেশের উপর মন না থাকার জন্য। প্রথম এখানকার টাকাকড়িওয়ালা লোক কাজ কারবারে টাকা খাটাইতে বড় নারাজ। তাই ঐ কারখানার সেয়ার বেচিতে উদ্যোগীদিগের একেবারে হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া যায়। কেউ বলেন, কোম্পানীর কাগজের দরটা একটু চড়ুক এখন কাগজ বেচিলে অনেক লোকসান খাইতে হইবে। কেউ বলেন, বাড়ীর মেয়েদের ও বিষয়ে একেবারেই মত নাই। তাঁরা বলেন, গহনা বা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিলে হু হু করিয়া টাকা বাড়িয়া যাইবে, অথচ কোন লোকসানের ভয় থাকিবে না। আবার যারা বিলাতী ওষুধপত্র হামেসা ব্যবহার করে, তাদের আবার এমনই বিদ্যে বুদ্ধি যে বিলাতি পুরাণা পচাধসা ওষুধ ব্যবহার করিবে, তবুও দেশী কারখানার টাটকা ওষুধ লইবে না। ওষুধবিক্রেতারাও দেশী কারখানার ওষুধ গুদামের এক অন্ধকার কোণে ফেলিয়া রাখিয়া দেয়। আমাদের জন্য বিলাত থেকে যে সকল ওষুধ আসে, তাহার অনেকগুলি ব্যবহারেই কোন উপকার হয় না। সেগুলি জিনিষ ভাল নয়, ভারতের জন্যই সেগুলি তৈয়ারি, একথা বিলাতের ঔষধওয়ালারা স্পষ্ট করিয়া কাগজে ছাপিয়া দেয়, তবুও এদেশের লোকে ঘরের কড়ি খরচ করে ডুবে মরে।

তাই বলি, আপাততঃ বিদেশে পাঠাইয়া বিশ্বকর্ম্মা তৈয়ারীর মতলব চাপিয়া রাখিয়া এই সকল কারখানা দেশী লোকের সাহায্যে যত দূর চলে সেটা একবার চেয়ে চেয়ে দেখিলে ভাল হয় না? বিদেশে লোক পাঠাইলেই তার ১০টা হাত আর দশটা পা বেরোয়, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। জগদীশচন্দ্রকে অনেক দিন প্রেসিডেন্সী কালেজের লেবরেটরী ঘেঁটে ঘেঁটে তবে একটা কিছু হইতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, বেঙ্গল কেমিকেলের চন্দ্রবাবু* বা রাজশেখরবাবু† এখান থেকে যা করিবেন, কোন লোক বিলাত, জার্ম্মাণী বা জাপান থেকে কারীকুরির বস্তা বস্তা সার্টিফিকেট বেঁধে নিয়ে এসেও, তার সিকির সিকি করিতে পারিবে না। বরং অন্য দেশ থেকে কারিকর এনে নূতন বিদ্যা শেখা ভাল, তবুও যার গোঁফের রেখা দেয় নাই, বা যে কখনও কল কারখানা দেখে নাই, তাহাকে বিদেশে পাঠান কিছু নয়।

বিলাতে যখন প্রথম লোহা ঢালাই করিয়া নানা রকম জিনিষপত্র তৈয়ারী হইতে থাকে তখন ফ্রান্স সুইজরলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এত কারিকর আসিয়াছিল যে, তখনকার পাড়া পাড়ার রেজিষ্টারী বহিতে ঐ সকল দেশের অনেক লোকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইত। তাই বলি, আগে দেশে যে সকল কাজকর্ম্ম চলিতেছে, সকলে মিলিয়া সেইগুলি ভাল করিয়া চালাইবার চেষ্টা করা উচিত। কেবল হুজুগে পড়িয়া যার প্রাণে যা চায়, তাই করিলে চলিবে কেন? বেঙ্গল কেমিক্যালটার এখন যেমন অবস্থা, তাহাতে প্রাণে বেশ আশা হয়—আনন্দ হয়। যদি সঙ্গতিপন্ন লোক মাত্রেই এই কারখানার শেয়ার কেনেন, তাহা হইলে এই দেশী লোকের দ্বারাই কতদূর কাজ হয়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া যায়।

—১৩ই মার্চ, ১৯০৬

যখন হিউম-কটন-ওয়েডারবার্ন প্রভৃতি তথাকথিত ভারতপ্রেমিকদের লইয়া বাংলাদেশের তথা ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতারা উন্মত্ত, বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব তখন এইভাবে এই ভারতপ্রেমিকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে দ্বিধা করেন নাই:

কবে আঁখি ফুটিবে?

হিউম বল, কটন বল, ওয়েডারবরণ বল, এঁরা সবাই লোক ভাল, শতবার এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু এঁদের সঙ্গেই কি সত্যি সত্যি আমাদের মিল আছে? না—মিল

* চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী।

† রাজশেখর বসু।

হইবার সম্ভাবনা আছে? আমরা যে বস্তুর জন্য লালায়িত, ইঁহারা কি তার আদর করেন, না ইচ্ছা করেন আমরা তাহা লাভ করি। সত্য সত্য আন্তরিকভাবে ইঁহারা তা কি কখনো চান? আজ পর্য্যন্ত আমাদের রাজনীতিক নেতৃবর্গ এ কথাটা কখনো তলাইয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কথাটা অতি সামান্য, কিন্তু এর নিগূঢ় মর্ম্ম অতি সাংঘাতিক। সে কথাটা এই যে হিউম, কটন, ওয়েডারবরণ্ প্রভৃতি ভারত-বন্ধুগণ কখনো ভারত-শাসনকে—"আমাদের শাসন"—"Our rule" ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণে নির্দ্দিষ্ট করেন না। এখন ভারতশাসন সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজের ইহা কে না জানে? আমরা সর্ব্বতোভাবেই—

'নিজবাসভূমে পরবাসী'

হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু কথাটা সত্য বলিয়াই যে প্রিয় হইবে তা ত নয়। আর এ সত্যও যে একটা বিরাট অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও তো অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজ আমাদের যতই উপকার করুক না কেন, এ তো গরু মেরে জুতা দানের চাইতে কখনো বেশী হতে পারে না। কিন্তু কোনো ইংরেজই এই গোড়ার অন্যায়টা মানিয়া চলিতে রাজী নন। ঐ গোড়ার অন্যায়ের জ্ঞান যদি থাকিত, তবে কথায় কথায় এমন উদারমতি ভারত-বন্ধুগণও আমাদের মাথায় বারম্বার—এই Our rule প্রক্ষেপ করিতেন না।

এদেশে কথায় কথায় গৃহস্বামী সম্মানিত অভ্যাগতকে "এ আপনারই বাড়ী"—"এ আপনারই সকল"—এরূপ অভ্যর্থনায় পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াস পান। ইহাতে গৃহ-স্বামীর স্বামিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কেবল অসাধারণ সৌজন্যই প্রকাশ পায়। আমাদের উদারমতি ভারতবন্ধুদের এ সৌজন্যটুকুও আজি পর্য্যন্ত শিক্ষা করা হয় নাই।—অন্যে পরে কা কথা?

মোট কথাটা এই—যে বিরাট অন্যায়ের বলে জগতের সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলতর জাতির উপরে প্রবলতর জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, কোনো ইংরেজই ভারত-শাসনে সেই গোড়ার অন্যায়টা আর মানিতে চান না। যাঁরা নিতান্ত উদার ভাবাপন্ন, তাঁরাও তামাদির অজুহাতটা অস্বীকার করিতে রাজি নন। এই জন্য কোনো ইংরেজ ভারতশাসনকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করিতে চান না, যাহাতে আর তাঁহাদের পক্ষে ইহাকে—"আমাদের শাসন"—Our rule—বলা সম্ভব হইবে না।

হিউম বল, কটন বল, ওয়েডারবরণ বল, ইঁহারা সকলেই এই "আমাদের শাসন"—Our Ruleটাকে এদেশে বদ্ধমূল করিবার জন্য ব্যস্ত। হিউম-কটন-ওয়েডারবরণ-নীতির উদ্দেশ্য ইহাই। ইঁহাদের সর্ব্ববিধ সদাশয়তার লক্ষ্য ঐ এক দিকে।

ইঁহারা ইংরেজশাসনকে মোলায়েম করিতে চান। ইঁহারা লোকের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিয়া ইংরেজ রাজত্বকে জনগণের প্রিয় করিতে চাহেন। এঁরা ব্রিটিশ ভারতে অত্যাচার অবিচার বন্ধ করিতে চাহেন—ধর্ম্মের খাতিরে ও রাজ্যরক্ষার উদ্দেশে। অপর ইংরেজের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ এই যে, তারা নির্ব্বোধ, ইঁহারা বুদ্ধিমান; তারা অপরিণামদর্শী, ইঁহারা পরিণামদর্শী; তারা বর্ত্তমানের আশুসুখ-সম্মান সুবিধার জন্য ব্যস্ত, ইঁহারা সুদূর ভবিষ্যতে শান্তি ও স্থায়িত্বের জন্য লালায়িত। কিন্তু মূলে কাহারও ভুল নাই। সকল ইংরেজেরই প্রাণগত বাসনা যে চিরদিন ভারত ব্রিটিশ পদানত থাকে।

সে বহু দিনের কথা—একবার কংগ্রেসে অস্ত্র আইন সম্বন্ধে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়। অস্ত্র আইন রহিত করিবার জন্য কংগ্রেসে এক মন্তব্য উপস্থিত করা হয়। সেবারে মান্দ্রাজে প্রথম কংগ্রেস বসিয়াছিল। হিউম এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। পর বৎসরের কংগ্রেসে প্রয়াগে আবার ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, সেবারেও হিউম উহার অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের হেতু কি, তিনি নিজমুখে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, একজন কংগ্রেসীকে বলিয়াছিলেন,—কৌন্সলী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী একথা হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে হিউম বলেন—'১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে যাহারা ভারতের সেই ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব স্বচক্ষে দেখিয়াছে—তাহারা কখনও অস্ত্রআইন রদ হউক, আর এদেশের লোকে যথেচ্ছভাবে অস্ত্র রাখিবার অধিকারপ্রাপ্ত হউক, এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারে না।'

পাঠক, কথাটার দৌড় কত একবার তলাইয়া দেখ। যাঁদের মনোভাব এইরূপ, তাঁরা লোক মন্দ, একথা বলিতে

পারা যায় না; কিন্তু আমরা যে বস্তু চাই, তাঁরাও যে ঠিক সেই বস্তুই আমাদের জন্য চান, তাই স্বীকার করিতে পারি না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ এই যে, তাঁরা চান আমাদের জন্য সুশাসন, আমরা চাই সত্য স্বায়ত্ত-শাসন। কারণ সুশাসনে পশুবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরমার্থসিদ্ধি হইতে পারে না।

এঁরা চান দেশে যেন অকাল-মন্বন্তর না হয়, লোকে পেট পুরিয়া যেন দুবেলা খাইতে পায়। এঁরা এইজন্য প্রজার করভার লঘু করিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা করভার লঘু কি গুরু তা ভাবি না—আমরা কেবল চাই যে করভার যদি গুরু হয়, তাও আমাদের আত্মপ্রয়োজনে, আত্মনির্দ্ধারণে হইবে। অপরের প্রয়োজনে বা নির্দ্দেশে নয়। দেশরক্ষার জন্য স্বজাতির শিক্ষার জন্য, শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের সুখ-স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য যদি এখন যে করভার বহন করি, তদপেক্ষা দশগুণ বেশী বহন করিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু রাজস্বের প্রত্যেক কপর্দ্দক প্রজার প্রয়োজন সাধনে ব্যয়িত হইবে, আর প্রজার নির্ব্বাচিত, বিশ্বস্ত, স্বদেশবাসী, স্বজাতীয় প্রতিনিধিগণ এই কর নির্দ্দিষ্ট করিবেন। বিচারালয়ে আমরা কেবল ন্যায়-বিচার চাহি না,—আমাদের নিজেদের লোক বিচার করিবেন ইহাও চাই। কারণ এই বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের লোকের বুদ্ধি প্রখর ও ধর্ম্মজ্ঞান উত্তরোত্তর ফুটিয়া উঠিবার সম্যক্ অবসর পাইবে। আমরা শিক্ষা কেবল চাহি না—নিজেরা শিক্ষকও হইতে চাহি; কারণ শুধু অধ্যয়নে বিদ্যালাভ হয় না,—অধ্যাপনা ব্যতিরেকে অধীত বিদ্যা কদাপি পরিস্ফুট ও পরিপক্ব হইতে পারে না। আমরা কেবল সুরক্ষিত হইয়া থাকিতে চাহি না,—কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আপনাকে আপনি রক্ষণ করিবার শক্তি ও সরঞ্জাম লাভ করিতে চাহি; কারণ যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সে যতই কেন সুরক্ষিত হউক না,—জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে সে কদাপি অচল-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। আমরা কেবল শান্তি চাহি না, কিন্তু শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সংযমের ক্ষেত্র চাহি; কারণ যে শান্তি সংযমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা বিষময় ও আত্মঘাতী। তাহাতে মানুষ পশুর অধম হইয়া যায়; তাহাতে তমোগুণ প্রবল হইয়া উঠে। সে শান্তি মৃত্যুর দ্বার, অমৃতের সোপান নহে। আমরা শক্তি চাই, আমরা বীর্য্য চাই,—আমরা সেই সাধন চাই, যাহাতে পরমার্থ জাগ্রত হয়। আমাদের বিলাতী বন্ধুগণ কি এ পথে আমাদের সহায় কখনো হইবেন? যতই কেন উদার হউন না,—এতটা উদারতা তাঁরা সহিতে পারিবেন না। তাঁদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা কেবলই পদে পদে বিপথগামী হইব, এখনো যদি ইহা বুঝিতে না পারি, তবে আর কবে আমাদের এ চক্ষু ফুটিবে?

—১৬ই মার্চ, ১৯০৬

নিজে সম্পাদক হইয়া জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদককে এই তীব্র ব্যঙ্গ একমাত্র বিপ্লবী উপাধ্যায়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল:

অমৃতং মতি ভাষিতম্

প্রিয় "অমৃত" বলিতেছেন, এত দেশ থাকিতে বরিশালে কন্‌ফারেন্স করিবার কারণ কি?

বাস্তবিক, কারণ কি? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কারণ কি?

আমরা বলিতেছি, এবারকার কন্‌ফারেন্স কামস্কট্‌কায় করিলে হানি কি? কামস্কট্‌কা কিঞ্চিৎ কটমট বলিয়া যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে এযাত্রা সিংহলে সমবেত হইলে ক্ষতি কি? বিজয়বাহুর পর আর কোনও প্রবল প্রতাপশালী বাঙ্গালী সিংহলে জয়পতাকা প্রোথিত করেন নাই। এবার সিংহল বিজয় করিলে হয় না? রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন,—

"প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ"

বাঙ্গালীর প্রতাপ "বন্দে মাতরম্" কন্যাকুমারীর পথে লঙ্কায় উপনীত হইয়াছে, সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। এইবার সেখানে কণ্ঠযন্ত্র সহযোগে "শব্দ" করিলেই ত দিগ্বিজয়ের অর্দ্ধেক ফতে হইয়া যায়? আর সিংহল যদি মনঃপূত না হয়, হিন্দুর প্রাচীন উপনিবেশের ফর্দ্দেও দেশের অভাব নাই। যবদ্বীপ অর্থাৎ যাভা, বলিদ্বীপ অর্থাৎ বালি প্রভৃতি সমুদ্রোর্ম্মিচুম্বিত দেশে কন্‌ফারেন্স হইল না কেন? হনোলুলু ও চন্দ্রকোণা, ফিলিপাইন ও তারকেশ্বর, উত্তর-মেরু ও ফরেসডাঙ্গা—সব পড়িয়া রহিল, আর বাছিয়া

বাছিয়া ক্ষুদে লাট ফুলারের দুটি চক্ষুর বিষ, গুর্খা-বুট মর্দ্দিত বরিশালেই কন্‌ফারেন্স ?

এ নির্ব্বাচন কে করিল ?

"অমৃত" বলিতেছেন, দুর্দ্দান্ত বরিশালী পুলিস রাঘব বোয়ালের মত বদন ব্যাদান করিয়া আছে। এই যমের মুখে বাঙ্গলার বাছা বাছা নায়কদের নিক্ষেপ করিবার দুষ্ট কল্পনা কাহার ? বাহিরের লোকে, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বরিশালের নেতাদের পুলিসের গ্রাসে সমর্পণ করিবার দুরভিসন্ধিতে এই টোপ্ ফেলে নাই ত ? বরিশালের অধিবাসীরা বিভীষিকায় ভয় করে না, ফুলারের মনে এই কাল্পনিক সংস্কার বদ্ধমূল করিবার বৃথা চেষ্টায়, বরিশালে কন্‌ফারেন্স চণ্ডীমণ্ডপের পত্তন হয় নাই ত ? "অমৃত" শেষে প্রায় মুক্তকচ্ছ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বলি, বরিশালে এবার কন্‌ফারেন্স হইবে ত ? যদি বা হয়, সেখানে নামজাদার বদলে বেকার নামহীন নগণ্য প্রতিনিধিদের ভিড় হইবে না ত ?

বলা বাহুল্য, এ সব "অমৃতে"র প্রশ্ন—অমৃতায়মান অচল অটল সিদ্ধান্ত নয়। কেন না, তাহার পরই অমৃত-বাজার বলিতেছেন, এসো, আমরা এক লহমার জন্যেও ধরিয়া লই যে, বরিশালবাসীর হৃদয়ে বল দিবার জন্য, প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্যই কন্‌ফারেন্স হইতেছে। বরিশাল অনেক সহিয়াছে, এখনও তাহার ক্ষতমুখে রুধির ঝরিতেছে, অতএব, বরিশালই কনফারেন্সের একমাত্র যোগ্য ক্ষেত্র। আমরা বলি সাধু !

অমৃতে আমাদের কোনও কালে অরুচি নাই। বিশেষতঃ সংপ্রতি অত্র দেশে মতান্তর ঘটিলেই মনান্তর, এবং মনান্তর ঘটিলেই একতা নষ্ট হইতেছে। এক্ষেত্রে যত দিন এই একতার জোড়-কলম বেশ জুড়িয়া না যায়, ততদিন আর মতান্তরের ঝঞ্ঝা তুলিয়া কাজ নাই। অগত্যা আমরা প্রসন্নচিত্তে কামস্কটকা, হনোলুলু যবদ্বীপ প্রভৃতির কন্‌ফারেন্স বক্ষে ধরিবার দাবী তুলিয়া লইতেছি। বরিশালেই কন্‌ফারেন্স বসুক।

এখন দেখা যাক, ভাবী প্রতিনিধিদের অবস্থা। "অমৃতে"র ভাণ্ড হইতেই আমরা কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এত তথ্য, প্রশ্ন, সম্ভাবনা বিভীষিকা সংগ্রহ করিতেছি। আর এক পশলা অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইতে, বোধ করি, কাহারও আপত্তি নাই। আর, যখন এহাটে কোনও আপত্তিই তুলিবা[illegible]তে নাই, তখন আর ভয় কি ?—"অমৃত" সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকীর ন্যায় "আকাশে" জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"ধর্ম্মক্ষেত্রে বরীশালে সমবেতা যুযুৎসবঃ", সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ও মতিদাদার ন্যায় নায়কদের ধরিয়া বরিশালের জেল-নামক জঘন্য খাঁচায় পুরিবে না ত ? বরিশালের কন্‌ফারেন্সের পাণ্ডা ও নেতাদের আবার অনাহারী কন্‌ষ্টেবল করিবে না ত ?

আমরা বলি, একটু ইংরাজী করিয়াই বলি, সে সব এখন ভবিষ্যৎ গর্ভিনীর গর্ভে। যখন দৈবজ্ঞ ঠাকুর এত খড়ি পাতিয়াও ফিরিঙ্গীর আভসন্ধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের বিশ্বাস, উত্তরের আশা নাই।

এবার ত বরিশালে দুর্ভিক্ষ। শুনিয়াই একটু দমিয়া গিয়াছি। "অমৃত" ভুলিয়া যান, কিন্তু আমাদের মনে আছে,—বরিশালে কন্‌ফারেন্সের কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। তখন স্বদেশীও ছিল না, দুর্ভিক্ষও ছিল না, সুতরাং মালক্ষ্মীর অন্নক্ষেত্র বরিশাল হইতে পেলার হিসাবে মনে করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ বালাম সংগ্রহ করিয়া আনিব। দুর্ভিক্ষ বরিশালে মানুষ খাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার সে আশারও মাথা খাইয়াছে। পেলা চুলায় যাক, খোরাকীর ভাবনায় ঘুম হইতেছে না। অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত কিরূপ ? রসদের উপরই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে। রসদের পরিপাটী ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তাই অমৃতের কেবল নেতাদের চিন্তা, আর আমরা প্রতিনিধিদের ভাবনায় অস্থির।

যদি পোলাও কাবাব না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বরিশালই কারাগার। জগৎ একেই জীর্ণারণ্য, তার উপর কন্‌ফারেন্সে যদি আলুভাতে ভাতই সম্বল হয়, তাহা হইলে জেলে যাইতেই বা হানি কি ? বরিশালের জেলে দাদখানি চাউলের অন্ন, একটু মাছের ঝোল ও কিঞ্চিৎ বল্‌কা দুধ পাইব ত ? হরিনামের ঝুলিটি হাতে রাখতে দিবে ত ?

এবারে "অমৃতে"র হ্যামলেট-ভাবের একটু অনুধ্যান করুন। To be or not to be, that is the question। ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ বোধ করি কোনও মহিলাকবি

এইরূপ করিয়াছেন, "হয় কি না হয় প্রশ্ন ইহাই এখন।" প্রশ্ন গুরুতর। যাই কি না যাই? একদিকে চক্ষুলজ্জা, লোকের উপহাস, ফিঙ্গের উপদ্রব। ওদিকে গুর্খার গুঁতার আশঙ্কা, নিদারুণ জেলের ভয়, ফিরিঙ্গির প্রেম-সাধে বাদ, তার উপর দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রসাভাব। কি করি। যাই কি না যাই! "অমৃত" বলিতেছেন, এবার সকলেই চল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ চৌহদ্দী করিয়া ভাঙ্গা ও অভাঙ্গা, সমগ্র বাঙ্গালার নায়ক বা নেতা মনুষ্যদের একটা ফর্দ্দ কর। তাঁহাদের শপথ করাইয়া লও যে, এবার বরিশালের কন্‌ফারেন্সে নিশ্চিত হাজিরা দিব। অবশ্য যাঁহারা 'ইন্‌ভ্যালিড্' অর্থাৎ শয্যাগত তাঁহাদের ছুটি। আমরা আবার বলি সাধু!

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রতিবাদ করিব না, কিন্তু একটু ত্রুটির উল্লেখ না করিলে নয়। তাই ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, এই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঘিরিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া যে জাল ফেলিলেন, ইহাতে এত বড় একটা ছিদ্র রাখিয়া দিলেন কেন? ঐ যে শয্যাগত—মহারন্ধ্র, ঐ পথে ত বাঙ্গালার যত রুই, কাতলা, মৃগেল বাহির হইয়া যাইতে পারে! তখন কি পঙ্কচারী রোগা কই সিঙ্গি, চ্যাং ছাঁকিয়া তুলিয়া বরিশালের রাজনীতি দীঘিকায় ছাড়িয়া দিবেন? অমৃত দাদা আপনি যে বলিতেছেন—স্বয়ং যাইবেন, তাহাই কি এই "ইন্‌ভ্যালিড" ছিদ্র থাকিতে ঘটিয়া উঠিবে? কন্‌ফারেন্সের প্রসঙ্গে আপনার বাজারে যেরূপ "হা হতোস্মিন" রব উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আপনার স্নায়ুর অবস্থাও শঙ্কাজনক। আপনি যদি ইন্‌ভ্যালিডের খাতে পড়িয়া যান, তাহা হইলেই ত সব মাটি! নভেলের ভাষায় বলিতে গেলে, বাগবাজারের গগনমণ্ডলের এক কোণে একটু ভয়ের একটু সন্দেহের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে,

"পুন পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন ডাক দিয়া বলে,
লক্ষ্য বিঁধিবারে যত ক্ষত্রিয় সকলে।"

ইহার অর্থ এই যে নিশ্চেষ্ট দেখিলেই ডাক দিয়া লক্ষ্য বিঁধিতে বলিতে হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নও ডাক দিয়াছিলেন, "অমৃত"ও দিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আওয়াজ ভরাট, অমৃতের গলা একটু কাঁপিতেছে। কালের প্রভাব।

আমাদের পরামর্শ, শুধু ডাকাডাকি হাঁকাহাকির কর্ম্ম নয়। যদি কন্‌ফারেন্স সফল করিতে চান, তাহা হইলে যেমন রোগ সেইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করুন। প্রথমতঃ ফুলার-ভয় নিবারণের প্রার্থনা করিয়া মিণ্টোর নিকট দরখাস্ত ও মরলীর নিকট 'তার' করুন। এই দরখাস্ত দুইখানির ও মহারাণীর সেই মামুলি ঘোষণাপত্রের লিখো প্রতিলিপি করিয়া বড় বড় তাম্রময় কবচে রক্ষা করুন। সেই কবচ একটু স্থূল রজ্জুসহযোগে গলদেশে ধারণ করিয়া বরিশালে গমন করুন, আর ফুলার-ভয় থাকিবে না। অবশ্য নেতাদের জন্য একটু বিশেষ রামকবচ আবশ্যক। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিন নেতাদের পক্ষ হইতে প্রজাদের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কবচে তাহাও থাকিবে। গলায় দিবার দড়ি যেন একটু মোটা ও মজবুৎ হয়, নতুবা ছিঁড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না।

—২৯ মার্চ, ১৯০৬

এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইবার ঠিক পনের দিন পরে ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ, ১৩১৩) বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনের দিন স্থির হয়। ঐতিহাসিক "বঙ্গভঙ্গে"র সেইদিনই সূত্রপাত।

বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধবের বৈপ্লবিক জীবনের শেষ পরিণতির কথা একজন বৈদেশিক রাজনৈতিক নেতা অতি চমৎকার বিশ্লেষণে বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন যখন প্রবলভাবে চলিতেছে তখনই ইংলণ্ডের তদানীন্তন পার্লামেণ্ট-সভ্য এবং পরে প্রধানমন্ত্রী জে. র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারত-পরিভ্রমণে আসিয়া, তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই অভিজ্ঞতার কথা তাঁহার 'The Awakening of India' 'ভারতের জাগরণ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ১৯১০ সনে প্রকাশিত হইবার পর উহার প্রচার ভারতবর্ষে আইনতঃ বন্ধ করা হয়। তাহাতে "The Genius of Bengal" "বাংলার প্রতিভা" শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"Hinduism is the pivot round which the life of India turns. It is a reservoir of preju-

dice, of feeling, of sympathy, of power as yet almost untapped, but if tapped capable of displaying a force like a swollen river which has burst its banks. It is in the worship of his gods, in his religious devotions, in his following the footsteps of his gurus that the Indian seeks after his mother, India. The Matripuja—the worship of the mother—has become a political rite.···And now, when the Indian youth sees his benign mother no longer sitting in ashes on the wayside but enthroned in splendour and majesty on a seat of authority, it is as a goddess that he pictures her. India is indeed the mother goddess. The worship of maternity, which runs like a golden thread through nearly every one of his popular faiths, inspires the Indian's "Bande Mataram" and makes it seditious by the abandon of its filial worship, the whole-heartedness of its childlike allegiance to the soil of his birth, and the luxuriant growths of tradition and sentiment which it bears. He returns to his gods and to the faith of his country, for there is no India without its Faith and there is no Faith without India."

"The prodigal son wanders back to his father's door. Beneath many veneers of faith, of worship, of culture, the Hindu personality persists. Let any one take up the biography of Swami Upadhyay Brahmabandhab, the catholic convert, the christian propagandist, the lecturer at Cambrige and Oxford, who never really forsook the worship of Shri Krishna, who participated in the Shivaji festival, whose Catholicism was but Hinduism plus a cross, and whose message to his countrymen was : 'Whatever you are be a Hindu, be a Bengali'—and see how Hinduism can persist."

অর্থাৎ, হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের জীবনধারা আবর্তিত হইতেছে। সংস্কার, হৃদয়াবেগ সমবেদনা ও শক্তির ইহাই আধার এবং এই আধার এখনও প্রায় অব্যবহৃত আছে। যদি ইহার উৎসমুখ খুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বন্যাস্ফীত বাঁধভাঙা নদীর মত শক্তি অবারিত হইবে। বিভিন্ন দেবতার পূজায়, বিবিধ ধর্মের অনুষ্ঠানে, নানা গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতবাসীরা মাকেই খোঁজে, সে মা ভারতবর্ষ। মাতৃপূজা এখন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে···ভারতের যুবসম্প্রদায় এখন আর পথের ধারে ভস্মবিভূতি-আচ্ছন্ন অবস্থায় কল্যাণময়ী মাকে বসিয়া থাকিতে দেখে না, তাঁহাকে ঐশ্বর্য ও মহিমামণ্ডিত সিংহাসনে আরূঢ়া একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীরূপে দেখিতে চায়। তাঁহার দেবীমূর্তি কল্পনা করে। ভারতবর্ষ সত্যসত্যই মাতৃ-শক্তির প্রতীক। মায়ের পূজা স্বর্ণসূত্রের মত ভারতবাসীদের সকল প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, এবং ভারতবর্ষের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উদ্গীথ করাইয়াছে। সন্তানদের মাতৃপূজার আতিশয্যে, জন্মভূমির প্রতি তাহাদের সন্তানসুলভ আনুগত্যের ঐকান্তিকতায় এবং ইহাকে ঘিরিয়া যে বিপুল ঐতিহ্য ও ভাবোদ্বেলতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ফলেই এই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র রাজদ্রোহমূলক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতবাসী যে পথই অনুসরণ করুক শেষ পর্যন্ত তাহার স্বদেশের দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসের পথে ফিরিয়া আসে কারণ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া ভারতবর্ষ নাই এবং ভারতবর্ষ ছাড়া ধর্ম নাই।

উন্মার্গগামী পুত্র পিতৃগৃহদ্বারে ফিরিয়া আসে। ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস, ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির যত প্রলেপই তাহার গায়ে লাগুক, শেষ পর্যন্ত হিন্দুত্ব ফুটিয়া উঠে। যে কেহ স্বামী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবনী আলোচনা করিবে, দেখিতে পাইবে এই ধর্মান্তরিত কাথলিক, এই খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের এই বক্তা কখনও সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইতে বিরত হন নাই, শিবাজী উৎসবে অবাধে যোগ দিয়াছেন, ইহার কাথলিক ধর্ম একটি ক্রশযুক্ত হিন্দুত্ব মাত্র। তাঁহার দেশবাসীর নিকট তাঁহার বাণী ছিল "যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও।" উপাধ্যায়ের এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারিবে হিন্দুত্বের প্রভাব যাইবার নহে।

আজন্মবিপ্লবী উন্মার্গগামী ব্রহ্মবান্ধবকে পিতৃগৃহদ্বারে আর ফিরিতে হয় নাই, পথের পথিক থাকিয়াই তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী

পবিত্রকুমা

অন্তরের অতল প্রদেশে যেখানে পাপের প্রথম একটি দুটি বীজ জন্মায়, যেখানে আবার মান-হুঁস মানুষের প্রথম করুণ আর্তি বিন্দু বিন্দু জমে ওঠে সেইখানে ডুব দিয়েছিল রাশিয়ানরা গত শতকে; মাথার ওপরের নীলাভ আকাশের রহস্য সব ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্যে উর্ধ্বতম প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে চেয়েছে রাশিয়ানরা এই শতকে। এই দুই ব্যাপারেই রাশিয়ানদের সাফল্য আর সকলকে হার মানিয়েছে। এই দু পাশের দুই ঘটনার মাঝখানে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা আছে। রাশিয়ানরা একটি সফল বিপ্লব সমাধা করেছে, দেশের ওপর থেকে সমস্ত রকম বিদেশী অধীনতার জাল ছিঁড়ে ফেলেছে, খণ্ড খণ্ড রাজ্য জাতি ও ভাষাকে ঐক্যের মালায় গেঁথে এক অখণ্ড জাতি সৃষ্টি করেছে, ঐশ্বর্যে কীর্তিতে সামাজিক সুবিচারে মানবজাতির অতীতকে ম্লান করে দিয়েছে এবং রাশিয়ার রাজধানী মস্কো বিশ্ব-সভ্যতারই একটি অন্যতম রাজধানীতে পরিণত হয়েছে।

তারই পাশাপাশি আমাদের চিত্রটি কিন্তু এই রকম দাঁড়ায়।

ইংরেজি সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য ভাষা আমরা মেনে নেব কি নেব না এই ছিল আমাদের বুদ্ধিজীবীদের প্রধান সমস্যা গত শতকে; পশ্চিমী মতবাদ, যন্ত্র ও নানা রকম প্রতিষ্ঠান (রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক) আমরা নেব কি নেব না এই হল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রধান সমস্যা এই শতকে। এই দুই দিকের মাঝখানে আমাদেরও কয়েকটি ছোট ঘটনা আছে। স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু কাম্য রূপান্তর আসে নি, দেশের ঐক্য নিয়ত বিপন্ন হচ্ছে, পরিকল্পনাগুলি প্রায়শই ব্যর্থ, বিদেশে কেউ আমাদের পাত্তা দেয় না। মানবজীবনের অন্তরতম সত্য উদ্ঘাটনে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর উৎসাহ নেই, বিশ্বসৃষ্টির রহস্যলীলায় অংশ নেবার তার বাসনা নেই, বাস্তব সুখ সমৃদ্ধির সংগঠনে তার প্রবল অনীহা।

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এই মানসদৈন্যের উৎস কোথায়? কি কি কারণ তাদের পঙ্গুতার জন্য দায়ী? জাতির যে-কোনও রকম উন্নতির দায়িত্ব বহন করা বুদ্ধিজীবীদের কাজ, জনসাধারণের একমাত্র ভূমিকা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া। জাতীয় অবনতির দরুন জনসাধারণের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের দায়িত্বস্খলনের একটা সোজা উপায় মাত্র। সকল দোষের ভাগ বুদ্ধিজীবীদের নিতে হবে। এই প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটিতে যা বলেছি তার কৃতিত্ব রাশিয়ান জনসাধারণের নয়, ডস্টয়েভস্কির; সেই আশ্চর্যতম লেখকের বই কিনে, পড়ে, তাঁর দৃষ্টি ও রুচির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল রাশিয়ার জনসাধারণ। এর বেশী ভূমিকা জনসাধারণের কোন দিন ছিল না। বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতাই জাতির ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতার উৎস অনুসন্ধানের ইচ্ছা করি।

এক

সংবাদপত্রই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একমাত্র আশ্রয়; আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সাংবাদিক মাত্র। সাম্প্রতিককালে যে কয়েকজন ভারতীয়ের নাম বুদ্ধিজীবীরূপে বিদেশে পৌছেছে তাঁদের মননশীলতা সাংবাদিকের মননশীলতার ওপরে ওঠে নি। অর্থাৎ মৌলিক ও অভিনব চিন্তাধারা তাঁদের কারোরই প্রায় নেই; স্বচ্ছ ভাষায় কতকগুলি প্রাপ্ত চিন্তাধারা প্রকাশ করার দরুনই তাঁদের যা কিছু খ্যাতিলাভ ঘটেছে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জওহরলাল নেহরু—বিদেশে এঁরা ভারতীয় মনীষীরূপে পরিচিত হয়েছেন। অন্যান্য বহু অল্পখ্যাত ব্যক্তির নাম

করা যেতে পারে, কিন্তু তা আমরা পরে করব। আপাততঃ ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রধান এই তিনজনকে সামনে রেখে এ কথা বলা যেতে পারে যে সাংবাদিকসুলভ মনীষার স্তর উত্তীর্ণ হতে এঁরাই পারেন নি—অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু উপরোক্ত তিনজনকে সামনে রেখে আরও একটি কথা বলা যায়, আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এক দুর্নিবার ঝোঁক তাঁরাই উদ্ঘাটিত করেছেন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা শুধু সাংবাদিক হয়েই যে সন্তুষ্ট থাকতে চান তাও নয়, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের আছে দুর্মর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মেঘনাদ সাহা সত্যেন বসুর মত বৈজ্ঞানিক এই আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ছিলেন না বা নেই, রমেশ মজুমদারের মত ঐতিহাসিক, তারাশঙ্করের মত অগ্রণী সাহিত্যিক—রাজনৈতিক লাভালাভের হিসাব নিয়ে উদ্ব্যস্ত হবার যাঁদের কোন কারণ নেই তাঁরাও সহজেই এই জালে নিজেদের জড়াতে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বা তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনায় রত ব্যক্তিরাও তাঁদের অভিনিবেশ নিয়োজিত করেছেন রাজনীতিতে। অবশ্যই এর কারণ আছে, সে কারণ আশু প্রাপ্তির লোভ। কিন্তু সেই লোভ যা প্রথমেই নাশ করে তা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর প্রথমতম প্রধানতম দায়িত্ব—সত্য উপলব্ধি ও তার প্রকাশের দায়িত্ব।

ইদানীং আশু প্রাপ্তির দ্বার খুলে দেবার হাতিয়াররূপে এসেছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তা একমাত্র বড় শহর বা রাজধানী থেকেই প্রকাশিত হয়ে থাকে, বিশেষতঃ আমাদের মত অনুন্নত দেশে। মফস্বলের লোকেরা সংবাদপত্রের পাতায় আসতে পায় না, অন্ততঃ দৃষ্টিগোচর ভাবে নয়। জাতীয় জীবনে মফস্বলবাসীরা তাই গৌণ ভূমিকার বেশী গৌরব দাবি করতে পারে না। বুদ্ধিমান বা প্রতিভাবান তরুণেরা মফস্বলে পড়ে থাকাটা তাই আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করে না, কলকাতার মত শহরে তারা চলে আসে। ফলে, মফস্বল অঞ্চল এমন জনসাধারণ নিয়ে গঠিত হয় যারা শহর থেকে বিতরিত সংবাদপত্র, পত্রিকা বা বইয়ের—এক কথায় ছাপার অক্ষরের আধিপত্য বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। জন্মার্জিত সংস্কার, লোকাচার ও শহর থেকে আগত ছাপার অক্ষরের বিধান এই মেনে চলে মফস্বলের লোক; তাদের নিজেদের চিন্তাশক্তি তাই কোনও দিন গড়ে ওঠে না, মনন থাকে দুর্বল। দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সকলেই শহরবাসী নয়, মফস্বলেও তারা ছড়িয়ে রয়েছে। মফস্বলের সেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিন্তু, বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব বহনে হয় অক্ষম নতুবা সুযোগাভাবে অসমর্থ। শহর থেকে যে পণ্য বুদ্ধিজীবীরা সরবরাহ করেন, মফস্বলের লোকেরা তার গ্রাহক মাত্র। অন্যপক্ষে, শহরবাসী মাত্রই মননশীল ব্যক্তি নয়—অধিকাংশই সাধারণ মানুষ, সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে দূরে। সামান্য কিছু-সংখ্যক লোক মাত্র বুদ্ধিজীবীর পোশাক পরতে চায়—বাকিরা অনুৎসাহী বা সুযোগবঞ্চিত। এখন এই অল্প-সংখ্যক লোক কি শহর কি মফস্বল সর্বত্র নিজেদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের বাধাহীন সুযোগ পেয়েছে ছাপার অক্ষরের দৌলতে। যেহেতু বাধা নেই, প্রতিযোগিতা নেই, কোনও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার ভয় নেই অতএব সবচেয়ে যা সোজা রাস্তা তার আশ্রয় নিতে বুদ্ধিজীবীরাও দ্বিধাহীন। সেই সোজা রাস্তাই হচ্ছে সংবাদপত্রের পাতায় পুনঃপুনঃ দৃষ্টিগোচর করে নিজের নাম প্রচার করা। নিত্য মুদ্রিত হয় ও শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সংবাদপত্র পড়ে বলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর উপর সংবাদপত্রের প্রভাব অপরিসীম। সংবাদপত্র যাঁদের পৃষ্ঠপোষণা করে তাঁদের জয় এ যুগে অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণ তাঁদের মান্য করে এবং সেই কারণেই সরকার তাঁদের খাতির করে। পুরস্কার, চাকরি, বিদেশে পাঠান ইত্যাদি নানাভাবে সরকার অনুগ্রহ বিতরণ করে এবং সেই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবার ইচ্ছা কম ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরই আছে। জনসাধারণের কাছে উচ্ছ্বসিত সম্মান ও সরকারের অনুগ্রহ লাভ এই দুই আশু ফলপ্রাপ্তির গ্যারান্টি সংবাদপত্রই দিতে পারে। বুদ্ধিজীবীরা তাই সংবাদপত্রের কৃপাপ্রার্থী। এই কৃপাপ্রার্থনার নানারকম উপায় আছে। কেউ কেউ সংবাদপত্রে সরাসরি চাকরি নেয় (আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে এই প্রবণতা ইদানীং অতি দুর্বার), কেউ সংবাদপত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব অর্জন করে বা তোষামোদ করে (এ প্রবণতা সর্বজনীন), আর যারা প্রকৃতই সমর্থ তারা সংবাদপত্রের

শিরোনামা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। আসামে বাঙালী-পীড়নের সময় যে সাহিত্যিক নেহরুর কাছে খোলা চিঠি লিখেছিলেন জ্বালাময়ী ভাষায়, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বছরে বিদেশে রবীন্দ্র-নিন্দা করেছিলেন যে কবি, সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যান করে উত্তপ্ত বাক্য বর্ষণ করেছিলেন যে বিগত নট তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের সংবাদ-শিরোনামা দখল করা। অখ্যাত ভারতীয়ের আত্মকাহিনী রচনা করতে গিয়ে জনৈক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ভারতবর্ষের নিন্দা করেছিলেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করে, জনৈক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু বিফলমনোরথ বাঙালী তরুণ বুদ্ধিজীবী কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকার আশ্রয়ে রবীন্দ্র-শ্রাদ্ধে মনোনিবেশ করেছিলেন কয়েক বছর আগে, কোন কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের চাটুকারিতা করে বেড়ান কিছু-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ও লেখকেরা, এঁদের সকলের উদ্দেশ্যই এক—সংবাদপত্রের লক্ষীভূত হতে পারা। ইলেকশনের বছরে পূজা-প্যাণ্ডেলে যাঁরা বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন তাঁরা সবাই ভোটপ্রার্থী রাজনৈতিক নন, বহু বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই অনুমেয়—জনপ্রিয়তা অর্জন করা। এই জনপ্রিয়তা বা খ্যাতি পেতেই হবে—যে মূল্যেই হোক; তার জন্য দরকার হলে প্রথম প্রথম কুখ্যাতি অর্জন করব, এই মনোভাব আমাদের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের পেয়ে বসেছে। সেই বাসনা চটপট সফল হতে পারে সংবাদপত্রের আনুকূল্যে। সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে তাই ঘুরছে বুদ্ধিজীবীরা।

অতএব সংবাদপত্রের মাপে নিজেদের সাজানো একান্ত দরকার হয়েছে তাঁদের। বুদ্ধিজীবীরা তাই এই নীতি নিয়েছেন: এমন কিছু লিখো না যা সংবাদপত্রের পাঠক-মাত্রই বুঝতে না পারে, এমন কিছু করো না যা সহজেই লোকের নজরে পড়বে না এবং এমন কিছু সর্বদা বলো যা খবরের কাগজে ছাপা হবে। খ্যাতনামা বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা অনেক বলেছি, এবার সদ্য-তরুণদের কথায় আসা যাক। বাঙালী তরুণ লেখকেরা সংবাদপত্রের বিভাগীয় সম্পাদকদের চাটুকারিতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত মেতে উঠেছে এবং তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা সংবাদপত্রে পুস্তক-সমালোচনা নামক যে কিম্ভুত জিনিসটি থাকে সেই পুস্তক-সমালোচনার কলমে কোন বইয়ের সমালোচনা করার জন্য কাড়াকাড়ি পর্যন্ত পড়ে যায়, কেন না রিভিয়ুর তলায় নিজের নামটি যদি বেরোয় সেটিই পরম লাভ। কেন এই উঞ্ছবৃত্তি? তরুণ লেখকেরা পরিষ্কার ভাষায় বলেন—খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা বেশী বলে তাতে নাম না বেরোলে চলে না।

একটি কথা শুধু এখানে সংশোধন করা দরকার। সংবাদপত্র বলতে শুধু কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকাকেই বোঝাতে চাই না, সেইসব দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকার কথাও আমি বলছি।

দুই

নারী অথবা সংবাদপত্র কেউই নরকের দ্বার নয়। সব দোষ একটি হেতুতে বর্তায় না। আরও হেতু আছে এবং তার মধ্যে একটি বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের সম্পর্কিত একটি ধারণায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এডওয়ার্ড শিলস্ লিখেছেন: One often hears it said within India and outside, by foreigners and by Indian intellectuals themselves about other Indian intellectuals, that he has lost contact with his country and its culture, that he belongs neither to India nor to the West—and all this because he is an Indian taken by Western ways and ideas. In consequence of this, he is alleged to be neurotic, schizophrenic, ambivalent, suspended between two worlds, and rooted in neither. [Edward Shils : The culture of the Indian Intellectuals : Quest, Jan-Mar. 1960] শিলস্ বলছেন এই ধারণা সত্য নয়। কারণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশদ্বারা প্রায়শই আচ্ছন্ন। শৈশব, যৌবন, বিবাহ, পারিবারিক জীবন, ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি আমাদের বুদ্ধি-জীবীদের সবতোভাবে দেশজ করে রেখেছে। তবু আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায়

শিক্ষিত হবার ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং এই বিচ্ছেদই তাঁদের ব্যর্থতার মূল কারণ।

বিশ্বকে যে জানে না, সর্বপ্রকার ভাবধারার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, বিচিত্র ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যার আত্মীয়তাবোধ নেই, আধুনিক যুগে সে বুদ্ধিজীবীরূপে স্বীকৃতি পাবার অযোগ্য। ইংরেজি ভাষা আমরা যদি শিখে থাকি ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ ও সংস্কৃতি ও ভাবধারার সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় ঘটে থাকে তাতে আমাদের পাপ হয় নি। এমন কোনও অন্যায়ই তাতে আমাদের ঘটে নি যাতে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার্জনের উপর আমাদের ব্যর্থতার জন্য দোষ চাপানো একান্তই বালসুলভ ব্যাপার।

ইংরেজ যতদিন রাজা ছিল ততদিন খুব সহজেই ব্যাপারটির মীমাংসা করা যেত, বিদেশী শাসনের কুফল আমরা অজুহাত হিসাবে দেখাতে পারতাম। আজ সে সুযোগ নেই। এখন আমরা কাকে দায়ী করতে পারি, একমাত্র নিজেদের ছাড়া?

জীবনের সঙ্গে যারা প্রতারণা করে অথবা সত্য হতে যারা মুখ ফেরায় তারাই অবশেষে বঞ্চিত হয়, ব্যর্থ হয়। উনিশ শতকের গৌরবে বাঙালীরা আনন্দে বাঁচে না, কিন্তু উনিশ শতকের মনীষীদের কৃতকর্মের ফল আজ ফলতে শুরু করেছে আসামে বিহারে রাজধানী দিল্লীতে, এমন কি খোদ পশ্চিমবঙ্গে। কী সেই ফল? উনিশ শতকে বাঙালীরা ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ইংরেজি বিদ্যা রপ্ত করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে চাকরি দখল করতে। অন্যান্য প্রদেশেও যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃত হবে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠবে এবং চাকরির দখল নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘটবে চাকরিজীবী বাঙালীর স্বার্থের সংঘাত আমাদের উনিশ শতকের মনীষীরা সেই সরল সত্যটি স্বীকার করেন নি। আজ তার বিষময় ফল ফলছে। বাংলার অর্থনৈতিক সংগঠন যে দৃঢ় মজবুত করা দরকার ও তার উপর বাঙালীর কর্তৃত্ব অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার সে কথাও তাঁরা ভাবেন নি এবং পরমানন্দে চাকরি রসে নিমজ্জিত বাঙালীরা আজ উনিশ শতকীয় মনীষীদের দূর-দৃষ্টির অভাবের ফল ভোগ করছে। বাংলাদেশ শুধু হিন্দুর দেশ নয়, মুসলমানেরও দেশ। মুসলমানদের হেয় করে অশিক্ষিত রেখে দূরে ঠেলে দিয়ে যে হিন্দুদের চিরকালীন উন্নতি অসম্ভব আমাদের উনিশ শতকীয় মনীষীরা তা বোঝেন নি এবং তারই ফলস্বরূপ দেশবিভাগ এল ও আজকের বাঙালী সর্বস্বান্ত হল।

জীবন ও জগতের বিশালতম থেকে সূক্ষ্মতম সত্য আবিষ্কারের উৎসাহ যার নেই, আবিষ্কৃত সত্যকে আয়ত্ত করার ব্যাপারে যার আলস্য সে সম্মান ও স্বীকৃতি পেতে পারে না। সে বুদ্ধিজীবী নয়। সাময়িক খ্যাতি লাভ করলেও পরিণামে সে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা খ্যাতি চান, সহজ খ্যাতি—কিন্তু এটুকু পরিণামদৃষ্টি তাঁদের নেই যে সমকালে ও স্বদেশে লব্ধ খ্যাতি একান্ত সাময়িক হতে পারে। যে কাজ করে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন সে কাজ তাঁর আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে করা। তার পর থেকে বাকি জীবনটা তিনি মন্থর শিথিল ও আপন কর্মে আস্পৃহাহীন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলা যায় কেবল এটুকু ছাড়া যে অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্তব্যকর্মে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিরলস। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিজ্ঞানী অধ্যাপনা করেন তাঁদের শতকরা নব্বই ভাগ সম্পর্কে শোনা যায় যে, তাঁরা নতুন নতুন আবিষ্কার ও তথ্য সম্পর্কে খোঁজই রাখেন না। জনৈক সাহিত্যের অধ্যাপক শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস অনার্স-ক্লাসে পড়াতে গিয়ে প্রায় দশটি দিন নিয়েছেন শুধু এই কথা বোঝাতে যে ভি. এস. প্রিচেট বলেছেন, মানুষের মধ্যে ভাল আছে মন্দ আছে, আলোও আছে আঁধারও আছে এবং গৃহদাহের অচলা ও মাদাম বোভারি উপন্যাসের মাদাম বোভারি একই চরিত্রের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের দর্শনের পাঠ্যসূচী কাণ্ট হেগেল পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, বিশ শতকের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে অধ্যাপকদের সম্যক্ পরিচয়ই ঘটে নি। এ তথ্যও জানতে হল লজ্জার সঙ্গে যে এম. এ. ক্লাসে প্লেটোর 'রিপাবলিক' বইখানি পাঠ্যসূচীতে থাকা সত্ত্বেও অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন বই বলে।

আমাদের সাহিত্যিকদের সম্বৎসরের প্রধান কর্ম হয়েছে দিল্লীতে ও কলকাতায় আকাদমী পুরস্কারের জন্ম তদ্বির করা, বছরে দশ বারোখানা করে উপন্যাস লেখা, সিনেমা-পত্রিকায় সচিত্র জীবনী ছাপা এবং বৈজ্ঞানিকদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে মেতে থাকা ও যত বেশী ও যত দ্রুত সম্ভব অর্থোপার্জন করা। উদাহরণ অনেক বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু থাক্। কেবল একটি লজ্জাকর ঘটনার উল্লেখ করব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রাথতযশা অধ্যাপক ডি.-লিটের জন্ম থীসিস পেশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর থীসিস তৈরীও হয়ে যায়। কিন্তু এক জ্যোতিষী তাঁকে বলেন তাঁর ডি.-লিট পাবার আশা নেই। এই কথায় মর্মাহত হয়ে উপরোক্ত অধ্যাপক তাঁর থীসিস পেশ করেন নি।

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আত্মপ্রত্যয়হীন কিন্তু অহংকারী, সংকীর্ণচেতা ও অনুদার, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাহীন, অলস ও শিথিল। বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে তখন তারা পদক্ষেপ করতে সাহস সঞ্চয় করতেই পারছে না। সত্যের সঙ্গে পরিচয়ই তাদের ঘটছে না। সত্যকে তারা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। তাই সত্যের মূল্য তারা বোঝে না, সত্য-আবিষ্কারের মূল্যও তাদের কাছে নেই। তাই প্রায়ই এ ঘটনা ঘটে চলেছে যে পদাধিকারীরা প্রচুর সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু সমস্ত সুযোগ জলে ফেলে দিচ্ছে ইচ্ছে করে। আর যারা কাজ করতে চায় তারা ক্লিকের দরুন কাজ করতে পারছে না, বিদেশে সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কেই এ কথা বিশেষভাবে বলছি।

আজকে যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের ব্যর্থ বলে মনে করে থাকে, এই পটভূমিকায় বিচার করলে তা কি খুব অস্বাভাবিক মনে হবে ?

তিন

আমাদের সাহিত্যিকেরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিয়ে বেড়ান নি। তাঁদের অনেকেরই ছাত্রজীবন উজ্জ্বল ছিল। লেখা ছাড়া, সাহিত্য-চর্চা ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরূপে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়েছেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। সেই শিক্ষা লাভের কালেই সাধাণতঃ তাঁদের মানসিক গড়ন নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমি পূর্বোক্ত অধ্যায়ে যা বলেছি তা যদি সত্য হয় তবে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক গড়নটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা দরকার ; কেন না সমস্ত কিছুর মুলে এই জিনিসটিই রয়েছে। ছাত্রজীবনটি আমাদের কি ভাবে বিন্যস্ত হয়ে থাকে তা না জানলে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মানস-পরিণতির বিশেষ ধরনটি কেন এ রকম তা জানা সম্ভব নয়।

ছাত্রজীবন আমাদের দেশে প্রায় সূত্রপাত থেকেই কলঙ্কিত। লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়া চড়তে পারা যায় এই বৈষয়িক লাভের কথা শুনে আমাদের পড়াশোনার শুরু। কিন্তু একটু বয়স হলেই যখন জানা যায় আজকাল লেখাপড়া শিখে সবাই বড়লোক হয় না, বেশির ভাগই বেকার ও দরিদ্র থাকে তখন শিক্ষার প্রেরণাই আর বজায় রাখা যায় না। শিক্ষালাভ করলে সত্যিই যে জীবনের পরমপুরুষার্থ সাধিত হয় না বরং অগৌরবের জীবন বয়ে বেড়াতে হতে পারে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত শিক্ষকমশাই স্বয়ং। শিক্ষকেরা অশ্রদ্ধার পাত্র সমাজে আর্থিক অসঙ্গতির দরুন। কাজেই শিক্ষার প্রতি অনুরাগ তাঁরা ছাত্রদের মনে কী করে আনবেন, যখন শিক্ষার ভাণ্ডারী হয়ে তাঁরা নিজেরাই ছাত্রদের মূল্যায়নেও ছোট হয়ে গেছেন ? শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিক্ষাদপ্তরের তদানীন্তন সচিব হুমায়ুন কবীর এই তথ্য পেয়েছিলেন: "সাম্প্রতিক সমাজ যে শিক্ষাবৃত্তিকে অবহেলার চোখে দেখে, শিক্ষকের অর্থহীনতা তার প্রধান কারণ। একথা আমরা হয়ত স্বীকার করতে চাই না, কিন্তু এই মনোভাবের পিছনে অর্থের প্রতি যে মোহ, ভারতবর্ষে আজ তা প্রবল হয়ে উঠেছে। আমরা আজকাল প্রায়ই বলে থাকি যে ভারতবাসী আধ্যাত্মিক, এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতি বা সমাজের তুলনায় এদেশে মূল্যবোধ আদর্শবাদ প্রবল। শিক্ষক ও শিক্ষাবৃত্তির প্রতি আমাদের যে মনোভাব তাতে কিন্তু এ দাবি মানা কঠিন। বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডে অথবা

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আজও শিক্ষকের যে মর্যাদা ও সম্ভ্রম, তার সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের আধ্যাত্মিকতার দাবি টেকে না। অর্থ ও বিত্ত দিয়ে আজ আমরা সামাজিক মর্যাদার বিচার করি, এবং তার ফলে যে কেবল শিক্ষকের ইজ্জত কমেছে তা নয়, সমস্ত সমাজে আদর্শহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে। শৈশব থেকে শিক্ষার্থী শোনে এবং পড়ে যে অর্থ দিয়ে মানুষের বিচার করা চলে না, বিভিন্ন বৃত্তির মর্যাদা বা ইজ্জত অর্থাগমের উপর নির্ভর করে না, গুরু দরিদ্র হলেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তারা দেখে যে, গুরু বা শিক্ষকের স্থান সমাজের নীচু কোঠায়। কথা ও কাজের মধ্যে যেখানে এতখানি তফাত, সেখানে তরুণের বিশ্বাসের ভিত্তি অটল থাকবে কি করে? ফলে তারা শৈশব থেকেই দৈনন্দিন জীবনের দাবি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের আহ্বানকে স্বতন্ত্র করে দেখতে শেখে, ভাবে যে এ সব বড় বড় বুলি সময় ও সুবিধামত মন্ত্র উচ্চারণের জন্য, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনের শত শত ছোটখাট কাজে তাদের কোন প্রয়োজন নেই।" [হুমায়ুন কবির : ছাত্র-অসন্তোষ ও তার প্রতিকার, চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩]

সে সিদ্ধান্তে আমি আপাততঃ যেতে চাই না, আমি শুধু এটুকু বলছি যে শিক্ষার প্রতি কোনও ভালবাসা নিয়ে আমাদের ছাত্ররা বেড়ে ওঠে না, শিক্ষার সার্থকতায় তাদের বিশ্বাস নেই, বৈষয়িক উন্নতির লক্ষ্য ছাড়াও যে বিদ্যাচর্চা স্বতঃই করা যেতে পারে এ বোধ তাদের মধ্যে বিকশিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর প্রথম বৈশিষ্ট্যই এই যে, অন্যান্য বৈষয়িক লাভালাভের হিসাব না করেই সে জ্ঞানচর্চা, সত্যের অনুসন্ধান, সৃষ্টিবাসনা এসব জিনিস ভালবাসবে। বুদ্ধিজীবী হবার জন্য যে মানসিক গড়নের দরকার তা আমাদের ছাত্ররা আদৌ লাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

আমাদের ছাত্ররা দ্বিতীয় যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত তার অভাব আরও বেশি ক্ষতিকর। কলকাতার কয়েকটি ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্ন অভিজাত পরিবার ছাড়া বাকি সকল বাঙালীর ঘরে ঘরে মাতৃভাষা অটল আসনে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে ইংরেজী ভাষা-প্রীতি আমাদের দেশে অচল হয়ে আসছে। স্কুলে এখন পঞ্চম শ্রেণীর পর ইংরেজী পাঠ শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের খানিকটা অগ্রগতি হওয়ায় ঘরে ঘরে ইংরেজী সাহিত্য পড়ার রেওয়াজও কমে আসছে এবং বাংলা বই বেশি পড়া হচ্ছে। আমাদের ছাত্ররা ইংরেজি ভাষায় তাই যথেষ্ট দুর্বল থেকে যাচ্ছে শুধু তা নয় ইংরেজি ভাষার প্রতি কোন অনুরাগ তাদের মনে জন্মাচ্ছে না। অথচ কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাদের পাঠ্যপুস্তক পড়তে হয় সব ইংরেজিতে, লিখতে হয় ইংরেজিতে। পরীক্ষায় তারা ফেল করে ইংরেজিতে দুর্বলতার দরুন। পাঠ্যপুস্তক তাদের পক্ষে ভীতিকর, পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তর করা তাদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। তাই ফেলের হার এত বেশী। এই কারণে ইংরেজি এখন একটা অতিশয় ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইংরেজি ভাষায় আমাদের দখল তাই ক্রমশঃ কমছে। যত কমছে তত আমরা দেশীয় ভাষার পক্ষ নিচ্ছি এবং রাজ্য ও রাষ্ট্রভাষারূপে দেশীয় ভাষার প্রচলন হবে চিন্তা করে ইংরেজি ভাষা শেখার কোনও যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

কিন্তু আমরা যেমন ইংরেজিতে দুর্বল থাকছি, পৃথিবীর অন্য কোন আধুনিক ভাষাও আমরা শিক্ষা করছি না। জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, রুশ এসব ভাষা শেখার একটা ফ্যাশন সম্প্রতি চালু হয়েছে বটে কিন্তু খুব কম লোকেই সেপথে পা বাড়ায় এবং দ্বিতীয়তঃ এই সব ভাষা যা কেউ কেউ শেখে তাতে সেই সব ভাষার সাহিত্য সংস্কৃতির পাঠ নেওয়া চলে না। ফলে আধুনিক জগৎ, তার ভাবধারা, বিভিন্ন দেশের নানা রকম মননচর্চার ফল আমাদের অপরিচিত, অনধিগত থেকে যাচ্ছে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে একসময় আমরা সারা পৃথিবীর সকল চিন্তাতরঙ্গ ও সাহিত্যসম্ভার উপভোগ করেছি, আজ ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতার দরুন সে সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলছি।

ভাল পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না, ইংরেজিতে পড়তে হয়। ইংরেজিকে মানতে চাই না কিন্তু না মেনে উপায় নেই, এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে বলে যে জিনিসটি ক্রমশঃ শুকিয়ে আসছে তা হল মননের অভিপ্রায়, তীব্র কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা। বাইরের জগৎ তার সাংস্কৃতিক সম্ভারও আমাদের কাছে উন্মোচন করতে পারছে না। ফলে বুদ্ধিজীবীসুলভ মানসিক গড়নের বিকাশ ঘটা আমাদের দেশে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে, তাদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ডাঃ জ্ঞান ঘোষের রিপোর্ট সে বিষয়ে একটি প্রামাণ্য দলিল হয়ে আছে। বেশীর ভাগ ছাত্রই দরিদ্র, প্রায় সবাই টুইশনি বা ছোটখাট কাজ করে লেখাপড়া চালায়, উপরন্তু অনেককেই সংসারের দায়িত্ব বইতে হয়। ছাত্রজীবনের অবসান হলে যে ভাল চাকরি মিলবে, প্রত্যাশা সব পূরণ হবে এমন আশা তাদের সামনে থাকে না। তারা জানে চাকরির ধান্ধায় তাদের ঘুরতে হবে, বহুদিন বেকার থাকতে হবে এবং অবশেষে এমন চাকরি জুটবে যাতে সংসার প্রতিপালন সম্ভব নয়। কলা, বিজ্ঞান এমন কি

[৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় খণ্ড : কাব্যভাষ্য

॥ প্রস্তাবনা ॥

॥ প্রীতিরতি এরস্-তত্ত্ব ও প্রেমধর্ম ॥

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের আদিসংহিতাকার ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাবের নাম দিয়েছিলেন রতি। তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভবঃ। উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। এই শৃঙ্গারই পরবর্তীকালে আদিরস নামে অভিহিত হয়েছে। বৈষ্ণব রসিকগণের নিকট শৃঙ্গার বা আদিরসই মধুর কান্ত বা উজ্জ্বলরস।

ভরত শৃঙ্গারকে বলেছেন উজ্জ্বলবেষাত্মক। উজ্জ্বল শব্দের অর্থ পরস্পর-সন্নিকর্ষজনিত আস্বাদ, আর বেষ শব্দের অর্থ পরস্পরের মধ্যে তার ব্যাপ্তি। ভরতকথিত শৃঙ্গাররসের এই সংজ্ঞার্থ অনুসরণ করে পরবর্তী অলংকারশাস্ত্রে দুটি ধারার উদ্ভব হয়েছে। একদল শৃঙ্গারকে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ করে বলেছেন, নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাব্যনিবেশিত রসনিষ্পত্তির নামই আদি বা শৃঙ্গাররস। অন্যদলের মতে, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি অভিলাষ-রূপ কামের প্রবৃত্তিমাত্রকেই শৃঙ্গার বলা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট। শৃঙ্গারের অর্থ অনেক ব্যাপক ও গভীর।

শৃঙ্গারকে যাঁরা নায়ক-নায়িকার প্রেমেরই রসপরিণাম বলে মনে করেন, অর্থাৎ যাঁরা সংকীর্ণ অর্থেই শৃঙ্গারকে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাহিত্য-দর্পণে'র অনুসরণে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। শৃঙ্গারের স্থায়িভাব 'রতি'র সংজ্ঞা-নির্দেশ করে বিশ্বনাথ বলেছেন, মনের অনুকূল প্রিয়বস্তুতে মনের প্রবণতা বা প্রেমার্দ্র অবস্থার নামই রতি। 'রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্। টীকায় বলা হয়েছে, 'রতিরিতি মনসোঽনুকূলে প্রিয়ে বস্তুনি প্রবণায়িতং প্রেমার্দ্রং মনোরতিরিত্যর্থঃ।' শৃঙ্গারের সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলেছেন –

শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥

টীকায় বিশদীভূত করে বলা হয়েছে, "শৃঙ্গমিতি। মন্মথস্য সম্ভোগেচ্ছায়াঃ উদ্ভেদ উদ্বোধঃ তদাগমনহেতুকঃ মন্মথোদ্ভেদপ্রাপ্তিজন্যঃ বীতরাগাণাং রসানুৎপত্তেঃ উত্তমঃ প্রকৃতির্নায়কো যত্র সঃ প্রায় ইত্যনেন শৃঙ্গারাভাসাদাবধমপ্রকৃতিত্বং সূচিতং এবঞ্চ শৃঙ্গমিচ্ছতি।"

শৃঙ্গার দ্বিবিধ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারিটি ভাগ : পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। [বৈষ্ণবগণের মতে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস]। সম্ভোগের অর্থ হল দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যে যুক্ত নায়ক-নায়িকার উল্লসিত ব্যবহার ও ভাব। উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে :

দর্শনালিঙ্গনাদিনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

মুখ্য ও গৌনভেদে সম্ভোগ দ্বিবিধ। জাগ্রত অবস্থায় সম্ভোগের নাম মুখ্য সম্ভোগ, আর স্বপ্নে সম্ভোগ হল গৌণ সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ আবার চতুর্বিধ। সংক্ষিপ্ত,

সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত, মানের পর সংকীর্ণ, প্রবাসের পর সম্পন্ন এবং সুদূর-প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয়ে থাকে। সম্ভোগের শেষ পর্যায় হল সম্প্রয়োগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের 'অঙ্গসঙ্গ' বা দেহমিলন। সম্প্রয়োগের পূর্ববর্তী চুম্বন-আলিঙ্গনাদিকে বলা হয়েছে লীলাবিলাস। বিদগ্ধজনের কেউ কেউ সম্প্রয়োগের চেয়ে লীলাবিলাসকে মধুরতর বলে মনে করেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হয়েছে :

বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখং।
ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥

দুই

শৃঙ্গারকে যাঁরা এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি, তাঁদের অগ্রগণ্য হলেন অভিনব গুপ্ত। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের এই দার্শনিক ও আলংকারিক 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের "লোচন" টীকা রচনা করে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রেরও 'অভিনবভারতী' নাম্নী একটি উল্লেখযোগ্য টীকা রচনা করেছিলেন। অভিনব তাঁর নাট্যশাস্ত্রের টীকায় শৃঙ্গার এবং তার স্থায়িভাব রতির স্বরূপ নির্ণয়ে 'অঙ্গসঙ্গ'কে মুখ্যস্থান দেন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরাভিলাষরূপ কামপ্রবৃত্তিকেই শৃঙ্গার বা রতি বলে না। তিনি স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরাভিলাষকে বলেছেন রতি-স্থায়িভাবের ব্যভিচারী ভাব। ভরতের "স চ স্ত্রীপুরুষহেতুকঃ উত্তম-যুবপ্রকৃতিঃ"—এই বাক্যের টীকায় অভিনব বলেছেন, "স্ত্রীপুরুষশব্দেন পরস্পরাভিলাষসংভোগলক্ষণয়া লৌকিক্যা 'অস্য ইয়ং স্ত্রী' ইতি ধিয়া। তেন অভিলাষমাত্রমপরায়াঃ কামাবস্থানুবর্তিন্যা ব্যভিচারিরূপানীতিয়া [পানীতায়া] বিলক্ষণা এব ইয়ং স্থায়িরূপা প্রারম্ভাদিফলপ্রাপ্তিপর্যন্তা ব্যাপিনী পরিপূর্ণসুখৈককল্প রতিশ[ব্দ]ক্তা ভবতি।"

অভিনবের মতে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত মিলন-বিরহ-নির্বিশেষে নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে অবিশ্রান্ত সুখপ্রবাহ বিরাজমান থাকে তারই নাম রতি। নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে পারস্পরিক একাত্মতা ও নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন ঐক্যভাব, অভিনব তাকেই বলেছেন রতি। "একা এব হি অসৌ তাবতী রতিঃ। যত্র অন্যোন্যসংবিদা একবিয়োগো ন ভবতি।" অভিনব এখানেই থামেন নি, তাঁর ব্যাখ্যায় আরেক পদ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "অবিযুক্তসংবিৎপ্রাণস্তু শৃঙ্গারঃ। ব্যাখ্যাতঃ পরস্পরং জীবিতসর্বস্বাভিমানরূপঃ। বেষয়তি ব্যাপয়তি চিত্তবৃত্তিমন্যত্র জ্ঞাপনয়া সংক্রময়তি ইতি বেষঃ বিভাবানুভাবাত্মা।" অর্থাৎ একজন যেখানে অপরকে নিজের প্রাণস্বরূপ মনে করে এবং অপরের মধ্যে সেই ভাবকে সংক্রামিত করে দেয় সেখানেই থাকে শৃঙ্গারের স্থায়িভাব বা রতি। অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্য-বিচার' গ্রন্থে অভিনবের এই টীকার ব্যাখ্যায় বলেছেন, "পরস্পর জ্ঞানের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে ধ্যানরূপে বা সমাধিরূপে পরস্পরের যে অবস্থিতি তাহাই শৃঙ্গারের স্থায়িভাব বা রতি। বাহ্যিক মিলনেচ্ছা রতি নহে। * * * যদিও শৃঙ্গারের মধ্যে পরস্পরের আস্বাদ আনন্দরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তথাপি সেই আস্বাদের মূল কেন্দ্রস্বরূপ রহিয়াছে জগতের একটি গভীর সত্য—আত্মার সহিত আত্মার মিলন, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন।"[১]

তিন

রতিকে হৃদয়সম্পর্কের ব্যাপকতম ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছেন কবিকর্ণপূর তাঁর 'অলংকারকৌস্তভ' গ্রন্থে। কবিকর্ণপূর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' ও 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' রচয়িতা ভোজরাজকে অনুসরণ করে দশম ও একাদশ রস হিসাবে বাৎসল্যরস ও প্রেমরসকেও স্বীকার করেছেন। বাৎসল্যের স্থায়ী 'মমকার', আর প্রেমের স্থায়ী 'চিত্তদ্রব'। কবিকর্ণপূর 'রতি'র নূতন সংজ্ঞা রচনা করে বললেন, চিত্তরঞ্জনকারী ধর্মবিশেষের নামই রতি ; তা সুখভোগের আনুকূল্যকারী। রতিশ্চেতোরঞ্জকতা সুখভোগানুকূল্যকৃৎ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর সুবোধনী টীকায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'চিত্তস্য রঞ্জনং দ্রবীভাব ইতি তজ্জনকধর্মবিশেষ এব চেতোরঞ্জকতা'—অর্থাৎ যা চিত্তকে রঞ্জিত করে বা রাঙিয়ে দেয় তারই নাম রতি। এই সংজ্ঞায় হৃদয়সম্পর্ক-মাত্রকেই যেন রতি নামে অভিহিত করতে পারা যায়।

এই চিত্তরঞ্জনী রতি দ্বিবিধ। সম্প্রয়োগবিষয়া, এবং অসম্প্রয়োগবিষয়া। চেতোরঞ্জকতা সম্প্রয়োগবিষয়া হলে সাধারণ অর্থে তাকে বলা হয় রতি, আর অসম্প্রয়োগবিষয়া হলে তার সাধারণ নাম হয় প্রীতি।

যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীর্তিতা।
সম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুষব্যবহারঃ সতাং মতঃ।
অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতির্নিগদ্যতে ॥

অসম্প্রয়োগবিষয়া রতিকে সাধারণ ভাবে প্রীতি বলা হলেও [ভোজরাজ[১] তাই বলেছেন] কবিকর্ণপুর এই অসম্প্রয়োগবিষয়া রতিকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ ও ভাব। 'সা প্রীতিমৈত্রীসৌহার্দভাবসংজ্ঞাং চ গচ্ছতি।'

প্রীতি মনোবৃত্তিময়ী রতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে সখার পত্নী এবং পতির সখাতে যে চিত্তরঞ্জকতা তারই নাম হল প্রীতিরতি। দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সখাতে সখাতে, বা সখীতে সখীতে, অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে যে অনুরাগ তার নাম মৈত্রী। প্রীতিরতি একান্তই মনোময়ী, সুতরাং সেখানে অঙ্গস্পর্শাদি নেই। মৈত্রী অঙ্গস্পর্শোচিতা। সখার পত্নী এবং পতির সখাতে যে ভাব তা যদি 'নির্বিকারা', 'সদৈকাভা' ও 'সদৈকরূপা' হয় তাহলে তার নাম সৌহার্দ। 'নির্বিকারা সদৈকাভা সা সৌহার্দমিতীর্যতে। সদৈকাভা সদৈকরূপা সা চেতোরঞ্জকতা।' সৌহার্দের সার্থক উদাহরণ বোধ করি কাদম্বরী-কাহিনীর চন্দ্রাপীড় আর পত্রলেখার সম্পর্ক। প্রীতি থেকে সৌহার্দকে পৃথক করে নেওয়ার অর্থ হল এই যে, পুরুষে নারীতে যে অসম্প্রয়োগবিষয়া মনোময়ী রতি তার মুখ্যত দুটি ভেদ স্বীকার্য। যে সম্পর্কে অনুভূতির মধ্যে কোন বিকার নেই, যার রঙ ও রূপ চিরদিনই এক, অর্থাৎ যেখানে চিত্তরঞ্জকতার হ্রাস বৃদ্ধি নেই, তাকেই বলা হয়েছে সৌহার্দ। পক্ষান্তরে পুরুষে নারীতে যে মনোময়ী রতিতে বিকারও হতে পারে এবং যার রঙ ও রূপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তারই নাম প্রীতিরতি। দেবতা ও গুরুজনবিষয়া যে মনোময়ী রতি তার নাম হল 'ভাব'। মম্ম [ম-এ ম-য়ে] ট মম্মটভট্টও [একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী] তাঁর 'কাব্যপ্রকাশে' দেবাদিবিষয়া রতিকে বলেছেন ভাব। "রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ।"

'অলংকারকৌস্তভ'প্রণেতা সম্প্রয়োগ এবং অসম্প্রয়োগ-বিষয়া দ্বিবিধ রতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সম্প্রয়োগ-বিষয়ে তিনি কোনও উন্নাসিক মনোবৃত্তির আভাসমাত্র দেন নি। তিনি বলেছেন, অবস্থার উৎকর্ষ-বিশেষে সম্প্রয়োগবিষয়া রতিও পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে ইক্ষুরসের সিতোপলারূপে পরিণামের মত চরমপাকে পরিণত হয়।

যা সম্প্রয়োগবিষয়া সাঽপি অবস্থাবিশেষতঃ।
পাকাৎ পাকান্তরং প্রাপ্য চরমে পর্যবস্যতি ॥

এই শ্লোকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। যা সম্প্রয়োগবিষয়া রতি তাও [সা অপি] অবস্থাবিশেষে চরম পরিণাম অর্থাৎ রসে পর্যবসিত হয়। অবস্থাবিশেষ বলায় এই অর্থই অভিব্যঞ্জিত হচ্ছে যে, সব সম্প্রয়োগবিষয়া রতিই চরমে পর্যবসিত হয় না। তার জন্যে অবস্থার উৎকর্ষ প্রয়োজন। 'সা অপি' বলাতে ব্যঞ্জনায় বলা হয়ে গেল যে, অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি অবশ্যই চরম অবস্থা লাভ করে। অর্থাৎ প্রীতিরতি, মৈত্রীরতি, সৌহার্দরতি এবং ভাবরতি স্থায়িভাব রূপে বিভাব অনুভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শৃঙ্গার রসে পরিণমিত হয়। বলাই বাহুল্য, এই বিশ্লেষণে শৃঙ্গার রসেরও পরিধি বহু ব্যাপকতায় প্রসারিত হল। প্রচলিত ও লৌকিক অর্থে আমরা যাকে প্রেম বলি, অর্থাৎ যে-সম্পর্কে সম্প্রয়োগ বারিত নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হল সাধারণ সংজ্ঞায় যাকে বলা হয়েছে প্রীতি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সেই প্রীতি চার ভাগে বিভাগিত—প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ ও ভাব। এই চতুর্বিধ প্রীত্যাখ্য রতির ক্ষেত্রেই সম্প্রয়োগ বারিত। পুরুষে নারীতে সম্পর্কের বেলা তা একান্তভাবেই মনোবৃত্তিময়ী। চতুর্বিধ অসম্প্রয়োগবিষয়া রতির মধ্যে প্রীতিরতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তা একান্তভাবেই মানসলোকের ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও তার বিকার আছে, এবং তার রং ও রূপের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। অর্থাৎ প্রীতিরতিতে মানসলোকে বিচিত্র বাসনা বিলসিত। এমন কি, পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করে মনে-মনে লীলাবিলাস ও সম্প্রয়োগের বাসনাও সেখানে আস্বাদ্যমান হতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই প্রীতিরতির বিকাশ, বিবর্তন ও বিশুদ্ধিকরণ, অর্থাৎ পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তার অন্তিম রসপরিণাম নরনারীর হৃদয়-সম্পর্কের এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। যেখানে মনঃপ্রকর্ষ চারুচর্যা ও শুচিশীলনে

বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে সেখানে নরনারীর মানসলোকে প্রীতিরতির লীলা পরম বিস্ময়াবহ।

গুরুজন ও দেববিষয়া মনোরতির নামকরণ করা হয়েছে 'ভাব'। গুরুজনের প্রতি ভাবরূপা প্রীতিরতিও সমভাবেই চিত্তরঞ্জক। এবং তারও রসপরিণামের নাম শৃঙ্গার। জীবগোস্বামী তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে দেববিষয়া প্রীতিরতির অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন। গুরুজনবিষয়া ভাবরূপা প্রীতির অনুশীলন প্রস্ফুরণ এবং শৃঙ্গারে তার চরম রসপরিণামও কম আহ্লাদজনক নয়। রবীন্দ্রমানসে তাঁর মানসলক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহের মত প্রীতি ও ভাবরতির যুগলধারায় প্রবাহমাণ। কখনও তা যুক্তবেণী, কখনও তা মুক্তবেণী। কখনও প্রীতিই মুখ্য। তখন কবির অনুরাগ মানস-বিপ্রলম্ভের বিচিত্র লীলায় বিলসিত। আর যখন ভাবই মুখ্য হয়ে উঠেছে তখন মানসসুন্দরী দেখা দিয়েছেন দেবীমূর্তিতে। পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তাই হয়েছে অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-চেতনার অনিঃশেষ উৎস।

চার

প্রতীচ্য জগতে প্রেমচেতনার আদি সংহিতাকার হলেন গ্রীক কবি-দার্শনিক প্লেটো। এমার্সন তাঁর 'রিপ্রেজেন্টেটিভ মেন' গ্রন্থে বলেছেন, 'Plato is philosophy, and philosophy, Plato'. এমার্সনের অনুকরণ করে বলা যায়, প্লেটোই দিব্যপ্রেম, দিব্যপ্রেমই প্লেটো। প্লেটো তাঁর প্রেমতত্ত্ব এরস্-তত্ত্বের মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে দিব্য-এরস ও জৈব-এরসের জন্মকথা বলেছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-চেতনার আলোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে এরস-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

প্লেটোর এরস-তত্ত্ব তথা প্রেমতত্ত্বের নানা টীকাভাষ্য হয়েছে পরবর্তী য়ুরোপে। খ্রীষ্টীয় মিস্টিকদের হাতে, প্লটিনাস-প্রমুখ নিও-প্লেটোনিস্টদের নবব্যাখ্যায়, কিংবা এলিজাবেথীয় ও পরবর্তী রোমান্টিক প্রেমকল্পনায় প্লেটোর প্রেমাদর্শ নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার ফলে প্লেটো দিব্য-এরসের প্রেরণাসম্ভূত মানবহৃদয়ের মহত্তম প্রেরণারূপী যে প্রেমচেতনার কথা তাঁর 'সিম্পোসিয়াম' এবং 'ফিড্রাস' নামক ডায়লগে বলেছেন, তার স্বরূপই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইদানীং কালে যাকে বলা হয় 'প্লেটোনিক প্রেম' তার সঙ্গে প্লেটোর মূল চিন্তার পার্থক্য অনেকখানি। প্লেটোনিক প্রেমের যে অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত তার পরিচয় সহজেই দেওয়া যাবে চণ্ডীদাসের কবিতার ঈষৎ পরিবর্তন করে:

প্লেটোনিক প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়॥

রোমান্টিসিস্টদের হাতে প্লেটোনিক প্রেমের এই যে নবরূপায়ণ তাকে প্লেটো-বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম এ. ই. টেলর বলেছেন সবচেয়ে 'un-Platonic.'[৩] এ সম্পর্কে জি. এল. ডিকিন্সনের বিশ্লেষণে বক্তব্যটি বিশদীভূত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

"We are accustomed to the phrase 'Platonic Love', but we do not use it in Plato's sense, since few of us have his temperament and attitude. He was not thinking of love without sex feeling, a mere comradeship, still less of a kind of pretence or hypocrisy. He was thinking of a passion which should transform itself, in the better and nobler instances, into objects more and more public and disinterested, until it should lose, or rather find, itself in direct apprehension of a higher world."[৪]

অর্থাৎ কামগন্ধহীন প্রেমের কল্পনা প্লেটোর কল্পনা নয়। কামের ঊর্ধ্বায়িত ও বিশুদ্ধীভূত অবস্থারই নাম প্লেটোনিক প্রেম। কাম সেখানে শুধু যে আছে তাই নয়, ঊর্ধ্বগতির জন্যে তা অত্যাবশ্যকও বটে। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের প্লেটো-বিশেষজ্ঞ জার্মান অধ্যাপক Paul Friedlander এ কথা অকুণ্ঠ ভাষাতেই প্রকাশ করে বলেছেন:

"Moreover, the sensual element is not merely mask or veil. It is a steppingstone to a higher level, but a necessary steppingstone whose absence could make that higher level inaccessible."[৫]

পাঁচ

প্লেটোনিক প্রেম সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে চিন্তনীয়। আপাতদৃষ্টিতে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, প্লেটো তাঁর ডায়লগে দাম্পত্যপ্রেমের কথা তো বলেনই নি, এমন কি পুরুষে নারীতে যে মুক্তপ্রেম তার কথাও বলেন নি। পুরুষে পুরুষে যে অনুরাগ—কামশাস্ত্রের পরিভাষায় যার নাম সমকামুকত্ব—প্লেটো শুধু তার উর্দ্ধায়িত রূপের কথাই বলেছেন। এতদ্দেশীয় 'অলংকার-কৌস্তভ'-প্রণেতা কবিকর্ণপূর যাকে বলেছেন মৈত্রীরতি, বাহ্যত প্লেটোর প্রেম তারই সগোত্র। কবিকর্ণপূর মৈত্রী বলতে বুঝেছেন পুরুষে পুরুষে অথবা নারীতে নারীতে চিত্তরঞ্জক হৃদয়ধর্ম। প্লেটোর পরিধি তার অর্ধেক অংশ-মাত্র জুড়ে আছে। তাঁর কল্পনা শুধু পুরুষে পুরুষে সম্পর্কের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ।

প্লেটোর এই কল্পনার হেতুনির্দেশ করতে হবে তৎকালীন গ্রীসের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। প্লেটোর এথেনীয় সমাজে জায়া ও জননীরূপে নারী ছিল শুদ্ধান্তঃ-পুরের অবরোধেই বন্দিনী। সামাজিক জীবন ছিল একান্তভাবেই পুরুষের জীবন। তা ছাড়া, বর্তমান দৃষ্টিতে যতই নিন্দনীয় ও ন্যক্কারজনক বলে বিবেচিত হোক না কেন, পুরুষে পুরুষে সমকামুকত্বই ছিল সে যুগের গ্রীসের যৌনজীবনের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। সুন্দরদেহধারী কিশোরই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের "প্রেমের পাত্র"। এই প্রেমকেই প্লেটো রিরংসাবৃত্তির প্ররোচনা থেকে উন্নমিত করে মহত্তর জীবনচর্যার প্রেরণারূপে বিশুদ্ধীভূত করেছেন।

এথেন্সের তৎকালীন জীবন ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করে অধ্যাপক Friedlander বলেছেন—

"...this society, the most productive the world has ever seen, is completely filled with male love on every level and in all its manifestations, from the most passionate devotion to casual play, from loftiest adoration to crudest sensuality, rising to the heights of creative power, as it survives in Greek art, and reverberating in the halls of state..."[৬]

স্বভাবতই প্লেটোর প্রেমচেতনার ভিত্তি এই সমাজ-ভূমিতেই গড়ে উঠেছে।

প্লেটোর দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য-সম্পর্ক সন্তানজননের সামাজিক বিধানরূপেই পরিগৃহীত হয়েছে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।'—বিবাহিত জীবনের এই উদ্দেশ্যকেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে যে, নারীদের সম্পর্কে প্লেটো উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। 'রিপাব্লিক' ও অন্যান্য রচনায় দেখা যাবে যে, প্লেটো পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

"Women, he still insists, should share in all the activities of men. They are to be members of the governing assembly and the administrative bodies; and in case of need they are to be soldiers too."[৭]

নারী সম্পর্কে এই যাঁর ধারণা ছিল তিনি নারী ও পুরুষের প্রেম সম্পর্কে একেবারেই চিন্তা করেন নি, এ কথা শুধু বিস্ময়করই নয়, অবিশ্বাস্য বলেও মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে 'ফিড্রাস' ও 'সিম্পোসিয়ামে'র দুটি ইঙ্গিতের প্রতি প্লেটো-গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণীয়। প্লেটো তাঁর আলোচ্য ডায়লগ দুটিতে সক্রেটিসের কণ্ঠেই তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্লেটোর ডায়লগে বর্ণিত এই সক্রেটিস-চরিত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকই প্লেটোর ডায়লগের সক্রেটিস। প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। যুবকদের বিপথগামী ও বিনষ্ট করার অপরাধে সক্রেটিসের বিচার হয়, এবং তাঁকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে হয়। সক্রেটিসের বয়স তখন সত্তর বৎসর। প্লেটো সেই বিচারসভায় উপস্থিত ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর 'অ্যাপলজি'তে তিনি গুরুকৃত্য পালন করেছেন। অনেকে মনে করেন এই অ্যাপলজি ও ফিডো-[Phaedo]র সক্রেটিস এবং অন্যান্য ডায়লগের সক্রেটিস অভিন্ন পুরুষ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলের প্লেটো-বিশেষজ্ঞগণ এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তাঁদের মতে প্লেটোর ডায়লগের সক্রেটিস একটি কাল্পনিক চরিত্র। কাল্পনিকই হোক আর ঐতিহাসিকই হোক, সক্রেটিসের মুখেই প্লেটো

তাঁর প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 'ফিড্রাসে' সক্রেটিস প্রেমের শিক্ষা কোন্ সূত্রে কিভাবে পেলেন সে কথা ফিড্রাসকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলছেন :

"...like a pitcher I have been filled, through my ears, from some foreign source; but here again so stupid am I, that I have quite forgotten both how and where I gained my information."[৮]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, সক্রেটিস বলছেন যদিও তিনি সঠিক মনে করতে পারছেন না কিভাবে এবং কোন্ সূত্রে আদর্শ প্রেমের ধারণা পেয়েছেন, কিন্তু কোনও বিদেশী সূত্র থেকেই যে তিনি তা পেয়েছেন, তা তিনি অস্বীকার করেন নি। প্লেটোর প্রাচ্য-পরিক্রমা এবং প্লেটোর জীবনে প্রাচ্যপ্রভাব সম্পর্কে আজও সুনিশ্চিত কোনও মতবাদ গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সক্রেটিস-স্বীকৃত এই 'বিদেশী সূত্র' প্রাচ্য দিগন্তেরই কোনও দেশের ইঙ্গিত বহন করছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সিম্পোসিয়ামে ইঙ্গিতটির ব্যঞ্জনা আরও গভীর। পূর্বেই বলা হয়েছে, কিশোরের প্রতি পুরুষের দৈহিক আকর্ষণ গ্রীসে সর্বজনীনভাবেই প্রচলিত ছিল। সামরিক স্পার্টা প্রভৃতি রাজ্যে তা ছিল আইনসিদ্ধ। এথেন্সে অবশ্য আইন এই অস্বাভাবিক প্রথাকে অনাচরণীয় বলেই অনুৎসাহিত করেছে। কিন্তু আইনের সমর্থন না থাকলেও সবত্রই লোকাচারের সমর্থন ছিল তার পক্ষে। প্লেটো তৎকালপ্রচলিত পুরুষের এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এই দুর্নিবার আকর্ষণের পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি বা প্রেরণা ক্রিয়াশীল তিনি তাকে দেহবাসনার স্তর থেকে মানসিক ও আত্মিক স্তরে উন্নমিত করে সৌন্দর্য ও শ্রেয়োবোধের শুচিশীলনে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে পুরুষের প্রতি পুরুষেরই আকর্ষণ। কিন্তু সিম্পোসিয়ামে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বস্তু হল এই যে, প্লেটোর প্রেমধর্মের প্রবক্তা সক্রেটিস বলছেন, প্রেম সম্পর্কে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও চেতনা তিনি লাভ করেছেন একজন নারীর কাছে। অর্থাৎ বিষয়টি পুরুষের প্রেম, কিন্তু তার মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছেন এক অসামান্যা রমণী। সক্রেটিস অকুণ্ঠ ভাষাতেই স্বীকার করছেন যে, প্রেমশাস্ত্রে তিনি দীক্ষা পেয়েছেন মন্তিনিয়ার যাজিকা ও ভবিষ্যদ্বক্ত্রী দিয়োতিমার কাছে। "...There is a speech about Love which I heard once from Diotima of Mantineia."[৯] দিয়োতিমার ভাষণকেই সক্রেটিস ভোজসভায় সবসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। সক্রেটিস শুধু দিয়োতিমার ভাষণই যে একবার মাত্র শুনেছিলেন তা নয়, তিনি প্রেমের ব্যাপারে তাঁর কাছেই পাঠ নিয়েছিলেন, এ কথাও বলতে কুণ্ঠিত হন নি। "And she it was who taught me about love affairs."[১০] প্রেম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্যে সক্রেটিস যে বহুবার দিয়োতিমার কাছে গিয়েছেন সেকথাও তিনি বলেছেন, "I, in admiration of your wisdom, have come to you as your pupil to find out these very matters."[১১] পুনশ্চ, "...Diotima, this is just why I have come to you, as I said; I knew I needed a teacher."[১২] দিয়োতিমার বক্তব্য শেষ করেও সক্রেটিস বলছেন, "All this she taught me at different times." এ সব উদ্ধৃতির পরে আর সংশয়মাত্র থাকে না যে, সক্রেটিস [অর্থাৎ প্লেটো] নারীর কাছ থেকেই অর্জন করেছেন প্রেমশাস্ত্র ও প্রেমবিদ্যার পরা-জ্ঞান। এক তপস্বিনী নারীই প্লেটোর প্রেমমন্ত্রের দীক্ষাদাত্রী গুর্বী।

যে-তত্ত্ব নারীর কাছেই পুরুষ পেয়েছে সে-তত্ত্বে নারী-চেতনার কোনও অস্তিত্ব নেই, এ কল্পনা অবাস্তব। কাজেই প্লেটোর সমসাময়িককালে তাঁর প্রেমতত্ত্ব পুরুষের প্রতি পুরুষের আচরণীয় হৃদয়ধর্মের অনুশাসন বলে গৃহীত হলেও, পরবর্তীকালে যখন প্রেম স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের সুস্থ ও সুন্দর পরিণাম বলেই সমস্ত সভ্যসমাজে গৃহীত হয়েছে তখন প্লেটোব্যাখ্যাত সেই তত্ত্বই হয়েছে নরনারীর আদর্শ প্রেমের চর্যাচর্যবিনিশ্চয়কারী অনুশাসনের মূলমন্ত্র। তাই য়ুরোপীয় প্রেমধর্মের আদি গঙ্গোত্রী হল প্লেটোর সিম্পোসিয়াম।

আমরা পূবে বলেছি, আপাতদৃষ্টিতে প্লেটোর প্রেম কবিকর্ণপুরের মৈত্রীরতিরই সহোদরা অনুভূতি। কিন্তু এ সাদৃশ্য বাহ্যসাদৃশ্যমাত্র। স্বরূপলক্ষণে প্লেটোর প্রেম

তথা দিব্য-এরস-তত্ত্ব কবিকর্ণপূরের প্রীতিরতিরই সহোদর তত্ত্ব। উভয়তই অনুভূতি একান্তভাবেই মনোময়ী। উভয়ক্ষেত্রেই মানস-বাসনাকে অস্বীকার করা হয় নি, কিন্তু সর্ববিধ দেহসম্পর্ককে একান্তভাবেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আদিতে বা উৎসমূলে প্রীতিরতির মত প্লেটোনিক প্রেমও সবিকারা কিন্তু মনোবৃত্তিময়ী। উভয়তই অনুরাগের রূপ ও রঙ নিয়ত-উপচীয়মানা এবং মানসিক ও আত্মিক স্তরে সৌন্দর্য ও শ্রেয়োবোধের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে নব নব স্তরে ঊর্ধ্বায়িত জীবনচর্যা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দিব্যপ্রেরণা।

ছয়

এবার প্লেটোনিক প্রেমের মূল সূত্রগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ফিড্রাস-শীর্ষক ডায়লগে প্লেটো বন্ধুত্ব ও প্রেমের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই ডায়লগের শেষার্ধে সাহিত্যিক কলাবিধি সম্পর্কেও আলোচনা আছে। সেজন্যে ফিড্রাসে প্লেটোর মূল বক্তব্য সম্পর্কে সমালোচকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, যৌন-বাসনার সুগতি ও দুর্গতিও যে ফিড্রাসের বিষয়ীভূত হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। প্রেম কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার ফল আমাদের জীবনে শুভংকর না অশুভংকর—এ সব প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয়েছে এবং প্লেটো সক্রেটিসের মুখ দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

ফিড্রাসে সক্রেটিস বলছেন, প্রেম নিশ্চয়ই এক ধরনের বাসনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুটি নিয়ন্ত্রী শক্তি আছে। মানুষ এই দুটি শক্তির অনুশাসনেই পরিচালিত হয়। একটি হল সুখের জন্য সহজাত বাসনা, অপরটি হল শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলের জন্য বাসনা—এই দ্বিতীয় বাসনাটি মানুষের সহজাত নয়, তাকে বিচারের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। মানুষের সহজাত আত্মরতি বা আত্মসুখের বাসনা যেখানে বলবৎ সেখানে প্রেমের পাত্র "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য।" 'As wolves love lambs, so lovers love their loves.'

কিন্তু সত্যকার প্রেম হল একটি ঐশ্বরিক চেতনা। ক্ষেমংকর। সক্রেটিস বলছেন, "...we owe our greatest blessings to madness, if only it be granted by Heaven's bounty."[১৩]

মহৎ কাব্যরচনা যেমন ঐশ্বরিক প্রেরণাসঞ্জাত উন্মাদনা, তেমনি মহৎ প্রেমও দিব্যোন্মাদনা। "...such a madness as this is given by God to man for his highest possible happiness."[১৪]

প্লেটো বলেছেন, এই দিব্য প্রেরণা ছাড়া যেমন সত্যকার কাব্য রচিত হতে পারে না, তেমনি প্রেমের দিব্য প্রেরণা ছাড়াও মানুষ পৃথিবীতে সত্যকার মহৎ কোন ব্রতে ব্রতী হতে পারে না।

প্লেটো ফিড্রাসে দুটি রূপকের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম রূপকটি হল পক্ষবান আত্মার কল্পনা। এককালে প্রতি আত্মাই ছিল পক্ষবান। সেই পক্ষবান আত্মাগুলি স্বর্গের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াত। অবশেষে একদিন তাদের পক্ষ ছিন্ন হল, তারা ওড়বার শক্তি হারিয়ে নেমে এল পৃথিবীর বুকে। এই পৃথিবীতে যখন আত্মা মর্তসৌন্দর্যের সন্ধান পায় তখন তার স্মৃতিতে ঊর্ধ্বলোকের সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে; ধীরে ধীরে তার পাখা গজাতে থাকে। শুরু হয় তার নভোবিহার। "...by the sight of beauty in this lower world, the true beauty of the world above is so brought to his remembrance that he begins to recover his plumage, and feeling new wings, longs to soar aloft."[১]

আর একটি রূপকে প্লেটো আত্মাকে অশ্ববাহিত রথের সারথি রূপে কল্পনা করেছেন। সে রথে আছে দুটি পক্ষবান অশ্ব; একটি সদ্বংশজাত, অপরটি দুষ্কুলোদ্ভব। অর্থাৎ, একটি দিব্য এরসের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অপরটি জৈব এরসের প্ররোচনায় সর্বদা অবাধ্য ও বিপথগামী। প্রেমচেতনার প্রথম পর্যায়ে এ দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সারথি যখন দুটি অশ্বকেই সুনিয়ন্ত্রিত করে রথ পরিচালনা করতে পারে তখনই সে অভীষ্ট লাভ করে। প্লেটো অবশ্য সারথি এবং অশ্বযুগলকে একই সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, as a single organism-রূপেই কল্পনা করেছেন।

আত্মার অভীষ্ট লাভ বলতে প্লেটো কী ধারণা করেছেন সে কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হবার পর আত্মা দিব্যসৌন্দর্যকে ভুলে যায়। সুন্দরের প্রতি প্রেমাবিষ্ট হলে তার মধ্যে সেই হারানো সৌন্দর্যানুভূতি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। যে দিব্যসৌন্দর্যের চেতনা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছে তার মধ্যে দেহসঙ্গমের জন্যে জৈবচেতনাই উদগ্র হয়ে ওঠে, কিন্তু যার মধ্যে দিব্যসৌন্দর্যের রেশ এখনও রয়েছে মর্ত্যলোকের সৌন্দর্য দেখে সে দৈববিস্ময় ও উপাসনার ভাবে উজ্জীবিত হয়। "In the soul which has all but lost the impression of heavenly beauty, the effect of its earthly adumbration is to provoke 'brutal' appetite for intercourse with the beautiful body. But in a soul fresh from deep contemplation of spiritual beauty, the sight of earthly beauty arouses religious owe and worship."[১৬]

সাত

ফিড্রাসের বৈশিষ্ট্য হল এই দুটি রূপকের ব্যাখ্যান: স্বর্গচ্যুত আত্মার মর্তলীলা, আর যুগল অশ্ববাহিত রথের সারথিরূপে দেহধারী আত্মার আত্মসংগ্রাম ও আত্মজয়। প্রথম রূপকে আমরা দেখলাম, স্বর্গচ্যুত আত্মা মর্তলোকে এসে সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেয়ে কি করে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করে। এর মধ্যেই রয়েছে প্লেটোর বিখ্যাত 'স্মরণতত্ত্বে'র রহস্য। এই স্মরণতত্ত্ব শুধু প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পরা-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারই লীলা ক্রিয়াশীল। স্বভাবতই পরা-জ্ঞান সম্পর্কে প্লেটোর দার্শনিক ব্যাখ্যার কথাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। 'রিপাব্লিকে' গুহা-রূপকের সাহায্যে প্লেটো এই বিষয় বিশদীভূত করেছেন।

ফিড্রাসের দ্বিতীয় রূপক যুগল-অশ্ববাহিত রথের সারথির সাহায্যে প্লেটো আত্মা ও শরীরধর্মের সংগ্রামের কথাই বলেছেন। সারথিকে বলা যেতে পারে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা। যুগল অশ্বের মধ্যে যে সদ্বংশজাত সে "loves honour and temperance and modesty, and a votary of genuine glory, he is driven without strike of the whip by voice and reason alone." নীচকুলোদ্ভব অশ্বটি প্রেমের পাত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তাকে প্রগ্রহে শান্ত ও সংযত করবার জন্যে সারথিকে বহু সংগ্রাম করতে হয়। অবশেষে সে বশীভূত হয় এবং অনুগত ভাবে শাসন মেনে প্রথম অশ্বের সঙ্গে একযোগে পথ চলে। এই সুকঠিন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হলে পরে প্রেমের সত্যকার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। বলাই বাহুল্য, তার লক্ষ্য হল প্রিয়জনের আত্মাকে উচ্চতর জীবনচর্যায় উন্নীত করা।

প্রেম সম্পর্কে প্লেটোর তৃতীয় এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপক হল প্রেমের জন্ম ও প্রেমের ধর্ম সম্পর্কিত উপাখ্যান। তারই নাম প্লেটোর এরস-তত্ত্ব। সিম্পোসিয়ামের মূল বিষয় হল এই এরস-তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ট্র্যাজিক কবি আগাথনের নাট্যসাফল্যের অভিনন্দনে একটি ভোজসভা আহূত হয়। এই সভার অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সক্রেটিস [৫৩], সভাপতি হিসাবে বৃত হন প্লেটোর বন্ধু ফিড্রাস, আর ছিলেন পোসানিয়াস, কমিক-কবি এরিস্টোফেনিস, রাষ্ট্রনীতিবিদ এলসিবিয়াডিস প্রমুখ গুণিজন। এই ভোজসভার বর্ণনা করেন এরিস্টোডেমস, তাঁর মুখে শুনে এপলোডোরাস যে ভাবে পুনর্বর্ণনা করেন তারই সাহিত্যরূপ হল সিম্পোসিয়াম। ভোজসভার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেম।

বক্তারা প্রেমের স্বরূপ ও মানবজীবনের উপর তার বিচিত্র প্রভাবের কথা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম বক্তা ছিলেন ফিড্রাস এবং সর্বশেষ বক্তা সক্রেটিস। মধ্যবর্তী বক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কমিক-কবি এরিস্টোফেনিসের দোসর-তত্ত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই এরিস্টোফেনিসই তাঁর Ecclesiazusae নাটকে তাঁর স্বভাবসুলভ লঘু-পরিহাসের মধ্য দিয়ে মুক্ত প্রেমের আদর্শ প্রচার করেছিলেন:

> All women and men will be common
> and free,
> No marriage or other restraint
> there will be.

সিম্পোসিয়ামে এরিস্টোফেনিস এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার

করলেন। তিনি তাঁর হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিতে বললেন, আদিযুগে মানুষ ছিল পূর্ণবৃত্ত জীব : চার হাত, চার পা, দুই মুখ ও এক মাথা। তাদের 'লিঙ্গ' ছিল তিনটি : যুগল-পুরুষ, যুগল-নারী ও যুগল-নারী-পুরুষ। তারা ছিল অসামান্য শক্তির অধিকারী। স্বভাবতই স্বর্গে গিয়ে তারা দৌরাত্ম্য করত। তারই ফলে জিউস প্রত্যেক মানুষকে উপর থেকে নীচে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেটে কেটে দু টুকরো করে দিলেন। সেই থেকে মানুষ তার আদিসত্তার অর্ধাংশ মাত্র। তারা পরস্পর পরস্পরের অর্ধকে খুঁজে বেড়ায়। এরিস্টোফেনিসের মতে নিজ সত্তার এই অর্ধাংশের অন্বেষণ এবং তার সঙ্গে পুনর্মিলনের নামই প্রেম :

"Since then man is only half a complete creature, and each half goes about with a passionate longing to find its complement and coalesce with it again. This longing for re-union with the lost half of ones original self is what we call "love", and until it is satisfied, none of us can attain happiness. Ordinary wedded love between man and woman is the re-union of the two halves of one of the originally double sexed creatures ; passionate attachment between two persons of the same sex is the re-union of the halves of a double-male or a double-female, as the case may be."[১৭]

মানুষের এই আদিম যুগ্মসত্তার কল্পনা হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্যে একটি নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে। এই মর্ত্যলোকের প্রেমিক তার প্রাণের দোসর—তার 'মনের মানুষ'কে খুঁজে বেড়ায়। সেই মনের মানুষকেই সে ভালবাসে। তারই নাম প্রেম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনা "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধ ['ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮] এবং 'পূরবী'র "দোসর" কবিতাটি অবশ্যই স্মরণীয়। "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধটির আলোচনা প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আট

সিম্পোসিয়মের এরস-তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা হলেন সক্রেটিস। তাঁর পূর্বে তরুণ কবি আগাথন বললেন, এরস হচ্ছেন দেবসমাজে সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ, তিনি বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বগুণসম্পন্ন। [স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালবাসার অমৃত।'] সক্রেটিস তাঁর স্বভাবসুলভ বাগ্মিতার চিরন্তন পদ্ধতি অনুযায়ী আগাথনের বক্তব্যকেই 'পূর্বপক্ষ' রূপে গ্রহণ করে বললেন, এরস দেবতা নন, তিনি মানুষ ও দেবতার মধ্যবর্তী এক সত্তা, গ্রীক ভাষায় তাঁর নাম "daimon" [স্মরণীয় : রবীন্দ্রনাথ এই 'ডেমন'-এরই বাংলা প্রতিশব্দ করছিলেন "জীবনদেবতা"।] সক্রেটিস বলছেন, তিনি দিয়োতিমার কাছে যে প্রেমতত্ত্ব শিখেছেন দিয়োতিমার ভাষাতেই তা ব্যক্ত করবেন। দিয়োতিমার বক্তব্য হল, এরস শিবও নন্ সুন্দরও নন্। এই দুটো ধর্মেরই তাঁর অভাব, সেই জন্যেই এরস শিব-সুন্দরের চিরপ্রত্যাশী। এই যুক্তি অনুসারেই দিয়োতিমা বলছেন, এরস দেবতা নন, কেন না দেবতারা সবাই শিব-সুন্দর। এরস যদি দেবতা না হন, তা হলে তাঁর ধর্ম ও শক্তি কি? মানুষ ও দেবতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনই তাঁর ধর্ম। "To interpret and to ferry across to the gods things given by men, and to men things from the gods ; from men petitions and sacrifices, from the gods commands and requitals in return ; and being in the middle it completes them and binds all together into a whole."[১৮]

এরসের জন্ম সম্পর্কে দিয়োতিমার কাহিনীটি বর্ণনা করে সক্রেটিস বললেন : আফ্রোদিতের জন্ম হলে দেবতারা একটি ভোজের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে মেতিসের পুত্র 'পোরোস' [প্রাচুর্য]-কেও আমন্ত্রণ করা হল। ভোজশেষে পেনিয়া [দারিদ্র্য] এল সেখানে ভিক্ষা চাইতে। পোরোস ভোজনান্তে প্রচুর সুধা পান করে প্রমত্ত হয়ে জিউসের নন্দনকাননে গেল শয়ন করতে। সুধাই সে পান করল, কেন না তখনও সুরার সৃষ্টি হয় নি। অভাবের তাড়নায় পেনিয়া চাইল পোরোসের সঙ্গ। তাই নন্দনকাননে সে

গিয়ে পোরোসের পাশে শয্যা গ্রহণ করল। পোরোস ও পেনিয়ার সঙ্গমে যে সন্তানের জন্ম হল তারই নাম এরস বা প্রেম। যেহেতু প্রেমের পিতা ও মাতা পোরোস ও পেনিয়া, সেইজন্যে তার মধ্যে পিতামাতা উভয়েরই ধর্ম বর্তমান। মায়ের স্বভাবে সে দরিদ্র, গৃহহারা ও আশ্রয়হীন; অভাবই তার চিরসহচর। পিতার স্বভাবে সে শিবসুন্দরের উপাসক, নির্ভীক, দুর্দম ও অমিতবলশালী। সে দার্শনিক, ঐন্দ্রজালিক ও শিক্ষক। মানুষের জীবনে এই এরস বা প্রেমের দান কি? সুন্দরের প্রতি ভালবাসা। সুন্দরের প্রতি ভালবাসার অর্থ কি? অন্য দিক থেকে, যে সুন্দরকে ভালবাসে সে কি চায়? উত্তর, সে পেতে চায় সুন্দরকে। দিয়োতিমা বললেন, সুন্দরের বদলে শিব [বা শুভ কিংবা শ্রী] কথাটি প্রয়োগ করলে কি দাঁড়ায়? যে শিবকে ভালবাসে সে কি চায়? সে চায় সুখ। এই সুখলাভের উপায় কি? যা শিব যা সুন্দর তাকে সৃষ্টি করার বাসনা থেকেই সুখলাভ হয়। "It is a breeding in the beautiful both of body and soul."[১৯]

দিয়োতিমা পুনশ্চ বললেন, "love is not for the beautiful.···It is for begetting and birth in the beautiful ···begetting is, for the mortal, something everlasting and immortal. But one must desire immortality along with the good, according to what has been agreed, if love is love of having the good for onself always. It is necessary then from this argument that love is for immortality also."[২০]

অর্থাৎ সুন্দর দেহে এবং সুন্দর আত্মায় সন্তান-জননের মধ্য দিয়ে অমরত্ব প্রাপ্তি এবং তজ্জনিত সুখলাভই মানব-জীবনে এরসের দান। প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ দেহমিলনে সন্তানজননের ফল বংশানুক্রম। দ্বিতীয় পর্যায়ের ফল কাব্য ও অন্যান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্প; এবং বিচিত্র মানবধর্মী জীবনচর্যা; জ্ঞান কর্ম ও ধর্মের সুন্দর ও ক্ষেমংকর অনুশীলন।

সক্রেটিসকে দিয়োতিমা বললেন, এই হল প্রেমের বিচিত্র রহস্যের কয়েকটি দিক। সুপথে পরিচালিত হয়ে এই রহস্যজাল ভেদ করে জীবনের একটি পরম তত্ত্বে প্রেমিক উপনীত হয়। আর তাই হল আত্মিক প্রেমের চূড়ান্ত পরিণাম। বিচিত্র থেকে পরম একে, সীমা থেকে অসীমের চেতনায় এই প্রেম-পরিক্রমার কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর পরিলক্ষিত হবে। প্রথমে একটি সুন্দর দেহকে ভালবাসা। তারপরে এই বিশ্বাস যে প্রতিটি সুন্দর দেহের মধ্যে একই চিরসুন্দর প্রকাশ। এই অনুভূতির ফল সুন্দর দেহ-মাত্রকেই ভালবাসা। তার পরের স্তরে এই বিশ্বাস যে, দেহের সৌন্দর্য থেকে আত্মার সৌন্দর্যের উৎকর্ষ অনেক বেশি। এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মিক সৌন্দর্যের অনুশীলন এবং তজ্জনিত জ্ঞানই পরবর্তী স্তর। এই ভাবে নিঃসীম সৌন্দর্য-সমুদ্রের সন্ধান এবং সর্বশেষ স্তরে পরম-সুন্দর ও পরম শিবের চেতনায় এক এবং অদ্বিতীয় সত্যের পরা-জ্ঞানই প্রেমচর্যার শেষ কথা। "···beginning from these beautiful things, to mount for that beauty's sake ever upwards, as by a flight of steps, from one to two, and from two to all beautiful bodies, and from beautiful bodies to beautiful pursuits and practices, and from practices to beautiful learnings, so that from learnings he may come at last to that perfect learning, which is the learning solely of that beauty itself, and may know at last that which is the perfection of beauty."[২১]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্লেটোনিক প্রেমচর্যা উন্নততর জীবনচর্যারই নামান্তর। তার রয়েছে বিচিত্র সোপান-পরম্পরা। কিন্তু এর সর্বশেষ স্তরে অসীমের কোটিতে পৌঁছে প্রেমের দৃষ্টিতে চিরসুন্দরের অনুধ্যানই প্লেটোনিক প্রেমধর্মের পরমতত্ত্ব। বলাই বাহুল্য, এই প্রেমতত্ত্ব, যার অন্য নাম এরসতত্ত্ব, তা দার্শনিক প্লেটোর জীবনতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। প্লেটোর ইউটোপিয়া—তাঁর ভূস্বর্গ 'রিপাব্লিক' এই এরস বা দিব্যপ্রেমেরই প্রেরণাসঞ্জাত মহত্তম কবিস্বপ্ন।

[ক্রমশঃ]

রবীন্দ্রনাথ—কৃতি ও কৃত্য

ইংরেজীমতে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হইতে আর মাত্র এক মাস বাকি। আমরা ১৩৬৮ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচিত ও শতবার্ষিক অর্ঘ্যরূপে প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। আরও অনেকগুলি বই আমাদের হস্তগত হইয়াছে, প্রাপ্ত রবীন্দ্র-কৃতিগুলি এই :

১। **পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি** (সচিত্র)। গ্রন্থ ও চিত্রপরিচয় সহ। চার টাকা।

২। **জাভা-যাত্রীর পত্র** (সচিত্র)। গ্রন্থপরিচয় সহ। চার টাকা।

৩। **বলাকা**। রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা ও গ্রন্থপরিচয় সহ। তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

৪। **স্ফুলিঙ্গ**। গ্রন্থপরিচয় সহ। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

৫। **বিসর্জন**। গ্রন্থপরিচয় সহ। এক টাকা আশি নয়া পয়সা।

৬। **সাহিত্যের পথে**। গ্রন্থপরিচয় সহ। তিন টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা।

৭। **আত্মপরিচয়**। গ্রন্থপরিচয় সহ। এক টাকা আশি নয়া পয়সা।

এতদ্‌ব্যতীত সংক্ষিপ্ত 'বিসর্জন' (পঞ্চাশ নয়া পয়সা), গীতিচর্চা (স্বরলিপি—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা) এবং স্বরবিতান গ্রন্থমালায় ৫৭ সংখ্যা 'তপতী'র (এক টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা) প্রকাশও উল্লেখযোগ্য। শ্রীকানাই সামন্তের যত্নে বইগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

রবীন্দ্র-কৃত্যের সংখ্যা ও উৎকর্ষ দেখিলে আনন্দ হয়। কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখ ও বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। তালিকা এই :

১। **রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড : পুলিনবিহারী সেন** সম্পাদিত। বাক্‌সাহিত্য। বহু তথ্য ও তত্ত্ব-সমৃদ্ধ। দশ টাকা।

২। **রবি-স্মরণে : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য**। বসুধারা প্রকাশনী। দুই টাকা।

৩। **রবি-প্রদক্ষিণ : সম্পাদক, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য** বসুধারা প্রকাশনী। সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দুইখানি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহাস্পদ সুহৃৎ

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ দ্রষ্টব্য : 'কাব্যবিচার', শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃ° ১৩৫।

২ ভোজরাজ বলেছেন :

মনোহনুকূলেষ্বর্থেষু সুখসংবেদনং রতিঃ।
অসম্প্রয়োগবিষয়া সৈব প্রীতির্নিগদ্যতে॥

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ।

৩ Plato the man and his work, পৃ° ২০৯।

৪ Plato and his dialogues, পৃ° ১৯৬।

৫ Plato (I) An introduction. Hans Meyerhoff-এর ইংরেজি অনুবাদ। স° ১৯৫৮। পৃ° ৪৯।

৬ তদেব পৃ° ৪৪।

৭ Plato and his Dialogues : G. Lowes Dickinson, পৃ° ১৭৭।

৮ ফিড্রাস, জে রাইটের অনুবাদ (১৮৪৮)। দ্রষ্টব্য, এভারম্যানস লাইব্রেরি গ্রন্থমালার ৪৫৬ সংখ্যক গ্রন্থ Plato : Five Dialogues, পৃ° ২২৬।

৯ Great Dialogues of Plato. [A Mentor Classic গ্রন্থমালা] অনুবাদ W. H. D. Rouse; পৃ° ৯৭।

১০ তদেব, পৃ° ৯৭।

১১ তদেব, পৃ° ১০১।

১২ তদেব, পৃ° ১০২।

১৩ Five Dialogues, রাইটের পূর্বে-উল্লিখিত অনুবাদ; পৃ° ২৩৮।

১৪ তদেব, পৃ° ২৪০।

১৫ তদেব, পৃ° ২৩৫-৪৬।

১৬ Plato : the man and his work, পৃ° ৩০৮-৩০৯।

১৭ তদেব, পৃ° ২১৯।

১৮ Great dialogues of Plato [A Mentor Classic], পৃ° ৯৮।

১৯ তদেব, পৃ° ১০১।

২০ তদেব, পৃ° ১০১-১০২।

২১ তদেব, পৃ° ১০৫-১০৬।

লাল ফিতা

সঙ্কর্ষণ রায়

নভেম্বর মাস থেকে 'জরুরী' শিরোনামা-অঙ্কিত একটি ফাইল কেন্দ্রীয় খনিজ-বিভাগের বড়কর্তার টেবিলে পড়ে আছে। ফাইলটিতে মধ্যপ্রদেশের একটি নব-আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ আরম্ভ করার প্রস্তাব রয়েছে। বড়কর্তার সম্মতিসূচক একটি দস্তখত ফাইলটিতে পড়লেই ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ-বিভাগ ওখানে কাজ শুরু করে দিতে পারে।

ফাইলে দস্তখত দিতে মিনিটখানেকও সময় লাগার কথা নয়। ফাইলের মলাট খুলে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় উপনীত হওয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হয় না। তার জন্যে পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট রয়েছে। তবু বড়কর্তা পাঁচ মাসেও পেরে উঠলেন না তাঁর স্বাক্ষরাঙ্কিত করে ভূতাত্ত্বিক জরিপ-বিভাগকে সবুজ সংকেত দিতে।

তাঁকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সত্যিই তাঁর সময় নেই। নতুন একটি বাড়ি করছেন তিনি মথুরা রোডের ওপর। বাড়ি তৈরির তদারক করতে তাঁর প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। যেটুকু সময়ের জন্য তিনি দপ্তরে আসতে পারেন, সেটুকু সময় তাঁর মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরী আলোচনা করতেই কেটে যায়।

তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট মাঝে মাঝে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ফাইলটির দিকে। কিন্তু তাতে তাঁর ভুরু দুটো বিরক্তিতে এমনি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে যে বেচারা পালাবার পথ পায় না।

অবশেষে এপ্রিল মাস এল। গ্রীষ্মের নিদারুণ দাহে গলদঘর্ম হয়ে উঠে খনিজ-বিভাগের বড়কর্তা সমর সমাদ্দার নরওয়ে এবং সুইডেনে একটি তিন মাসের সফরের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ওসব দেশের খনিজ-শিল্পসংক্রান্ত তথ্যগুলি আহরণ করা হঠাৎ যে অতিমাত্রায় আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কথা তিনি মন্ত্রিমশাইকে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলেন।

মধ্যপ্রদেশের কয়লাক্ষেত্রের অতি জরুরী ফাইলটিতে শুধু ধুলোই জমতে থাকে।

ওদিকে ভূতাত্ত্বিক জরিপ-বিভাগের ডিরেক্টর জিওলজিস্ট অরবিন্দ পাণ্ডেকে নভেম্বর মাসেই লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মধ্যপ্রদেশের নতুন আবিষ্কৃত ঘুরৌলি কয়লাক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে। সমর সমাদ্দারের দপ্তর থেকে সবুজ সঙ্কেত আসামাত্রই তাকে যাত্রা করতে হবে এবং অবিলম্বে ওখানে গিয়ে আরম্ভ করতে হবে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ।

সরস্বতীর সঙ্গে অরবিন্দর বিয়ে অনেক দিন থেকেই নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিশেষ একটি দিনে হবে বলে ঠিক হয়ে আছে। ডিরেক্টরের অফিস-অর্ডার পাওয়ামাত্র বিয়ের দিন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিল অরবিন্দ।

কিন্তু নভেম্বর থেকে শুরু করে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত বিয়ের অনুকূল একটি শুভদিনও খুঁজে পেল না অরবিন্দ। সুদীর্ঘ সাতটি মাস ধরে সমর সমাদ্দারের স্বাক্ষরিত নির্দেশের জন্যে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা চলল, যে কোনও দিন যে কোনও মুহূর্তে ঘুরৌলির উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল অরবিন্দ। মধ্যপ্রদেশের সুদুর্গম অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চলে যাওয়ার জন্যে নিত্য প্রস্তুতির মধ্যে সরস্বতীকে তার জীবনে বরণ করে আনার অবকাশ রইল না। অথচ ঘুরৌলিতে যাওয়ার হুকুম এল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে।

চাপা প্রকৃতির মেয়ে সরস্বতী, মনের মধ্যে উদ্বেলিত অভিমান বাইরে প্রকাশ করল না। জুলাইয়ের মাঝামাঝি যখন অরবিন্দ তার কাছে বিদায় নিতে এল তখনও সে কিছু বলল না। তার নীরব অভিমানের আভাস যে অরবিন্দ পেল না তা নয়, কিন্তু তাকে বলবার মত একটি কথাও সে পেল না খুঁজে।

সমর সমাদ্দার জুনের শেষ সপ্তাহে তাঁর বৈদেশিক সফর সেরে দেশে ফিরলেন। সেক্রেটারিয়েটে তাঁর দপ্তরে কাজে যোগ দিতেই মধ্যপ্রদেশের কয়লাক্ষেত্রের ফাইলটি তাঁর চোখে পড়েছিল। একটানা সাতটি মাস ধরে ফাইলটি তাঁর চোখের সামনে ফাইল-ট্রেতে পড়ে ছিল, অথচ

এই প্রথম যেন ওটা তাঁর চোখে পড়েছে এমনি একটা ভাব দেখিয়ে তিনি চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিলেন, পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টকে ডেকে প্রচণ্ড রকম ধমক দিয়ে উঠেছিলেন : ফাইলটা এতদিন আমার কাছে পুটআপ করেন নি কেন ?

পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট জবাব দিতে গিয়েছিল যে ফাইলটা সমাদ্দার সাহেবের টেবিলেই পড়ে ছিল এতদিন, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। সমাদ্দার সাহেবের মেজাজ বিগড়ে গেলে যে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না এটা তার ভালভাবেই জানা ছিল।

মধ্যপ্রদেশের ঘুরৌলি কয়লাক্ষেত্রে অবিলম্বে কাজ শুরু করার জরুরী আদেশ সমর সমাদ্দারের দপ্তর থেকে ভূতাত্ত্বিক জরিপ-বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে এসে পৌঁছতেই তিনি অরবিন্দকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়তে আদেশ দিয়েছিলেন।

ডিরেক্টরের আদেশ নীরবে শিরোধার্য করে নেওয়া তার কর্তব্য জেনেও অরবিন্দ মৃদু আপত্তি প্রকাশ করে বলেছিল, এই প্রচণ্ড বর্ষায় ঘুরৌলিতে পৌঁছব কী করে স্যর্ ? ওখানকার রাস্তায় বর্ষাকালে জীপও চলে না। নদীনালাগুলোতে ব্রিজ নেই, খবর নিয়ে জেনেছি পাহাড় থেকে হামেশা ঢল নামছে।

গম্ভীর মুখে ডিরেক্টর বললেন, এ সব কথা বলে লাভ নেই অরবিন্দ। সমাদ্দার সাহেব যখন হুকুম দিয়েছেন, দুর্যোগে দুনিয়া রসাতলে গেলেও তোমাকে যেতেই হবে।

অগত্যা ড্রিলিং মেশিন ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম-ভর্তি একটি ট্রাক ও একটি জীপ নিয়ে রওনা হল অরবিন্দ। তার সঙ্গে চলল ড্রিলার রমেশ রাণে ও দশ বারোজন ড্রিল-অপারেটার মোটর-মেকানিক ড্রাইভার ও খালাসী।

যেদিন তারা রওনা হল সেদিন প্রবল তোড়ে বৃষ্টি নেমে প্রায় সমস্ত দিল্লী শহর ভাসিয়ে দিয়েছে।

অবিরাম বৃষ্টির মধ্য দিয়ে তারা আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ ও রেওয়া হয়ে সিধিতে পৌঁছল। সিধিতে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ থেকে মেঘের আবরণটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে গেছে। মেঘে মাজাঘষা হওয়ার দরুণই যেন আকাশটা আশ্চর্য রকম নীল হয়ে উঠেছে। আকাশের বিস্ময়কর নীলিমা ছাপিয়ে উঠেছে সূর্যের প্রসন্ন হাসি। অরবিন্দর মনটাও খুশিতে ভরে ওঠে।

অরবিন্দ স্থানীয় লোকদের কাছে শুনল যে আবহাওয়া এমনি অনুকূল থাকলে ঘুরৌলিতে পৌঁছতে তার অসুবিধে হবে না। Acc No. 7776

সিধিতে বিলম্ব না করে আবহাওয়ার আনুকূল্যের সুযোগ নিয়ে ঘুরৌলির পথে যাত্রা করল অরবিন্দ ও রমেশ। রাস্তা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে একদিনের রোদে। ছোট ছোট নালাগুলোতে বিশেষ জল নেই। অরবিন্দ অনুমান করল যে কাচনি ও গোপদ নদী পেরিয়ে যেতে খুব অসুবিধে হবে না।

বরহি গ্রামের কাছে গোপদ নদী শোনে মিলত হওয়ার আগে খুব চওড়া হয়ে গেছে। শীতে ও গ্রীষ্মে নদীটা শুকিয়ে যায়, বর্ষায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দু কূল ছাপিয়ে ওঠে।

এপার থেকে ওপার পর্যন্ত জল মেপে অরবিন্দ দেখল যে গোপদ নদীতে তখনও সে রকম জল হয় নি, ট্রাক ও জীপ পার করিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সে।

পারলও এক রকম বিনা আয়াসে। ওপারে ডাঙায় উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অরবিন্দ। এর পর ঘুরৌলির পথে কাচনি নদী ছাড়া আর কোনও বাধা নেই। বাধাটা অবশ্য দুর্লঙ্ঘ্য হবে না। বরহি গ্রামের লোকেদের কাছে অরবিন্দ শুনেছিল যে গোপদের তুলনায় কাচনি নদীটা খুবই ছোট।

কাচনি নদীর কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই হঠাৎ বৃষ্টি নামল আকাশজোড়া নিবিড় কালো মেঘের ঘনঘটা বিস্তার করে। ঘুরৌলি অবশ্য আর বেশী দূর নয়। কাচনি নদী পেরিয়ে যেতে পারলে ঘণ্টা দেড়েকও লাগবে না ঘুরৌলি গ্রামে পৌঁছতে।

কাচনি নদীর ধারে পৌঁছে অরবিন্দ দেখল জল খুবই অগভীর এবং শান্ত। বালির ওপর কাঁকর বিছিয়ে যে পথ তৈরি করা হয়েছিল, স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে তার আভাস দেখা যাচ্ছে। অরবিন্দ নিশ্চিন্ত মনে নদী পার হতে উদ্যত হল।

প্রথমে সে জীপ নিয়ে নদীতে নামল রমেশকে এপারে ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। জীপ নিয়ে নিরাপদে

সে নদী পার হয়ে গেলে পর রমেশকে ট্রাক নিয়ে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়ে রাখল।

ফ্রণ্ট হুইল অ্যাক্সেলে গীয়ার নামিয়ে ধীরে ধীরে অরবিন্দ গাড়ি চালায় নদীর মধ্য দিয়ে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে চললেও নদী শান্তই থাকে। জলের মধ্যে পথটা অস্পষ্ট নয়। অরবিন্দ শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মনে গাড়ি চালায়।

হঠাৎ স্তিমিত জলে প্রচণ্ড আবেগের সঞ্চার করে ঢল নেমে এল। কাচনি নদীর দু কূল ছাপিয়ে উঠল জলের প্রবল আবর্ত। দুই তীরের শাসন মুহূর্তের মধ্যে জলে তলিয়ে গেল।

চক্ষের নিমেষে নদীর দুর্বার স্রোতে ভেসে গেল জীপটি। ট্রাকে বসে রমেশ রাণে অসহায়ভাবে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল। তার কিছু করার উপায় ছিল না।

বারো ঘণ্টা বাদে নদীর জল আবার নির্দিষ্ট দুই তীরের সীমানার মধ্যে নেমে এল। কিন্তু অরবিন্দকে কোথাও খুঁজে পেল না রমেশ।

সমর সমাদ্দার অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ঘুরৌলিতে কয়লার প্রসপেক্‌টিংয়ের কাজ শুরু হবার খবর এসে পৌছয় নি বলে। অরবিন্দ দিল্লী ছেড়েছে প্রায় পনেরো দিন হল। পনেরো দিন এমন কিছু কম সময় নয়। আঠারো দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। সমাদ্দার সাহেব সেদিন অফিসে এসেই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিলেন। গতিক মন্দ দেখে সমাদ্দার সাহেবের সহকারী ভূতাত্ত্বিক জরিপ-বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর রণধীরকে জরুরী তলব দিয়ে ডেকে পাঠালেন।

রণধীর সমাদ্দার সাহেবের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াতেই সমাদ্দার সাহেব ফেটে পড়লেন: এখনও ঘুরৌলিতে কাজ শুরু হয় নি কেন?

রণধীর শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, বর্ষার আগে আপনার নির্দেশ পেয়ে গেলে এতদিনে অনায়াসে কাজ শুরু হয়ে যেত।

সমাদ্দার সাহেব তিক্তস্বরে বললেন, আপনি তা হলে বলতে চান যে বর্ষাকালে কোন কাজ শুরু করা যেতে পারে না?

না, তা বলি না।

তবে? দেখুন ডক্টর রণধীর, সোজাসুজি স্বীকার করলেই তো পারেন যে একজন অপদার্থ জিওলজিস্টকে ঘুরৌলিতে পাঠিয়েছেন।

অরবিন্দ পাণ্ডে অপদার্থ নয়

মাই গুডনেস ডক্টর রণধীর, আপনার দেখছি কারুর যোগ্যতা বিচার করার ক্ষমতাও নেই। শুনুন ডক্টর রণধীর, আপনি এক্ষুণি আপনার অফিসে গিয়ে ওই অরবিন্দ পাণ্ডেকে ডিস্‌মিস করার অর্ডার দিন।

রণধীর অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করে বললেন, এইমাত্র আমাদের ড্রিলার রমেশ রাণের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছি। সে জানিয়েছে যে ঘুরৌলির কাছে কাচনি নদী পার হবার চেষ্টা করছিল অরবিন্দ জীপ নিয়ে, এমন সময় নদীতে ঢল নেমে জীপসুদ্ধ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

চোখ কপালে তুলে সমাদ্দার সাহেব বললেন, জীপ! তার মানে গভর্মেণ্ট প্রপার্টি! গভর্মেণ্ট প্রপার্টি নদীর জলে ভেসে গেছে! এর পরও কি আপনি বলতে চান যে ওই অরবিন্দ পাণ্ডে অপদার্থ নয়! বাই দি ওয়ে, অরবিন্দ এখন কোথায়?

কম্পিত স্বরে রণধীর জবাব দিলেন, সে আর বেঁচে নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল সরস্বতী। আলুথালু বেশ, দু চোখে তার উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতা। সমাদ্দার সাহেবের মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে সে প্রশ্ন করল, বলুন, অরবিন্দ কোথায়?

ভুরু কুঁচকে সরস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে সদ্য ধরানো সিগারেটটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সমাদ্দার সাহেব জবাব দিলেন, অরবিন্দ বেঁচে নেই। বেঁচে নেই বলেই ও বেঁচে গেল আমার ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন থেকে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ওর চাকরি যেত।

—

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' [এক]

"To amuse yourself with a pretty girl is not a sin. It is only a sign of good health."

—তলস্তয়

মানবসভ্যতার প্রত্যূষকালে প্রাচ্যের এক রাজপুত্র রাজার ঐশ্বর্য, ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণী, দুগ্ধফেননিভ-শয্যার উত্তপ্ত সঙ্গ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। নিশীথরাত্রির নিঃসীম নীরবতায় অসংখ্য তারার আলোয় আলোকিত অনন্ত আকাশ মাথার ওপর ; পায়ের তলায় অগণিত মানুষের পায়ের ধূলায় পবিত্র পথ। পেছনে যা কিছু মূল্যবান ; সামনে যা কিছু অমূল্য। নিজের জন্যে নয়, জগতের সকল কালের সমস্ত মানুষের জন্যে সেই একবার একজন মানুষ বেরিয়েছিলেন ঘর ছেড়ে পথে, পথ ছেড়ে অরণ্যে, বিলাস ছেড়ে বসেছিলেন বৈরাগ্যের আসনে, বিষয় ছেড়ে তপস্যায় দিয়েছিলেন মন। মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, অন্যায় থেকে ন্যায়ে, হিংসা থেকে অহিংসায় উত্তীর্ণ সেই যাত্রার শেষে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বাঁচার মন্ত্র। পথের ধারে যেখানে তিনি পেতেছিলেন তাঁর প্রেমের সিংহাসন সেখানে কোনও এক রাজ্যের নয়, কোনও এক কালের নয়, জগৎ জুড়ে সকল কালে উঠছে তাঁর জয়ধ্বনি : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!

মানবসভ্যতার বয়স বাড়বার দীর্ঘকাল পরে আর এক মানবপুত্র ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন পথে। অশান্তিতে বাঁচবার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, মৃত্যুতে শান্তি পাবার জন্যে। ঘর থেকে, খ্যাতি থেকে, স্ত্রী-পুত্র-প্রিয়জন-ভক্ত-শিষ্যের কাছ থেকে পলাতক সেই জীবনযোদ্ধা অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বলেছিলেন উপস্থিত চিকিৎসক-সঙ্গীকে : "There are millions of human beings on earth who are suffering. Why do you think only of me ?"

অশীতিবর্ষ অতিক্রান্ত তলস্তয়ের মৃত্যু-মুহূর্তে উচ্চারিত এই সমবেদনার বাণীর মধ্যেই তাঁর সাহিত্য কেন চিরন্তন বিশ্বসাহিত্য, তার এই জিজ্ঞাসার উত্তর উপস্থিত। আঘাত, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, উপদেশ নয় ; অসাধারণ সমবেদনাই সাধারণ লেখককে মহৎ শিল্পী করে ; মহৎ শিল্পীকে করে মহত্তম জীবনশিল্পী।

অতি দুর্গম সেই সৃষ্টির শিখরদেশ অসীমকালের মহা গহ্বর থেকে নিত্য উৎসারিত যেখানে আব্রহ্মস্তম্ব সব। এই নিত্যপ্রবাহিণী সৃষ্টি করে সঙ্গীত তা নিয়ে দর্শন-তত্ত্ব-তন্ত্র-মন্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয় নি আজও। সেই গানের ঝরনাতলায় কান পেতে বসেছে শুধু কবি, আর কথা-শিল্পী। তারা শুনেছে সৃষ্টির কান্না। অগণিত মানুষের কাছে অশ্রুত সেই ক্রন্দনধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে গেটের শেষ অশেষ একটি কথায় ; "Light ! more light !" সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ-এলিনকিতে : "It is a tale told

by an idiot full of sound and fury signifying nothing ;" রবীন্দ্রনাথের কবিতায় :

'জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;'

সৃষ্টির এই কান্নাই তলস্তয়ের গদ্যকাব্য : Anna Karenina-র অপরূপ কথা : "The heavenly powers bring us into life ; they compel us to sin ; and then they abandon us to our sin and our pain"

কিন্তু সৃষ্টির কেবল কান্না নয়, আনন্দও তার কান্নার একটা রূপ। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র যুদ্ধে আহত নায়কের অশ্রুতে সেই আনন্দের আভাস অকস্মাৎ উদ্ভাসিত : " 'The illimitable sky which broods above the outrage and abjectness of the earth,' and the sight of it filled him with an indescribable joy."

যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে দিয়ে উচ্চারিত জীবন ও মৃত্যুর, মর্ত্য ও স্বর্গের, রূপ ও অপরূপের আনন্দ ও বেদনার এই চিরন্তন বার্তাই তলস্তয়ের 'War and Peace'।

বুদ্ধের সঙ্গে অনেক পরবর্তীকালের এই প্রবুদ্ধের মিল যত, অমিলও তত। বুদ্ধ রাজার ছেলে, তলস্তয় রাজার না হলেও প্রায় রাজার মতই মানুষ হয়েছেন শৈশবেও, কৈশোরেও। বুদ্ধ জীবনের প্রভাতকালেই জরা, জীর্ণতা, মৃত্যু এবং প্রসন্নতার মুখ দেখেছিলেন রথে করে রাজপথে বেরিয়ে। তলস্তয় রণদামামার মধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে কান পেতে সুন্দরের, শুভের, শিবের আহ্বান-বাণী :

"Is it impossible, then, for men to leave in peace, in this world so full of beauty, under this immeasurable starry sky? How can they, in a place like this, retain their feelings of hatred and vengeance, and the lust of destroying their fellows? All there is of evil in the human heart ought to disappear at the touch of Nature, that most immediate expression of the beautiful and the good."

বুদ্ধের মতই নবধর্মের, মানবধর্মের অন্বেষণে এই প্রবুদ্ধ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তলস্তয় ১৮৫৫ সনের ৫ই মার্চ দিনলিপির পাতায়, তলস্তয়ের বয়স তখন তিরিশও নয় :

"I have been laid to conceive a great idea, to whose realization I feel capable of devoting my whole life. This idea is the foundation of a new religion ..."

বুদ্ধ যে ধর্মের প্রবর্তন করে যান তার নাম বৌদ্ধধর্ম, তলস্তয় যে creed-এর সূচনা করে যান তার নাম 'Non-Violence'।

কিন্তু বুদ্ধ রমণীর মধ্যে পরমের সন্ধান পান নি। তলস্তয় প্রথম যৌবনে রমণীর মধ্যেই পরম রমণীয়ের আস্বাদ পেতে চেয়েছিলেন ; "To amuse yourself with a pretty girl is not a sin. It is only a sign of good health." বুদ্ধের বৈরাগ্য জাগে সুন্দরের সৃষ্টিতে জরার 'অসুন্দর'কে প্রত্যক্ষ করে। তলস্তয়ের প্রথম অতৃপ্তি নিজের দেহের সৌন্দর্যহীনতার কারণে ; কারণ, "He had the mind of an Ariel in the body of a Caliban." এই কুৎসিত দেহকে বিসর্জন দিয়ে দেহত্যাগ করার চিন্তাও একসময়ে তাঁকে সাময়িককালের জন্যে আচ্ছন্ন করে। তিনি নিজেই লিখেছেন : "There were moments when I was overcome by despair : I imagined that there could be no happiness on earth for one with such a broad nose, such thick lips and such small grey eyes as mine ; and I asked God to perform a miracle, and make me handsome, and all I then had, and everything I might have in the future I would have given for a handsome face"

দৈহিক রূপের অভাব ভুলতে চেয়েছিলেন তলস্তয় মদ, জুয়ো আর মেয়েমানুষের আমোদে আকণ্ঠ ডুবে ; পারেন নি। ক্ষণকালের এই উত্তেজনা তাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে নি, ঠেলে দিয়েছিল চিরকালের 'সত্য'-অন্বেষণের পতন ও অভ্যুত্থানের দুর্গম বন্ধুর পথে। দৈহিক রূপের অভাবের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল আত্মার অপরূপ আবির্ভাব। হিংসার সঙ্গে দেহকামনার

তৃপ্তিদায়ক উত্তেজনার অব্যবহিত পরবর্তী বিপুলতর অতৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম 'যুদ্ধ' এবং সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে অক্ষয় 'শান্তি',—'War and Peace' তলস্তয়েরই জীবন-জিজ্ঞাসা।

দৈহিক সৌন্দর্যের অভাব তলস্তয়ের অনেকটাই পুষিয়ে গিয়েছিল দুর্দান্ত স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল উচ্ছলতায়। যৌবনের রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার বাধা অপসারিত হয়েছিল জীবনীশক্তির উচ্ছল জোয়ারে দুর্বার বেগে ভাসমান এই অতি-নায়কের সহজাত দুনিবার আকর্ষণের দুরন্ত মহিমায় ["He was a man of strong sexual instincts and while in the Caucasus contacted syphilis."]। রূপোর চামচে মুখে করে এসেছিলেন তলস্তয় জন্মমুহূর্তেই। কাউন্ট নিকোলাস এবং মারিয়া তলস্তয় দুজনেই সম্পত্তির মালিক ছিলেন; তলস্তয় ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান। বাবা এবং মা দুজনকেই তলস্তয় অত্যন্ত শৈশবে হারান কিন্তু তার জন্যে তাঁকে ভাগ্যহারা হতে হয় নি।

তলস্তয়ের ছাত্রজীবন মেধার পরিচয়ে প্রদীপ্ত নয়। লিও এবং তাঁর অন্য দুই ভাই, তিন তলস্তয় সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষকদের অভিমত রীতিমত কৌতুকপ্রদ: "Sergei is willing and able; Dmitri is willing but unable; Leo is both unwilling and unable." লিও তলস্তয় সম্পর্কে তাঁর সতীর্থদের অভিজ্ঞতা আরও মর্মান্তিক:

"I had never met a young man with such a strange, and to me incomprehensible, air of importance and self satisfaction.…He hardly replied to my greetings, as if wishing to intimate that somehow we were far from being equals…" সৈনিক জীবনের সঙ্গীদের সম্পর্কেও তাঁর অত্যুগ্র অনীহা সোচ্চার: "At first many things in the society shocked me, but I have accustomed myself to them without, however, attaching myself to these gentlemen. I have found a happy mean in which there is neither pride nor familiarity."

মানবমনের দুর্গম অরণ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল এক যুবক সেদিন, জীবনজিজ্ঞাসার খুঁজে বেড়াচ্ছিল জবাব। অনন্ত আকাশের অন্ধকারে কার ছোঁয়ায় ফোটে তারা, ছড়িয়ে যায় তার আলো অন্তহীন অমায়; নামহারা কত গাছের শাখায় কার আঘাতে কুঁড়ির বুক বিদীর্ণ করে ফোটে ফুল, জড়িয়ে যায় তার গন্ধ অন্ধকারের কালো কেশে; নিরবধিকাল ধরে বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে মানুষ কেন মরতে চায়, মারতে চায় মানুষকে; সুন্দরের ভুবনে কেন অসুন্দরের, অশুভের, অসত্যের আবির্ভাব যুগে যুগে কালে কালে নটরাজের নৃত্যের তালভঙ্গ করে বার বার—এমনই কত জিজ্ঞাসার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত তলস্তয়ের হৃদয়; প্রমোদে ঢেলে দিয়েও কেন তবু প্রাণ কাঁদে—এই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিল সেদিন। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' সেই উদ্‌ভ্রান্ত যুবকেরই উত্তরণের অদ্বিতীয় 'এপিক'।

এই সময়েই তলস্তয় তাঁর পথের প্রথম নির্দেশ পান যাঁর রক্তিম রচনায়, তাঁর নাম: রুসো।

গতানুগতিক চিন্তার গড্ডলিকা থেকে মুক্তির প্রথম পাঠ তাঁর মনের মশালে আগুন ধরিয়ে দিল মুহূর্তে। চিন্তার জগতে বিপ্লবের পাবক-বাণী তলস্তয়ের ধ্যানে, ধারণায়, চলায় ফেরায়, স্বপ্নে জাগরণে রচনায় নতুন রঙ ধরাল। মাতৃপিতৃহারা বালকের জীবনের প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়েছিল 'Aunt' Tatiana-র কাছে। তীর্থযাত্রীদের কাহিনী তলস্তয়ের কানে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন প্রথম। এই পুণ্যার্থীদের রূপকথায় লালিত বালকের, রুসোর অপরূপ কথায়, দ্বিতীয় জন্মের আরম্ভ হল। অদ্বিতীয় জন্ম সে বিদ্রোহী বালকের। ষোল বছর বয়সে চার্চের ধর্মকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে নিয়েছিলেন 'নিহিলিজমে'র পথ। তখন তাঁর বয়স উনিশ।

তারপর ডুবেছিলেন মদে, মেয়েমানুষে আর জুয়ায়। নিজের দৈহিক রূপের অভাব ভুলতে অন্যের, অনন্যার অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে চেয়েছিলেন ডুবতে। আত্মহত্যার পথ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে চেয়েছিলেন হারিয়ে যেতে। হারিয়ে যাবার মুহূর্তেই, যৌবনের জলসায় জীবনের জলতরঙ্গ যখন উদ্দাম

মুখর তখনই কানে এল রুসোর উদাত্ত আহ্বান। নদীর কানে এসে পৌছল সমুদ্রের গর্জন।

'অ্যানা কারেনিনা' তলস্তয়ের যৌবন-সংগীত, 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' তলস্তয়ের জীবন-সংহিতা।

চার্চের ধর্ম ত্যাগ করে রুসোর ধর্মে দীক্ষিত তলস্তয়ের প্রথম রচনা: A Russian Landlord। তলস্তয়ের শিল্প ও জীবনকর্মের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যুক্ত সমস্যা: "The eternal conflict between the ideal of the prophet and the indifference of the public" এই প্রথম গ্রন্থেই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বকে জয়যুক্ত করেছে অনিবার্যভাবেই। গ্রন্থের নায়ক, "Prince Nekhludov, has left the University in order to help his peasants. But, like most other human derelicts, Nekhludov's peasants prefer to remain in the rut of their helplessness. They can understand a tyrant who beats them, but they hardly know what to make of a master who is kind to them. They shrink from him, they ridicule him, they look upon his proffered help with suspicion, they regard him as a spy, a scoundrel, a fool—anything but a man who is simply trying to be their friend.

Nekhludov is defeated. He sits down at the piano and strikes the keys. He has no talent for music. But his imagination weaves the song that his fingers are too clumsy to play. He hears a choir, an orchestra. The past and the future are blended together into a triumphant fulfilment of his dream.

In his mind's eye he sees the peasants, the moujiks, not only in their ugliness, but in all their *lovableness* as well. He forgives them for their ignorance, their idleness, their obstinacy, their hypocrisy, their distrust. For now he looks not only *at* them, but *into* them. He sees their suffering, their patience, their cheerfulness, their quiet acceptance of life, and their courageous resignation in the face of death.

'It is beautiful,' he murmurs. Even though they reject his advances, he now understands them and sympathizes with them. For they are all brothers, he and his peasants, flesh of one flesh and blood of one blood—a host of helpless moujiks living and toiling and dying under the lash of the pitiless Landlord, Fate." [Living Biographies Of Famous Novelists.]

অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলার পথে এই পৃথিবীতে ভগবানের দূত যাঁরা বলেছেন, 'ক্ষমা কর, ভালবাস' আমরা তাঁদের অবিশ্বাস করেছি বার বার। আমাদেরই আঘাতে রুধিরধারা যখন সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরেছে তাঁদের, তখনই আমাদের জন্যেই তাঁদের চোখ দিয়ে নির্গত হয়েছে অশ্রুধারা। আঘাতের উত্তর আঘাতে নেই, হিংসার জবাব নয় প্রতিহিংসা। নির্বুদ্ধিতায়, লোভে, হানাহানিতে উন্মত্ত মানুষের বেদনায় বিচলিত সমবেদনায় সীমাহীন মানুষের দেবতা, তলস্তয়ের মতই তবুও বলেছেন: "There are millions of human beings on earth who are suffering. Why do you think only of me?"

'মানুষের দেবতারে ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে' এবং 'দানবের মূঢ় অপব্যয় গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে' যে 'শাশ্বত অধ্যায়' তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' তারই অপরূপ 'এপিক'। এবং তলস্তয় ছাড়া কে আর এই তলস্তয়ের উপন্যাসের নায়ক হতে পারে? মানুষের দেবতা এবং অপদেবতা মানুষ ছাড়া আর কে?

তাঁর উপন্যাসের মতই দীর্ঘ তলস্তয়ের জীবন। উপন্যাসেরই মত আলো-আঁধারে উত্থান-পতনে বিচিত্র এবং অলৌকিক। তলস্তয়ের যে বাণী তাঁর উপন্যাসে অনিবার্য

উপস্থিত, নিজের জীবনে তাকে মূর্ত করে তোলবার প্রয়াসেই তিনি কেবল কথাশিল্পী থাকেন নি আর, অথবা থাকতে চান নি। শিল্পীর জীবন থেকে জীবন-শিল্পীর জন্মই তলস্তয়ের জীবন-মৃত্যুর সাধনা! তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মৃত্যুতে দ্বন্দ্বের অবসান অন্বেষণের ইতিবৃত্ত অনুধাবন করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' একই আধারে বিশেষের এবং নির্বিশেষে সকল মনের সকল মানবের কথা। বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময় যারা তারা সবাই প্রায় একজনের জীবনের কথা বলতে গিয়ে সমগ্র মানবজীবনের সংহিতা হয়ে উঠেছে। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে' সকলের জীবনে নিজের জীবন যোগ করতে পেরেছেন তলস্তয় বলেই এই কথাশিল্প কৃত্রিম গানের পসরা হয় নি। অকৃত্রিম অব্যর্থ জয়যুক্ত হয়েছে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' যে তার একমাত্র কারণ বহুজীবনের বহুকর্মের বহুব্যর্থতার আনন্দবেদনার অংশীদার তলস্তয় এই বিপুল বিচিত্র গদ্যকাব্যে বহু মানুষের কথাকে আত্মসাৎ করে আত্মজীবনের আলোয় আলোকিত করেছেন এমনভাবে যাতে নিরবধি কাল ধরে বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে পাঠক মাত্রেরই মনে অবশ্যম্ভাবী যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে এই বিস্ময়কর রচনা নিঃসংশয়ে সক্ষম তা হচ্ছে সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের মনের কথাই তলস্তয়ের কথা। এবং তা তলস্তয়ের কথা হয়েও সকলের কথা হতে পেরেছে বলেই 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' এমন কথাশিল্প যা সত্যই তার কীর্তির চেয়েও অনেক—অনেক মহৎ।

জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে ["...on one occasion, indeed to pay a gambling debt he had to sell the house on his estate of Yasnaya Polyana which was part of his inheritance."] তলস্তয় পাওনাদারের হাত থেকে গা বাঁচাবার সবচেয়ে সহজ উপায়ের সদ্ব্যবহার করতে সৈন্যদলে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স তেইশ! উনিশ বছর বয়সে আত্মহত্যায় উদ্যত যুবক তলস্তয় তেইশ বছরে পা দিয়ে পৃথিবীকে ভালবাসতে শুরু করলেন। সুন্দর ভুবনে মৃত্যুর চেয়ে অসুন্দর এবং রমণীর চেয়ে সুন্দর আর কিছু মনে হল না। রমণীর অভিজ্ঞতাই অবশ্য সবচেয়ে রমণীয় মনে হল তাঁর। এবং সেই অভিজ্ঞতারই ছায়া পড়েছে 'The Cossacks'-এ: "Nothing is wrong. To amuse yourself with a pretty girl is not a sin. It is only a sign of good health." কিন্তু অতিবীর্যবান তলস্তয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি কোনও একজন বা কোনও একটা কিছু নিয়েই অনেকক্ষণ বা অনেকদিন কাটাতে পারতেন না। রমণীরমণক্লান্ত তলস্তয়ের দিনলিপি থেকে জানা যায় যে, "...after a night of debauchery, a night with cards or women, or in carousal with gypsies, which if we may judge from their novels is, or was, the usual, but somewhat naive Russian way of having a good time, he suffered pangs of remorse;" তলস্তয়ের দিনলিপি থেকে এই স্বীকৃতি যিনি উদ্ধার করে দিয়েছেন তিনি অবশ্য এর উপসংহারে এটুকু যোগ করে দিতে বিস্মৃত হন নি যে, "he did not, however, fail to repeat the performance when the opportunity offered." [The World's Ten Greatest Novels]

গা বাঁচাতে গিয়েছিলেন তলস্তয় সৈনিক জীবনে। সেখানে তিনি পেয়ে গেলেন নতুন চোখ। সেই চোখে তাঁর সামনে অবারিত হল সংগ্রাম ও শান্তির অন্তর্লোক। নতুন সত্য। নবধর্মের বীজ রোপিত হল প্রমোদপ্রমত্ত মনের মরুভূমিতে। সেই নতুন দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত দিগন্তের দিকে তাকিয়ে তলস্তয় বলছেন:

"How can they, in a place like this, retain their feelings of hatred and vengeance, and lust of destroying their fellows?" [The Invasion]

সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মসমাহিত সৈনিক তখনও সাক্ষাৎ-যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে। ১৮৫৩ সনে যুদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন তিনি। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনায় অস্থির আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি প্রথমে:

"At first he was carried away by the fervor of his patriotism. Like the other

young men of his nation he became suddenly ferocious. A wave of mystical frenzy had swept over him. He slew the Turks and thanked God for His assistance in the slaughter."

কিন্তু সাময়িক আত্মবিস্মৃতি-আবিল দৃষ্টির ভুয়া দর্শন মিলিয়ে যেতে মরীচিকার মত দেরি হল না। 'ক্রিমিয়ান যুদ্ধে'র সময়ে তিনখানা বই লিখলেন তিনি। দ্বিতীয় বইতে অর্থহীন নরহত্যায় বিক্ষুব্ধ তলস্তয়; তৃতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় পৃথিবীপালদের প্রজাকে 'canon-fodder'-এ পরিণত করার বিরুদ্ধে জানালেন প্রতিবাদ।

রণক্ষেত্রের রক্তস্নাত পশু ও নরকঙ্কাল পরিকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তলস্তয় লাভ করলেন যে নূতন দৃষ্টি, নূতন বোধি, নূতন ধর্ম তা হচ্ছে: "The relig on of non-resistance, of international brotherhood, of universal peace."

১৮৫৬ সনে নবধর্মে দীক্ষিত তলস্তয় সৈনিকজীবন থেকে বিদায় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন সেন্ট্ পিতার্সবার্গে। তার আগেই তাঁর সাহিত্যখ্যাতির সৌরভে সমাচ্ছন্ন সমস্ত দেশ বিপুল অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত করল সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্যগুরুকে। কিন্তু তলস্তয়ের ওষ্ঠ পর্যন্তই মাত্র পৌঁছল প্রশংসার পানপাত্র; তিনি তার মদিরা পান করলেন না, প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ:

"…he found them to be an uncongenial lot of snobs. They regarded themselves as the elect, the intellectual supermen of their time, the glory and crown of creation. They wrote for the *Intelligentsia*, and looked upon the rest of mankind as unworthy to share in their exalted ideas. But Tolstoy's attitude was just the opposite of this. Literature to him was a religion—a holy gospel of beauty and wisdom that must become the common possession of all. *Instead, therefore, of writing to entertain the few, he wrote to* educate the many." [Living Biographies of Famous Novelists]

কিন্তু তলস্তয় এখানেই থামলেন না। জীবনকর্মে এই বিশ্বাসকে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর হলেন তিনি। শিল্প এতদিন যাঁর জীবন ছিল, সেদিনে 'জীবন' তাঁর কাছে শিল্প হয়ে উঠল। শিল্পী তলস্তয় জীবনশিল্পী হবার পথে প্রথমেই চাষাদের জন্যে—যারা অন্নহারা, বস্ত্রহারা, শিক্ষা-হারা, সর্বহারা তাদের জন্যে শুরু করলেন এক বিদ্যালয়।

গতানুগতিকতার সঙ্গে সারাজীবন সংগ্রামরত তলস্তয় তাঁর চাষার ছেলেমেয়েদের জন্য এই স্কুলও তৈরী করলেন সম্পূর্ণ নিজের মনের মত করে। অর্থাৎ তাকে স্কুলে পরিণত করলেন না, নিজেকে করলেন না তাদের মাস্টার:

"His methods were revolutionary. The pupils had the right not to go to school and even when in school not to listen to their teacher."

শাস্তি দিতে নারাজ মাস্টার পৃথিবীতেই বোধ হয় সেই প্রথম। পড়ানোর রীতিও অভিনব। মাস্টারও এই স্কুলে পড়ুয়াদের সতীর্থ:

"For he maintained that all of them were nothing more than children trying to spell out the first syllables in the mysterious book of life."

'সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে' গান উঠবে না যাদের বাতাসে, আলো জ্বলবে না যাদের আকাশে তাদেরই জন্যে তলস্তয় পাতলেন পথের ধারের পাঠশালা। দিনের আলো মিলিয়ে গেলে, শুরু হয়ে গেলে ঝিঁঝির ঐকতান, রাতের আসর গুরু এবং চেলাদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠত গানে, খেলায়, গল্পে। মাথার ওপর হাজার লক্ষ মাইল দূরে হাজার লক্ষ তারারা যেখানে আদিকাল থেকে অনাদিকালের দিকে নীরব উদ্দেশে অনিমেষ লোচনে কি ইঙ্গিত করছে বোঝা যায় না তারই নীচে মহুয়ার গন্ধে মাতাল রাতের বাসরে পৃথিবীর প্রথম বিদ্যার বোঝা-বাদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন গুরুগিরী-বরবাদ-গুরু তলস্তয়। বিদ্যালয় নয়, এই জীবনালয়

তলস্তয় এই আশায় প্রতিষ্ঠা করেন নি যে এই গানহারা প্রাণহারা সর্বহারার দল তাঁকে বুঝবে, কারণ :

'In working for the common people, he had no illusions about their intelligence." তবুও তিনি তাঁর জীবনের স্বপ্নকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, অপরূপ করে তুলতে চেয়েছিলেন নিজের এবং অপরের জীবনকে; তার কারণ তিনি বুঝেছিলেন যাদের বেদনা তাঁর বুকে বেজেছে তাদের অশিক্ষার কারণে তাঁকে অবিশ্বাসের উত্তর আঘাত নয়—সমবেদনা পুঁথির পাতায় লেখা শুষ্ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরানন্দ চর্চার দুর্গম বন্ধুর রাস্তায় মুক্তি নেই এই সব মানুষদের। এদের জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে, না হতে পারলে এদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার, কর্মে ও কথায় না অর্জন করতে পারলে এদের আত্মীয়তা, রোদে পুড়ে শীতে কেঁপে বৃষ্টিতে ভিজে না হতে পারলে এদের দুর্ভাগ্যের শরিক, প্রাণের আলোয় আলোকিত করতে না পারলে এ বিদ্যালয় ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁর উপন্যাসের নায়ক প্রিন্স নেখলুডভ তাঁর কথাই বলে যখন সে বলে :

"Go to the people to learn what they want···Try to understand their needs, and help them to satisfy these needs."

এই সময়ের একটি ঘটনার প্রতি তাঁর জীবনীকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কোনও রায়তরমণী-গর্ভে এই সময়ে অবৈধ প্রণয়ের পরিণামে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বড় হয়ে এই সন্তান—যার নাম রাখা হয় টিমথি, তলস্তয়ের বৈধ সন্তানদের কোনও একটি গাড়ির গাড়োয়ান নিযুক্ত হয়। তলস্তয়ের বাবার জীবনেও অনুরূপ দুর্ঘটনার ফলে জাত সন্তান অনুরূপ ভাবেই পারিবারিক গাড়োয়ানের পদ পান। সমারসেট মম্ ন্যায়সঙ্গতভাবেই এই প্রসঙ্গে না বলে পারেন নি যে :

"I should have thought that Tolstoy, with his troublesome conscience, with his earnest desire to raise the serfs from their degraded state, to educate them and teach them to be clean, decent and self-respecting, would have done at least something for his son."

এবং অতঃপর অনিবার্য প্রশ্ন করেছেন : "Did it cause Tolstoy no embarrassment when he saw the peasant who was his natural son on the box of his legitimate son's carriage ?"

এর কোনও উত্তর দেন নি মম্। কারণ তলস্তয় ছাড়া এর উত্তর দেওয়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না; সম্ভবতঃ তলস্তয়ের পক্ষেও অসম্ভব ছিল, কারণ, এই পৃথিবী অতি বিচিত্র জায়গা, কিন্তু 'তারও চেয়ে বিচিত্র মানুষের মন'।

তলস্তয়ের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের কথা এর আগে বলা হয়েছে অর্থাৎ চারিত্রিক সঙ্গতির অভাব, তারই ফলে তলস্তয়ের স্বপ্ন আর সাধনা দিয়ে তৈরী বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য বিদ্যালয় বন্ধের পেছনে পুলিসের হাত ছিল এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। অমিত উৎসাহ আর অপরিমিত হতাশার অন্তর্দ্বন্দ্বে আবহমান আলোড়িত তলস্তয়ের কর্মের তরঙ্গ নিস্তেজ হয়ে গেল হঠাৎ, আলো মুছে গিয়ে অমার অন্ধকার ঝাঁপিয়ে এল নানা রঙের আকাশ মসীলিপ্ত করে দিতে মুহূর্তে। যক্ষ্মায় মারা গেল তলস্তয়ের দু ভাই। তলস্তয়ের নিজেরও ধারণা হল যে তিনি যক্ষ্মাক্রান্ত। ফলে, "He lost his 'faith in goodness, in everything.' Once more he began to think of suicide."

কিন্তু অন্ধকারতম মুহূর্তেই বুঝি আকাশে জলে ওঠে অরুণোদয়ের প্রথম আভাস। মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনের প্রতি উন্মুখ করে তুলল এবারে যে সে সোফিয়া,—রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণে উজ্জ্বল আঠারো বসন্তের একটি শুবক বিহ্বল বিবশ করে দিল চৌত্রিশ বছরের শিশু তলস্তয়কে। সোফিয়াকে বিয়ে করলেন তিনি।

বিবাহের পর প্রথম এগার বছরে আটটি এবং পরবর্তী পনের বছরে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেন তিনি। এবং তলস্তয় এ সময়ে অবিচ্ছিন্ন আনন্দস্রোতে ভেসে যেতে যেতেই তাঁর এবং পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি অদ্বিতীয় সৃষ্টিরও জন্ম দেন। তাঁর এই সময়কার ছবি অনবদ্য ধরা পড়েছে তাঁর জীবনভাষ্যে :

"Tolstoy liked horses and rode well, and he was passionately fond of hunting. He improved his property and bought new estates east of the Volga, so that in the end he owned some sixteen thousand acres of land. His life followed a familiar pattern."

সেদিনকার রাশ্যার অভিজাতদের জীবনযাত্রার বাঁধা ছকের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই তলস্তয়ের এই দিনপঞ্জীর :

"There were in Russia scores of noblemen who gambled, got drunk and wenched in their youth, who married and had a flock of children, who settled down on their estates, looked after their property, rode horseback and hunted ;" [Great Novelists And Their Novels]

মিল কেবল বহিরঙ্গ নয়, বলেছেন ভাষ্যকার মম। তলস্তয়ের অন্তর্বাসনার অংশীদারও সেদিনকার রাশ্যায় নয় অপ্রতুল : "and there were not a few who shared Tolstoy's liberal principles and, distressed at the ignorance of the peasants, their dreadful poverty and the squalor in which they lived, sought to ameliorate their lot."

কিন্তু তাহলে তলস্তয় কেন তলস্তয় ? তলস্তয় কেন নন সেই বিস্মৃত অভিজাতদের একজন ? তার উত্তরও মমই দিয়েছেন অতঃপর : "The only thing that distinguished him from all of them was that during this time he wrote two of the world's greatest novels [illegible]War and Peace' and 'Anna Karenina [illegible]

উত্তর দেবার প[illegible]ারসেট মমের প্রায় এক নিঃশ্বাসে অনুচ্চারিত স্বগতো[illegible] স্মর্তব্য : "How this came about is a my[illegible]ery as inexplicable as that the son an[illegible]heir of a Stodgy Sussex squire should hav[illegible]written the *Ode to the West Wind.*"

এই রহস্যের যবনি[illegible] উত্তোলনের অপপ্রয়াস থেকে অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত মম বি[illegible] থেকেছেন। ঠিকই করেছেন তিনি। কারণ পঙ্গু [illegible]ও কখনও কি করে পর্বত লঙ্ঘনের জোর পায় ছু পায় এবং জন্মমূক কার খেয়ালে মুখর হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর মত অবাধ কলকণ্ঠে এ নিয়ে প্রশ্নই করা চলে কেবল, কিন্তু এর কোনও উত্তর হয় না ; আজ পর্যন্ত উত্তর দেয় নি কেউ এর ; দিতে পারে নি কেউ।

[ক্রমশঃ]

আগামী সংখ্যা হইতে শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় রচিত একটি উপন্যাস 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

১

মৃণাল সকালবেলায় হাসপাতালে গিয়ে শুনল ডাক্তার সমীর রায় ভোর হতেই নিজের ছাড়পত্র নিজেই যোগাড় করে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন।

মৃণাল জানলা দিয়ে বাইরে একবার পথের ওপর চেয়ে দেখল। পথের ওপর একটা লোক পিঠে কয়েকটা খালি নতুন টিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সকালের আলো সেই একটা টিনের গা থেকে ঠিক্‌রে লাগল মৃণালের চোখে। চোখে বুঝি আঘাত লাগল! তা না হলে দু চোখের কোণ করকর করে উঠবে কেন! নিজের মনে নিজেকেই বলল, পাগল!

মনের মধ্যে কোথায় একটু ক্ষোভ জমে উঠল। নিজের ওপর ক্ষোভ। আর কেউ না জানুক মৃণাল দেবী নিজেই জানে তার মন অহরহ অপেক্ষা করে রয়েছে কখন সেই হাতখানা এগিয়ে আসবে যে হাতটা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘুমের মধ্যেও।

সহসা সেই হাতখানা তার হাতের দিকে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে সেই হাতখানা সাহস করে ধরতে পারল না। নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করে, কেন? কে বাধা দিল ভিতর থেকে? সংস্কার? সাংসারিক শালীনতার সূক্ষ্ম ধারণা? না, অবিশ্বাস। মানুষের মধ্যে যা অতি সূক্ষ্ম তার প্রতি অবিশ্বাস। নিজের মধ্যেও যা সূক্ষ্মতম তার প্রতিও অবিশ্বাস। সমাজে মানুষ তার মোটা রূপটা নিয়ে চলে। এটাই সভ্য মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমাদের ভেতর যা সূক্ষ্ম তার প্রকাশ নেই আচরণে; সেটাকে প্রকাশ করার জন্যে শিল্প-সৃষ্টিকে আশ্রয় করতে হয়। যে প্রেম বুকের মধ্যে সঞ্চরণ করে কিন্তু মুখে আসে না, সেই প্রেমকে আমরা শিল্পের আকারে বাইরে আনি।

কয়েক নিমেষের জন্যে মৃণাল নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ফিরে এল নার্সের একটা মামুলী জিজ্ঞাসায়। জিজ্ঞাসু নার্সের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। তারপর তার জিজ্ঞাসাটার জবাব দিয়ে নিজের কাজে লেগে পড়ল।

* * *

সকালবেলায় স্নান সেরে অন্য সব দিনের মতই শীলভদ্র পড়ার ঘরে বসেছেন। টেবিলের ওপর রাশীকৃত দলিল-দস্তাবেজ। এই মাত্র আলমারি থেকে বের করেছেন।

সুস্মিতা এসে চা দিয়ে গেল। মুখ না তুলে বললেন, থাক্।—তারপর আগের মতই কাগজপত্রের স্তূপে কি খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন।

এর কয়েক মুহূর্ত পরে তাপস তার চিরাভ্যস্ত ভঙ্গীতে প্রবেশ করল। শীলভদ্র তার দিকে চেয়ে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। টেবিলের কলিংবেলটা টিপে হয়তো ভৃত্যকে ডাকলেন।

তাপস প্রবেশ করে পিয়ানোর কাছে পাতা ডিভানটার দিকে এক ঝলক চেয়ে শীলভদ্রের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। শীলভদ্র কাগজপত্রগুলোকে গুটিয়ে নিজের

অজ্ঞাতসারে কোলের দিকে টেনে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাপসের দিকে চেয়ে রইলেন।

তাপস শীলভদ্রের চোখের দিকে চেয়ে বুঝল এ সময়ে তার আসা ঠিক হয় নি। কিন্তু বুঝেও সে কুণ্ঠিত হল না। বিনা ভূমিকায় সে বলে বসল, আমরা মানুষের খুব অল্পই জানি জ্যাঠামশাই।

শীলভদ্র তার আচরণের ঔদ্ধত্যে পূর্বেই বিরক্ত হয়েছিলেন, তার ওপর এই মুহূর্তে এই রকম একটা তত্ত্ববাক্য শুনে অপমানিত বোধ করলেন। মনে ভাবলেন তাপস তাঁর নিজের ধারাটাকে অনুকরণ করে তাঁকেই অপমান করল। স্পষ্ট কথার পরিবর্তে তত্ত্ববাক্য বলা শীলভদ্রের নিজেরই স্বভাব।

শীলভদ্র গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, অতি অল্পই জানি।

তাপস তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, বরেনের প্রভাবে ওকে ছেড়ে দেওয়া মানে বরেনের কাছে আমাদের পরাজয় বরণ করে নেওয়া।

শীলভদ্র তাপসকে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে এসব কথা বলার মতো তার তখন অবসর নেই। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল থেকে তোমার বই রিলিজ্‌ড্‌ হয়েছে, না?

হ্যাঁ, কাল বিকেলে ছন্দার বক্স-অফিসের সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখলাম ও হনহন করে ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছে।

কে, সুস্মিতা?

হ্যাঁ।

তারপর?

তারপর সেখান থেকে ও বরেনের বাড়িতে গিয়েছিল।

কী করে জানলে?

দেখেছি।

তার মানে, তুমি ওকে অনুসরণ করেছিলে?

আমি না, অন্য একজন।

শীলভদ্র কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। তারপর কাগজপত্রগুলো টেবিল থেকে সরিয়ে ড্রয়ারে রাখতে আরম্ভ করলেন।

তাপস চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে আরম্ভ করল। জানলা দিয়ে শীতের সকালের সোনালী রোদ্দুর এল ঘরে। তার একটা ঢেউ লাগল পিয়ানোর ডালায়, আর একটা ঢেউ ভেঙে পড়ল রঙিন কার্পেটে।

শীলভদ্রের মনে হল এই সুন্দর সকালটা তাপসের দ্বেষে কালো হয়ে এল।

তাপস পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি ওকে এই অঘ্রাণেই বিয়ে করব জ্যাঠামশাই।

শীলভদ্র নিমেষের মধ্যে তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলেন, বেশ তো, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো।

আচ্ছা।— বলেই তাপস উঠল।

শীলভদ্র ভাবলেন তাপস তাঁর স্বরের তীক্ষ্ণতায় আহত হয়ে বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে লজ্জিত হলেন। এ বিয়ের প্রস্তাব তো তিনিই করে রেখেছিলেন অনেক আগেই। অনেক আগেই এ বিয়েটা দেওয়া উচিত ছিল। তিনি নিজেই দেরি করে দিয়েছেন। তাপসের অধৈর্য হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া ওদের মধ্যে আবার এক তৃতীয় ব্যক্তির বাধা এসে পড়ছে যখন।

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

ওর ঘরে।

শীলভদ্র বিস্মিত হয়ে তাপসের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। মুখটা কেমন পাঁশুটে হয়ে গেছে। ভেতরে কী একটা জ্বলছে। জ্বলছে দ্বেষ আর দ্বেষের সঙ্গে আরও কিছু।

শীলভদ্র ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বললেন, থাক্‌, আমিই ওকে এঘরে ডেকে দিচ্ছি। খবর না দিয়ে আমি নিজেও ওর ঘরে কোনদিন যাই নি। তুমি বস, আমি আসছি।

কলিংবেলের ডাকে এতক্ষণে একজন ভৃত্য এসে দেখা দিল। শীলভদ্র ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ কী করছিলে?

বাইরে গিয়েছিলুম বাবু—

কেন?

দিদিমণির চিঠি ফেলতে। বললেন এই সকালের ডাকে যাওয়া চাই।

আর কেউ ছিল না?

আজ্ঞে না, সকলেই বাইরে গেছে কাজে।

শীলভদ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে গেলেন, কেন, দিদিমণি তো ছিলেন? কিন্তু বলতে পারলেন না। দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে তাপস পায়চারি করছে। ঘুরছে ফিরছে আর তার মুখের ওপর আলো পড়ছে। আলো পড়ছে আর সে সেই আলোর দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাচ্ছে। যেন আলোটা ভয় পেয়ে সরে যায়।

তাপস আজ ধৈর্য হারিয়েছে। এতদিন সে বরেনের সঙ্গে সুস্মিতার পরিচয়ে মনে মনে দাহ অনুভব করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় সে যখন দেখল ও জানল সুস্মিতা প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত 'অভিসারে' বেরিয়েছে তখন সহসা তার মনে হল এই অন্তর্দাহ নিছক সস্তা ভাবালুতা (সেন্টিমেন্টালিজম) মাত্র। রূপসীর উপর সাহসীর অধিকার স্বাভাবিক। নারীপুরুষের সম্পর্ক মাটি আর লাঙ্গলের সম্পর্ক। এই উপমাটা মনে ভেসে উঠে তার ঠোঁটের কোণে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়ে তুলল।

বরেনের প্রতি সুস্মিতার আকর্ষণ থাকে তো থাক্। বিয়ের ব্যাপারে হৃদয়াবেগকে সে বড় বলে মানে না। এ বিয়ে তার কাছে উপলক্ষ্য। এ বিয়ে ঘটলে বরেন আঘাত পাবে ঠিকই তবে সেটা তার গৌণ লক্ষ্য। আরও পাঁচজন লোক নারীকে আয়ত্ত করে তার কাছ থেকে যেটুকু আশা করে সেটুকু পেলেই সে খুশী। নিজের কাছেই নিজের গূঢ় মনোভাবটাই যেন হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে গেল। ভাবল এ বিয়ে সে ব্যবসায়ের জন্যে কামনা করে।

৮

হয়তো এই বিয়ের প্রতি তার আকর্ষণটা সে এমনি করে নিজের কাছেও গোপন করতে চাইল। যে দুর্বৃত্ত নারীকে অপমান করে খুন করে, সে আত্মগোপন করার আগে সেই নারীর অলঙ্কারগুলোকে অপহরণ করে নিয়ে নিজেকে ও অপরকে বোঝাতে চায় সে খুন করেছে অলঙ্কারের মোহে।

মানুষের যে মন তার দেহের ঊর্ধ্বে বিরাজ করে সেই মন তাপসের স্পর্শের অতীত। তার কাছে অন্যের দেহের ওপর, আচরণের ওপর, কর্মের ওপর স্থূল অধিকারটাই পরম ও চরম লাভ।

অবিবাহিত শীলভদ্রের সঙ্গে সুস্মিতার একত্র বাসকে সে অন্তরে অন্তরে সন্দেহে বিকৃত করে দেখেছে। কিন্তু কোনদিন বাইরে তার মনের এই ভাবকে সে প্রকাশ করে নি। মনে মনে ভেবেছে সুস্মিতার প্রতি শীলভদ্রের যেটুকু দুর্বলতা সেইটুকু দুর্বলতার মূল্যস্বরূপ শীলভদ্র হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—একদিন তাঁর বিপুল সম্পত্তি তার হাতে সমর্পণ করে দেবেন। ভেবেছে এ দুর্বলতাটা কিছুই নয়। তেরো বছরের কিশোরী দেখে তিরিশ বছরে সেও তো আকৃষ্ট হয়। দুর্বলতা একটা হালকা ভুরভুরে নেশার মত। কিন্তু মারাত্মক নয়।

তা ছাড়া সুস্মিতা অসাধারণ সুন্দরী। লক্ষ নারীর মধ্যে একজন। কবে কলেজের কোন্ পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিল নায়িকাকে দেখে নায়ক বলেছিলেন, যে মুখের জন্যে হাজার হাজার জাহাজ ভেসেছিল সমুদ্রে, এ কি সেই মুখ!…হ্যাঁ, সুস্মিতার মুখ তেমনি একখানা মুখ।

তাপস সূর্যের আলোর দিকে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়ে মনে মনে উচ্চারণ করল—ও হেলেন…ও উর্বশী!

তাপসের পরলোকগত পিতা জাহাজী মাল খালাস করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আজ সেই অর্থ তাপস আর এক 'জাহাজী' কারবারে লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের এই অশিক্ষিত শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের শূন্য মনের খোলে ইউরোপ আমেরিকার নিম্নরুচির মাল বোঝাই করার কাজ। তাপসের নিজের ধারণা সেও একজন যুগন্ধর পুরুষ। এই যুগকে সে ছায়াচিত্র ব্যবসায় দিয়ে নতুন চেহারা দিচ্ছে। যেমন ফিনিসীয়রা প্রাচীন সভ্যতাকে রূপ দিয়েছিল তাদের ব্যবসায় দিয়ে। ব্যবসায়ের পথ বেয়ে তারা দিকে দিকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল এক দেশের পণ্য দেশান্তরে, এক দেশের ভাব অন্য দেশে, এক দেশের লিখনপদ্ধতি অন্য দেশে। তাপসের ধারণা তার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ও এমনি করে পৃথিবীর সভ্যতার চেহারা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে।

তাপসের কল্পনায় ভেসে উঠল—এই সুস্মিতা তার নতুন চলচ্চিত্রে অভিনয় করবে একদিন। নায়িকার ভূমিকায়। সেই ছায়াচিত্র দেখতে সহস্র সহস্র লোক

উন্মত্তের মত বক্স-অফিসের সামনে দাঙ্গা বাধিয়ে দেবে পুলিসের ব্যাটনকে উপেক্ষা করে। তৃতীয় শ্রেণীর 'কিউ'তে ছোকরারা ছাতা মাথায় একাদিক্রমে ছুটো-তিনটে সূর্যাস্ত পার করে বসে থাকবে। কাউণ্টার থেকে হুড়্‌হুড়্‌ জলধারার মত পয়সা নেমে আসবে।

তাপস আরও দ্রুতগতিতে পায়চারি আরম্ভ করল। তার গায়ের ঘননীল কোটটা ঘরের আলোয় সুতোর মধ্যে মাকুর মত দ্রুত যাতায়াত করতে শুরু করল।

কল্পনায় দেখল— জেমিনি হেরে গেছে, সোহ্‌রাবমোদী হিংসায় বারলেস্ক বা প্রহসনের ছবি তুলছে তাকে নিয়ে; সেসিল ডিমীল, আইজেনস্টাইন, পুডভকিন তাকে সমুদ্র-পার থেকে অভিনন্দন পাঠাচ্ছেন।

বিরাট প্ল্যাকার্ডে আঁকা সুস্মিতার একখানা নগ্নপদ প্ল্যাকার্ড থেকে উঠে এসে লক্ষ লক্ষ মনের ওপর মুদ্রিত হয়ে যাবে। একটা ফটোগ্রাফের নেগেটিভের কপি হয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ, লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে।

তারপর যেদিন ত্রিমাত্রিকে ওকে নায়িকা করবে সেদিন সারা ভারতবর্ষ ওর বাঁ পায়ের নীচে নিজের বুকটা পেতে দেবে। তাপস সুস্মিতাকে হেলেন তৈরি করবে, উর্বশী তৈরি করবে। কিন্তু তার নিজের কাছে ও বাঁধা থাকবে তার ভোগের জালে। তাপস উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে করতে সহসা হেসে উঠল। তার বনিতা কোটি কোটি মানুষের হৃদয় হরণ করে তাকে কুবের করে তুলবে। রূপ হল আলাদীনের প্রদীপ।

সুস্মিতা বাইরে চৌকাঠের ওধার পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ডেকেছিলেন?

হ্যাঁ, জরুরী কথা ছিল, ভিতরে এসে বস।

তাপস সুস্মিতাকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। কিছুদিন আগে সে নারীসৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই উলটে-পালটে দেখেছিল। বইটা চলচ্চিত্র পরিচালকের উদ্দেশ্যে লেখা। প্রথম লাইনে লেখা ছিল নারীর সৌন্দর্য একটা মনতাজ। শুধু এই একটা লাইনই তার মনে রয়ে গেছে। সেই বইটার একখানা ছবির সঙ্গে সুস্মিতার এই চেহারাটার মিল আছে। আলুথালু চুল কেঁপে উঠে তার কিশোরীর মত কচি মুখখানাকে ঘিরে রয়েছে। মুখখানা কিশোরীর, বাকী দেহটা বক্ষদেশ থেকে গুল্‌ফ পর্যন্ত— অতিপরিণত।

বসবে না?

সুস্মিতা ধীরপদে ঘরে ঢুকে পিয়ানোর কাছে নিচে ডিভানটায় দেহ টান করে বসে বলল, বসলুম, বলুন।

সুস্মিতার গলার স্বরে লেশমাত্র অনুভূতির লক্ষণ নেই। তাপসের মনে পড়ল মাসাজহোমের পরিচারিকাদের গলা স্বর। তাপসের উত্তেজনাতপ্ত মনের ওপর কার যে হিম হাতের স্পর্শ লাগল।

কিন্তু দমবার পাত্র নয় সে। নিজের অজ্ঞাতসা মাটিতে গোড়ালি ঠুকে ভিতরের তাপটাকে যেন আব জাগিয়ে তুলল।

গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বিয়ে য অঘ্রাণেই হয় তাতে তোমার আপত্তি আছে?

সুস্মিতা যেন তন্দ্রার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উ দেয়, বিয়ে কি না করলেই নয়?

সুস্মিতার অবশ তন্দ্রালু ভাব দেখে তাপসের আবার ফিরে এল। তার মনে হল এ বুঝি আত্মসম পূর্বে মনের অবশ ভাব। ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হ উঠল। সুস্মিতার এই অবশ ভাবকে গাঢ়তর ক উপায় ভাবতে ভাবতে স্টুডিও-অভিনয়ের কলাকৌ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্লেষণ করে স্থির করল এ অব আবেগপ্রধান কিছু বলতে হবে। মনে পড়ল ছেলেবে দোল উৎসবের সময় এক যুবতীর চোখে আবীর ছু নিমেষের জন্য তাকে অন্ধ করে সেই নিমেষের ম তার প্রতি উদ্ধত চপল ব্যবহার করেছিল।

তাপস অনতিদূরে একটা খাড়া পিঠওয়ালা চেয়া হাতলে দু হাত রেখে সুস্মিতার দিকে চেয়ে রইল। কোন সাইকোঅ্যানালিস্ট মনোবিকারের কোন রোগি দিকে চেয়ে রয়েছে।

মনে মনে বলল, ওকে আমার শীগগির চ আভাকে নায়িকা করে নতুন বইটা দাঁড় করানো শ আভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজসজ্জার অন্তরালে অস্ফুট থে যায়। অতিরিক্ত স্ফুট করার চেষ্টা করলে সে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠতে পারে। নারীদেহের সম্মুখের পশ্চাতের যে ভার দিয়ে পুরুষের চিত্তদলন করা যা

ভার নেই আভার দেহে। আভার ওপর ভরসা করে এতগুলো টাকার ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

চাপা উত্তেজনায় তাপস ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠল। সিলিংয়ের পাখাটায় সুইচ টিপে তাকে এক পয়েণ্টে চালিয়ে দিল।

সুস্মিতা ডিভানের ঠেসের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে। হাত দুটোকে এমন ভাবে ভাঁজ করে ফেলে রেখেছে ঠেসের ওপর যে তার মুখখানাও আড়াল হয়ে গেছে তাপসের দৃষ্টি থেকে। তাপসের মনে হল ও যেন এক নিমেষেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার শ্রোণী পর্যন্ত লম্বিত বেণীর আগায় কালো সুতোর ঝালরটা উপরের বিজলী পাখার দ্রুত হাওয়ায় কাঁপছে। ঘাড় থেকে স্খলিত শাড়ির সাতরঙা পাড়টাও কাঁপছে থরথর করে। তাপস সুস্মিতার অনাবৃত ঘাড় থেকে শ্রোণী পর্যন্ত কম্পমান শাড়িটার ওপরে চোখ বুলিয়ে গাঢ়স্বরে অভিনয়ের সুরে কথা বলতে আরম্ভ করল।

রেডিয়োটা খোলাই ছিল। কোনো বেতারকেন্দ্র থেকে সরোদ বাজনা ভেসে আসছে। এই ঘরের দেওয়ালগুলো আসমানী রঙে রাঙানো। তাদের গা থেকে ঠিকরে পড়েছে আলো মেঝের কাশ্মীরী কার্পেটের ফুলের অরণ্যে। তাপসের মনে নেশা জমেছে। অপূর্ব নাটকীয় পরিবেশ।

তাপস শুরু করেছে, ভালবাসা কী তা তুমি যদি জানতে সুস্মিতা!

সুস্মিতার তন্দ্রাচ্ছন্ন মাথার মধ্য দিয়ে একটা কথা ভেসে যায়: ভালবাসা একটা উপায়!

ভালবাসা কী তা তুমি যদি জানতে সুস্মিতা! এ যেন— এ যেন সমুদ্রের তলাকার স্রোত!

তাপসের সামুদ্রিক ভাষায় প্রেমনিবেদনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আরও কয়েকটা মুহূর্তকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে সুস্মিতা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই কলধ্বনির কিছুই তার কানে প্রবেশ করে নি।

বক্তৃতার শেষে তাপস সুস্মিতার কাছে সরে এসেছে। উত্তর দিলে না সুস্মিতা?

পাতলা ঘুম সহজেই ভেঙে গেল।

সুস্মিতা তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, উত্তর? কিসের উত্তর?

সুস্মিতা তন্দ্রার ঘোরে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল, তারপর একচক্র ঘুরে তাপসের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিসের উত্তর?

সুস্মিতার চোখেমুখে ঘুমের ছাপ। সে যে সহজ মানসিক অবস্থায় নেই তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

সুস্মিতা এতক্ষণ ডিভানের ঠেসে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, কোনও কথাই তার শোনে নি। গলন্ত লোহা যেমন বালির ছাঁচের ওপর তৈরি ছোট ছোট নালীপথে ছড়িয়ে পড়ে ঢালাই হয় তেমনি এই জ্ঞান তাপসের মস্তিষ্কের সহস্র নালীপথে জলন্ত তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আগুন লাগল তার মাথায়।

তাপসের মুখের ওপর এই জ্বালার আভাস সুস্মিতা তন্দ্রার ঘোরেও টের পেল।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাপস পাশের দরজা দিয়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

বাইরে তার বুইকখানা দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বিদ্যুৎ-হর্নের একটা বিলম্বিত আর্তনাদ করে গাড়িখানা সাঁ করে বেরিয়ে চলে গেল। প্রবেশপথের কাঁকরে কড়কড় শব্দ উঠল।

নিজের শোবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে সুস্মিতা দেখল তাপসের ঝকঝকে কালো রঙের বৃহৎ কীটের মত গাড়িখানা শহরের অরণ্যে হারিয়ে গেল— একটা ক্ষুব্ধ আর্তনাদ ও দাঁত কড়মড়ানির শব্দ পিছনে রেখে।

সুস্মিতার চোখ থেকে চশমার মত ঘুমটা হঠাৎ খুলে পড়ে গেল। ঘুমটা বুঝি মনের ভান। মনে হয় সে নয় অন্য কেউ তার মধ্যে জেগে রয়েছে।

কী আছে তার মধ্যে যে তাপস তাকে শুধু লোভের দৃষ্টিতে দেখে?

তাপসের লোভাতুর জলন্ত চোখ দুটো সে যেন এখনও সামনে দেখতে পাচ্ছে। সেই চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যেই যেন চোখ মুদল ক্ষণিকের জন্য।

* * *

এদিকে শীলভদ্রের পড়ার ঘরে তাপসের চালিত

দেওয়া বিদ্যুৎ-পাখাটা আপনার বেগে আপনিই ঘুরে চলেছে।

৯

সন্ধ্যার পর। তাপসের স্টুডিও। গেটের ওপর লতা-ঢাকা আর্চের মাথায় একটি নিঃসঙ্গ আলো। আর তার নীচে একরাশ ঘোর লাল রঙের ফুল। কাগজের ফুলের মত।

স্টুডিয়োর ভিতরে টেনিস মাঠের ধারে আভা তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে দাঁড়িয়ে আছে তাপসের অপেক্ষায়। তাপস তাকে প্রতিদিনের মত আজও তার বাড়ির গলির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে বলে।

আভার চোখে, প্রখর ধারাবর্ষী আলোকে লনের ছাঁটা ঘাসের সবুজ ভেলভেটের মত মনে হচ্ছে। এই সবুজ ভেলভেটের ওপর সাদা ক্যানভাসের জুতোয় মোড়া কয়েক জোড়া পা চপল হয়ে উঠেছে। ওই পাগুলোর দিকে চেয়ে আভা এক ধারে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। সাহস করে কারুর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে পারছে না। দারুণ লজ্জা অসহ্য চাপে তার মাথাটাকে মাটির দিকে নুইয়ে দিয়েছে।

আভা বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের একজন। যাদের বাবারা হয় পাড়াগাঁয়ের জমিদারের গোমস্তা বা উকিলের কেরানী বা প্রাথমিক শিক্ষক বা যাজক ব্রাহ্মণ বা শহরের কেরানী বা ড্রাইভার বা ট্রামের কন্ডাক্টর।

কৈশোর থেকে সে তার শ্রেণীর আরও সব মেয়েদের মত নিজের দেহকে ঢেকেঢুকে চলতে অভ্যস্ত। আবরণের নীচেই এদের দেহে অলক্ষ্যে যৌবন আসে। দেহের যে যে অংশে সে নারী সেই অংশগুলোর ওপর তার নজর পড়ে কৈশোরের প্রথম থেকেই। এই বয়স থেকেই পুরুষের সাক্ষাৎমাত্রেই এদের হাত অজ্ঞাতসারে দেহের রমণীচিহ্নগুলোর ওপর আবরণ রক্ষার জন্য বিব্রত হয়ে ওঠে। আভার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

শৈশব থেকেই আভা একটু-আধটু নাচত। যখনই নেচেছে তখনই পোশাকে সারা অঙ্গ ঢেকে নেচেছে।

তাপসবাবু কিছুদিন পূর্বে তার এই ধরনের নাচকে পুতুলনাচ বলে উপহাস করেছিলেন। সেদিনও তাপসবাবু বিদ্রূপ করে বলেছেন, আর কতকাল পুতুল থাকবে আভা, এবার মানুষ হও।

আভা যে অনভিজ্ঞা বালিকা এ কথা স্টুডিয়োর সবাই সুযোগ পেলেই বলে থাকে। প্রবেশপথের পাহারায় যে ছোকরা নেপালী দারোয়ান বসে থাকে সেও একদিন হেসে বলেছিল, টফি লাউ, দিদিমণি!

আভার বয়স এখনও ষোল পেরোয় নি।

কিন্তু আভা মোটেই অনভিজ্ঞা নয়। নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের পরিবেশে যেখানে একটিমাত্র শয়নকক্ষের পরিসরের মধ্যে পারিবারিক জীবন ব্যয়িত, যেখানে প্রণয়ের পরিসর ক্ষুদ্র, কলহের পরিসর সঙ্কীর্ণ, যেখানে মানুষের দশাবস্থার সব কয়েকটা অবস্থা কয়েক বর্গ-হাতের মধ্যে অতিবাহিত হয়, সেখানে কিশোরীর মন বয়সের বহু পূর্বে তার বয়সনিষিদ্ধ বহু জ্ঞান আহরণ করে।

আভা লনের পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজকের দুপুরে তার নাচের মহড়ার স্মৃতিটা রোমন্থন করছিল। রোমন্থনের জন্য যে স্মৃতিটা উঠে এল সেটা এত তিক্ত যে তাকে কিছুতেই আত্মসাৎ করে ভুলে যেতে পারছে না।

* * *

স্টুডিয়োর ভিতরে ইউরোপীয় ব্যালে নাচের পোশাকে ডিরেক্টরের সামনে বহুক্ষণ ধরে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে আভা। হাত দুটোকে পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে ধরেছে সামনে। ফোটা ফুলের মত কোমরের ছোট্ট ঘাগরাটা পাপড়িগুলোকে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে রেখেছে। লজ্জায় চোখ দুটো নিজের থেকেই প্রায় মুদে এসেছে।

হঠাৎ ডিরেক্টরের অট্টহাস্যে চমকে উঠল। ডিরেক্টর বললেন, তোমার আবার লজ্জা? তোমার শরীরে লজ্জা পাবার মত কিছু নেই।

কী যে লজ্জা তা আভা নিজেই জানে। প্রকাশ করার মত ভাষা নেই তার।

ডিরেক্টর আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গর্জন করে উঠলেন, পয়সা নিচ্ছ, দরকার হলে উলঙ্গ হয়েও নাচতে হবে।

আভার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণের মত খেলে

গেল—পয়সা, পয়সা, পয়সা! টাকা! কত পোশাক! কত অলঙ্কার! পয়সার জন্য নাচছি! লজ্জা কি!

এইটুকু সময়ের নিরাবরণ লজ্জা পরে কত দুর্মূল্য আবরণ আর আভরণ দিয়ে সে ঢাকতে পারবে পয়সা হলে! তবু অসহায়ের মত একবার আমেদের দিকে চোখ ফেরাল। আমেদ বলল, একবারেই ওর জড়তা কাটবে না। কয়েকটা দিন সময় নেবে।

ডিরেক্টর তিক্তস্বরে বলেন, তোমার কাজ তুমি কর আমেদ। কয়েকটা সীটিং অর্থাৎ বসার পর কয়েকটা লায়িং অর্থাৎ শোয়ার দরকার। তাহলে এসব জঞ্জাল ভেসে যাবে। হা হা হা!

স্টুডিয়োর কোটোটার মধ্যে হাসিটা একটা বন্দুকের মত এদিক-ওদিক গড়িয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে ভেঙে-চুরে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ কী যেন একটা চুরমার করে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল।

আভা যেন নেশার ঘোরে নাচল। গত এক মাস ধরে এ নাচটার তালিম নিয়েছে সে। তবু দেহটা প্রথমে নড়তে চায় নি।

সারা দেহ সঙ্কোচে শুকনো আঠার মত জড়িয়ে ছিল।

কিন্তু সামনের বড় আয়নার দিকে নিনিমেষে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে অর্ধ-অনাবৃত দেহের নেশা তার মনেও সঞ্চারিত হল। মনের ওপর এতকালের লজ্জার আবরণ যেন কয়েকটা মুহূর্তে স্খলিত হয়ে পড়ল। কয়েকটা মুহূর্ত ডিঙিয়ে আভার কৈশোর পরিপূর্ণ যৌবনে পা দিল। সারা দেহ ঝনঝন করে উঠল অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কারে।

অনঙ্গের অসংখ্য আবেদনে তার দেহ মুখর হয়ে উঠল। এ যেন সমুদ্র মন্থনে বাসুকীর মুখনিস্থত বিষফেনের উপর উর্বশীর আবির্ভাব।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখল শট নেওয়া হয়ে গেছে। কেউ আর কোনও কথা বলল না, সবাই যে যার কাজ বা খেয়ালের পিছে চলে গেল। কিন্তু নাচ শেষ করে আভা আর মাথা তুলতে পারল না। তাই টেনিস লনের ধারে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

তাপস আজ সারাদিন কাজের ঘূর্ণিতে সারা কলকাতায় ঘুরেছে, তবু তার মধ্যে যে পশুটা সকালবেলায় স্মিতার কাছে আঘাত পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সে শান্ত হয় নি। মনের গোপন গুহা থেকে বেরিয়ে সে অশান্ত হয়ে উঠেছে। একটা শিকার না পেলে সে হয়তো আর তার নিজের গুহায় ফিরবে না। আর, অদৃষ্টের এমনি যোগাযোগ যে, ঠিক এই দিনেই রাত্রির ছায়ায় একটা নিরীহ শিকার সারাদিনের তাড়নার পর তারই ঘরের কাছের অরণ্যে একটু নিভৃত বিশ্রামের অবসর খুঁজছিল।

তাপস যে কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আভা তা বুঝতে পারে নি। তাপস যখন বলল, "চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দি আভা" তখন সে রীতিমত চমকে উঠল।

তাপস আভাকে প্রত্যহ রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দেয়। আভাদের বাড়ি পর্যন্ত যায় না। যে গলিটার মধ্যে আভাদের বাড়ি সেই গলিটার মুখে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিজের পথে চলে যায়।

আভার পরিবারের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গতা করতে চায় না, আভাও তাকে এই অন্তরঙ্গতার মধ্যে টানতে চায় নি। তাপসের সঙ্গে নিজের সামাজিক পার্থক্যটা মেনে নিয়েছিল।

জেনেছিল তাপসের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিছক ব্যবসায়ের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ভিতর একটুকু ছোঁয়া, একটুকু মাখামাখি ছাড়া অন্য কিছুকে আসতে দেয় নি। তাপসও এইটুকু ছাড়া চায় নি।

আজ তাপসের যেন বারবার দিক্‌ভ্রম হচ্ছে। এ রাস্তা ও রাস্তা করে সে যেন দিক্ ঠিক করতে পারছে না। বারবার রাস্তা ভুল হচ্ছে। মাঝে মাঝে বলছে, এ কি, এ কোথায় এলাম! আভা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠছে। ভালই লাগছে এই গাড়ি করে ঘুরতে। গাড়ির ভেতরটায় বেশ গরম। বাইরে পাতলা কুয়াশা নেমেছে। না, এরকম করে আর খুঁজে পাব না। শহরের মধ্যে না গেলে আর রাস্তা চিনতে পারব না। বলল তাপস।

আভা বলল, তাই চলুন। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে। তাপসের পথ ভুল! বিশ্বাস হয় না। সহসা চকিতের জন্য আভার মনে হল তাপস ইচ্ছে করে কী একটা খেলায় নেমেছে। কিন্তু ভয় হল না। আজ বিকেলের অভিজ্ঞতার পর তার মধ্যেও একটা অস্থিরতা জেগেছে। তাই এই খেয়ালটাও ভাল লাগছে।

আভা আবার বলল, তাই চলুন। আকাশে চাঁদ উঠেছে দেখছি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লটাকে ঘুরে এলেও তো হয়।

তাপস একটা ছোট্ট হুঁ বলে গাড়িটাকে মন্থর গতিতে চালিয়ে দিল শহরের কেন্দ্রের দিকে।

গাড়িটা যেন দুলতে দুলতে চলেছে। আভার মনে হল কে যেন তাকে চতুর্দোলায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য এক বাসরের দিকে।

গাড়িটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে একটা চৌমাথায় এলে তাপস গাড়ির ভেতর আলোটা জেলে দেখল আভা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে। এই ফাঁকটুকুর মধ্যে মুক্তোর মত কয়েকটি দাঁত ঝিক্‌মিক করছে। নীচেকার ঠোঁটটা ঈষৎ শিথিল হয়ে পড়েছে। শিথিল হয়ে পড়েছে বুকের ওপর সিল্কের ব্রেশিয়ের, খুলে পড়েছে আঁচল।

মনে পড়ল স্মিতার ঘুম। এই ঘুমের ওপর সে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল।

এই যে মেয়েটাকে সে জনবিরল পথের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে এর আর স্মিতার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একই মাংসে গড়া দুটো মানুষ। একই আকার প্রকার কপাল থেকে কোমর পর্যন্ত। কোমর থেকে পা পর্যন্ত।

তাপসের বিকারপ্রাপ্ত চোখে স্মিতা আর আভা এক হয়ে গেল। তবু একে পৌছে দিতে হবে। নিশ্চিন্ত আরামে সুপ্ত এই দেহটাকে তার 'তাকে' পৌছে দিতে সে স্টীয়ারিংয়ে ঘুমজড়িত চোখে বসে বসে কুয়াশার ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এখন এই ঘুমন্ত শহরের পথের দু ধারে অট্টালিকার 'তাকে তাকে' এমনি সব মেদপিণ্ড তোলা রয়েছে সযত্নে।

সহসা তাপসের মাথাটা দুলে উঠল। সে ধর্মতলার মোড় থেকে হঠাৎ গাড়িটাকে একটা আধো অন্ধকার গলির পথে চালিয়ে দিল। গ্যাসের পাণ্ডুর আলো কুয়াশায় মিশে মুমূর্ষু হয়ে গেছে এই সুড়ঙ্গে।

তাপসের গাড়িটা যখন ঢুকল তখন এই সুড়ঙ্গটা সুরের ঢেউয়ে কাঁপছে। কাছাকাছি কোথায় কে বেহালা বাজাচ্ছে। সেই সুর এই মৃতের সুড়ঙ্গে কাকে যেন খুঁজে ফিরছে।

১০

স্টুডিয়ো থেকে ফিরে এসে আমেদ তার তিনতলা হোটেলের উপর-তলার কক্ষটিতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে সন্ধ্যার পর থেকে সেই যে বেহালার সুরে মুগ্ধ হয়ে গেছে সেই মোহের ঘোর এই রাত্রি দুপুর পর্যন্ত কাটে নি। একটা অশরীরী শক্তি তাকে আশ্রয় করে সুরে কথা বলে চলেছে। কখনও কাঁদছে, কখনও ডাকছে। খেয়ার এপার থেকে রাত্রি-পাওয়া যাত্রী যেমন ওপারে বাঁধা নৌকোয় ঘুমন্ত খেয়ারীকে ডাকে!

একটা আশালেশহীন ভবিষ্যৎ আর একটা প্রাণ-ক্ষয়কারী অতীত দুটোতে মিলে আজ সন্ধ্যার পর থেকে আমেদকে অধীর করে তুলেছে।

আজ বিকেলে আভাকে অর্ধ উলঙ্গ করে নাচিয়ে তাকে যন্ত্র করে ডিরেক্টর যা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে সমস্ত সুরের বিরোধ। সুর দূরে যাক, তাকে হাটবাজারের কথ্য ভাষায়ও প্রকাশ করলে ভাষার অপমান করা হয়। এই অস্ফুট-যৌবনা, এখনও কিশোরী, এর দেহমনকে এক পৈশাচিক উত্তেজনা প্রকাশের উপায়রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যারা এর জন্যে দায়ী তাদের ক্ষমা নেই। এই প্রচেষ্টাকে আভার সুপ্ত মনুষ্যত্ব একদিন ধিক্কার দেবেই যখন তা দুঃখের আগুনে তপ্ত হয়ে জাগবে। অথচ জীবনের এমনি পরিহাস যে, আমেদকেই এই জঘন্য ভাবকে সুরে অনুবাদ করতে হয়েছে। এই অনুবাদের মধ্যে আমেদ সকলের অজ্ঞাতে একটা গোপন হাহাকারের সুর দিয়েছে মিশিয়ে।

শুধু দেহাশ্রিত ভাবের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হাহাকার আমেদ সর্বদাই শুনতে পায়। তবু এ কাজ তার পক্ষে পাপ

হায় রে, বাইশ বছর! আমেদের বয়স বাইশ।

যে এতদিন ধরে অরফিউসের মত ইউরিডিসিকে খুঁজেছে সে আজ জীবন-দেবতার কাছে দেওয়া শপথ বিস্মৃত হয়ে বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল! মনে পড়ল নিজের

অতীতটা। তার জন্মভূমি বীরভূমের রাঙামাটির গেরুয়া পরে কল্পনায় সম্মুখে আবির্ভূত হল।

বীরভূমের যে অংশে হাজারীবাগ প্রবেশ করেছে তার অভ্রবহুল উঁচুনীচু ভূমির ঢেউ নিয়ে, তার শাল মহুয়ার বন নিয়ে, তার নুড়ির নূপুর-পরা ঝরনা নিয়ে, তার 'বনতিতির' নিয়ে— সেই অংশে একটা ছোট্ট গ্রামে আমেদের জন্ম। সেই রাঙামাটির অভ্রঝলমল অঞ্চলে, পুষ্পিত শাল মহুয়া বনের গন্ধমন্থর হাওয়ায়, নুড়ির আঘাতে ব্যাহতগতি ঝরনার অস্ফুট কলধ্বনির রাজ্যে তার মনে সুরের জন্ম। প্রতিবেশী আদিবাসীদের মাদলের সুর, উচ্চনীচ বন্ধুর ভূমির ওপর আষাঢ়-মেঘের বিলম্বিত গুরুগুরু ধ্বনি, ঝড়ের মুখে ঘন শালবনের গম্ভীর আহ্বান, ঝরনাদের তরল জলতরঙ্গের 'বেরিয়ে চল বেরিয়ে চল' এই প্রগল্‌ভ বাণী কৈশোর থেকেই তার চিত্তকে বিবাগী করেছিল। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তার দেশের আউল-বাউলের ঘরছাড়ানো গান, উদাস-করা সুরের দূরের হাতছানি।

কিশোরের মন পাঠ্যপুস্তকের মূক অক্ষরের খাঁচায় বাঁধা পড়ল না। তবু নিছক আত্মপীড়ন করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

তারপর যৌবন এল। যে বিস্ময় এতকাল ছড়িয়ে ছিল শালবনের সবুজের নিঃশব্দ চিৎকারে, অভ্রছড়ানো লাল মাঠের কোলে সূর্যাস্তের গাঢ় বেদনার রঙে, ঘননীল আকাশে, ঝরনার চাঞ্চল্যে তা একদিন বাইরের ভুবন থেকে সরে এসে চিত্তের কেন্দ্রে সঞ্চারিত হল। সহসা একদিন সকলের অজ্ঞাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পরিব্রজায়। সুরের সন্ধানে। একখানা বেহালা সম্বল করে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ আজমীড় মথুরা দিল্লী, পথের ধূলি মাখল কিছুদিন। কিছু পেল সঙ্গে সঙ্গে হয়তো, কিছু হারাল। কয়েক বছর পরে ফিরে এল কলকাতায় প্রতিষ্ঠা আর জীবিকার সন্ধানে।

সারা পৃথিবীতে তখন যুদ্ধ চলেছে। কলকাতায় এসে এক যুদ্ধপলাতক বৃদ্ধ ইহুদীর সংস্পর্শে আসে। এই বৃদ্ধ ইহুদী পোলাণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁর যুবতী কন্যা কোলাপোভার হাত ধরে। পথে এক বন্দরে কোলাপোভা হারিয়ে যায়। তার পর থেকে বৃদ্ধ দেশে দেশে তাঁর সেই হারানো নয়নের মণিকে খুঁজে ফিরছিলেন। খোঁজ করতে করতে একদিন ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হন। এখানে এসে তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সঙ্গীতের শিক্ষকতা শুরু করেন এখানে। সেই সূত্রে আমেদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

এই ইহুদীর মুখে আমেদ ইউরোপীয় সঙ্গীত-জগতের মহারথীদের কীর্ত্তির কথা, সাধনার ইতিহাস ও বেদনার কাহিনী প্রথম শুনল। এই বৃদ্ধ গুরু তাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের রহস্যে দীক্ষিত করলেন। এঁর সংস্পর্শে এসে আমেদ জানতে পারল সুরের পৃথিবীটা একই।

তালিমের ফাঁকে ফাঁকে এই বৃদ্ধ এই বিদেশী শিষ্যকে গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী শোনাতেন।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীকে তিনি মানবাত্মার শাশ্বত কাহিনীর রূপক রূপে বর্ণনা করতেন। মনে পড়ে, একদিন তিনি অরাফউস ইউরিডিসির কাহিনীকে আধুনিক সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনরূপক রূপে বর্ণনা করেছিলেন।

গ্রীকেরা বলেছে নরক থেকেই ইউরিডিসিকে উদ্ধার করতে হবে। সে তোমার পিছে পিছে ছায়ার মত আসবে। ফিরে তাকিয়ে তাকে দেখতে যেয়ো না, তাহলেই সে হারিয়ে যাবে। শিল্পী অরফিউস আর তার প্রিয়া এই ছায়ামূর্তি ইউরিডিসি। এই ইউরিডিসির জন্যে তোমার আকাশ পৃথিবী কাঁদছে। শোন বেটোফেন, শোন মোৎসার্ট, শোন চাইকভ্‌স্কি, তাহলেই বুঝবে। আজ নতুন মানুষ বলছে তুমি পাতাল জয় করে ইউরিডিসিকে নিজের বীর্যে উদ্ধার কর। আধুনিক সভ্যতার এই পাতাল। কে জয় করবে এই পাতালকে? যারা এই পাতালকে জয় করেছে বা যারা হাজার হাজার বছরের গ্লানিভরা এই পাতালে জয়যাত্রা শুরু করেছে তারা কি পাতাল থেকে ইউরিডিসিকে উদ্ধার করতে পেরেছে?

আভাও ইউরিডিসির ছায়া। আমেদ ফিরে চেয়েছিল বলেই বুঝি ও মিলিয়ে গেল। বিদ্যুতের ঝলকের মত আভার এই অনুপম উপমাটা মনের মধ্যে জেগে মিলিয়ে গেল।

স্টুডিও থেকে ফিরে হোটেলে তার তিন তলার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে নীচে চলমান ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-লক্ষ্য-সার করে

নেওয়া মানুষের জনতাকে দেখে আর ভাবে কী করে এদের সে তার সন্ধানের অর্থ বোঝাবে? আমেদ কী করে ওদের বোঝাবে যে তার চেতনার ওপর যে প্রিয়ার আভাস ছড়িয়ে রয়েছে তাকেই সে সুরের রাজ্যে খুঁজতে বেরিয়েছে? সে সুর বেচতে বেরোয় নি।

জানলার ধারে খাটখানাকে টেনে এনে তার কানায় বসে আমেদ বেহালা বাজাচ্ছে।

এই রাত্রিতে তার আত্মা এই বেহালার তারগুলোর ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওপরে আকাশে ঘন কালো মখমলের ওপর মণির মত তারার দল কার গতির চাঞ্চল্যে কাঁপছে।

আর তার পায়ের নীচে থেকেই পাতাল আরম্ভ। দোতলার মাসাজ ক্লিনিক থেকে এই পাতালের সুর শুরু হয়েছে।

ওই যে সামনের ফুটপাথে আলোর নীচে বিকলাঙ্গ ভিখিরী এখনও ভিক্ষার আশায় গোঙাচ্ছে। বোধ হয় ও নারী। ওই যে দু-একজন মানুষ কামনার উত্তেজনায় ছাই-হয়ে-পুড়ে-যাওয়া নিরক্ত মুখে আজ রাত্রির মত নিজের নিজের কোটরে ফিরছে। ওরা গ্রীক কাহিনীর সিসিফাস। জড় লোভের বিরাট পাথরটা সারাদিন ঠেলে ঠেলে যেখানে তুলেছিল সেটা এই রাত্রিতে আবার ওদের বুকের ওপর দিয়ে পাতালে গড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ ট্যাণ্টালাস। তৃষ্ণার জলপাত্র দিনের দোলায় ওদের ঠোঁটের কানায় ঠেকেছিল, আবার রাত্রির ফিরতি দোলায় সেটা দূরে সরে গেছে। ওরা সবাই এই পাতালের বাসিন্দা। ব্যর্থ মনুষ্যত্বের নরক।

ওদের দিকে চোখ ফেরালেই প্রিয়া ইউরিডিসি মিলিয়ে যায়। সমস্ত প্রাণ কেঁদে ওঠে, ইউরিডিসি! ইউরিডিসি! শাহাজাদি! শাহাজাদি!

তার বেহালায় আকুল ডাক জাগে— শাহাজাদি! ইউরিডিসি!

* * *

তাপসের গাড়িটা আমেদের হোটেলের গলিতে এসে একেবারে অনড় হয়ে পড়ল। যেন অদৃশ্য পঙ্কে তার চাকা বসে গেছে।

অন্ধকার বাড়ির স্বল্পালোকিত সিঁড়ির মুখে দরজাটা খোলা। তার ওপর একটা রঙচটা সাইনবোর্ডের ওপর একটা ম্লান বাল্‌বের আলো। এই মুমূর্ষু আলোটা নিঃশব্দে একটা নাম পড়ছে। ইণ্টারন্যাশনাল মাসাজ হোম!

তাপস ঘুমন্ত আভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আভা ঘুমের ঘোরে চোখ মেলে দেখল। বোধ হয় ভাবল স্বপ্ন কিংবা ভাবল কে তাকে চতুর্দোলায় বসিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য এক বাসরের দিকে!

তাপস আভাকে তুলে নিয়ে একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। আভা আবার চোখ মেলল নিমেষের জন্যে।

হঠাৎ একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। পরমুহূর্তেই একটা চাপা ক্রুদ্ধ ধমকে চুপ করে গেল। দোতলার দরদালানের দূর কোণে টুলে বসে এক বৃদ্ধ হোটেল-বয় তন্দ্রার আবেশে ঝিমচ্ছিল। তাপসের ক্রুদ্ধ ধমকে সে চমকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে যন্ত্রচালিতের মত তাকে সেলাম জানাল। তারপর ট্রাফিক পুলিসের মত বাঁ হাত বাড়িয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিল।

তাপস আভাকে সেই ভাবে কোলে নিয়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেল। বাইরের একটা বড় বাড়িতে ঢং ঢং করে কয়েকটা বাজল। শোনার মত মানুষ এ তরফে কেউ বুঝি জেগে ছিল না।

* * *

আমেদের বেহালায় তখন একটা সুর থরথর করে কাঁপছিল। বেহালাটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল— শাহাজাদি! শাহাজাদি!

তাপস মুহূর্তের জন্যে যেন সেই সুরের কান্নায় উন্মনা হয়ে গেল।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাপস আভাকে খাটের ওপর ঘন লাল রঙের বিছানার ওপর ছুঁড়ে রেখে দিল।

সশব্দে ঘরের দরজাটা বন্ধ হল। বাইরে বুড়ো হোটেল-বয় আবার একবার চমকে উঠে সেলাম করল। চেয়ে দেখল আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। একটা হাই তুলে টুলে বসে আবার ঢুলতে আরম্ভ করল।

১১

গভীর রাত্রিতে নিজের শোবার ঘরের টেবিলে বসে বরেন একখানা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। সামনে কয়েকখানা গণিতের বই খোলা পড়ে রয়েছে তাদের বিচিত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন বুকে ধারণ করে। কাগজখণ্ডটা থেকে মাথা তুলে বরেন জানলা দিয়ে আকাশে চেয়ে দেখলেন, সেখানেও তারায় তারায় মিলে বিচিত্র চিহ্ন রচিত হয়ে রয়েছে। এদিকে গণিতের বইয়ের মনুষ্যসৃষ্ট সঙ্কেত আর ও দিকে আকাশে প্রকৃতিসৃষ্ট সঙ্কেত। কিন্তু এই কাগজের টুকরোটিতে যে সঙ্কেত রচিত হয়ে রয়েছে ভাষার আশ্রয়ে, তার ঠাঁই এই বইগুলোতেও নেই, ওই আকাশেও নেই, আছে মানুষের বুকের মধ্যে, রক্তের ছন্দে, অনুভবের নিরাকার অক্ষরে অক্ষরে। এই সঙ্কেতটা তার চিত্তকে উদ্বেল করেছে। জোয়ারের মত উচ্ছ্বাস জেগেছে গভীর অন্তরে। সেই জোয়ারের বন্যায় ভেসে গেছে অনেক নোঙর-করা ধারণা। এই সঙ্কেত একটা ইশারায় অন্তরের প্রকাণ্ড আকাশটাকে অনুভবের মধ্যে নিয়ে এসেছে। আর অনুভবের মধ্যে নিয়ে এসেছে হৃদয়ের সমস্ত শিকড়গুলোকে। বরেন বুঝতে পারছেন চিত্তের গভীরে অসংখ্য জালের মত অনুভবের শিকড় বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, আর এই শিকড়ের পথে হৃদয়ের রস ঊর্ধ্বে উঠে একটা অদৃশ্য আকাশে অবর্ণনীয় এক আলোকের সন্ধানে সহস্র সহস্র শাখাপ্রশাখা মেলে রয়েছে। এ এক অভাবনীয় দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জগৎ, এই অনুভবের ভুবন। এই কাগজের টুকরোতে একখানা চিঠি লেখা। সুস্মিতার চিঠি। বিদায় নিয়েছে সে। কোথায় গেছে তা বলে যায় নি। মনে হল বাইরের আকাশে ঘন কালো মখমলের ওপর মণির মত তারার দল কার গতির চাঞ্চল্যে দুলছে। ভেতরের আকাশ দুলছে, স্মৃতির ছায়াপথ দুলছে। চোখের কোণে উদ্গত অশ্রু দুলছে। আবার পড়লেন চিঠিখানা। চোখের ওপর একটা চিত্ত সমুদ্রের মত দুলে উঠেছে।

...শুনে তুমি আশ্চর্য হয়ো না, আমার মন তোমার উজ্জ্বল ছবির পায়ে রাত্রে দিনে কেবলই মাথাকুটে মরছে। স্বপ্নে স্বপ্নে আমার অন্তর তোমাকে খুঁজে ফিরছে। কিন্তু আমি জেনেছি তুমি আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। কে পারে আকাশ ছুঁতে? কে পারে চরম চাওয়াকে আলিঙ্গনের মধ্যে পেতে? তুমি তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ; আমার কামনার উত্তরে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

জানি, তুমি একদিন গলে আমাদের এই সমতলে নামবে। কিন্তু এও জানি সেই তরল আত্মদান যে খাতে বইবে, সে খাত আমি নই। এ আমি বুঝেই নিয়েছি।

অথচ, জান কি, তোমাকে দেখার পর থেকে আমার দৃষ্টি গেছে বদলে? যে মুখে তোমার মুখের আদল নেই সে মুখে আমার দৃষ্টি থামে না। যে চোখে তোমার চোখের ভাষা নেই, সে চোখ আমার কাছে বোবা।

তোমাকে আমি পাই নি। কিন্তু তোমাকে আমি পাবই। আমার সমগ্র মনের মধ্যে তোমাকে ছড়িয়ে নেব।

আজ আমি সব ছেড়ে যাচ্ছি। বাকী জীবনটা আমার কাছে অচল মুদ্রার মত হয়ে গেছে। পথের ধুলোয় ফেলে দিলেও যায় আসে না। তাই বেরিয়ে পড়েছি।

তোমার দোষ দিই নে। কিন্তু দোষ দিই ভাগ্যের। কেন সে তোমাকে এনে দিয়েছিল আমার চোখের সামনে?

তোমাকে আমি নিষ্কৃতি দিলাম। আমার কামনার কলঙ্ক দিয়ে তোমাকে মলিন করব না।

কিন্তু জেনে রাখ, আমি অন্তরে অন্তরে তোমাকে যে ভালবাসা নিবেদন করেছি, তার তুলনা নেই, তার নাম নেই, তার কূলকিনারা নেই, তার দিগ্‌বিদিক্ নেই। আর এই ভালবাসা থেকে আমার মুক্তিও নেই। যেমন আমার দেহের থেকে আমার রক্তের নেই মুক্তি। এ আমার সমস্ত সুখের, সমস্ত দুঃখের মূলে বাসা বেঁধেছে। এ আমার হাসিও নয়, কান্নাও নয়। এ একটা বিস্ময়। আমার অনুভবের রাজসূয় যজ্ঞ।

একটা অনুরোধ, তুমি ভালবেসো। আমাকে পারবে না। পারলে আগেই পারতে। কাউকে না কাউকে ভালবেসো। তা হলেই আমাকে বুঝবে।

তুমি যে দিন ভালবাসবে সেই দিন আমি আবার ভরসা পাব। ভরসা পাব এই ভেবে যে তোমার

ভালবাসার পাত্রীর মধ্যে সেই নারীই সার্থক হবে যে নারী রয়েছে আমার বুকের মধ্যে। তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে পাব।

আজ বিদায় নিচ্ছি। হয়তো চিরকালের জন্যে। শুধু এইটুকু প্রার্থনা, আমি যে দিকে চললাম উত্তর-পশ্চিমে সেই দিকে তোমার ডান-হাতখানা একবার বাড়িয়ে দিও।

কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছি, দেখেছ? সারা বুকে ভরে রয়েছে অগাধ ভালবাসা! কিন্তু যার পায়ে এ সমুদ্র উজাড় করে দিলাম তার পা কিন্তু ভিজল না। দেখেছ, তোমাতে আমাতে কত তফাত! তুমি কী, আমি ঠাহর করতে পারি না। তুমি হয়তো আমার মাপটা জেনে গেছ পুরোপুরি। সত্যি জেনেছ কি? ইতি

তোমার সুস্মিতা

পুনশ্চঃ— তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না জেনে এই চিঠি লিখছি। তাই লজ্জাশরম মানি নি, তাই যা বলতে চেয়েছি সব বলে দিলাম। তবু অনেক—অনেক কথাই বলা গেল না।

বরেনের মনের মধ্যে সুস্মিতার শেষ প্রশ্নটা প্রতিধ্বনির মত বারবার শব্দিত হচ্ছে। সত্যি— জেনেছো কি? মানুষের মাপ, তার অনুভবের মাপ, তার প্রেমের মাপ, কামনার মাপ— এ মাপের গণিত সৃষ্টি হয় নি। সহসা মনে হল মানুষের বিদ্যে জীবনের কিনারায় এসে ঠেকে গেছে। যা সে জেনেছে, যা জেনেছে পদার্থবিদ্, রাসায়নিক, বিজ্ঞানী তা মানুষের মধ্যে নিতান্ত জড় অভ্যাসের সূত্র। এই গণিত মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে মাটি, সেই মাটির অভ্যাসে সৃষ্ট। এই মাটির ওপর যে চিত্তের আকাশ সেখানে মাটির কোন অভ্যাস নেই।

এই অপার্থিব অভ্যাসের শৃঙ্খলের বাইরে যে চেতনার ভুবন সেই ভুবন তার নিদারুণ বিস্ময় নিয়ে পদার্থবিদ্ বরেনের মধ্যে আবির্ভূত হল এই গভীর রাত্রিতে।

বরেনের মনে হল তার চতুর্দিকে যে জড়তার দেওয়াল সেই দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। ভেতরের মানুষ সমস্ত বিদ্যাকে দু হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে যেন অন্য মানুষের দিকে ধেয়ে যেতে চাইছে। এতকাল মানুষের কাছ থেকে সে সরে থেকেছে। তত্ত্বের রাজ্যে।

* * *

সহসা দরজায় বাইরে থেকে কে টোকা দিল। যে অনির্বচনীয় আজ সহসা তার চেতনায় আবির্ভূত হয়ে গেছে এ কি সেই? আকার ধরে দরজায় মৃদু আঘাত দিচ্ছে? গভীর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দেখল কোথাও কেউ নেই। বাইরে বারান্দা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। এই সিক্ততার ওপর মায়ার আবরণের মত আলো রয়েছে ছড়িয়ে। বেরিয়ে এসে মুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ কাছাকাছি কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। বরেনের সারা শরীর শিহরণে চমকে উঠল।

কাছে থেকে কে যেন অস্ফুটকণ্ঠে বলল— আমি! আমি! আমি!

কে, কে তুমি?— চকিত বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন বরেন।

দরজা খুলে পাশের ঘর থেকে মৃণাল ছুটে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কী? কী হয়েছে দাদা?

মৃণালের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে বরেনের সম্বিৎ ফিরে এল। ক্লান্ত হয়ে বললেন, কে যেন আমার দরজায় টোকা দিয়ে এইখানে কোথায় লুকিয়ে পড়ল, একবার যেন হাসল, কী যেন বলল!

মৃণাল বিস্মিত হয়ে বলল, চোর নাকি!

বরেন অবাক হয়ে বললেন, চোর! সে কি! চোর কেন হবে? অদ্ভুত মিষ্টি হাসি!

মৃণাল তাঁর হাত ধরে বলল, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে দাদা, চল, শোবে চল।

[ক্রমশঃ]

ইতিহাস

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

এখানে একদিন একটি মন ছিল
যেই মন খুশী ছিল অল্পে,
যে মনটি মরমীয়া, অনায়াসে ভরত
সহজিয়া রূপকথা, গল্পে।
এখানে একদিন একটি মাঠ ছিল
যেই মাঠে ধান-শীষ দুলত
একটি ঘর ছিল—দেয়ালে আলপনা,
চালেতে লাউ-লতা ঝুলত।
একটি নদী ছিল—বিগলিত তৃপ্তি—
যার কূলে ভিড়তো না তৃষ্ণা
একটি মেয়ে ছিল—মায়াবী সোম-লতা
আদরের ডাকনাম কৃষ্ণা।
একটি পাখি ছিল নীড়ের সুখে সুখী
মিষ্টি সবুজ সুরে ডাকত,
একটি ফুল ছিল—সোহাগী বন-ফুল—
গন্ধে আকুল করে রাখত।
একটি রস ছিল, তৃপ্তির সুধা-রস,
প্রাণের গভীরে তার পুষ্টি
অভাব বোধহীন প্রসন্ন হৃদয়ের
দুর্লভ শান্তির তুষ্টি।

আজ সেই মন নেই, সহজের রঙ নেই
নেই সেই স্বভাবের শান্তি,
শান্তির নাম আজ ভ্রান্তির বালুচরে
আলেয়ার পিছে ঘোরা শ্রান্তি।
নেই সে সহজ সুখ, সহজে ভরে না বুক
খুশী আর হয় না সে অল্পে,
জটিলের ঘূর্ণীতে কুটিল আঁধির ঝড়
আজ সেই হৃদয়ের গল্পে
কাঁচা মাটি পুড়ে ছাই, সে নদীটি বেঁচে নাই
মরে গেছে মায়াবিনী কৃষ্ণা,
মায়া আজ মরীচিকা ; ছায়া-হারা জীবনীতে
তৃপ্তির নব নাম তৃষ্ণা।
পাখিরও পুড়েছে পাখা, ফুলটি পাথর-চাপা,
তুষানলে জ্বলে মরে তুষ্টি
সবুজের সুধা-হারা বিবর্ণ মরুদাহ
বিকৃত বিকারে খোঁজে পুষ্টি।

গৃহের একান্ত কোণ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কে যাবে আবার এই বিমূর্ত আঁধারে !
বেরুবার ঋতু নয়, দীর্ঘকাল পথে
কেটেছে আত্মীয় দিন পথের শপথে ;
আজ কিন্তু প্রাণে প্রাণে
নিস্তরঙ্গতায় কিংবা নিঃশব্দ সঞ্চারে
বাড়ি-ফেরা তৃষ্ণার চেতনা।

কে যাবে আবার এই বোবা অন্ধকারে !
পিপাসার জ্বালা বুকে রক্তক্ষত পায়ে
উত্তীর্ণ বিচিত্র ঋতু, আশ্চর্য উপায়ে
বার বার সিন্ধবাদী বোঝা চাপে ঘাড়ে।
কত বার বিকীর্ণ সময়ে
বিশীর্ণ বৃক্ষের মত বজ্রতাপ সয়ে
ঋতুরা হেসেছে সব আত্মমগ্নতায়—
সূর্যাস্তের শেষ অনুরাগে
যখন আকাশ লাল, নিস্তরঙ্গতায়
নদীতে উদ্বেগ ঢেউ জাগে।

আজ আর পথ নয়। আজ অন্ধকার
দূরে থাক। বাড়ি-ফেরা প্রতীক্ষায়
দিন যায় লগ্ন যায়, এখন আবার
বাড়িতেই ফিরে যাব, দুর্ভাবনা সমস্ত বিকার
বাইরে ভাসাব কোন নব ঘন যমুনার জলে ;
শয্যাশায়ী হয়ে রবে আমার হৃদয়
গৃহের একান্ত কোণে, সমর্পিত শান্ত অঙ্গীকারে।

হয়তো সে'ই কৃষ্ণকলি

আবুলকাশেম রহিমউদ্‌দীন

এখানে যার তুহিন হাত
নরকে আঁকে আলপনা,
ধূসর চোখে কাজল ছলনার,
গলির মোড়ে চড়া বুকের
চলছে আজো কাল গোনা
মদের ফুলে বাসর রচনার।
তাকেই যেন দেখেছিলাম
পলাশ ডানা দিনশেষে
দীঘির ঘাটে কখনো নিরালায়,
সুখের ব্যথা ছড়াতো রঙ
জলের নীল নীলদেশে—
হৃদয় ছিল ঢেউয়ের দোলনায়!

নাগিনী যেন নীরবে সয়
রূপের হাটে লাঞ্ছনা—
এখানে যার কলস খালি মন,
ধনুক ঠোঁটে পঞ্চশর
নকল হাসি, আনমনা
পথিক শিবে জাগায় অনুখন!
তাকেই যেন দেখেছিলাম
শিশির-স্নেহে লুণ্ঠিত
ভোরের ফুলে সাজাতে তার ডালি,
তখন বুকে নদীর দোলা,
গলায় মৃদু গুঞ্জিত
মৌমাছির মহুয়া ভাটিয়ালি।

হয়তো সেই কৃষ্ণকলি
কবিচোখের কল্পনা
মেঘের দিনে ময়নাপাড়া মাঠে,
দেখেছি তার ভীরু মনের
ভাবনা মেলে জাল-বোনা
মেঘের ডাকে সূর্য বসা পাটে।

এ কোন্ পাপে মরণমুখী
নগর-নাগ-কন্যা সে,
নেই কি তার কিছুই অবশেষ?
নিশাচরের লোলুপ শিসে
আকাল ভাঙা পঞ্চাশে
এ-মেয়ে যেন পোড়ো বাংলা দেশ!

কে তুমি বলো বাজাও আজও
বাজাও তুমি কার হাতে
নানান সুরে সনাতনের বীণা,
বন্ধু ওগো তাকিয়ে দেখো
গলির মোড়ে মাঝরাতে
এ-দেশ তুমি চিনতে পার কি না!

—

কাশ্মীরের চিঠি

শ্রীঅমিয়ময় বিশ্বাস

অজানার আকর্ষণে

বদরীনাথ দর্শন করতে হলে হরিদ্বারে আসতেই হবে। হৃষীকেশ থেকে যাত্রা আরম্ভ হলেও তার সব ব্যবস্থা করতে হয় হরিদ্বারে এসে। তেমনি পুণ্যালোভাতুর অমরনাথ-যাত্রীদের এসে জুটতে হয় এই পহলগামে। বাস যাতায়াতের ফলে বদরীনাথ দর্শনের পথ হয়েছে সুগম। হৃষীকেশ থেকে যাত্রীদের পৌঁছে দিচ্ছে একেবারে বদরী-বিশালের দরজায়। মাত্র আঠারো মাইলের পায়ে-হাঁটা পথ আজও স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতে পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীরা কি অসীম কষ্ট সহ্য করে, দীর্ঘ অনভ্যস্ত পথের কত বাধা বিঘ্ন দুঃখ ক্লেশকে অতিক্রম করে আসতেন দেবতার দেউলে। অমরনাথ যাত্রা আজও সহজ হয় নি। পাহাড়ের গায়ে আঁকা বরফে ঢাকা কঠিন দুর্গম পথের শেষে আছে প্রকৃতির হাতে গড়া দেবতার মন্দির। তীর্থযাত্রী ছাড়াও পহলগামে এসে থাকেন স্বাস্থ্যান্বেষী অর্থশালী ভাগ্যবানেরা। লীডারের জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলেছে ধর্ম আর অর্থের প্রবাহ। ত্রিধারার সমন্বয়ে পহলগাম কাশ্মীরের প্রয়াগ।

পহলগামের দূরত্ব শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল। শ্রীনগর পাঠানকোট ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরে যেতে হয় বরাবর দক্ষিণে। "খানাবাল" পৌঁছে রাস্তা ঘুরে গেছে উত্তর-পূর্বে। সকাল আটটায় বাস ছাড়বে পর্যটক-কেন্দ্র থেকে। বেশ শীত বোধ হচ্ছে। আমরা সবাই শীতবস্ত্র নিয়েই এসেছি। অনেকে চলেছেন আধুনিক গ্রীষ্মকালীন শৌখীন বুশসার্ট ও প্যান্ট সম্বল করে। পাঞ্জাবি মেয়েরা এসেছেন রেশমী কামিজ আর সালোয়ার পরে। তাঁদের সুন্দর মুখের সৌন্দর্য স্বচ্ছ নাইলনের ওড়নার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। পোশাকের সবচেয়ে দৈন্যতা চোখে পড়ে আমাদের বাঙালী সহযাত্রীদের। ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু মানায় বিয়েবাড়ির উৎসব-সভায়। অন্যত্র, বিশেষ করে বিদেশে এ সাজ লজ্জার কারণ না হলেও দস্তুরমত অসুবিধাজনক। আর বাঙালী মেয়েদের তো ধনেখালি ছাড়া কোনও শোভনীয় শাড়ি নেই। সুদূর কাশ্মীরের পথে হ্যাণ্ডলুমের বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছেন কালো কালো রোগা রোগা বাংলার মেয়েরা। তাদের সৌন্দর্যবিহীন কৃশমূর্তি দেখলেই মনে হয় যেন বাংলার দৈন্যের আর শেষ নেই। পুরুষরা কেউ কেউ কোট-প্যান্ট চড়িয়ে দুনিয়ার আসরে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু বাংলার মেয়েরা আজও জড়সড়। ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান তালে চলতে হলে সালোয়ার কামিজকেই করতে হবে দেশের মেয়েদের বাইরে বেরবার পোশাক।

বাসে আমাদের পিছনেই বসেছেন বাংলার একটি দল। সঙ্গে এক বুড়ো ভদ্রলোক, প্রায় অথর্ব। তিনি কোথাও বাস থেকে নেমে কিছু দেখতে পারেন নি। তাঁর কথা ভেবে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। প্রথম জীবনে যখন মানুষের উদ্যম থাকে, শক্তি থাকে, তখন দেশ ভ্রমণের সুযোগ হয় না। যদি বা কারও জীবনে একদিন সে সুযোগ এল তখন সে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে, দেহখানা বয়ে চলেছে কোনও রকমে। মনের কোণে বহুদিনের লুকিয়ে রাখা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়তো হল কিন্তু তাতে নেই কোনও আনন্দ, মনে জাগে না কোন শিহরণ। অস্তগামী জীবনীশক্তির স্কন্ধে জরাজীর্ণ দেহমনের ভার চাপিয়ে জীবনসায়াহ্নে দেশ ভ্রমণ বিড়ম্বনামাত্র।

বাস ঠিক সময়েই ছাড়ল। প্রভাতের নির্মল আলোয় সব ঝলমল করছে। পরিষ্কার চওড়া পিচ দেওয়া রাস্তা।

আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ...
'নতুনকে পরখের আনন্দ'...
Surf
সার্ফে কাপড়জামা
সবচেয়ে ফরসা করে কাচে
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
SU. 21-X52 BG

মাঝে মাঝে অপূর্ব শ্রেণীবদ্ধ পপলার গাছের সারি ও বিশাল সবুজে ছাওয়া গগনস্পর্শী চিনার। শহর ছেড়ে কিছুদূর যেতেই দেখা গেল ডাইনে বাঁয়ে পাহাড় আর তাদের বরফ-ঢাকা শুভ্র শীর্ষে প্রভাতের সূর্যকিরণের খেলা। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। কনকনে বাতাসের ভয়ে গাড়ির সব জানলার কাঁচ উঠিয়ে দেওয়া হল। প্রায় দশ মাইল যেতেই এল পাম্পুর। বিখ্যাত জাফরানের চাষ হয় এখানেই। আমরা জাফরানের গাছ দেখতে পেলাম না। যাঁরা সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আসেন তাঁরাই দেখতে পান দিগন্তবিস্তৃত জাফরান ফুলের অপূর্ব সৌন্দর্য।

পথে পড়ল অবন্তীপুর। এখানে আছে ১৫০০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ—কাশ্মীররাজ অনন্তবর্মার কীর্তি। মাটি খুঁড়ে মন্দিরের অনেকটা বের করা হয়েছে - ওপরের ছাদ বা চূড়ার কোনও চিহ্ন নেই। বড় বড় চৌকো কালো পাথরের টুকরো একের পর এক সাজিয়ে রাখা। কিছু কিছু কারুকার্যও আছে এই পাথরগুলোর গায়ে। বিশুদ্ধ হিন্দু স্থাপত্য রীতিতে তৈরী। মুসলিম বা সারাসেন সভ্যতার মিলানের কোন লক্ষণ নেই এই মন্দিরের গঠনরীতিতে। এখানে আমরা প্রায় দশ মিনিট ছিলাম।

অবন্তীপুর থেকে আমরা এলাম "খানাবাল"। দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের ছায়ায় ঢাকা "বানিহাল পাস"। পথ এখানে দু ভাগ হয়ে গেছে—সোজা পথ যাবে বানিহাল হয়ে পাঠানকোট। আমরা এ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এসে পৌছালাম "অনন্ত নাগ"—কাশ্মীর কুটিরশিল্পের কেন্দ্রস্থল। অনতিদূরেই আছে মার্তণ্ডের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা রামদেব খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ শতাব্দীতে। তার বহু পরে বোধ হয় খ্রীষ্টাব্দ ৭০০ শতকে রাজা ললিতাদিত্য এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ও বিরাট নাটমন্দির নির্মাণ করে এর লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। পীর-পাঞ্জালের কোলে কারুকার্য-সমন্বিত এই মন্দিরের বহুলাংশ আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। উড়িষ্যার কোণারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মিত হয়েছিল এর বহু শতাব্দী পরে। মার্তণ্ডের মন্দিরের পাথরে আঁকা মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় সুদূর অতীতেও কাশ্মীরের সভ্যতা সমসাময়িক ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। বড়ই দুঃখের বিষয়, সরকারী পরিবহন বিভাগে এই বিখ্যাত স্থানটি দেখার কোনও ব্যবস্থা নেই। সরকারী গাইড বইতেও এর উল্লেখ দেখলাম না।

এখান থেকে আমরা এলাম আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য-স্থান "কোকরনাগ"। পাইনের ছড়াছড়ি দেখে বুঝলাম ৬০০০ ফিট ওপরে উঠে এসেছি। স্থানটি নির্জন ও কোনও বসতি নেই। এখানেও রয়েছে পাহাড়ের গায়ে সরকারী ডাকবাংলো ও তার চারিদিকে সযত্নরক্ষিত সুবিন্যস্ত সবুজ মাঠ আর ফুলের বাগান। পাহাড়ের নীচে বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ স্রোতধারা। আমরা ডাকবাংলোর পিছনে কোকরনাগের বিখ্যাত উৎস দেখতে গেলাম। পাহাড়ের গা থেকে এক জায়গায় জল উথলে বেরিয়ে আসছে। গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের নীচে। আমরা উৎসমুখ তো লাফিয়েই পার হয়ে এলাম। এখানে দুটো উৎস পাশাপাশি। শুনলাম একটির জলে আছে লোহা, অন্যটিতে ক্যালসিয়াম। একজন লোক উৎসমুখ থেকে কনকনে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে আমাদের পান করতে দিল। উৎসের সন্নিকটে দেখলাম একটি ইউরোপীয়ান দম্পতি নির্জন পাহাড়ের গায়ে তাঁবু খাটিয়ে বাস করছেন।

এখান থেকে আট মাইল দূরে পাহাড়ের ওপারেই আছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্মৃতিবিজড়িত "ভেরনাগে" ঝিলমের উৎস। সেখানে আমাদের যাওয়া হয় নি। ফিরে আসতে না আসতেই বাস ছেড়ে দিল আচ্ছাবলের মোগল গার্ডেন দেখাতে। মাঝপথে এক জায়গায় নেমে আমরা একটি হিন্দু মন্দির ও তার সংলগ্ন গন্ধকের উৎস দেখলাম। এই মন্দিরের আর সেবায়েতদের দৈন্যদশা দেখে দুঃখ হল। পরে "উলার" ভ্রমণের পথে ক্ষীরভবানীর মন্দির দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে হিন্দুমন্দিরেরও আদর আছে এই মুসলিমপ্রধান দেশে।

বেলা একটায় পৌছে গেলাম মোগল উদ্যানের দরজায়। গেট পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম উদ্যানের বিরাট চত্বরে। মোগলদের বিশিষ্ট ঢঙে তৈরি এই উদ্যান। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে জলস্রোত—তা থেকে ছোট ছোট পাথরে বাঁধানো নালা দিয়ে জলধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে

সমস্ত উদ্যানময়। বিশাল চিনার, নানাবিধ ফলবৃক্ষ, রঙিন ফুলের কেয়ারী উদ্যানের শোভা বর্ধন করছে। কিন্তু খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হল, সমস্ত উদ্যানটি নোংরা। প্রকৃতির কোলে লালিত আচ্ছাবলের কাশ্মীরীরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বোধ হয় এই উদ্যানেই আসেন। প্রতি রবিবারে এখানে মেলা হয় কিন্তু সমস্ত জায়গাতে রয়েছে অবহেলার প্রবল ছাপ। উদ্যানের মধ্যে আছে ছোট একটি অলিন্দ। তার সামনে জলের ধারে বসে আমরা খেয়ে নিলাম। কী ঠাণ্ডা জল! পিছনের সুউচ্চ পাহাড়ের কোলে রয়েছে জলের বিরাট প্রস্রবণ। তাকেই পোষ মানিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে উদ্যানের মধ্যে। ইদানীং এই উৎস থেকে খাল কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরকারী কৃষি ফার্মে। জল অফুরন্ত, কাজেই উদ্যানের কোনও ক্ষতি হয় নি।

এই উদ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারার স্মৃতি। এ উদ্যান তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই আদেশে তৈরি হয়েছিল। ভেবে অবাক হতে হয় সুখে-স্বচ্ছন্দে পালিতা সম্রাট-দুহিতার এই সুদূরে অভিযান, যখন রাস্তা প্রায় ছিল না। আর যানবাহনের শত ব্যবস্থাসত্ত্বেও সে সময়ে এদিকে আসা-যাওয়া কষ্টকরই ছিল। জানি না কোন্ সৌন্দর্যের আকর্ষণে তিনি ছুটে আসতেন এই নিভৃত নিকুঞ্জে।

এখানেও সরকারের তরফ থেকে ট্রাউট মাছের চাষ হচ্ছে। কাশ্মীরে এই মাছের চাষ আরও অনেক জায়গায় করা হচ্ছে তবে আমরা গিয়ে দেখি নি। এখান থেকে বাস ছাড়ল বেলা দুটোয়। লীডারের বিখ্যাত উপত্যকার ভেতর দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। পাহাড়ের নীচে রাস্তা, বাঁ দিকে লীডার নদীর প্রবল উত্তাল তরঙ্গস্রোত। তার ওপারে আবার পাহাড়ের সারি। এ রাস্তায় গাছপালা বেশী নেই, মাঝে মাঝে দেখছি সবুজ আখরোটের গাছ, সবুজ ফলের ভারে নুয়ে আছে। ফলগুলো দেখতে কাঁচা আমড়ার মত। ধূসর রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে গায়ে লীডারের কলরোলের সঙ্গে তাল রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত মহাদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ পহলগাম দর্শনমানসে।

বেলা প্রায় তিনটেয় বাস এসে থামল আরও অনেক বাস মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নেমে পড়তেই কুলির দল ঘিরে দাঁড়াল। তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে একটি ছোকরার হাতে আমাদের হাণ্ডব্যাগটা দিয়ে বাজারের রাস্তায় এগুতে লাগলাম। দু ধারে কাঠের বাড়ি, পরিষ্কার চওড়া রাস্তা, সামান্য চড়াই। খোকা ও আণ্টু ঘোড়ায় চড়ে বসল। আমরা ধীরে ধীরে লীডারের হ্যাণ্ডিং পুল পার হয়ে পাইন গাছের ছায়ায় এসে বসলাম। কাছেই পহলগাম ক্লাব।

আমরা ভেবেছিলাম পহলগামে শীত হবে কিন্তু এখানে এসে দেখলাম বেশ গরম। গরম কাপড়ে আরও বেশী গরম বোধ হতে লাগল। কিন্তু পাইনের ছায়ায় বসে স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে অপরাহ্ণের তীব্র রৌদ্রের কষ্ট আর মনে রইল না। পায়ের নীচে লীডারের প্রবল জলস্রোত, নদীর গর্ভে ছড়িয়ে আছে পাথর, তাতে ধাক্কা লেগে নীল জল শুভ্র ফেনার কণায় দেখাচ্ছে শ্বেতাভ। নদীমাতৃক দেশে প্রতিপালিত আমরা, কিন্তু দেখি নি এ রূপ। জল এত ঠাণ্ডা যে হাত দেয় কার সাধ্য, আঙুলগুলো সব অবশ হয়ে আসে। এই ঠাণ্ডা জল পান করে সমস্ত শ্রান্তি দূর হল। পরে জেনেছিলাম যে লীডারের জল পান করা নিষেধ। যাহোক, আমাদের কিছু হয় নি। নদীর ওপারে বিরাট মাঠ জুড়ে পড়েছে অসংখ্য বস্ত্রাবাস। বিত্তাধিক্যের (পিত্তাধিক্য নয়) সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক নানা উপসর্গে কাতর হয়ে অনেকেই এসেছেন প্রকৃতির শান্ত কোলে বিশ্রামের আশায়। ঠাকুর চাকর আয়া পরিবৃত হয়ে লীডারের ধারে ধারে পাইন আর দেবদারুর বন জঙ্গলে হারানো স্বাস্থ্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা।

পহলগাম স্বল্প পরিসর উপত্যকা, চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের গায়ে পাইন আর দেবদারুর ঘন বন। উপত্যকাকে দ্বিধা-বিভক্ত করে বয়ে চলেছে লীডারের জলস্রোত। পাহাড়ের চূড়ায় শুভ্র বরফ, মাঝে মাঝে তার ক্ষীণ রেখা নেমে এসেছে প্রায় নীচে পর্যন্ত। এখান থেকেই যেতে হয় অমরনাথ দর্শনে। রাস্তা এখনও খোলে নি, খুলবে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। অক্ষয় তৃতীয়াতে খোলে বদরীনাথের মন্দিরের অর্গল আর অমরনাথ দর্শনের প্রশস্ত দিন হচ্ছে শ্রাবণ পূর্ণিমা, রাখী-

বন্ধনের আনন্দের দিন। আপনভোলা মহেশ্বরের মন্দিরের দ্বার সদাই অবারিত, অর্গল কখনও পড়ে না দেবতার দুয়ারে। ভগবানের কৃপা পেতে হলে খুলতে হয় নিজের মনের অর্গল, একাগ্রচিত্তে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই বন্ধন থেকে মুক্তি।

প্রবাদ, অমরনাথের গুহা আর তুষারলিঙ্গের কথা প্রচার করেন ভ্রেগিশ ঋষি—মহর্ষি কাশ্যপের পরবর্তীকালে। প্রতি বৎসর শ্রীনগরের দশনামী আখড়া থেকে "ছড়ি"কে পুরোভাগে রেখে বের হন সাধুরা পায়ে হেঁটে আসেন অমরনাথে। তীর্থযাত্রীরা সবাই যান ঘোড়ায় চড়ে। চার-পাঁচ দিন লাগে যেতে আসতে। এ দুর্গম পথে কেদার-বদরীর রাস্তার মত নেই কোনও চটি বা সরাই। নির্জন পথের মাঝে মাঝে যাত্রীদের মাথা গোঁজবার জন্য আছে ভগ্নপ্রায় অল্প কয়েকটি কুটির। আজকাল কাশ্মীর সরকারের তরফ থেকে যাত্রীদের সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে, হয়তো বা অদূরভবিষ্যতে অমরনাথের ভয়াবহ রাস্তার কাহিনী বদরীনাথের পথের মত শুধু কাহিনীতেই পর্যবসিত হবে।

পহলগাম থেকে সব ব্যবস্থা করে যাত্রীদের বেরোতে হয় বিছানা, খাবার, রাত্রিবাসের তাঁবু, ভাল ঘোড়া, বিশ্বাসী গাইড নিয়ে। শীতবস্ত্র প্রচুর থাকা ভাল, মাথা বাঁচানোর জন্য চাই ক্যাপ, শরীর বাঁচানোর জন্য গরম ওভারকোট, হাতের জন্য দস্তানা, চোখে দেবার গগলস আর মুখের জন্য কোল্ডক্রীম। পাহাড়ের গা বেয়ে চন্দনবাড়ির বরফের সেতু পার হয়ে পথ গেছে "শেষনাগ" হ্রদের পাশ দিয়ে। ১২০০০ ফুট উঁচুতে শেষনাগ। হ্রদের জল বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফে ঢেকে থাকে। সেখান থেকে পঞ্চতরণী গ্লেসিয়ার পার হয়ে যেতে হয় অমরনাথের গুহায় ১৩০০০ ফুট উঁচুতে। এ পথে আছে ভয়াল হিম-ঝড়ের আশঙ্কা, তার দর্শন না পেলেই দেবদর্শন সম্ভব।

পাহাড়ের বুকে একটি বিরাট গহ্বরই দেবমন্দির। মানুষের বসবাসের কিছুমাত্র ব্যবস্থা নেই এই দেবালয়ে। বিশাল অন্ধকার গুহার এক স্থানে চুঁয়ে-পড়া ফোঁটা ফোঁটা জল জমে এই তুষারের শিবলিঙ্গ গড়ে ওঠে। শুনলুম এই মূর্তি প্রতি পূর্ণিমাতে পূর্ণাবয়ব ধারণ করে, আর পরের অমাবস্যাতে গলে যায়। কত যুগ ধরে যে এই অভিনব প্রকৃতির খেলা চলে আসছে তা কেউ বলতে পারে না। এই হিমশীতল নিস্তব্ধ আঁধার প্রাকৃতিক গর্ভগৃহে মহাদেবের পূজা আর প্রদক্ষিণ শেষ করে তখনই ফেরার পথে পা বাড়াতে হয়। ত্রিরাত্র তো দূরের কথা, এক রাত্রি বাসও এখানে সম্ভব নয়। এই বরফ-ঢাকা নির্জন নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ গুহায় দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গী শুধু দুটি পারাবত। অনন্তকাল ধরে তারা দক্ষিণ ভারতের পক্ষীতীর্থের পক্ষীদের মতই অমরনাথ-যাত্রীদের ভক্তি ও বিস্ময় উদ্রেক করে আসছে।

পহলগাম থেকে অনেকে যান "কোলাহাই গ্লেসিয়ারে" চড়তে। ১৪০০০ ফুট উঁচু। এখান থেকে ৪৪ মাইল। যেতে আসতে তিন দিন লাগে। কুমায়ুনের "পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারে"র চেয়ে যাতায়াত সহজ। সে জন্য পর্বত আরোহণের হাতেখড়ি নিতে অনেকেই আসেন এই কোলাহাইয়ের পাদপীঠে।

পাঁচটা বাজে, চা খেয়ে বাসে এসে বসলুম। সহযাত্রীদের মধ্যে দুজন ফরাসী আমাদের ঠিক পিছনেই বসে ছিলেন। সমস্ত রাস্তা তাঁরা ছবি নিতে নিতে চললেন। ফেরার পথে বাস কোথাও দাঁড়াল না। প্রায় রাত্রি আটটায় পৌঁছে গেলাম শ্রীনগরে।

রাতের ঘনায়মান অন্ধকারে শঙ্করাচার্য পাহাড়কে দেখাচ্ছে কালো মেঘের মত। তার বুকে মাঝে মাঝে দেখছি আলোর ঝিলিক জ্বলছে আর নিবছে। কেউ বোধ হয় মন্দির দর্শন করে ফিরছেন, অন্ধকারে পথ হারিয়ে খাদে পড়ার ভয়ে টর্চের আলোয় রাস্তা দেখছেন মনে হল। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই দুইই সমতলবাসীদের পক্ষে দুরূহ। তাই সবাই প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মন্দিরের পথে চলতে আরম্ভ করেন আর সূর্যের উত্তাপ বেশী হবার পূর্বেই দেবদর্শন শেষ করে নেমে আসেন। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির, সরকারের তরফ থেকে রোজ রাত্রে তাতে স্পটলাইট ফেলে উজ্জ্বল করে রাখা হয়। আমাদের প্রোগ্রাম হল যে পরদিন সকালে তোমার মা খোকাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দির দর্শন করতে যাবেন। চড়াই-পথে আমার ওঠা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
LUX
নীল
গোলাপী
হলুদ
'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-
দেখুন ! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই
সাদাটিও রয়েছে । প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য
যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন ।
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান
LTS. 86A-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
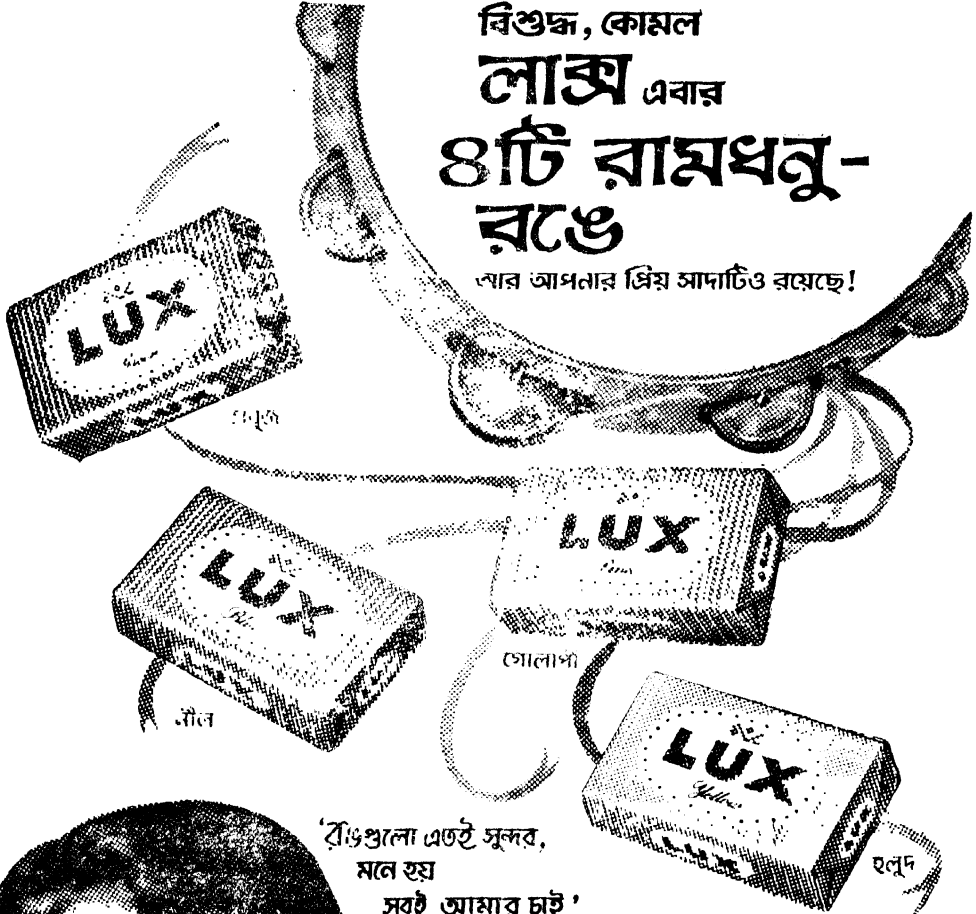
আমাদের পাশের বোটে যে কয়েকজন ইয়ং বেঙ্গল ছিলেন তাঁরা যা বর্ণনা দিলেন তাতে আমার ও আণ্টুর যাবার কথা আর উঠতেই পারল না।

পরদিন খুব ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মা বেরিয়ে পড়লেন মন্দিরের উদ্দেশে। সঙ্গে নিলেন এক থলে চেরী। পাহাড়ে উঠতে পিপাসা পায় খুব কিন্তু জল পান করলেই বিপদ। তখন ফলের রসই খাদ্য ও পানীয় যোগায়। আমাদের বোটের সামনে থেকে যে পাকদণ্ডি উঠে গেছে পাহাড়ের গায়ে সেই পথ ধরে ওঁরা উঠতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে চলেছে বোট-ওয়ালাদের লোক গাইড হয়ে। পাহাড়ে এদিকের রাস্তা মন্দিরে যাবার সোজা রাস্তা নয়। সেটা পাহাড়ের অন্য দিকে পর্যটক দপ্তরের কাছে। সে রাস্তা অনেক ভাল এবং বেশ আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেছে, উঠতে বেশী কষ্ট হয় না। ওঁরা পরে সেই পথে নেমে এসে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এদিকে খাড়া পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তা। খোকা বেশ তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তোমার মা ধীরে ধীরে উঠছেন। হাউস-বোটের ছাতে বসে দূরবীন দিয়ে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এই ভাবে প্রায় পনের মিনিট চলার পর পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর দেখা গেল না। ফিরলেন বেলা প্রায় এগারোটায়। এদিকে রাস্তাটা মোটেই ভাল নয়, উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় অনেকটা সমতল জায়গা। তার ওপরে মন্দির। প্রায় চল্লিশটা দেড়ফুট উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় মন্দিরের চত্বরে। মন্দিরের গর্ভগৃহে আছে বিরাট শিবলিঙ্গ—প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু। পাথরটাও সাধারণ নয়, নানা রঙের সমাবেশ তাতে। মন্দির থেকে শ্রীনগরের দৃশ্য চমৎকার। এখানেও পর্যটকদের বিশ্রাম-গৃহ আছে। শুধু দিনের বেলা তাতে থাকা চলে। মন্দিরের পূজারীর জন্যে আছে একটা কুটির। জল আনতে হয় নীচে থেকে ভারী দিয়ে। শোনা যায় এ মন্দির বিখ্যাত শঙ্করাচার্যের পূর্বেকার। শিব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সঙ্গে এই মহামানবের নামের সম্পর্ক আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

মন্দির থেকে ফিরে এসে আমরা ডালের হাউসবোট ত্যাগ করে ঝিলমের বোটে চলে এলাম।

উলার

আমি প্রথম চিঠিতেই লিখেছি যে কাশ্মীর শুধু জল আর পাহাড়। উত্তরের হিমালয় আর দক্ষিণের পীরপাঞ্জাল এই উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে। আর এদের কোন অংশই ৯০০০ ফুটের নীচে নয়। বানিহাল পাস—যা এই উপত্যকায় যাতায়াতের একমাত্র পথ তার উচ্চতাও ৯০০০ ফুটের ওপর। অর্থাৎ জল যদি জমে তার গভীরতাও হবে ওই রকম। তুষারকিরীট পর্বতমেখলায় পরিবেষ্টিত এই কাশ্মীর এককালে এক বিশাল হ্রদে পরিণত ছিল। কিংবদন্তী আছে, একদা দেবী পার্বতী এখানে বিহার করতে আসেন, তাঁরা এসে যে পর্বত-চূড়ায় বাস করেছিলেন তার নাম হরমুখ—১৬০০০ ফুট উঁচু। পর্বতের শিখরদেশ শুভ্র বরফে সমাচ্ছন্ন, হয়তো কৈলাসের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। দেবী এখান থেকে জল পাড়ি দিয়ে যেতেন দক্ষিণে "কোনসারঙ্গ" হ্রদে বিহার করতে। পীরপাঞ্জালের একটি উচ্চ শৃঙ্গের নাম আজও কোনসারঙ্গ। প্রবাদ এই যে এখানে এক দৈত্য, নাম তার জলোদ্ভব, এক সময় বড় অত্যাচার করত। আর মুশকিলে পড়লেই সে এই বিরাট জলাশয়ে লুকিয়ে পড়ত। বিপদে পড়ে দেবী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন, তিনি কিছু উপায় করতে পারলেন না। তখন বিষ্ণু বরাহ-মূর্তি ধারণ করে দাঁত দিয়ে পাহাড় কেটে দিলেন বারামূলার কাছে। সমস্ত জল বয়ে গেল সেই পাহাড়ের ফাটলের পথে। তবুও দৈত্যের তেজ কমে না। তখন দেবী উপায়ান্তর না দেখে নিজেই পাহাড় ছুঁড়ে দৈত্যকে বিনাশ করেন।

কাশ্মীর উপত্যকা একটা ডোঙা বা Trough-এর মত। একমাত্র নদী ঝিলম, পৌরাণিক নাম বিতস্তা, এই বিরাট ভূখণ্ডের জল নিষ্কাশনের পথ। ঝিলমের উৎপত্তি হয়েছে বানিহাল পাসের নীচে ভেরনাগের উৎস থেকে। পীরপাঞ্জালের উত্তর অববাহিকার সব জল প্রবাহিত হচ্ছে এই ঝিলমের স্রোতে। এখান থেকে এঁকেবেঁকে ঝিলম চলেছে উত্তরে, শ্রীনগরের ভিতর দিয়ে এসে থেমেছে হিমালয়ের কোলে। এই পুঞ্জীভূত স্থির জলরাশিই বিখ্যাত উলার। প্রায় পনের মাইল লম্বা আর ততটাই চওড়া। এখান থেকে ঝিলম আবার চলেছে দক্ষিণে। এর সঙ্গে এসে মিলেছে কোলাহাই গ্লেসিয়ার

আর অমরনাথ পাহাড় থেকে লীডার ও সিন্ধের প্রবল জলস্রোত। এসেছে পীরপাঞ্জাল থেকে ভীষভ্, গুলমার্গ থেকে দুধগঙ্গা, ফিরোজপুর আলা। তারপর ঝিলম পার হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা বারামুলায় পাহাড়ের ফাটলের ভিতর দিয়ে। পীরপাঞ্জাল ভেদ করে এসে পড়েছে পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে, মিশেছে সিন্ধুনদের সঙ্গে। এ সব এখন পাকিস্তানের। বারামুলাতেই আমাদের শেষ দেখা ঝিলমের সঙ্গে।

সকালে টুরিস্ট কেন্দ্র থেকে বাস ছাড়ল। এই সরকারী বাসগুলো বেশ বড় আর আরামদায়ক। আমরা পঁচিশজন যাত্রী একসঙ্গে চলেছি। সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকটি বাঙালী পরিবারও ছিলেন। এর ভেতর একটি দলই আমাদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করল। তাঁরা সত্যিকার বাঙালী কিংবা কলকাতার অবাঙালী, এই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে লাগলাম। ভদ্রলোকের গায়ে বেগুনী রঙের আচকান আর পরনে সাদা চিলে পায়জামা। সঙ্গে যে দুজন মধ্যবয়সী মহিলা ছিলেন তাঁরা শাড়ি পরলেও, বাংলায় কথা বললেও তাঁদের বব-করা আধ-পাকা চুল ও সিঁদুরবিহীন সীমন্ত দেখে অবাঙালী বলেই মনে হল। পরে এঁদের সঙ্গে আলাপ হয় "মনসাবল" লেকের ধারে। থিয়েটার রোডে থাকেন। মাঝে লড়াইয়ের সময় কিছুদিন ছিলেন সাহারানপুরে। আমি অবশ্য দেখি নি কখনও এঁদের। কথায় কথায় ভদ্রলোকটি বললেন যে কাশ্মীর সুইজারল্যাণ্ডের চাইতেও সুন্দর। বোঝা গেল যে মহাশয় ইউরোপ বেড়িয়ে এসেছেন। সাজ-সজ্জার চাইতে কথার সুর উঁচু পর্দায় বাঁধা।

বাস শহর ছেড়ে উত্তরে এগিয়ে চলল। রাস্তার দু ধারে সুদৃশ্য পপলার। গাছগুলো ইউক্যালিপটাস গাছের মত সোজা, সরল, শুভ্র কাণ্ড, পাতাও অনেকটা ওই রকম। তবে ইউক্যালিপটাসের মত অত বড় গাছ কোথাও দেখলাম না। দু ধারে ধানের ক্ষেত। জলের অভাব নেই। মাইলের পর মাইল শুধু রোয়া ধান। কাশ্মীরে যেখানেই গেছি দেখেছি বহুদূর বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। পাহাড়ের গায়েও খাঁজ কেটে জমি বের করে ধানের চাষ হচ্ছে। জঙ্গল কোথাও দেখি নি, একেবারে পাহাড়ের গায়ে ছাড়া। গ্রামও বিশেষ নজরে পড়ে না, দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের অঞ্চলে ছেয়ে আছে ধরণীর বুক। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের সারি। আমরা এগিয়ে চলেছি বারামুলার পথে। মাঝপথে পট্টনে নেমে দেখা গেল একটি শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। রাজা শঙ্কর বর্মণের স্থাপিত ন শো শতাব্দীতে। মন্দিরের গঠনভঙ্গী অবন্তীপুরের মন্দিরের মতই।

রাস্তায় অন্য কোনও যানবাহন নেই। শুধু দেখছি মিলিটারী লরি আর যুদ্ধোপকরণবাহী শকটশ্রেণীর দ্রুত গমন। কাশ্মীরে যে রাস্তায় গেছি, দেখেছি অগণিত সামরিক স্কন্ধাবার। বিশেষ করে বারামুলার পথে তো একেবারে জমজমাট ব্যবস্থা। পাকিস্তানের মাটি মাত্র দশ মাইল দূরে।

বেলা প্রায় এগারটায় এসে পৌঁছলাম সোপর। এখানে ঝিলমের ওপর যে দেওদার কাঠের পুল আছে তার ওপর দিয়ে যাত্রী বা মাল বোঝাই বাস যেতে দেওয়া হয় না। আমরা সবাই বাস থেকে নেমে কাশ্মীরের বৈশিষ্ট দেবদারুর পুল হেঁটে পার হয়ে এলাম। এখানে ঝিলমের স্রোত কী ভয়াবহ! সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে ঝিলমের নীল জল। ওপরে নীল আকাশ। চারিদিক ঘিরে নীল পর্বতের পটভূমি, স্নিগ্ধ সূর্যালোকে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম সেই প্রবল জল-স্রোতের দিকে।

সোপর ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। একটি সিনেমা হাউসও চোখে পড়ল। বারামুলা মাত্র সাত মাইল। টাউনটা বেশ নোংরা। যে যায়গা বছরে ছ মাস বরফে ঢাকা থাকে সেখানে লোকগুলো বোধ হয় দায়ে পড়েই নোংরা হয়। এখানে আমরা কিছু চেরী ফল কিনলাম। থিয়েটার রোডের ভদ্রলোকরা মনে হয় দুপুরের খাবার সঙ্গে করে আনেন নি, তাঁরা নোংরা তেলেভাজার দোকান থেকে মাছি-পড়া মাছ ভাজা ও আরও অন্যান্য কিছু খাবার সেই নোংরা লোকদের কাছ থেকে কিনলেন। বাস ছাড়ল আধ ঘণ্টা পরে।

এখান থেকে আমরা চলেছি সোজা উত্তরে। ডান দিকে গাছপালার ঘন সমাবেশ। বাঁ দিকে ধূসর রুক্ষ পাহাড়, তারই গা বেয়ে সর্পিল পথ। পথ পিচ দেওয়া নয়। পাহাড়ের গা কেটে বের করা হয়েছে

কাঁচা রাস্তা। বেশ চড়াই, মোটরের ইঞ্জিনটা খুব শব্দ করে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে। খানিকটা উপরে উঠে একটা বাঁক ঘুরতেই ডান দিকে চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুদূর বিস্তৃত সবুজ জলরাশি। এই হচ্ছে উলার।

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছি ভারতবর্ষে দুটি হ্রদ—একটি কাশ্মীরের উলার আর একটি রাজপুতানার সম্বর। তখন থেকেই উলারের স্বপ্ন দেখেছি, হ্রদ কেমন হয়। কখনও জীবনে দেখব এ কল্পনাও করি নি। যতটা সুন্দর কল্পনাতে এঁকেছিলাম তা যেন পেলাম না। মনে ভাবতাম পরিষ্কার নীল জলরাশি ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে চারিদিকের শ্যামল বনানী ঢাকা পাহাড়ের কোলে। তাদের চূড়ায় শুভ্র বরফ সূর্যকিরণে ঝলমল করছে নীল আকাশের তলে। এখানে পেলাম ধূসর বৃক্ষলতাহীন পাহাড়ের কোলে হালকা সবুজ জলরাশি। এই পাহাড়ের নীচেই জল একটু পরিষ্কার, তার পরে নানা জলজ উদ্ভিদে হ্রদের জলের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন মস্ত বড় একটা মাঠ বন্যায় ভেসে গেছে। হ্রদের ওপারের পাহাড়কে অতিক্রম করে বহুদূরে দিগন্তরেখায় আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তুষার-কিরীট সোনামার্গের পর্বতরাজি।

আমরা আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম। তারপর হ্রদকে প্রদক্ষিণ করে আমাদের বাস ফিরে চলল মনসাবল হ্রদের পথে। এদিকে না আছে হ্রদের সৌন্দর্য, না আছে পাহাড়ের। সমস্তটা এক বিরাট জলাভূমি বলে মনে হতে লাগল। হ্রদকে পিছনে ফেলে এসে বাস থামল একটা গ্রামে। এখানে ছোট ঝরনা থেকে সবাই পানীয় জল ভরে নিলেন নিজেদের ফ্লাস্কে। এই গ্রামে পনীর (cheese) খুব বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। শুনলাম খেতেও খুব ভাল। যাঁদের লাঞ্চের ব্যবস্থা অনিশ্চিত তাঁরাই ঝুঁকে পড়লেন।

বেলা প্রায় দুটোয় এসে পৌঁছলাম মনসাবল হ্রদের ধারের ডাকবাংলোতে। এসে দেখি আমাদের পূর্বেই আরও দুটি বাস টুরিস্টদের নিয়ে এসে রয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। পাহাড়ের কোলে এই হ্রদটি খুব বড় নয়। এই হ্রদ দেখে আমার কল্পিত হ্রদ দেখার স্বপ্ন যেন খানিকটা পূর্ণ হল। সবুজে ছাওয়া পাহাড়ের কোলে শান্ত জলরাশি সূর্যের দীপ্তিতে চকচক করছে আর তা' ছোট ছোট ঢেউগুলি আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়ছে পাহাড়ের পায়ে।

সকলের শেষে ছাড়ল আমাদের বাস, ফিরে চললাম শ্রীনগরের পথে।

মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট গ্রাম আর ফলের বাগান। তাতে রয়েছে আপেল বাদাম এপ্রিকট চেরীর অসংখ্য গাছ। সবগুলিই কচি কচি সবুজ ফলভারে সমৃদ্ধ। এখনও রঙ ধরে নি। দ্রুতগতি বাসে বসে ফলের বৈশিষ্ট্য চোখে ধরা পড়ে না। তবে মনে হল যে এই ফলের গাছগুলি প্রায় সবই সমগোত্রের। পিচ গাছের মত। সেই রকমই ডালপালা পাতা, ছোট বড়র তফাত মাত্র। আমরা যে সময় এসেছি সে সময় না আছে ফুল, না আছে ফল। তাই কাশ্মীরে আসার সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস। বর্ষার জলে যখন সব মালিন্য ধুয়ে যায়, ঘন নীল আকাশে সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণে খেলা চলতে থাকে, পাহাড়ে পর্বতে সবুজের কোমল পরশ তাদের রুক্ষ সৌন্দর্যকে আড়াল করে রাখে তখনই কাশ্মীর ভ্রমণের প্রকৃষ্ট সময়। আমরা এ সৌন্দর্য দেখি নি কিন্তু অভাব খানিকটা পুষিয়ে নিয়েছি রঙিন গগল্‌স্ চোখে দিয়ে। তুমি বিশ্বাস করবে না যে গগল্‌স্ চোখে দিয়ে আর খুলে রেখে চারিদিকের দৃশ্যের কত তফাত হয়ে যায়। কাশ্মীরের সঙ্গে আমাদের চার চোখের মিলন হল এই গগল্‌সের মারফত। তাই বুঝি কাশ্মীর এত ভাল লাগল।

ক্ষীরভবানী: উলার দেখে ফেরবার পথে হিন্দুদের তীর্থস্থান। জনশ্রুতি, রাবণের তপস্যায় প্রীত হয়ে দেবী পার্বতী লঙ্কাতেই অবস্থান করেন। পরে সীতা-হরণ প্রভৃতি কুকার্যে অসন্তুষ্ট হয়ে দেবী লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসের পথে "সতী-ঘরে" এসে বাস করতে থাকেন। এই সতী-ঘরই কাশ্মীর। "তুলামুল্লা" উৎসের ধারে দেবী আর তাঁর সঙ্গী তিনশো ষাট নাগ ভক্তদের দেওয়া

দুধ পান করে তৃপ্ত হতেন, তাই দেবী পার্বতী এখানে ক্ষীরভবানী।

পাহাড়ের পাদদেশে অনেকটা সমতল জায়গা জুড়ে মন্দির। বাস দাঁড়ানোর জন্য বিস্তৃত ময়দান, চারিদিকে সুউচ্চ পপলারের সারি। ফুলবাগানের ভিতর দিয়ে মন্দিরে যাবার পথ, পথের শেষে মন্দিরের বিরাট অঙ্গন। ক্ষীণ জলধারার ওপর দিয়ে সাঁকোর পথে আসতে হয় প্রাঙ্গণের দরজায়। দরজার পাশেই "চেতাবনী"—'মচ্ছি, মাস থাকর অন্দর ঘুসনা মানা হ্যায়।' চামড়ার জিনিস নিয়েও কেউ ভেতরে যাবেন না, ক্যামেরার খাপও খুলে রাখতে হল। মেয়েরা জুতো খুলে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ভ্যানিটি দেখিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ প্রায় একটা ফুটবল মাঠের মত। চারিদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা—দু ধারে যত্ন করে রাখা হয়েছে বহু পুরনো চিনার গাছগুলি। এক-একটার গুঁড়ির ব্যাস পঁচিশ-তিরিশ ফুট হবে।

এখানে একটা জলের উৎস আছে, শুনলাম তার জলের রঙ সপ্তাহে সপ্তাহে বদলায়। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে জলের রঙ সত্যিই বদলায় কিনা দেখার সময় ছিল না। কাজেই নির্বিবাদে মেনে নিতে হল। উৎসের জল বাঁধিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্র এক জলাশয়, তার মধ্যে ছোট মন্দির, অমৃতসরের শিখ মন্দিরের মত। তবে এখানে মন্দিরে যাবার কোনও পথ নেই। মন্দিরে আছেন দুটি পাথরের স্তূপ—দেবীর পীঠস্থান। অনেকেই সেই জলাশয়ে বিগ্রহের উদ্দেশে ফুল আর জঙলী পাতার অঞ্জলি দিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যে মন্দিরের অঙ্গনের দরজায় ফুল-পাতা বিক্রি করছে মুসলমানরা। কাশ্মীরে দেখেছি হিন্দু মুসলমান এক হয়ে আছে। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে এখানে খুব বড় মেলা হয়, তা ছাড়া ভক্তরা প্রতি শুক্লাষ্টমী ও পূর্ণিমাতে দেবীদর্শন করতে আসেন।

এদিকটায় রাস্তার দু ধারে জঙলী ডালিমের ঘন বন। ফুলের ভারে অবনত তাদের শাখা-প্রশাখা। ডালিমের ফুল যে এত সুন্দর হয় তা আগে লক্ষ্য করি নি। গুচ্ছে গুচ্ছে লাল পাটকিলে রঙের ফুলগুলি ঘন সবুজ ছোট্ট পাতার কুটিরের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে, কেউ বা সাহস করে বাইরেই বেরিয়ে এসেছে। ফুলের ভারে নুইয়ে পড়া একটি ডালিমের শাখা ভেঙে তোমার মার হাতে দিলাম।

বাস ছাড়ল। নাগিন লেকের ধার দিয়ে হজরতবাল মসজিদের সামনে দিয়ে চলেছি শ্রীনগরে। এই হজরতবাল মসজিদ থেকেই শেখ আবদুল্লা বিষ উদ্‌গিরণ করেছেন ভারতের বিরুদ্ধে। এইটিই কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় মসজিদ। অল্প সময়েই পৌঁছে গেলাম টুরিস্ট-কেন্দ্রে।

[ক্রমশঃ]

জোর

সুশীল সিংহ

পথ চলার সময় রাস্তা নিরিবিলি হলে, সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চেনা অচেনা কোন মানুষের দেখা না পেলে বা ঘরের কোণে কখনও একলা হলে বাঁ-হাতের আঙুলগুলোকে নাড়ার চেষ্টা করা অবিনাশের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা অবিনাশের ইচ্ছেমত সোজা বাঁকা হয়, দুমড়ে যায় কিন্তু আর চারটে হয় না। অবিনাশ বাঁ-হাতের মুঠি পাকাতে পারে না। আঙুল নোয় না, নড়ে না। তাই হাতের পাতাটাই কেমন যেন কুঁকড়ে গেছে। অবিনাশের মনে হয় যখনই সে দুটি হাতের পাতা মিলিয়ে দেখে, তুলনা করে, তখনই মনে হয়, তার চারটে আঙুল দিনে দিনে কেবলই আরও পানসে, ফ্যাকাশে, রোগা, আরও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

খুবই গোপনে একান্ত নিভৃতে সে তাই আঙুল নাড়াবার, মুঠি পাকাবার চেষ্টা করে। তখন তাকে অন্যরকম দেখায়। শরীরের সমস্ত জোর বাম অঙ্গে সঞ্চারিত করার চেষ্টায় শরীরটাই সেদিকে হেলে পড়ে। দাঁতের ওপর দাঁত বসে চোয়াল বেরিয়ে যায়। শরীরের তুলনায় বেমানান চওড়া কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করে ওঠে। নস্যি তার নেশা। নাসারন্ধ্র আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ত্রিশ বছরের যুবক অবিনাশ এক ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিফল হয়।

এ-হেন চেষ্টার জন্য, এই গোপনতা, এই নিভৃতির প্রয়োজন কিন্তু মাস দুয়েক আগেও আদৌ ছিল না। বন্ধুরা বলত চেষ্টা করতে। মৌখিক আশ্বাস, উৎসাহ দিত। সেও চেষ্টা করত। রাত্রে স্ত্রী অত্যন্ত যত্নে তার আঙুলে মালিশ করে দিত। বলত, একটুও কি জোর পাচ্ছ না?

পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

পাবেই তো। একবার চেষ্টা করে দেখ না।

অবিনাশের আঙুলগুলো অসহায় ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠত। ঘরের মেঝেয় রাখা হ্যারিকেনের ম্লান আলো সেই হাতের পাতায়, তার স্ত্রীর চোখেমুখে আলো-ছায়া ফেলত। কোন-কোনদিন নিজেকে সামলাতে না পেরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলত তার স্ত্রী। নিজের কথা ভুলে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিত অবিনাশ। রাত্রিটা যে পথে হাঁটছিল সে পথ থেকে এই ভাবে চকিতে সরে গিয়ে অন্য দিগন্তের সামনে দাঁড়াত। রাত্রি সুন্দর হত।

আজও দিন রাত্রির নির্দিষ্ট বিভক্তিতে সময় বয়ে যায়। দিনে কারখানা আর রাত্রে হ্যারিকেনের আলো যথারীতি একঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হাতের হারানো শক্তি, স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার জন্য সে আর চেষ্টা করে না। এমন কি স্ত্রীর সামনেও না। আর পাঁচজন সুস্থ সমর্থ মানুষ যেমন বিশেষ ভাবে তার শরীরের যে কোন অঙ্গের কথা মনে রাখে না, অবিনাশেরও যেন তাই। অন্ততঃ ভাবটা তাই।

চেষ্টাটা তাই সে নিজের জন্য, একার জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছে। মনে মনে কোন অপরাধ করার মত একা। সে চেষ্টার জন্য পথ নির্জন হওয়া চাই, তবে ঘরে বাইরে একই অবস্থা।

হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময় ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, মাঝে মাঝে চেষ্টা করবেন। খুব বেশী জোর দেবেন না। ধীরে ধীরে হবে।

বাড়ির কথা, স্ত্রী, একমাত্র ছেলে ও বিধবা মার কথা, কারখানা ও জীবিকার কথা অবিনাশ যা বহুবার ডাক্তার বাবুকে জানিয়েছে হাসপাতাল থেকে চলে আসার আগে, আবার তা জানাল। আগের জোর, সেই হাত নাড়া, আঙুল সোজা করা, বাঁকানো, ঘুষি পাকানো, খেলানো সেই সব তার দরকার। সব, সব, সব। এক একটা কাঁচের পাতের ওজন পনের থেকে পঁয়ত্রিশ সের। ক্ষেত্র-

LIFEBUOY
SOAP
ময়লা আপনার লাগছেই, লাইফবয় সাবানের
কার্যকারী ফেনায় ধুলো ময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে যায়। পরিবারের সবার
স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে নিয়মিত লাইফবয় মেখে স্নান করুন।

বিশেষে ওজনের এদিক ওদিকও হয়। ব্যারো (Barrow) থেকে এক একটা সীটকে তোলা, ফেণ্টে শোয়ানো, তারপর হুইল দিয়ে— হাতের জোর চাইই যে। আমার বাঁ-হাত।

দুটি হাতের জোর আগের মত না থাকলে সে কাজ করবে কি করে, খাবে কি! এই ভেবে অবিনাশ উতলা হয়েছিল। তার ভবিষ্যৎটা ডুকরে উঠেছিল।

সেদিন ডাক্তারবাবু আরও অন্যান্য নির্দেশের সঙ্গে তার হাতে একটি নিটোল গোল নুড়ি দিয়েছিলেন। আধপোটাক ওজন সেটার। ডাক্তারবাবু নির্দেশ দিয়েছিলেন, এটাকে হাতে রাখবেন, নাড়াচাড়া করবেন। কাজ হবে। যদি দেখেন নাড়াচাড়া করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তাহলে আলতোভাবে সামান্য ওপরে তুলে লুফবেন। এই ভাবে।

এই বলে ডাক্তারবাবু নুড়িটাকে নেড়ে লুফে দেখিয়েছিলেন।

যেন কোন উপহার দেওয়া হয়েছে অবিনাশকে এই ভাবে সে পাথরটাকে দেখতে দেখতে বলেছিল, ভারী সুন্দর জিনিসটা তো। কোথায় পাওয়া যায় এগুলো?

খুবই সংযত আগ্রহে, স্মিতহাস্যে জানতে চেয়েছিল অবিনাশ। একটু আগেও যে লোকটা তার ঘর সংসার, জীবিকা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদির কথা বলতে বলতে ককিয়ে উঠেছিল এ যেন সে লোক নয়। কোথাকার নুড়ি, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জানার আগ্রহেই যেন তার সময়ের অনেকটা নিয়মিত ভাবে ব্যয় হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে পাওয়া যায়। প্রচুর।

তাই বুঝি?

এ-হেন একটা খবর জানা ছিল না বলেই যেন এতদিন অবিনাশের হরিদ্বার যাওয়া হয় নি। যেন তার পকেটে মুঠো মুঠো টাকা খচখচ করছে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই সে সোজা হরিদ্বার চলে যাবে। যেহেতু সেখানে এ-হেন সুন্দর সুন্দর সব নুড়ি অনেক পড়ে আছে।

যাই হোক, অবিনাশ নুড়িটা বাঁ-হাতের তেলোয় রাখত। নাড়াচাড়াও করত। সে একা নয়, সহকর্মী এবং জানাশোনা আরও অনেকেই। টিকিট ক্লার্ক রায়দা বলেছিল, কি আর হবে অবিনাশ। দাও, ওটাকে পেপারওয়েট করি।

তবে আর কি? আমি বলে আমার হাত নিয়ে মরছি আর আপনি এটাকে কাগজ-চাপা করার কথা বলছেন?

আমি লোকটা যে এখনও অসুস্থ, আমার বাঁ-হাতটা যে এখনও হারানো শক্তি ফিরে পায় নি এ কথাটা সহজে জানাতে অবিনাশের কোন সংশয় ছিল না। ক্লেশও না।

এর পর ন মাস কেটে যাওয়ার পরেও যখন হাতের কোন উন্নতি হল না, হাতটা কেমন আছে এ কথাটা জানা যখন নিয়মের মত কেবল তার স্ত্রী আর মার দৈনন্দিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল তখন অবিনাশ একদিন বিনা ভূমিকায় সত্যিই সেই নুড়িটা রায়দাকে দিয়ে দিল।

তোমার লাগবে না?

না।—অবিনাশ যোগ করল, ডাক্তারবাবু বলেছেন ওটা আর লাগবে না। আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

অথচ ডাক্তারবাবুর কাছে অবিনাশ আদৌ যায় নি। সে যে শুধু মিথ্যা বলল তাই নয়। নিজের হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য সমস্ত চেষ্টা নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলার ব্যাপারে এই তার প্রথম ধাপ। অবিনাশ নিজেও তা জানত না।

নিরিবিলিতে অবিনাশ যেমন হাত মুঠো করার চেষ্টা করে তেমনি কোন-কোনদিন পথের ধারের একখণ্ড পাথর বা ইট তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টাও করে।

একবার— এই তো সেদিন, তার খেয়াল হয়েছিল যে ডান হাতে করে একটা পাথরকে নিজের মাথার উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে বাঁ-হাতে লুফবে। আঙুল মেলতে না পারলে পাথরটা আঙুলগুলোর গাঁটে আঘাত করবে। তাই স্নায়ুগুলো সাবধান হয়ে হয়তো বাঁ-হাতটাকে আপনিই মেলে দেবে। অবিনাশ বারবার চেষ্টা করতে থাকল। পাথরটাকে ছুঁড়ে দেয় ঠিকই কিন্তু হাত আর মেলা হয় না। হাতটা যেন শরীরের দিকে আরও সিঁটিয়ে আসে।

সেদিন অবিনাশ যখন আপনার মনে তন্ময় হয়ে একা একা এ-হেন চেষ্টা করছিল তখন সে দেখতে পায় নি যে তার পিছনে অদূরে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটাকে যখন সে দেখল তখন সে ভ্রূক্ষেপ করল না। কুকুরই তো। সুতরাং সে আবার চেষ্টা করল। অবিনাশের মনে যাই

থাক্, রাস্তার কুকুরটা এতে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। অবিনাশ যখন হাঁটতে আরম্ভ করল তখন কুকুরটা তার পিছু নিয়েছে। তার ডাকে কোথা থেকে আরও দু-চারটে কুকুর দৌড়ে এসে দলে মিশেছে।

এর পর থেকে পথে অনুরূপ চেষ্টা করা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঃ, সেদিন তার বুকটা যে কি রকম করেছিল তা সেই-ই জানে।

কারখানার অফিসে অবশ্য সে পেপারওয়েট নাড়ার অছিলায় হাতে ওজন নিতে পারে। লোকে কথার ফাঁকে টেবিলের টুকিটাকি জিনিস, পেপারওয়েট, পিন প্যাড, পাঞ্চ হাতে করে নাড়াচাড়া করে না? আঙুলে করে ঘোরায় না? তবে? একদিন কাজের ফাঁকে অবিনাশ তাই করছিল।

মায়া বলেছিল, আরে, তোমার সেই যে নুড়িটা ছিল সেটা কি হল?

সেটা টিকিট-সেকশনের রায়দাকে দিয়ে দিয়েছি।

ভারী চমৎকার দেখতে কিন্তু পাথরটা। দিলে কেন?

এ কথাটার মধ্যে কি ছিল জানি না। অবিনাশ অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গি করে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, দিয়েছি, বেশ করেছি দিয়েছি। কারও বাবার জিনিস তো আর দিই নি।

আজকাল নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে অবিনাশের সঙ্গে অনেকেরই প্রায় রোজই একটা অশান্তি হয়। কোন-কোনদিন এ সবের বিবরণ বিভাগীয় বড় সাহেবের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে সাহেবের চোখে গত দু মাসে অবিনাশ একটা আপদ হয়ে উঠেছে। তিনি পরিষ্কার ইংরেজীতে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এটা আদালত নয়। তোমার যদি খুবই খারাপ লাগে সকলকে, তুমি যেতে পার তা হলে। আমি এখনও তোমাকে কমপেনসেশন দিতে পারি। নেবে?

সাহেবের এই সাফ কথা অবিনাশ শুনেছে পরশু দিন।

এখন কার্তিকের মাঝামাঝি। কারখানার যখন ছুটি হয়, সেই বিকেল পাঁচটাতেই আকাশটা নিভে আসে। অবিনাশ জানে যে মানুষের শরীরের রক্তের সঙ্গে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের রঙের মিল নেই। রক্ত কালচে লাল। অবিনাশ নিজের [illegible] দেখে তা জেনেছে। দুটো র[illegible] পার্থক্য সে [illegible] তবু জানি না কেন আজকাল [illegible] কার্তিকের মা[illegible]মাঝি, বিশেষতঃ গত পরশু থেকে বা[illegible] ফেরার পথে যখন আকাশটা দেখে, যখন দিনান্তের [illegible] আকাশে অপরূপ বর্ণসমারোহ, যখন পথের ধা[illegible] টেলিফোন ইত্যাদি তারের ওপর অজস্র চড়ুই বসে থা[illegible] তখন তার কেবলই সেই দুর্ঘটনার দিনটা বড় বেশী ক[illegible] মনে পড়ে। অ[illegible]শ যেন অমনি সূর্যটার মত জলছি[illegible] তারপর কে যেন, কোন অসাধারণ মুহূর্তে হাতের ও[illegible] একটা বিরাট কাঁচের পাত ফেলে চারপাশ রক্তে ভিজি[illegible] দিয়েছে। মাখামাখি হয়ে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অবিনাশ দেখল যে ত[illegible] দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে নিজেদের মধ্যে ক[illegible] বলছে। পড়ুয়া ছেলে—পাড়ারই। বছর পনরো [illegible] হবে। অবিনাশ তাদের চেনে। অবিনাশকে আস[illegible] দেখে ছেলে দুটি নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে অন্য দি[illegible] দিয়ে চলে গেল।

ছেলে দুটিকে চলে যেতে দেখে ভীষণ রাগ [illegible] অবিনাশের। ইচ্ছে হল চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস ক[illegible] দুটোর গালে চড়িয়ে দেয়। দেবে না তো কি! ওরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছিল তা নিজের কানে শুনেও তো সে বলে দিতে পারে। সে যে এতদিনেও [illegible] আঙুল সোজা করতে পারে না, কারখানায় কাঁচ কাট[illegible] কাজ করতে পারে না, নানা এলোমেলো ফাইফরমা[illegible] কাজ করে টিকে আছে, সেটা অবশ্য আগের মতই প[illegible] এই সব কথাই আলোচনা করছিল ওরা। যেদিন সন্ধ্যা[illegible] ওকে কুকুরে তাড়া করেছিল, এই ছেলে দুটোই লেলি[illegible] দিয়ে থাকবে। এরাই আবার পড়ুয়া ছেলে! যত সব

বাড়ির সামনে তো আর বিভাগীয় বড় সাহেব নে[illegible] এই কথাগুলো, যেগুলো তার জিভের আগায় নাচছিল সে বলেই ফেলত, কিন্তু ছেলে দুটো তখন চলে গেছে।

দুজন পনরো বছরের ছাত্র যে নিজেদের মধ্যে হা[illegible] কথা বলতে পারে এবং সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার জন্য বা তা[illegible] আসতে দেখে বাড়ি চলে যেতে পারে, এ কথাটা তার এ[illegible] বারও মনে হল না। অবিনাশ মনে মনে ধরেই নিয়ে[illegible] যে বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফি[illegible]

আলোচনা করছে আর তাকে উপস্থিত হতে দেখলেই চুপ করে যাচ্ছে। কারখানাতেও তো এই চলছে। বাইরেও শুরু হয়েছে। তার অবর্তমানে তাকে নিয়ে আলোচনা করলে তার যে রীতিমত রাগ করার অধিকার আছে এ কথাটা কেউ ভেবে দেখে না। বিভাগীয় সাহেব বা কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক যে কেউ যদি তার এই দিকটা ভেবে দেখত, তা হলে মাম্মা, রায়দা কিংবা বাসুদেব চক্রবর্তীকে সে থামাতে পারত। তা তো নয়। যেহেতু সে নিজে কানে শোনে নি সেইহেতু তার কথা গ্রাহ্য নয়। অনুমান বলে একটা জিনিস আছে তো! তা ধরা হবে না। কেবল সে মুখ খারাপ করলেই দোষ হবে। কি হবে, যার শরীরটা সবটা থেকেও নেই, যার অমন সুন্দর আঙুলগুলো এমন হয়ে গেল, ভাগ্য যাকে মেরেছে, তার দিকে তো কেউ তাকাবেই না। সত্যি যারা দোষ করছে তারাই প্রশ্রয় পাবে। আর সে কেবল সইবে। পৃথিবীর কাছেই সে যে পর হয়ে গেছে।

অবিনাশের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল কোন সাড়া না দিয়ে সে ভিতরে গেল।

ঘর বলতে তো দেড়খানা। একটা মোটামুটি প্রমাণ মাপের। আর একটা তারই আধখানা। আধখানা ঘরটি ঠাকুরঘর ও তার মার শোবার ঘর। কোন ঘরেই চৌকি বা তক্তাপোশের বালাই নেই। সুতরাং চলা-ফেরা করা যায়। লাগোয়া বারান্দার একটা পাশ ঘিরে রান্নাঘর হয়েছে। এক চিলতে উঠোনও আছে। তারই এক কোণে চাটাইঘেরা স্নানঘর। জল অবশ্য বাইরে থেকে তুলে আনতে হয়।

ঘরে প্রাণী বলতে তাকে বাদ দিলে আড়াই জন। তিন বছরের ছেলেটা তখনও বাইরে ছিল। প্রতিবেশী ঘরের কোন সপ্তদশী তাকে প্রায়ই ট্যাঁকে করে বেড়াতে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, তার মা ও স্ত্রী ছিল রান্নাঘরে।

বাড়িতে ঢোকার আগেও অবিনাশ স্পষ্ট টের পাচ্ছিল যে মা আর স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আর এখন, যেই সে ঘরে এসেছে অমনি চুপ। আশ্চর্য! সব বেইমান। বাইরের লোককে দুষে আর কি হবে!

অবিনাশ কান খাড়া করে শুনল। মা যেন বলল, বউমা, চায়ের জল তাড়াতাড়ি কর। খোকা এসেছে।

বউ যেন বলল, জানি। এই করছি।

কথাগুলো সে স্পষ্ট শুনতে পেল না বলে অতি-মাত্রায় সজাগ হয়ে বসেই রইল। কিন্তু বাড়ির মধ্যে আর কোন কথা নেই। সব চুপ।

অবিনাশ হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরে শতরঞ্চির ওপর বসল। ইতিমধ্যে তার মা ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেখিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়েছে, আর একটু পরেই হ্যারিকেন জ্বলে উঠবে।

তার স্ত্রী এনামেলের থালায় কিছু মুড়ি, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ আর একটু গুড় দিয়ে গেল। এর পর চা আনবে। একগাল মুড়ি হাতে নিয়ে অবিনাশ ডাকল, শোন।

কি?

কি কথা বলছিলে তোমরা?

কথা?

আঃ, তুমি আর মা। কি কথা বলছিলে?

কখন?

আমি বাড়ি আসার আগে।

সে সারা দুপুরে কত কথা বলেছি, তা কি মনে আছে?

সারা দুপুর নয়, বাড়িতে ঢোকার আগে।

কি যে বল, কি কথা আবার বলব?—বলে তার স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

অসাবধানে মুড়ি চিবোতে গিয়ে অবিনাশ নিজের গাল কামড়ে ফেলল। কিন্তু তার জন্যে জল চাইল না, বা কাউকে ডাকল না।

এক পেয়ালা চা নিয়ে স্ত্রী এল আবার। চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। সধূম পেয়ালা স্বামীর সামনে নামিয়ে সে নিজেও বসল। অবিনাশ কোন কথা বলল না। একটু আগেই যে গাল কামড়ে ফেলেছে সে কথাও নয়।

স্ত্রী বলল, শোন।

অবিনাশ মুখ তুলে চাইল।

আমি বলছিলাম—

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে মাঝপথে থেমে গেল সে।

কি?

কবরেজী করালে হয় না?

কার জন্যে? মার হাঁপের রোগ কি আবার বেড়েছে?

না। মার জন্যে নয়। ওরা বলছিল যে কবরেজী

তেল মালিশে অনেক সময় ভাল হয়ে যায়। ওদের পরিচিত একজন খুব বড় কবরেজ আছে। একবার দেখাবে?

অবিনাশ শুধু জানতে চাইল, ওরা কারা?

তার স্ত্রী ওরা বলতে পাশের বাড়ির ওপাশের বাড়ির গিন্নীর কথা বলেছে।

চকিতে অবিনাশের চেহারা পালটে গেল। একেবারে অগ্নিমূর্তি। চেঁচিয়ে বলল, ধন্যি সতীলক্ষ্মী, ধন্যি! কেন? তোমার স্বামীর কি কুষ্ঠ হয়েছে যে রাজ্যসুদ্ধ লোকের কাছে পরামর্শ না নিলে চলছে না?

অবিনাশের তখন মাথার ঠিক নেই। তার স্ত্রী কোন কথা বলছে না। তার চিৎকারে তার মাও যে ঘরের কোণে এসে দাঁড়িয়েছে তাও সে দেখতে পায় নি। কিংবা দেখলেও কিছু যায় আসে না তার। সেই ভাবে সে বলল, কি চাও কি তোমরা? কি পাচ্ছ না? গাণ্ডে-পিণ্ডে গেলার ব্যবস্থা তো আগের মতই করে রেখেছি। তোমাকে রাস্তায় নামতে হয়েছে, না, মাকে ভিক্ষে করতে হচ্ছে?

অবিনাশের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। চওড়া কপালে একটা শিরা কাঁপছে। তবু সে থামছে না। সে যা বললে, আগের কথার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই তার। সে যা বলল তা কোন পুরুষ নিজের মার সামনে বলতে পারে না। অমন ভাবে পারে না। অবিনাশ বলল, কি চাও তবে? আর একটা ছেলে চাও। তাও দিতে পারি। আমি বুড়ো হই নি, অথর্ব হই নি, বুঝলে?

এই বলে মুড়ির থালাটাকে উলটে দিয়ে অবিনাশ রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কার্তিকের সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির বাইরে বেরুলে যে গায়ে কিছু জড়িয়ে যাওয়া দরকার সে কথা বলার অবকাশ পর্যন্ত মাকে দিল না। পিছন ফিরে দেখলও না। পায়ের নীচের ঘাস তখন ভিজে ভিজে হয়ে উঠেছে।

অথচ স্ত্রৈণ বলে অবিনাশের একটা সুনাম বা বদনাম আছে। যে মানুষ নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে এবং গোটা সংসারকে ভালবাসে সে যদি স্ত্রৈণ হয়, অবিনাশ তাহলে নিশ্চয়ই তাই। স্ত্রীর ছোটখাটো আবদার রাখতে তার আগ্রহ কোন কম ছিল না, এ তো সত্যি কথা। আর তাই তার ঘরে দুটো সুন্দর মোড়া এখনও আছে। লোকজন এলে বসতে দিতে দেখতে বেশ। হয়তো ক্রমে ক্রমে নিতান্ত স্ত্রীর আবদারেই অবিনাশের ঘরে এ-হেন টুকিটাকি জিনিস আরও দু চারটি হত। কিন্তু তা হল না। কেন না দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

কাঁচ কারখানায় কাঁচ কাটার কাজ করে অনেকেই। টেবিলে ফেল্ট লাগানো। বাঁ-হাতে কাঁচভর্তি ব্যারো। ব্যারো থেকে কাঁচের পাত তুলে ফেল্টে ফেলা। হাতে দস্তানা কব্জী পর্যন্ত। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার আবরণী। ডায়মণ্ড দিয়ে বা কেরোসিনে ডোবানো হুইল দিয়ে পাতের ওপর দ্রুত হাতে টেনে যাওয়া। সাইজ অনুযায়ী কাঁচ কাটা।

পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর ক্ষিপ্রতার ওপর উপার্জন বাড়ে। ইন্‌সেনটিভ-স্কীম কাজ। যত কাজ তত আয়। এই চুক্তি। সুতরাং হাতের ওপর কাজ। কর্মীদের মধ্যে যে বা যারা ইউনিয়ন নিয়ে মাতামাতি করে স্বাভাবিক কারণেই তারা প্রডাকসন দেয় কম। আর যারা ঘর-সংসারের মুখ চেয়ে কাজে আসে এবং সে কথাটাই বেশী করে মনে রাখে তারা প্রডাকসন করে বেশী। একবার টার্গেট করতে পারলে যেন খেপে যায়। এক মিনিটও থামতে রাজী হয় না। কাঁচের পর কাঁচ, সীটের পর সীট কেটেই যাচ্ছে, কেটেই যাচ্ছে। দূর থেকে চেয়ে দেখার মত।

তেমনি ক্ষিপ্রভাবে কাজ করতে করতে ব্যারো থেকে কাঁচ তোলার সময় টেবিলে ফেলার আগে মাথার ওপর ঝোলানো রেঞ্জে কাঁচের পাতটা ধাক্কা খেয়ে অবিনাশের হাতের ওপর কাঁচটা ভেঙে গেল। বাঁ-হাতের কব্জীর আরও চার আঙুল ওপরে হাঁ হয়ে গেছে। কাঁচে কাটা ছোরা চালানোর মত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। যারা অবিনাশকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।

হাসপাতালে তাকে থাকতে হয়েছিল একটানা দেড় মাস। এই দেড় মাস তাকে অপারেশন থিয়েটারে

নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিনবার। হাতের ক্ষত জুড়েছে। সেখানে একটা লম্বা গর্ত হয়ে গেছে।

প্রায়ই এই রকম হয়। অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা ছাড়াও নানা স্নায়ু দেহের সবকটি অঙ্গকে সচল রেখেছে। একবার বিযুক্ত হলে আবার তাদের আগের মত বিন্যস্ত করা খুবই দুঃসাধ্য। অবিনাশেরও হাতটা আছে। কোন কিছুই বাদ দিতে হয় নি। কিন্তু যে সমস্ত স্নায়ু হাতের আঙুলগুলোকে সচল রাখে তারা খোয়া গেছে। থেকেও নেই।

চিকিৎসার সব খরচ কোম্পানির। দুর্ঘটনার পর পুরনো কাজও সে করতে পারে না। কিছুদিন ধরে তাকে দিয়ে অফিস-অ্যাসিস্টান্টের কাজ করানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না। যেখানেই দেওয়া হচ্ছে বনিবনা নেই। তার অসাক্ষাতে সকলেই তাকে নিয়ে আলোচনা করে এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল। তাকে নিয়ে সব গোলমালের মূলও সেখানে।

সে রাত্রে অবিনাশ যখন বাড়ি এল তখন তার ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রে খেতে বসে আর কোন অশান্তি করল না সে। বরং বলল, ডালটা ভালই হয়েছে। মুসুর নাকি?

একসময় আলো নিবল। চারাদকে ঝিল্লীরব ঘন হয়ে উঠল। স্ত্রীর মাথা থেকে নারকোল তেলের চেনা গন্ধটা এসে নাকে লাগছে।

কিছুতেই অবিনাশের ঘুম এল না। মনে মনে তার বড় অনুশোচনা হচ্ছিল। সেই অনুশোচনা ঘুমটাকে যেন আড়াল করে দাঁড়াল। রাত্রি যতই বাড়তে লাগল ততই বিশেষ ভাবে নিজের ছেলেবেলার নানা টুকরো ঘটনা এলোমেলো ভাবে তার মনে ভেসে উঠতে লাগল।

অবিনাশ যখন ছোট ছিল তখন তার বাবা বলত, অবিনাশ মানে কি জানিস? যার বিনাশ নেই, ধ্বংস নেই।

এখনও মা মাঝে মাঝে সেই কথা বলে।

সেই দীর্ঘ রাত্রিতে এই সব কথা যত বেশী মনে পড়ল ঘুম তার তত বেশী দূর থেকে আরও দূরে সরে গেল।

নিদ্রাহীন দু-চোখ জেলে অবিনাশ তার বাঁ-হাতখান দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে উঠে বসে সেই অন্ধকা সে তার পাঁচ আঙুল মেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। কী করুণ, কী নির্মম সে চেষ্টা! তার কনুই তার বাহুমূ টনটন করে বাজছে। বাঁ-হাতটা অসহায় ভাবে কেঁ কেঁপে উঠছে। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কেবল মনে হতে লাগল সে পেরেছে—পেরেছে সে। তা আঙুলগুলো আগের মত—সেই আগের মত হয়ে গেছে সে তার ডান হাতখানা বাঁ-হাতের পাতার ওপ বোলাল। খুব ভালতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল তা প্রতিটি আঙুল সত্যিই সোজা হয়েছে কিনা। তারপ সেই মেলে দেওয়া হাতের পাতা খুব সন্তর্পণে স্ত্রীর পিঠে ওপর রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন তা গোটা হাতে, এমন কি ঘাড় আর বুকের বাঁ-দিকেও এক ব্যথার স্তূপ আড়ষ্ট হয়ে আছে। স্ত্রী উঠে পড়েছে। বাঁ হাতের পাতা পড়ে আছে শয্যায়। অবিনাশ চেয়ে চে দেখল, আঙুলগুলো যেন তার আরও নুয়ে কুঁকড়ে গেছে

কারখানায় কাজে বের হবার আগে প্রতিদিনের ম তার মা বলল, দুর্গা দুর্গা।

আর অবিনাশ মনে মনে বলল, দিনটা যেন শান্তিতে কাটে। যেন কারোর সঙ্গে ঝগড়া না হয়।

দরজা পার হতে পথে নামার আগে অবিনা আড়চোখে তার বাঁ-হাতটা একবার দেখে নিজে অজানতে হাতের পাতাটা জামার ঝোলা পকেটে ঢুকিয়ে দিল। আজই প্রথম।

সেই মুহূর্তে অবিনাশ জানত না যে এর পর যতই দি যাবে ততই সে কেবল নিরীহ হতে থাকবে। জানত ন যে এর পর রাস্তায় পথ চলার সময় এবং কারখানাতেও যতক্ষণ সম্ভব বাঁ-হাতটা পকেটে রাখা তার একটা অভ্যাস হয়ে যাবে।

জানত না, এতদিনে, এইমাত্র, কারখানা যাওয়ার ঠিক আগে তার হাতটা বাদ হয়ে গেল।

বাস্তু

প্রিয়নাথ বসু

নাঃ, ঘুম আসে না চোখে। বিনিদ্র রাতের প্রহর দুর্বহ বোঝার ভারে চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। মাথায় জলন্ত আগুনের দাপাদাপি। চিন্তার আগুন। দুঃসহ চিন্তা। অকল্পনীয়, অচিন্তিতপূর্ব চিন্তা। যে চিন্তা কেউ করে না কোনদিন, সেই চিন্তা। যে চিন্তার প্রতিকার নেই, অথচ আছে দাহ, সেই চিতানলে দগ্ধকারী চিন্তা। বাস্তু ছেড়ে পালাতে হচ্ছে। বাস্তু, বাস্তু। জন্মের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, পিতৃপিতামহের সঙ্গে, বংশের ধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত বাস্তু।

পাশ ফেরেন কেদারবাবু।

নাঃ, আগুন জ্বলছে মাথায়। ঘুম আসবে কী করে। দরকার নেই ঘুমের, জেগেই কাটিয়ে দিই বাস্তুর বুকে এ জীবনের শেষ রাত্রি। কালই তো অনিশ্চিতের যাত্রা। না এল ঘুম।

তবু শ্রান্ত দেহ ছেয়ে কখন আসে তন্দ্রা। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে আসে স্বপ্ন। বিছানা থেকে পড়ে যাচ্ছেন কেদারবাবু। পড়েই চলেছেন। পাতালের অনন্ত অন্ধকারের দিকে খসে পড়ছেন তীরবেগে। স্থানচ্যুত লক্ষভ্রষ্ট উল্কার মত অন্ধ বেগে। একটা কোনকিছু অবলম্বন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; চিৎকার করে ডাকছেন নাম ধরে ধরে। পুত্র কন্যা পুত্রবধূ নাতি নাতনী গোমস্তা চাকর সবাইকে ডাকছেন। সাড়া দিচ্ছে না কেউ। গলায় জোর নেই আর। আর পারছেন না ডাকতে। -পড়ে গেলাম, পড়ে গেলাম। উঃ, কি দুঃস্বপ্ন। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

বিছানা হাতড়ে উঠে বসেন কেদারবাবু। ধড়ফড় করছে বুক। থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ। ঘরের কোণের টিমটিমে লণ্ঠনটা দেন উসকে। টেবিলের উপরে ঢাকা দিয়ে রাখা এক গেলাস জল খেয়ে নেন এক চুমুকে। উঃ, শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে ছিল ভিতরটা। ঘরের দরজা খুলে এসে দাঁড়ান প্রাঙ্গণে। মস্তবড় চকমেলানো বাড়ি। নিঃঝুম নিষুতি চারদিক। ঘরে ঘরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত পুত্র পুত্রবধূ নাতি নাতনীরা সব। বাঁ-ধারের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে ভারি নিশ্বাসের শব্দ। বড় ছেলের নাক ডাকে ঘুমের ঘোরে। বাড়ির কুকুর বাঘা একবার মুখ তুলে চেয়ে মনিবকে দেখে নিয়েই শুয়ে পড়ে ফের কুণ্ডলী পাকিয়ে। সবাইকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে শুয়ে রাতের প্রহর মেপে চলেছে বাস্তুমাতা, অতিকায় জননীর মত। নিঃশব্দে ফেলছে গভীর নিশ্বাস। নীরবে বলছে কি সব কথা। কত প্রাণঢালা মমতায় ভরা কথা। কিসের ইঙ্গিতময়—ভাষা নেই তার, দুর্বোধ্য নয় তবুও।

বাস্তুর উত্তর দিকের আম-কাঁঠালের বাগানের পেছনের বেত-ঝোপ থেকে কুম্-কুম্ করে ডেকে ওঠে কটা ঘুম-ভাঙা কানাকোকা পাখি। আরও কি কি সব পাখি গলা মেলায় একই সঙ্গে। একটা কোকিলও। দূরে মাঠের দিক থেকে ডেকে ওঠে একপাল শেয়াল। রাতের প্রহর ঘোষণা করছে ওরা। রাত কত? অগণিত তারকা-রোমাঞ্চিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকান কেদারবাবু।

সামনে দাঁড়িয়ে কালপুরুষ। ত্রিকালদর্শী কালপুরুষ। কালপুরুষের দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শরীর। সর্বদ্রষ্টা তুমি কালপুরুষ! আমার পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষের সমস্ত কার্যকলাপের তুমি সাক্ষী। কেমন করে একদিন অরণ্যচারী মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে হয়ে উঠেছিল গোষ্ঠীভুক্ত, আবিষ্কার করেছিল অগ্নি, সন্ধান করে নিয়েছিল ক্ষুধার অন্ন; নিজের কণ্ঠে অকস্মাৎ উচ্চারিত ভাষা বিস্ময়বিহ্বল করে তুলেছিল তাকে, সব জান তুমি। যাযাবর জীবনের সমাপ্তি করে শস্যক্ষেত্র ঘিরে রচনা করেছিল আশ্রয়, ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্-

দিনে দিনে
ত্বকে নবীন লাবণ্য আসে
নতুন রেক্সোনার পরশে
যতবারই মাখুন রেক্সোনার অবাক পরশ যেন প্রতিবারই আপনার ত্বকে নবীনতা এনে দেয়। কেননা রেক্সোনায় ক্যাডল আছে, বিশেষ ধরনের এই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক তেলটি ত্বকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায় আর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায় আপনার লাবণ্য আনে। মিষ্টি গন্ধ ভরা রেক্সোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাখলে আপনি এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে পাবেন।
Rexona
FOR YOUR SKIN
নতুন রেক্সোনা-
ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক
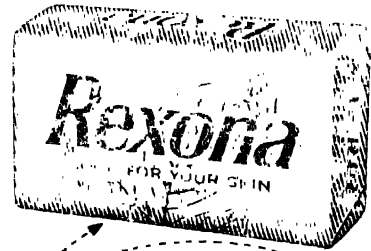
বিদিকে। উর্বর মাটি আর শস্যের সন্ধানে ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষ দূরে দূরান্তরে করেছিল বসতি বিস্তার। আরও দূরান্তরে। হিংস্র শ্বাপদ আর বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরাস্ত করে আরও অনুপ্রবেশ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল বিভিন্ন বংশের ধারায়। প্রতিষ্ঠা করেছিল বাস্তু, নিজের জীবনধারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি করে, সে কাহিনী নখদর্পণে তোমার। বাস্তুর শান্তির নীড়ে আত্ম-সমর্পণ করে স্থিতিলাভ করেছিল যাযাবর মানুষ। শোক দুঃখ লুণ্ঠন অপহরণ অগ্নিদাহ সহ্য করেছিল বাস্তুর বুকে গড়াগড়ি দিয়ে। বাস্তুকে সুশোভিত করে তুলেছিল বৃক্ষলতা-পত্র-পুষ্প-ফল-ফুলের প্রাণময় শ্যামল সম্পদে। গীতবাদ্য উৎসব আনন্দ ভোজন আপ্যায়ন দান ধ্যানের সমারোহে করে রেখেছিল মুখরিত। মিথ্যা কি সে সব? বল, বল তুমি সর্বদ্রষ্টা কালপুরুষ, মিথ্যা কি সে কাহিনী? প্রশ্ন করেন কেদারবাবু—মিথ্যা কি সে সব?

নীরব নিথর নৈঃশব্দের অতলান্ত সাগরের গহনে ডুব দিয়ে আছে নিশীথরাত্রির বিশ্বপ্রকৃতি। পশ্চিম দিকের বাঁশবন থেকে হা-হা করে ছুটে এল একটা দমকা বাতাস। পরিত্যক্ত দীর্ঘনিশ্বাসটা লুফে নিয়ে গেল চলে। থরথর করে কেঁপে উঠল বয়সের ভারে জীর্ণ দেহ। মিথ্যা! মিথ্যা কি তবে সব? ওই অনন্ত শূন্যতাময় নীল সমুদ্র, ওই সমুদ্রে আকীর্ণ কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জ, এই সূচীভেদ্য নৈঃশব্দের ঘনীভূত তমসা, এই জীবন, জীবনের সমস্ত আয়োজন সম্ভার, স্নেহ প্রেম মায়া মমতাঘেরা ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, ঘর দ্বার, বাস্তু, সব? কে দেবে উত্তর? আকাশ মাটি পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম, চারিদিকে চিরনিরুত্তর নিস্তব্ধ সবাই।

প্রাঙ্গণে পদচারণ করেন কেদারবাবু। ধীর শিথিল পদক্ষেপ। নিঃশেষিত প্রায় ক্ষীয়মাণ জীবনীশক্তি। পঁচাত্তরটি বৎসরের ভারে জীর্ণ দেহ। সহসা মাঝখানে দাঁড়ান থমকে। হ্যাঁ, ঠিক এইখানটাই। পঞ্চান্ন বছর আগেকার ঘটনা। বয়স তখন মোটে বিশ। চোদ্দ ছাড়িয়ে পনেরয় পড়েছে সে। সুশ্রী সরলা লজ্জাবনতা গ্রাম্য মেয়ে। বিয়ের আসর বসেছিল এইখানটায়ই। মাথার উপরে রঙিন চাঁদোয়া। লোকে লোকারণ্য চারদিক। বাদ্যভাণ্ড। আলোয় আলোময়। সামনে শালগ্রাম শিলা।—যদিদং হৃদয়ং তব···। সপ্তপদী তারপরে। নহবতখানা থেকে ভেসে আসছিল সানাইয়ের সুর। সুরটা কানে ভাসছে আজও। হ্যাঁ, ঠিক সেই মধুর সুরটাই আসছে ভেসে। হ্যাঁ, ওই তো যাচ্ছে শোনা। বাইরের মস্ত উঠোন জুড়ে যাত্রার আসর। তিনপালা যাত্রাগান। সাবিত্রী, নলদময়ন্তী, সুরথ উদ্ধার। অঢেল খাদ্য খাওয়া। দীয়তাং ভুজ্যতাং। সকলের পাতের সামনে গিয়ে আরও দই আরও মিষ্টি নেবার জন্যে বাবার সাধাসাধি। ঠাকুরদা বেঁচে তখনও। অচল শরীর। আহ্লাদে আটখানা তবুও। একমাত্র পৌত্র আমি। বংশের ধারা। আমার বিয়ে। নাতির টুকটুকে বউ দেখে আনন্দে গদগদ।

শ্রম নিষ্ঠা আর সেবা দিয়ে ও অল্প দিনেই ভরাট করে তুলল সংসার। ঠাকুরদা বাবা মা আমি—সকলের পাশে ঘুরঘুর করে ফেরে একখানি হাসিমুখ। আমার মনও উঠল ভরে। নতুন করে ভাল লাগল সংসার। কাজের উৎসাহ গেল বেড়ে—অনেক, অনেক বেড়ে।

শান্তিতে সজ্ঞানে চোখ বুজলেন ঠাকুরদা। এইখানটায় শোয়ানো হয়েছিল তাঁকে। শ্রাদ্ধ করলেন বাবা। এই প্রাঙ্গণেই। যস্য ন পিতা ন মাতা।—গীতা পড়েছিলেন রঘুনাথ ভট্টাচার্য। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি—দানসাগর শ্রাদ্ধ। মহা-ধুমধাম। তিন উঠোন ছেয়ে খাটানো হয়েছিল শামিয়ানা। লোকে লোকারণ্য। শ্রাদ্ধবাসরের ওধারে কীর্তন। নাগরপাড়ার দীনবন্ধু দাসের দল। মধুর গলা ছিল দীনবন্ধু দাসের।—জীবন ধনে না চিনিলে এমন জীবন বৃথায় যাবে। কত প্রবীণেরা আসরের ধুলো মেখেছিলেন গায়ে। দর-বিগলিত ধারা বয়েছিল দু চোখ বেয়ে। বৃথায় বুঝি বা চলে গেল জীবন। দিন গেল বয়ে।

বাবা আর মা তারপরে। একের পরে এক। এইখানে শোয়ানো হয়েছিল তাঁদেরও। অসহায়ের মত কেঁদেছিলাম এইখানটায় গড়াগড়ি দিয়ে। সেও কেঁদেছিল ওঁদের পা জড়িয়ে ধরে। চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল বাস্তুর মাটি। ওকে বড় ভালবাসতেন তো ওঁরা। কত দিন গেল তারপরে। কত বছর। স্মৃতির উপরে প্রলেপ দিয়ে দিয়ে গেল গড়িয়ে। হ্যাঁ, গড়িয়ে গেল।

বসে থাকে না কাল। না, কারও জন্যেই নয়। হু হু করে চলেছে ছুটে। আমিও ছুটে চলেছি সেই সঙ্গে। উপায় নেই থেমে থাকবার। ফিরে যাবার নেই পথ। চলতে হবে কালের স্রোতের সঙ্গে। চলেছি আমিও। সেই বিশ বছরের আমি, পৌঁছেছি এসে পঁচাত্তর বছরে—ধাক্কা খেয়ে, ঠোক্কর খেয়ে, ডুবে ভেসে।

কি একটা পাখি ডানা ঝাপটায় প্রাঙ্গণের কোণের চাঁপা গাছটায়। চমকে ওঠেন কেদারবাবু। চোখ তুলে তাকান গাছটার দিকে। নিজেরই হাতে বোনা। হয়েছে কতবড়। অজস্র ফুলে ফুলময়। সুগন্ধে ভারি সারা বাড়ির বাতাস। ও গাছটার মায়াই কি বড় কম! এতটুকু থেকে করে তুলেছেন এত বড়। নিজের অজানতেই বুক খালি করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দেন দরজা। ভাল করে খুলে দেন পূব দিকের জানলা। ঠাণ্ডা থমথমে জলো হাওয়ায় ভারি ওদিকটা। বাবা কাটিয়েছিলেন পুকুর। দুবার সংস্কার করিয়েছি আমি নিজেও। টলটল করে অগাধ জল। চান করে পাড়ার সবাই। আমিও সাঁতার কাটতাম ছেলেবেলায়। রাজু কানাই পরেশ একসঙ্গে সাঁতার কাটতাম সবাই। কানাই ছিল ডুবসাঁতারে ওস্তাদ। এক ডুবে হাজির হত গিয়ে পুকুরের মধ্যিখানে। মুখ তুলেই ফের ডুব—ভোঁদড়ের মত। ওর মত পারতাম না কেউ। মোক্তার হয়েছিল কানাই। মারা গেছে ক বছর আগে। আরও একজন থাকত আমাদের সঙ্গেই। হেমি। কুচকুচে রং, টানাটানা দুটো চোখ, একমাথা চুল টেনে বাঁধা পেছন দিকে। গাছকোমর বাঁধা ডুরে শাড়ি। ঝুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত পুকুরে। হাঁসের মত কাটত সাঁতার। ভয় করত আমার।—এই হেমি, এত দূরে আসিস নি। ডুবে মরবি হাত পা অবশ হয়ে।

ইশ, অবশ হলেই হল আর কি। তোমার মত ভীতু কিনা আমি।

ডুবে গেলে আমি কিন্তু তুলতে পারব নারে তোকে।

না তুললে, বেশ তো। পাতালে চলে যাব এক ডুবে।

পাতাল কোথায় রে হেমি?

কেন, সেই যে সোনার পালঙ্কে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে রাজকন্যে। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ঘুমুচ্ছে সবাই। শোন নি বুঝি? যেও সন্ধ্যেবেলায়। মা বলে রোজ।

সে তো রূপকথা রে। রূপকথা বুঝি সত্যি হয় কখনও?

সত্যি না হলে এল কোথা থেকে এসব তবে? মিথ্যে কথা বুঝি হয় অত ভাল? ছাই জান তুমি।

খিলখিল করে হাসত হেমি সাঁতার কাটতে কাটতেই। হাসলে টোল পড়ত ওর গালে। কুলকুচো করত জল মুখে নিয়ে। হেমির কথা অস্বীকার করতে চাইত না মন। থাকতাম চুপ করে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, ভারি কষ্ট হত পাতালপুরীর রাজকন্যের জন্যে। কবে যে আসবে রাজপুত্তুর, কবেই বা ভাঙবে রাজকন্যের ঘুম। একটা আবছা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত মন। হেমির বিয়ে হল দশ বছর বয়সে। বিয়ের পর ডুলিতে চড়ে কাঁদতে কাঁদতে হেমি চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। ওর বাবাও পোঁটলা হাতে করে গেল ডুলির পিছু পিছু। ডুলি দেখা গেল যতক্ষণ, চেয়ে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদল ওর মা। কদিন পরেই ফিরে এল হেমি। আবার গেল। এল ফের। চলল এমনি কিছুদিন। তারপরে কালে ভদ্রে। হেমি হারিয়ে গেল মনের অগোচরে। সংসারের জনারণ্যে। ওর বাবা মা কাজ করত আমাদের বাড়ি। ঘরদোর উঠোন, তামাম বাস্তু ঝাঁটপাট দেওয়া, বাসনপত্র মাজা এই সব কাজ। হেমির বাবা নেই। মাও না। ওর ছোট দুটো ভাই আছে। ওরাও বলছে, কর্তা, আপনে চইলা গেলে এত বড় বাস্তু আগলাইয়া কার সাহসে থাকুম আমরা?

মন শক্ত করে বিছানায় শুয়ে পড়েন কেদারবাবু। সে পাড়ি জমিয়েছে বেশ ক বছর আগেই। একলা ঘর। কথা বলে মনটা হালকা করারও কেউ নেই পাশে। ঘুমও হয় না বড় একটা। আগে আগে শুয়ে পড়লেই চোখ ছেয়ে আসত ঘুম। সে ঘুম চলে গেছে বহুদিন। তন্দ্রার ঘোরে বিছানায় পড়ে থাকা শুধু। চিন্তা—কেবল চিন্তা। এমন প্রাণঘাতী চিন্তা এর আগে করতে হয় নি জীবনে আর কখনও। না, কোনদিন নয়। উঠতে বসতে, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে কাঁটা ফুটছে খচখচ করে।

দোয়েল দুটো এসে বসেছে চালের উপরে। শিস দিচ্ছে। গান শুরু করবে এখনি। ভোর হতে দেরি নেই আর।

কর্তা কি ঘুমে নাকি? বেলা যে অনেক অইল। এত বেলা তো শুয়ে থাকেন না কর্তা।

দরজায় করাঘাত করে অক্ষয়। বাড়ির গোমস্তা।

দুর্গা, দুর্গা।—ধড়ফড় করে উঠে বসেন কেদারবাবু। তাই তো, বেলা তো হয়েছে অনেক! ঘুম হয় নি রাতে। খালি আজেবাজে স্বপ্ন। ভোরের দিকে তন্দ্রায় ঝিমিয়ে এসেছিল শরীর। মনও। দরজা খুলে দেন কেদারবাবু।

আইজ যে বেলা দশটার মধ্যে রওনা হওয়ার কথা কর্তা।

মনিবের মুখের দিকে তাকায় অক্ষয়। রওনা হওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে ঠিক। ঘাটে বাঁধা কেদারবাবুর পানসি নাও। রান্না চেপেছে ভোরবেলায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন কেদারবাবু। লাঠিটা তুলে নেন হাতে। নদীর দিকে যান এগিয়ে। রোজই ভোরে যান বেড়াতে। সঙ্গ নেয় বাঘা। রোজই নেয় সঙ্গ। খানিকটা এগিয়ে, নদীর ধারে বাঁ দিকে আম-বাগানের পরেই শ্মশান। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা, মা সে, গাঁয়ের আরও কত লোক শুয়ে আছে পাশাপাশি। নাম-না-জানা, নাম-না-শোনাই বা কত আছে শুয়ে। কত দিন থেকে। ওঁদেরই মাঝখানে ওরই পাশেই শুয়ে থাকব ভেবেছিলাম আমিও। রোজ ভোরে এখানে এসে বলতাম তাই। ওইখানটায় ঠাকুরদা, ঠাকুরমা পাশেই ওঁর। ওইখানটায় বাবা, পাশেই রয়েছেন মা। ওইখানটায় সে। পাশেই একফালি খালি জায়গা। ইটের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা সব। ওর পাশের খালি জায়গাটা রোজ দেখি। দেখি আর ভাবি ঠিক আছে। কি হবে তবে উপায়? নিজেকে নিজেই করেন প্রশ্ন। জবাব নেই। কে দেবে জবাব। দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চিবুক বেয়ে। হাতের পিঠ দিয়ে মুছে নেন কেদারবাবু। কুকুরটা করুণ চোখ তুলে তাকায় ওঁর মুখের দিকে। একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করে। কি বোঝে ও, কে বলবে তা। চিকচিক করছে সামনের নদীর জল। বংশবতী নদী। নদীর দুটো শাখা বেরিয়ে গাঁ বেষ্টন করে ফের মিশেছে নদীতে। তিন ধারার মোহনায় গাঁ। গাঁয়ের নাম তাই ত্রিমোহন। এমন মধুর নাম দিয়েছিল বা কে। অলকা। অমরাবতী। কই, ত্রিমোহনের মত মধুর তো নয়। অলকানন্দা, মন্দাকিনী কি প্রাণদাত্রী বংশবতীর চেয়েও? কি জানি, কে বলবে তা। কল্পনায় অস্পষ্ট সবই তো।

কর্তা, অনেকে আইচে দেখা কইরতে। বাড়ি যাই চলেন।—পেছনে এসে দাঁড়ায় অক্ষয়।

পিতৃপিতামহ আর পূর্বগতা স্ত্রীর শ্মশানভূমি সামনে। গা ঘেঁষে প্রবাহিতা বংশবতী নদী। নিঃঝুম নিঃশব্দ চারদিক। ভেঙে পড়েন কেদারবাবু: এই সব ফালাইয়া তুমিও যাইতে কও আমারে অক্ষয়?

কি করি কর্তা। ছাওয়ালপাওয়াল সকলেই উতালা যাওয়ার জন্যে, আমি বাধা দিমু কোন্ সাহসে? আমার বুকটা চিরা তো দেখাইতে পারুম না আর আপনারে।—কোঁচার খুঁটে চোখ মোছে অক্ষয়।

আমার এই জায়গাটুকুর ভার দিয়া গেলাম তোমারে। দেইখ্যা রাইখো। বেহাত না হয় যেন।

তার চিতার পাশের খালি জায়গাটুকু দেখিয়ে দেন কেদারবাবু। জায়গাটুকুর দিকে তাকায় অক্ষয়। কর্ত্রীর চিতার পাশে হাত চারেক লম্বা আর হাত দুই পাশ একফালি জায়গা। একজনের নিরিবিলি শুয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। মনিবের বিচলিত ভাব দেখে বুক ফেটে যায় অক্ষয়ের। ছেলেবেলা থেকে আছে ওঁর আশ্রয়ে। পিতৃতুল্য। সুখ-দুঃখের অবলম্বন। অনুনয় করে অক্ষয়, বাড়ি যাই চলেন।

বিচলিত ভাব কাটে না কেদারবাবুর। বলেন না কোন কথা। তাকিয়ে থাকেন। উদাস নয়নে থাকেন তাকিয়ে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে এক চুমুকে পান করে নিতে চান চারদিকের মধুর পরিবেশ। পূর্বাহ্নের সোনার রোদে ঝিকমিক করছে সব। চিকচিক করছে নৃত্যচঞ্চলা বংশবতীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মানিক। পাল তুলে ভেসে চলেছে দুটো নৌকো। ওপারের গঞ্জে লোকজনের ব্যস্ততা। অদূরে মাঠে মাঠে কাজে নেমে পড়েছে চাষীরা। ফিঙে দুটো এসেছে আজও। রোজ আসে ওরা। শ্মশানের ওধারের নিমগাছের লম্বা সরু ডালটায়

পাশাপাশি বসে দুজনে। বসে লেজ ঝুলিয়ে। পোকা-মাকড় দেখলেই ঝুপ করে উড়ে এসে ধরে নিয়েই ফের বসে গায়ে ডালায়। রোজ দেখেন ওদের কেদারবাবু। ভারি ভাল লাগে নির্জন শ্মশানে ওদের দুজনের উপস্থিতি।

বেলা অইল অনেক। এবার বাড়িতে চল্লেন যাই কর্তা।—মুখ কাচুমাচু করে বলে অক্ষয়।

সম্বিৎ ফিরে পান কেদারবাবু। চেষ্টা করেন নিজেকে সামলে নিতে। পা বাড়ান বাড়ির দিকে।

অনেক লোকের জটলা বাইরের ঘরে। পাড়াপড়শী, অনুগত, পরিচিত, প্রজা, অনেকে। এসেছে দেখা করতে। যাঁর সাহসে সকলের মনে ছিল সাহস, তাঁর চলে যাওয়া সহজভাবে নিতে পারছে না কেউ। কে করল, কার দেশভাগ, লাভই বা কার হল কি এতে? এর জবাব খুঁজে পায় না কেউ। সমবেত সকলের মুখের দিকে তাকান কেদারবাবু। চেনা সকলেই। বহুদিনের চেনা। সমবয়সীও কেউ কেউ। নতুন করে ভাল লাগে সবাইকে আজ আবার।

আমি থাকব না সেখানে। নবদ্বীপধাম। ছেলে-পিলেরা যাচ্ছে সবাই। জায়গা রাখচে বাড়ি করবে। থাক ওরা সেখানে। আমি শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ চললাম তীর্থ করতে। আমি থাকব না সেখানে।—আশ্বাস দেন কেদারবাবু।

শুনে মহা খুশী সকলেই। যাক্, কর্তা তীর্থ সেরেই আসছেন তবে ফিরে।

নবদ্বীপধাম থেকে লেখা কেদারবাবুর প্রথম চিঠি।—অক্ষয়, অদ্য সকালবেলায় আসিয়া নবদ্বীপধাম পৌছিয়াছি। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াই গঙ্গাস্নান সারিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি আর বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত পাদুকা দর্শন করিয়া আসিলাম। অদ্য যাইতে ছেলেরা নিষেধ করিয়া ছিল, আমি উহাদের নিষেধ শুনি নাই। গাড়ি কেরায়া করিয়া গিয়াছিলাম। যতক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ছিলাম সব ভুলিয়া ছিলাম। আমি এখান হইতে বাড়ি রওয়ানা হইবার আগে লিখিয়া জানাইব, তুমি আসিয়া দরশন করিয়া আমার সঙ্গেই ফিরিয়া যাইতে পারিবা। প্রেমের ঠাকুর দুই হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মন খারাপ হইয়া গেল। ভাড়াটিয়া একখানি বাড়ি। চারিখানি ঘর রান্নাঘর উঠান মিলাইয়া অনেক কম জায়গা। আমার বাড়ির এক মহল হইতেও অনেক কম। কিছুই ভাল লাগে না। শান্তি নাই মনে। সেদিন আমাদের নৌকা ছাড়িয়া দিলে তোমরা সকলেই কাতার দিয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া ছিলে, ছইয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি সকলই দেখিয়াছি। নৌকা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘা আমাদের সহিত আসিবার জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। তুমি ডিঙি ভাসাইয়া বহু কষ্টে উহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলে, তাহাও আমি দেখিয়াছি। বাঘার দশা দেখিয়া নাতি নাতিনীরা হাসিয়া অস্থির। আমি কোন প্রকারে মুখ ফিরাইয়াছিলাম, পাছে বা উহারা আমার মুখ দেখিয়া ফেলে। তুমি নিজে বাঘার প্রতি লক্ষ্য রাখিও অক্ষয়। দেখিতে দেখিতে নৌকার পালে জোর হাওয়া লাগিল, আমার ইচ্ছা ছিল না পাল খাটানো। দেখিতে দেখিতে তোমরা সকলে, বাড়িঘর, গ্রাম, ওপারের গঞ্জ সকলই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার মনটা হু-হু করিয়া উঠিল অক্ষয়। সেই হু-হু করা ভাব একটুও কমে নাই। একটুও না অক্ষয়। এক একবার ভাবি, আমার এমন লাগে কেন। চেষ্টা করি, মনকে বুঝাইতে, পারি না। আমার মন মানে না। বৈকাল গড়াইয়া গিয়াছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজই পত্র না লিখিয়া শান্তি পাইলাম না। এ সব কথা অপরকে দিয়া লিখাইতে মন চাহে না। আর চক্ষে দেখি না অক্ষয়। বিস্তারিত সমস্ত সংবাদ লিখিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবা।

কেদারবাবুর লেখা আটচল্লিশ নম্বর চিঠি।—অক্ষয়, অদ্য বৈকালে তোমার পত্র পাইলাম। তুমি এখন বড়ই বিলম্ব করিয়া পত্র লিখ। পূর্বে সপ্তাহে একখানি করিয়া পত্র লিখিতে, এবার সতর দিন পর তোমার পত্র পাইলাম। হাঁ, ঠিক সতর দিন পর। তুমি লিখিয়াছ, তোমার শরীর সুস্থ নহে। সন্ধ্যার সময় জর হইতেছে। দুর্বলতাও খুব বাড়িতেছে। একদিন কাশির সঙ্গে রক্তও পড়িয়াছে। ভয় পাইও না অক্ষয়। আমার কালী গাইয়ের দুধ যতটা সম্ভব তুমি খাইবা, সংকোচ করিও না। পুষ্টিকর আহার করিলেই তাড়াতাড়ি সারিয়া

উঠিবে। অক্ষয়, আমার শরীরও সুস্থ নহে। ডাক্তার কবিরাজরা বলিতেছেন, আমার অন্ত্রে ক্ষত হইয়াছে। কবিরাজিতে বিশেষ ফল না পাইয়া ডাক্তারি চিকিৎসা করিতেছি। তাহাতেও বিশেষ ফল পাইতেছি না। ক্রমশঃই শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাড়ি গেলেই আমি ভাল হইয়া যাই—অক্ষয়। নিশ্চয় ভাল হই। বাড়ির ইন্দারার জল। গরুর খাঁটি দুধ। বংশবতীর খোলা বাতাস। নিশ্চয় ভাল হইয়া যাই অক্ষয়। বাড়ি লইয়া যাইবার কথা দিবানিশি ছেলেদের বলিতেছি। উহারা বলে, একটু সুস্থ না হইলে লইয়া যাই কিরূপে। ডাক্তারেরও তাহাই মত। একা যাইতে পারিলে অনেক আগেই চলিয়া যাইতাম। একা যাইবার সামর্থ্য নাই। ছেলেরাও যাইতে দিবে না। এখানে বন্দী অবস্থায় আছি অক্ষয়। শাজাহানের কথা মনে পড়ে। এখান হইতে আমার তাজমহল দেখিতে পাই না। বংশবতীর পাড়ে ইটের বেড়া দিয়া ঘেরাও করা। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া ওঠ অক্ষয়। যদি নিজের হাতে চিঠি লিখিতে না পার, অপর কাহারো দ্বারা লিখাইয়া নাম সহিটা নিজেই করিও। তোমার সহিটা দেখিলেই বুঝিতে পারিব, তোমার কথা মতই চিঠি লিখা হইয়াছে। সহিটা তুমি নিজে করিও। আমিও বুঝি নিজের হাতে আর চিঠি লিখিতে পারিব না। তবে যতদিন পারি সহিটা নিজেই করিব। না না অক্ষয়, কোন ক্রমেই মন আর শরীর দুর্বল হইতে দিও না। না না, কিছুতেই না। আমার শরীর একটু সুস্থ হইলেই রওনা হইবার ব্যবস্থা করিব। আমার পানসি নৌকা ঠিক করিয়া রাখিও। যাইবার কালে স্টীমার ঘাট হইতে যদি পাল খাটানো যায়, তবে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি পঁহুছিব। আমি সর্বদার তরে পূর্ব দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকি অক্ষয়। পুবান বাতাস ছাড়িলে শরীর জুড়াইয়া যায়। মনে হয়, বুঝিবা ত্রিমোহনের উপর দিয়া বাতাসটা ভাসিয়া আসিয়াছে। সূর্য উদয় হইলে ভাবি, তুমিও সকাল বেলায় আমার বাড়িতে দাঁড়াইয়া এই সূর্যই দেখিতেছ। কাকপক্ষীটি উড়িয়া আসিলে বোধ হয় আমার বাড়ির উপর দিয়া বুঝিবা উড়িয়া আসিল। তুমি পত্র দিতে কিছুতেই এত গৌণ করিও না অক্ষয়। একবারে বেশী করিয়া খাম খরিদ করিয়া রাখিবা যাহাতে খামের অভাবে চিঠি লিখিতে বিলম্ব না হয়। আমার কথার অন্যথা করিও না অক্ষয়।

তিন মাস পরে কেদারবাবুর বড় ছেলে লেখেন অক্ষয়কে। দীর্ঘ রোগভোগের পর গতকল্য রাত্রি দুই ঘটিকায় পিতৃদেব আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিকারের ঘোরেও সর্বদা আপনাকে ডাকিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, নৌকা বাড়ির ঘাটে ভিড়িতে বিলম্ব কত। বাড়ির কথাই সর্বদা বলিতেন। বাড়ি যাইবার জন্যে বড়ই উতলা হইয়া ছিলেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, কালব্যাধির কবল হইতে তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া বাড়ি লইয়া যাওয়া আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। বাস্তু ছিল তাঁহার দেবতা। কোন দেবতাকেই তিনি অত ভালবাসিতেন না। সে দেবতাকে শেষবারের মত আর তাঁহাকে দেখানো কিছুতেই সম্ভব হইল না।

চারিদিন পর কেদারবাবুর বরাবর অক্ষয়ের স্ত্রীর একখানি চিঠি কেদারবাবুর বড় ছেলের হস্তগত হয়।—গতকল্য রাত্রি অনুমান তৃতীয় প্রহরের সময় এ হতভাগিনীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া উনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শেষ কথা বলিয়াছেন, কর্তা পানসি নৌকা লইয়া আসিতেছেন। আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। নৌকার বাদামে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছে। আমি নদীর ঘাটে চলিলাম।

চারিদিক বড় অন্ধকারময় দেখিতেছি। আপনিও এ দুঃসময়ে এখানে উপস্থিত নাই। আপনি কৃপা করিয়া সব উপদেশ দিয়া এ অভাগিনীকে জানাইবেন আমি এখন কিরূপে কি করিব, না করিব।

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

শারদীয় অত্যাচার

সম্পাদক মহাশয়, আপনার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এ আপনার কী অত্যাচার! আমি নিরীহ ভদ্রসন্তান, আপনার খাই, আপনার পরি; কাহারও কানা-কড়ি ধারি না। একমাত্র কালাচাঁদ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর জন্য কাহারও নিকট কখনও হাত পাতি নাই, পাতিব না। তবে আমার উপর আপনার এরূপ আজ্ঞা কেন?

আপনি জানেন, শ্রীখোশনবীস মেথর নহে, মুদ্দোফরাশ নহে—নৈকষ্য কুলীন স্বয়ং ঘটিরামের সন্তান। যদিও ট্রামের ভিড়ে বহুকাল পূর্বে পৈতা হারাইয়া গিয়াছে এবং মৌতাতের খরচ বাঁচাইয়া অদ্যাবধি উহা পুনর্বার ক্রয় করা হইয়া উঠে নাই, তবুও বিশুদ্ধ ব্রহ্মতেজের বলে এখনও যে-কোন শাস্ত্রের যে-কোনরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং সন্ধ্যাকালে চাচার হোটেলে একাসনে বসিয়াই একাধিক ভাজিত কুক্কুটশাবককে বাতাপির ন্যায় নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারি। এ-হেন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আপনি কোন্ বিবেচনায় আঁস্তাকুড় ঘাঁটিতে বলেন!

সম্পাদক মহাশয়, ইহা আপনার নিতান্তই অন্যায় উৎপীড়ন। আপনি আমাকে পূজা-সংখ্যা সম্পর্কে লিখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু কেন? আমি কাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে বসিয়া বসিয়া পূজা-সংখ্যা পড়িব, পূজা-সংখ্যা সম্পর্কে লিখিব! আজন্মব্রহ্মচারী নিষ্কলুষ খোশনবীসের উপরে এই স্তূপীকৃত গর্ভস্রাব ঘাঁটিবার আজ্ঞা কেন?

ভাবিয়াছিলাম, করিব না, এই শারদীয় জঞ্জাল ঘাঁটিব না; আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিব। কিন্তু হইল না; ভাগ্যচক্রে ওই জঞ্জালই ঘাঁটিতে হইল।

এবার দেবী কিসে আসিয়াছেন জানি না। কিন্তু সঙ্গে করিয়া যে দুরন্ত দুঃশাসন ফ্লুমাস্নীকে লইয়া আসিয়াছেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। তাহার আক্রমণে পূজার পূর্বেই শয্যা আশ্রয় করিতে হইয়াছে; এবং কিছুদিন শয্যাশায়ী হইয়াই কাটাইতে হইয়াছে। এই নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া দিনরাত্র কেবল নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে নাই। অবশেষে নিদ্রার অমোঘ ঔষধ পত্রিকার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। পূজা-সংখ্যা পড়িয়াছি।

পূর্বেকার বৎসরের ন্যায় পূজা-সংখ্যা এবারও প্রচুর বাহির হইয়াছে, প্রবল বর্ষণের পর কলিকাতার নর্দমা দিয়া ময়লা জল যেরূপ তোড়ে বাহির হয় প্রায় সেইরূপ প্রচণ্ড প্রতাপেই। যতদূর জানি, প্রায় পাঁচ শত পূজা-সংখ্যা এবার প্রকাশিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে এই পাঁচ শত পূজা-সংখ্যার একটি ডেবিট-ক্রেডিট কষিয়া দেখা যাইতে পারে।

গড়ে প্রত্যেকটি যদি পাঁচ হাজার করিয়া ছাপা হইয়া থাকে, তবে মুদ্রিত পত্রিকার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০০ × ৫০০ = ২৫,০০০০০ অর্থাৎ পঁচিশ লক্ষ। ইহাদের প্রত্যেকটির আয়তন যদি গড়ে কুড়ি ফর্মা করিয়া ধরা যায়, তবে মোট মুদ্রিত ফর্মা দাঁড়ায়, ২৫,০০০০০ × ২০ = ৫,০০০০০০০ অর্থাৎ পাঁচ কোটি। এই পাঁচ কোটি ফর্মা

ছাপিতে কাগজ ব্যয় হইয়াছে আনুমানিক ৫০,০০০ অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার রীম। তিরিশ টাকা রীম ধরিলে ইহার মূল্য আনুমানিক ৫০,০০০ × ৩০ = ১৫,০০,০০০ অর্থাৎ পনের লক্ষ টাকা। মুদ্রণ-ব্যয় আনুমানিক ১২,০০,০০০ অর্থাৎ বারো লক্ষ টাকা। কভার, বিজ্ঞাপন, গাড়ি-ভাড়া, পান-তামাক-সিগারেট, লেখকের দক্ষিণা ইত্যাদি বাজে খরচ আনুমানিক ১,০০,০০০ অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা। সুতরাং মোট ব্যয় হইয়াছে আনুমানিক ১৫,০০,০০০ + ১২,০০,০০০ + ১,০০,০০০ = ২৮,০০,০০০ অর্থাৎ আটাশ লক্ষ টাকা। এই গেল প্রত্যক্ষ ব্যয়। ইহা ব্যতীত অপ্রত্যক্ষ স্থায়ী ব্যয়ও কিছু আছে। ঘর ভাড়া, কর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি বাবদ সে খাতেও ব্যয় ধরা যাইতে পারে ১,০০,০০০ অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা। তাহা হইলে, পাঁচ শত পূজা-সংখ্যা প্রকাশ করিতে সর্বসাকুল্যে ব্যয় হইল উনত্রিশ লক্ষ টাকা।

ইহা গেল ব্যয়ের দিক। এবার আয় অর্থাৎ উপযোগিতার দিকের হিসাব কষিয়া দেখা যাউক। এই পঁচিশ লক্ষ কপি পূজা-সংখ্যার চূড়ান্ত পরিণতি কি দাঁড়াইবে? ইহার দশ লক্ষ যাইবে ঠোঙা তৈয়ারির কাজে। আট-পেজি ফর্মা ধরিলে উহাতে কাগজ পাওয়া যাইবে ১০,০০,০০০ × ২০ × ৮ = ১৬,০০,০০,০০০ অর্থাৎ ষোলো কোটি শীট। এই ষোলো কোটি কাগজে ঠোঙা হইবে এক সেরী দেড় কোটি, আধ সেরী সাড়ে চার কোটি এবং এক পোয়া ছয় কোটি, একুনে বারো কোটি। বাদবাকি পনেরো লক্ষ কপির মধ্যে দশ লক্ষ যাইবে বালক-বালিকার দুধ জাল দেওয়া এবং অন্যান্য নিত্য-কৃত্যে। এক লক্ষ বালক-বালিকা যদি প্রত্যহ তিন বার করিয়া দুধ খায় এবং অন্যান্য নিত্যকর্ম দুই বার করিয়া করে, তবে এই কাগজে কতদিন চলিবে? আমার হিসাবে কোনক্রমে সাড়ে তিন মাস চলিতে পারে। খুব ব্যয়-সংকোচ করিয়া চলিলে চার মাস যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাকি রহিল আর পাঁচ লক্ষ কপি। ইহাতে কাগজ পাওয়া যাইবে, ৫,০০,০০০ × ২০ × ৮ = ৮,০০,০০,০০০ অর্থাৎ আট কোটি শীট। এই কাগজ ব্যয় হইবে দাড়ি কামানো, জিনিসপত্র মোড়া, শিশুদের জন্য নৌকা নির্মাণ ইত্যাদি ছোটখাটো বহু কর্মে। দশ লক্ষ লোক নিত্য দাড়ি কামাইলে এই কাগজ নিঃশেষ হইতে তিন মাস লাগিতে পারে। অতঃপর ছিটাফোঁটা যাহা অবশিষ্ট রহিবে উহা ধর্তব্যের মধ্যে না আনিলেও ক্ষতি নাই।

অতএব, উনত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমরা পাইতেছি মোট বারো কোটি ঠোঙা, এক লক্ষ শিশুর জন্য চার মাস ধরিয়া দুগ্ধ জাল ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং দশ লক্ষ লোকের তিন মাস দাড়ি কামাইবার কাগজ। ইহাই পাঁচ শত পূজা-সংখ্যা হইতে আমাদের নীট লাভ। ইহা নিতান্ত কম লাভ নহে।

উহা ব্যতীত, স্ত্রীলোক, বেকার যুবক এবং নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট পূজা-সংখ্যার আরও কিছু উপযোগিতা আছে। এবার তাহার কথাই বলিব।

বলিয়াছি, ফ্লুমায়ীর কৃপায় শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম। শয্যাশায়ী হইয়াই পূজা-সংখ্যা পড়িয়াছি। উহাতে একদা প্রায় প্রাণসংশয় হইয়াছিল। একদা হঠাৎ দেখিলাম, আমি কালকেতু হইয়া গিয়াছি। কলিঙ্গরাজ বন্দী করিয়া বক্ষে গুরুভার পাষাণ চাপাইয়া দিয়াছে। ভারে প্রাণ যায় যায়। উদ্ধার পাইবার জন্য ভাবিলাম, জোড়হস্তে দেবী চণ্ডীর নিকট প্রার্থনা জানাইব: দেবি, দয়া করিয়া উদ্ধার কর! বক্ষ হইতে পাষাণ নামাও। শপথ করিতেছি, মৌতাতের জন্য তোমাকে আপনার বরাদ্দ কালাচাঁদের অংশ দিব। কিন্তু প্রার্থনা করিতে হইল না, আপনা হইতেই রক্ষা পাইলাম। ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, কালকেতু নহে—আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত খোশনবীস জুনিয়র; আপনার গৃহে আপনার খট্টায় চিত হইয়া পড়িয়া আছি। কিন্তু বক্ষের পাষাণ তখনও ঘুচে নাই; নিশ্বাস লইতে তখনও কষ্ট হইতেছে। অনেক কষ্টে ঠেলিয়া উঠিয়া দেখিলাম, পাষাণ নহে—ভার শারদীয় 'মধুরাংশে'র।

আমার বিবেচনায় মধুরাংশই এ বৎসরের পূজা-সংখ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ এইজন্যই যে উহা সর্বাপেক্ষা ওজনে ভারী। যাহা ওজনে ভারী, তাহা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। যে মোটা সেই রসিক। মাপিয়া দেখিয়াছি, ইহার ওজন সওয়া কিলো, পাঁচ পোয়া। এত ওজন অন্য-কোন কাগজেরই নাই। কাজেই, মধুরাংশের শ্রেষ্ঠতায়

পাষণ্ডী ভিন্ন অন্য-কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে ইহার একটি ছবি এবং একটি উপন্যাস সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। ছবিটি আঁকিয়াছেন শ্রীমান চিত্ত সিংহ এবং উপন্যাসটি লিখিয়াছেন শ্রীঅতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটিতে সিংহ মহাশয়ের তৃষ্ণার্ত বর্বর পশু-পৌরুষ স্পষ্ট ফুটিয়াছে; এবং উপন্যাসটিতে লেখকের সুস্থ মনন ও অনুভবক্ষমতার অস্পষ্ট আভাস ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং 'মবি ডিক' ও 'দি ওলডম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' সাধারণের হাতে পৌছাইবার পর এই ছবি এবং এই উপন্যাসের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু শিল্পী আঁকিয়াছেন এবং লেখক লিখিয়াছেন। আর, উহাতে তাঁহাদের শক্তির স্বাক্ষরও কিছু পাওয়া গিয়াছে। সিংহমহাশয়ের সৃষ্টির সহিত আমার পূর্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে; কিন্তু অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমি পূর্বে কখনও শুনি নাই। তবুও নির্দ্বিধায় বলিতেছি, যদি তাঁহারা পরানুকরণের ক্ষুদ্রতা এবং ফাঁকিবাজির হীনতাকে বরণ করিয়া না লয়েন, তবে ভিড়ে তাঁহারা হারাইয়া যাইবেন না।

এতদ্ব্যতীত মধুবংশের সকল রচনাই অতীব উচ্চস্তরের হইয়াছে। এত উচ্চস্তরের হইয়াছে যে দশ হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত বয়সের সুবোধ বালক-বালিকাদিগের পাঠের জন্য আমি ইহা অনুমোদন করিতেছি। যে-সকল গৃহিণীর দিবানিদ্রা আইসে না, তাঁহারাও ইহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। (কিন্তু ওজন সম্বন্ধে সাবধান!) দেখিবেন, নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সকল রচনা এইরূপ উচ্চস্তরের হইল কেন? ইহা একটি প্রশ্ন বটে। কিন্তু ইহার উত্তর সম্ভবত দক্ষিণারঞ্জন জানেন। যে সংকলনের সম্পাদক স্বয়ং দক্ষিণারঞ্জন, তাহার লেখকেরাও যখন দক্ষিণালাভে বঞ্চিত থাকে এবং আপামর সকলেই যখন লেখক সাজিয়া বসে, তখন রচনা-গৌরব এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। দক্ষিণারঞ্জন সর্বজনপ্রিয় দরদী মানুষ। অমিয়নন্দনের অমিয় কিঞ্চিৎ নিষ্কাশন করিয়া তিনি লেখকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন না কি? এবং ঐ সঙ্গে শকুন্তলা সেনের তৈলাক্ত যুগচর্চা ও কুমারেশ ঘোষের ক্লেদাক্ত বাতিল চেক খারিজ করিতে পারেন না কি? তাঁহার পারা উচিত ছিল।

'মধুবংশ'র অমিয়ময় স্বপ্নের জগৎ হইতে এইবার ধূলামাটির দেশে নামিয়া আসা যাউক। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র 'দেশে' একটি উপন্যাস লিখিয়াছেন, 'প্রতিধ্বনি ফেরে'। উপন্যাসটিতে প্রেমেন্দ্র একটি অসাধারণ চরিত্র এবং একটি অসাধারণ চিন্তা গড়িতে গড়িতেও গড়িতে পারেন নাই। যদিও ইহার আখ্যানের সহিত জন্ ডস্ পাসোস্-এর 'নাম্বার ওয়ান' নামক উপন্যাসটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছি, তবুও ইহার দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং সত্যানুসন্ধান আমার ভাল লাগিয়াছে। প্রেমেন্দ্রের যুগান্তরের গল্পটিতেও (গল্প নেই) এই একই দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি।

রোগযন্ত্রণা ভুলিবার জন্য অন্য যে-সকল লেখকের রচনা পড়িতে হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তারাশঙ্করের দুইটি উপন্যাস হাতে পড়িয়াছে—'শুকসারী-কথা' (আনন্দবাজার) এবং 'স্বভিভঙ্গ' (নবকল্লোল)। প্রথম উপন্যাসের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ এবং দ্বিতীয় উপন্যাসের কাহিনী মন্দ লাগে নাই। এই উভয় রচনারই প্রভূত পরিবর্তন করা প্রয়োজন; এবং উভয়েই যে আত্যন্তিক অহংয়ের প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বর্জন করা প্রয়োজন—কেন-না, উহা অপ্রয়োজনীয় এবং পাঠকের রসোপলব্ধিতে উহা ব্যাঘাত জন্মায়।

শ্রীমতী বাণী রায় সাহিত্যবিচারে অতি অভিনব বুদ্ধির খেলা দেখাইয়াছেন—'সূক্ষ্মবিচারে ষোড়শী' (কথাসাহিত্য)। এই বিচার এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে আছে কি নাই বোঝা দুষ্কর। ষোড়শী আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যে New England ও জমি-সংক্রান্ত আন্দোলন, স্বত্ববিক্রয়ের অধিকার ইত্যাদি সমস্যার ইঙ্গিত এই নাটকে পাওয়া যায়। শরৎ সাহিত্যে এইভাবে একটি বিশ্বজনীন সমস্যার উপস্থিতি আছে।" (কথাসাহিত্য, ১৪১ পৃঃ)। এই আবিষ্কার সত্যই সূক্ষ্ম এবং অভিনব। শ্রীমতী রায়কে এই সূক্ষ্ম বিচারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. ফিল. খেতাব দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষিত হইবে।

পরমভাগবত অচিন্ত্যকুমারের দুইটি গল্প পড়িলাম—'মণিবজ্র' (দেশ) এবং 'অঙ্গুলি' (অমৃত)। উভয় রচনাই অচিন্ত্য-অচিন্ত্য দুর্গন্ধে ভরপুর। যাঁহারা পরমভাগবতের পরমপৌরুষেয় লীলা দেখিয়া ভিরমি গিয়াছেন, তাঁহারা 'মণিবজ্র' পড়িলে তাঁহার অচিন্তনীয় স্বরূপ দেখিতে পাইবেন।

মনোজ বসুর কয়েকটি গল্প চোখে পড়িয়াছে। অনেক দিন বসু মহাশয়ের রচনা (বকুল, নবীন যাত্রী ইত্যাদি) কৃত্রিমতার জন্য পড়িতে পারি নাই। এক্ষণে তিনি সেই ভঙ্গীসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য ফাঁকিবাজী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সহিত উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া প্রীত হইলাম।

কিন্তু এবার সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইয়াছি যাঁহার রচনা পড়িয়া, তিনি প্রাণতোষ ঘটক। ঘটক মহাশয়ের যেরূপ ভাব, সেইরূপ ভাষা। আহা নায়িকাগণের 'ভারী বুক', এবং 'ধবধবে ফর্সা পেট আর পিঠ ··· নিরাবরণ কটি · জলের বুকে ভাসমান বন্যার মত মেদভারী নিতম্বে'র কী প্রাণতোষিনী বর্ণনা! অলস ধনীর লাম্পট্য, বসের নিকট টাইপিস্ট-মেয়ের নিরুপায় আত্মসমর্পণ—ইত্যাদি সমস্ত স্টক যৌন-সুড়সুড়িই ঘটক মহাশয়ের রচনায় বর্তমান। পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, এবং সেইজন্য শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটককে তাঁহার অনন্যসাধারণ সাহিত্যকীর্তির জন্য ১৯৬১ সনের 'পূজা-সংখ্যাশ্রী' উপাধি দিতেছি। আশা করি, বঙ্গীয় লেখক-পাঠক সকলেই ইহা আন্তরিকভাবে অনুমোদন করিবেন।

যে রচনা কেহই পড়িবেন না

এবার পূজা-সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত গুটিকতক রচনার কথা বলিব, যে-সকল রচনা পাঠকেরা কেহ পড়িবেন না। এই রচনাগুলিতে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণ কিছু না থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে সাধারণভাবে রচনানৈপুণ্য ও দৃষ্টির সুস্থতা বর্তমান। কাজেই, বঙ্গদেশের বিদগ্ধ পাঠকগণ যে এই-সকল রচনা পড়িবেন না সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

রচনা	লেখক	পত্রিকা
শ্রীমন্তী স্বয়ংবর	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেশ
কল্পতরু	মনোজ বসু	অমৃত
ফুলকুমারীর অন্তর্ধান রহস্য	পরিমল গোস্বামী	কথাসাহিত্য
প্রায়শ্চিত্ত	সম্বুদ্ধ	যুগান্তর
মালদা থেকে মালাবার	দীপক চৌধুরী	অমৃত
একটি চরিত্র, একটি দিন	সন্তোষকুমার ঘোষ	দেশ
মুকুন্দ মাষ্টার	মনোজ বসু	যুগান্তর
কোলস্ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট	বিনয় ঘোষ	অমৃত
ভারতীয় বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিদেশযাত্রা	জে. বি. এস. হলডেন	গণবার্তা
রবীন্দ্র-রচনার সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
আধুনিক উপন্যাসে মানবপ্রত্যয়	অরবিন্দ পোদ্দার	ঐ
বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ	ত্রিদিব চৌধুরী	ঐ
বৃষ্টিতে নিজের মুখ	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	দেশ
সহজ হওয়া লেখক	শিবরাম চক্রবর্তী	ঐ
বেলা পড়ে এসেছে	অরুণ মিত্র	ঐ
পাখির বাসা	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কথাসাহিত্য
শতবার্ষিকী	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	স্বাধীনতা
মুখরক্ষা	আশাপূর্ণা দেবী	ষষ্টিমধু
গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও রবীন্দ্রনাথ	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	মধুবংশ্চ
স্মরণ	অসিতকুমার ভট্টাচার্য	গণবার্তা
সাহিত্য ও অশ্লীলতা-বিচার	দেবব্রত ভৌমিক	সাহিত্যের খবর

জনৈক পাঠিকার পত্র

পূজার পূর্বেই শ্রীখোশনবীসের ভক্ত জনৈক পাঠিকার একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। উহা ছাপিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পূজার গোলমালে তাহা হইয়া উঠে নাই। সেই ইচ্ছা এক্ষণে কার্যে পরিণত করিতেছি।

মাননীয় খোশনবীস জুনিয়র, ২৫।৯।'৬১

আশা করি আপনার কাছে গেলে পূজার জন্য কিছু ছিট (যা আপনার মাথায় প্রচুর পরিমাণে আছে) পাওয়া যাবে। যদি কিছু সস্তা দামে দেন তাহলে সুখী হব। আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাববেন যে আপনার মাথায় যে ছিট আছে তা আমি জানলুম কি করে? তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি যে আমি 'শনিবারের চিঠি'র একজন নিয়মিত পাঠিকা। নিয়মিত ভাবে···আপনার লেখা 'সাহিত্যের হাটে' (যা আপনি গঞ্জিকা সেবন করে লিখে থাকেন) আমি পাঠ করি। আপনি আপনার সমালোচনায় (?) অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের (যাঁরা আপনাকে পড়াবার যোগ্যতা রাখেন, যথা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম. এ., বি. এল.) অবমাননা করে থাকেন। আপনি নিজে স্বীকার করেছেন যে আপনি ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডিটাও পার হতে পারেন নি। কোন্ সাহসে আপনি এঁদের সমালোচনা করেন? অতএব আপনার মাথায় যে ছিট আছে তাতে আর সন্দেহ কি!

আপনাকে ধন্যবাদ যে এখনও পর্যন্ত আপনি কোন প্রথম শ্রেণীর মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের সমালোচনা করেন নি। পরুষেরা (পুরুষেরা?) প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাসগুলিকে যথার্থ মর্যাদা দেয় না, কারণ সেগুলির মধ্য দিয়ে তিনি পুরুষদের ক্লেদাক্ত নীচতার চিত্র অঙ্কিত করেছেন। পুরুষেরা যদি বিচারক না হত তা হলে প্রভাবতীদি যে এতদিনে নোবেল পুরস্কার পেতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও এ কথা আপনার কাছে আজ হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু এমন সময় একদিন আসবে যখন পৃথিবীর লোকেরা আমার কথার মূল্য বুঝতে পারবে। আপনার যদি অবকাশ হয় তাহলে প্রভাবতী দেবীর লেখা "দানের মর্যাদা" পাঠ করে দেখবেন।

সত্য কথা বলে বলে আমার এমন বিশ্রী স্বভাব হয়েছে যে তা না বলে থাকতে পারি না। এই স্বভাবের বশবর্তিনী হয়ে আপনাকে অনেক রূঢ় কথা বলেছি, যার জন্য আমি দুঃখিত।

রাবিশ মালে ঠাসা 'সাহিত্যের হাটে' আর আমার পড়বার রুচি নেই। ইতি,

অধ্যাপিকা (কুমারী) শুচিস্মিতা রায়, এম.এ., ডি. ফিল.

লেখিকার সহিত আমি সব ব্যাপারেই একমত—কেবল একটি কথা ছাড়া। তিনি লিখিয়াছেন যে আমি গঞ্জিকা সেবন করিয়া লিখিয়া থাকি। আমি এই উক্তির ঘোর প্রতিবাদ করিতেছি। আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত খোশনবীস জুনিয়র অহিফেনের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, কালাচাঁদ ভিন্ন মৌতাতের জন্য কখনও অপর কাহারও দ্বারস্থ হই নাই। কালাচাঁদের প্রসাদেই কল্পনার পাখায় ভর করিয়া যত্রতত্র বিচরণ করিয়া থাকি। আমি গঞ্জিকা সেবন করিতে যাইব কোন্ দুঃখে! কাজেই, অধ্যাপিকা মহাশয়ার এই উক্তিকে আমার পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর বলিয়া মনে করিতেছি।

ইহা ব্যতীত কুমারী শুচিস্মিতার সহিত সকল ব্যাপারেই আমি একমত। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার বুদ্ধি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া যাইব। আমি সত্যই অবাক হইয়াছি। এত বুদ্ধি তিনি পাইলেন কোথায়! অবশ্য তিনি যখন অধ্যাপিকা এবং ডি. ফিল. (নিশ্চয়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের) তখন এইরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতী হইবার অধিকার তাঁহার আছে বটে।

কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিতেও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে 'কোন্ সাহসে' আমি 'বড় বড় সাহিত্যিকের' সমালোচনা করিয়া থাকি। ইহার উত্তরে জানাইতেছি যে ঠিক যে-সাহসে তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, সেই সাহসেই আমি লিখিয়া থাকি। সাহস বস্তুটি জলের ন্যায়—ইহার আকার আসলে এক, কেবল পাত্রের তফাতে তফাত হয়।

জানিয়া সুখী হইলাম যে পরমভাগবত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম. এ, বি. এল. আমাকে পড়াইতে পারেন। কিন্তু কি পড়াইবেন? পরমপৌরুষেয় ধূম্র এবং পর্নোগ্রাফিতে আমার রুচি নাই। তবে ইদানীং কিছু দর্শন এবং অর্থনীতির তত্ত্ব বিশেষ বিব্রত করিতেছে। লকের Epistemology মানিয়া লইয়া বৈদান্তিক প্রতিভাসকে Representationalism হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা? হেগেলের Spirit as Synthesis-এর মতকে Neo-Hegelian-গণ যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মার্কসীয় ডায়লেকটিক্‌সের বিচারে উহা কতদূর টিকে? ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমভাগবত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এম. এ., বি. এল. এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিতে রাজি আছেন কি ?

'ক্লেদাক্ত নীচ' পুরুষেরা যদি বিচারক না হইত তবে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী যে এতদিনে নোবেল প্রাইজ পাইতেন, সে বিষয়ে কুমারী শুচিস্মিতার ন্যায় আমিও নিঃসংশয়। আমার বারো বৎসর বয়সের সময় প্রভাবতী দেবীর কয়েকখানি নবেল পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবং তখনই তাঁহার নোবেল প্রাইজ পাইবার অধিকারের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহার পর অবশ্য তাঁহার অন্য-কোন গ্রন্থ পড়া হইয়া উঠে নাই। 'দানের মর্যাদা' আমি পড়ি নাই। কুমারী শুচিস্মিতা যদি তাঁহার প্রভাবতীদির এই গ্রন্থখানি ধার দিতে রাজি থাকেন, তবে পড়িয়া ধন্য হইতে পারি।

কুমারী শুচিস্মিতা পূজার জন্য কিছু ছিট চাহিয়াছিলেন। পূজা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ভক্ত পাঠিকাকে ছিট যোগাইতে আমার এখনও আপত্তি নাই। কিরূপ ছিট প্রয়োজন জানাইলেই যোগাইতে পারি। মূল্য লাগিবে না—কিন্তু বাহির হইতে উহা যোগাইবার কোন প্রয়োজন আছে কি? মনে হয় না।

শুচিস্মিতা লিখিয়াছেন যে সত্যকথা বলা তাঁহার এক বিশ্রী স্বভাব। কিন্তু আমি বলি, উহা মোটেই বিশ্রী নহে—উহা অত্যন্ত সুশ্রী, অত্যন্ত সুমধুর। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী, সত্যবাদিনী এবং মধুরভাষিণী মহিলা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয়া নাই। 'এমন সময় একদিন আসবে যখন পৃথিবীর লোকেরা আমার কথার মূল্য বুঝতে পারবে।'

* * *

সপ্তপদী

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস সপ্তপদীর সিনেমায়িত রূপ দেখিলাম। দেখিলাম, সিনেমায়িত রূপ উহার মূল রূপ হইতে কেবল সপ্তপদ নহে বহুশত পদ দূর দিয়া হাঁটিয়াছে। তারাশঙ্কর নিজেও উহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়া শ্যাম এবং কুল উভয় বজায় রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা, যাহারা তারাশঙ্করের অনুরাগী, তাহারা সিনেমাওয়ালাদিগের এই ধৃষ্টতায় নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইয়াছি। শিল্পী তারাশঙ্করকে লইয়া যাহা-খুশি-তাহা করিবার ঔদ্ধত্য আমরা ক্ষমা করিতে রাজি নহি। সেইজন্য, আমরা আশা করি যে এখন হইতে এই-সকল সিনেমাওয়ালাদিগের সকল সংস্রব আমাদিগের প্রিয় লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অবহেলায় পরিত্যাগ করিবেন।

* * *

পুরস্কারের মূল্য

আজীবন রবীন্দ্র-চর্চার জন্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন সরকারী পুরস্কার পাওয়ায় আমরা আন্তরিক প্রীত হইয়াছি। এতকাল স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ভিন্ন অন্যত্র পুলিনবিহারী সেনের কেবল প্রশংসাই শুনিয়া আসিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন অপকর্মের খবর বাহির করিতে পারি নাই। এইবার আশা করিতেছি তাহা পারা যাইবে। আশা করিতেছি, তাঁহার বন্ধুমহল হইতে শীঘ্রই তাঁহার বহুবিধ দুষ্কৃতির বিশ্বস্ত সংবাদ পাওয়া যাইবে। পুরস্কারের মূল্য যে কেবল আড়াই হাজার নহে, সেন মহাশয় তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-১৮৩৮

৩৪শ বর্ষ,
২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮

সংবাদ-সাহিত্য

5209

হিমশীতল স্পর্শ

হিমপ্রবাহের শীতল স্পর্শ সমস্ত উত্তর ভারতকে কম্পান্বিত করিয়া দিয়াছে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মতে জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ বটে কিন্তু এবারে পদাতিক মানুষের জানু ভগ্ন; ভানু সারা বৎসর ফ্রেমবদ্ধ ফোটোগ্রাফরূপে গাঁদা ও রজনীগন্ধার মালার স্তূপে চাপা পড়িয়া বর্ষ-সমাপ্তির মুখে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, শতবার্ষিক স্মরণ-সভায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেছে বটে কিন্তু উত্তাপের সঞ্চার হইতেছে না; এবং কৃশানু এমনই কৃশ-তনু হইয়া পড়িয়াছেন যে ট্রেন-স্টীমারের বয়লারে স্টীম যোগাইতে সক্ষম হইতেছেন না। ফলে যাহাদের টাকার গরম নাই মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ তাহাদিগকে হয় চিতাবহ্নি অথবা ধরিত্রীমাতার বক্ষে তপ্ত হইবার অফুরন্ত সুযোগ দিতেছে। সংবাদপত্রের খবর যদি সত্য হয়, ইতিমধ্যেই সহস্রাধিক প্রলিটারিয়েট লিকুইডেটেড হইয়াছে।

বিশ্বাসী লোকেরা অষ্টগ্রহের আসন্ন অষ্টবজ্র সম্মেলনের গুরুতর সঙ্কটের কথা তুলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিতেছেন, কেহ বলিতেছেন গাগারিন-শেফার্ড-টিটভের মানবিক প্রশ্বাসে মহাকাশের পবিত্রতা ও স্থৈর্য বিনষ্ট হইয়াছে, আবার কেহ বলিতেছেন, যে-মহাচীন অতীতে ফাহিয়েন, হিউয়েনচয়াং ও ই-শিংকে এই তথাগত-তীর্থে ধর্মশরণে প্রেরণ করিয়াছিল আজ সেই মহাচীনই মারণ-মন্ত্রের সঙ্গে এই শৈত্যকে ভারতে পাঠাইতেছে, পোর্তুগীজ-গোয়ায় আগুন জ্বালাইয়াও সে শৈত্য দমন করা যাইতেছে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘুণরা বলিতেছেন, এবারে চৈনিক গোবি-আলতাই-এর হিম-বাত্যার সঙ্গে পাকিস্তানী কারাকোরামের তুষার-ঝটিকা মিলিত হইয়া এই সর্বনাশ ঘটাইতেছে।

* * *

উত্তর ভারতে বঙ্গদেশ বরাবরই সর্বাধিক হতভাগ্য। এই মরশুমে শুধু নৈসর্গিক শৈত্যই নয়, মৃত্যুর তুহিনশীতল করাল করাঘাত বঙ্গমাতার অনেকগুলি সুসন্তানকেই মাতৃ-অঙ্কচ্যুত করিয়াছে। এত অল্পকালের মধ্যে এমন শোচনীয় ক্ষতি বাঙালীর আর বুঝি হয় নাই। বিমলচন্দ্র সিংহ, সুবোধকুমার মিত্র, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাইলট-স্বরূপ অগ্রগামী হওয়ার পর যেন শলাপরামর্শ করিয়াই বাংলার সপ্তরথী মৃত্যু-অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অনাথনাথ বসু কী সূত্রে একজোট হইলেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ বটে। বঙ্গমাতার প্রতিনিধিস্থানীয়া প্রবীণা সরলাবালা সরকার সঙ্গে গিয়াছেন ইহাই সপ্তরথীর পক্ষে ভরসার কথা। সংস্কৃতিবান রসিক ধূর্জটিপ্রসাদ, কম্যুনিস্ট বঙ্কিমচন্দ্র, শিক্ষাবিদ নির্মলকুমার, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস, সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ ও গান্ধীবাদী অনাথনাথ যে একই সঙ্গে এক পথের পথিক হইতে পারিলেন, ইহা দৃষ্টে আমরা বাঙালীরা, যদি অতঃপর সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি পরিহার করিতে পারি তবেই দেশের ও

জাতির এই ঘোরতর অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হইতে পারিবে। নির্বাচন-দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড কলহ-কোলাহলের অব্যবহিত পূর্বে ইঁহারা যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া গেলেন, এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

হার্মাদী হামলা

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট ক্রিষ্টফার কলম্বাস "ইণ্ডিয়া"র সন্ধানে স্পেন হইতে সদলে সমুদ্রযাত্রা করিয়া ভুল পথে গিয়া লাল ভারতীয়দের দেশ আবিষ্কার করেন। সে ভুল শোধরান পোর্তুগীজ ভাস্কো ডা গামা। তিনিই সর্বপ্রথম কেপ অফ গুড হোপ ঘুরিয়া জলপথে কালা ভারতীয়দের মাটি স্পর্শ করেন, ১৪৯৮ সনের ১৯ মে তারিখে গামার পদার্পণে ভারতবর্ষের সঙ্গে পোর্তুগালের পাপ-স্পর্শ ঘটে। কালিকটের জামোরিনের বদান্যতায় পাপস্পর্শ অচিরাৎ পাক-স্পর্শে পরিণত হয়। তাহার পর পুরা চার শতাব্দী ও চৌষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ঘরবাড়ি বাঁধিয়া এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম-বাখরগঞ্জ-সুন্দরবন অঞ্চলে হার্মাদী দৌরাত্ম্য করিয়া কয়েক শতাব্দীর পুরাতন সেই পাপ শেষ পর্যন্ত গোয়া-দমন-দিউয়ে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। এতদিনে নেহরুর ভারতবর্ষ যে পাপের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেন শুধু সেই পুণ্যেই জওহরলাল চিরস্মরণীয় হইতে পারিবেন।

দিগভ্রান্ত কলম্বাসের অবচেতন মনে কালা ভারতবর্ষের প্রতি যে কাম অবদমিত ছিল আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে সেই ভারতের গোয়া হইতে পোর্তুগীজ প্রভুত্ব-বিতাড়নে কলম্বাসদের বংশধরদের জবানে তাহাই প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। যাহা মূলে সহজ সরল স্বাভাবিক কামনামাত্র ছিল তাহাই কুটিল-জটিল রাজনীতির প্যাঁচে রূপান্তরিত হইয়াছে। কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য আমরা আতঙ্কিত হইয়া আছি। চৈনিক তৈমুর-চেঙ্গীজ এবং গজনীর মহম্মদ ঘোরী ও আহম্মদ শাহ আবদালিরা আজিও ওত পাতিয়া আছে। তদুপরি মহাকাশে গাগারিনদের খোঁচাখুঁচিতে স্বভাব-ক্রোধী গ্রহেরা সম্মিলিত হইবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। আমাদের এখন প্রায় দি বয় স্ট ড্ অন দি বার্নিং ডেকের অবস্থা। গ্রহশান্তি করাইব—পঞ্জিকার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে ও গুপ্তপ্রেসে একই সঙ্গে ঘা মারিয়া শকাব্দী সরকার তাহাতেও বাদ সাধিতেছেন। 'রাজসিংহে'র মবারকের মত আমাদিগকেও বুঝি বলিতে হয়, "ইয়া আল্লা, আমাকে মরিতেই হইবে!"

পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর

আমাদের দেশে গজানন গণেশই প্রথম লংহ্যাণ্ড লিখিয়ে। তিনি ব্যাসের ডিকটেশনে মহাভারত লিখিয়াছিলেন। তাই পণ্ডিত ও কবিরা তাঁহার যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন জনগণেশের মুখে মুখে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। "পার্বতীসুতো লম্বোদরঃ" হইয়াছে "পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর"। লিখিয়েদের এমন লাগসই পরিচয় আর নাই। ইহা কেবল কল্পনাশ্রয়ী কথাসাহিত্যিক রম্যরচনাকার ও কবিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয় জীবনীকার ও ঐতিহাসিকেরাও যে পাক দিয়া সুতা লম্বা করিয়া থাকেন তাহা, খ্রীষ্টপূর্ব অনৈতি-হাসিক দৃষ্টান্তে যাইব না, ঐতিহাসিক কালের ঘটনা দ্বারাই প্রমাণ করা যায়। যীশুর যে চারিটি জীবনী পবিত্র বাইবেলের শ্রেষ্ঠ ভাগ অর্থাৎ 'নূতন নিয়ম' হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে একই ঘটনা বিভিন্ন লিখিয়ের পাকে যীশু-জীবনীকে কিরূপ লম্বা করিয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যের জীবনীও মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, লোচন দাস, কবিরাজ গোস্বামী এবং সন্দেহ-জনক গোবিন্দ দাসে কিরূপ প্রলম্বিত হইয়াছে পরবর্তী-কালে সুশীলকুমার দে, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ও বিমানবিহারী মজুমদার তাহা দেখাইয়াছেন। প্রায় আমাদেরই কালে শুধু বৈদ্য লিখিয়েদের হাতের পাকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কতখানি লম্বা হইয়াছেন কেশবচন্দ্র সেন, ভাই গিরিশ সেন, শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তেরাই তাহার সাক্ষ্য। এইবার রবীন্দ্রনাথের পালা। আমরা যতদূর জানি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই (তাঁহার বয়স তখন ২৩) তাঁহার জীবনী ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে, 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'র পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ বিগত ৭৭ বৎসর ধরিয়া লিখিয়েরা স্বভাবদীর্ঘ রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘতর করিতেছেন। এই

লক্ষ্মীকরণ ১৯৬১ সনে জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া চরমে উঠিয়াছে। কোন্ গোপিনীর হাতে শ্রীকৃষ্ণ কতখানি ধরা দিয়াছিলেন তাহার যদি লিখিত রিপোর্ট থাকিত তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কাট-ছাঁট করিয়া আদর্শ 'কৃষ্ণ-চরিত্র' রচনা করিতে সাহসী হইতেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই ছাপাখানার বিস্তারের যুগে সবই ছাপা এবং পাকা দলিল। মৃণালিনী দেবীর তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ কাহাকে "ওগো" এবং কে তাঁহাকে "উনি" বলিতেন, কাহাদেরই বা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পক্ষ বলিতেন এই সকল ব্যক্তিগত গুহ্য কথার স্তূপ আজ আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নির্মলকুমারী বা ইমলিবেগমের সহিত ঔরংজেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন, যাহাতে শাহানশাহ নিজের পাঞ্জা পর্যন্ত ইমলিবেগমকে দিয়াছিলেন এমন উক্তিও আছে, ঔপন্যাসিকের কল্পনাবিলাস বলিয়া আমরা সহজেই উড়াইয়া দিতে পারি কিন্তু ইমলিবেগমরা যদি অটোবায়োগ্রাফি লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে আমরা অত সহজে নিষ্কৃতি পাইতাম না। আজ চিঠিপত্র ও আত্মজীবনীর যুগে নানা পরস্পরবিরোধী সত্য কথার মধ্যে কোনটি আসল সত্য তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত এখানে দাখিল করিতেছি।

হোয়াট ইজ ট্রুথ?

যীশুখ্রীষ্টকে যখন ইহুদী ফ্যারিশিরা জুডিয়ার প্রকিউরেটর (গবর্ণর) পন্‌শিয়াস পাইলেটের (অন্য উচ্চারণও হইতে পারে) নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানাভাবে শাস্ত্র লঙ্ঘনের নালিশ জানাইল তখন পাইলেট যদিও হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে যীশু নির্দোষ কিন্তু জনতার দাবির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরিহাসবিজল্পিত ভঙ্গিতে একবার মাত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হোয়াট ইজ ট্রুথ, সত্য কি? খানাপিনায় তাঁহার মন ছিল, এক বদনা জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বলিলেন, এই লোকটির বিচারে ক্রুশ-ব্যবস্থার রায়দানের পাপ হইতে আমি মুক্ত হইলাম, সত্য কি এই প্রশ্নের জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

আমরা এইভাবে চলিয়া যাইতে পারি না কাজেই সত্য কি আমাদের নির্ধারণ করিতেই হইবে। 'দেশ' পত্রিকার রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সংখ্যায় সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথের "হে মাধবী দ্বিধা কেন" গানটি যে তাঁহার ভৃত্য বনমালীর পাঁচজন লোকের সম্মুখে তাঁহাকে এক গ্লাস শরবত সরবরাহ উপলক্ষ্যে রচিত তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁহার 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' গ্রন্থে লিখিয়াছেন কবি পূর্বরচিত এই গানটি যখন শিখাইতেছিলেন তখন বনমালী এক প্লেট আইসক্রীম কবির সম্মুখে উপস্থিত করিতে দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত পূর্বরচিত গানের দুই কলি গাহিয়াছিলেন মাত্র। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকের ১৩৬৩ সালের সংস্করণের ১৮৬ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "[অমুক] বললে, আপনি নাকি বনমালীকে দেখে লিখেছেন—হে মাধবী দ্বিধা কেন? শুনে এমন মনের অবস্থা হল, না হয় সুদিন গেছেই তাই বলে কি এমন দুর্দশা হয়েছে যে, বনমালীকে দেখে গাইব—ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন?"

গোলে পড়িয়া আমরা সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য স্বয়ং কবির শরণাপন্ন হইয়াছিলাম প্ল্যানচেটে। অনেক কষ্টে অনেক লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে টেবিলে হাজির করা গেল। তিনি স্বভাবসুলভ পরিহাস-গাম্ভীর্যে বলিলেন, "গানটার উৎস হচ্ছে শান্তিনিকেতনের হেমা ধোবি। আমার একটা সখের বহির্বাস মানে আলখাল্লা তাকে কাচতে দিয়েছিলেম, কেচে যখন এল, দেখি পিঠের দিকে লম্বালম্বি দু-টুকরো হয়ে গেছে সেই চীনাংশুক-বাস। খুবই মনঃকষ্ট পেয়েছিলেম তবু মুখে হাসি টেনে হেমা ধোবিকে প্রশ্ন করেছিলেম, হেমা ধোবি, দ্বিধা কেন? সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ-সামঞ্জস্যে হে মাধবী দ্বিধা কেন গানটি রচনা করেছিলেম।"

এই সত্য কাহিনী প্রচারের ভারও তিনি আমাদের দিয়াছিলেন এবং সতর্ক করিয়াছিলেন তাঁহার উপর অবিরাম মিথ্যার বোঝা চাপাইয়া তাঁহাকে প্রফেটে পরিণত করা না হয় সে দিকে যেন আমরা সর্বদা অবহিত থাকি।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

এবার বাংলাদেশের সাহিত্য সংসারে সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বরে কলিকাতার রবীন্দ্র-ভবনের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ৩৭তম অধিবেশন; এই বৎসরের ১লা জানুয়ারি বোম্বাইয়ে আরব্ধ রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষের ব্রত এই অধিবেশনে উদযাপিত হইল। এইবারকার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে জীবনের অন্যান্য বিভাগে কৃতী বাঙালীদের অন্তরালে রাখিয়া একান্তভাবে বঙ্গ ভারতীর সেবকদেরই প্রাধান্য দান। সাহিত্যিকেরা এই গুরু দায়িত্ব চমৎকার ভাবে মর্যাদার সহিত পালন করিয়াছেন। উদ্বোধক ও বিভিন্ন সভাপতির অভিভাষণে সাহিত্যের সকল বিভাগের আলোচনা ব্যাপক ভাবেই করা হইয়াছে, আমরা তন্মধ্যে কয়েকটির মোদ্দাকথা পর পর পুনর্মুদ্রিত করিলাম। কাব্যশাখার সভাপতির ভাষণ অন্যত্র সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

সম্মেলনের উদ্বোধক গুজরাটের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শ্রীউমাশঙ্কর যোশী বলেন:

"His [Tagore's] genius was called upon to function in a world context, of which science and internationalism, he was not slow in recognising, were the two most outstanding forces. When Tagore, the poet, came to give articulation to the soul of India in this new world context, his creative genius drew upon the contemporary social landscape and historical and mythological memories to emphasize the one preoccupation of India with Dharma through the ages. Thus he reaffirmed in modern terms the one thing that had always been nearest and dearest to India. Tagore's self-fulfilment as a man and poet was also the fulfilment of India, for he passed on in immortal speech to the coming generations, for whatever it is worth, the indomitable urge in the soul of India, viz. the untiring quest for Dharma in newer and newer context. Therefore it is that I venture to suggest that Rabindranath is more akin to Vyasa than either Valmiki or Kalidasa."

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

"আজ বিজ্ঞান মারাত্মক রূপ নিয়ে আমাদের সামগ্রিক ধ্বংস সাধনে উদ্যতবজ্র হয়েছে। আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞান ও কল্যাণবুদ্ধি এই ধ্বংসলীলা নিরোধে অক্ষমতা দেখাচ্ছে। বিশ্বের এই সঙ্কটমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন জীবনবাণী নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। এই বাণী ভারতের শাশ্বত, বহুপরীক্ষিত বাণী। পাশ্চাত্ত্য কবি ও মনীষিগণ ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আর কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পারছেন না। প্রচলিত অর্থ-নীতি, বিজ্ঞান শাসিত জীবন যাত্রা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তাঁদের মতে ব্যর্থ চক্রাবর্ত্তনে জীবনীশক্তি নিঃশেষ করছে—বিশ্বজোড়া আঁধারে কোন নূতন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সমস্ত বিশ্ব রবীন্দ্রনাথকে প্রশস্তিজ্ঞাপন করছে শুধু কবি বলে নয়, নব জীবন-বেদের উদ্গাতারূপে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৌন্দর্যে শুধু মুগ্ধ না হয়ে তাঁর সামগ্রিক জীবন দর্শন, তাঁর অধ্যাত্ম প্রত্যয়, তাঁর উদার ও বিশ্বজনীন, সর্বসমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবার জন্য যদি প্রস্তুত হই, ও তাঁর বাণী যদি আমাদের সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পারি তবেই আমাদের রবীন্দ্রপূজা সার্থক হবে।"

মূল সভাপতি শ্রীকালিদাস রায় বলেন:

"প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ বিরাট সৃষ্টি। প্রবন্ধকে তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যে পরিণত করেন। সত্য শিব সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধমালাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। সত্যাশ্রিত—কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা কবিগুরুর ভাষায় সত্যের ভূমির উপর দিয়া লঘু পদে বিচরণের জন্য রচিত। যুক্তির বদলে ঘন ঘন ঔপম্য (Analogy) প্রয়োগে সরস করিয়া অথবা পঞ্চভূতের মতো মিত্র সম্মিত আলোচনার আকারে রচিত বলিয়া তাহা সাহিত্য।

২। শিবাশ্রিত—জাতীয় কল্যাণ ও মানবাত্মার কল্যাণের জন্য রচিত। কবিত্বময় ভাষায় হৃদয়াবেগে অনুপ্রাণিত বলিয়া সাহিত্য।

৩। সুন্দরাশ্রিত—অবিমিশ্র রস সৃষ্টির জন্য রচিত।

কবি মানসের সহিত গভীর চিন্তাশীলতার শুভ সম্মিলনের অভাবে প্রবন্ধ সাহিত্য দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। প্রবন্ধ পূর্ববৎ রচিত হইতেছে কিন্তু ভাষার জন্য তাহা সাহিত্য পদবাচ্য হইতেছে না।

এযুগের অধিকাংশ প্রবন্ধ তথ্য, উদ্ধৃতি ও যুক্তির সাহায্যে অপরিচ্ছন্ন অস্বচ্ছ ও ইঙ্গবঙ্গীয় ভাষায় রচিত।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার লেখক ও পাঠকদের সর্বশাখার সাহিত্যের আদর্শ নিদর্শন যেমন দিয়াছেন, সাহিত্য-বিচারমূলক প্রবন্ধে তেমনি দিয়াছেন রসবোধে দীক্ষা, স্বদেশসেবামূলক প্রবন্ধে স্বদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দিয়াছেন শিক্ষা, ধর্মমূলক প্রবন্ধে দিয়াছেন সর্ব-সংস্কারমুক্ত মানবধর্মের ব্যাখ্যা, আর শিক্ষামূলক প্রবন্ধে করিয়াছেন শিক্ষার পথ-নির্দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাবের ইহাই চরম কথা।

এই সদ্যোমুক্ত জাতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও দেহেমনে প্রকৃতিস্থ করিয়া আপনাদেরই গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেবল নরনারীর বিশেষ করিয়া যুবক যুবতীর অবসর কাল বিনোদনের উপচার যোগানো সাহিত্যের যদি ব্রত হয়—তাহা হইলে সাহিত্যের যে কোন অনুকল্পের দ্বারাই তাহা সাধিত হইতে পারে। তাহাতে সাহিত্যিকদের মর্যাদা হারাইয়া বাজিগরের পর্যায়ে নামিয়া যাইতে হইবে। পাঠকপাঠিকাদের রুচিপ্রবৃত্তির আনুগত্য না করিয়া তাহাদের রুচিপ্রবৃত্তির সংস্কার সাধন আপনারাই করিতে পারেন।

জনসাধারণের কাছে ধর্মগুরু বা জ্ঞানগুরুদের বাণী পৌঁছায় না—আপনারাই তাঁহাদের বাণী-সম্ভার ও জ্ঞান-সম্পদ অধিগত করিয়া তাহা ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতে পারেন যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আপনাদেরই একজনের রচিত সাহিত্যের বাহনতায় ঘরে ঘরে পৌঁছিয়াছে।

আপনারা মনে প্রাণে জানেন মানবকল্যাণের সঙ্গে রসসাহিত্য সাধনার বিরোধ নাই। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমাদের জাতি দুর্বল, দরিদ্র, অসংযত, অসংহত, শিক্ষাবিমুখ ও সদ্য-শৃঙ্খলমুক্ত, কিন্তু শৃঙ্খলাযুক্ত নয়। কাজেই ইউরোপীয় সাহিত্য ও সমাজের দোহাই দিয়া লাভ নাই। শুচিসুন্দর উদাত্ত মহান ভাবগুলিকে কি করিয়া আর্টের অঙ্গহানি না করিয়াই কৌশলে সন্তর্পণে দেশময় বিকীর্ণ করা যায় তাহা আপনারাই জানেন। জ্ঞানগুরুরা বা লোকশিক্ষকরা তাহা জানেন না। কোথাও একটু বাক্‌সংযম, কোথাও কল্পনার একটু বল্গাসংহরণ, কোথাও সুনীতিদীপের সামান্য সামান্য আলোকপাত, কোথাও পাপের প্রতি জুগুপ্সা, কোথাও ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার সাহায্য গ্রহণ, কোথাও রিরংসামূলক অংশ বর্জন—হয়ত এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি কীই বা হইতে পারে? কামধেনু যার ঘরে ছাগীশোকে সে কি মরে?''

সাহিত্য-শাখার উদ্বোধক শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন:

"বাঙালী কল্যাণকৃৎ হইয়াও অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিয়াছে ও করিতেছে। অনেকে বলেন বাঙালী কি মহাসমরে না মরিয়া সাতনলার ঘায়ে মরিবে? সব্যসাচী কি বৃহন্নলা হইয়াই থাকিবে? না, থাকিবে না—মহাভারতের কপিধ্বজ রথের সারথি তাঁহাদিগকে ভুলিবেন না।

কবিগুরু আপনাদের ভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া জগৎবরেণ্য করিয়াছেন, আপনারা নিজ অব্যভিচারী প্রতিভায় ও মনীষায় সেই সুধাসত্রের অধিকারী হইবেন।''

কথা-সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন:

"পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে অনেককিছু জানতে হয়। জানতে হয় কেমন করে কোত্থেকে সে খাদ্য আহরণ করবে, জানতে হয়—কেমন করে অন্ন, বস্ত্র, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান আয়ত্ত করে জগতের এই জীবলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব বলে নিজের পরিচয় দেবে। কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলে, চিররহস্যাবৃত অন্ধকারের সে কোন্ পরপারে তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানবার ব্যাকুল আগ্রহে এই ভারতবর্ষের মানুষই একদিন রাজশক্তির সুতীব্র মাদকতাকে বিসর্জন দিয়েছে, রাজসিংহাসন অবহেলায় পরিত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তৃপ্তিহীন ভোগকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। আবরণ-আচ্ছাদন, দম্ভ, অহঙ্কার, সব-কিছু অসার হয়ে গেছে তার কাছে।

এ আমাদের মনের বিলাস নয়। দারিদ্র্য গোপন

করবার কৌশল নয়। জীবনকে একটা প্রগতিবিমুখ জপমালাধারী জড়পিণ্ডে পরিণত করবার ইঙ্গিত নয়। এই আমাদের মনের ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটিতে যে-মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, এই তার জীবনের আদর্শ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে স্বর্গের প্রতিস্পর্দ্ধী ইউরোপের মদগর্ব্বী প্রতাপ, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, ইউরোপের সমাজব্যবস্থা এবং শিল্প-সাহিত্যের অসঙ্গত অক্ষম অনুকরণ—আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেনি। কারণ, ভিন্ন ধাতুতে গড়া এ-দেশ, ভিন্ন-সুরে বাঁধা আমাদের মন। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে আমরা যদি কোনোদিন ইউরোপের সমকক্ষ হয়ে উঠি, সমাজব্যবস্থা পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণের সার্থক অনুকরণে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন আমাদের আর ভারতীয় বলে চিনতে নাও পারি, তেমন দিনেও যদি হঠাৎ দেখি, ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত কোনও সাধক তার সকল চাওয়া সকল পাওয়ার উর্দ্ধে কোনও উঁচু সুরে জীবনের যন্ত্রটি বেঁধে ফেলেছেন, তখন সেই পরধর্ম্মগ্রহণকারী ভারতীয়ের হৃদয়েও তৎক্ষণাৎ সেই সুরটি প্রতিঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যাবে সেখানে।

এম্‌নি একটা বিচিত্র উপাদানে গড়া আমাদের ভারতীয় মানুষের মন।

এই মানুষের মাঝেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সেই পরমাশ্চর্য্য মহাশক্তি যা তাকে ক্রমাগত টানছে তার আবশ্যক সীমার বাইরে, যেখানে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দেনা-পাওনার কোনও অভাবই তার মিটবে না।—সেই সমস্ত অভাব-বোধকে, পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশকে অনায়াসে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের সেই পরিপূর্ণতার, আত্মসমর্পণের সেই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যে-ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা চিরকাল ব্যাকুল, আমি সেই মিষ্টিক ভারতবর্ষের সেই চিররহস্যময় ভারতবর্ষের মানুষের জীবন-ধেয়ানী শিল্পী। যে পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানের গৌরবে ভারতবর্ষ চিরকাল গর্বিত, যে-জ্ঞান মানুষকে তার সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি, তার সমস্ত সংকীর্ণতার, তার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির দুর্ভাবনার পরপারে নিয়ে যায় তার মনের মুক্তির সে এক সীমাহীন আনন্দের মধ্যে, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের সেই তেজস্বী জ্ঞানকে—সে জ্ঞানের অমিত শক্তিকে স্পর্শ করাই হোক আমাদের এ ভারতবর্ষের সাহিত্যের মূলমন্ত্র!"

নাট্য-সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীমন্মথ রায় বলেন:

"নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। অভিনয়েই নাটকের সার্থক সম্পূর্ণ হয়। নাট্যশালার জন্য যেমন নাটকের প্রয়োজ নাটকের জন্যও নাট্যশালা তেমনই অপরিহার্য। অভিনয়ে সুব্যবস্থা না হলে নাটকের মান উন্নয়নের কোনও আ নেই। বাংলা নাটকের পক্ষে নাট্যশালার স্বল্পতাই এ একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার রাজধা কলকাতার কথাই ধরা যাক্। বহুকাল থেকে দে যাচ্ছে কলকাতায় চারটির বেশী স্থায়ী পেশাদার নাট্যশা নেই। কলকাতার জনসংখ্যা যে উর্দ্ধস্তরে গি পৌঁছেছে তাতে এই চারটি স্থায়ী নাট্যশালা দর্শকদে নাট্য-পিপাসা মেটাতে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। অপেশাদা নাট্যসংস্থাগুলি স্থায়ী মঞ্চের অভাবে সঙ্কুচিত। স্থায়ী নাট্যশালার অপ্রতুলতা বাংলার নবনাট্য আন্দোলনে অগ্রগতির পথে শোচনীয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুখের বিষয় এই রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী শুভ বৎসরে গত পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে, এই মহানগরীতে জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপন করেছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু। দুঃখের বিষয়, এই নাট্যশালার সংগঠন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোন ঘোষণা এখনও পর্যন্ত জনসাধারণ অবগত নন। জাতীয় নাট্যশালার বিরাট ইমারতটি গড়ে উঠছে, সম্পূর্ণ হতেও নাকি আর বিশেষ দেরি নেই। কিন্তু বিভিন্ন পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যসংস্থার সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালার যদি নাড়ীর যোগ না থাকে, তবে তাকে জাতীয় নাট্যশালা বলা যায় কি না, আশা করি সরকার এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন—বিশেষ, যেখানে দেশের সকল নাট্য সংস্থাই এই জাতীয় নাট্যশালাটিকে বাংলার গর্ব ও গৌরবে পরিণত করিতে সমুৎসুক।

আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় আর একটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয়। পাশ্চাত্ত্য নাটককে কথা-সাহিত্যের সঙ্গে পৃথক করে দেখা হয় নি। সাহিত্য যদি দেশ-কাল-জাতির দর্পণ হয়, তবে বাংলা কথাসাহিত্যের

…ণ খুবই উজ্জ্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের …ণও অনুজ্জ্বল নয়। জাতিকে মহৎভাবে অনুপ্রাণিত …রা যদি সাহিত্যের দায়িত্ব হয় তবে মাইকেল মধুসূদন …, দীনবন্ধু মিত্র থেকে আরম্ভ করে গিরিশচন্দ্র, …জেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ …রে আধুনিক কালের শক্তিশালী নাট্যকারেরা এ দায়িত্ব …ষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন বা করে আসছেন। …াংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি যদি পাঠকের …নে দোলা দিয়ে থাকে তবে বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ …নিদর্শনগুলি আপামর জনসাধারণের মনে, সমগ্র জাতির …নে দোলা দিয়ে এসেছে। তর্ক হয়তো উঠতে পারে যে, …শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকগণ যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠকের …ত্তাকে জাগ্রত করেছেন বাংলার নাট্যকারগণ সেখানে …শুধুই জনসাধারণের সস্তা ভাবপ্রবণতার ইন্ধন জুগিয়েছেন। …এ কথা বললে আমি এই অর্থই করব যে, শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকগণ তবে গজদন্ত মিনারে আরোহণ করে সমগ্র জনসাধারণকে ভাবপ্রবণ জনতার মিছিলরূপে দেখছেন। আর যদি তাই হয়, তবে আমি নাট্যকার ওই গজদন্ত মিনার থেকে দূরে সরে এসে ওই ভাবপ্রবণ জনতার সামিল হয়েই থাকতে চাই—যে জনসভায়, যে দর্শকসভায় বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী ও ঋষিগণ বসে বুদ্ধিজীবী-নিন্দিত ওই সস্তা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে থিয়েটারে হাততালি দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া, কথাসাহিত্যিকদের কথাসাহিত্য সাধারণ জনের তথাকথিত সস্তা আবেগের সমর্থন যদি না পেত তবে তাঁদের গ্রন্থের নিত্য নতুন সংস্করণের সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে তাঁরা তাঁদের ওই গজদন্ত মিনারে উঠে বসতেও পারতেন না। ক্ষোভের সঙ্গে আমি এ কথা শুধু এই কারণেই বলতে বাধ্য হলাম যে, এখনও আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, বেশির ভাগ সাহিত্যপত্র-পত্রিকায় নাটক ছাপা হয় না। এমন কি বিপুল কলেবর শারদীয় সংখ্যাগুলিতেও না। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে এবং সে সব ক্ষেত্রে সম্পাদকের এবং পাঠকদের নাট্যপ্রীতি সাহিত্যপ্রীতি থেকে ভিন্ন নয়।"

ভারতীয় সাহিত্যশাখার উদ্বোধক শ্রীসুধাংশুমোহন …ন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

"ভারতীয় সাহিত্যের এই মূলগত ঐক্য থাকলেও ভাষা ভিন্ন, ও দূরত্বের দরুণ প্রকাশভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বিভিন্ন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা বিশ্বসাহিত্যের বিরাট আবর্তে পড়েছি। দেশ আজ স্বাধীন, আমরা স্বাধিকার প্রমত্ত। আজ ঘর ভাঙচে, মন ভাঙচে, সমাজ বিন্যাস বদলাচ্চে, নূতন নূতন সমস্যা জাগচে—অন্নচিন্তা চমৎকারা, দেশে আসছে শিল্পীকরণ। সে গ্রাম, সে অরণ্য, সে মন, সে মানুষ, সে বহতা নদী, সেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখর নিয়ে রোমান্টিক ভাববিলাসিতার যুগ নেই। আজকের ক্রুদ্ধ নবীন জনতার দল (angry youngmen) চাইছেন যে জীবনের অলিগলির ভিতরে যে দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্ট-বিরহ-কামনা-বেদনা, লোভ লাস্য মূক হয়ে আছে তাকে প্রকাশ করতে, তার ব্যাখ্যান বিচার বিশ্লেষণ করতে। আজ আর মোহময় অনুভূতিতে সাহিত্যের সৃষ্টি নয়, সে সাহিত্য হবে কঠিন নিষ্ঠুর, জীবনরসে জারিত। সেখানে থাকবে না শিবসুন্দরের কল্পনা, আবেগময় বাগবিস্তার। এ কথা শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর। ইংলণ্ডে এক যুগে ইয়েট্স এলিয়ট্, অয়ডেন, স্পেণ্ডার ডেলুইস্ একটা Cause খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সাহিত্যে তার স্পর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। আজকের তরুণ সাহিত্যিকরা কারণহীন কারণবারিতে হাবুডুবু খাচ্চেন। অসবোর্ণ, ওয়েন প্রভৃতির লেখা পড়লে মনে হয় যে তাঁরা হচ্চেন "far more interested in producing something hardhitting, something that will make an immediate impact." একে কী রবীন্দ্রনাথের কথায় বিশ্লেষণ করবো—

মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক্
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো, ছন্দটা নির্বাধুনিক্
পাঠকেরা বলে এতো নয় সোজা
একটি বর্ণ যায়না যে বোঝা

কবি হেসে কন্ তাহার কারণ আমার কবিতা আধুনিক্।
তবে কোন বক্রোক্তি না করেও বলা যেতে পারে আজকের বেশীভাগ লেখকই "Skilled craftsmen." inspired artists হয়তো নন—কারণ এ যুগ হচ্চে গতির যুগ, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস নিয়ে মত্ত হবার সময় নেই।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন :

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে কোন বিদেশী সাহিত্যিক অধ্যাপক জানিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবার হেতু তিনি খুঁজে পান না, তাঁর ধারণায় Ram Prasad Sen is a greater poet than Rabindranath. এ অবশ্য শোনা কথা কিন্তু সব শোনা কথাই মিথ্যা নয়। গাল বাড়িয়ে দিয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে চড় খাওয়া কেন। বিশেষ আঘাতের সবটা যখন প্রশংসাপত্রপ্রার্থীর গায়ে লাগছে না। আবার বিদেশে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতার উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে অনেকের মনে। যে শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলেই বাংলা ভাষায় অ, আ, ক, খ সম্বন্ধে অজ্ঞ, সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও উদাসীন তাদের মধ্যে গিয়ে গায়ে পড়ে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচার স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতির যোগ্য নয়। বিদেশে সত্যই যদি কারো মনে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে থাকে তবে আসুক সে বাংলাদেশে, বসুক সে বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে একাসনে, পড়ুক সে বর্ণপরিচয়, তারপর যথা সময়ে পৌঁছবে বোধদয়ে। রবীন্দ্র-সাহিত্য তার পরের কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যথার্থ গৌরব বোধ থাকলে এই দৃষ্টিতেই দেখতাম। কিন্তু না, তা হওয়ার উপায় নাই। কেননা, যুগের বিচিত্র নিয়মে রবীন্দ্রনাথ এখন রাজনৈতিক পাশা খেলার একটি ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছেন। কোন্ জাত কত রবীন্দ্র-সাহিত্য ভক্ত—এই রেষারেষির পথে সকলেই প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে ভারতীয় রাজনীতির খাস দরবারে। ভারত সরকারও বড় গররাজি নন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্যাশ সার্টিফিকেট তাঁরা পুরা দামে ভাঙ্গাতে চেষ্টা করছেন বিশ্বের বাজারে। এর মধ্যেও দীনতা আছে—সে দীনতা সাবালক জাতের যোগ্য নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা উঠেছে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। কথাটা আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ গীতি-কবিতা যার তুলনা নেই বললেও চলে। কিন্তু গীতি-কবিতা তো ভাষান্তরে বহনযোগ্য নয়; ভাষান্তরে বাহিত হলে তার প্রাণ থাকে না। এহেন বস্তু ভাষান্তরে বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? আর ভাষান্তরে বাহিত হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রমাণ দাখিল করতে সক্ষম হবে না। ইংরাজী গীতাঞ্জলির সাহিত্যিক সাফল্যের দৃষ্টান্ত অনেকের মনে পড়বে। কিন্তু ইংরাজী গীতাঞ্জলি তো অনুবাদ নয়—নূতন সৃষ্টি। এখন আর তা সম্ভব নয়। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত গৌণ অংশ, বিশেষ ভাবে তাঁর ছোট গল্পগুলো ভাষান্তরিত করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতেও পৌঁছে দেওয়া হবে না রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয়। গীতি কবিতা যাঁর প্রধান সম্পদ তাঁর পক্ষে এরকম অসুবিধা অপরিহার্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় হবে মনীষী-রূপে, ভারতের বাণীবাহকরূপে, মানব-প্রেমিক ঋষিরূপে। সেই সঙ্গে জনশ্রুতিতে থাকবে যে তিনি একজন অসামান্য কবিও বটেন। এ মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আরও একটা কথা। বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে; মুদ্রণ সংখ্যা চমকে দেয়—আমাদের পক্ষে গৌরব বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। তবু, একটা সন্দেহের কুশাঙ্কুর মনের মধ্যে খোঁচা দেয়। কী অনুবাদ হচ্ছে? সাত নকলে আসল খাস্তা হচ্ছে না তো? জ্ঞানকৃত বিকৃতি পরিবেশিত হচ্ছে না তো? সম্যক বুঝবার উপায় নাই—অধিকাংশ ভাষাই অধিকাংশের অজ্ঞাত। রবীন্দ্র-সাহিত্য যদি ভারতের পরিচয় বহন করে, তবে সে পরিচয় যাতে বিকৃত না হয় সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কে গ্রহণ করবে এ দায়িত্ব? বিশ্বভারতী, গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী, ভারত সরকার,—কে? এ বিষয়ে তাঁদের হুঁস আছে মনে হয় না। আগে অনেকবার এ সমস্যা উত্থাপন করে সাড়া পাই নি। আর হুঁস থাকলেও সাহসের আবশ্যক। কেউ-ই প্রথম ঢিলটি ছুঁড়তে চান না। আর যদি এ জাতীয় বিকার রোধ করবার ক্ষমতা আইনের হাতে না থাকে তবে অবশ্যই নিরুপায়।"

—

বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি

নারায়ণ দাশশর্মা

ভূমিকা

প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় বাংলা সাহিত্যরীতির সাম্প্রতিক সূত্রগুলির প্রধান একটি সূত্র অবলম্বন করার প্রয়াসে বারংবার আমি ব্যর্থ হয়েছি। সেটি হচ্ছে—ইংরেজীতে যার নাম প্লেগিয়ারিজম—সাদা বাংলায় চৌর্য।

পাঠকের অবিদিত নেই, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ প্রত্যেক সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষায় প্রেরণার গভীরতম উৎস যদি হন রবীন্দ্রনাথ, বিষয়ের বিস্তীর্ণতম উৎস তবে ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজী "সাহিত্য" সংজ্ঞায় এস্থলে চিরায়ত ক্লাসিক গ্রন্থ থেকে শুরু করে নিউজপ্রিন্টে ছাপা পেপারব্যাক ও রঙচঙে কমিক স্ট্রিপ পর্যন্ত সকলপ্রকার কাগুজে বস্তুই অন্তর্ভূত।

এ প্রসঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হবার প্রবৃত্তি আমার নেই; কেবলমাত্র স্বীকারোক্তি হিসাবেই আমি কথাটি উত্থাপন করেছি: সে-স্বীকারোক্তির অর্ধেক প্রথম অনুচ্ছেদে কথিত, বাকি অর্ধেক হল এই বারংবার ব্যর্থতার পরে এবারে আমি সফল হতে কৃতসঙ্কল্প।

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ—ইংরেজী টপিক্যাল ইভেন্টস কথাতে অর্থটি পরিস্ফুটতর, সম্পর্কে আলোচনায় অন্যের লেখা থেকে 'না বলিয়া লওয়া' এ কারণে কঠিন যে পুরনো পেপারব্যাক বা চিরনূতন ক্লাসিকে এবিষয়ে সাহায্যলাভ দুরাশা। অপরন্তু আজকের স্টেটসম্যান বা গত সপ্তাহের নিউ স্টেটসম্যান থেকে প্রবন্ধ আত্মসাৎ করা একটু অতিরিক্ত দুঃসাহসসাধ্য। এবং সাহিত্যিকদের ভীরুতার খ্যাতি জনশ্রুত।

তথাপি সেই দুঃসাহসে এবারে প্রবৃত্ত হয়েছি এই ভরসায় যে যে-প্রবন্ধটি থেকে বক্তব্য ও বাকভঙ্গী আত্মসাৎ করার বাসনা হয়েছে আমার, সে-প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার বাংলাদেশে সুপরিচিত নন।

প্রবন্ধটির নাম—সোশ্যালিজম অ্যাণ্ড দি ইণ্টেলেকচুয়ালস; লেখকের নাম কিংসলি অ্যামিস।

অ্যামিস প্রবন্ধটি শুরু করেছেন এইভাবে:

"আমার বক্তব্য থেকে অচিরেই বোঝা যাবে আমি পলিটিশিয়ান নই, কিংবা পলিটিক্স সম্বন্ধে তেমন কিছু বিশেষ রকম ওয়াকিবহালও নই আমি। পলিটিক্যাল প্যাম্প্লেট-লিখিয়ের দল সচরাচর এই দুটোর কোন একটা হয়ে থাকে; অতএব আমার লেখা খানিকটা স্বাদ বদলের কাজ অন্ততঃ করবে। রাজনীতির বিষয়ে আমি পড়াশুনা করি, তর্কও করি এবং কখনও কখনও, এমন কি, এ বিষয়ে চিন্তারও চেষ্টা করি বটে; কিন্তু তাই বলে আমি অথরিটি নিয়ে কোন কথা বলতে যাচ্ছি না।"

মূল ইংরেজী অংশটিই এখানে উদ্ধৃত করা চলত অনায়াসে, তাতে আমার পরিশ্রম যেমন বাঁচত তেমনি পাঠকের পক্ষে রসগ্রহণের পথও হত সুগম; কিন্তু আমি যখন রিসার্চ করতে বসি নি, আমার উদ্দেশ্য যখন প্লেগিয়ারিজম, তখন মূলের উদ্ধৃতি সাহিত্যরীতি-সম্মত হয় কী করে? বিবেক-দংশন থেকে আত্মরক্ষার জন্য

এতক্ষণ যেটুকু স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছি, একটি মাত্র প্রবন্ধের পক্ষে তাই আশা কার যথেষ্ট। অতঃপর পাঠক আমার রচনায় আর কোন উদ্ধৃতি-চিহ্নের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করবেন না।

২

রাজনীতির ব্যাপারে আলোচনা আমি যে কোন অথরিটি নিয়ে করতে বসি নি শুধু তাই নয়; সাদা কথায় বলা উচিত কোন দল বা মতের লেবেল—পার্টি বা ইজমের টিকিট আমার গায়ে আঁটা নেই। তাই বা কেন, আরও গোড়ার কথা হচ্ছে রাজনীতি "করার" বাসনা আমার বিন্দুমাত্র নেই।

এই রাজনীতি "করা" ধাতুটি নূতন বাংলা। ওকালতি করা, ডাক্তারী করা, দোকানদারী করা ইত্যাদি কৃ-অন্ত ধাতুগুলির পূর্ব পদ যে অর্থে কোন না কোন পেশাকে বোঝায়, রাজনীতি ঠিক সেই অর্থে পেশা-পদবাচ্য কি না আমার জানা নেই। হলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কারণ পেশা শব্দটিই গত দুই দশকে অনেকখানি জাতে উঠেছে; সর্বত্রই এখন শৌখিনের চেয়ে পেশাদারের, অ্যামেচারের চাইতে প্রফেশনালের কদর বেশী; দর দিয়ে কদরের বিচার যে-সমাজে স্বীকৃত সত্য সেখানে এটাই স্বাভাবিক। অলিম্পিকের রীতিনীতি এযুগে হাস্যকর ছেলেখেলা মাত্র, সাহিত্যের অলিম্পিকে যেমন রাজনীতির অলিম্পিকেও তেমনই সম্ভবত অ্যামেচারদেরই এখন প্রবেশ নিষেধ।

কয়েক বছর আগে কলকাতার পুলিস-কর্তৃপক্ষ যখন গুণ্ডানিরোধ কর্মসূচী অবলম্বন করেছিলেন, পেশাদার গুণ্ডার চাইতে অ্যামেচার গুণ্ডারাই—পুলিসের পরিভাষায় যাদের নামকরণ হয়েছিল উঠতি গুণ্ডা—ছিল সে ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। সাহিত্য, গুণ্ডামি ও রাজনীতি এই তিনটি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক কর্মক্ষেত্রে ক্রমেই অ্যামেচারকুল অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাত্য হয়ে পড়ছেন। এদের কোন ভবিষ্যৎ নেই।

এবং এর প্রথম দুটি ক্ষেত্রে যদি আমি কোনদিন অদৃষ্টক্রমে পেশাদার হয়েও বা পড়ি, রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রফেশনাল হওয়া আমার পক্ষে টেম্পারামেণ্টের দিক দিয়ে অসম্ভব।

অতএব বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই আমার রাজনীতি করার বাসনা নেই।

তথাপি রাজনীতি সম্পর্কে প্রসঙ্গ কথা রচনায় বসেছি এই কারণে যে রাজনীতি এই মুহূর্তের সবচেয়ে টপিক্যাল ইভেণ্ট।

দুটি সাধারণ নির্বাচন পার হয়ে আমরা এখন তৃতীয়ের সিংহদ্বারে; এবং গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন রাজনীতির স্থূলতম প্রকাশ। নির্বাচনে দুর্নীতি আইনত নিষিদ্ধ, দুর্নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনে জয় হলেও ট্রিবুন্যালের বিচারে বিজয়ী হয় পদচ্যুত; কিন্তু নির্বাচনে রাজনীতি শুধু আইনত সিদ্ধ নয়, রাজনীতির ভিত্তিতে ছাড়া নির্বাচনে জয়লাভ অসম্ভব।

যদিও নির্বাচন ছাড়াও অনেক কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে এখনই ঘটছে তবু সাধারণ নির্বাচন এমন একটা সর্বগ্রাসী বস্তু যাতে অন্য সকল ঘটনা হয় তৃতীয় শ্রেণীর গুরুত্বে পর্যবসিত হয়েছে অথবা নির্বাচনেরই কুক্ষিগত হয়ে অন্যতম ইলেকশন ইস্যু মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি নির্বাচনের মত দুটি ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানও আমরা অতিক্রম করে এসেছি এবং সে ক্ষেত্রেও তৃতীয় যোজনা এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দ্বারদেশে; ভাষা ও ভাষাগত মর্যাদার প্রশ্নে ভারতের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত বলে একটা তীক্ষ্ণ হাহাকার শোনা যাচ্ছে চতুর্দিকে: রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানের স্রোত সমাপ্ত হয়ে এসেছে, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ভট্টাচার্যকে পাকিস্তানী সামরিক আদালত দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে; মাষ্টার তারা সিং উপবাস, পারণ ও প্রায়শ্চিত্ত করেছেন; এবং এই প্রবন্ধ রচনাকালীন শেষ সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় অভিযাত্রীবাহিনী পাঞ্জিমে তেরঙা ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন, গোয়ার পর্তুগীজ সেনা-নায়ক সসৈন্য আত্মসমর্পণ করেছেন।

এই সব ঘটনাগুলির কোনটি আংশিকভাবে মাত্র রাজনৈতিক ঘটনা, কোনটি রাজনীতির আওতায় মোটেই পড়ে না। তবু এর প্রত্যেকটি ঘটনা সাধারণ নির্বাচনে

কোন না কোন দলের সহায়তা অথবা বিরোধিতা সৃষ্টি করবে; এবং নির্বাচনের মাধ্যমে এগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য ছাড়া অপর কোনরূপ মূল্যায়নের অবসর নেই দেশবাসীর।

শুধু ভারতের চৌহদ্দিতে সংঘটিত ঘটনাগুলি কেন, বহির্বিশ্বের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিও আমাদের কাছে আজ রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ নিয়েছে। সোভিয়েত য়ুনিয়নের মহাশূন্য জয় ও মৃত স্টালিনের দ্বিতীয় মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ভারতে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি দলের সপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট হ্রাসবৃদ্ধি হিসাবেই প্রতিভাত হবে।

সাধারণ নির্বাচন নামক সংক্রামক রাজনৈতিক পাণ্ডু-রোগের প্রাদুর্ভাবে আমাদের প্রত্যেকের চক্ষু আজ এমন গভীরভাবে রুগ্ন যে চতুর্দিকে আমরা শুধু একটি রঙ দেখতে পাচ্ছি: রাজনীতির পীতবর্ণ। রাজনীতির কানু ছাড়া গীত নাই আর। জীবিকার ধান ভানতে ভানতে আমরা রাজনৈতিক শিবের গান গাইতে বসেছি।

॥ এক ॥

রাজনীতির সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর সম্বন্ধ, আইনের ভাষায় nexus, জটিল ও বিচিত্র।

একদল বুদ্ধিজীবী, আর্টিস্ট জাতের যাঁরা, রাজনীতিকে দেখেন জুগুপ্সামূলক ঔদাসীন্যের দৃষ্টিতে। বুদ্ধদেব বসুর কটূক্তি "রাজনীতি কর্কশ কুটিল" (সমর সেন স্মরণীয়েষু) পংক্তিতে যদিও ঔদাসীন্যের পরিবর্তে অজ্ঞতাই অধিক সূচিত; জীবনানন্দ দাশের স্বগতোক্তি:

"চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়;
এ ছাড়া নির্মল কোন জননীত নেই।
যে-মানুষ—যেই দেশ টিঁকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যের মত কোনো ভূমা
চায়।…
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হলে তবে
উজ্জ্বল সময়-স্রোতে চলে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।"

(জনান্তিকে। সাতটি তারার তিমির)

অথবা

"সে অনেক রাজনীতি রুগ্ননীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি;…"

(তবু। শ্রেষ্ঠ কবিতা।)

কিংবা

"…মানুষের মন
জানে জীবনের মানে: সকলের ভাল করে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।"

(এই সব দিনরাত্রি। ঐ।)

ইত্যাদি পংক্তিতে আর্টিস্টের রাজনীতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য ও ঔদাসীন্যের কারণ সুস্পষ্ট।

একজন মাত্র কবির রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছি বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে অনুরূপ উক্তি অপরাপর আর্টিস্টের রচনায় বুঝি প্রভূত পরিমাণে নেই। ঐ একটি কবির গ্রন্থ এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে ছিল, এ ছাড়া ওঁর প্রতি আমার পক্ষপাতের অপর কোন কারণ দেখি না। কাজী নজরুল ইসলাম আর্টিস্ট-পদবাচ্য হলেও বুদ্ধিজীবী পরিচয়ে পরিচিত হতে পারেন কিনা সে বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে; তবু তাঁর রচনাতেও—যদ্যপি নজরুল সক্রিয় জীবনে যতটুকু কবি তার চেয়ে বোধ হয় বেশী ছিলেন পলিটিক্যাল অ্যাজিটেটর—রাজনীতি সম্বন্ধে যে কতকগুলি নির্দয় উক্তি আছে তাতে ঈর্ষা বা অজ্ঞতা নয়, বরঞ্চ মোহভঙ্গ ও জুগুপ্সাই বিবৃত। বিদেশী রচনার মধ্যে এই মুহূর্তে আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে ওআর্ডস্‌ওআর্থের একটি বহুপঠিত কবিতা এবং সম্প্রতিকালে বহুল-আলোচিত পাস্টেরনাক-কৃত ডক্টর ঝিভাগোর কথা।

কিন্তু অপর একদল বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা আবার রাজনীতির প্রেমে উন্মত্ত-অধীর; প্রায়শঃ উত্তীয়ের মত ব্যর্থ প্রেমে। আইনজীবী, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও

শিক্ষক—বিশেষতঃ সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি শাখার অধ্যাপককুল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকে দেখেন সেই আকর্ষণের চোখে, যেমন দৃষ্টিতে প্রেমিক প্রেমিকাকে, ভক্ত ঈশ্বরকে, শার্লক হোম্‌স্‌ অপরাধীকে ও মাতাল মদকে দেখে থাকে। রাজনীতিকে যদি অবয়ব-সম্পন্ন মানব-মূর্তিতে কল্পনা করি তবে তার মস্তিষ্ক হবে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা।

তা হলে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধবর্ণালীর দুই বিপরীত প্রান্তে পোলারাইজড হয়ে আছে—গভীর আকর্ষণে ও চরম বিকর্ষণে। আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর অধিকাংশ বিষয়ের মতই এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

রাজনীতির প্রতি বুদ্ধিজীবীর সুগভীর আকর্ষণের কারণঃ রাজনীতি বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়। যতদিন পর্যন্ত রাজ্যের ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজার বাহুবলের উপর নির্ভরশীল, ততদিন রাজনীতির জন্ম হয় নি; তার জন্ম হল সেইদিন যেদিন রাজকার্যে রাজা এবং সেনাপতি ছাড়াও মন্ত্রীর প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হল। ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, প্রথম রাজনীতিবিদ জন্মাল ব্রাহ্মণের গৃহে—যে ব্রাহ্মণ ভারতে বুদ্ধিজীবীদের পূর্ব-পুরুষ; যার সামাজিক শক্তি নিহিত ছিল বাহুবলে নয়, শস্ত্রচালন ক্ষমতায় নয়—অর্থগৌরবে কিংবা সেবা-পারঙ্গমতায় নয়, বুদ্ধিতে।

রাজনীতি শব্দটির অর্থ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। রাজার নীতি হয়েছে রাজ্যের নীতি, অতঃপর রাষ্ট্রের নীতি; প্রজাপালনের সূত্র থেকে বিবর্তিত হতে হতে রাজনীতি এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ-সূত্র। তবু বস্তুটির মৌলিক বুদ্ধিভিত্তিক রূপটি কিছু আর পরিত্যক্ত হয় নি, বরঞ্চ ক্রমেই আরও বেশী বুদ্ধিনির্ভর হয়ে পড়েছে সে। (এইখানে হয়তো বলে রাখা উচিত, 'বুদ্ধি' শব্দটি আমি এখানে মূল সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করেছি; বুদ্ধি অর্থ ধূর্ততা নয়, মননক্ষমতা; cleverness নয়, intelligence-ও ঠিক নয়, বলা চলে intellect)। অতএব রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীর পারস্পরিক আকর্ষণ সমুদ্র ও নাবিকের মতই সহজাত।

অপর পক্ষে রাজনীতি সম্পর্কে আর্টিস্টজাতের বুদ্ধিজীবীর প্রবল বিকর্ষণ-মনোভাবের কারণ—এ যুগের রাজনীতির সঙ্গে এস্‌থেটিক্‌সের বিরোধ। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সমাজতত্ত্বের স্থান আছে, ইতিহাসের স্থান আছে, রয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের স্থান; কিন্তু তাতে নন্দনতত্ত্বের স্থান নেই। অথচ তাত্ত্বিক দিক দিয়ে চিরদিন রাজনীতির সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ; প্লেটোর রিপাবলিক থেকে শুরু করে এঙ্গেল্‌সের অ্যান্টি-ডুহ্‌রিঙ পর্যন্ত রাজনীতির থীসিসগুলি মূলতঃ দর্শন-শাস্ত্রেরই গ্রন্থাবলী; হিটলারের মেইন ক্যাম্ফ্‌ পড়লে দেখা যায় এক উন্মাদ দার্শনিকের, কিন্তু উন্মাদ হলেও দার্শনিকের প্রলাপ; গান্ধীজীর সর্বোদয় পরিকল্পনা তো রাজনীতির নয়, দর্শনশাস্ত্রেরই এক নূতন দিগন্ত। তা হলে, রাজনীতির যদি দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাব, এস্‌থেটিক্‌সের সঙ্গে তার বিরোধ কেন? এর উত্তর—বিরোধ নেইঃ রাজনীতি যেখানে দর্শনশাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত সেখানে, রিপাব্‌লিকে বা য়ুটোপিয়ায়, ডায়েলেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজমে বা সর্বোদয়ে, রাজনীতির সঙ্গে এস্‌থেটিক্‌সের কোন বিরোধ নেই। বিরোধ এসেছে তখনই যখন প্রবক্তার হাত থেকে নেতার হাতে এসেছে রাজনীতির দার্শনিক তত্ত্ব, এবং নেতা থেকে জনতার হাতে।

রাজনীতির যে অসুন্দর রূপ জনতার কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আর্টিস্ট সেই রূপকে সহ্য করতে পারে না বলেই তার বিকর্ষণ। যে-রূপে স্লোগানের অত্যাচারে যুক্তি নির্বাসিত, ডগ্‌মার কারাগারে চিন্তা বন্দিনী, ক্ষমতার মত্ততায় বুদ্ধি রাহুগ্রস্ত, রাজনীতির সেই স্থূল মূর্তি আর্টিস্টের চক্ষুশূল।

বুদ্ধিজীবীর দুই শাখা, একদিকে আর্টিস্ট অপর দিকে সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতিকে দেখতে পায় দুই মূর্তিতে। এবং দুটি মূর্তিই সত্য।

তাহলে রাজনীতির সামগ্রিক রূপ কী? এবং রাজনীতির প্রতি বুদ্ধিজীবীর সৎ কর্তব্য কী? গ্রহণ, না বর্জন?

॥ দুই ॥

পূর্ব-পরিচ্ছেদে উত্থাপিত প্রশ্নটি উপস্থাপিত করতে গিয়ে আমি সজ্ঞানে একটি অপরাধ করেছি : অতি-সরলীকরণের অপরাধ।

প্রথমতঃ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আমি দুটি বিচ্ছিন্ন শাখায় ভাগ করেছি এমনভাবে যাতে মনে হতে পারে সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষে আর্টিস্ট হওয়া সম্ভব নয় এবং আর্টিস্টের পক্ষে নয় সমাজবেত্তা হওয়া। অধিকন্তু প্রত্যেকটি বুদ্ধিজীবীকে এই দুটি শাখার একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এরূপ ভুল ধারণারও অবকাশ রয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ বহু বুদ্ধিজীবী আছেন (মাইকেল এঞ্জেলো কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত অনন্য উদাহরণের কথা না তুলেও) যাঁরা যুগপৎ আর্টিস্ট ও সমাজবিজ্ঞানী ; এবং এ দুই সংজ্ঞার বহির্ভূত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও অগণিত। সাংবাদিক ও আইনজীবীকে আমি সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে শিথিল বন্ধনে জুড়ে দিয়েছি কিন্তু বৈজ্ঞানিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, চিকিৎসক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীকে যোগ করব কোন্ শাখায় ? তা ছাড়া রাজনীতি-পাগল সাহিত্যিক, রাজনীতি-এড়ানো অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি উদাহরণ কি বিরল ?

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিজীবীমাত্রেরই রাজনীতি সম্পর্কে আকর্ষণ-বিকর্ষণ কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া থাকতেই হবে এবং সে-প্রতিক্রিয়া নির্ভর করবে তার শ্রেণীগত রুচির ওপরে, এ যেন আমি স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে তুলে ধরেছি। শ্রেণী নয়, ব্যক্তিগত রুচি ও টেম্পারামেণ্ট অনুযায়ী এ বিষয়গুলি নির্ধারিত হয়ে থাকে, এই সহজ কথাটাকে আমি অযথা ঘোরালো করে তুলেছি।

তৃতীয়তঃ, 'রাজনীতি' শব্দটির সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞার্থ না বলে আমি সুবিধামত কোথাও পলিটিক্যাল ফিলজফি, কোথাও পলিটিক্যাল ইকনমি, কোথাও পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন ইত্যাদি বিবিধ অর্থে ওই এক শব্দ প্রয়োগ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছি।

এই অভিযোগগুলির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য সংক্ষেপেই সারব।

অতি-সরলীকরণের অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। সাময়িক-পত্রের একটি প্রবন্ধের পরিসরে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে উত্থাপন করতে হলে এরূপ না করে উপায় ছিল না। অন্ততঃ প্রথম পরিচ্ছেদে।

আর্টিস্ট এবং সমাজবিজ্ঞানী এই দুই শিরোনামার বুদ্ধিজীবীদের ভাগ করেছি, সেও সরলীকরণের প্রয়াসে। বস্তুতঃ পাঠক যদি এখন দয়া করে শিরোনামা দুটি বিস্মৃত হন, শুধু স্মরণ রাখেন যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ও অনেকে উদাসীন ; এবং প্রবন্ধকারের সঙ্গে এইটুকু মতৈক্য প্রকাশ করেন যে এই একটি নিরিখ দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইচ্ছা করলে বিভাজক রেখা টানা সম্ভব (টানার প্রয়োজন আছে কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর) তবে আমি বাধিত হব।

বুদ্ধিজীবী মাত্রেরই রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া থাকবে, এ কথা আমি সত্যই বিশ্বাস করি। মধ্য-যুগের য়ুরোপে (কিংবা অন্য কোন যুগ হবে : ইতিহাসে আমার জ্ঞান বিশুদ্ধ নয়) যেমন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যাণ্ট কোন-না কোন দলভুক্ত হতেই হয়েছিল ; উত্তর রেনেসাঁস বিশ্বে যেমন বুদ্ধিজীবী মাত্রকেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আইডিয়ালিস্ট কিংবা মেটিরিয়ালিস্ট দর্শনে আস্থা রাখতে হয়েছে ; উনিশ শো ছেচল্লিশের কলকাতায় পথচারীকে যেমন হিন্দু অথবা মুসলমান একটি পরিচয় স্বীকার করতেই হয়েছে, এ-ও তেমনি। রাজনীতি আজকের দিনে বলবত্তম ধর্ম, বুদ্ধিজীবীকে সে-ধর্মের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য কিংবা অনাস্থা প্রকাশ করতেই হবে ; অজ্ঞেয়-বাদী এ-ক্ষেত্রে নাস্তিক বলেই পরিগণিত।

রাজনীতি শব্দটি আমি 'পলিটিক্স্' শব্দের বিস্তৃততম লোক-স্বীকৃত অর্থে প্রয়োগ করেছি ; যে-অর্থে এম্. এন্. রায় থেকে শুরু করে বিড়ি মজদুর য়ুনিয়নের অনারারী অফিস সেক্রেটারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই রাজনীতি "করেন"।

॥ তিন ॥

A subject nation has no politics এবং এই উক্তির উত্তরে ঐতিহাসিক প্রত্যুক্তি A subject

nation has nothing but politics—এই দুটি বিবৃতিই সত্য। পরাধীন জাতির রাজনীতি ও স্বাধীন দেশের রাজনীতি পৃথক বস্তু।

ক্ষুদিরাম থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত একটি স্রোত, ডাণ্ডী অভিযানের গান্ধীজি থেকে কলকাতায় ১৯৪৫-এর ছাত্র-শোভাযাত্রা পর্যন্ত একটি স্রোত, ১৯৩৭-এর মন্ত্রীত্ব-গ্রহণ থেকে ১৯৪৬-এর মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব-গ্রহণ পর্যন্ত অপর একটি স্রোত, পরাধীন ভারতের এই সব রাজনীতির স্রোত বহমান হয়েছিল একটি মোহানার উদ্দেশ্যে, যার নাম স্বরাজ। এগুলি সেই পলিটিক্‌স্‌, সাবজেক্ট নেশনের যা না থাকলে নয়। কিন্তু এরই পাশাপাশি ছিল আরও কয়েকটি স্রোত যারা স্বাধীনতা-মোহানার উদ্দেশ্যে বয় নি। তাদের উদ্দিষ্ট ছিল আরও সহজ কিংবা আরও কঠিন। তেজবাহাদুর সাপ্রু-প্রমুখ পলিটিশিয়ান ছিলেন; লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস-মেন ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ইত্যাদি গোষ্ঠী ছিল; মহাত্মা ও সর্বোদয়-কর্মসূচী ছিল। এগুলি সেই জাতের পলিটিক্‌স্‌ যা পরাধীন ভারতের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে সম্ভবত অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু এই দ্বিতীয় জাতের রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল বলেই আবার ১৯৪৭-এর পর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয় নি। সাপ্রু থেকে রাজাগোপাল আচারী সৃষ্টি হয়েছে; কংগ্রেসের বামপন্থী উইং সৃষ্টি করেছে আবাদী-ব্র্যাণ্ড থেকে শুরু করে মস্কো-ব্র্যাণ্ড (অথবা পিকিং-ব্র্যাণ্ড?) নানা শেডের সমাজবাদী চিন্তাধারা; মহাত্মার রাজ-নৈতিক উত্তরাধিকার যদিও এখনো রয়েছে অনধিকৃত তবু পরোক্ষ-প্রভাবে সে-উত্তরাধিকার রাজনীতিকে নৈতিক স্তরে এক নূতন দিগন্ত দেখিয়েছে।

পরাধীনতার যুগে রাজনীতির স্থূল রূপ অজাত ছিল না। যে অগ্নিযুগের গৌরবে আমরা সঙ্গতভাবেই গর্বিত, সেও তো প্রতিদ্বন্দ্বী-হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত। [সে সম্পর্কে আর্টিস্টের প্রতিক্রিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কার এতবড় সৎসাহস?—এঁকে গিয়েছেন চার অধ্যায়ে।] সেকালেও ছিল ডগ্‌মা, গড্ডলিকা-বৃত্তি, স্লোগান, বুদ্ধিহীন যুক্তিহীন উন্মত্ততা। তবু আর্টিস্টের এসথেটিক মনের সামনে তার একটি আকর্ষণীয় রূপ ছিল: রোমান্টিক রূপ। অধিকন্তু যেহেতু পরাধীনতা নামক কুৎসিততম কলঙ্ক বিদূরিত করার জন্য, এবং একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে, সেদিনের রোমান্টিক রাজনীতির আবির্ভাব সেই হেতু আর্টিস্ট সেদিন সাধারণতঃ রাজনীতির প্রতি আকৃষ্টই বোধ করত। ক্বচিৎ মোহভঙ্গের কারণ যে ঘটে নি এমন নয় (নজরুল ইসলামের কয়েকটি পংক্তি স্মর্তব্য) তবু সাধারণ ভাবে রাজনীতি কুরূপ নিয়ে দাঁড়ায় নি সেদিন আর্টিস্টের সামনে।

অপর পক্ষে অ-রোমান্টিক যুক্তি-আশ্রয়ী বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করার মত সমান্তরাল রাজনীতিও ছিল, যার বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত।

অতএব প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে সাধারণভাবে বলা চলে ভারতে রাজনীতির এসথেটিক-সম্মত রোমান্টিক ধারা ও যুক্তিবিন্যস্ত সমাজ-সচেতন অপর একটি ধারা যুগপৎ প্রবাহিত ছিল; যার ফলে বুদ্ধিজীবীর সৎ কর্তব্য নির্ধারণ কঠিন হয় নি। আপন আপন রুচি অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীরা কোন না কোন ধারার সঙ্গে আন্তরিক ঐক্য বোধ করতে পেরেছিল।

সঙ্কট দেখা দিল ১৯৪৭-এর পনেরই আগস্ট পার হয়ে।

যে বুদ্ধিজীবীর দল রাজনীতির রোমান্টিক রূপেই আকৃষ্ট ছিলেন, যাঁদের মনন যুক্তির চাইতে সেন্টিমেন্টকে আশ্রয় করেই পরিতুষ্ট ছিল, তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন স্বাধীনতাকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্যস্থলের অভাবে।

রাজনৈতিক ভারতের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা অবশ্য এ পরিস্থিতির জন্য কিছুটা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও আরও কতগুলি রোমান্টিক লক্ষ্যস্থল প্রস্তুত করছিলেন তাঁরা। কয়েক বছর তাই রোমান্টিক রাজনীতির দেউলে দশা অনুভব করতে পারি নি আমরা। ১৯৫০ পর্যন্ত সংবিধান-প্রণয়ন ও রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা একটি রোমান্টিক লক্ষ্য হতে পেরেছে; তারপর কমনওয়েলথ-ত্যাগের দাবি, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ অবিশ্বাস ও তাঁর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশা, ভারতের আন্তর্জাতিক যশোলাভ, এমনকি বান্দুং সম্মেলন, পঞ্চশীল ইত্যাদি মূলতঃ

অ-রোমান্টিক বিষয়গুলিও রোমান্টিক রাজনীতির প্রাণরস জুগিয়ে এসেছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার স্পৃহা আর্টিস্টের চোখ থেকে রাজনীতির কুশ্রীতা মুছে ফেলতে যতখানি সক্ষম হয়েছিল, এই নতুন রোমান্টিক লক্ষ্যগুলির সে পরিমাণে বর্ণবৈচিত্র্য নেই। অতএব আর্টিস্ট রাজনীতির কুশ্রীরূপ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর সচেতন হয়ে উঠেছে।

এদিকে যুক্তি-আশ্রয়ী ধারাটি স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বভাবতঃই এ ধারাটি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে।

রাজনীতির এই ধারাটির চালকশক্তি তার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব, তার সামনের লক্ষ্যের আকর্ষণ নয়। মার্কসবাদী রাজনীতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অস্পষ্ট সুদূর লক্ষ্যের আকর্ষণে সবলগতি লাভ করতে পারত না; সে গতি তাকে দিয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ইন্টার্নাল কম্বাশশন এঞ্জিন; শ্রেণী-সংগ্রামের অন্তর্জালা সে রাজনীতিকে গতিশীল করেছে। গান্ধীজি কথিত শ্রেণীহীন শোষণহীন সর্বোদয় সমাজ (যার সঙ্গে মার্কসের কমিউনিস্ট সোসাইটির আশ্চর্য মিল আইডিয়ালের দিক থেকে; যদিও আইডিয়াল ছাড়া সর্বত্র অমিল, কারণ মূল দার্শনিক ভিত্তিভূমি সম্পূর্ণ বিপরীত) লক্ষ্য করে যদি কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন দেশে দেখা দেয় তবে লক্ষ্যের আকর্ষণ নয় সর্বোদয়ের দার্শনিক ভিত্তি হবে সে আন্দোলনের প্রাণশক্তি। কেবলমাত্র একটি লক্ষ্যের প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ রাজনীতিকে দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে নিতে পারে না: মুসলিম লীগের পাকিস্তান-আন্দোলনের পেছনেও ছিল ইসলাম-দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা—দ্বিজাতি-তত্ত্ব।

স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতীয় রাজনীতির প্রধান লক্ষণ ছিল সেন্টিমেন্ট-আশ্রয়ী আন্দোলন—পলিটিক্স অব এ সাবজেক্ট নেশন; এবং স্বাধীনতা লাভের পর তার প্রধান লক্ষণ হতে শুরু করল যুক্তি-আশ্রয়ী জটিল রাজনীতি। সেই সঙ্গে সেন্টিমেন্টের রঙীন চশমা খুলে দেখা গেল রাজনীতির সঙ্গে অনেক কুশ্রীতা অনেক স্থূলতা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে এককে বাদ দিয়ে অপরকে গ্রহণ অসম্ভব। ফলে একদল বুদ্ধিজীবী, শুধু রোমান্টিকের দল নয়, অনেক বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবীও—রাজনীতির প্রতি ঔদাসীন্য ও ঘৃণা প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে কুশ্রীতা এমন করে জড়িয়ে গেল কেন?

॥ চার ॥

সাহিত্যিক যখন সাহিত্যরচনা করেন তখন কজন পাঠককে দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যের প্রশংসা করাতে পারবেন, সে প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে না। অন্ততঃ ওঠা অপরিহার্য নয়। ঔপন্যাসিক বা কবি বা শিল্পী অনায়াসে আপন আপন প্রতিভার প্ররোচনায় এমন সৃষ্টিকর্ম হাতে নিতে পারেন, যা তাঁর সমসাময়িক মানুষ নিন্দার পঙ্কে কদর্য করে তুলবে।

বৈজ্ঞানিক যখন বিজ্ঞানভারতীর কথা শুনতে পান তখন সে প্রত্যাদেশ ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁকে ভাবতে হয় না জনসাধারণের রুচি বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা। গ্যালিলিওরা চিরকাল সত্যের মধ্যে মৃত্যুকে আবিষ্কার করেন, মৃত্যুর মধ্যে সত্যকে।

দার্শনিক তাঁর চিন্তার গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক; যুক্তির মাজিত রসে সাহিত্যিক।

এঁদের বিচার হয় যুগের হাতে নয়, যুগ-যুগান্তরের হাতে। সমকাল নয় নিরবধি কাল এঁদের লীলাক্ষেত্র। জনসাধারণ নয়, অনন্তপার হিউম্যানিটি এঁদের সমঝদার।

কিন্তু রাজনীতি যখন দর্শনশাস্ত্রের তাত্ত্বিক ভূমি অতিক্রম করে ফলিত রাজনীতি হয়ে আবির্ভূত হয়, তখন বিপরীত ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে। রাজনৈতিক নেতার থীসিস যদি সমকালীন মানুষের কাছে অবজ্ঞাত হয়ে ভবিষ্যতের কাছে আদৃত হয় সে তবে ক্ষীণ সান্ত্বনা। কেননা ফলিত রাজনীতির সাফল্য সমকালীন মানুষের সমর্থনের উপর সর্বথা নির্ভরশীল।

শরৎচন্দ্র বসু সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন এমন এক সময়ে যখন বঙ্গদেশে তাঁর সমর্থক জোটে নি। আজকে যদি সে-প্রকল্পের সমর্থনে এক কোটি

মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে (তাও ওঠা আর সম্ভব নয়) তবু সে-প্রকল্প মৃত।

ফলিত জ্ঞান মাত্রই এরূপ। ফলিত বিজ্ঞানের আবিষ্কার আবিষ্কারই নয় যদি তা মানুষের আশু উপকারে না আসে।

ফলিত রাজনীতির কুশ্রীরূপের প্রধান কারণ এই জন-নির্ভরতা।

সাহিত্য যদি একান্তভাবে পাঠকের রুচি-নির্ভর হত তবে কী ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হত সহজে অনুমেয়। বিজ্ঞান যদি শুধুই জনতার আশু উপকারে নিয়োজিত হত তবে ইক্‌মিক্ কুকারের স্তর ছাড়িয়ে বিজ্ঞান উঠত কিনা সন্দেহ। (এই বস্তুটির উল্লেখ করলাম একটি বাস্তব কারণে, একখানি শিশুপাঠ্য সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক আমার চোখে পড়েছিল, তাতে দেখলাম—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতের নামে গ্রন্থকার বসিয়েছেন ওই বস্তুটি; শুদ্ধু ইকমিক কুকার!)

পাঠকের মন-রাখা "সাহিত্য", আশু আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে "বিজ্ঞান", ইত্যাদি কি অবর্তমান? না, তা নয়। কিন্তু সেই মন-রাখা "সাহিত্যিক" সেই অর্থকরী "বৈজ্ঞানিক" সকলেই মনে-প্রাণে জানে ও বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করে যে সাহিত্যক্ষেত্রে সে নিজে অতি তুচ্ছ, বিজ্ঞানক্ষেত্রে সে খদ্যোতমাত্র। সাহিত্যের শশধর দত্ত (জীবিত কারও নাম করলাম না বিনয়বশতঃ!) কখনই ভুলে যান না সাহিত্যে তাঁর মূল্য কী। বিজ্ঞানের টমাস এডিসন জানেন বিজ্ঞানে তাঁর অবদান কতখানি নগণ্য।

অর্থাৎ বাজারে সাহিত্য ও ফলিত বিজ্ঞান কখনই সাহিত্য বা শুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রতিযোগী হওয়া কল্পনাই করে না, তারা অনুগামী থেকেই তুষ্ট।

কিন্তু ফলিত রাজনীতি রাজনৈতিক দর্শনের শুধু প্রতিযোগী নয়, শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে এ যুগে। সাময়িক প্রয়োজনে মূলনীতির প্রশ্নে আপস তো রাজনীতির ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কেরলে কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য গড়েছিল, পাঞ্জাবে কমিউনিস্টরা আকালী দলের সঙ্গে।

সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে: রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাবে ফলিত রাজনীতির আন্দোলন আর গড়ে উঠছে না এ দেশে; বরঞ্চ ফলিত রাজনীতির তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে রাজনৈতিক দর্শন প্রতিমুহূর্তে নবনব ব্যাখ্যা উপস্থাপনের প্রয়াসে গলদঘর্ম।

জনতার তাৎক্ষণিক রুচির উপর নির্ভর করে রাজনীতি বারংবার ডিগবাজি খায় বলেই রাজনীতি আজ স্থূল কুশ্রী কদর্য। এ বিষয়ে আমি প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করেছি এই পত্রিকারই পৃষ্ঠায়, পুনরুক্তি করে প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ করব না।

বুদ্ধিজীবীর যে অংশ রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট এই প্রসঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য হল রাজনীতিকে কুশ্রীতামুক্ত করা। সখেদে স্বীকার করতে হবে সে দায়িত্ব পালনে তাঁরা এতাবৎ অক্ষম হয়েছেন।

তার ফল হয়েছে এই যে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবী রাজনীতির "কর্কশ কুটিল" ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসছেন; আর্টিস্ট ও রোমান্টিকগণ শুধু নন, যাঁদের অ্যাকাডেমিক আখ্যা দেওয়া হয় সেই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরল হয়ে পড়ছেন।

একদা রাজনীতির তাত্ত্বিক দিক সমগ্রত ও ব্যবহারিক দিক মুখ্যত ছিল বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে। যে কোন রাজনৈতিক দলের ইতিহাস অন্বেষণ করুন, দেখবেন শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ছিলেন দলগুলির প্রাণশক্তি; সেই সঙ্গে আইনজীবী, চিকিৎসক ও সাহিত্যিকদের সংখ্যা গুণে দেখুন, দেখবেন বুদ্ধিজীবীদের বাদ দিলে রাজনৈতিক দলগুলির শুধু খোলস পড়ে থাকত, বস্তু থাকত না। আর এখনকার দলীয় গঠনভঙ্গী লক্ষ্য করুন; নেতৃত্ব রয়েছে ষোল আনা সেই গোষ্ঠীর হাতে যারা পেশাদার পলিটিশিয়ান নামে পরিচিত। এই পেশাদারদের শ্রেণী-চরিত্র কী? এরা কেউ ভূম্যধিকারী (জমিদারী উচ্ছেদের পরেও), কেউ শেয়ার কিংবা বীমার দালাল, কেউ ট্রেড য়ুনিয়নিস্ট, কেউ বা শুধুই পলিটিশিয়ান। এক আধজন সাংবাদিক, এক আধজন অধ্যাপক, এক আধজন দার্শনিক প্রবন্ধকার হয়তো খুঁজে পাবেন বহু

আয়াসে কিন্তু পেশাদার পলিটিসিয়ান হবার প্রয়াসে তাদের বুদ্ধিজীবী চরিত্র খণ্ড হয়ে গিয়েছে।

শুধু নেতৃত্বের দিক দিয়ে কেন, রাজনৈতিক কর্মপন্থাগুলির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করুন; দেখবেন বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ অবহেলিত পদদলিত।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল, যতদুর জানি, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে হিন্দীকে সমর্থন জানিয়েছে। কেন? না তাতে অশিক্ষিত জনতার সুবিধা হবে। অহিন্দীভাষী বুদ্ধিজীবী যারা এতদিন পর্যন্ত মাতৃভাষা ও ইংরেজীর মাধ্যমে তাদের চিন্তার ফসল ফলিয়েছে তাদের মত কী, কেউ জানবার প্রয়োজন বোধ করে নি। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়েছে। কেন? না তাতে পুঁজিপতিদের মুনাফা ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে। অথচ চারুশিল্প সহায়তার প্রচেষ্টা কতটুকু হয়েছে তার আণুবীক্ষণিক মানের পরিমাপ করতে স্ক্রু-গজ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও তার অনুগত রাজনীতি আছে: ধনিকের স্বার্থ তার লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও তাকে প্রতিষ্ঠা-মানসে রাজনীতি আছে: শ্রমিকের স্বার্থ তার ঘোষিত উদ্দেশ্য। মুসলমানের জন্য মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আছে; হিন্দুর জন্য হিন্দুমহাসভা ও হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি আছে; নারীর সমান অধিকার দাবি করার জন্য সাফ্রেজেট রাজনীতি ছিল; পুরুষের প্রিভিলেজ অক্ষত রাখার প্রয়াসে সে রাজনীতির বিরোধিতা ছিল; বণিক্-স্বার্থে চেম্বার অব কমার্স, শ্রমিক-স্বার্থে ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস আছে; দ্রাবিড়ের জন্য কাঢ়াগম ও শিখের জন্য আকালী রাজনীতির নামে সাপ-খেলা খেলেছে; কিন্তু বুদ্ধিজীবীর স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এসেছে কোন সংস্থা?

শিক্ষকের জন্য শিক্ষক-সমিতি, সাহিত্যিকের জন্য সাহিত্য সম্মেলন, শিল্পীর জন্য শিল্পসংস্থা—এগুলি হয় রাজনীতিকে সন্তর্পণে শতহস্ত দুরে রেখেছে অথবা ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের মত স্থূল বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের সম্প্রদায়-হিসাবে স্বার্থের স্ফূর্তি যে নয় মাত্র বেতন-বৃদ্ধিতে, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় তাদের যথোপযুক্ত অধিকার দাবি যে সে-রাজনীতির প্রাথমিক কর্তব্য, কোন শিক্ষক-সমিতির পক্ষে সেকথা স্মরণ রাখা কঠিন।

গণতন্ত্রের জনতাকীর্ণ স্থূলতায় মানুষ যেদিন হাঁপিয়ে উঠবে, সমাজতন্ত্রের Dictatorship of the proletariatকে মনে হবে পাশবিক অত্যাচার, সেদিন মানুষজাতি আবার প্রার্থনা করবে Philosopher Kingকে। মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে যে মনন-শক্তি তাকে পূর্ণতায় পরিস্ফুট করতে হলে বুদ্ধিজীবীর শ্রেষ্ঠতা একদিন স্বীকার করতেই হবে মানুষকে। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করতে হলে চাই বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক কর্মসূচী।

দীর্ঘকাল পূর্বে বোদলেয়র লিখেছিলেন, "If a poet asked the state for the right to have a few bourgeois in his stable there would be considerable surprise; while, if a bourgeois asked for roast poet, if would seem quite natural."

এ বিবৃতিতে অতিশয়োক্তি নেই, কেবল সাহিত্যিক অলঙ্কার আছে কিঞ্চিৎ। অলঙ্কারের সেই প্রতীকটুকু উন্মোচন করলে এ উক্তির অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুর সত্য আজও অপরিবর্তিত।

সেই নিষ্ঠুর সত্যের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে হলে বুদ্ধিজীবীকে রাজনীতির পথে আবার নামতে হবে। কুশ্রীতা থেকে পরিমার্জিত করে রাজনীতিকে তুলতে হবে স্বাস্থ্যের পথে। আর সুস্থ রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্ব অবিসংবাদী সত্য।

॥ পাঁচ ॥

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে কথিত বক্তব্যটি কিঞ্চিৎ নগ্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ওই একই কথা অনেক সহনীয় করে বলা চলত এই ভাবে:

১. জনতার রুচি অনুযায়ী পরিচালিত রাজনীতি ও সেই রাজনীতির কাঠামোয় তৈরি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ মানবিক ভিত্তিতে সংগঠিত হয় না; ফলে জনগণের সুখ-সুবিধা (বা জনগণের একাংশের সুখ-সুবিধা) লক্ষ যদি বা হয় মানবিক মননক্ষমতার অবাধ স্ফূর্তি সেই রাজনীতি ও সেই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না।

[১৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ কাব্যভাষ্য

॥ প্রস্তাবনা ॥

॥ প্রীতিরতি এরস্-তত্ত্ব ও প্রেমধর্ম ॥

১

প্লেটোর এরস্-তত্ত্বই বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের 'লিবিডো'-তত্ত্ব রূপে দেখা দিয়েছে। ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যা [Pshychoanalysis] এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। তাঁকে ডারুইন, স্পিনোজা, নিউটন ও আইনস্টাইনের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার এই নির্জ্ঞানের আবিষ্কার কোপার্নিকাসের এবং ডারুউইনের আবিষ্কারের সহিত তুলনীয়।'[২২] হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর জেমস জে. পুট্নম্ বলেছেন :

"Freud has made considerable addition to this stock of knowledge, but he has done also something of greater consequence than this. He has worked out, with incredible penetration, the part which the instinct plays in every phase of human life and in the development of human character."[২৩]

ডক্টর সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড [১৮৫৬-১৯৩৯] প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ এবং নির্জ্ঞান-বাদের প্রথম প্রকাশ মানুষের মানসলোক সম্পর্কে এত বিপ্লবী পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল যে, মানুষের রক্ষণশীল চেতনা তাকে সাদরে বরণ করে তো নেয়ই নি, উপরন্তু তার সম্পর্কে প্রভূত বিরূপতাই ভাববাদী শিবিরে দেখা দিয়েছিল। মানবজীবনে ফ্রয়েড-ব্যাখ্যাত লিবিডো [Libido] বা কামশক্তির প্রভাব যে-ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তার মধ্যে অত্যুক্তির লক্ষণ তাঁর সহকর্মিবৃন্দের চোখেও ধরা পড়েছে। তারই ফলে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে য়ুংয়ের বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা [Analytical Psychology] এবং আড্‌লরের প্রাতিস্বিক মনোবিদ্যার [Individual Psychology] নবরূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে এঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, প্রতিপক্ষীয় সমালোচকের দৃষ্টিতে এঁরা মানুষের মধ্যে আদিম পশু বা শয়তানকেই আবিষ্কার করেছেন বলে ধিক্কৃত হয়েছেন। সি. ই. এম. জোড তাঁর 'গাইড টু মডার্ন থট্' গ্রন্থে বলেছেন :

"Where Freud has revealed the beast in man, Adler claims to have exposed the devil, and the devil is simply this dominating urge to power and self-assertion."[২৪]

ফ্রয়েড এবং তাঁর সহকর্মী ও শিষ্যসম্প্রদায় সম্পর্কে এ জাতীয় মনোভাব বিজ্ঞানসম্মত নয়। ফ্রয়েড কখনও মানুষের মধ্যে পশুকে আবিষ্কার করার হীন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নি। তিনি মানসিক ব্যাধির কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার মহৎ ব্রতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলেই তিনি মানবমনের নির্জ্ঞান স্তরের সন্ধান লাভ করেন। তাঁর মনঃসমীক্ষণ প্রারম্ভে এবং প্রাথমিক স্তরে মানসিক ব্যাধিতে পর্যুদস্ত মানুষের রোগমুক্তির উপায় রূপেই দেখা দিয়েছিল। এদিক দিয়ে

ফ্রয়েড এযুগের ভিষগ্‌রত্ন বা ধন্বন্তরি। নিন্দা নয়, প্রশংসা ; পরিবাদ নয়, সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য।

১০

মূলত ফ্রয়েডের অনুসরণে মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যার মূল-সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা অফলপ্রসূ হবে না। মনঃসমীক্ষকগণের সব মতবাদেই এ কথা স্বীকার্য যে, মানুষের মনের বেশির ভাগ অংশই অজ্ঞেয়। যেটুকু আমাদের জানার জগতে রয়েছে তা মনের অতিশয় সামান্য অংশমাত্র। এদিক দিয়ে মানুষের মনকে জলে-ভাসমান একটি বরফের পাহাড়ের সঙ্গে [Iceberg] তুলনা করা যেতে পারে। বরফের পাহাড়ের যেমন অতি সামান্য অংশই জলের উপরে এবং বেশির ভাগই জলের নীচে থাকে, তেমনি মনের অতি সামান্য অংশ সম্বন্ধেই আমরা সচেতন থাকি, অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। যে অংশ সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি মনঃসমীক্ষণে তার নাম দেওয়া হয়েছে সংজ্ঞান মন। যে অংশ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয় তার নাম নির্জ্ঞান মন। সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মধ্যবর্তী আর একটি স্তর কল্পনা করা হয়েছে, তার নাম আসংজ্ঞান। যা ঠিক এই মুহূর্তে আমার সংজ্ঞান স্তরে নেই, অথচ একটু চেষ্টা করলেই তাকে সংজ্ঞানে আনতে পারি তারই নাম আসংজ্ঞান।

সংজ্ঞান মনের তুলনায় নির্জ্ঞান মন বা নির্জ্ঞান শুধু যে আয়তনেই বৃহৎ তা নয়, তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণও বটে। কেন না আমাদের সংজ্ঞানে যা পাচ্ছি তা নির্জ্ঞানেই উদ্ভূত এবং নির্জ্ঞানের পথ দিয়েই সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়ে থাকে। কাজেই সংজ্ঞানে যা পাওয়া যাচ্ছে তার মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেন না তার উপকরণ এবং তার ব্যবহার আমাদের নির্জ্ঞানস্থিত শক্তিরই প্রকাশমাত্র। অথচ সেই নির্জ্ঞান স্তরের শক্তিসমূহের সন্ধান পাওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে লুক্কায়িত শক্তি বা বৃত্তিসমূহের আবিষ্কার ও অনুসন্ধানই মনঃসমীক্ষণের মুখ্যকৃত্য। "To discover and explore these hidden trends of the unconscious is the main object of Psychoanalysis."[২৫]

মানুষের মনের এই তিন স্তরের মত মানুষের ব্যক্তিত্বেরও তিনটি মুখ্য স্তরের কল্পনা করা হয়েছে : ইদং বা অদস্, অহং এবং অধিশাস্তা। প্রত্যেক মানব-শিশুই কতকগুলি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে ইংরেজিতে বলা হয় instinct ; এই ইন্‌স্টিংক্ট বা প্রবৃত্তিগুলিই শিশুমনের একমাত্র সম্বল এবং মানসিক জীবনের আদি উপকরণ। এদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি না, কিন্তু কাজের ভিতর দিয়ে এদের শক্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা তাদের যথেষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় সমস্ত মনটির উপর প্রভাব বিস্তার করে এরা সম্পূর্ণভাবে মনটিকে অধিকার করে থাকে। মনের এই আদি অবস্থার নাম ফ্রয়েড দিয়েছেন Id. [Id ল্যাটিন কথা, তার ইংরেজি প্রতিশব্দ It]। এই 'ইদে'র বাংলা করা হয়েছে ইদং বা অদস্। অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র বলেছেন, অদস্ বলতে আমরা বুঝব, মনের সেই প্রাচীনতম অবস্থা যখন অজ্ঞাতস্বরূপ সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া মনে আর কিছু নেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রবৃত্তিগুলি সমস্ত মানসিক বৃত্তির উপর আধিপত্য বজায় রেখে সর্বতোভাবে এদের নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করে থাকে। জীবনে ইদং বা অদসের প্রভাব তাই সর্বাপেক্ষা অধিক।[২৬] ইদং-এর, স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ব্রিল বলেছেন :

"According to Freud's formulation the child brings into the world an unorganized chaotic mentality called the *Id*, the sole aim of which is the gratification of all needs, the alleviation of hunger, self-preservation, and love, the preservation of the species."[২৭]

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ইদং-এর যে অংশ ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে পরিবেশের সংস্পর্শে আসে এবং বহির্জগতের নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হয় তাকে ফ্রয়েড বলেছেন Ego বা অহং। এই অহং পরিবেশ-সচেতন হয়ে ইদং-এর নীতিবিগর্হিত প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে মানুষের আদিম সত্তা এবং নৈতিক সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় তারই অর্থ ইদং এবং অহং-এর দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের মত মনের উচ্চতর স্তরে আরেকটি দ্বন্দ্ব বিরাজমান—তা হল অহং-এর সঙ্গে অধিশাস্তার দ্বন্দ্ব। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশু নিজেই নিজেকে শাসন করার ভার গ্রহণ করে। অহং-এর যে অংশ এই শাসনের ভার গ্রহণ করে ফ্রয়েড তারই নাম দিয়েছেন Super-ego বা অধিশাস্তা। আমাদের চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের গুরু হল এই অধিশাস্তা। এই স্তরই হল মানস-বিবর্তনের চূড়ান্ত স্তর। অধ্যাপক ব্রিল বলেছেন :

"In a psychosis,···the illness results from a conflict between the ego and the outer world, and in the narcistic neurosis from a conflict between the ego and the super-ego. ···the super-ego represents a modified part of the ego, formed through experiences absorved from the parents, especially from the father. The super-ego is the highest mental evolution attainable by man, and consists of a precipitate of all prohibitions and inhibitions, all the rules of conduct which are impressed on the child by his parents and by parental substitutes. The feeling of conscience depends altogether on the development of the super-ego."[২৮]

মনঃসমীক্ষকগণের মতে ইদং, অহং এবং অধিশাস্তা—মনের এই তিন স্তরের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তিসম্পন্ন আদিম মন অর্থাৎ ইদং-ই সবচেয়ে বলশালী। সহজাত প্রবৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসা এবং রিরংসা—এই দুটিই প্রধান। ভারতীয় দৃষ্টিতে তারই নামান্তর হল শিশ্নোদর-পরায়ণতা। কিন্তু ইদং-এর আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে শুধু শিশ্নোদরপরায়ণ বলা সমীচীন নয়। ফ্রয়েড এই আদিম প্রবৃত্তিনিচয়কে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন : বন্ধনস্থাপনের প্রবৃত্তি আর বন্ধনছেদনের প্রবৃত্তি। তাঁর পরিভাষায় বন্ধনস্থাপনের প্রবৃত্তির নামই 'এরস'। এবং এই এরস-এর শক্তিকেই তিনি বলেছেন Libido বা কামশক্তি। অধ্যাপক ব্রিলের ভাষায় :

"In psychoanalysis libido signifies that quantitatively changeable and not at present measurable energy of the sexual instinct which is usually directed to an outside object. It comprises all those impulses which deal with love in the broad sense. Its main component is sexual love ; and sexual union is its aim ; but it also includes self-love, love for parents and children, friendship, attachments to concrete objects, and even devotion to abstract ideas."[২৯]

এই লিবিডো বা কামশক্তির লীলা মানবমনে আশৈশব ক্রিয়াশীল। ফ্রয়েড বলেন, শিশুর মনে স্বভাবী ও অস্বভাবী (normal and abnormal) সকল প্রকার কামভাবের অঙ্কুর আছে, এবং শিশু তদনুরূপ কামচেষ্টাও করে থাকে। ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত কাল্পনিক নয়, তা বহু পর্যবেক্ষিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর সহজাত প্রকৃতি থেকেই কামভাবের উৎপত্তি, কিন্তু সাধারণতঃ পরিবারের যে পরিবেশের মধ্যে সে লালিত হয় যৌনবিকাশের পক্ষে তা প্রতিকূল। যখনই শিশু কোন কামচেষ্টার উপক্রম করে তখনই সে তার পিতামাতা বা পরিবারের অপর কারো নিকট থেকে বাধা পায়। শিশুকে নানা নিষেধের বশেই চলতে হয়। শিশু যেমন বড় হতে থাকে, শিক্ষাদীক্ষা পারিবারিক ও সামাজিক শাসনে তার মনে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি নানা বিবেকবুদ্ধি জাগরিত হয় এবং তখন সে বাইরের বাধা-নিষেধের অপেক্ষা না রেখেই নিজে অসামাজিক যৌন ভাবগুলিকে নিজেই নিগৃহীত করার চেষ্টা করে। ফলে এই সব যৌন-ভাব ক্রমে মনের অজ্ঞাত প্রদেশে বা নির্জ্ঞানে চলে যায়। সহজাত প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতার পথে বাধা এলে মনে অশান্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু তারা অজ্ঞাত মনে বা নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হলে অতৃপ্ত কামনার তাড়না ভোগ করতে হয় না। অসামাজিক ইচ্ছার অজ্ঞাত মনে বা নির্জ্ঞানে নির্বাসনের নাম repression বা অবদমন। মনঃসমীক্ষকগণ দেখেছেন যে, মুখ্যত কামপ্রবৃত্তিই অবদমিত হয়। বিখ্যাত বাঙালী মনঃসমীক্ষণবিৎ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, যে সব কর্মে ব্যতিহার প্রত্যাশা আছে, কেবল তৎসংক্রান্ত ইচ্ছাই অবদমিত হতে থাকে। অর্থাৎ যে কর্মে কর্তৃস্থানীয় এবং পাত্রস্থানীয় উভয় ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা আছে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই অবদমন ও তৎফলে ইচ্ছার নির্জ্ঞানে নির্বাসন সম্ভব।[৩০]

দুর্ভাগ্যবশত অবদমিত ইচ্ছা বহুকাল রুদ্ধ থাকলেও ধ্বংস হয় না। জেলখানার দুর্দান্ত কয়েদীর মত সুযোগ পেলেই বাইরে এসে নিজের অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। যে মানসিক ভাবসমষ্টি বা যে মানসিক শক্তি অসামাজিক কামজ ইচ্ছাকে অবদমিত করে এবং নির্জ্ঞানে আবদ্ধ করে রাখে তাকে বলা হয়েছে censor বা মনের প্রহরী। আমাদের মনের প্রহরী সব সময় সমান সজাগ থাকে না। নিদ্রাবস্থায়, মানসিক অবসাদ বা উত্তেজনার সময় এবং কোন কোন মানসিক রোগে প্রহরী অসতর্ক হতে পারে। এই সুযোগে অবদমিত রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে, নানাপ্রকার ভুলভ্রান্তির সহায়ে ও আবেগজ ক্রিয়ায় পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। ফ্রয়েডের মতে আমাদের নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত বাসনা স্বপ্নের মাধ্যমেই চরিতার্থ হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, স্বপ্নই নির্জ্ঞান-লোকে পৌছবার রাজপথ। "The dream is the royal road to the unconscious."

অবদমিত ইচ্ছা যখন রোগ সৃষ্টি না করে প্রতীকের সাহায্যে বা অপর কোন ভাবে সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে গৌণ রূপে প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় sublimation বা উদ্‌গতি। এই উদ্‌গতি আমাদের চেষ্টাসাধ্য নয়। কেনই বা এক ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা থেকে রোগ উৎপন্ন হয় এবং কেনই বা অপর ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা শিল্পকলা ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা আনে তা আজও মানুষের জ্ঞানের গোচরীভূত হয় নি।[১১]

"Sublimation is a process of deflecting libido or sexual-motive activity from human objects to new objects of a non-sexual socially valuable nature.

"Sublimation, too, gives justification for broadening the concept of sex ; for investigation of cases of the type mentioned conclusively show that most of our so-called feelings of tenderness and affection, which color so many of our activities and relations in life, originally form part of pure sexuality, and are later inhibited and deflected to higher aims."[১২]

১১

অবদমিত প্রবৃত্তির নির্জ্ঞান থেকে শিবসুন্দর রূপ নিয়ে সংজ্ঞান মনে পুনরাগমনের নামই 'সাব্‌লিমেশন' বা উদ্‌গতি কিংবা উদ্‌গমন। আর মনঃসমীক্ষকগণের মতে আমাদের কামপ্রবৃত্তিই মুখ্যত অবদমিত হয়ে থাকে। কাজেই অবদমিত কাম-ইচ্ছা ও কাম-জীবন—এক কথায় ফ্রয়েডের লিবিডো বা কামশক্তির লীলা সম্পর্কে আর-একটু বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্ব প্রচলিত যৌন-তত্ত্বের সমার্থক নয়। লিবিডো বা কামশক্তির কল্পনায় যৌনবৃত্তির অনেক অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে। অধ্যাপক ব্রিল্ বলেছেন :

"...by broadening the term sex into love or libido, much is gained for the understanding of the sexual activity of the normal person, of the child, and of the pervert.... the libido concept loosens sexuality from its close connection with the genitals and establishes it as a more comprehensive physical function, which strives for pleasure in general, and only secondarily enters into the service of propagation. It also adds to the sexual sphere those affectionate and friendly feelings to which we ordinarily apply the term love."[১৩]

বলা বাহুল্য, শুধু ফ্রয়েড বা আধুনিক মনঃসমীক্ষকগণের মতেই শুধু নয়, প্রাচীনগণের মতেও কামশক্তিই মানুষের মনোলোকের প্রবলতম শক্তি। মনু যখন বলেন, 'বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি' তখন তিনি মুখ্যত কামশক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকেন। এই বলবান কামশক্তিকে জীবনীশক্তির ভিত্তিমূলে স্থাপন করে ফ্রয়েড ভুল করেন নি। বরং তার অর্থব্যাপ্তি ঘটিয়ে শাশ্বত সত্যকেই নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। ফ্রয়েড বলেন, কাম-বৃত্তির বিশ্লেষণ করলে তার তিনটি অঙ্গ দেখা যায় : (১) কামানুভূতি (sexual

feeling), (২) কাম-চেষ্টা (sexual aim) ও (৩) কাম-পাত্র (sexual object)। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর যে অনুরাগ ও পরস্পরের সঙ্গলাভের যে সুখ তাই কাম-ভাব বা কামানুভূতি। পরস্পরের আলিঙ্গন সহবাসাদির যে চেষ্টা অর্থাৎ যে কায়িক বা মানসিক ব্যাপারকে উদ্দেশ্য করে কামভাব বিকশিত হয় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াসই কাম-চেষ্টা। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষই স্বাভাবিক কামপাত্র। ফ্রয়েড বলেন, কামবৃত্তির তিনটি অঙ্গের প্রত্যেকটির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হতে পারে। রতিসুখ থেকে আরম্ভ করে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর কথোপকথনের আনন্দ পর্যন্ত সব রকম অবস্থাতেই কাম-ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। স্ত্রীপুরুষের কথোপকথনের যে আনন্দ তা রতিসুখ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাও কামানুভূতির রূপান্তর মাত্র। কামচেষ্টাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হতে পারে। স্ত্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য, কখনও পরস্পরের সঙ্গলাভ, কখন-বা রতিক্রিয়া। কামপাত্রও সব সময় এক না হতে পারে। পুরুষ আজ যে নারীকে ভালবাসে কাল তাকে ভাল না বেসে অন্যতরাতে আসক্ত হতে পারে। নারী সম্পর্কেও একই নিয়ম সত্য। এমন কি একই সময়ে একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিতে আসক্ত হতে পারে।

তা হলেই দেখা গেল, কামবৃত্তির বিকাশ কোন-একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনোবিদ্‌গণ বলেন, কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমও সেই আদি কামভাবেরই রূপান্তর মাত্র। তেমনি সখিত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদির মূলেও রয়েছে কামশক্তি। পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে আসক্তির মূলেও রয়েছে এই কামশক্তির লীলা। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে প্রীতি, ভক্তি ও স্নেহ-বন্ধনের সঙ্গে কামভাব জড়িত।

স্ব-রতি [narcissism], বিষয়-রতি [object-love] এবং স্বতঃরতি [auto-eroticism] ভেদেও আবার কামবৃত্তির নানা রূপভেদ রয়েছে। কামভাব যদি আত্মসুখেরই জনক হয় তা হলে তার নাম স্ব-রতি বা আত্মরতি। আসক্তির পাত্র বা পাত্রীর প্রতি ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ যখন প্রবল তখন তার নাম বিষয়-রতি এবং কেবল প্রেমের জন্যেই প্রেম অর্থাৎ ভালবাসাকেই ভালবাসার নাম স্বতঃ-রতি।[৩৪]

বলাই বাহুল্য, কামশক্তিকে বিশ্লেষণ করে মনঃসমীক্ষক ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মনোবিদ্‌গণও প্রেম বা প্রেমশক্তির নানা উপকরণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'প্রিন্সিপল্‌স অব সাইকোলজি' গ্রন্থে প্রেমের নয়টি উপকরণ আবিষ্কার করেছেন: ১ দৈহিক যৌনবাসনা, ২ সৌন্দর্যানুভূতি, ৩ স্নেহ, ৪ শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ৫ অনুমোদন-প্রীতি, ৬ আত্মাদর, ৭ মমকার, ৮ কর্মের সম্প্রসারিত স্বাধীনতা এবং ৯ সহানুভূতির উর্ধ্বায়ন।[৩৫]

ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষকগণের লিবিডো বা কামশক্তির অর্থব্যাপ্তি সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক মহলেও স্বীকৃত হয়েছে। ম্যাক্‌ডোগাল প্রবৃত্তিসমূহ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক চিন্তাকে সংশোধিত করে সেগুলিকে মানুষের জিজীবিষা-প্রবৃত্তির মধ্যে ঐক্যগ্রথিত করার দিকেই প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন। তাই তিনি প্রবৃত্তিসমূহের একটা সংহতিবদ্ধ রূপের কল্পনা করে জীবনের অমরত্ব ও সম্প্রসারণকামী প্রাণ-শক্তিরই অঙ্গরূপে তাদের স্বীকার করে নিয়েছেন, "The great purpose which animates all living beings, whose end we can only dimly conceive and vaguely describe as the perpetuation and increase of life."[৩৬]

য়ুং ফ্রয়েডের 'কামশক্তি'র ধারণাকে সমধিক সম্প্রসারিত করে তাকে এমন অর্থে পরিব্যাপ্ত করেছেন যাকে অনায়াসেই বলা যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের ব্যবহৃত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের 'কাম' বা বাসনা। য়ুং-এর এই অর্থসম্প্রসারণে ফ্রয়েডীয় 'লিবিডো' শোপেনহাওয়ারের *will* বা 'অভীপ্সা' এবং বার্গসঁর 'elan vital' বা প্রাণাবেগের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে।

১২

'লিবিডো' বা কামশক্তির এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংকলন করার পর মনঃসমীক্ষকগণের 'সাবলিমেশন' বা উদ্‌গতির তাৎপর্য আবিষ্কার করা আশা করি সহজসাধ্য হবে। পূর্বেই বলেছি ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামিগণের মতে

আমাদের অবদমিত বাসনাই শুভসুন্দর বেশে উদ্‌গতি লাভ করে। আর একথাও তাঁদের কাছে আমরা জেনেছি যে, কেবল কামবৃত্তিই অবদমিত হয়। ফ্রয়েডীয় শাস্ত্রে অবদমিত বাসনার উদ্‌গতি-তত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, কেন না ফ্রয়েডের মতে আমাদের সমগ্র সভ্যতাই উদ্‌গতির ফল [All civilization may be regarded as a sublimation of libido.] ফ্রয়েডের এই মূলসূত্র পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের মনঃসমীক্ষকগণের চিন্তায় নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। Maeder প্রমুখ সুইস মনঃসমীক্ষকগণ উদ্‌গতিকে বলেছেন, মনঃ-সংহতি [Psychosynthesis] বা 'ধর্ম' যার দ্বারা আত্মা মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে যেতে পারে। "as helping to constitute a kind of psychosynthesis, and even a kind of religion, the soul being led, as Dante was in his great poem, through Hell and Purgatory to Paradise, the physician as guide playing the part of Virgil."[৩৭]

ইতালীয় মনঃসমীক্ষক Assagioli বলেন, কামশক্তি একটি পাশবিক বৃত্তি, সুতরাং মানুষের লজ্জার কারণ—এই ধারণা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর মতে অবদমনও অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয় নি। তিনি স্বতঃ-উদ্‌গমন বা Autosublimation-এ বিশ্বাসী। তাঁর মতে "The sexual excitation may be intense but it may at the same time be linked on to higher emotional and spiritual activities, and especially, he holds, by a complete change of occupation, to some *creative* work, for artistic creation is deeply but obscurely related to the process of sexual sublimation."[৩৮]

অবদমিত বাসনার উদ্‌গতি সর্বক্ষেত্রেই সমান হবে এমন কোন কথা নেই। ফ্রয়েড তাঁর 'Introductory Lectures'-এ বলেছেন, সাধারণ মানুষ অতৃপ্ত কামশক্তির বেগের সামান্য অংশমাত্রই ধারণ করতে পারে। বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই উদ্‌গতির পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। তা ছাড়া অবদমিত কামনাশক্তির সমস্তটাই যে উদ্‌গতি লাভ করতে পারে এমন নয়। [sublimation can never discharge more than a certain proportion of libido,] এমন কি অবদমিত বাসনার উদ্‌গতি-ক্রিয়াতেও কামশক্তির কিছু অংশ আদিম বৃত্তির সুস্থ ও স্বাভাবিক পথেই চরিতার্থতা লাভ করে। "When we deal with sublimation we are treating the organism dynamically, and we must be prepared to accept and allow for a certain amount of sexual energy "expelled in the form of degraded heat," whatever the form may be. Even Dante had a wife and family when he wrote the Divine Comedy."[৩৯]

১৩

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের এই সামান্য বিশ্লেষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, ফ্রয়েড এবং তাঁর সহকর্মী ও শিষ্যগণ এমন কোন অসম্ভব কথা বলেন নি যা মানুষের চিন্তাজগতে একেবারেই অভিনব বা অভূতপূর্ব। আমরা ফ্রয়েডকে বলেছি এযুগের ধন্বন্তরি। মানসিক ব্যাধি-জর্জরিত মানুষের আধি-ব্যাধির নিদান সন্ধান করতে গিয়ে তিনি সুস্থ মানুষের মনস্তত্ত্বেরও এক নূতন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন। ইদং, অহং এবং অধিশাস্তা প্রভৃতি মনোলোকের বিচিত্র স্তরবিন্যাসের দ্বারা তিনি তত্ত্বমনোবিদ্যার [Metapsychology] নূতন অধ্যায় রচনা করলেন। নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কার এযুগের মানবসভ্যতার এক বিস্ময়কর আবিষ্কার বলেই স্বীকৃত হয়েছে। কামশক্তি, তার অবদমন এবং উদ্‌গমনের তিনি যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন তা মানুষের মনোজগতের রহস্যময় অন্ধকারলোকে এক বলিষ্ঠ এবং বিপ্লবী পদক্ষেপ।

তথাপি ফ্রয়েডের অনুরূপ চিন্তা প্রাচীন পৃথিবীতে—প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে—সূত্রাকারে এবং অনতিস্ফুটরূপে বর্তমান ছিল এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের দেশে মানুষের জৈবিক সত্তায় তার শিশ্নোদর-পরায়ণতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। ফ্রয়েডীয়

'কামশক্তি'র মত আমাদের দেশেও কেউ কেউ রতিকেই সমস্ত সহজাতবৃত্তির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভোজরাজ তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশে' 'শৃঙ্গার'কে শুধু 'আদি'ই নয়, একমাত্র রস-রূপেই গণ্য করেছেন। 'রতি'ই তা হলে তাঁর মতে একমাত্র 'স্থায়িভাব'। অলংকারকৌস্তুভ-প্রণেতা সম্প্রয়োগবিষয়া এবং অসম্প্রয়োগবিষয়া ভেদে 'রতি'র যে বিচিত্র স্তরবিন্যাস করেছেন,—বিশেষ করে তাঁর প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ ও ভাব-রতির বিশ্লেষণের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় কামশক্তির বিশ্লেষণ প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত।

আমরা বলেছি, প্লেটোর এরস্-তত্ত্বই ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। প্লেটো যাকে বলেছেন মানুষের জীবনে দিব্য-এরসের লীলা, ফ্রয়েডে তাই হয়েছে 'কাম-শক্তি'র উদ্‌গতি বা উদ্‌গমনের ফল। মনঃসমীক্ষকগণের স্মরণীয় উক্তি—all civilization may be regarded as a sublimation of libido—যতই চমকপ্রদ বলে বিবেচিত হোক্ না কেন, তেইশ-চব্বিশ শো বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের কবিদার্শনিকও সমান উদাত্ত ভঙ্গিতেই অনুরূপ অর্থে দিব্য-এরস্-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। হ্যাভেলক এলিস তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় উদ্‌গতি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন:

"Plato said that love was a plant of heavenly growth. If we understand this to mean that a plant, having its roots in the earth, may put forth "heavenly" flowers, the metaphor has a real and demonstrable scientific truth. It is a truth which the poets have always understood and tried to embody. Dante's Beatrice, the real Florentine girl who becomes in imagination the poet's guide in Paradise, typically represents the process by which the attraction of sex may be transformed into a stimulus to spiritual activities."[৪০]

[ক্রমশঃ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

২২ দ্রষ্টব্য: তৎপ্রণীত 'মনঃসমীক্ষণ' গ্রন্থ, পৃ° ৵৹।

২৩ দ্রষ্টব্য: The Basic Writings of Sigmund Freud গ্রন্থে মার্কিন মনঃসমীক্ষক ডক্টর ব্রিলের ভূমিকা, পৃ° ১৫।

২৪ Guide to Modern Thought: C. E. M. Joad, পৃ° ২৫০।

২৫ তদেব, পৃ° ২৪৩।

২৬ দ্রষ্টব্য 'মনঃসমীক্ষণ', পৃ° ৭৮-৭৯।

২৭ The Basic Writings of Sigmund Freud. ভূমিকা, পৃ° ১২।

২৮ তদেব, পৃ° ১২-১৩।

২৯ তদেব, পৃ° ১৬।

৩০ দ্রষ্টব্য: 'স্বপ্ন', শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু; পৃ° ১৯-২২, ৫৪-৫৫। আলোচনার এই অংশ উক্ত গ্রন্থ থেকেই সংকলিত।

৩১ তদেব, পৃ° ৩৭।

৩২ The Basic Writings of Sigmund Freud, পৃ° ১৮-১৯।

৩৩ তদেব। পৃ° ১৬-১৭।

৩৪ দ্রষ্টব্য: স্বপ্ন, অনুচ্ছেদ ৯১-৯৫। এই অংশ উক্ত গ্রন্থ থেকেই সংকলিত হয়েছে।

৩৫ A. M. Krich সম্পাদিত Women গ্রন্থে [A Dell First Edition] হ্যাভেলক এলিসের "The Sexual Impulse and the Art of Love" প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য: উক্ত গ্রন্থের পৃ° ৩০।

৩৬ তদেব, পৃ° ৬১।

৩৭ তদেব, পৃ° ৬৮।

৩৮ তদেব, পৃ° ৬৮।

৩৯ তদেব, পৃ° ৬৯।

৪০ তদেব, পৃ° ৬৪।

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।"

কথকঠাকুরের ভাববিহ্বল কণ্ঠস্বর। যন্ত্রের সাহায্যে আয়তনে অনেক গুণ বেড়ে আরও প্রাণময় হয়েছে তা। অনেক দূর থেকে ভেসে আসতে থাকলেও ওই বন্ধ ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল তরুণ ডাক্তার অনুপম বোস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করছেন ভাবুক কথকঠাকুর নবদ্বীপের না-জানি কোন এক মন্দিরের প্রাঙ্গণে।

বৃন্দাবনলীলার প্রাণস্পর্শী বর্ণনা। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অন্যতম একটি গোপবালক মাত্র। নন্দ-যশোদার চোখে কৃষ্ণ নিতান্তই এক অবোধ বালক। শ্রীদাম সুবল ইত্যাদি সখাদের তিনি কেবলই খেলার সাথী। আর গোপীরা? রাধারাণী? মদনমোহন, বংশীবদন কিশোর কৃষ্ণের প্রেমে তাঁরা তো আত্মহারা, উন্মাদিনী। কুলমান, ধর্মাধর্ম, লাজ-ভয় সব যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে দেহ মন সব তাঁরা কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ? তাঁরও ঐশ্বর্যবোধ নেই। গোপীপ্রেমে মুগ্ধ তিনি; শ্রীরাধার শ্রীচরণে দাসখত লিখে দিয়েছেন। প্রাণের টানে উপবনে মিলন হয় তাঁদের। তখন "না সো রমণ না হাম রমণী।" দুয়ে মিলে এক। মধুর সে মহামিলন।

বলতে বলতে ভাবে বিভোর কথকঠাকুর: ব্রজলীলা শুদ্ধ মাধুর্য; ব্রজধামে সবই মধুর। মধুর রূপ শ্রীকৃষ্ণের, মধুর তাঁর বংশীধ্বনি, অতি মধুর কৃষ্ণপ্রেমসরোবরে অবগাহন স্নানের আনন্দ! যুগলমিলন যখন হয় তখন—

মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।···

মধুর কণ্ঠস্বর কথকঠাকুরেরও, মধুর তাঁর তন্ময়তা। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনুপম। ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্দেহ জাগল তার মনে—সে কি সত্যিই ঘুমিয়েছিল!

এখন তত আর মধুর অবশ্য নয়, কথকঠাকুরের মধুর ভাববিহ্বল কণ্ঠের সেই স্তোত্রসঙ্গীত এখন আর তার কানে আসছে না। তবুও নাম-কীর্তনই তো শুনছে সে। সেই মদনমোহন বংশীবদন কৃষ্ণেরই লীলা বা নাম নিয়ে কীর্তন সুরের সঙ্গীত। নানা রকম আঞ্চলিক ভাষা, নানা জনের কণ্ঠস্বর। কিন্তু রস একই। কেবল যে "হরেকৃষ্ণ" বা "নিতাইগৌর" দুটি কথা, তারও উচ্চারণ লীলায়িত সুরে। "নামে"র সঙ্গে সুর আর সুরের সঙ্গে "নাম" বাক আর অর্থের মতই মিলে যেন এক হয়ে গিয়েছে—অবিরাম বয়ে চলেছে ভাগীরথীর প্রবাহের মতই। এখন আর দূর থেকে ভেসে আসা নয়। তন্দ্রার ঘোর ঘোর অবস্থাতেও সবিস্ময়ে অনুভব করল অনুপম যে সুরের ওই প্রবাহ বয়ে চলেছে প্রায় যেন তার খাটের গা ঘেঁষে।

ধড়মড় করে উঠে এক টানে বন্ধ জানলা খুলে ফেলল অনুপম।

তখনও রোদ ওঠে নি, তবে বেশ ফরসা হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা গেল।

রানী রোডের উপরেই বাড়িখানা। সেই পথ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে চলেছে পুণ্যকামী নরনারী। বিচিত্র এক শোভাযাত্রা যেন! নারী ও পুরুষ, গৃহী ও বৈষ্ণব পাশাপাশি চলেছে। উৎফুল্ল যৌবনের গা ঘেঁষে বিশুষ্ক জরা, বিপুলায়তন মেদের পাশে পাশে হয়তো বিবর্ণ জীবন্ত কঙ্কাল এক একটি। সুরূপ ও কুরূপের গলাগলি। তবু অপরূপ।

সকলের কণ্ঠেই গান। জানলা খুলবার পর অনুপমের চোখজোড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান দুটিও সম্পূর্ণ সচেতন

হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ গানের একটি চরণ কানে এল তার :

"বৈকালে আসিবে তোমার শ্যাম চিকণ কালা।"

বহুর মধ্যে এক ; কেবল স্বতন্ত্র নয়, বিশিষ্ট ; স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

মধুর নারীকণ্ঠে তানলয়বিশুদ্ধ কীর্তন গানের একটি কলি। সঙ্গে তেমনি মধুর টুংটাং ছন্দে তাল রেখে বেজে চলেছে একজোড়া মন্দিরা।

কে গাইছে দেখবার জন্য অদম্য কৌতূহল অনুপমের মনে। কিন্তু পথে লোক তো কম নয়, সে কৌতূহল তার অতৃপ্তই থেকে গেল। তবে ক্ষতিপূরণ আছে। যে গাইছিল সে গেয়েই চলেছে ; তার মধুর কণ্ঠে ওই গানেরই আর একটি কলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল :

"ধৈর্য ধর কমলিনী, হয়ো না উতলা—"

তারপর একসঙ্গে সম্পূর্ণ পদটিই :

"ধৈর্য ধর কমলিনী হয়ো না উতলা
বৈকালে আসিবে তোমার শ্যাম চিকণ কালা॥
ধৈর্য ধর—"

সরু ও মোটা, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সুরে নামগানও চলেছে। কিন্তু সব গানকে ছাপিয়ে উঠেছে ওই গানখানি—রাইকমলিনীকে উপলক্ষ করে মধুর অভিসার-সন্ধ্যার জন্য মধুরতর প্রতীক্ষার গুণকীর্তন।

বাঃ, এ যে দেখছি ঠিক তাই!—আপন মনেই বলে উঠল অনুপম।

এই নবদ্বীপধামে বায়ুর মত, আকাশের মত হরিনামের সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে একটু রহস্যময় ও সরস আভাস সে পেয়েছিল গতকাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে রেল-স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই।

এই না-শহর না-পাড়াগাঁয়ে মাত্র বছর দুয়েকের সরকারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটির ভার নেবার জন্য যাঁর জায়গায় সে বহাল হয়েছে সেই তার প্রায় পিতার বয়সী প্রবীণ ডাক্তার হরেশ্বর সরকার তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে স্টেশনেই ওই কথাটা তাকে শুনিয়েছিলেন।

ইহকালের কিছু এখানে আপনার হোক আর নাই হোক, পরকালের জন্য মূলধন অনেক জুটবে। এখানে দিন-রাতই আপনি "নাম" শুনতে পাবেন, কোন খরচ, কোন চেষ্টা করতে হবে না।

'নাম' মানে কৃষ্ণনাম, হরিনাম। গৌরনাম ওরই এক রূপান্তরমাত্র—যেমন রাধানামও। মুখে উচ্চারণ করলে তো কথাই নেই, অপরের মুখ থেকে শুনলেও নাকি মহাপুণ্য হয়।

সেই কথাগুলিই অনুপমের মনে পড়েছিল ; সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হরেশ্বর সরকারকেও।

একটু সেকেলে।

কিন্তু চমৎকার লোক ডাক্তার সরকার।

বয়সে প্রবীণ হলেও মনটা তাঁর এখনও বেশ তাজা রয়েছে। শরীরটাও। সুগঠিত সুঠাম দেহ স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ; সহৃদয়তায়, প্রাণময়তায়, সকৌতুক সরসতায় ঝলমল ব্যক্তিত্ব। অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন ; পাঁচ মিনিটেই আপন করে নিতে জানেন অচেনা অজানা অনেক দূরের মানুষকেও।

স্টেশনেই অনুপম তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছিল।

তার মুখের দিকে চেয়েই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তার সরকার, কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত তাঁর মুখে কোন কথাই ফুটল না। কিন্তু তার পরেই—রূপান্তর নয় তাঁর, স্বরূপের আত্মপ্রকাশ।

স্যুট-পরা অনুপম সাহেবী কায়দায় করমর্দন করবার জন্যে একখানা হাত এগিয়ে দিয়েছিল ; প্রতি-দাক্ষিণ্যে ডাক্তার সরকার নিজের দুই হাতে সেই প্রসারিত হাতখানা ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললেন, শুনেছিলাম বটে যে আপনার বয়স কম, কিন্তু এত যে কম তা তো আমি ভাবতে পারি নি মশায়!

তেমন কম আর কই!—অনুপম হেসে উত্তর দিল : ত্রিশের কোঠায় উঠে গিয়েছি।

উঠলেনই বা। তবু ত্রিশ কি একটা বয়স? দেখতে তো দেখছি আরও ছেলেমানুষ। তা একাই এসেছেন মনে হচ্ছে যে, গৃহিণীকে সঙ্গে আনেন নি?

আগে গৃহে আসবেন তিনি, তবে তো সঙ্গে বিদেশে।

তার মানে? বিয়ে—

এখনও করি নি।

বলেন কি মশায় !

আবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্য স্তব্ধ ডাক্তার সরকার। কিন্তু তারপর কৌতুকে যেন নেচে উঠল তাঁর বিস্মিত দুটি চোখ। অনুপমের হাতখানি ধরেই ছিলেন তিনি, আবার তাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, আমাকে যে অবাক করলেন আপনি। ব্যাপার কি বলুন তো? প্রেমে পড়ে আছেন নাকি? কোন নার্সের সঙ্গে নয় তো?

প্রশ্নটি মোটেই রুচিসম্মত নয়। তবুও আশ্চর্য হয়ে অনুভব করল অনুপম যে এই প্রবীণ ভদ্রলোকের স্থূল রসিকতায় বিরক্তি-বোধ হচ্ছে না তার। বরং যেন ওই রঙ্গপ্রিয়তারই ছোঁয়াচ লাগল তার মনে। মুচকি হেসে সে বলল, না, প্রেমে এখনও পড়ি নি। তবে পড়বার সুযোগ খুঁজছি।

সর্বনাশ!—ডাক্তার সরকার একটা ছদ্ম আর্তনাদ করলেন: এমন লোককে আমাদের হেল্থ্ ডিপার্টমেণ্ট নবদ্বীপ পাঠিয়েছে!

কেন এখানে প্রেমে পড়বার সুযোগ নেই নাকি?

ঠিক উলটো। নবদ্বীপই তো প্রেমের ধাম, বন্যায় ভাসছে। শোনেন নি? 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' শত শত বোষ্টমী প্রেমের ফাঁদ পেতে বসে আছে এখানে। ধরা যদি পড়েন তখন রুগীদের উপায় কি হবে?

এখনই সে ভাবনা কেন, আগে প্রেমে পড়ি তো!

পড়বেন, নির্ঘাত পড়বেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে কপালে দুঃখু আছে আপনার।

তা হলে আপনি সেটা এড়ালেন কেমন করে? আমি তো শুনেছি যে প্রায় দু বছর ধরে আপনি এখানে আছেন!

আমার যে টিকা নেওয়া আছে।

টিকা!

হ্যাঁ মশায়, সর্ব অঙ্গে, প্রেমরোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক টিকা। আমার ঘরে গিন্নী আছেন। তাঁর মুখগহ্বরে রসনা আছে, হাতে আছে সম্মার্জনী—দু রকমের টিকা রোজই আমাকে নিতে হয়। তা ছাড়া এই তো দেখছেন আমার হোঁতকা মুখ। আর আপনি? সাক্ষাৎ কন্দর্প। এখানে প্রেমে যারা দিবানিশি উন্মাদিনী হয়ে আছে তারা প্রত্যেকেই যে আপনাকে লুফে নেবে মশায়। ওই দেখুন না, আপনার ওপর এখানেই চোখ পড়ল।

হাত দিয়ে নয়, চোখের ইশারায় দেখালেন ডাক্তার সরকার। আধা বয়সী একটি মেয়ে, নাকে বৈষ্ণবীর রসকলি, হাতে মালার থলি একটি। পরনের দশহাতী থানধুতি সম্পূর্ণ দেহ তার ঢাকতে পারে নি—এমনি মোটা সে। আর প্রায় আবলুসের মত কালো তার গায়ের রঙ। পাশ দিয়ে হেঁটে ওভারব্রীজের দিকে চলে গেল। কিন্তু দূরে গিয়েও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে যেন অনুপমের দিকেই।

একটু লক্ষ্য করে দেখবার পর অনুপম হেসে উত্তর দিল, তা হলে আর ভাবনা নেই ডাক্তার সরকার। এই তো টিকা নেওয়া হয়ে গেল। এরকম রূপও প্রেমরোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক।

ডাক্তার সরকারও হাসলেন, কিন্তু উত্তর না দিয়ে ফিরে গেলেন যা থেকে কথাটা উঠেছিল সেই প্রসঙ্গে। বললেন, তা বলে আসল কথাটা এড়িয়ে যেতে পারবেন না মশায়। সত্যি বলুন তো বিয়ে করেন নি কেন?

মাইল দুয়েক পথ রিকশাতে যেতে যেতে সত্যি কথাই বলল অনুপম: একে তো স্বাধীন ভারতে ডাক্তারের চাকরি—নিঃস্বার্থভাবে সেবা করবার উপদেশ হরদম শুনতে হয়। তার ওপর আমার চাকরি ছিল অস্থায়ী, মাত্র তো এক মাস আগে পাকা করেছেন কর্তারা প্রায় তিন বছর ঝুলিয়ে রাখবার পর।

তিন বছর!

তার কম হবে না, কিছু বেশীই।

কেন? পুলিস আপত্তি করেছিল নাকি?

মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ল অনুপম।

সর্বনাশ!—ডাক্তার সরকার সত্যিই চমকে উঠলেন: পলিটিক্স করতেন নাকি আপনি, কম্যুনিস্ট হয়েছিলেন?

সরল দিলখোলা মানুষ। সদ্য-পরিচিত যে যুবককে তার বিয়ে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তাঁর আটকায় নি তারই ছাত্রজীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে দ্বিধা কেন হবে তাঁর? একে একে অনেক প্রশ্নই করেছিলেন ডাক্তার সরকার। আর অনুপম সংক্ষেপে সত্য কথাই তাঁকে শুনিয়েছিল।

পলিটিক্স নয়, বন্ধুবৎসলতা। তার বন্ধুও মার্কামারা

কম্যুনিস্ট ছিল না। তবু পাকা ধানের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে জোতদার আর ভাগচাষীদের মধ্যে সমসাময়িক অনেকগুলি দাঙ্গার একটির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অনুপমের বন্ধুটি একেবারে খুন হয়ে গিয়েছিল। সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখাটা অনুপমের পক্ষে নিতান্তই একটা যোগাযোগের ব্যাপার হয়ে থাকলেও দেখাটাও যেমন সে অস্বীকার করতে পারে নি, তেমনি অস্বীকার করতে পারে নি সে তার বন্ধুত্বকেও। সুতরাং আসলে তার কোন দোষ না থাকলেও পুলিসের সন্দেহ তাকে রেহাই দেয় নি। বাঘে ছুঁলেই আঠার ঘা। সবগুলি সারতে তিন বছর এমন আর বেশী সময় কি!

ঘটনার জন্য তত পরোয়া নেই ডাক্তার সরকারের। অনুপম যে পলিটিক্‌স করে নি এবং করে না, এই কথা তার মুখ থেকে শুনেই তিনি নিশ্চিন্ত। তার ফাঁড়া একেবারে কেটে গিয়েছে বুঝে তিনি রীতিমত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কতক্ষণেরই বা পরিচয়! তবু মুগ্ধ হল অনুপম। নিজস্ব সীমার মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষটি। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই অনুপমের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন। অনেক উপদেশই তিনি তাকে দিলেন। কথায় ও স্বরে আন্তরিকতা এতই সুস্পষ্ট যে অনধিকারচর্চা বলে মোটেই মনে হয় না অনুপমের।

ডাক্তার সরকারের ওই আন্তরিকতাই প্রকাশ পেয়েছিল অনুপমকে নিজের বাড়ি এনে তোলবার পর পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উপলক্ষেও। অনুপমকে তিনি সোজা অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। পিসীমাকে ডাকলেন, গৃহিণীকে ডাকলেন, ছেলেমেয়ে দুটিকে ধমক দিয়ে বললেন তাদের নতুন কাকাকে প্রণাম করতে।

পুরনো ধাঁচের কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তাকে প্রণাম করবার জন্য মাথা নত করতেই অনুপম 'কর কি কর কি' বলে বাধা দিয়ে প্রায় বুকে টেনে নিল ছেলেটিকে। আর তাই দেখেই যেন ডাক্তার সরকারের শেষের দিকে মিইয়ে-পড়া কৌতুক প্রবৃত্তি আবার সতেজে খাড়া হয়ে উঠল। হা হা করে হেসে তিনি বললেন, ধরেছেন ঠিক মশায়। এতটুকু ছোট ছেলেরও প্রণাম পাবার যোগ্য আপনি এখনও হন নি।

গৃহিণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই আবার বললেন তিনি, দেখেছ কাণ্ডটা? আমার জায়গায় বসবেন উনি এই স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ভার নিয়ে। অথচ কি ছেলেমানুষটিই না দেখতে!

এইবার লজ্জা পেল অনুপম; চোখ নামিয়ে সে বলল, কেবল দেখানোর কথাই তো নয় আপনার তুলনায় সত্যিই তো ছেলেমানুষ আমি। কেন যে আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন!

শোন কথা।

ডাক্তার সরকার যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'তুমি' বলে ডাকব একজন এম. বি. পাসকরা ডাক্তারকে!

প্রতিবাদই ফুটেছিল ডাক্তার সরকারের ভাষার মত তাঁর গলার আওয়াজেও। কিন্তু ওই পর্যন্ত বলতে বলতেই হঠাৎ যেন বদলে গেলেন তিনি; উদ্দাম হাসি তাঁর সংযমের বন্ধনের মধ্যে এসে খুব যেন কোমল হয়ে গেল। গলা একটু নামিয়ে আবার বললেন তিনি, তুমি বলেই ডাকতাম যদি ছ মাস আগে আপনার সঙ্গে দেখা হত, আমার বড় মেয়েটার বিয়ে হবার আগে। জাতিতে যখন মিল রয়েছে তখন হয়তো আপনাকে আমাদের নতুন একটি ছেলে করে নিতেই চাইতাম আমরা। কি বল, তুমিও তাই চাইতে না?

শেষের প্রশ্নটা তিনি করলেন তাঁর স্ত্রী নগেন্দ্রনন্দিনীকে।

তিনি কিন্তু উত্তরে দাঁতে জিভ কেটে বললেন, আঃ কি যে বল তুমি! নির্বন্ধ না থাকলে কি একজনের সঙ্গে আর একজনের বিয়ে হয়!

অর্থের আর অস্পষ্টতা নেই বলেই অনুপম কুণ্ঠিত। বুদ্ধিমতী নগেন্দ্রনন্দিনী স্বামীর ভুলটাকে শোধরাবার জন্য তখন গৃহকর্ত্রীর আসল ভূমিকা গ্রহণ করলেন; বললেন, আপনি আসুন অনুপমবাবু, জামাকাপড় ছাড়বেন।

হয়তো ডাক্তার সরকারও বুঝেছিলেন যে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে, সে রাত্রে তিনি অনুপমের সঙ্গে হালকা পরিহাস আর করেন নি। খেতে বসে নতুন জায়গার নতুন সব খবর শুনিয়েছিলেন অতিথিকে; ওই প্রসঙ্গেই এই বৈষ্ণবতীর্থের বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গও উঠেছিল। তার উপসংহার তিনি করলেন অনুপমকে তার জন্য নির্দিষ্ট শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় বসিয়ে দেবার পর।

রাতের মত বিদায় নেবার আগে ডাক্তার সরকার হেসে বললেন, তা সাধুসঙ্গ এখানে খুব পাবেন আপনি, নেড়ানেড়ী যেমন এখানে আছে তেমনি আছেন অনেক উচ্চকোটির সাধকও। অন্ততঃ "নাম" এখানে আপনি দিনরাত শুনতে পাবেন। কান পাতুন, ওই শুনুন—কোথায় যেন পাঠ হচ্ছে—ওই শুনুন চৈতন্যচরিতামৃতের পদ :

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।"

খোলা জানলা দিয়ে মুখ বের করে তন্ময় হয়ে দেখছিল অনুপম। ডাক্তার সরকার কখন যে ঘরে ঢুকে প্রায় তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছেন তা বুঝতেই পারে নি। হঠাৎ দরাজ গলার সম্বোধন শুনে চমকে উঠল সে।

কি মশায়, কেমন লাগছে আমাদের নবদ্বীপ ?

অনুপম স্মিতমুখে উত্তর দিল, মন্দ আর কি! ঠিকই বলেছিলেন আপনি যে এখানে দিনরাত নাম শুনতে পাওয়া যায়।

আর বৈষ্ণবদর্শনও হয়।—ডাক্তার সরকার বললেন : তার জন্য চেষ্টা না করলেও চলে। ওই দেখুন—

আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন তিনি।

তা দেখবার মত বইকি, অনেকের মধ্যেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চোখে পড়বার মতই।

আকারের চেয়ে আচরণের বৈশিষ্ট্যই বেশী প্রকট। অনুপমের মনোযোগ সেই দিকেই আকর্ষণ করলেন ডাক্তার সরকার।

নবদ্বীপের একটি বিশেষ রত্ন উনি—ওই কৃষ্ণদাস বাবাজী। নামের রসে দিনরাত ডুবে থাকেন। সিদ্ধির প্রায় নাকি কাছাকাছি গিয়ে পৌচেছেন। বিষ্ঠায়-চন্দনে, শুনি আর ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণ সমজ্ঞান। ওই দেখুন তার প্রমাণ।

এখন স্পষ্টই দেখতে পেল অনুপম যে পথের একটি কুকুর তার সামনের পা দুটি তুলে বাবাজীর কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁ করেছে। ঝুলি থেকে কি যেন এক মুঠো বের করে বাবাজী পথের উপর ছড়িয়ে দিতেই বাবাজীকে ছেড়ে আবার চতুষ্পদ হল কুকুরটি ; আর তখনই বাবাজী স্বয়ং ওই পথের উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে ওই কুকুরের একটি পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন তাকে।

দেখলেন তো অনুপমবাবু ?

ডাক্তার সরকার আবার বললেন : কেমন সমদৃষ্টি কৃষ্ণদাস বাবাজীর ? আর ওই পথের কুকুরও দেখুন, কেমন আপন করে নিয়েছে বাবাজী মশায়কে। বুঝুন এখন আমাদের এই নবদ্বীপের মাহাত্ম্য।

অনুপম মুচকি হেসে উত্তর দিল, কিছু কিছু বুঝতে পারছি।

আরও বুঝবেন, যত দেখবেন তত চোখ খুলবে আপনার। কিন্তু এখন আর নয়। আটটার আগেই ডিসপেনসারিতে হাজিরা দিতে হবে। চট করে তৈরি হয়ে নিন, ওদিকে চা তৈরি হয়েই আছে।

আর তা হলে দেরি করা চলে না, ঘড়ির দিকে চেয়েই বুঝতে পারল অনুপম।

রানীর ঘাট এলাকা থেকে পথ নেহাত কম নয়। ছাড়া গঙ্গার উপরকার পুলটি দুধের সঙ্গে জলের মত রানী রোডের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে। সেটি পার হয়ে বাজারের প্রায় ভেতর দিয়ে শ-দুশ বছর বয়সের বটগাছটির নীচে সার্থকনামা পোড়া-মায়ের মন্দির ডাইনে রেখে পোড়া-মা-তলা রোড অতিক্রম করে পশ্চিমমুখো গলিটাতে গিয়ে ঢুকতে হবে। তার পরেও এক ফার্লং হবে বইকি! ডাইনে, বাঁয়ে এতবার মোড় ফিরতে হল যে অনুপমের মনে হল যেন কোন গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে সে। ভাগ্যিস ডাক্তার সরকার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন তাকে!

বাড়ি থেকে পথে নামতেই আর একটা আওয়াজ তার কানে এসেছিল—ঠক্-ঠক্, ঠক্-ঠক্, ঠক্-ঠক্—

অবিরাম চলেছে।

বেশ একটু বেলা হয়েছে তখন ; স্নানযাত্রীর ভিড় পাতলা হয়ে আসছে, ভাটা পড়েছে একটানা নামগানে। সেইজন্যই ওই নতুন আওয়াজটা সশব্দে নিজেকে জাহির করতে পারছে।

সম্পূর্ণ না হলেও অনুপমের ওই ব্যাখ্যাকে মোটামুটি মেনে নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললেন ডাক্তার সরকার। নবদ্বীপে আজকাল নাম-সঙ্কীর্তনের সঙ্গে জোর কদমে চলে ঠকঠকি

তাঁতের দ্রুতলয়ের নর্তন—পরমার্থের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব অনর্থের মূল নাকি যে অর্থ, তাকে আয়ত্তে আনবার জন্য দ্বিতীয় এক শ্রেণীর লোকের জীবন-সংগ্রামে রণহুঙ্কারের মত। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসে টিনের চাল আর দর্মার বেড়া দিয়ে নতুন করে ঘর বেঁধেছে যে হাজার হাজার খেটে-খাওয়া মানুষ তাদের অনেকে মহাপ্রভু বা রাধাকৃষ্ণের পট বা বিগ্রহের পাশেই তাঁতও বসিয়েছে—যার যে কখানা সাধ্য। সকাল সাতটা থেকে সেই সব তাঁতে কাজ শুরু হয়। চারিদিকেই একসঙ্গে শত শত তাঁত ঠক্-ঠক্ শুরু করলে সে আওয়াজ কি পথের লোকের কানে না এসে পারে!

তা নাম-সঙ্গীতের তুলনায় তেমন ফেলনা নয় পেটের তাগিদে মানুষের হাতের কাজের ওই ঠক্-ঠক্ ছন্দ। কিন্তু পথে চলার ছন্দ বজায় রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে যে!

সরু সরু পথ। ফুটপাতের বালাই নেই। অগুনতি রিকশা ছাড়াও যাত্রীবাহী বাস চলে, ময়লাবাহী মিউনিসিপ্যালিটির মোটর এবং বলদ-টানা দু রকমের গাড়িও। লোক চলেছে পিঁপড়ের সারির মত। এখানে-সেখানে আবর্জনা জমে রয়েছে—কঠিন, আধা-তরল ও তরল, সব রকমই আছে। অবাঞ্ছিত আলিঙ্গন এড়িয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলতে চলতে আশা করেছিল অনুপম যে ডিসপেনসারিতে পৌঁছবার পর সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে তার চোখে যেন আর পলক পড়ে না।

বহির্বিভাগসর্বস্ব মামুলী একটি ডিসপেনসারি মাত্র।

একখানি বড় ঘরকেই কাঠের বেড়া দিয়ে ভাগ করে দুখানা করা হয়েছে। পেছন দিকে জানলা একটিও নেই। সামনে দুটি দরজা ও সরু একফালি বারান্দা আছে বলেই অন্ধকূপের সঙ্গে ওর যা পার্থক্য।

অপেক্ষাকৃত ছোট যে ঘরখানা সেখানা কম্পাউণ্ডারের। দুটি পুরনো আলমারি এবং উঁচু একখানা টেবিল সেখানে আছে। আলমারিতে বড় বড় কয়েকটি বোতল আছে; টেবিলের উপরে মাঝারি ও ছোট আকারের কয়েকটি শিশি খল ছুরি কাঁচি ইত্যাদি কম্পাউণ্ডারের অবশ্য-প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। অপেক্ষাকৃত বড় যে ঘরখানাতে ডাক্তার সরকার অনুপমকে নিয়ে বসালেন তাতে ডাক্তার ও রুগীদের এজমালি অধিকার। উপকরণ বা আসবাব বলতে তাতে আছে দুখানা চেয়ার এবং একখানা টেবিল; রুগীদের জন্য একখানা মাত্র কাঠের বেঞ্চি।

অপারেশন কোথায় করেন তা হলে?—অনুপম ডাক্তার সরকারকে উদ্‌ভ্রান্তের মত জিজ্ঞাসা করল।

প্রবীণ ডাক্তার মুখে অদ্ভুত এক রকমের হাসি ফুটিয়ে তুলে আঙুল দিয়ে বারান্দার একটা কোণ নির্দেশ করলেন।

অনুপম বিহ্বল হয়ে বলল, ওখানে? অপারেশন? ওই খোলা বারান্দায়?

আরে মশায়, আমরা কি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করি এখানে? না ব্রেন টিউমার? হাইড্রোসিল কেস হলেও তো রুগীকে কেষ্টনগরের পথ দেখিয়ে হাঁকিয়ে দিই। কাটি তো ফোড়াফাড়ি। তা ওই বারান্দাতেই বরং ভাল হয়। বারান্দার ধার ঘেঁষে বসাই বা শুইয়ে দিই রুগীকে, তারপর ছুরি চালাই। পুঁজ-রক্ত যা বের হয় তা পড়ে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির খোলা নর্দমায়। অল্প একটু জায়গা রুগী নিজে না পারলেও তার আপন লোকেরা ধুয়ে সাফ করে দিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে অপারেশন টেবিল থাকলে ধোয়া-মোছার হ্যাঙ্গাম কে করত? মেথর আমাকে দিয়েছে নাকি গভর্মেণ্ট?

ডাক্তার সরকারের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির চেয়ে কৌতুকই যেন বেশী। তবে বেশ প্রাঞ্জল তাঁর ব্যাখ্যা। বিশ্বাস না হলেও অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। তাই ভেবেই ঢোক গিলেছিল অনুপম। তবু আর একটা সন্দেহ মন থেকে তার ঠোঁটের কাছে উঠে এল। ডাক্তার সরকারের মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, তা সার্জিকাল কেস শক্ত হলে না হয় তাকে বিদায় করে বাঁচলেন। কিন্তু মেডিক্যাল? তাদের জন্যে ওষুধপত্র?

তা আছে।—ডাক্তার সরকার একটু যেন গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিলেন: ওঘরে গিয়ে একটু ভাল করে দেখুন। দেখবেন যে দশ-বারোটা স্ট্যাণ্ডার্ড মিকশ্চার আমরা দিতে পারি।

তাই দিয়েই সব রোগের চিকিৎসা হয়?

কেন হবে না?

অনুপমের মনে হল যে ডাঃ সরকার বুঝি বিস্মিত

হয়েছেন। অনুমানটা যে ভুল নয় তার প্রমাণও সে পেল প্রায় পরের মুহূর্তেই।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার সরকার; হাসতে হাসতেই বললেন, একালের ডাক্তার তো আপনি—তাই বুঝি সাল্‌ফা আর অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের কথা ভাবছেন! তা ওসব একেবারে যে আমাদের নেই তা নয়—সিবাজল আছে, সালফা গুয়েডিনও মাঝে মাঝে পাই। লেখালেখি করলে পেনিসিলিনও পাওয়া যায়। কিন্তু কেন ওসব হ্যাঙ্গাম করবেন? আরে মশায়, আপনাদের একালের এইসব ওয়াণ্ডার-ড্রাগ যখন বের হয় নি তখন তো ওই স্ট্যাণ্ডার্ড মিকশ্চার দিয়েই চিকিৎসা করেছি আমরা। তাতে কি ব্যারাম সারে নি রুগীদের?

অনুপম আবার একটি ঢোক গিলে বলল, কিন্তু নতুন আবিষ্কার যখন হয়েছে—

রেখে দিন আপনার নতুন আবিষ্কার!

ডাক্তার সরকার অনুপমকে যেন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তারপর কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, আরে মশায়, রুগী যে সারে তা কি ওষুধের গুণে? রোগ যদি সারবার হয় তবে বিনা ওষুধেই সারবে, আর না সারবার হলে সিলিন, মাইসিন যতই দিন না কেন, রুগী অক্কা পাবেই।

শুনতে শুনতে গা যেন রি-রি করছিল অনুপমের। একজন ডাক্তার কেমন করে যে এ সব কথা মুখে আনতে পারেন তা বুঝতে পারে নি সে। কিন্তু যিনি ওরকম কথা বলছিলেন তিনি বয়সে প্রবীণ। তাঁর মুখের উপর মৃদু প্রতিবাদ করতেও সংস্কারে শালীনতায় বাধে। কাজেই অনুপম মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারছিল না। কিন্তু মানুষের মুখ তো তার মনের দর্পণ। গোপন করবার সযত্ন প্রয়াসকে পরাস্ত করে তার মনের বিরক্তি ও প্রতিবাদ কিছু বুঝি ফুটে উঠেছিল তার চোখে, তার ললাটের কুঞ্চিত চর্মের ফাঁকে ফাঁকে। হঠাৎ তা চোখে পড়ে যেতেই থেমে গেলেন ডাক্তার সরকার; তারপর অনুপমের একখানি হাত করমর্দনের ভঙ্গিতে দখল করে নিয়ে একেবারে অন্য এক সুরে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কিছু ভাবছেন আপনি। না না, আমি ক্যাম্বেলের পাস-করা সেকেলে ডাক্তার হলেও ততটা মূর্খ নই যতটা আমার মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

অপ্রতিভ হয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল অনুপম। কিন্তু বাধা দিয়ে ডাক্তার সরকারই আবার বললেন, আরে মশায়, অনেক দুঃখে এ সব কথা বলছি। আমাদের কর্তারা ওষুধ দেয় না—ম্যাগসাল্‌ফ, কুইনাইন, সোডিবাইকার্ব, আয়োডিনের মত ওষুধ দিতেও ওদের যা কার্পণ্য দেখলে অবাক হবেন আপনি। অনেক দেখে, অনেক সয়ে তবে এই পথ ধরেছি আমি। নিষ্কাম কর্মের বুলি আওড়ে মনকে চোখ ঠারি। তা আমার কথা মনে করে রাখবেন না আপনি, চার্জ নেবার পর আপনার বিচারবুদ্ধি মতই রুগীর চিকিৎসা করবেন।

শুনতে শুনতে অনুপমের রাগের মত ভ্রান্তিও কেটে গিয়েছে। এই সরল প্রকৃতি মানুষটির প্রতি মনে মনে সে অবিচার করেছে বুঝে যেন প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই বলল, আপনি আমায় আশীর্বাদ করবেন ডাক্তার সরকার, তাই যেন আমি পারি—তা অবস্থা যত প্রতিকূলই হোক না কেন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

খুব খুশী ডাক্তার সরকার। কিন্তু অনুপমের চোখে চোখে চেয়ে যে হাসি তিনি হাসলেন তা কৌতুকের। মিটি-মিটি হাসতে হাসতে তিনি বললেন, তবে আমার পাকা চুল আর অভিজ্ঞতার জোরে একটি উপদেশ আপনাকে দেব অনুপমবাবু। রুগীর জন্য বেশী দরদ থাকা আর চিন্তা ও আচরণে সর্বদাই বৈজ্ঞানিক হওয়া, দুইই ডাক্তারের পক্ষে মারাত্মক। নিজের গাঁট থেকে আপনাকে তাহলে ওষুধের দাম দিতে হবে এবং একবার তা যদি শুরু করেন তাহলে অচিরেই দেখবেন যে মাইনের টাকা একটিও আপনি ঘরে নিয়ে তুলতে পারছেন না। অত কম ওষুধ যাঁরা আমাদের সরবরাহ করেন, আমাদের মাইনের হারও তাঁরাই তো ঠিক করে দিয়েছেন। নয় কি?

নির্মল কৌতুক। তার রসে অনুপমের মনটাও ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। প্রসন্ন হাসি হেসে সে বলল, আপনার এই উপদেশটি আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। কিন্তু ওই যে বললেন, কটি স্ট্যাণ্ডার্ড মিকশ্চার দিয়ে সব রকম ব্যারামের চিকিৎসা করতে, তা পারব না। আমাদের কালের সব ওষুধ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আদায়

করব আমি, করবার জন্যে দরকার হলে কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়াও করব।

তা করবেন।—বলতে বলতে চশমার খাপ খুললেন ডাক্তার সরকার: কোমর বেঁধে করবেন। এখন চার্জ নিন তো।

আগে রুগী দেখবেন না? ওরা বসে রয়েছে যে!

মেয়ে-পুরুষ পাঁচ-সাতটি রুগী ততক্ষণে বারান্দায় এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু তার জন্য ডাক্তার সরকারের মুখে চোখে কোন উদ্বেগ দেখা গেল না; অপাঙ্গে সে দিকটা একবার দেখে নিয়ে তিনি বললেন, সবই পুরনো রুগী। থাকুক বসে কিছুক্ষণ। আমাদের কাজটা তুলনায় বেশী জরুরী, সেটা আগে সারি, আসুন।

কিন্তু খাতাপত্রের দিকে মন দেবার শুরুতেই চমকে উঠল অনুপম, কীর্তন গানের একটি কলি কানে এসেছে তার:

"ওরে কেউ ভাসে, কেউ ডুবে মরে রে
ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে।"

ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভাব, ভিন্ন সুর। কিন্তু ঠিক সেই কণ্ঠ, সঙ্গে সেই মান্দরার টুংটাং, ভোরবেলায় ডাক্তার সরকারের বাড়িতে খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রানী রোডের উপর স্নান-যাত্রীদের বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে হঠাৎ যে গলার গান শুনে পুলকিত বিস্ময়ে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অনুপম, ঠিক তাই।

এবারও ঠিক তেমনি উন্মুখ হয়ে উঠল অনুপমের মন। চোখ দুটি তার খাতার উপর পড়ে থাকলেও মন তার এক নিমেষেই ছুটে উধাও হয়ে গেল।

প্রথমে বুঝতে পারেন নি ডাক্তার সরকার। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ তিনি। যখন বুঝলেন যে তাঁর শ্রোতাটি অন্যমনস্ক হয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গেই কারণটাও বুঝতে পারলেন তিনি। হাতের লাল-নীল পেনসিলটি ঠুক করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে মুচকি হেসে তিনি বললেন, গান শুনছেন বুঝি?

অস্বীকার করবার উপায় নেই; ধরা পড়বার লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে অনুপম বলল, জানি না তো কে গাইছে, তবে বেশ গলাখানি, না?

মানুষটিও বেশ।—হেসে উত্তর দিলেন ডাক্তার সরকার: দেখবেন নাকি? ডাকব?

চেনা নাকি আপনার?

মঞ্জরী বোষ্টমীকে এই নবদ্বীপে কে আর না চেনে। ভালই হল যে আজই এই কাছেই এসেছে সে। বসুন, ডেকে পাঠাচ্ছি।

বেয়ারা ফটিককে হুকুম দেবার পর ডাক্তার সরকার আবার যখন অনুপমের মুখের দিকে তাকালেন তখন তাঁর মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। সকৌতুক হাসির উপরে ছদ্ম গাম্ভীর্যের পাতলা চাদর চাপা দিয়ে তিনি বললেন, তবে সাবধান মশায়, ও কিন্তু সাক্ষাৎ সাপিনী, একেবারে শঙ্খচূড়ের জাত।

ঠিকই তো! প্রথমে চোখে পড়ে নি বলেই আরও চমকে উঠল অনুপম।

গোড়াতে নিরাশই হয়েছিল সে।

দূর থেকে ভেসে-আসা কীর্তনসুরের ইন্দ্রজাল অনুপমের মনের পটে যে অপ্সরীকে রচনা করেছিল সে তো নয় এই রক্তমাংসের বৈষ্ণবী! কুব্জা না হলেও রাধারাণী নয়; বৃদ্ধা না হলেও যুবতী বলে একেবারেই মনে হয় না। একমাথা রুক্ষ চুল আর কাঁধে অনেক তালি দেওয়া ভিক্ষার ঝুলিটি নিয়ে খাটো থানধুতি পরা যে মেয়েটি ফটিকের পেছনে পেছনে ডিসপেনসারির বারান্দায় এসে উঠল, তাকে প্রথমে অনুপমের মনে হয়েছিল নিতান্তই সাধারণ একটি বৈষ্ণবী। শীর্ণ দেহ, তামাটে রঙ, সাদামাঠা মুখখানিতে যেন ক্লান্তির ছাপ। লাবণ্য বলতে যা একটু চোখে পড়ে তা কেবলই তার গাল দুটিতে; আর দীপ্তি দুটি চোখে। কিন্তু সমগ্রের বিবর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে দুইই বেমানান রকমের তীক্ষ্ণ।

কিন্তু কাছে আসতেই ওই সাধারণ বৈষ্ণবীই অকস্মাৎ অসাধারণ হয়ে উঠল।

অনুপমকে দেখিয়ে ডাক্তার সরকার তাকে বললেন, এই যে গো, তোমাদের নতুন ডাক্তার। চিনে রাখ ভাল করে। ওষুধপত্তর যদি লাগে—

খোঁচা বলতে ওইটুকুই। তবু তাতেই কাজ হল। বৈষ্ণবী মুখ তুলে তার দিকে তাকাতে না তাকাতেই

অনুপমের মনে হল যেন একটা সাপই অকস্মাৎ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। ক্ষিপ্রগতি বিদ্যুতের মত ; বিদ্যুতেরই ঝিলিক ফুটল যেন বৈষ্ণবীর দুটি চোখেই কেবল নয়, তার ভুরুতে, তার ঠোঁটে, তার নারীদেহের খাঁজে খাঁজে।

আর মন্দিরার ঝঙ্কারের মতই ধ্বনি ফুটল তার কণ্ঠে : তাই নাকি গো ডাক্তারগোঁসাই! আমাদের ছোট গোঁসাই ইনি ?

ছোট নয়।—বলে দাঁতে জিভ কেটে মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন প্রবীণ ডাক্তার সরকার প্রায় ছেলেমানুষের মতই : ইনি মোটেই ছোট নন—আমার চেয়ে ঢের বড় ডাক্তার এই বোস সাহেব।

ও!

বলে চোখ দুটি বড় করেছিল বৈষ্ণবী, কিন্তু তারপর হেসেই সে বলল, তা হলেও আপনার চেয়ে বয়সে ছোট তো—আমি ওঁকে ছোট গোঁসাই বলেই ডাকব।

বলে অনুপমের মুখের দিকে তাকাল বৈষ্ণবী। অদ্ভুত দৃষ্টি তার চোখে—অকুণ্ঠিত ঔৎসুক্যে একাই একশো। অনুপমের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। তার উপরে আবার যে আচরণ করল বৈষ্ণবী তা অনুপম কল্পনাও করতে পারে নি।

বৈষ্ণবী বলল, দণ্ডবৎ হই ছোট গোঁসাই।

বলতে বলতেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। উপুড় হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে হাত দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে মাটিতে কপাল ঠুকে ঠুকে প্রণাম করছে বৈষ্ণবী। সর্বনাশ! সাপের মতই যে বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে সে অনুপমের জুতো-পরা পা দুটির দিকে!

একটা লাফ দিয়েই দূরে সরে গেল অনুপম। কেবল কুণ্ঠিত নয়, যেন ভীত হয়েই সে বলে উঠল, আহা-হা—এ কি করছেন আপনি!

সর্বসাকুল্যে হয়তো এক মিনিট সময়ও নয়। অথচ অতগুলি ঘটনা ঘটে গেল, উচ্চারিত হল অতগুলি কথা, অতগুলি ভাবনা ভাবল অনুপম। কেবল ভাবা নয়, কাজেও আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা। স্থির হয়ে বসবার আগে নিজের চেয়ারখানাকেও নিরাপদ দূরত্বে টেনে নিয়ে গেল সে।

ততক্ষণে বৈষ্ণবী উঠে বসেছে—তবে অনুপমের মুখের দিকেই তার দৃষ্টি।

সব দিক দিয়েই বিব্রত অনুপম ; সে বলল, মাটিতে বসলেন যে ?

তাতে কি হয়েছে!—তাচ্ছিল্যের স্বর বৈষ্ণবীর।

কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরই সরস হয়ে উঠল, যখন পরের মুহূর্তেই অনুপমকে সে প্রশ্ন করল, আপনাকে ছোট গোঁসাই বললাম বলে রাগ করলেন না তো ?

অনুপম আরও বিব্রত হয়ে বলল, রাগ কেন করব—আমি তো ছোটই, সব রকমেই তাই। কিন্তু ওই গোঁসাই কথাটাকে জুড়লেন কেন ?

বাঃ রে! তা ছাড়া কি ডাক হয়? আমাদের কাছে আপনারা সকলেই গোঁসাই।

তা হলে আমি আপনাকে কি বলে ডাকব ?

যা আপনার খুশী।—বলতে বলতে মুখ টিপে হাসল বৈষ্ণবী : বড় গোঁসাই তো ডাকেন "সই"। মন চায় তো আপনিও তাই ডাকবেন।

অনুপম লাল হয়ে উঠে বলল, দূর—তা কি পারি!

তবে যা খুশি তাই ডাকবেন। আমার নাম হল গিয়ে মঞ্জরী।

মঞ্জরীর প্রস্তাবটি অনুপমের কানে খারাপ ঠেকেছিল, কিন্তু তার জানা নামটাই দ্বিতীয়বার তার নিজের মুখ থেকে শুনে অনুপমের মনে হল যেন মধু। কিন্তু খুশী হয়েও তা প্রকাশ করবার উপায় নেই। একা মঞ্জরীই কেবল নয়, ঘরের মধ্যে ডাক্তার সরকার এবং বারান্দায় সব কজন রুগীই অনুপমের মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। সুতরাং সেই তার সতর্কতা-বোধটা আবার তার মনে প্রবল হয়ে উঠল। এবার গম্ভীর হয়ে সে বলল, আপনি তবে আমার দিদি।

দিদি!

হ্যাঁ, আমি দিদি বলেই ডাকব আপনাকে।

কেন গো ছোট গোঁসাই ?

চমকে উঠল অনুপম।

কেবল সুরই নয়, রূপও আর একজনের যেন। অস্ফুট, কিন্তু অনস্বীকার্য। বড় বড় চোখ দুটিতে প্রথমে যা মনে হয়েছিল অসুস্থ একটু দীপ্তিমাত্র, তাতেই এখন

বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে; বিস্ময়ের পেছনে উঁকি দিচ্ছে পুলকিত কৌতুক, তামাটে বর্ণের অন্তরাল থেকে লাবণ্যের ঝিকিমিকি—বর্ষার মেঘমেদুর আকাশে উষার অসম্পূর্ণ আবির্ভাবের মত। একখানি মুখই দুখানি মুখ যেন। মঞ্জরী বৈষ্ণবীর শীর্ণ ও বিবর্ণ পরিণত মুখখানির আনাচে-কানাচে ছায়ামূর্তির মত আর যে মুখখানি উঁকি দিচ্ছে, তা এই মঞ্জরীরই উচ্ছল রসসমৃদ্ধ যৌবনসত্তা নাকি!

দুয়ের মিলনে কিন্তু কেমন যেন উদ্ধত ভঙ্গি মুখখানির। উপমাটা আবার মনে পড়ল অনুপমের, একটা সাপই বুঝি ফণা তুলে হেলছে দুলছে।

ফস করে বলে ফেলল অনুপম, সাপের বিষদাঁত ভেঙে দিলাম।

কি বললেন!

ফণা ভেঙে পড়ল। কিন্তু তা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। পরের মুহূর্তেই সাপিনী যেন আগের চেয়েও বড় এবং উঁচু করে ফণা তুলে বিদ্যুদ্বেগে ছোবল মারল।

মঞ্জরী বলল, তাতে লাভ কি ছোট গোঁসাই? বিষ দাঁত তুলে ফেললেও আবার গজায় তা।

কথাটা খুব স্পষ্ট নয় বলেই খোঁচাটা তীক্ষ্ণ। অনুপম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমি কিন্তু, দিদি, কিছু ভেবে বলি নি কথাটা।

আমার কথাটাও কিছু না ভেবেই বললাম আমি।—মঞ্জরী উত্তর দিল।

তখন মুখের হাসি তার নিভে গিয়েছে, ঠোঁট দুখানি কেমন যেন নীল নীল। কিন্তু বোধ করি ক্রোধ ও আক্রোশেই ভুরু দুটি কুঞ্চিত। একটু থেমেই সে আবার বলল, কিন্তু অমন একটা কথা যখন উঠলই তখন একটা প্রশ্ন করি আপনাকে। আচ্ছা, সাপের মুখে যে বিষ আছে, তা কি সাপের দোষ?

অনুপমের কাছে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন এবং এমন, যার উত্তর কোন ডাক্তারি পাঠ্যপুস্তকে লেখাও থাকে না। তাতে আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত সে। কোন উত্তরই তার মুখে ফুটল না।

কিন্তু অনুপমের সেই অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়েই মঞ্জরী আবার হাসল; হাসতে হাসতেই সে বলল, কিন্তু ছোট গোঁসাই, বিধাতার কি যে বিচার, সৃষ্টির গোড়া থেকেই সাপকে তবু মানুষের হাতে ক্রমাগত মার খেতে হচ্ছে।

তুলনায় কণ্ঠস্বর এখন বিষণ্ণ; তবু অনুপমের মনে হল যেন আর একটা ছোবল।

বিধাতা তো উপলক্ষ মাত্র। বিধাতার নাম করে বুঝি অনুপমের বিরুদ্ধেই অবিচারের অভিযোগ করছে মঞ্জরী।

ভাগ্যিস রুগীরা ওখানে উপস্থিত ছিল। তাদেরই একজন অসহিষ্ণু হয়ে বাধা না দিলে খোঁচা-খাওয়া সাপের ছোবল মারার মত বৈষ্ণবী অনুপমকে আরও কত কি যে বলত, কে জানে!

আপনারা কি আজ কেবল গল্পই করবেন? রুগী দেখবেন না?

অভিযোগ তার বিরুদ্ধে না হলেও কথাটা তার কানে যেতেই মঞ্জরী তার ঝুলিটিকে কাঁধে তুলে উঠে দাঁড়াল।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল অনুপম, কিন্তু বাধা পড়ল।

সরল মানুষ ডাক্তার সরকার অপ্রতিভ হতে জানেন না। রুগীর কাছে তাড়া খেয়েও মঞ্জরীকে উদ্দেশ করেই তিনি বললেন, ও কি সই, এখনই উঠছ কেন?

মঞ্জরী উত্তরে বলল, আপনারা গোঁসাই রুগী দেখুন। আমারও কাজ আছে তো, আজকের মাধুকরী এখনও শেষ হয় নি।

কিন্তু তোমার ছোট গোঁসাই যে তোমার গান শুনতে চান।

আমার গান?—বলে মঞ্জরী বিদ্যুদ্বেগে ফিরে তাকাল অনুপমের মুখের দিকে।

অনুপম মুখ ফুটে অস্বীকার করবার পূর্বেই ডাক্তার সরকার বললেন, হ্যাঁ গো, তোমারই গান। দূর থেকে শুনেই উনি মুগ্ধ হয়েছেন বলেই না লোক পাঠিয়ে তোমাকে ডেকে আনলাম।

তাহলে রাধারাণীর কৃপা, আর আমার ভাগ্য।

মুখ ফিরিয়ে আবার ডাক্তার সরকারের মুখের দিকে চেয়েই উত্তর দিল মঞ্জরী, সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে রাধারাণীর উদ্দেশেই প্রণামও

করল সে। কিন্তু তারপর আবার সে তাকাল অনুপমের মুখের দিকে।

তখন যেন মেঘের মত কালো তার মুখ; তবে দামিনীর ঝলকও আছে তাতে। ভুরুজোড়া একটু বেঁকিয়ে ফিক করে হেসে সে বলল, আমি, ছোট গোঁসাই, গান গাই মাধুকরী মাগবার জন্য। ভিক্ষা করতে আপনার বাড়ি যেদিন যাব সেই দিন গান গাইব, বৌদিদিমণির সঙ্গে সঙ্গে দাদাকেও শুনিয়ে আসব।

সাপিনী আবার ছোবল মেরেছে।

কিন্তু আশ্চর্য! ও দংশনে জ্বালা নেই।

বরং অপ্রতিভ ভাবটা কেটে যাবার পর স্বস্তিই অনুভব করছিল অনুপম; তা যেন আবার উল্লাসের গা-ঘেঁষা। গোড়াতে যে ভুল করেছিল সে, সেই ভুল ভেঙে যাওয়ার স্বস্তি।

ভালই হয়েছে যে প্রথম দর্শনেই কঠিন আঘাত দিয়ে বৈষ্ণবী তার সত্য পরিচয় তাকে জানিয়ে গেল।

আরও আশ্চর্য এই যে, সদ্যপরিচিতা ওই বৈষ্ণবীকে এখন তার মনে হচ্ছে যেন কতকালের চেনা।

হারিয়ে যাওয়া আপন জন একটিকে হাটে হাটে ঘাটে ঘাটে অনেক খোঁজবার পর হঠাৎ যেন দেখতে পেল সে, সামান্যের হাটে বিশেষ একজন। এখনও অনিশ্চয়তা যেটুকু আছে, তা সন্দেহের নয়, বিস্ময়ের।

সময়ের হিসাবে কি পরিচয়ের পরিমাপ হয়! হোক না চাকরির খাতিরে, তবু বৈষ্ণবতীর্থ নবদ্বীপে বাস করবার হুকুম পাওয়ার পর থেকেই নাকে রসকলি-আঁকা রসবতী একটি বৈষ্ণবী দেখবার যে প্রত্যাশা মানুষ অনুপমের গোপন অন্তরের কোন একটি কোণে জেগে উঠেছিল, কর্মকুশলতায় তা যে বিশ্বকর্মার সগোত্র। নিরাকার সেই রূপকার অনুপমের মনের পটে অস্পষ্ট রেখায় যে নারী-চিত্র এঁকে রেখেছিল, দূর থেকে গানের সুরে পরিচয় দিয়ে তার নিজের মনেরই মাধুরী-মাখানো সেই ছবিই বুঝি রক্তমাংসের রূপ ধরে তাকে দেখা দিয়ে গেল। না তারই জীবনের যাত্রাপথে ক্ষণেকের সহযাত্রী কোন নারী অনেক পেছনে ফেলে-আসা অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে উঠে অনেক পথ হেঁটে আসবার পর গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখের ইশারা করল বিস্মৃত সেই অতীতের দিকেই? নইলে মিনিট দশেকের মাত্র পরিচয় এত যে গভীর দাগ কাটতে পেরেছে তার মনে, তা কি কেবলই তার দেওয়া কঠিন আঘাতকটির ফল!

সৃষ্টি হোক, আবিষ্কার হোক, নবদ্বীপের ওই মঞ্জরী বৈষ্ণবীকে ভাল লেগেছিল অনুপমের। সেই ভাললাগার অকুণ্ঠিত স্বীকৃতিই তার কণ্ঠেও বেজে উঠল।

কাজ শেষ করে বাজারের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার সরকার জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনুপমকে, আমার বোষ্টমী সইকে কেমন লাগল আপনার?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল অনুপম, বেশ। খুব চালাক মেয়েটি। আর মনে হল যে জানে-শোনেও বেশ।

না জানলে ওদের পেট চলবে কেন!—ডাক্তার সরকার উৎসাহিত হয়ে বললেন: জানতেই হয় এই বোষ্টম বোষ্টমীদের। ভাগবত, পুরাণ, মহাজন পদাবলী, এ সব পড়তে না পারলেও মুখে মুখে ওরা শোনে; শুনতে শুনতে ওদের বুদ্ধিও খুলে যায়, রসের মাল তো সবই।

অনুপমের মনের পাত্র তখন কৌতূহলে পরিপূর্ণ; সে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটির পরিচয় কিছু জানেন নাকি?

না মশায়!—ডাক্তার সরকার উত্তর দিলেন: যা দেখি তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। একটি ছেলে আছে। কার ছেলে তা জানা নেই, তবে শুনেছি যে ওর পেটেই হয়েছে।

ওর বোষ্টম বুঝি আর একজন?

না মশায়। যার আখড়াতে ও থাকে সে ওর বোষ্টম নয়, মানে চলতি অর্থে যা বোঝায় তা নয়। কানা বাবাজী ওকে মা বলে ডাকে। বয়সও দুজনের বাপ-বেটীরই। না মশায়, এই দুজনের সম্বন্ধ নিয়ে কি বোষ্টম, কি গেরস্ত, কেউ কোন রসাল কথা রটায় না।

শুনতে শুনতে ভাবছিল অনুপম; একটু পরে সে বলল, ওর নামটি কিন্তু বেশ। আর মন খুললে খোলবার মত রূপও ওর আছে।

তাও চোখে পড়েছে আপনার?—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন ডাক্তার সরকার। কৌতুকের চাপা হাসি তখন চিকচিক করছে তাঁর দুটি চোখে।

কিন্তু আবার চলতে আরম্ভ করবার পর গম্ভীর স্বরেই তিনি বললেন, তবে আর কিছু নয় অনুপমবাবু। শিকার ধরবার জন্যে ও কখনও ফাঁদ পাতে না, পুরুষ ফাঁদ পাতছে বুঝলে তাও এড়িয়ে চলে মঞ্জরী। কয়েকজনের মুখেই আমি শুনেছি যে ও মুগ্ধ পুরুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তা না হলে কানা এক ঘাটের মড়াকে নিয়ে একটা কুঁড়ে-ঘরের মধ্যে ওকে দিন কাটাতে হত না। গোড়ার দিকে শুনেছি খুব শাঁসালো এক গোঁসাই ওকে পরকীয়া সাধনার গুহ্যতত্ত্ব বোঝাতে গিয়েছিল। ফলে মাসখানেক হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হয়েছিল গোঁসাইজীকে। সে গল্পটা আমার মনে আছে বলেই তো ওকে ভুজঙ্গিনী বলি আমি।

ওঃ!

অনুপম চমকে উঠেছিল আর একটা ভুল তার এতক্ষণে ধরা পড়ল বলে। কিন্তু ডাক্তার সরকার পরিবর্তনটুকু একেবারেই লক্ষ্য না করে আপন মনেই বলে চললেন, সাপিনীর দংশনে গোঁসাইজীর ঘায়েল হওয়ার কথাটা তখনই চারিদিকে রটেও গিয়েছিল। তারপর থেকে কোন পুরুষ ওর শরীরটার ওপর লোভ করে না। এখন অবশ্য ওর সে দেহও আর নেই। আয়ুই যে কত আছে—

শুনেই চমকে উঠল অনুপম; বাধা দিয়ে সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা ডাক্তার সরকার, ওর কি টি-বি হয়েছে?

ঠিক ধরেছেন তো!—আবার থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার সরকার, সসম্ভ্রম বিস্ময়ে তাকালেন অনুপমের মুখের দিকে।

অনুপম বলল, ওর গাল দুটি আমার মনে হয়েছিল বেমানান রকমের লাল; আর চোখ দুটিও যেন বড় বেশী চকচকে।

চমৎকার!—বলে অত লোকের মধ্যে ওই পথের ওপর দাঁড়িয়েই ডাক্তার সরকার অনুপমের দুই কাঁধ ধরে বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে দিলেন।

আর একজনের জীবনকাহিনী বলতে বলতে তাঁর নিজস্ব রাজ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছেন বলেই প্রবীণ ডাক্তারের উল্লসিত আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি ওটি।

ওখানেই শেষ নয়। অনুপমের কাঁধের ওপর থেকে হাত নামিয়ে নেবার পর ডাক্তার সরকার আবার বললেন, খাসা ডাক্তার আপনি হবেন অনুপমবাবু—এক নজরেই যখন রুগীর রোগ ধরতে পারেন। তা ঠিকই ধরেছেন আপনি। সত্যই টি-বি হয়েছে মঞ্জরীর, ভেতরে ভেতরে এগিয়েছেও অনেক দূর।

চিকিৎসা?

অনুপম সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু শুনেই ডাক্তার সরকার যে হাসি হাসলেন তা ঝুনো পেশাদার ডাক্তারের হাসি। ডান হাতে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে তিনি উত্তর দিলেন, ওদের আবার চিকিৎসা, আপনিও যেমন!

তবুও ওই সম্বন্ধেই আরও একটু আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল অনুপমের; কিন্তু ডাক্তার সরকার আরও নির্মম ভাবে প্রসঙ্গটির উপরেই যবনিকা টেনে দিলেন।

তখন বাজারের কাছাকাছি এসে গিয়েছে দুজনে। ডাক্তার সরকার চোখের ইশারায় একটি চলতি রিকশাকে থামিয়ে অনুপমকে বললেন, এতে চেপে বাড়ি চলে যান আপনি, গিয়ে স্নানটান করুন গে। আমি বাজারটা একটু ঘুরে যাব।

অনুপমের ঈষৎ বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যকণ্ঠে তিনি আবার বললেন, আপনার সম্মানে আমার বাড়িতে একটি পার্টি দেব আমি। তার জন্য কিছু কেনাকাটা করা দরকার।

তার মানে!

অনুপম রীতিমত বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু ডাক্তার সরকার তাঁর চাপা হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে উত্তর দিলেন, আপনাকে স্থানীয় দশজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না! এইটিই হল তার দেশকালপাত্র-সম্মত পদ্ধতি।

[ক্রমশঃ]

ফুল থেকে কাঁঠাল

সুধীরকুমার চক্রবর্তী

ডাক্তার সরকার তাঁর সর্বমঙ্গলা প্রসূতি-সদনের কনসালটেশন রুমে বসে সেদিনকার রুগীদের রিপোর্টগুলো দেখছিলেন। এমন সময় মেট্রন মিস বিজলী বোস ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, সার্, আপনাকে একবার এখনই নার্সারী রুমে যেতে হবে।

স্বাভাবিক নির্বিকার গলায় ডাঃ সরকার বললেন, কেন সিষ্টার? হঠাৎ কি হল?

হঠাৎ নয় সার্, সতের নম্বর বেডের বেবীর রিপোর্টটা দেখেছেন তো?

হ্যাঁ দেখেছিলাম; নার্স করছে না, মার কাছে নিয়ে গেলেই কাঁদে তা ওকে আর্টিফিসিয়াল ফীডিঙের ব্যবস্থা করা হয়েছে তো?

তাই দিচ্ছিলাম সার্। কিন্তু কাল রাত থেকে এ পর্যন্ত পলতে করে একটু দুধ বা মিছরির জলও খাওয়ানো যায় নি। কেবল মধু দিলে একটু চাটে। ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে।

আচ্ছা চলুন, যাচ্ছি।

নতুন বেবীদের যে ঘরে রাখা হয় তাকে নার্সারী রুম বলে। সেখানে ছোট ছোট বেবী-কটের এক-একটায় দুটি করে বেবী থাকে, তাদের মাথার কাছে বেড নাম্বার দেওয়া থাকে। তবু যে রামের ছেলের সঙ্গে শ্যামের মেয়ের বদল হয় না এ কথা হলফ করে বলা কঠিন। কারণ সব ব্যাঙাচি যেমন এক রকম, সব বেবীও তেমনি এক রকম।

এমনও শোনা গেছে যে একবার ভিজিটিং আওয়ারে এক প্রসূতির আত্মীয়স্বজন দেখা করতে গেছেন। তখন নার্স করাবার জন্যে বেবীদের মায়ের কাছে দেওয়া হয়েছে। শিশু কার মত হয়েছে এই নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে তুমুল তর্ক। কেউ বলেন, বাবার মত, কেউ বলেন মায়ের মত, কেউ বলেন মাতুল-ক্রম। এই সময় নার্স এসে বললেন, আমি বড় দুঃখিত, এই বাচ্চাটি আপনার নয়, নম্বর গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। বলে তিনি শিশুটিকে তুলে নিয়ে গেলেন ও অন্য একজন নার্স এসে আর একটি শিশুকে তাঁর পাশে শুইয়ে দিয়ে গেলেন। এর পরে আর শিশুর চেহারা নিয়ে তর্ক চলে না।

সে যাই হোক, ডাঃ সরকার নার্সারী রুমে এসে ঢুকলেন। মেট্রন বিজলী বোস বললেন, দেখুন সার্, ছ দিনের বেবী কেমন পাশ ফিরে শুয়েছে—যেন বয়স্ক লোক!

ডাঃ সরকার কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, তাই তো, ভারী মজার ব্যাপার দেখছি! আচ্ছা, সারাদিনই কি এমনি থাকে?

সারা দিনই। আমরা চিত করে শুইয়ে দিয়েছি। চিত করে দিলেই চিৎকার করে, আর ছেড়ে দিলেই বাঁ দিকে ফিরে যায়।

আচ্ছা, ডান দিকে পাশ ফিরিয়ে দেখেছ?

ওরে বাবা, তা হলে চেঁচিয়ে-ককিয়ে অস্থির করে তোলে; যতক্ষণ না বাঁ দিকে ফিরছে ততক্ষণ রীতিমত দাপাদাপি করে!

অদ্ভুত তো!

হ্যাঁ সার্। আরও একটা মজার ব্যাপার, চিত করে দিলে চিৎকার তো করেই, তখন চোখের মণি দুটোও বাঁ দিকে একেবারে চোখের কোণায় এসে হাজির হয়—মনে হয় এক্ষুনি ফিট হবে।

ডাঃ মিত্র এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন; বললেন, এপিলেপসি ডেভেলাপ করবে না কি! হোমিওপ্যাথরা ওই লক্ষণ দেখে থিউজা দেয় তাতে ফলও হয় দেখেছি।

ডাঃ সরকার বিরক্ত হয়ে বললেন, ডাঃ মিত্র, এটা বৈজ্ঞানিক প্রসূতিভবন, এখানে হোমিওপ্যাথির জলপড়ার কথা বলবেন না। রাশিয়ার বাকুলভ সাহেব কি বলেছেন পড়েন নি?

ডাঃ মিত্র সসঙ্কোচে চুপ করে গেলেন। ডাঃ সরকার

শিশু ও প্রসূতির ব্যাপারে জগৎ-প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ। ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে বহু বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর অক্ষরমালা সংগ্রহ করে এনেছেন। তিনি বললেন, কেবলই বাঁয়ে ফিরছে! তার মানে হার্টের ব্যাপার মনে হচ্ছে। মিত্র, তুমি ওর মায়ের হার্টটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে এস, একে আমি দেখছি।

অনেকক্ষণ ধরে হার্ট পরীক্ষা করে ডাঃ সরকার গম্ভীরভাবে বললেন, দেখি, এর একটা টিকিট করুন।

বেবীর টিকিটে ডাঃ সরকার কারডিটিজ অর কারডিও-মেলাকিয়া লিখে দুটোর পেছনেই একটা করে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিলেন ও বেবীর ইলেকট্রো কারডিওগ্রাম করবার নির্দেশ দিলেন।

কনসালটেশন রুমে ফিরে এসে ডাঃ সরকার কলিং-বেল বাজালেন। বেয়ারা এলে বললেন, মেট্রন মেমসাবকো সেলাম দাও।

মিস বিজলী বোস এলে ডাঃ সরকার বললেন, সতেরো নম্বর বেডের ফাইলটা আনবেন তো।

ফাইল এলে, খানিকক্ষণ সেটা দেখে ডাঃ সরকার বললেন, এঁর স্বামীকে একটা ফোন করে দিন তো। একবার এখনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন। কেসটা ভারী অদ্ভুত; শুধু এক ফোঁটা দু ফোঁটা মধু খাইয়ে তো বেবীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ওঁকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। তা ছাড়া উনি যদি অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখাতে চান তা হলেও সেটা আমরা আপত্তি করব না। কারডিওগ্রাম করতে বলেছি বটে কিন্তু আমার মনে হয় না হার্টে কিছু পাব। আমি দেশে বিদেশে এত প্রসূতি-সদনে কাজ করেছি, এরকম কেস কখনও দেখি নি—সেটা আমায় স্বীকার করতেই হবে।

এমন সময় বাইরে একটা তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, আসতে পারি সার্?

এসো।

একজন নার্স ঘরে ঢুকলেন। ডাঃ সরকার বললেন, কি খবর সিস্টার?

ভারী অদ্ভুত ব্যাপার সার্! সতেরো নম্বরের বেবী যেমন বাঁ পাশে ফিরে শুয়ে থাকে তেমনি চুপচাপ শুয়েছিল। তার বাঁ পাশ থেকে আঠারো নম্বরের বেবীকে তুলে নিয়ে তার মার কাছে নার্স করতে দেওয়াতে সতেরো নম্বর বেবী ভীষণ চিৎকার শুরু করে দিলে। কোনও রকমে থামাতে পারি না, খানিক পরে আঠারো নম্বর বেবীকে আবার শুইয়ে দিয়ে গেল তখন সতেরোর বেবী আপনিই চুপ করে গেল।

ডাঃ সরকার অবাক হয়ে বললেন, কী বলছ! এও হয় নাকি!

নার্সটি বলল, বিশ্বাস করুন সার্, আমরা পরীক্ষা করবার জন্যে আরও দুবার আঠারো নম্বর বেবীকে কট থেকে তুলে নিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সতেরো নম্বর চেঁচাতে শুরু করেছে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার সার্, রাত্রে এই সতেরো নম্বর বেবীর জন্যে নার্সারীতে কড়া আলো জ্বালানো যায় না। খুব কম পাওয়ারের সবুজ আলো বা একটা ছোট নিওন-ল্যাম্প জ্বালালে ভাল থাকে। বেশী আলো হলেই চেঁচায়।

সেটা না হয় ফটোফবিয়া হতে পারে।—ডাঃ সরকার বললেন, কিন্তু আঠারো নম্বরের সঙ্গে ওর কান্নার কি কারণ থাকতে পারে? মিস বোস, আপনি ওর বাবাকে একটা ফোন করুন, আমি আর একবার ব্যাপারটা দেখে আসি।

ডাঃ সরকার নার্সের সঙ্গে বেবীটি দেখতে গেলেন। মেট্রন মিস বোস টেলিফোনে সতেরো নম্বর প্রসূতির স্বামীকে ডাকলেন। ভদ্রলোক সব শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, ডাক্তার সরকার যেন একটু অপেক্ষা করেন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

সতেরো নম্বর বেডের প্রসূতি শ্রীমতী উমা সেনের স্বামী মোহিত সেন একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ও মহাপ্রতিপত্তিশালী। বাংলাদেশে ধনী হওয়ার এক মস্ত অসুবিধা আছে। অত্যল্প কালের মধ্যেই বহু হিতৈষী আত্মীয় ও পরভৃতিকা জুটে যায়। অর্থনৈতিক জগতের বাইরে এরা নেহাত অসহায় বলে এমন দু-চারটি সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁদের দরকারও পড়ে বটে।

প্রসূতি-সদনের সামনে মোহিতবাবুর প্রকাণ্ড গাড়ি থামল। ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে নেমে এল প্রতুল নামে তাঁর একজন সবজান্তা কল্পিত আত্মীয়।

ব্যবসার বাইরে এই জটিল পরিস্থিতিতে প্রতুলের মুখ নানা সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। মোহিত সেন চিন্তান্বিত ভাবে গাড়ি থেকে নেমে ডাঃ সরকারের কনসাল্টেশন রুমের দিকে গেলেন, পেছনে প্রতুল। ডাঃ সরকারকে দেখেই মোহিতবাবু ব্যগ্র ভাবে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো ডাঃ সরকার, কোনও খারাপ খবর?

ডাঃ সরকার বললেন, এক্ষুনি তেমন কিছু নয়, তবে আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ ঘটেছে।

প্রসূতি?

না, মিসেস সেন ভালই আছেন। বেবীকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছি।

কী ব্যাপার বলুন তো! বাঁচবে না?

ব্যাপার যে কী, তা সত্যি কথা বলতে গেলে আমিও বুঝতে পারছি না। বেবীকে দু-এক ফোঁটা মধু ছাড়া আর কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না, কেবল বাঁ পাশ ফিরে শুয়ে থাকে, মার কাছে নিয়ে গেলে কাঁদে। আমি তো মশায় কিছু ধরতে পারছি না। আজ হার্টের ছবি নিতে বলেছি কিন্তু হার্টে কিছু আছে বলে মনে হয় না। এর মধ্যে আধ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। না খেলে বাঁচাব কি করে! অথচ সমস্ত যন্ত্র স্বাভাবিক, ইউরিন স্টুল ভাল। আপনি যদি অন্য কোনও স্পেশালিস্ট দেখাতে চান দেখাতে পারেন।

সে কি মশায়, আপনি কলকাতার শ্রেষ্ঠ শিশু-চিকিৎসক, আপনি না বুঝলে আর কে বুঝবে?

তা কেন? ডাঃ রায়কে একবার কনসাল্ট করে দেখুন না।

মিঃ সেন বললেন, তা তো করব, কিন্তু কি রোগটা বলব? কট থেকে তুলে মার কাছে দিলে কাঁদে—এ তো বড় অদ্ভুত কথা!

প্রতুল বলল, এ অসুখ নয় সার্।—মুখে তার বিজ্ঞ ভাব: এ শিশু নিশ্চয়ই জাতিস্মর! পূর্বজন্মের কোনও কথা স্মরণে আছে—তাই!

মোহিতবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, থাম তুমি। পূর্বজন্ম না ঘোড়ার ডিম! কিন্তু মশায়, এও তো ভারি আশ্চর্য! কিছুই খাচ্ছে না মধু ছাড়া?

ডাঃ সরকার বললেন, তাও দু-এক ফোঁটা মাত্র। আরও অদ্ভুত ব্যাপার আছে বাঁ দিকে ফিরে শোয় বুড়োদের মত। চিত করে দিলেই চিৎকার করবে। ডান পাশে তো ফিরবেই না, হাত পা ছুঁড়ে, চেঁচিয়ে একাকার করে। আরও মজা হচ্ছে, বাঁ দিকের বিছানায় একই কটে আঠারো নম্বরের বেবী থাকে। তাকে তুলে নিলেও আপনার বেবী চেঁচায়।

প্রতুল সোৎসাহে বলল, তবেই দেখুন! আপনি যাই বলুন সার্, এ শিশু জাতিস্মর না হয়ে যায় না। ওই শিশুর সঙ্গে পূর্বজন্মে কোনও সম্বন্ধ ছিল তাই ওর দিকে ফিরে শোয়। ওখান থেকে ওকে তুললেই কাঁদে। আমি যা বললাম তা না হয়েই যায় না।

ডাঃ সরকার বললেন, বিজ্ঞান-বিরোধী হলেও কথাটা তো উড়িয়ে দিতে পারছি না মোহিতবাবু! এ ছাড়া দৈহিক দিক থেকে দেখলে কোনও এক্সপ্লানেশনই পাই না। কিন্তু এও ভাবছি, খাবেই না বা কেন! তাই যদি সত্যি হবে তবে দুটিতেই যখন কটে থাকে তখন তো খুশী হয়ে খাওয়া উচিত।

মোহিতবাবু। আচ্ছা, অন্য বেবীটা খায়?

ডাঃ সরকার। হ্যাঁ, ও একেবারে স্বাভাবিক। এই কদিনে এক পাউণ্ড ওজনে বেড়েছে।

মোহিতবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, তাই তো! উপায়?

ডাঃ সরকার। অন্য যাঁরা বড় ডাক্তার বা শিশু-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ আছেন, আপনার ইচ্ছে হয়তো তাঁদের—

মোহিতবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ইচ্ছে হয় মানে? এ বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ ভার দিচ্ছি, আপনার যাকে ইচ্ছা, এমন কি ফরেন থেকে কাউকে ডাকতে হলেও ডাকবেন—যত টাকা লাগে আমি দেব। টাকার জন্যে কোনও ত্রুটি যেন না হয়। আমার এই প্রথম সন্তান—একে বাঁচাতেই হবে।

প্রতুল এই কথাটা শোনবার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সময় বুঝে বলল, আমি বলি কি, আমার একজন পরিচিত খুব নাম-করা জ্যোতিষী আছেন, তাঁকেও ডাকলে হত।

মোহিতবাবু অধৈর্য হয়ে বললেন, ডাক ডাক —যাকে তোমার প্রাণ চায় ডাক। জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, ঝাড়-ফুঁক, যাকে ইচ্ছা। খোকাকে বাঁচাতেই হবে।

উৎসাহিত প্রতুল হাত কচলিয়ে বলল, তার জন্যে কিছু খরচা—

মোহিতবাবু বিরক্ত মুখে পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করে প্রতুলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও, যা হয় কর গে। আমায় বকিও না।

আমি স্যর্, এখুনি পণ্ডিত মশায়কে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।—বলে প্রতুল ত্বরিতে প্রস্থান করল।

মোহিতবাবু বললেন, ডার্টি বেগার! মনে করে আমি কিছু বুঝি না। পূর্বজন্ম না ছাই! ডাক্তার সরকার, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

ডাঃ সরকার। ঠিক আছে মোহিতবাবু, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এখনও বেবীর ভাইটালিটি যথেষ্ট আছে। আমি কালই ডাক্তার রায় ও আরও দু একজন শিশু-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব। তারপর বেলা তিনটের মধ্যে আপনাকে ফলাফল সব জানিয়ে দেব।

ডাঃ সরকারকে একটা পাঁচশো টাকার চেক দিয়ে শিশুটিকে দেখে আর প্রসূতির সঙ্গে দেখা করে মিঃ সেন ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন বেলা তিনটে। টেলিফোন বেজে উঠতেই মোহিতবাবু রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, হ্যালো, সেন কথা বলছি।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ডাঃ সরকারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, মিস্টার সেন, আমি ডাক্তার সরকার। এই মাত্র আমাদের কনসালটেশন শেষ হল। কোনও কিনারা হল না কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে।

মিঃ সেন। অ্যাঁ, বলেন কি! এত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্তর, ছুরি কাঁটা, বায়োটিক্-অ্যান্টিবায়োটিক্—এ সব সত্ত্বেও আমার ছেলে বাঁচবে না?

ডাঃ সরকার। শুনুন মোহিতবাবু, আমরা একটা বিষয় স্থিরনিশ্চয়, বেবীর আশু কোনও বিপদ নেই। কাজেই ব্যস্ত হবেন না। এঁরা কিছু স্থির করতে না পারায় আমি মলয় ব্যানার্জীকেও কল দিয়েছিলাম।

মিঃ সেন। সে আবার কে?

ডাঃ সরকার। এ ভদ্রলোক নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনোবৈজ্ঞানিক। মনঃসমীক্ষণ করে মানসিক চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মিঃ সেন। কি বললেন তিনি?

ডাঃ সরকার। পেসেণ্ট খাচ্ছে না শুনে তিনি বললেন সীটিং দিতে হবে এক মাস। বললাম সীটিং দেবেন কাকে মশায়—সাতদিনের শিশু! শুনে লোকটা বলে উঠল, আচ্ছা, আমি কাল জানাব। মনে হয় সে আর এমুখো হবে না।

মিঃ সেন। তবে আর কিছু কি করবার নেই?

ডাঃ সরকার। আছে বইকি। আমরা ঠিক করেছি আপনি যখন অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত নন তখন বিদেশ থেকেই বিশেষজ্ঞ আনাব।

মিঃ সেন। আমি তো বলেইছি, যত টাকা লাগে পরোয়া নেই। আপনি যাকে ইচ্ছা বা যাদের ইচ্ছা ডাকুন। আমার এই প্রথম সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য আমি দু-এক লাখ টাকা খরচ করতে দ্বিধা করব না। শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব।

ডাঃ সরকার। ঠিক আছে। তাহলে আমি আজই যেখানে যেখানে কেবল্ পাঠাবার পাঠাচ্ছি। আপনাকে যথাসময়ে ডাকব।

মিঃ সেন। তাই হবে ডাক্তার সরকার। আপনার ওপর ভার দিলাম। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।

মোহিতবাবু রিসিভার রেখে দিয়েই পেছন ফিরে দেখলেন নামাবলি গায়ে, প্রকাণ্ড চৈতন-সম্বলিত এক পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রতুল দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্তিতে তাঁর মন ভরে গেল। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল?

পণ্ডিত বললেন, আজ্ঞে হয়েছে!

মোহিতবাবু। কী হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

পণ্ডিত। আজ্ঞে, মহাপুণ্য লগ্নে আপনার পুত্র জন্মেছেন। আপনার এই পুত্র—

মোহিতবাবু। অসুখটা কী তাই বলুন না আগে?

পণ্ডিত। আজ্ঞে, অসুখ কিছু নেই। থাকতে পারে না। দেবদেহে অসুখ আছে যে নাস্তিক বলবে সে হিন্দুকুলের কুলাঙ্গার।

মিঃ সেন। দেখ, তোমার দেবমাহাত্ম্য শোনবার আমার সময় নেই। ছেলে খাচ্ছে না কেন তাই বল।

পণ্ডিত। শুনুন সার্, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আঠারো নম্বর শিশুটি কন্যা সন্তান, আপনারটি পুত্র। কন্যাটি স্বয়ং প্রকৃতি—শ্রীরাধিকা, আপনার পুত্রটি শ্রীকৃষ্ণের অবতার—একেবারে সেই রাশি সেই লগ্ন সেই নক্ষত্র সেই রকম গ্রহসমাবেশে জন্ম। এতে আর ভুল নেই সার্, আপনার বংশ পবিত্র হল।

মিঃ সেন। বটে! আর তুমি বুঝি স্বয়ং কংস?

পণ্ডিত। আপনি কৌতুক করছেন সার্। কিন্তু আমি যা বললাম তাতে ভুল নেই।

মিঃ সেন। বুঝলাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি দেহ ধারণ করেই থাকেন তাঁকে খেতে হবে তো? না খেয়েই যদি মারা যান তবে বংশ উজ্জ্বল হবে কেমন করে?

পণ্ডিত। ও কিছু না সার্, এসব থাকবে না। সব সাময়িক লীলা মাত্র। এখন মানভঞ্জন চলেছে, অচিরে মিলন হবে। এর জন্যে অষ্টপ্রহর কীর্তন করতে হবে, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

মিঃ সেন ভীত ভাবে বললেন, তার মানে এই বাড়িতে আপনারা অষ্টপ্রহর চেঁচাবেন?

পণ্ডিত। এখানে না হলেও চলে।

মিঃ সেন। তবে? হাসপাতালে? তাও হবে না। সেখানে অবতারটি ছাড়া আরও সাধারণ রুগী আছে, তারা ভয় পেতে পারে।

পণ্ডিত। তা হাসপাতালেও না হোক—

মিঃ সেন। তবে? ব্যবস্থাটা কিসের—টাকার? বেশ, যা লাগে নিয়ে যান। যেখানে খুশী অষ্টপ্রহর কেন চৌষট্টি প্রহর চেঁচান। কাছাকাছি হলে দয়া করে মাইক লাগাবেন না। অত কৃষ্ণনাম আমার আবার সইবে না।

পণ্ডিত। আজ্ঞে ঠিক আছে, আপনার শ্রুতিপথের বাইরেই হবে।

মিঃ সেন। তা আর হবে না! টাকায় সব বিধানই তৈরী হয়। কত চাই?

পণ্ডিত। তা আজ্ঞে এই শ খানেক—

মোটে! এই নিন।—বলে মোহিতবাবু একটা একশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

প্রতুল মুখ ভেঙচে বলল, দূর ছ্যাঁচড়া। বাড়িয়ে বলতে পারলি না? জানিস অঢেল টাকা।

পণ্ডিত বলল, কি জানি বাবা, যেমন করে কথা কইছিল, ভাবলাম বেশী চাইলে যদি ফসকে যায়।

সর্বমঙ্গলা প্রসূতি-সদন আজ জমজমাট। শহরের গণ্যমান্য বিখ্যাত চিকিৎসক—বিশেষতঃ শিশুচিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ এসেছেন। আর এসেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশের বড় বড় পাঁচ ছজন চিকিৎসক ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ। শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসমূহের রিপোর্টারও এসেছেন খাতা পেনসিল হাতে। সঙ্গে তাঁদের সুসজ্জিত ক্যামেরাম্যান।

রাশিয়া থেকে এসেছেন সাইকো-অ্যানালিস্ট ডাঃ ক্রেস্টাকভ। শিশু-চিকিৎসা-বিশারদ ডাঃ আলেকজান্দার বিয়াকুভ আর নিউরলজিস্ট ডাঃ জেমেস্কি গরদভ। হার্লে স্ট্রীট থেকে এসেছেন ডাঃ সার জন স্টোন্‌হেড। নিউইয়র্ক থেকে এসেছেন ডাঃ চার্লস্ সিম্পলটন।

এ ছাড়াও ডাঃ সরকার পেনসিলভেনিয়া থেকে কেব্‌ল্ করে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ গুস্তাভ জে মার্টিনের এক শিষ্যকে আনিয়েছেন। তিনি তাঁর গুরুদেবের নব আবিষ্কৃত 'ডায়গোনেস্টিক কমপ্যুটার' নামক যন্ত্র সঙ্গে এনেছেন। এমন অদ্ভুত কেস আর এত বিখ্যাত ডাক্তারের সমাবেশ ভারতবর্ষে আর হয় নি। লোকের মুখে মুখে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় প্রসূতিসদনের বাইরে কৌতূহলী জনতা এত বেড়ে গেল যে ডাঃ সরকারকে টেলিফোন করে পুলিসের সাহায্য নিতে হল।

অপারেশন থিয়েটারটাই সবচেয়ে বড় এবং আলোকিত ঘর। সেখানে প্রসূতিকে ও শিশুটিকে আনা হল। বলা বাহুল্য, আঠারো নম্বর শিশুটিকেও সঙ্গে আনা হল, নইলে সতেরো চেঁচিয়ে অস্থির করবে।

সর্বদেশীয় চিকিৎসকবৃন্দ প্রথমে প্রসূতি ও শিশুর রক্ত পরীক্ষার ফল, ইউরিন ও স্টুল পরীক্ষার ফল, লাম্বার ফ্লুইডের কালচার রিপোর্ট, লাংসের স্কায়াগ্রাম ও কার্ডিওগ্রাম পরীক্ষা করে দেখলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া গেল না।

তখন সকলে মিলে প্রসূতি ও শিশুর চারদিকে ঘুরে ঘুরে কেউ নাড়ি দেখে কেউ পেট টিপে কেউ বা নানাবিধ

'স্কোপ' ব্যবহার করে বিচিত্র ও অত্যদ্ভুত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করলেন। ফল পূর্ব্ববৎ।

এর পর পরামর্শ সভা। সকলে মিলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সকলেই ইংরেজী জানেন, কাজেই সেই ভাষাতেই আলাপ হচ্ছিল। আমরা এখানে তার বাংলা তর্জমা দিলাম।

জার্মান ডাক্তার হের ডাঙ্কার বললেন, কেসটা অটোফেজি, মানে, স্বদেহ থেকেই খাদ্য শোষণের ব্যাপার বলা যেতে পারে।

রাশিয়ার আলেকজান্দার বিয়াকুভ বললেন, তাতে তো সবটা বোঝা যায় না। বাঁ দিকে ফিরে থাকবে কেন?

জেমেস্‌কি গরদভ বললেন, আর চোখই বা বাঁ দিকে বেঁকে যাবে কেন? আলো সহ্যই বা হবে না কেন? অক্ষিদেশের কোনও দোষ তো পাওয়া গেল না।

ডাঃ সরকার বললেন, কার্ডিওগ্রামে ধরা না গেলেও কার্ডিওমেলেশিয়ার প্রথম আক্রমণ বলা যায় কি?

হার্লে স্ট্রীটের ডাঃ স্টোনহেড বললেন, উঁহু, তা হলে বাঁ দিকে ফিরতে পারত না; ডান দিকেই ফিরে থাকত।

ডাঃ জেমেসকি গরদভ বললেন, এটাকে সিম্প্যাথিও নিউরাইটিসের একটা বিকৃত অবস্থা বলা যেতে পারে।

নিউইয়র্কের ডাঃ চার্লস সিম্পলটন বললেন, আমরা অন্য সিমটমগুলো ভুলে যাচ্ছি। পাশের বেবীটির সঙ্গে কি সম্পর্ক তাও দেখতে হবে। পাশের বেবীটি হচ্ছে মেয়ে। কাজেই আমি এটাকে বরং ইনফ্যান্টাইল ইনস্টিংটিভ ইরোটোম্যানিয়ার কেস বলব।

ডাঃ সরকার। বলেন কি! তা হলে তো আমাদের জন্মান্তরবাদ মানতে হয়।

ডাক্তার ক্রেস্টাকভ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি বললেন, জন্মান্তর? ওসব কিছু না। কেসটা কমরেড ডাক্তার জেমেসকি গরদভের আওতায় পড়েছে। উনি প্রসূতির সঙ্গে কদিন সীটিং দিলেই কারণটা জানতে পারা যাবে।

ডাঃ সরকার। তা হলে ডাক্তার সিম্পলটনের ডায়োগনোসিসই আপনারা মানছেন? কেসটা ইরোটোম্যানিয়ারই?

আলেকজান্দার বিয়াকুভ বললেন, উঁহু, আমেরিকার কোনও মতামত মানতে আমরা রাজী নই। এখানে রেড চায়নার কোনও ডাক্তার নেই?

ডাঃ সরকার বললেন, দুঃখের বিষয় ওখানে কে স্পেশালিস্ট আছেন জানতাম না বলে ডাকা হয় নি।

আলেকজাণ্ডার বিয়াকুভ বললেন, খুব ভুল করেছেন। একজনের—বিশেষ করে আমেরিকার একজনের মতে তো কিছু হবে না।

ডাঃ স্টোনহেড বললেন, কিন্তু আমারও মনে হয় ডাক্তার সিম্পলটন ঠিকই ধরেছেন, কেসটা ইরোটোম্যানিয়ারই।

ডাঃ ক্রেস্টাকভ বিরক্ত মুখে বললেন, এখানে এখনও আপনারা সেই ধনতন্ত্রের জোটই পাকাবার চেষ্টায় আছেন। তা হবে না, এ সব ম্যানিয়া ট্যানিয়ার কোনও মূল্য স্টেট-ম্যানেজমেণ্টের যুগে নেই।

ডাঃ হের ডাঙ্কার বললেন, কমরেড ডাক্তার ক্রেস্টাকভ, ভুলে যাচ্ছেন এটা ভারতবর্ষ। এখানে স্টেট আর ইণ্ডিভিডুয়াল, সাম্যবাদ আর ধনতন্ত্রবাদ চমৎকার তাল রেখে বলড্যান্স করে চলেছে। এখানে এ রোগ আশ্চর্য নয়। তবু ডাক্তার সিম্পলটনের কথা মেনে নেওয়ার আগে আরও পরীক্ষা করা দরকার।

ডাঃ সরকার বললেন, তা হলে আসুন, আমরা ডাক্তার মার্টিনের যন্ত্র ডায়াগোনেষ্টিক কমপ্যুটারের সাহায্য নিই। এখানে তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র যন্ত্রটি নিয়ে উপস্থিত আছেন।

এই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপূত হল। তখন একটা কার্ডে সমস্ত লক্ষণগুলো লিখে সেটা পাঞ্চ করে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। মাপবার যন্ত্রে পয়সা ফেললে যেমন একটা ঘড়ঘড় শব্দ হয় তেমনি একটানা একটা শব্দ হতে লাগল। যন্ত্রটির ম্যাজিক-আইতে নানা বর্ণের আলো জলতে আর নিভতে লাগল। প্রায় পনের ষোল মিনিট পরে কার্ডটা চিত্রিত হয়ে বেরিয়ে এল। একটা তীর চিহ্ন নানা পথ ঘুরে এক জায়গায় এসে থেমেছে। সেখানে লেখা ইন্‌ফ্যান্টাইল লাইপেম্যানিয়া, তার ঠিক উপরে লেখা, লাইপোথাইমিয়া, তারও উপরে ইরোটোম্যানিয়া।

ডাঃ সিম্পলটন বিজয়গর্বে বলে উঠলেন, লুক! লুক হিয়ার।

আলেকজান্দার বিয়াকুভ বললেন, হোয়াট লুক? ইরোটোম্যানিয়া নয়, তার বহু নীচে তার চিহ্ন থেমে গেছে। কেসটা লাইপেম্যানিয়া। আপনার ভুল হয়েছে।

ডাঃ সিম্পলটন চটে গিয়ে বললেন, আপনারা ওর ধারে কাছেও যান নি; বেশী বড়াই করবেন না।

ডাঃ ক্রেস্টাকভ বললেন, বড়ই আপত্তিকর কথা। ডাক্তার সিম্পলটন কি কথাটা প্রত্যাহার করবেন?

ডাঃ সিম্পলটন বললেন, আমরা কথা, কাজ, কিছু প্রত্যাহার করি না।—বিরক্ত মুখে এই কথা বলে তিনি সদর্পে বেরিয়ে গেলেন।

ডাঃ জেমেসকি গরদভ বললেন, ঠিক আছে, নরকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আর একটু হলেই বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়ে যেত। কোনও রকমে সেটা রক্ষা হয়ে গেল। ভাগ্যে ডাঃ সিম্পলটন চলে গিয়েছিলেন!

ডাঃ সরকার বললেন, ডাক্তার গরদভ, এবার তো আপনারই কাজ। এর কারণটা সীটিং দিয়ে যদি ধরে না দেন তা হলে চলবে না।

ডাঃ গরদভ বললেন, আমার এক সপ্তাহ সময় লাগবে। আর একজন দোভাষী লাগবে, প্রসূতির সঙ্গে সীটিং দিতে হবে। আমার ফী জানেন তো?

ডাঃ সরকার বললেন, জানবার দরকার হবে না, আপনার ফী যতই হোক আপনি পাবেন। আমি ইতিমধ্যে অন্য যাঁরা এসেছেন তাঁদের ফী আর যাতায়াত-খরচ মিটিয়ে দিয়ে আসছি।

ডাঃ সরকার বেরিয়ে গেলে, ডাঃ গরদভ ডাঃ বিয়াকুভকে বললেন, বাই হ্যামার। এদের এখনও এক একজনের কত টাকা দেখ।

সাত দিন পরে। ডাঃ সরকার ডাঃ গরদভ ও ডাঃ বিয়াকুভকে বিদায় করে সম্পূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে মোহিত-বাবুকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

লাইপেম্যানিয়া মানে অস্বাভাবিক মানসিক অবসন্নতা আর বিমর্ষতা! এই হল বাচ্চাটির অসুখ। এই সঙ্গে লাইপোথাইমিয়া আর ইরোটোম্যানিয়াও আছে। অর্থাৎ ভীষণ বেদনানুভূতি আর অস্বাভাবিক প্রেমাবেশ।

মোহিতবাবু বলে উঠলেন, সে কি মশায়? এক মাস হল না বাচ্চার বয়েস, এর মধ্যে বিরহবেদনা প্রেমাবেশ! এতগুলো টাকা খরচ করে আপনি এক পাল পাগলের আমদানি করেছিলেন?

ডাঃ সরকার স্মিত মুখে বললেন, উত্তেজিত হবেন না মোহিতবাবু। এঁরা সবাই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আন্তর্জাতিক যশ এঁদের বিজ্ঞানে আর চিকিৎসাক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আপনার সন্তানের রোগ নির্ণয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ভুল হবার অবকাশ নেই। ভুল যে হয় নি, শেষ পর্যন্ত ডাঃ জেমেস্কি গরদভ সেটা সম্পূর্ণ প্রমাণ করে গেছেন।

মোহিতবাবু অবসন্নভাবে বললেন, কি প্রমাণ বলুন!

ডাঃ সরকার। বলছি শুনুন, আপনার বেবীটির জন্মই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে হয়েছে। জরায়ুর বাইরে গর্ভাধান হয়েছে, অর্থাৎ যাকে বলে, এক্স্ট্রা ইউটেরাইন প্রেগ্‌নেন্সি। ওর মাতৃদেহে গর্ভাধানের অনেক পূর্ব থেকেই একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই ব্যাধিটা কন্‌জেনিট্যাল, যাকে বলে সহানুবর্তী। গর্ভাধানের বহু পূর্ব থেকেই প্রসূতি মিউজিকোম্যানিয়ায় ভুগছিলেন!

মোহিতবাবু। সে কি মশায়! আমি তো উমার কোনও অসুখ-বিসুখের খবর জানি না। ওটা আবার কি জিনিস?

ডাঃ সরকার। আপনি তো শিল্পপতি মানুষ। বহু কর্মে সারা দিন ব্যাপৃত থাকতেন। ইনি একা একা সারাদিন থাকতেন বলে সময় কাটানোর জন্যে কেবলই গান শুনতেন! গান শুনতে শুনতে এই অস্বাস্থ্যকর সঙ্গীতপ্রীতি ওঁর জন্মে গেছে। আমরা সীটিংয়ের সময় ওঁর মুখে শুনে শেষে আপনার বাড়ীতে লোক লাগিয়ে খোঁজ করে দেখলাম এ সব গানই আধুনিক বাংলা গান। মানে শতকরা নিরানব্বুইটাই হয় ব্যর্থ প্রেম, নয় বিরহ, নয় প্রেম-মিলনের গান। তার ভাষা, উচ্চারণ আর সুর যেন ব্যথায় উহু, উহু করছে। কোনও কোনওটার সুরে এমন একঘেয়ে দোলা রয়েছে যে মনে হয় যেন কেউ প্যান্ প্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে! এই সব শুনতে শুনতে ওঁর মিউজিকোম্যানিয়া হয়। আমাদের দেশে

শব্দকে ব্রহ্ম বলে জানেন তো? এই শব্দের অসীম শক্তি। ওরাও ও দেশে স্বীকার করে যে এই শব্দ ক্রমাগত একই তরঙ্গে আঘাত করে করে ভয়াবহ ব্যাধি সৃষ্টি করে। ডাক্তার জেমেস্কি গরদভ্ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সীটিং দিয়ে জানতে পেরেছেন উনি তিন বৎসর ধরে ক্রমাগত রেডিওতে বাংলা আধুনিক গান শুনেছেন। আপনার একটা গ্রামোফোনও আছে, এবং আপনার স্ত্রী বহু রেকর্ড ক্রয় করেছেন, তার মধ্যে শতকরা নিরানব্বইটা আধুনিক গানের। গানের বিষয়বস্তু একটিই; প্রেম বিরহ ব্যথা হাহাকার চাঁদের আলো বৃষ্টির রাত ইত্যাদি।

মোহিতবাবু অস্থির হয়ে বললেন, কী সর্বনাশ! এই নাকি আধুনিক গানের একমাত্র বিষয়বস্তু? আমার তো মশাই শুনেই মিউজিকোম্যানিয়া হবার জোগাড় হয়েছে। এদের কি আর কোনও আইডিয়া মাথায় আসে না?

ডাঃ সরকার। শুনিনা তো! আজকাল মার্গ সঙ্গীত রবীন্দ্র সঙ্গীত বা অন্য সব গানের চেয়ে এই গানই রেডিওতে চলে বেশী আর সিনেমায়। যে কোন সিনেমা পত্রিকার একটা খুললেই এর দু তিন ডজন নমুনা পাবেন। কে একবার একটা 'বন্‌বন্ ঘূর্ণি' না ওই রকম কি গেয়েছিলেন আর কে যেন গেয়েছিলেন উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার গান। আর তো মশায় যা শুনি সবই ওই পিরিতি বলিয়া এ তিন আখরের গান!

মোহিতবাবু। আশ্চর্য! পেটে নেই ভাত, কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জায়গায় ভিন্ন প্রদেশের লাথি খাচ্ছে, সব হজম করে এই সব বেলেল্লাপনার গান গায় কি করে মশাই? লজ্জা করে না, ঘেন্না-পিত্তি নেই, বাঙলা দেশে কবির এতই আকাল হয়েছে?

ডাঃ সরকার। আপনি বলছেন আকাল? এরা এই গৌরবে হিল্লি দিল্লী মাত করছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিতা আর গানের জয়জয়কারে ভারত মুখর। এরা সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মশায়। গানে গানে ফুল থেকে কাঁঠাল ফলাচ্ছেন, এঁচোড় হবারও ফুরসৎ নেই। একি সোজা ক্ষমতা মশাই? অন্য প্রদেশের লোকেরাও বাহবা দিচ্ছে, ভাবছে অর্ধেক দেশ তো উদ্বাস্তু, বাকি অর্ধেক মরুক এই পিরিতির আফিং খেয়ে। আমরা একটু এগিয়ে নিই।

মোহিতবাবু। চুলোয় যাক, এখন আমার বাচ্চাটা বাঁচবে কি?

ডাঃ সরকার। বাঁচবে বই কি। এসব রোগের 'প্রোগনসিস' ভাল—মৃত্যু নেই। এরা রকে বসে ধুলো খেয়ে বাঁচে। ওই দু ফোঁটা মধু না দিলেও বাঁচবে। তবে বেশ কিছু দিন লাগবে এই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি সারাতে। একটা গ্রামোফোনে বহু দূর থেকে বাছা বাছা গান শোনাতে হবে।

মোহিতবাবু। আবার গান?

ডাঃ সরকার। হ্যাঁ মিউজিকোম্যানিয়ার ওষুধ মিউজিকো থেরাপী। কতকটা হোমিওপ্যাথির সিমিলিয়া সিমিলিবাসের থিওরী, তাও বেবী বলে। বড় কেউ হলে গোটা কতক চারশো কুড়ি ভোল্টের শক্ দিলেই সেরে যেত। ভাবছি ওষুধের ব্যাপারে একজন ভাল হোমিওপ্যাথের সাহায্য নেব। ক্রনিক অসুখে ওরাই ভাল। আমি যত দূর জানি সঙ্গীতে যাদের অসুস্থতা বাড়ে তাদের ওঁরা থুজা দেন, যাদের কমে তাদের দেন ট্যারেন্টুলা। এরটা কিসে বাড়ে কমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তার পর কিছু দিন ধরে বিদেশী যুদ্ধের বাজনা, ডি. এল. রায়ের গান, নজরুলের গান, মুকুন্দদাসের গান এই সব শোনাতে হবে। আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবে, ভাববেন না।

মোহিতবাবু। যা ভাল হয় করুন মশায়, আর ভাবতে পারি না। আমি ছেলে চেয়েছি, ছেলেই চাই। রকবাজ এক শিখণ্ডী নিয়ে কি করব? দরকার হয় 'শক্'ই দেবেন।

ডাঃ সরকার। দেখি, যা হয় করব।

মোহিতবাবু উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরেই সোজা দোতলায় চলে গেলেন। স্ত্রী পুত্রের জন্য চিন্তিত আছেন মনে করে ওঁর উত্তেজনায় কেউ অস্বাভাবিক কিছু দেখল না। হঠাৎ ওঁর ঘর থেকে দুম্ করে এক পিস্তলের আওয়াজ এল। সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। ছেলেটা কি মারা গেছে? ভদ্রলোক ছেলের শোকে শেষে আত্মহত্যা করলেন নাকি? এই সব ভাবতে ভাবতে হন্তদন্ত হয়ে সবাই উপরে উঠে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখলেন, টেবিলের ওপর ধূমায়মান পিস্তল। রেডিওগ্রামটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, আর মোহিতবাবু পাগলের মত রেকর্ডগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙছেন।

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

দ্বিতীয় পর্ব

অভিনিষ্ক্রমণ

তাপসের স্টুডিয়োর কুশলীরা কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলে শট্ নিতে গেছে। কোথাও একটুকরো বেড়া তুলবে, কোথাও গাছের কয়েকটা শাখা, কোথাও হাটের ভিড়, কোথাও পারঘাটের খেয়া। আমেদ কয়েকটা দিনের অবসর পেয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে সুরের সন্ধানে।

কুশলীরা যদি আমেদের গ্রামে যেত তা হলে দেখতে পেত, এই দুপুরে সেখানকার গাছের পাতা এমন ঝকমক করে যে মনে হবে মাটির অভ্র সবুজ হয়ে গাছের পাতায় পরিণত হয়ে গেছে। এই ঝলক অনেক সময় আমেদের মনে সুরের চমক দিয়েছে। একটা কাঠের দোকানের সামনে করাতিরা করাত দিয়ে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি চিরছিল। আমেদ দাঁড়িয়ে দেখল, কিন্তু ওই শব্দপ্রবাহ তার মনে কোনও সুরের রেশ জাগাল না। রাস্তার অপর প্রান্তে একটা রেস্তোরাঁয় পাসিলেন ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনে আমেদ চমকে উঠল। মনের মধ্যে একটা সুরের ঝলক উঠল, কিন্তু সেই ঝলকটা কোনও আকার নিল না। রেস্তোরাঁর দিকে আনমনে এগিয়ে গেল। পিচঢালা পথের ওপর দুপুরের রোদ ঝক্‌ঝক্ করে উঠে চোখে আঘাত দিল। এই তীরের মত প্রতিফলিত রোদ্দুরের কোনও সুর আছে কি? সকলেরই সুর আছে। কিন্তু সে সুর সব সময় ধরা দেয় না। চিত্ত দিয়ে কোনও বস্তুকে আলিঙ্গন করলে তবেই তার অন্তর্নিহিত সুরটা মনে সঞ্চারিত হয়। মন কিন্তু সব সময় সব বস্তুকে আলিঙ্গন করতে চায় না।

রেস্তোরাঁর দিকে চেয়ে দেখল স্বচ্ছ কাঁচের দেওয়ালের ওধারে সুবেশ ভদ্রলোকেরা টেবিলে টেবিলে আহারে বসেছেন। আমেদের মনে হল তারও কিছু আহারের প্রয়োজন। রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে দেখল বাঁ ধারে একটা টেবিলের নীচে থেকে হোটেলের একজন বয় ভাঙা পসিলেন প্লেটের গুঁড়ো কুড়িয়ে তুলছে আর একটা পসিলেন প্লেটে; আর, সেই টেবিলে উপবিষ্ট ভদ্রলোক আচ্ছন্নের মত ভাঙা প্লেটের টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছেন।

আমেদ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ভদ্রলোককে দেখে নিল। এঁর মধ্যে কী একটা রয়েছে, কী একটা নেই। আশেপাশের মানুষগুলির দিকে চেয়ে দেখল। কারুর দুই ভ্রূর মধ্যে যূপচিহ্নের মত ভাঁজ পড়েছে, কারও নীচের ঠোঁট যেন স্থায়ী জুগুপ্সায় বাইরে ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে, কেউ এক বিশেষ ধরনের আবিষ্ট ভাবে চোখ দুটো ভরিয়ে রেখেছে। কেউ মাথার চুল রুক্ষ রেখে ঠিক পাখার নীচেই বসেছে আর উড়ন্ত চুলের উপদ্রব নিবারণ করতে যেন হিমশিম খাচ্ছে; যে হাতে কেশ শাসন করছে সেই হাতের কব্জিতে দামী ঘড়ির সোনার ব্যাণ্ড ঝকমক করছে। কেউ আহারের অপেক্ষায় প্রজাপতি-পাখনার মত রঙ-বেরঙের টাইটা ঠোঁটের কোণে ধরে ঈষৎ চাপ দিচ্ছে ঠোঁটে; ঠোঁট সম্বন্ধে অতিরিক্ত সজ্ঞান; ঠোঁট-দুটোও চমৎকার—পৌরাণিক ধনুকের চাপের মত সুঠাম। কেউ মিছিমিছি হাসছে, সুন্দর দাঁতগুলোকে সমবেত সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে। কেউ উদাস দৃষ্টিতে দেওয়ালের ফ্রেস্কোর দিকে চেয়ে রয়েছে, যেন সেই ফ্রেস্কোর সবুজ লতাফুল আর ময়ূরপুচ্ছের রঙিন অরণ্যে হারিয়ে গেছে। আমেদের মনে হল এরা সবাই প্রত্যেকে এক একটা ভান

নিয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মধ্যে কোনও ভান খুঁজে পেল না সে। শিশুর মত ভানলেশহীন। ওদের চোখে কোনও বিস্ময় নেই, এরা যেন সব জেনে ফেলেছে, সব দেখে ফেলেছে। কিন্তু এঁর চোখভরা বিস্ময়। ওদের প্রত্যেকের চারদিকে অদৃশ্য একটা করে বেড়া রয়েছে, এর চারদিকে কোনও বেড়া নেই। সহসা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমেদের চোখাচোখি হল। আর, আমেদ তাঁর সামনের শূন্য চেয়ারটিতে বসে পড়ল।

ভদ্রলোক আমেদকে লক্ষ্য করে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনি এমন ভাবে বসলেন যেন আপনার সামনে এই চেয়ারটা খালি!

বলে হাসলেন। এ রকম হাসি আমেদ যেন কোথাও কোন ছবিতে দেখেছিল। আমেদ হেসে প্রত্যুত্তর দিল, এই ব্যবধানটা রাখাই যে আজকের সভ্যতার লক্ষণ!

না, অসভ্যতা! এত কাছে বসে এই দূরত্বের কল্পনা অন্যায়, অসামাজিক।

বরেন কোনদিনও এই রেস্তোরাঁয় আসেন না। ল্যাবরেটরিতে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায় মৃণাল। আজও মৃণাল হাসপাতালে ডিউটিতে যাবার পথে ল্যাবরেটরিতে তাঁর দুপুরের খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছে। তবু বরেন আজ দুপুরে মানুষের এই ভিড়ে নেমে এসেছেন। সব মানুষের থেকে তাঁর দূরত্বটা ঘুচিয়ে ফেলতে হবে। গত কয়েক দিন ধরে তাঁর কেবলই মনে হয়েছে সুস্মিতার কাছে তিনি পৌঁছতে পারেন নি কারণ সম্ভবতঃ তাঁর মন পাশের মানুষের মনের খোঁজ পায় না। মনে হয়েছে মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে মনের এই ক্ষমতাটা জন্মাবে। হয়তো নিজের অজ্ঞাতে গোপনে মনের মধ্যে অভীপ্সা জেগেছে মনের মানুষকে আবার এই জনারণ্য থেকে খুঁজে বের করতে। অবচেতন মন বুঝি বুঝেছে সুস্মিতা এই মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

শিশুর মত অবুঝ মন না হলে এ ধারণা তাঁর অবচেতন মনেও স্থান পেত না। তা না হলে এই একরাশ ছাইয়ের ভিতর থেকে হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট হীরেটাকে কেউ খুঁজে বেড়ায়! তাঁর সজ্ঞান-মনে মনে হয়েছে তিনি মানুষের থেকে বহু দূরে। এ দূরত্ব ঘোচাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাই হঠাৎ খেয়ালের মাথায় এই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছেন। ঢুকে প্রথমেই অন্যমনস্কতায় একখানা দামী প্লেট ভেঙে ফেলেছেন। আশেপাশের লোক বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করেছে কেউ কেউ, কেউ কেউ মুচকে হেসেছে। তিনি কিন্তু এই ভ্রূকুটি আর হাসির মধ্যে মানুষ খুঁজেছেন। এ সব শুনলে মৃণাল হাসবে। তা হাসুক—এ ছাড়া আর কি পথ আছে?

বরেন আমেদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন, তা ছাড়া, আপনার থেকে আমার ব্যবধান নেই।

আমেদ প্রশ্ন করে, এক মুহূর্তের দেখায় কি করে বুঝলেন?

বরেন আচ্ছন্নের মত আপন মনে বলে চলেন, আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারি না, কেউ কারও ওপর ভরসা করতে পারি না, সবাই নিজেকে আড়াল করে রয়েছি। হয়তো সমাজের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে গিয়ে, হয়তো সমাজে নিজেদের জন্যে একটা স্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা নিজেদের আড়াল করে ফেলি।

কিন্তু এই সামাজিক জীবন ছাড়াও জীবন আছে মানুষের।

বয় এসে এক পট কফি দিয়ে গেল। আমেদের জন্যে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলে চললেন বরেন, এই সামাজিক জীবন ছাড়াও জীবন আছে মানুষের। সকল মানুষের একটাই জীবন—যে জীবন আমরা সবাই একসঙ্গে বাঁচছি। তাই যে তত্ত্ব আমি আবিষ্কার করি সেই তত্ত্ব অন্য বৈজ্ঞানিকও বুঝতে পারেন। এক সুরকার যে সুর রচনা করেন অন্যে তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তার মানে, আমরা সবাই একই জীবন বাঁচছি।

কাপে কফি ছাপিয়ে গেল। আমেদ পটটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিল। বরেন হাত দুটো কোলের ওপর গুটিয়ে আগের মতই আচ্ছন্ন হয়ে বলে চললেন, আমরা আলাদা হয়েছি ইতিহাসে। সামাজিক ইতিহাসে, ব্যক্তিগত ইতিহাসে। পুরনো গাছের চারদিকে যেমন বাকল জন্মায় তেমনি মানুষকে ঘিরে কঠিন হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত ইতিহাসের বাকল। আমি সেই চোখ চাইছি, যে চোখের দেখায় এই ইতিহাসের আড়ালটা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। একদিন না একদিন এই

দৃষ্টিটা ফুটবে। আমার মনে হয় সবাইকে আমি দেখেছি, কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও। সবাই আমার চেনা।

নিমেষের জন্য নির্বাক হয়ে বরেন আমেদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো শিল্পী? আমি আপনাকেও দেখেছি। মনে হচ্ছে খুব —খুব চেনা।

বলে নিজের পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে একটুকরো কাগজে নিজের ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বললেন: একদিন আসুন। আপনাকে ভালভাবে চিনব —আরও ঘনিষ্ঠ-ভাবে!

আমেদ কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমি শিল্পী —এ আপনি কি করে বুঝলেন?

বরেন বললেন, কী জানি কী করে বললাম! এমনি হঠাৎ মনে হল।

বরেন অনুভব করলেন মনের মধ্যে কী একটা ঘটে গেছে। যেন একটা নতুন ইন্দ্রিয় কাজ করছে। এটাকে তিনি চেনেন না, এর সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাঁর সমস্ত অর্জিত বিদ্যা দিয়েও এর বর্ণনা করতে পারছেন না। অন্তরের গভীরে কী একটা উন্মীলিত হয়ে গেছে। এতক্ষণ পদার্থবিদ্যার সূত্র দিয়ে মনের সঙ্গে মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছিলেন, চেষ্টা করছিলেন এই বস্তুজগৎ আর মনোজগৎকে একটা অখিলের মধ্যে নিয়ে আসতে কিন্তু সহসা বুঝলেন এই চেনা ইন্দ্রিয়গুলো ছাড়াও ইন্দ্রিয় আছে মানুষের চেতনার। নিজেই বিস্ময়ে মূক হয়ে রইলেন কয়েক নিমেষের জন্যে। নিজের মধ্যে এই নতুন জন্মটাকে আড়াল করে চাইলেন। আর কোন কথা না বলে উঠলেন, কাফটা টেবিলে পড়ে রইল। হয়তো ভুলে গেছেন। দরজার কাছে কাউণ্টারে দাম মিটিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লেন পথে। একবার খররৌদ্রে যেন চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর আবার চলতে আরম্ভ করলেন। আমেদও তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল এই রহস্যময় মানুষটি কোথায় যান তাই দেখতে। তার মনে হল এই কলকাতা শহরটা অলীক, এই দুপুরটাও অলীক, আর এই মানুষের আবির্ভাবটাও অলীক।

আমেদের মনে হল ওই মানুষটি কাঁধে করে রৌদ্র বয়ে নিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ চোখে পড়ল বড় রাস্তার ওপর একটা চওড়া গলির মুখে একজন সুন্দরী সুবেশা ইউরোপীয়ান তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বড় বাড়ির ছায়ায়। বরেন তার সামনে যেতে তাঁকে ডেকে তরুণী একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে। ওদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। তারপর ওই রহস্যের মানুষটি তরুণীটির সঙ্গে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমেদ চিৎকার করে বলতে চাইল, ফিরে আসুন, ফিরে আসুন। যাবেন না, ফিরে আসুন।

আমেদ জানে ওই গলিটার মধ্যে ইউরোপীয় বারবনিতাদের বাস। ওই মানুষটা, এই রেস্তোরাঁ, ওই তরুণী আর ওই গলি সব মিলিয়ে একটা অর্থহীন অসামঞ্জস্য। অসহায় বেদনায় বেহালার জন্যে তার মন অস্থির হয়ে উঠল। আর একবার প্রায়-নির্জন দুপুরের পথের দিকে চেয়ে দেখল। মনে হল এই পথের ওপর অসংখ্য আলোর তারে কি একটা সুর বাজছে। তার ঝঙ্কারে তারগুলো কাঁপছে। পকেট থেকে নোটবইখানা বের করে একটা সুরের নোটেশন লিখে নিল তাড়াতাড়ি।

২

এই একই দুপুরে স্বচ্ছতোয়া কালিন্দী নদীর ওপর পালে রৌদ্র বয়ে একখানা ভাওয়ালিয়া মন্থর গতিতে পশ্চিমে চলেছে। নদীটা রূপনারায়ণ, স্থানীয় লোকেরা নদীর এ অংশকে কালিন্দী বলে। এখন শীতকাল, তবু এর জলের ভার কমে নি। যৌবনের কূলনাশিনীর রূপ নেই; এখন এ নদী প্রৌঢ়া; কূলের শাসন মেনে মন্থর-গতিতে লক্ষ্যের দিকে বয়ে চলেছে। জলে আর কলঙ্কের লেশ নেই; জল একেবারে স্বচ্ছ —প্রৌঢ়া গৃহিণীর আচরণের মত। কালো হাঁসের ঝাঁকের মত অজস্র ভাওয়ালিয়া বয়ে চলেছে দক্ষিণে। কিন্তু এই ভাওয়ালিয়াটা নদীর দাক্ষিণ্যের বিরুদ্ধে চলেছে —উত্তরে পশ্চিমে। উত্তুরে হাওয়া তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, কিন্তু তা অত্যন্ত ধীরে।

ভাওয়ালিয়া অল্প জলের চওড়া খোলওয়ালা ঢাকা নৌকো। পাটাতনের ওপর কাঠের তৈরি একটা নীচু কামরা। এই কামরার সামনে দরজা, আর তিন দিকে

কাঠের পাল্লা দেওয়া ছোট ছোট জানলা। এই জানলাগুলো দিয়ে হাত বাড়িয়ে জল ছোঁওয়া যায়।

এই ভাওয়ালিয়ার একটা জানলা দিয়ে একখানা কঙ্কনপরা সুন্দর হাত জলে নাড়া দিচ্ছে বারবার। কামরার পুবে পাটাতনের ওপর যে ছায়াটা পড়েছে সেই ছায়ায় মুণ্ডিতমস্তক এক প্রৌঢ় গেরুয়া পরে জলের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর সামনে হাল ধরে বসে রয়েছে এক মাঝি। মৃদু সুরে ভাটিয়ালি গাইছে। কাশের বন, ঘর, বন্ধু—এইসব কথা মিলিয়ে একটা অতিপ্রচলিত গান।

ভাওয়ালিয়ার কামরার মধ্যে বসে সুস্মিতা জল দেখছে। দুপুরের রোদে ঝকঝক করতে করতে জল চলেছে। সে কাশের বনও দেখছে না, ঘরও দেখছে না। আর বন্ধু? বন্ধু কোথাও নেই। তার মনে হচ্ছে কে যেন খুব কাছে গা ঘেঁষে বসে রয়েছে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য। সে বন্ধু নয়, সে অদৃষ্ট। ব্যর্থ জীবনের প্রভাতে দুপুরে সন্ধ্যায় সব সময় তাকে পাশে টের পাওয়া যায়। নৌকো উজিয়ে চললেও জলের দিকে চেয়ে সুস্মিতার মনে হচ্ছে, দুর্বোধ্য ইঙ্গিতে ঝকঝক করতে করতে এই জল তাকে হুহু করে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই বুঝি নিম্নমধ্যবিত্তের অদৃষ্ট। যেখানেই সে থাক্, একদিন না একদিন এই অদৃষ্ট তাকে টেনে তার নিজের জায়গায় নামিয়ে আনবেই। সুস্মিতা যেখানে যে পরিবেশে জন্মেছিল আবার সেখানেই এই অদৃষ্ট তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে সে একটা নিদারুণ ভবিষ্যের দিকে নেমে চলেছে।

উচ্চশ্রেণীর বরেন তাকে বুঝল না। তাপস তাকে শুধু নষ্ট করতে চাইল। গোটা কৈশোর আর যৌবন ধরে যে রাজপুত্রের স্বপ্ন সে দেখেছিল সেই রাজপুত্র জীবনে এসেছিল তার। মানুষের চেহারা নিয়েই এসেছিল। কিন্তু সে তাকে চিনতে চাইল না। বরেন তার কাছে স্বপ্ন হয়ে থেকে গেল।

এই দুপুরের অদৃশ্য স্রোতের পাশে বরেনের স্বপ্নছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে। তাই, আজ সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনে ছেদ টানতে পারছে না। পারবে কেন? নিম্ন-মধ্যবিত্তদের যে মেয়েদের সে চেনে, যাদের সঙ্গে সে স্কুল কলেজে পড়েছে, তাদের কেউ ষাট-সত্তর টাকার শিক্ষিকা হয়েছে, কিংবা পঞ্চান্ন টাকার সরকারী কারণিকা কিংবা কারণিক স্বামীর করুণাহীন ঘরণী। তার অদৃষ্টই বা অন্যরকম হবে কেন?

তবু মনে হয় অদৃষ্ট তাকে অন্য পাঁচজনের থেকে বেছে নিয়েছে। তা না হলে চিত্তের মৃত্তিকায় অনুভবের এত ফসল দিয়েছে কেন? তা না হলে মনে এত বাণী দিয়েছে কেন? দূরের প্রতি এত মোহ দিয়েছে কেন? দুর্নিরীক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে কেন? এই ভালবাসা দিয়েছে কেন? যে ভালবাসা থেকে তার মুক্তি নেই, যা তার সমস্ত সুখের সমস্ত দুঃখের মূলে বাসা বেঁধেছে। অন্তরের মধ্যে কেন আয়োজন করেছে অনুভবের রাজসূয় যজ্ঞের?

উচ্চশ্রেণীর আর একজন তাপস—দৈত্যের মত তার আত্মাকে সর্বস্বান্ত করতে চেয়েছিল। এরা, এই তাপসের দল, নিম্নমধ্যবিত্তের মেয়েকে বিবাহের গণ্ডীর বাইরে রক্ষিতা রাখে কিংবা বিবাহের গণ্ডীর ভিতরে নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সামনে কাকতাড়ুয়ার মত ধরে রাখে সমাজের কাকদের কর্কশ সমালোচনা রুখতে। নিম্নমধ্যবিত্ত পুরুষেরা বেচে শ্রম দেহের ও মনের উভয়ের। অতি অল্পমূল্যে বেচে। তেমনই এদের মেয়েরা যখন সরাসরি দেহ বেচে না, তখনও হাসি বেচে, চটুলতা বেচে, মিষ্টিকথা বেচে, আত্মা বেচে। আত্মা কচিৎ তাদের উপলব্ধির সীমার মধ্যে আসে। এদের জীবন দেহ আর মনের স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। আত্মার স্তর পর্যন্ত জীবন উচ্ছ্রিত হয় না। কিন্তু সে তার আত্মার দেখা পেয়েছে। জলন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে চেতনার মধ্যে এই রৌদ্রের মতন। জানলা দিয়ে দেখে রৌদ্র ঝকমক করতে করতে সমুদ্রে চলেছে। তার আত্মাও ঝকমক করতে করতে কোন্ সমুদ্রে চলেছে, কে জানে! এই রৌদ্রের প্রখর স্পর্শে চোখে জল টলমল করে উঠেছে।

বাইরে পাটাতনে বসে শীলভদ্র উজান বেয়ে চলেছেন গত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার প্রবাহের উজানে চলেছেন মনে মনে।

দীর্ঘকাল ধরে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শীলভদ্র কঠিন বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছিলেন—পাষাণ-প্রাচীরে ঘের হ্রদের মত। সেদিন সন্ধ্যায় কোন দুষ্টগ্রহের আকর্ষণে

প্রবৃত্তির সেই অবরুদ্ধ হ্রদে জলোচ্ছ্বাস উঠে এই বাঁধটাকে জীর্ণ করল। সেদিনের পর থেকে শীলভদ্র অসীম চেষ্টায় প্রতিরোধ প্রাচীরকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে লাগলেন।

সেই সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী প্রত্যূষ পর্যন্ত চেতনা ফসফরাসের মত ক্রমাগত জ্বলে ছিল। এই রাতটার স্মৃতি মনের মধ্যে এখনও উত্তপ্ত কালো পিচের মত চিন্তার পথে পথে পড়ে রয়েছে।

রাত্রির শেষে চাঁদ যখন ডুবল তখন সহসা অনুভবের মোড় ফিরে গেল। এই মোড় ফেরানোর জন্য তাঁর অন্তর অদৃশ্য দুটি কর একত্র করে দেবতার কাছে প্রার্থনা করছিল। প্রকৃতির আকাশে চাঁদ অস্ত গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের আকাশে চাঁদ উঠল। শ্রীমদ্-ভাগবতের রাসের চাঁদ বুঝি। সমস্ত চিত্তে রসের জোয়ার জাগল। মানুষের মনের কী অদ্ভুত রসায়ন! মোহময় ফেনায় সমস্ত চেতনার কূল উপকূল পরিপ্লুত হয়ে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। ধরণীতে ধীরে ধীরে শব্দ জাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে এক ধরনের অস্পষ্ট কাকলি জাগল। বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, নবজীবনপ্রভাতের কাকলি! যে বাঁশির শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীরা গৃহকর্ম ফেলে, প্রসাধন ফেলে, স্বামীসেবা আর সন্তান পালন ফেলে, উন্মনা হয়ে কুল শাসন ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল সেই বাঁশীর সুর যেন সেই প্রভাতে তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল। প্রথমে উন্মনা হলেন, তারপর উদ্ভ্রান্ত হলেন, তারপর ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

মনের রসায়ন বড় বিচিত্র। মনে কোনও কামনার অবসান ঘটে না। কামনা কখনও বেশ পরিবর্তন করে, কখনও রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের জন্য গোটা চিত্তলোকের প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তন সব মনে ঘটে না। যা সাধারণতঃ ঘটে তা কামনার সজ্জাবদল। কামনা যেমন স্বপ্নের সজ্জা পরে ঘুমের আসরে নামে, তেমনি জা[illegible]ত চিন্তার আসরে নামে বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে—যেমন সীতাহরণকালে রাবণ এসেছিল মুনির ছদ্মবেশ পরে। তখন চিন্তার আসরে সত্যে আর অলীকে, ইন্দ্রিয়ে আর অতীন্দ্রিয়ে এমনভাবে জট পাকিয়ে যায় যে অলীককে সত্য মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর অতীন্দ্রিয়ের ধূসরতা নামে। শীলভদ্রের বেলায়ও ঠিক এমনিই ঘটেছে।

সেই প্রভাত থেকে শীলভদ্রের মনে হয়েছে তিনি কার ডাক শুনতে পেয়েছেন। ঈশ্বরের? কিংবা, এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি রিক্তবিত্ত মানুষের? তাঁর বিত্ত আছে—তাই রিক্তবিত্তদের ডাক শুনেছেন, মনে ভেবেছেন বহু মানুষের দেবতা তাঁকে ডেকেছেন অতলস্পর্শী প্রেমে আত্মসমর্পণ করতে। সেই ডাকে তিনি সন্ন্যাসীর মত বেরিয়ে পড়েছেন কলকাতার বৃহৎ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে। চলেছেন গ্রামে নিজেকে বঞ্চিতদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে।

তাঁর সঙ্গে চলেছে সুস্মিতা। সুস্মিতাও পালিয়ে চলেছে। কিসের থেকে তা সে নিজেও জানে না।

চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু জলের ওপর দাঁড়ের শব্দ। চলন্ত জলের সঙ্গে সূর্যকিরণের নিঃশব্দ যুদ্ধ।

৩

বরেন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মাথা হেঁট করে রাস্তা বেয়ে চলছিলেন। ঝড়ের মধ্যে মানুষ যেমন প্রদীপকে বাঁচিয়ে নিয়ে পথ চলে তেমনি তিনিও তাঁর বুকের মধ্যে সদ্য-জলে-ওঠা একটা প্রদীপকে সযত্নে বাঁচিয়ে নিয়ে চলছিলেন।

সহসা কে যেন তাঁকে ভাঙা ইংরেজীতে ডাকল। মুখ তুলে দেখলেন একজন ইউরোপীয় তরুণী তাঁকে ডাকছে। তরুণী একখানা ঠিকানা লেখা কাগজ সামনে ধরে অনুরোধ করল তাঁকে ঠিকানাটা খুঁজে দিতে।

বরেন বিদেশিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। প্রাঙ্গণটার চারদিকে পিচঢালা মোটরের রাস্তা। মাঝে ফুলের বাগান। এই বাগানে চন্দ্রমল্লিকা, লার্কস্পার, ডালিয়া জিনিয়া নানা ফুল ফুটে এই শীতের দুপুরের রৌদ্রে হাসাহাসি করছে। মুহূর্তের জন্যে বরেন ফুলগুলির দিকে চেয়ে রইলেন।

যুবতী বলল, চলুন, ওই দিকে লিফট্। বাঁ হাতের একটা হীরে-বসানো আঙুল দিয়ে বাড়িটার একটা কোণের দিকে নির্দেশ করল। হীরেটার মত বরে চমকে উঠলেন।

হীরে চমকাল রোদ্দুরে, বরেন বিস্ময়ে!

বরেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো ঠিকানা জানেন, তবে আমাকে খুঁজে দিতে বললেন কেন?

আমার ফ্ল্যাটে চলুন, বলছি।—তরুণী বরেনকে সঙ্গে নিয়ে লিফটে উঠল।

লিফটের মধ্যে দাঁড়িয়ে বরেনের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে এক ঝলক হেসে যুবতী বলল, এটা আমার ঘর নয়, আমার ঘর আমি এখনো খুঁজে পাই নি।

বরেন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না এই সেই মেয়ে কোলাপোভা, যার সন্ধানে আমেদের ইউরোপীয় সঙ্গীত-শিক্ষক বৃদ্ধ ইহুদী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বাল্যকালে মাতৃহীন বালিকা কোলাপোভা পিতার মধ্যে সারা মানব-পরিবারকে পেয়েছিল, চেয়েওছিল। কিন্তু কৈশোরের শেষে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পিতার কাছ থেকে। পোলাণ্ডের ক্রাকাউ শহরের একটা গলি থেকে বেরিয়ে একেবারে মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যায়। ফ্যাসিস্টদের তাড়নায় পিতার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে নিজের সন্তোষের ছোট্ট কোণ থেকে বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর লোভের কুম্ভীপাকে। ঠিক সেই সময়ে, যখন যৌনবোধের উন্মেষে চেতনায় স্তরচ্যুতি ঘটছে কিংবা নতুন স্তরের উদ্ভব হচ্ছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন আবার নতুন করে অভাবিত অজ্ঞাত শক্তি নিয়ে জন্মাচ্ছে।

যুদ্ধ-বিপর্যস্ত যে ইউরোপীয় সমাজ জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী মতবাদ সৃষ্টি করেছে সেই সমাজের আওতায় কোলাপোভা তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত জাতের নারী হয়ে, যে নারী সংস্কার ভাঙতে ভাঙতে চেতনার এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শুধু প্রাণপদার্থ ছাড়া আর কিছু টিকে নেই। ইহুদী কোলাপোভা যৌবনে জর্মন ফ্যাসিস্টদের তাড়ায় তাড়িত হয়ে মধ্য-ইউরোপের দেশে দেশে ভেসে বেড়িয়েছে। নির্বিচারে ভেসে ভেসে বহু পুরুষের কামনার ঘাটে লগ্ন হয়েছে। ফলে, তার চোখে পুরুষ একটা নির্বিশেষরূপে আবির্ভূত হয়েছে। সে নিজেও নির্বিশেষ নারীতে পরিণত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর নির্বিশেষ নারী পুরুষের নির্বিশেষ রূপের মধ্যে নিজের মোক্ষকে সন্ধান করে ফিরছে।

ভারতবর্ষে আসার পূর্বে ও ছিল লণ্ডনে। এক বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির খুব নিম্ন পর্যায়ের সহকারিণী। সেখানে গবেষণারত ভারতীয় পদার্থবিদ ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে তার পরিচয়। সমানের সঙ্গে সমানের পরিচয় নয়। প্রভুর সঙ্গে পরিচারিকার মত পরিচয়। এইটুকু পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কোলাপোভা এই প্রৌঢ়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করল। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, হাসি-কান্না দিয়ে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি দিয়ে। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার পিতার কোথায় যেন মিল ছিল। পিতা যেমন সজ্ঞানে আত্মজাকে সন্ধান করেছে সমুদ্রের পোর্টে-পোর্টে, দুই মহাদেশের প্রধান শহরে শহরে, তেমনি আত্মজা সন্ধান করেছে পিতাকে—প্রৌঢ়ে প্রৌঢ়ে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। তাই এই প্রৌঢ়কে আশ্রয় করতে চাইল। তখন যুদ্ধের শান্তি হয়েছে। দেশে ফিরে যাবার সময় এসেছে। কিন্তু গেল না। এই প্রৌঢ়কে আশ্রয় করে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়ে দিতে চাইল। প্রৌঢ়কে জয় করতে কোনও চেষ্টার ত্রুটি করল না। শেষ চেষ্টা করল নিজেকে দিয়ে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ দেহের বিচারে বিফলপৌরুষ। তবু কোলাপোভা তাকেই আশ্রয় করল। সুব্রহ্মণ্যমের রক্ষিতা হয়ে ভারতবর্ষে চলে এল। বিবাহের জন্যে মোটেই পীড়াপীড়ি করল না। সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে সে নিজের এই সম্পর্কটাকে অতি অবলীলাক্রমে স্বীকার করে নিল।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতবর্ষে ফিরেই কলকাতার উপকণ্ঠে একটি সামরিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন। কলকাতার ইউরোপীয় পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সেখানে কোলাপোভাকে রেখে দিলেন।

এই ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ এখন বরেনের গবেষণার উপদেষ্টা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বরেনকে একটা সোফায় বসিয়ে যুবতী তার মুখোমুখি আর একটা সোফায় বসল একমুখ হাসি নিয়ে। বরেনের চোখ পড়ল মেঝের ওপর কার্পেটে বোনা একটা চন্দ্রমল্লিকার ওপর। এই ফুলটার ডাঁটা ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ল যুবতীর অনাবৃত পায়ে। ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি এই পা দুটো বেয়ে সসঙ্কোচে উঠল দেহে। যুবতী খুব হাসছে, কিন্তু নিঃশব্দে। লাল-ফুল-চিত্রিত গাউনের তলায় তার

বুকখানা এই হাসিতে থরথর করে কাঁপছে। বুকের উপরের অংশ অনাবৃত। চাঁপা রঙের পালিশ করা মার্বেল। তার ওপরে গলা। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখার বলয় তার ওপর। তারপর চিবুক। তার ওপরে টক্‌টকে দুখানা লাল ঠোঁট। চাপা হাসির ঘায়ে থরথর করে না কাঁপলে মনে হত আঁকা। ঝকঝকে শ্বেতপাথরের দাঁত। বৈদূর্য মণির মত ঝিলিকভরা দুই চোখ। সবার ওপরে একখানা ছোট্ট কপাল। সামনে সামান্য উঁচু। তারপর একরাশ ঘন সোনালী চুল। এই সোনালী চুলের ওপর রৌদ্রের চমক। এই কেশ বুঝি গ্রীক রূপকথার 'গোল্ডেন ফ্লিস'। 'সোনারতরী'র পণ্য।

কী দেখছ ?—যুবতী জিজ্ঞাসা করে জর্মন ভাষায়।

জর্মন ভাষায় বরেন উত্তর দেয়, আমি সুন্দরকে দেখছি।

সত্যিই বরেন সুন্দরকে দেখছেন। বিচিত্র রোমান্টিক পরিবেশে। যেখানে অচেনা রূপ বহু দূর দেশের এক ভাষায় কথা বলে উঠেছে।

যুবতী হেসে বললেন, আমি যে সুন্দরী এ অভিমান আমার আছে। তুমি আমাকে ভাল করে দেখবে বলেই এই দুপুরে তোমাকে আমি ডেকেছি। আজ সকাল থেকে ছায়ার মত তোমার পিছনে পিছনে ঘুরেছি, তা জান কি ?

না, কিন্তু কেন ?

যুবতী সোজা বরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল, তোমার ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের রক্ষিতা আমি।

বরেন বিস্ময়ে আহত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিয়ে যুবতী বলতে শুরু করল, হ্যাঁ, আমি ওঁর রক্ষিতা, কোলাপোভা নয়হাউস। তুমি এর আগে ল্যাবরেটরির ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমাকে দেখে থাকবে। লোকে জানে আমি ওঁর স্ত্রী। দেখে থাকবে আমি গাড়ি করে ওঁকে অফিস পৌঁছে দিই, আবার সন্ধ্যায় নিয়ে আসি।

বরেনের এবার মনে হল একে আগে দেখেছেন। কোন দিন ল্যাবরেটরির বাগানে ফুলের সারির পাশ দিয়ে বেড়াতে, কোনদিন ল্যাবরেটরির মধ্যে এদিক ওদিক শূন্যদৃষ্টিতে ঘুরতে।

এখানে এসে অবধি আমি কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারি নি। আমি ভাল ইংরেজি বলতে পারি না। মাত্র গোটা কয়েক ইংরেজি কথা শিখেছি লণ্ডনে। আমার মাতৃভাষা জর্মন। তুমি আমাকে লক্ষ্য কর নি কিন্তু আমি তোমাকে অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি। তুমি আমার ভাষা জান তাও আমি জানতে পেরেছি অনেক আগেই। আমি তোমার টেবিলে দেখেছি জর্মন ভাষায় লেখা পদার্থ বিদ্যার গবেষণার পুস্তিকা। আরও দেখেছি তোমার টেবিলে রিল্‌কের কবিতার বই। তুমি আমাকে স্পষ্ট করে কোনদিন দেখ নি কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছি তন্ন তন্ন করে। জেনেছি তুমি আমার ভাষা বুঝবে—শুধু মুখের ভাষা নয়, মনের ভাষাও। মুখের ভাষা বুঝবে তার প্রমাণ পেয়েছি চোখের ওপর। কিন্তু মনের ভাষা যে বুঝবে তা বুঝেছি শুধু মন দিয়ে।

বরেন আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলে কোলাপোভা তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, আমার মনের আবরণ ঘুচে গেছে, বরেন। তাই যা আমি বুদ্ধি দিয়ে বিচার দিয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি না তা আমি শুধু এই মনটা দিয়ে বুঝি। তা যাক, ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ দিনকয়েক আগে এখান থেকে গেছেন। বদলী হয়ে গেছেন, তা তো তুমি জান। দিনকয়েক পরে আমাকেও সেখানে যেতে হবে, তাঁর নতুন বাংলোতে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে আমার যা কথা আছে সেগুলো সেরে যেতে হবে। তাই তোমাকে ছল করে আমার ঘরে ডেকে এনেছি। শীগগির আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তাই তোমাকে জানালাম, আমি তোমাকে ভালবাসি বরেন। আমিও তোমার ভালবাসা চাই। ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'লাভ'।

বরেন জানেন, ইংরেজি ভাষায় এই 'লাভ' কথার গূঢ়ার্থ। কোলাপোভা আকুল হয়ে বলল, আমি আজ তোমার ভালবাসা চাই। তুমি হয়তো জান না বরেন, আমি সুব্রহ্মণ্যমের রক্ষিতা হলেও তাঁর সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক নেই।

কোলাপোভা বরেনের চোখে চেয়ে দেখল সেখানে একটা ত্রস্ত বিস্ময়ের ভাব জেগেছে। সে এর পূর্বে এই অবস্থায় অন্যান্য পুরুষের চোখও দেখেছে। কখনও

দেখেছে ঘোলাটে আত্মহারা দৃষ্টি, কখনও দেখেছে লুব্ধ ক্রূর পশুর দৃষ্টির মত। বরেনের চোখে যা সে পড়ল তা লোভ নয় ঘৃণা নয়—জিজ্ঞাসা। নিজের প্রতি জিজ্ঞাসা··· জিজ্ঞাসা কোলাপোভার প্রতিও। ওর চোখ যেন প্রশ্ন করছে, তুমি কি বলছ?

কোলাপোভা উঠে এসে সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধে দুটি হাত রেখে বলল, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবেসেছি বরেন। আমার এই ভালবাসা আমার দেহমন সব আচ্ছন্ন করেছে। তোমার হাত ধরে আমি আমার অস্তিত্বের সর্বস্তরে পৌছতে চেয়েছি। আত্মার সুখ কী তা আমি জানি না। আমি এই দেহের ভেতর দিয়েই আত্মাকে স্পর্শ করতে পারি। তোমাদের মত এটাকে বাদ দিয়ে আত্মার লোকে পৌছতে পারি না। জানি আমার যাত্রা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু এ তুমি জেনে রেখ বরেন, তোমার জন্যে শুধু আমার মন কাঁদবে না, দেহও কাঁদবে।

কোলাপোভা এবার তাঁর মাথার ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সহসা বরেনের সমস্ত সত্তা যেন অবরুদ্ধ এক আবেগের উৎপাতে বিদীর্ণ হয়ে গেল। মুহূর্ত পরে যখন সম্বিৎ ফিরে এল তখন দেখলেন কোলাপোভা তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে।

কোলাপোভা ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

জানলা দিয়ে শীতের সোনার রোদ্দুর সোজা এসে পড়েছে কোলাপোভার রক্তিম মুখে। বরেনের আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে ইন্দ্রজালের মত দাঁড়িয়ে রইল সে। বরেন তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন। কোলাপোভা মন্থর গতিতে কয়েক পা সরে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, আজ তুমি যাও বরেন।

বরেনের অন্তরের গভীর থেকে আবিষ্ট নিবেদন বেরিয়ে এল, আমি তোমাকে ভালবাসি কোলাপোভা।

কোলাপোভা উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। একবার আয়নার দিকে চেয়ে দেখল, তারপর রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করে চোখমুখ মুছে নষ্ট প্রসাধনের সংস্কার করে নিয়ে ঘুমন্ত গতিতে নিজের সোফায় ফিরে গিয়ে বসল।

বরেন মাথা নীচু করে অস্ফুট স্বরে বললেন, আমি তোমাকে ভালবেসেছি কোলাপোভা।

কোলাপোভা ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করে, এই কয়েকটা মুহূর্তেই?

বরেন জোর দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, এই কয়েকটা মুহূর্তেই।

কোলাপোভা হাসির জের টেনে বলে, তোমার ভালবাসা—সে দুর্মূল্য সম্পদ বরেন! এ সম্পদ নিলে আমি তাকে রাখব কোথায়? শুধু ভালবাসা দিলেই হয় না, ভালবাসার বাসের জন্যে একটা গৃহ দিতে হয়। আমার এই জীবনে আমি অনেক ভালবাসা পেয়েছি, কিন্তু কোথায়ও আমি গৃহ পাই নি।

বরেন সংকল্পের মত উচ্চারণ করলেন, আমি তোমাকে ঘর দেব।

কেন দেবে? কী পাবে তুমি আমার কাছ থেকে? যা পেতে পার, তার চেয়ে তোমার অনেক, অনেক আকাঙ্ক্ষা।

কী করে বুঝলে তুমি?

তুমিই বুঝিয়ে দিলে আমাকে। আমি যা আজ তোমার কাছ থেকে নিতে পারতাম তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী আমি চাই তোমার কাছ থেকে। এই উপলব্ধি থেকেই আমিও বুঝলাম তোমার অনেক, অনেক আকাঙ্ক্ষা। তা যাক, তুমি আজ এস বরেন। ওই দেখ বাইরে রোদ্দুরে বিকেলের রঙ লেগেছে। আবার আমাদের দেখা হবে। দেখা না হয়ে পারে না। এখন কি মনে হচ্ছে জান? হয়তো তোমার জন্যেই আমি এত দূর এসেছি। ভাব তো কত দূর দেশের মেয়ে আমি!

বরেন নিশ্চল হয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলেন।

কোলাপোভা উঠে কাছে সরে গিয়ে বলল, তুমি লজ্জা পেয়েছ বরেন?

হ্যাঁ, তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করলে কেন?

কেন তা জানি নে। তুমি সাড়া দেবে তা আমি ভাবি নি। তা ছাড়া আমি প্রলুব্ধ করি নি। আমি ভেবেছিলাম এক ঝাঁপে তোমার মধ্যে ডুবে হারিয়ে যাব। কিন্তু তুমি যখন হঠাৎ সাড়া দিলে তখন আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তোমাকে আমি ভেঙেচুরে নিতে চাইলাম

না। তোমাকে সমগ্র ভাবে চাই। আমার যে গৃহ চাই, আশ্রয় চাই। যাক, অনেক বলেছি, আর বোধ হয় বলার কিছু নেই। তুমি আজ এস।

কোলাপোতা এগিয়ে এসে তাঁর গালে একটা হালকা চুম্বন দিয়ে বলল, তুমি এখন চলে গেলেও আমি জানি তুমি আমার কাছেই রয়েছ। আবার দেখা হবে।... আউফভিদের জেহেন!

আউফভিদের জেহেন! বরেন বেরিয়ে পড়লেন পথে। মনে হল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে তিনি। যতদূর পথ বেয়ে চলেছেন ততদূর পথময় নিজের টুকরোগুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলেছেন। কতক্ষণ পথে পথে ঘুরেছেন খেয়াল নেই। সম্বিৎ ফিরে এলে দেখলেন দিন ম্লান হয়ে এসেছে।

* * *

দিন গলে গলে তরল সোনার মত কালিন্দীর জলে ছড়িয়ে পড়েছে। কামরার ছায়ায় সামনের পাটাতনটা সব ঢেকে গেছে। নৌকোটা মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরছে আর দিনান্তের সোনালী আলোর ঝিলিক লাগছে বাইরে-রাখা কালো ট্রাঙ্কটার কানায়। শীলভদ্র এই ঝিলিকটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। জলের থেকে ছিটকে আসা রোদ্দুর? না। মনে হল এই ঝিলিকটা আসছে সুস্মিতার হাতের কাঁকন থেকে। সুস্মিতা মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে।

ধীরে ধীরে এই ঝিলিকটা মিলিয়ে গেল।

দিগ্‌বলয়ে ঢেউয়ের মত ফেঁপে উঠেছে অন্ধকার। তার ওপর আবার চাঁদ উঠেছে। কালো ট্রাঙ্কের গায়ে চাঁদের আলো ঝিকমিক করছে। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ চূর্ণ হয়ে ভাসছে। সুস্মিতা হাত গুটিয়ে নিয়েছে ভিতরে। ছোট ছোট ঢেউয়ের কানা কাঁকনের মত ঝিকমিক করছে।

আবার, একটা অদ্ভুত চান্দ্রপরিবেশ! শীলভদ্রের চোখে নিতান্ত যে সাধারণ বস্তু ইস্পাতের তোরঙ্গ সেও যেন অশরীরী হয়ে উঠল। ওই তোরঙ্গটার মধ্যে একরাশ কাগজ। ওই কাগজে শীলভদ্রের বিপুল সম্পত্তির ওপর অধিকার কালির আঁচড়ে বিধৃত হয়ে রয়েছে। ওই তোরঙ্গে তাঁর সম্পত্তির দলিলপত্র। তাঁর সমস্ত অতীত ওই তোরঙ্গের মধ্যে কাগজের রূপে তাঁকে পিছনে টানছে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। সুস্মিতা কামিনী হয়েও তাঁর কাছে কামিনী নয়। সুস্মিতা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে তার নিজের পথ খুঁজতে বেরিয়েছে। তাঁরা দুজনে পথের সাথী—যেমন দুজন তীর্থযাত্রী একই তীর্থপথে।

কিন্তু এই তোরঙ্গটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। শীলভদ্র উঠে দাঁড়ালেন কামরার ছাদের কানায় হেলান দিয়ে। অন্তরের মধ্যে রসের সমুদ্রে বুঝি আবার জোয়ার জেগেছে। সেই উচ্ছ্বিত জোয়ারে কামনা বাসনার নোঙর যেন আলগা হয়ে গেল। একবার চেয়ে দেখলেন কালো তোরঙ্গের দিকে, আর একবার গলিত রজতের মত নদীর প্রবাহের দিকে।

সহসা মনে হল মন থেকে একটা নোঙর উঠে গেল।

ভাবলেন এই তোরঙ্গটার উপযুক্ত স্থান ওই নদীর গর্ভ। তা না হলে এই তোরঙ্গটা আর নদীর রজত জল একসঙ্গে চোখে আসে কেন? কোন্ অদৃশ্য দেবতার গূঢ় ইচ্ছা তাঁকে ঠেলা দিচ্ছে এই তোরঙ্গকে জলের গ্রাসের মধ্যে ফেলে দিতে! মনে পড়ল মহাপুরুষের বাণী: 'শুধু হাতে ভিক্ষেয় বেরবে! যার কিছু আছে তার ভিক্ষায় ফল নেই!'

হঠাৎ নীচু হয়ে তোরঙ্গটাকে দু হাতে ঠেলে জলে ফেলে দিলেন। নৌকোটা আচমকা টাল খেয়ে গেল। মাঝি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ভিতরে সুস্মিতা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। কাছাকাছি কূলে বোধ হয় কোন জলচর পাখী ঘুমিয়ে পড়েছিল। অচেনা চিৎকার করে জলের মধ্যে পাখা ঝপঝপ করে উড়ে গেল অন্যত্র। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নৌকো আবার স্থির হয়ে এল।

শীলভদ্র পাটাতনে দু পা মুড়ে ঋজু হয়ে বসে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

জ্যোৎস্নাবিদ্ধ একফালি কুয়াশার চাদরে নৌকোটা ঢাকা পড়ে গেল। সেই কুয়াশার মধ্যে পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন শীলভদ্র।

মাঝি বলল, বাবু, শিশির পড়ছে, ভিতরে যান।

কয়েক বারই বলল, কিন্তু শীলভদ্রের কানে এই অনুরোধ পৌঁছল না। ভিতরে, নৌকোর দোলায় সুস্মিতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কামরার দরজার মুখে একটা পেরেকে লণ্ঠন ঝুলছিল। মাঝি এসে তার পলতেটা একটু তুলে দিয়ে গেল।

* * *

বরেন পড়ার টেবিলে বসে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে। কুয়াশাচ্ছন্ন শূন্যতায় মৃত্যুর মুখের মত ল্যাম্পপোস্টের আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাবিদ্ধ একফালি কুয়াশার চাদর পোস্টটাকে অসংখ্য পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওখানে কোনও পরিত্যক্ত ভুবনের চৌমাথায় ভয়ঙ্করের সিগনালের মত দাঁড়িয়ে আছে পোস্টটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বোধ হয়। পিচ্ছিল পথে রাত্রিটা অন্ধকারের দুর্বহ ভার নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। উঠে বাকী প্রহরগুলো পেরিয়ে যাবার সামর্থ্য নেই তার।

আজ অপরাহ্ণে বরেনের সত্তা যেন দীর্ণ হয়ে গেছে। আর এই দীর্ণ স্থান দিয়ে অন্তরের অন্তস্তলের ধূম, কর্দম এসেছে বেরিয়ে। বেরিয়ে এসে চিত্তের স্ফটিক চত্বরকে দিয়েছে ভাসিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এনেছে অদ্ভুত উষ্ণতা শিরায় শিরায়। চেতনার মধ্যে স্তরচ্যুতি ঘটেছে। নতুন স্তরের বিন্যাস হয়েছে। নিজের মধ্যে যে গভীর গহ্বর, বরেন তার সন্ধান পেয়েছেন। পর্বতগহ্বরে বন্দী স্রোতস্বিনীর মত এই গহ্বরে বন্দী হয়ে আছে উজ্জ্বল অজ্ঞাত চেতনার প্রবাহ। একটা অজ্ঞাত সত্তা। বুদ্ধির ও বিচারের শাসনের বাইরে।

আজকের অভিজ্ঞতায় বরেন অনুভব করেছেন সত্তার দ্বৈতভাব। এই দ্বিধাবিভক্ত অস্তিত্বকে কী করে এক করবেন তিনি ?

কোনদিন কী এই দ্বৈতকে এক করা যাবে না ? এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের মিলন ঘটবে না কেন ? কেন মিলন হবে না বুদ্ধিতে আর প্রবৃত্তিতে ?

অস্তিত্বের এক অংশ কেন চিরকাল অপর অংশকে ভয় করে চলবে ? কেন এই অজ্ঞাত অংশকে বেড়া দিয়ে চিরকাল পৃথক করে রেখে দিতে হবে ?

বরেন টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। আমি এই বেড়াটা তুলে দেব ! নিজেকে নিজেই ভয় করব কেন ? এই দুটো অংশই তো আমি ! আমি আর আমাকে ভয় করব না। আমার যে অংশের প্রতি আমার ভয়, সে অংশ সরাসরি প্রকৃতির হাতে। এখানেই আমার সৃষ্টির উৎস। এই অংশই আমার প্রকৃতি !

এই প্রকৃতি আমার সমস্ত স্মৃতিকে, অভিজ্ঞতাকে গ্রাস করে—সমুদ্র যেমন গ্রাস করে ধরণীর সমস্ত মালিন্যকে। এই প্রকৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে রসের যোগান দেয়। এর তেজে চোখ দেখে, কান শোনে। এই তেজকে আমি কাজে লাগিয়ে দেব। আমার সন্ধানে। এটাই আমার ফুয়েল। আমার মাটির তলায়, কয়লার স্তরের মত, পেট্রলের স্তরের মত ঘনীভূত কঠিন শক্তি ! পৃথিবীর কেন্দ্রে তেজপুঞ্জের মত ! পৃথিবীর তেজ যেমন আদিম সূর্যের অংশ তেমনি আমার এই অংশ আদিম প্রাণের অংশ।

বরেন এতক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিলেন—নিজের দ্বিধাবিভক্ত চিত্তকে একাকার করার প্রবল সঙ্কল্প নিয়ে। বাইরে চেয়ে দেখলেন। তাঁর চোখে পথের ওপর প্রেতের চোখের মত আলোটির রূপ সহসা বদলে গেল।

মনে হল ওই আলো স্বপ্নরাজ্যে দিগদর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওই আলো দিনের সঙ্গে রাত্রিকে যোগ করেছে। রাত্রির আর দিনের দুস্তর পার্থক্য ও দূর করে দিয়েছে পদার্থের অন্তর্নিহিত তেজকে জ্বালিয়ে।

যে তেজ এতদিন সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জড়পদার্থের অন্তরে ঘুমন্ত বিদ্যুৎরূপে লুকিয়ে ছিল সেই তেজকে মানুষ বের করে এনেছে। তাই দিয়ে দিনের সঙ্গে রাত্রিকে যোগ করেছে।

এমনি করে মানুষ একদিন মানুষের অন্তরে সুপ্ত তেজকে জ্বালিয়ে তার সত্তার দিন রাত্রিকে যোগ করে দেবে ! যোগ করে দেবে চেতনে, অবচেতনে !

এক একদিন বর্ষার সন্ধ্যার অনেক পরে আকাশে হঠাৎ গোধূলি রাঙা হয়ে ওঠে। যে চাকাটার এদিকে অন্ধকার ওদিকে আলো, সেই চাকাটা কিছুক্ষণের জন্যে টাল খেয়ে যায় আর ওপিঠের আলোটা দেখা যায়। রাত্রির মধ্যে এমনি একটা অকাল গোধূলির মত আলোয় বরেনের চিত্ত যেন ভরে গেল। চিত্তের দ্বিধা ঘুচে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চেতনায় আর অবচেতনে যেন যোগ স্থাপিত হল ক্ষীণ একটা আলোর সেতুতে। চেতনার এ এক বিচিত্র প্রত্যূষ। বিস্ময়ে বরেনের তন্দ্রা টুটে গেল। চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে দেখলেন বাইরে আকাশে আলোর শব্দহীন ধ্বনি জেগেছে। বহুক্ষণ মুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন।

তাঁর চোখের সামনে আকাশে একটা নিঃশব্দ বিপুল বিস্ফোরণে প্রভাত হল। এই প্রভাতের আলোর ধারা বেয়ে গভীর তৃপ্তি সঞ্চারিত হল তাঁর শিরায় শিরায়। গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়লেন টেবিলেই মাথা রেখে। ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যুতের চমকে কোলাপোভার মূর্তিটা ভেসে উঠল চোখের ওপর সূর্যকিরণের মত কেশদাম নিয়ে।

[ক্রমশঃ]

কবি ও কাব্য

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পয়লা ফাল্গুন অধুনা-রহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশ অধিবেশনে কাব্য-শাখার সভাপতিরূপে বাংলা কাব্যের তদানীন্তন অবস্থা ও চিরন্তন আদর্শ সম্পর্কে কিছু বলিবার ও শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই অধিবেশনের মূল সভাপতি প্রমথ চৌধুরী ও সাহিত্যশাখার সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়দ্বয় ইতিমধ্যে ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ প্রায় শতাব্দীপাদ পরে কলিকাতার উদ্যোক্তাদের সহৃদয়তায় এই নিখিল ভারত অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম যোগ দিতে আসিয়া সর্বাগ্রে সেই দুই সাহিত্যরথীর ভাষণ আমার স্মরণ হইতেছে। চৌধুরী মহাশয়ের মূল কথা ছিল: "সাহিত্যরচনার মূলে আছে 'প্রেরণা'। কার প্রেরণা?—বোধ হয় লেখকের অন্তরস্থিত কোনরূপ ঐশী শক্তির।...আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, যে বস্তু অন্ধকারে পথ দেখায়, অর্থাৎ সাহিত্য, তার আলোক সযত্নে রক্ষা করা।" বর্তমানে বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরে ভারতের সর্বত্র যাঁহারা সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা জাতির জীবন-যাত্রায় একান্ত অপরিহার্য সেই আলোক-শিখাকেই প্রজ্বলিত রাখিবার প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহারা জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র মীমাংসাকার গুপ্ত মহাশয় সেদিন কাব্যের বাহন ও গড়ন সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন আজ তাহাও স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন:

"কাব্যের লক্ষ্য রসের সৃষ্টি এবং তার উপায় ভাষার প্রয়োগ।...অখণ্ড সত্য এই যে, কাব্যের লক্ষ্য ভাষা দিয়ে রসের সৃষ্টি। ভাষানিরপেক্ষ যদি রস থাকে সে রস কাব্যের রস নয়।...কাব্যরসিকের কাব্যপাঠের আনন্দ কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের আনন্দ নয়, কবির ভাষায় বিষয়ের বর্ণনার আনন্দ।...কবি স্রষ্টা। 'অপার-কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ'। তবে এ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন পঞ্চভূত দিয়ে নয়, ভাষা দিয়ে।...কাব্য বস্তুর বিবরণ নয়, বস্তুর অনুভূতির প্রকাশ। এই অমূর্ত অনুভূতির কাব্যমূর্তির দেহ হচ্ছে ভাষা; এবং মূর্তি থেকে তার দেহকে তফাত করা যায় না।...কবিকে তাঁর কবি-কর্মের জন্যে কাজের ভাষাকে দিতে হয় নূতন রূপ। কবি-প্রতিভার কৌশল, শব্দের চয়নে রচনায় ও গ্রন্থনে ভাষায় যে সুর ও ব্যঞ্জনা আনে পুরাতন উপাদানে তাকে নূতন সৃষ্টি বললে ভুল হয় না। যা ছিল ভাষা কবি তাকে করেন বাণী। কবি-কর্মের দ্বিতীয় কৌশল, কাব্যের কথা-বস্তুকে সেই নিপুণ গড়ন দেওয়া যে শিল্পরূপ হচ্ছে কাব্য-সৃষ্টির মূল কথা। কবির কাব্য-রচনার যে প্রেরণা সে হচ্ছে কাব্যের বিষয়কে এই আকার ও রূপ দেবার প্রেরণা। কাব্য বড় ছোট হয় তার বিষয়-বস্তুর প্রসার ও গভীরতায়, কিন্তু তার কাব্যত্ব নির্ভর করে এই গড়নের সুষ্ঠুতায়—কবির রূপদক্ষতায়। কাব্যের রস তার এই রূপের ফল। কবিকে তার জন্যে পৃথক যত্ন করতে হয় না। কবি জ্বালেন দীপশিখা, আলোর ভাবনা তাঁর নেই।"

আমরা, বঙ্গভাষাভাষীরা সৌভাগ্যবান এই কারণে যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি আমাদের কালে এবং আমাদের মধ্যেই তাঁহার ঐশী প্রেরণায় কাব্যের সহস্র দীপশিখা জ্বালাইয়া গিয়াছেন, আলোর ভাবনা আমাদেরও নাই। সেই আলো কী করিয়া দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কাজে লাগাইব, আমাদের সমস্যা তাহাই। মহাকবির আবির্ভাবের শতাব্দীপূর্তি-বৎসরকে এই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বিগত বোম্বাই-অধিবেশনে শ্রদ্ধা ও সমারোহের সহিত বরণ করিয়াছিলেন, আজ বৎসরান্তে কবি-স্মরণের সেই আনন্দযজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য কলিকাতায় কবির আবির্ভাব-ও-তিরোভাব তীর্থে আমরা সমবেত হইয়াছি। তাঁহারই কাব্য-জীবনের অনুধ্যানে এই অনুষ্ঠান সফল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হউক।

"কবিতা কি?" ("What is poetry?") এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ই. এ. গ্রীনিং ল্যামবর্ন শ্রেষ্ঠ কবির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন:

দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা।”

কাব্যসাধনায় এই ধ্রুব বা “ধ্রুবতারা” রবীন্দ্রনাথকে আবাল্য পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং তিনি চির-পুরাতন অথচ চিরনবীন এই ধরণীর প্রকৃতি-পরিবেশ হইতে নিত্য নূতন রস আহরণ করিয়াছেন। তাই বর্তমান পৃথিবীর তিনিই একমাত্র কবি যিনি বিশ্ববাসীকে অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন :

“আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।...আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে —এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।”

জীবনের সার্থক সুন্দর পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে অখণ্ড প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনিই বলিতে পারিয়াছেন :

“যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।”

কবি ও কাব্যের এই যে মহান আদর্শ বিগত অর্ধশতাব্দীকাল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিগোচর ছিল এবং অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য যে বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী আমরা রহিয়া গেলাম, কাব্য-সাধনার পথে সেই জন্ম-সৌভাগ্যবান আমাদের যদি বিভ্রান্তি ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা স্বেচ্ছায় উন্মার্গগামী হইয়া দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ, উত্তরাধিকার লাভ করিবার পূর্বেই আমরা পাইয়াছিলাম। আজ হইতে ঠিক পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম সভাপতিরূপে তিনি বিংশশতকের বাঙালী তরুণদের আহ্বান ও আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন :

“এখন আমাদের কালের শীতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজোদ্ভাসিত সূর্যোদয় আসন্ন—তোমরা তাহারই অরুণ-সারথি। আমরা ছিলাম দেশের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে ; অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত ক্ষীণ জ্যোতিতে আমরা দীর্ঘরাত্রি অপরিস্ফুট ছায়ালোকের মায়াবিস্তার করিতেছিলাম। আমাদের সেই কর্ম্মহীন কালে কত অলীক বিভ্রম এবং অকারণ আতঙ্ক দিগন্তব্যাপী অস্পষ্টতার মধ্যে প্রেতের মত সঞ্চরণ করিতেছিল। আজ তোমরা পূর্ব্বগগনে নিজের আলোকে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছ। এখনও জলস্থল-আকাশ নিস্তব্ধ হইয়া নবজীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে ; অনতিকাল পরেই গৃহে গৃহে পথে পথে কর্ম্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই কর্ম্মদিনের প্রখর দীপ্তি দেশের সমস্ত রহস্য ভেদ করিবে—ছোট বড় সমস্তই তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তোমাদের কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিবে তাহাতে অবসাদের আবেশ ও সুপ্তির জড়িমা থাকিবে না—তাহা প্রত্যক্ষ আলোকের আনন্দে, তাহা করতললব্ধ সত্যের উৎসাহে সহস্র জীবন হইতে সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এই জ্যোতির্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহৎ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা বিদায়ের নেপথ্য-পথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। তোমাদের উদয়পথ মেঘনির্ম্মুক্ত হউক এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।”

ইহা ইংরেজী ১৯০৭ সনের গোড়ার কথা, স্বদেশী আন্দোলনের প্রসন্ন প্রভাতকাল। বাংলার তরুণেরা তখন সত্যসত্যই নবসূর্যোদয়ের আলোকে দীপ্তিমান, কিন্তু সে কর্মের ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে নয়। কাব্য-সাহিত্যের মণ্ডপে সেদিন যাঁহারা হাজার বৎসরের ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রবির আলোকে দীপ্তিমান হইতেছিলেন তাঁহারা আজও পর্যন্ত তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছেন, হঠাৎ-নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া কোনও বিস্ময় বা চমকের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু বনস্পতির আওতায় এবং আজ বনস্পতির বিহনে, অরণ্য-শোভা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রণম্য, কিন্তু আজ আমার আলোচনার বিষয় নহেন।

"অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত" যে ক্ষীণ জ্যোতির কথা রবীন্দ্রনাথ সেদিন উল্লেখ করিয়াছিলেন সেই "অন্যত্রে"র অবস্থাও তখন বিঘ্ন-বিরোধ-সঙ্কুল। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে তখন নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি বৃহৎ পাদপেরা বিদায় লইয়াছেন, বৃহতের মধ্যে যে দুইজন অবশিষ্ট—সুইনবার্ন ও কিপলিং, বৃহত্তর ইংরেজ-সমাজের আস্থা তাঁহাদের প্রতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে; নাতিদীর্ঘদের মধ্যে আর্নেস্ট ডাউসন ও আর্থার সাইমনস আসর জমাইতে পারিতেছেন না, কেল্‌টিক নবজাগরণের ফলে ডব্লু. বি. ইয়েটস ও জর্জ রাসেল (এ. ই.) সবে মাথা তুলিতেছেন। মহীরুহের বিশালতা লাভ না করা পর্যন্ত ইংলণ্ডের রসিক সমাজ কোনও কবির খাতির করিতে চান না কাজেই পুরাতনের প্রতি তাঁহারা বীতরাগ, নূতনের প্রতিও উদাসীন। এমন সময়, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, একজন প্রখ্যাত ল্যাটিন গবেষক-পণ্ডিত এ. ই. হাউসম্যানের 'এ শ্রপশায়ার ল্যাড' কাব্য প্রকাশিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কাব্যরসিকেরা উৎফুল্ল হইয়া ঘোষণা করিলেন, পুরাতন বস্তাপচা মালের মধ্যে এই তো নূতনের আবির্ভাব দেখিতেছি! মুহুর্মুহু সংস্করণে 'এ শ্রপশায়ার ল্যাড' হাজারে হাজারে বিকাইতে লাগিল। হাউসম্যান ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে সত্যকার নূতনত্ব সঞ্চার করিলেন। তখনও অতীতের কবর খুঁড়িয়া জন ডান, উইলিয়াম ব্লেক ও জেরাল্ড ম্যানলে হপকিন্সকে নূতনের পয়গম্বররূপে খাড়া করা হয় নাই। 'এ শ্রপশায়ার ল্যাডে'র সাফল্য ইংলণ্ডের তরুণ কবিসমাজকে নূতন ভাবে ও ভাষায় উদ্বুদ্ধ করিল এবং এই নবজাগরণের প্রকাশ দেখা গেল ১৯১২ সনে এডওয়ার্ড মার্শ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'জর্জিয়ান পোয়েট্রি' গ্রন্থে। ই. এম. তাঁহার ভূমিকায় লিখিলেন:

"This volume is issued in the belief that English Poetry is now once again putting on a new strength and beauty."

অর্থাৎ ইংরেজী কবিতা এখন আর একবার নূতন শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করিতেছে এই বিশ্বাসেই এই সঙ্কলন প্রকাশ করা হইল।

এই "শক্তি ও সৌন্দর্যে" সমসাময়িক তরুণেরা যতই উল্লসিত হউক, অগ্রজ প্রবীণেরা এগুলিকে বিশেষ আমল তো দেনই নাই বরঞ্চ প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ঘূর্ণ্যাবর্ত যখন গ্রেটব্রিটেনকেও টান দিল তখন তরুণ কবিরা অনেকেই তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। চার বৎসর-ব্যাপী মৃত্যু ও মহামারীর পরে ইউরোপে যখন শান্তি ফিরিয়া আসিল তখন শ্মশান-বৈরাগ্যজনিত উচ্ছৃঙ্খলতায় কাব্যসরস্বতী উন্মাদিনী হইয়া বিবস্ত্র ও বীভৎস মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। আকস্মিক যুদ্ধের আঘাতে নবীন কবিদের মনের ভারসাম্য যে ভাবে বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহাদের রচনায় তাহার প্রকাশ দুঃখকর বটে, কিন্তু বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সনে বাংলাদেশের যে সদ্যোজাত তরুণ সম্প্রদায়ের হস্তে সেদিনের "জ্যোতির্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহৎ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার" সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহারা প্রত্যক্ষ কোনও কারণে নয়, ইউরোপীয় উচ্ছৃঙ্খলতার হাওয়া মনের গায়ে লাগাইয়াই বাউরা ও বেপরোয়া হইয়া উঠিল। ফলে "মা যাহা হইলেন" তাহাতেই আতঙ্কগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ বলিতে বাধ্য হইলেন:

"যেখানে না মানাই হচ্চে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহঙ্কার তরুণের পক্ষেই সবচেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি, তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে, তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিত মতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এই বিকৃতি ও ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কাব্যের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর বদল এবং ছন্দের বিলোপসাধন। এক মহামারী ব্যাধি শুধু আমাদের নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাব্যসংসারকে আক্রমণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে এমন সব অবাঞ্ছিত বস্তু কাব্যের মর্যাদা দাবি করিতেছে যে ইংরেজী কাব্যে আধুনিকতার বাল্মীকি অ্যালফ্রেড এডওয়ার্ড হাউসম্যানকেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত (৯ই মে, ১৯৩৩) লেজলি ষ্টিফেন

বক্তৃতায় ('দি নেম অ্যাণ্ড নেচার অব পোয়েট্রি', 'কবিতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি') বলিতে হইয়াছে :

"...the legitimate meanings of the word poetry were themselves so many as to embarrass the discussion of its nature. All the more reason why we should not confound confusion worse by wresting the term to licentious use and affixing it either to dissimilar things already provided with names of their own, or to new things for which new names should be invented."

অর্থাৎ কবিতা শব্দের ন্যায়সঙ্গত অর্থের সংখ্যা এমনিতেই এত বেশি যে ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিতে বসিলে গোলে পড়িতে হয়। এই কারণেই এই শব্দের উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগের দ্বারা এবং যে সকল বিসদৃশ বস্তু ইতিমধ্যেই অন্য নিজস্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে কিংবা *যে সকল নূতন বস্তুর ভিন্ন নাম আবিষ্কৃত হওয়া সঙ্গত সেই সকল বস্তুকে কবিতা আখ্যা দিয়া এই গোলযোগকে গোলকধাঁধায় পরিণত করা আমাদের উচিত নয়।*

কাব্যের ক্ষেত্রে অরাজকতার ফলে আর এক সঙ্কট উপস্থিত হইল, ইংরেজী কাব্যে আধুনিকতার বেদব্যাস, 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এবং 'দি ককটেল পার্টি'র কবি টি. এস. এলিয়টকেও যে বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন (১৯৩৩) :

"...we see generation after generation of untrained readers being taken in by the sham and the adulterate—indeed preferring them, for they are more easily assimilable than the genuine article."

অর্থাৎ আমরা দেখিতেছি আনাড়ী পাঠকেরা বংশপরম্পরায় জাল এবং ভেজাল কবিতার পাল্লায় শুধু পড়িতেছে না, খাঁটি মালের চাইতে সেগুলি সহজপাচ্য বলিয়া সেইগুলিই বেশি পছন্দ করিতেছে।

আজকাল যে কোনও সাময়িকপত্র, বিশেষ করিয়া একান্তভাবে কবিতার নামে উৎসাগত পত্রিকা খুলিলেই কবিতা শিরোনামায় প্রকাশিত বহু বিচিত্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় যাহার কোনটি পাটিগণিত, কোনটি ইতিহাস, কোনটি গদ্যনিবন্ধ, আবার কোনটি বিজ্ঞাপনের খাতে প্রকাশিত হইলে সঙ্গত ও শোভন হইত। ইহার মধ্যে জাল ও ভেজালের সংখ্যাই বেশি। মিসেস ভার্জিনিয়া উল্ফ যখন সমসাময়িক কবিতার শোচনীয় অধঃপতন দৃষ্টে তাঁহার "লেটার টু এ ইয়ং পোয়েট" "একজন তরুণ কবিকে লিখিত পত্রে" তাঁহাকে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া শেকস্‌পীয়র ও মিলটনের আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন স্টিফেন স্পেণ্ডার রাগের মাথায় বলিয়াছিলেন বটে, আমরা আধুনিক কবিরা চিরকালের বিস্ময় হইতে চাহি না, আমাদের সকল শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজেদের কালের প্রতিনিধিই হইতে চাই, আমরা অতীতের নকল করিতে চাই না, বর্তমানের দখল চাই ; কিন্তু আর একজন সমসাময়িক কবি পিটার কুয়েনেল না স্বীকার করিয়া পারেন নাই :

"Most verse written in the twentieth century, whether the poet is prepared to admit it or not, represents a frenzied effort *to gain time,* mere 'business' till the fire *begins to kindle. The burning glass may* not prevail against damp twigs ; but meanwhile, *cocked knowingly to one side,* it can be made to flash the sun in the audience's face. Look, I've started a blaze he calls exultantly. We rub our eyelids, but the pyre is still unlit."

অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে যে সকল পদ্য রচিত হইতেছে, কবিরা স্বীকার করুন আর নাই করুন, সেগুলি হইতেছে প্রতীক্ষাকালের কালক্ষেপের উন্মাদ প্রয়াস, যতক্ষণ আগুন না জ্বলে ততক্ষণ ফুঁ-বাতাসের প্রয়োজনীয় আয়োজন মাত্র। আতশী কাচ ভিজা কাঠকুটাকে এখনও হয়তো বাগাইতে পারিতেছে না ; কিন্তু ইতিমধ্যে জানিয়া শুনিয়া কায়দা করিয়া আতশী কাচকে একদিকে কাত করিয়া সূর্যকিরণকে দর্শকের মুখের উপর ফেলিয়া উল্লাসের সঙ্গে বলা হইতেছে, দেখ, আগুন ধরাইয়াছি। আমরা চোখের পাতা রগড়াইতেছি বটে কিন্তু কাঁচা কাঠে এখনও আগুন ধরে নাই।

আমাদের অবস্থা আরও মারাত্মক। এখানকার অগ্নিসাধকদের হাতে দীপশলাকা নাই, আতশী কাচও নাই, জ্ঞানের ধার নাই, বুদ্ধির দীপ্তিও নাই, ইহারা মুখের

ফুঁয়েই কাঁচা কাঠে আগুন ধরাইতে চায়। ফলে ইহাদের যত কোপ ছন্দ ও ভাষার উপর গিয়া পড়িতেছে। যে ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন সেই ভাষার আজকাল যে হাড়ির হাল হইয়াছে তাহা এতই সর্বব্যাপী ও প্রকট যে দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করিতেছি।

ছন্দ সম্বন্ধে ইঁহারা 'পুনশ্চ', 'পত্রপুটে'র দোহাই পাড়েন। শাহান্‌শাহ বাদশাহের যাহা খেলা, ঘুঁটে-কুড়ানীর ছেলের তাহাই যে সর্বনাশের কারণ ইহা তাহাকে বুঝাইবে কে। ছন্দের এভারেস্ট-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া নটরাজ যদি শিশু-ভোলানাথ হইয়া স্খলিত-নৃত্য জুড়িয়া দেন তাহা সাধারণ মানুষের অনুকরণীয় নহে। ছন্দ সম্বন্ধে কবিদের একান্ত সচেতন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথই আমাদিগকে ছন্দের পাঠ দিয়া বলিয়াছেন :

"শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।...কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই ছন্দ।...কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহন-যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়। এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথ মর্ত্য হইতে বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে (২১ জানুয়ারি, ১৯৪১) তাঁহার কবিতা সর্বত্রগামী হয় নাই এই স্বীকৃতির সঙ্গে বলিয়াছেন :

"যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

তবে সেই কবির নিকট এই নিবেদনও করিয়াছেন, তাঁহার বাণী যেন সত্য হয়, সে "শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।" কারণ অভিজ্ঞতার সত্য মূল্য না দিয়াই সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করা ভাল নয়,

"ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।"

তিনি যে আশঙ্কা ও সন্দেহ লইয়া বিদায় লইয়াছেন, সে আশঙ্কা এখনও অনেকেরই মনে আছে। তবে এ কথাও আমি বিশ্বাস করি এই যুগ এখনও যুগের কবির প্রতীক্ষা করিতেছে। এ যুগের জীবনযাত্রার শতধাবিভক্ত পথে পদে পদে যে আঘাত ও বেদনা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সহিতে হইতেছে, তাহার অভিজ্ঞতা যেদিন উপযুক্ত প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইবে, যাহা একান্ত ইমোশন অথবা একান্ত যুক্তিই হইবে না, সেদিনই বাংলা-কাব্যসাহিত্যে নব-অরুণোদয় হইবে। আমাদের যুগের যে সকল তরুণ ফাঁকির পথে না গিয়া সাধনার কুটিল-দুর্গম পথে বিচরণ করিতে করিতে রক্তাক্ত-চরণে একটা নূতন কিছু সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা এই ব্যাকুলতার কথা বুঝিবেন। নকলকে, ফাঁকিকে লোকে স্বভাবতঃই অনুকরণ করিতে চায়। কঠিন এবং দুরূহকে এড়াইতে গিয়া বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় কাব্যের নামে এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর উপাসনা করিতেছেন এবং একটা ভ্রান্ত সহজিয়া কাল্ট খাড়া করিয়া সেই তন্ত্রে সকলকেই দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাতেই আশঙ্কান্বিত হইয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছি। তাঁহারা যেন মনে রাখেন, এই অভিশপ্ত যুগের অক্ষম কবিসম্প্রদায়ের আমিও একজন।

এ যুগে যাহারা যুগের ভাষায় নূতন ছন্দে সৃজিছে মোহ
প্রণাম তাদের সকলেরে করি, যাহাদের সুর মর্মে পশে।
সামনে রয়েছে শুষ্ক নীরস অঙ্ক জ্যামিতি বীজগণিতও,
ইতিহাস আর ধনবিজ্ঞান খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে জেগে—
অন্নবস্ত্র প্রয়োজন হেতু তাহারা সবাই সত্য জানি ;
সত্য হলেও সবখানি নয় ; চোখের আড়ালে আরো কি
আছে!
অজানা আরোর খবর বন্ধু, কবিদের কাছে কামনা করি—
ছন্দ ও ভাষা থাক নাই থাক, মনে যেন মোহ সৃজন করে।

যুগ-মানবের অবসর কোথা, বিষ-জর্জর হায় মানব,
নীলকণ্ঠের জটার গঙ্গা ভুলেছে কি কভু কলধ্বনি ?
হিসাবের খাতা বাগাইয়া ধরি হিসাবের ভুল হতেছে তবু—
চাঁদের আলোকে দীর্ঘ নিশাস ফেলিছে নিরেট বৈজ্ঞানিকও।
নূতনের মাঝে পুরাতন ভুল দেখিয়া ভরসা হয় আজিও,
ল্যাবরেটরির সন্ধান শেষ, শেষকথা তবু গোপন থাকে।
কাব্যের মোহে বাঁধা পড়ে আজো অব্যক্তের সেই তো লীলা,
বিজ্ঞান যেথা হার মেনে যায়, কাব্যের গতি অবাধ সেথা ॥*

* নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সাঁইত্রিশতম বার্ষিক অধিবেশনে কাব্য-সাহিত্যশাখার সভাপতির ভাষণ।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

দীপক দাস মজুমদার

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু ইয়ের ভক্ত। মানে, সাহিত্যের একটু ইয়ে আর কি! যেদিন আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটে দিলীপদা আমার জন্মদিনে একটা 'ঝিলে জঙ্গলে' উপহার দিলেন, সেদিন থেকেই আমি লায়েক হয়ে উঠলুম। ভয়ানক বই পড়ার নেশায় আমি তখন টই-টম্বুর। 'ঝিলে জঙ্গলে', 'ভোম্বল সর্দার', 'দেড়শ খোকার কাণ্ড', 'কালো ভ্রমর'—তদানীন্তন নামকরা বইগুলো এন্তার গলাধঃকরণ করে চললুম। কিন্তু বাদ সাধলেন গুরুজনেরা। তাঁদের মতে এত ছোট বয়সে এ ধরনের বাজে "আউটবুক" পড়লে আমি নাকি ভয়ানক ডেঁপো হয়ে যাব। অগত্যা তাঁদের কড়া নিষেধে আমার আউটবুক পড়ে বাড়তি জ্ঞানার্জনের রাস্তাটুকু বন্ধ হল। কিন্তু পড়ার নেশা বন্ধ হল না। স্কুলের পড়ার বই পড়তে ভাল লাগে না। এক জিনিস বারবার পড়তে কারই বা ভাল লাগে। (এখন বুঝতে পারছি, তখন কী বোকামিটাই না করেছিলুম!) নতুন জিনিস, মানে, আগে যা আর কখনও পড়ি নি, এমন লেখা পড়তে হবে তখন মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বাজার থেকে আনা ডাল-নুনের ঠোঙা বা মসলাপাতির কাগজগুলো দিয়েও তো আমার তীব্র সাহিত্য-রসপিপাসাকে দমন করতে পারি কিছুটা। অতএব সেইদিন থেকেই পুরোদমে শুরু করে দিলুম। সব লেখা যে বুঝতে পারতুম এমন নয়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য—ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, হিন্দীর হরেক রকম নমুনা আমার বইয়ের দেরাজে সযত্নে সংগ্রহ করে চললুম। শুধু হাতের লেখাগুলি রাখতুম না। ওগুলো যে আমার তখনকার হাতের লেখার চেয়েও খারাপ ছিল। আজকাল 'ঝিলে জঙ্গলে' বা 'ভোম্বল সর্দারে' শৈশবের চোখ-বড়-করা আনন্দ পাই না, কিন্তু ঠোঙা বা খুচরো কাগজের সংগ্রহ এখনও সমানে চালিয়ে যাচ্ছি।

তবে প্রকারভেদ ঘটেছে। এখন আর ছাপার হরফ দেখে ছোঁক ছোঁক করি না, হাতের লেখার প্রতিই আমার নজর। তবে দুঃখ এই যে, ঠোঙা-শিল্পীরা আমার মত তো আর রসিক নয়। তারা হয়তো কোন অজানা দরদী কবির জানাশোনা বেদর্দ জেনানার কাছ থেকে কবিতার খাতা সের-দরে কিনে এনেছে। (অবশ্যই দুপুরবেলা—ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে সেটাই প্রশস্ত সময়) এবং সেই খাতা থেকেই একখানা পুরো ঠোঙা একটি আবেগমধুর কবিতার আধখানা দিয়ে তৈরি করেছে। কবিতার প্রথম দিকটুকু আছে, শেষের দিক নেই। না থাক্‌, প্রারম্ভটুকু পড়েই বুঝতে পেরেছি যে ষাট বছরের বুড়োর রক্তও ছলকে উঠবে এ কবি[illegible] পড়লে। অস্থির হবেন না, নীচে অসামান্য কবিতাটির সা[illegible] উদ্ধৃতি দিলুম—

"বধূ নহ শুধু প্রেয়সী"

…চাঁপার গন্ধ অধরে [illegible]মার
স্ব[illegible] মাতন পরশে,
অঙ্গে জড়ানো চপল ছন্দ
উৎসুক রসঃ-রভসে।
…বধূ নহ তুমি মধু উৎসবে
ছন্দ উতলা প্রেয়সী—
লোক-চোখে নহ শ্রেয়সী,
বধূ নহ—শুধু প্রেয়সী।…

লেখক কোন এক জগদীশ দাশ। কবিতার শিরোনামার নিম্নেই সেই স্বাক্ষর ছিল।

অবশ্য পুরো লেখা যে পাই নি, তা নয়। প্রায় পাঁচ বছরের পুরনো একটা পুরো চিঠি আমার সংগ্রহে আছে। পাঁচ পয়সার লবঙ্গ কিনতে গিয়ে পেয়েছিলুম এটা। স্বামী স্ত্রীর নিতান্ত ব্যক্তিগত কাব্যসুষমামণ্ডিত চিঠিটা ছেলের দুধ-গরমের মত একটা বাৎসল্যময় মহৎ প্রয়োজনে ব্যয়িত না হয়ে মুদীর দোকানে উঠল কী করে, সে এক বিস্ময়। যাক, আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। ছোট্ট চিঠি—হাতের লেখা মুক্তোর মত না হলেও ভাষা মোটেই শুক্ত নয়, মাংস পোলাওয়ের মতই রসালো:

ওঁ

শাঁখারীটোলা,
কলিকাতা।
২।৯।৫৪ ইং

তব বিম্ব ওষ্ঠাধরে আঙ্গুরের রস পান করি—
শুধু একবার, সুধার সাগর-তীরে ডুব দিয়ে মরি।

প্রিয় সুধা,

তুমি মধুপুরে যাবার পর থেকেই আমার আর কোন কাজে মন বসছে না। কেবলই ছটফট করছি, কবে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। অস্থির হয়ো না লক্ষীটি। আমি আগামী বুধবারই রওনা হচ্ছি। খোকন বাবার কথা বলে তো! চুমু নিও। ইতি—

তোমার প্রেমাংশু।

কী সুন্দর চিঠি। চিঠির প্রথমেই দু পংক্তি কবিতার নির্মাল্য। দুটি হৃদয়ের এক মহান আকুতি!

একেবারে সাম্প্রতিক একটা চিঠি পেলুম (চিঠি না বলে প্রবন্ধ বলাই ভাল—ঝাঁঝাল প্রবন্ধ। চিঠির ছাঁদে ভদ্রলোক নিবন্ধ ফেঁদেছেন—নতুন স্টাইল) শুকনো লঙ্কার ঠোঙায়। আস্ত অক্ষত চিঠি। প্রেরক ও প্রাপকের পুরো ঠিকানা-সংবলিত। আমি জীবনে বহু সম্পূর্ণ, অর্ধ-সম্পূর্ণ, সিকি-সম্পূর্ণ কবিতা, গল্প প্রবন্ধ, উপন্যাস, ব্যক্তিগত চিঠি, সর্বজনীন চিঠি সংগ্রহ করেছি, কিন্তু এমন ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন চিঠি পাই নি, যার প্রতি ছত্রে ছত্রে তীব্র শ্লেষের ছর্‌রা লুকনো রয়েছে। চিঠিটা হুবহু তুলে দিলুম:

ডাঃ ধরণীনাথ সিংহ, শ্রদ্ধাভাজনেষু,
২১ সি, বসাক বাগান লেন,
কলিকাতা-৬।

ব্যাপারটা একটু কৌতূহলজনক ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, পরস্পর এত কাছে থেকেও আমি আপনার সঙ্গে মৌখিক আলোচনা না করে লৈখিক আলোচনা করছি। আপনি ব্যস্ত মানুষ—নানান কাজের ভিড়ে থাকেন। আপনার মূল্যবান সময়ের অপব্যবহারের আশঙ্কায় এই ছোট্ট চিঠিটির অবতারণা। বেশী নয়, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা খাওয়ার ফাঁকেই এটি পড়ে ফেলতে পারবেন।

আমি এই বসাক বাগান লেনেরই বাসিন্দা। তবে নবাগত বলতে পারেন। মাত্র তিন বছর হয়েছে এখানে এসেছি। এই তিন বছরে অবশ্য আমাদের পারিবারিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রয়োজনে কমপক্ষে ত্রিশ বার আপনার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। তাতে আমার লাভ বই লোকসান হয় নি। দেখলাম, কড়া মিক্সচারের প্রেসক্রিপসান লিখিয়ে মানুষটির মনও সংস্কৃতির সুসম সংমিশ্রণে তৈরী। সেই সংস্কৃতি-সচেতন মনটি আবিষ্কারের সুবাদেই দু-চারটে কথা নিবেদন করবার ভরসা করছি।

গৌরচন্দ্রিকা আর বাড়াব না। আপনি নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য বলার অক্ষমতায় হাসছেন। এই তো গত রবিবারের কথা। বন্যাত্রাণে আপনার সভাপতিত্বে আমাদের পাড়ার "তরুণ তীর্থ" একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দু-এক জায়গার বিচিত্রানুষ্ঠানের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় প্রথমটা যাব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা দিক বিবেচনা করে যেতে হল। লোকসমাগম এবং গুণী শিল্পীদের সমাবেশ বিবেচনা করলে হাততালি, অনুরোধ এবং আদেশের বিচিত্র কলতানে গুঞ্জরিত সেদিনের বিচিত্রানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলা চলে।

কিন্তু এহ বাহ্য। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একদা বলেছিলেন, যে গান শুনতে ভালবাসে না, সে মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারে। কিন্তু মানুষ যে মনোমত গান শুনতে পাওয়ার জন্য খুনীর মত হয়ে যেতে পারে, এ কথাটা বোধ হয় সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও আঁচ করে উঠতে পারেন নি। এক শ্রেণীর শ্রোতা ন্যক্কারজনক কতকগুলি হিন্দী ফিল্মের ততোধিক নোংরা গান শোনবার জন্য বেলেল্লাপনায় "তরুণ তীর্থ"কে প্রায় নরক বানিয়ে ছেড়েছিলেন সেদিন। আর মেয়েদের প্রতি তাঁদের ইঙ্গিতও (চলতি কথায় "হিড়িক") অসহনীয়। দুঃখ এবং বেদনার কথা, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন তরুণ।

আমরা বাঙালীরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে বড়াই করি। কিন্তু আজ সংস্কৃতির নামে যে সমস্ত সস্তা, ভেজাল এবং মানসিকভাবে অপুষ্টিকর জিনিস পরিবেশন করা হচ্ছে, তাতে আমার সঙ্গে আপনিও বেদনা বোধ না করে পারবেন না। উপরোক্ত ঘটনাটি সেই ভেজাল

খাদ্যেরই বিষক্রিয়া। প্রতি বছরই একটা বিশেষ সময়ে কর্পোরেশনের গাড়িগুলি ভেজাল এবং রাস্তার জিনিস খাবেন না বলে লাউডস্পীকারে ঘোষণা করে দেখে থাকবেন। আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন কত বড় ফাঁকা কথা ওটা। দোকানে দোকানে এবং রাস্তার মোড়ে ভেজাল ও জীবাণুপূর্ণ খাবার থাকবে এবং পাশাপাশি প্রচার-গাড়িও থাকবে—এমন সহাবস্থান জাতির পক্ষে মারাত্মক।

আমরা বক্তৃতা করবার সময় বলব এটা করো, ওটা করো না—এটা ভাল ওটা ভাল না। আর কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার উলটোটি ঘটতে দেব—তাতে প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক ভাষণগুলো অনুষ্ঠানের মেনুতে একটা মামুলী উল্লেখ হয়েই থাকবে মাত্র।

"তরুণ তীর্থে"র সভ্য-সভ্যাদের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে, আস্থা রয়েছে আপনার ওপরও। সেদিনের অনুষ্ঠানের পেছনে তাঁদের এবং আপনার নিখাদ আন্তরিকতার স্পর্শ ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করেছি। তবে গণ্ডগোল, চেঁচামেচি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অঘটনগুলোর জন্য শ্রোতাদের একজন হিসেবে আমি যথেষ্টই লজ্জিত।

পরিশেষে বলব, রবীন্দ্রনাথের দেশে গানের অভাব নেই। গিরিশ ঘোষের দেশে ভাল নাটক খুঁজলে তু-চারটে এখনও পাওয়া যায়। আমাদের নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বিকাশ-সাধনে "তরুণ তীর্থ" বাংলার তীর্থ হয়ে উঠুক।

ছোট্ট করে গুছিয়ে লিখব ভেবেছিলাম চিঠিটা—সব কেমন অগোছাল হয়ে গেল। আপনাকে বিরক্ত করলাম, বক্তব্যে কোন বাচালতা থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। নমস্কার জানবেন।

ভবদীয়—

রতনকুমার মহলানবীশ

চমৎকার নয় কি? আমাদের সমাজের একেবারে নিখুঁত দিগ্‌দর্শন। আপনারা বহু বিখ্যাত লেখকের "অপ্রকাশিত রচনা" প্রকাশিত হতে দেখেছেন। এবং অস্বীকার করবার উপায় নেই, আপনাদের সক্রিয় সহানুভূতি না পেলে এ কখনই সম্ভব হত না। আপনারা, মানে পাঠক-সাধারণই তো সৎ-সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তাই ভাবছি আমার এই অপ্রকাশিত সুবৃহৎ সংগ্রহেরও (যদিও লেখকদের সকলেই অখ্যাত) একটা সম্পূর্ণ সংকলন শীগগিরই প্রকাশ করব।

এখন আপনাদের দক্ষিণাসমেত দক্ষিণ হস্তের কবোষ্ণ সান্নিধ্য পেলেই হয়।

পুনর্মিলন

সুনীল গুহ

আবার এল। এল তেমনি ভাবেই। যেমন সে আসে। কথা দিয়ে নয় বা বার্তা পাঠিয়েও নয়। অথবা আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েও নয়। চপল নাবালিকার মত তার খেয়াল। নিজের খুশিতেই যেন সে ছুটে চলে আপন মনে। মধ্য-ফাল্গুনের সামুদ্রিক বাতাস। অথচ প্রথম সম্ভাষণের মত তার কেমন যেন এক সবিনয় ব্যবহার। গাছের নতুন গজানো কচি কচি পাতাগুলোয় নাড়া দিতে দিতে আসে। ফুলের কলির নরম মুখগুলিতে টোকা দেয়। দিয়ে বলে, জাগো, মুখ খোলো এবার। তারপর আবার চলে সে, চলার ছন্দে ওঠে গুনগুন গান। ঢেউ ওঠে শিহরণের। দুরন্ত মিষ্টি আবেগ তার। অথচ দুর্বার বেগের অন্তরে রয়েছে অব্যক্ত এক আবেদন।

মধ্য-ফাল্গুনের সামুদ্রিক বাতাস একসময় নিবারণ সেন লেনের গলিতেও এসে ঢোকে সে। ঢোকে তেমনি ভাবে—কাউকে না জানিয়ে, চুপি চুপি। দিনের আলোকে ফাঁকি দিয়ে অথবা রাত্রির অন্ধকারের পাশ কাটিয়ে নির্বিবাদেই উড়ে আসে। কেউ দেখে না। সকলের চোখের আড়াল দিয়ে হঠাৎ এসে মনের কোণে ঢেউ তুলে যায় হারিয়ে।

এ বাতাস বোধ হয় কোন কবিতা লেখার সহায়ক নয়। যদি হত তা হলে মধ্য-ফাল্গুনে নিবারণ সেনের গলির 'বারোর এফ' নম্বর বাড়ির তিনতলায় এমন এক মহাকাব্যের সৃষ্টি হতে পারত, যা এ যুগের ভাবনার রাজ্যে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হত। কিন্তু তা হল না। মধ্য-ফাল্গুনের বাতাসে মাদকতা আছে, জ্বালা নেই।

ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে এসে মালবিকা টের পেল বাতাসটা এসেছে। রঙ্গনটী মতই ছন্দ বাজছে যেন তার চলার গতিতে। গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন পালাচ্ছে এদিক ওদিক দিয়ে। নিজেকে জানায়, কিন্তু দেখা দেয় না। বাতাসটা লাগছে—শুধু গায়ে নয়, মনেও। মনের কোথায় লাগছে? না, মনে নয় বোধ হয়—শুধু গায়েই।

ঘরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অবনী লিখছে। কী লিখছে, কে জানে। ওসব ও বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। দরকার নেই ওতে ওর। শুধু অবনীর ব্যাপারটাতে ও তাজ্জব বনে যায়। অবনীর মনটাই যেন আসলে একটা পাথর। সারাদিন কেবল বাইরে বাইরে থাকা, নয়তো ঘরে থাকলে অমনি বসে বসে কেবল লেখা। অবনী যেন সত্যি সত্যি অসঙ্গত অবুঝ একটা মানুষ। অনেক দিক দিয়ে অমানুষের চেয়েও তা যেন ভয়ঙ্কর।

বাইরে থেকে ঘরে আসে মালবিকা। পিছু পিছু আসে বাতাস। সেই বাতাস—পাতা দোলানো, ফুল ফোটানো আকুল-করা বাতাস। গানের কলি গুনগুন করে তার মুখে। অবুঝ অবনী মুখ তোলে না তবু। মাথা গুঁজে আছে। লিখছে।

মালবিকার মনে হল আগের চেয়ে যেন আজকাল অবনীর বুদ্ধিশুদ্ধি আরও লোপ পেয়ে গেছে। এমনি করে একেবারেই হয়তো ফুরিয়ে যাবে একদিন। আবার মনে হল দক্ষিণ দিকের জানলাটার বাইরে থেকে কে ধাক্কাধাক্কি করছে যেন! কে, কে? ওর নিজের ভিতর থেকে কে যেন নিঃশব্দে চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানলাটা খুলে দেবার জন্যে বাইরে থেকে কে যেন ডাকাডাকিই তো করছে।

অবনী তবু জানলাটা খুলে দেয় নি এতক্ষণ। রাগ হল ওর। তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলাটা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে হালকা সেই বাতাসেরই খানিকটা এসে হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। একটা ঢোক গিলতেই সেই বাতাসেরই খানিকটা যেন আটকে যায় ওর বুকের ভিতরে। আবার চেতনা আসে ওর মনে। না, অবনীর তা হলে কোন দোষ নেই, ওর নিজেরই ভুল তবে। বুকের ভিতরে কী যেন একটা ছটফট করছে। ছাড়া পাওয়ার তাড়নাটা তার যেন বাড়ছেই কেবল। অবনীর সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করছিল ওর এখন। নতুন কেউ নয়। অবনী। তবু

কেন মিছে
কষ্ট পাচ্ছেন ?
তাড়াতাড়ি
আরামের জন্য
বি.আই.
কফ
সিরাপ
ব্যবহার
করুন
দমকা ও পুরোনো
কাশিতে এবং
শ্বাসনালীর প্রদাহে
বিশেষ উপযোগী
বি.আই.কফ সিরাপ
বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
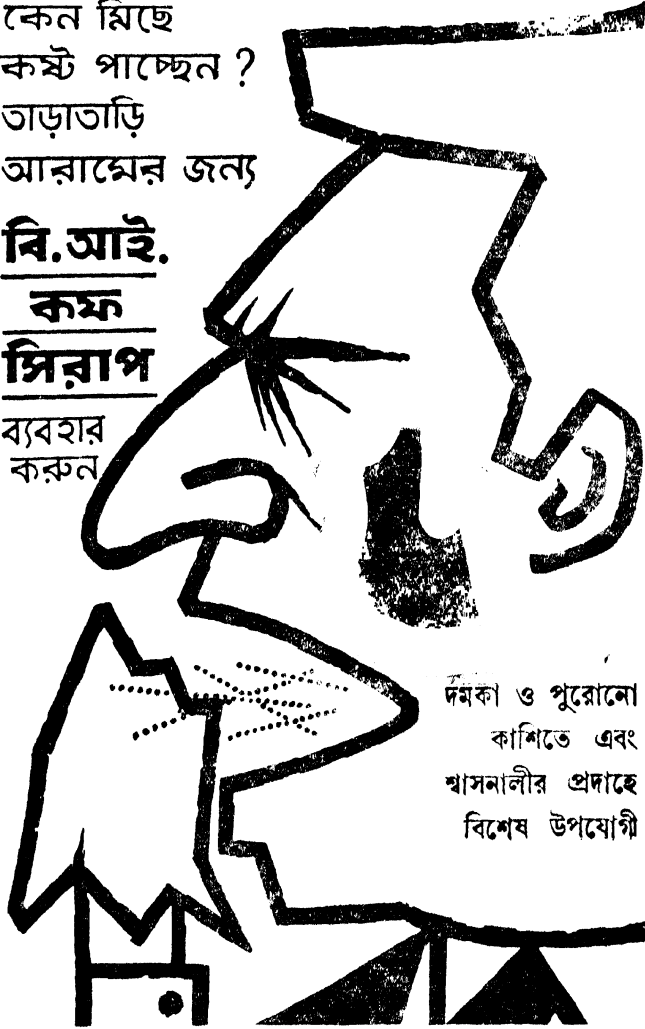
কেন যেন মনে হল ওর অবনীর সঙ্গে কথা বলতে ও আনন্দ পাবে এখন। অন্ততঃ এখন, এই মুহূর্তে।

'ও আমার দখিনা বাতাস গো···'—গান ধরে মালবিকা, গলাটা মন্দ নয় ওর। গুনগুন করে গান গায়, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এদিকে কোন মনোযোগ আছে কি না অবনীর। না, এদিকে লক্ষ্য নেই কোন। তেমনি ভাবেই লিখে চলেছে সে। গলাটা আরও চড়িয়ে দিল ও—'···তুমি আসবে বলে বসে ছিলেম···'—না, তবু কোন সাড়া নেই ওদিকের। একেবারেই অবুঝ মানুষ, কিছুই বোঝে না। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল অবনীর সামনে থেকে কাগজপত্র-গুলো টেনে এনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয় ছুঁড়ে। হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়ে বলে ওঠে, শুনছ?

হ্যাঁ, শুনছি। সেই পুরনো গানটাই তো।—জবাব আসে ওদিক থেকে।

তবে তুমি কি ভেবেছিলে?—ওদিকের জবাব পেয়ে রাগের সঙ্গে আনন্দও হল মালবিকার।

না, আমি ভেবেছিলাম একটা নতুন গান শোনাবে আজ।—মুখ তুলে মালবিকার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে অবনী।

গান শোনবার মন তা হলে এখনও আছে তোমার?

নেই ভেবেছিলে বুঝি?

ভেবেছিলাম বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে ওঠে মালবিকার। এতখানি ভুল যে ও করতে পারে সেটা ওর নিজেরই ধারণায় ছিল না। অবনী তা হলে অনুভব করতে জানে! মন আছে ওর। অবুঝ নয় সে। মাঝে মাঝে এমনি যা ভাবে, সেগুলো তবে ভুল ওর। ভেবেছিল অবনীর মধ্যে কিছু নেই। আছে, তা হলে কিছু আছে। ভিতরে ভিতরে নেচে ওঠে মালবিকা। আর ঘরের ভিতর পাক খায় বাতাস।

জানলা দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে মালবিকা। আনন্দ ও বিস্ময় সমানভাবে ওর মনটাকে জড়িয়ে ধরেছে। আসলে ও এখনও অবনীকে বুঝতেই পারে নি। তাই একই ভুল বারবারই করেছে, বুঝেও অবুঝ রয়েছে। এই তো এখন সবই শুনছিল অবনী। কঠোরতা দিয়ে মনের কানটা বন্ধ করে রাখে নি। ঠিক ঠিক জবাবও পাওয়া গেছে। তবে কেন ওর রাগ হয়েছিল এই মানুষটার ওপর? ভাবতে গিয়ে হোঁচট খায় ও। রাগটা ফিরে আসে নিজের দিকে। মধ্য-ফাল্গুনের দখিনা বাতাসে আবার ওঠে ঢেউ।

অবনী চোখ ফেরায় মালবিকার দিকে। মুখে রয়েছে দুষ্টু হাসি। আবার ফিরিয়ে নেয় দৃষ্টিটা। মনোযোগ দেয় নিজের লেখায়। এগুলো অনুভব করতে ভাল লাগে অবনীর।

আবার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে মালবিকা। তাকায় অবনীর দিকে। ততক্ষণে অবনী নিজের কাজের মনোযোগের গভীরে চলে গেছে। আবার যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কী লিখছে অবনী? সেই একই কথা তো! ও জানে ওসবে নতুন কিছু নেই। তবে অবনীর লেখায় বিশেষ একটা ধার আছে। যদিও নামকরা কোন জাঁদরেল কেউ নয় সে, তবু সে লেখে ভাল। এ বিশ্বাসটুকু অন্ততঃ মালবিকার আছে, মনে মনে স্বীকার করে সেটা। তবু কেন যেন তা পুরনো লাগে আজকাল।

ছুটির দিনে আজ একটু সিনেমায় গেলে হত না?—নৈঃশব্দ চূর্ণ করে আবার কথা তোলে মালবিকা। প্রত্যুত্তরে অবনী একটু হাসল শুধু। শুনতে পেয়েছে তাহলে! হ্যাঁ, অবনী তবে সবই শুনতে পায়! বোঝেও নাকি সব—ওর মনের কথা, সাধ, আহ্লাদ! অবনীকে বুঝতে তাহলে ও ভুল করে। অর্থহীন ভাবনায় মিথ্যাই দুঃখ পায়।

অবনী মুখ তুলল। তাকালো মালবিকার দিকে। হাসতে গিয়েও ঠিক হাসল না। ভ্রূজোড়া কুঁচকে আবার টান হল। তারপর বলল, সুকুমার যদি আসে তবে ওর সঙ্গেই যেও।

সুকুমার অবনীর ছেলেবেলার বন্ধু। ছুটির দিনগুলোতে প্রায়ই আসে এদিকে। তাই অবনী আপাততঃ সেই লোভ দেখিয়েই আত্মরক্ষা করল।

বাতাসটা আবার বন্ধ হয়ে গেল নাকি? দম আটকে আসছে যেন মালবিকার। কোথায় বাতাস? সত্যি ভারী বিশ্রী লাগছে এখন। বলা নেই, কওয়া নেই, যেমন করে আসা তেমন করেই পালানো! এও যেন এক দুষ্টুমির মতই মনে হল ওর।

সুকুমারকে ভাল লাগে মালবিকার। লোকটি ভাল

বিশেষ করে বেশ মিশুকে। মান অহঙ্কার বোধটা কম। সেইজন্তেই যেন তাকে আরও বেশী ভাল লাগে। সত্যি তো, সুকুমারের মত বড়লোকের ছেলের ওদের সঙ্গে না মিশলে কিছুই যায় আসে না। অথচ সুযোগ পেলেই সে আসে। ঠাট্টা করে, কথা বলে। বেশ আমুদে লোক। ব্যবহারটা সত্যি মিষ্টি তার।

এক সময় অবনী কলম রাখল। তারপর যেমন করে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের ওপর ঘোরে তেমনি করেই ঘুরে বসল মালবিকার দিকে; মালবিকা চোখ ফেরালো বাইরের দিকে। বাতাসটা বইতে আরম্ভ করছে আবার। পালাতে গিয়ে হারিয়ে যায় নি একেবারে। এই তো বেশ বইছে। আবার ভাল লাগছে ওর। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, অবনী তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আর সেই চাউনিটা যেন বিশেষ একটা অর্থপূর্ণ। অথচ এমন লাগছে কেন ওর? ভালোর যেন নাগাল পাচ্ছে না ও তেমন করে। তার চেয়ে বরং অবনী বোবার মত বসে বসে লিখুক। সেই ভালো। কোন কথা না বলুক আর।

অবনী ঘাড় গুঁজল আবার। লিখছে। মালবিকার দৃষ্টিটা ফিরে এলো আবার ঘরে। অবনীর দিকে তাকাতে গিয়ে দুঃখ হয়। নিজের উপর নিজের রাগটা ফুলে ফুঁসে উঠছে একটু একটু করে।

এবার তোমার কলমটা থামাবে?—মালবিকা একটু কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

কেন?—মালবিকার দিকে তাকাতে গিয়ে হেসে ফেলল অবনী।

এস, একটু গল্প করি এখন।

গল্প! অবাক হয় অবনী। এমন কথা তো সে আর কখনও শোনে নি মালবিকার কাছ থেকে!

সুকুমার এল। আসবেই। জানা ছিল ওদের। পিছনে নিয়ে এল ঝড়। নয়তো ঝড়টাই ওকে ঠেলে নিয়ে এল এখানে। এমনি করেই আসে সে। যেন দৌড়ে এসেছে। এখন হাঁপাচ্ছে। অবনী মুখ তোলে নি, তবু টের পেয়েছে যে সুকুমার এসেছে। মুখ না তুলেই বলল, বস্।

সুকুমার বসল। মুখে তার হাসি। সে হাসি কেমন হালকা অথচ মিষ্টি। অবনী দেখল না তা। ওধারে মালবিকা—তাকিয়ে তাকিয়ে আড়চোখে দেখছিল সুকুমারকে। বেশ লাগছে দেখতে। ওর রুচি আছে বলতে হবে। জামা-কাপড়ে তা সুস্পষ্ট। কথাবার্তায়ও তার আভাস আছে।

খানিক বাদে মুখ তুলল অবনী। বলল, সিনেমায় যাবি সুকুমার?

হঠাৎ এমন কথা কেন? বুঝে উঠতে পারে না সুকুমার। বলে, আপাততঃ তেমন কোন ইচ্ছে নেই।

গেলে আমার একটু উপকার হত।

তার মানে!

হেসে ফেলল অবনী। যেন ওর অনেক মানে, কিন্তু বলা যায় না। আড়চোখে তাকাল একবার মালবিকার দিকে। মালবিকার চোখ ওধারে—বাইরে। মেঘের নীল আকাশটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। রসিকতার আগাগোড়াই বুঝেছে ও। বুঝে গম্ভীর হয়েছে আরও। মনের কবিতাটা কেমন যেন ছন্দহীন হয়ে গেছে।

অবনী আবার বলে, তা বেচারার দুঃখ অনেক, ভাবলে আমারও কষ্ট লাগে রে।—বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যায় সে।

সুকুমার বোঝে এসব। অবনী মালবিকাকে রাগাবার চেষ্টা করছে। ঝঞ্ঝাবাত্যার এই পূর্বমুহূর্তগুলো ওর ভালই লাগে। সেও দেখছিল মালবিকাকে। একটু একটু করে কেবলই যেন ভাব হচ্ছে ও। সত্যি, সুকুমারেরও এটা অনুভব করতে মন্দ লাগে না।

কী মনে করে বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনল মালবিকা। অবনীর দিকে তাকাল। তাকিয়ে রইল বেশ খানিকক্ষণ। অবনী বুঝেও যেন না-বোঝার ভান করে রইল। ঘাড় গুঁজে রইল টেবিলের ওপর। তেমনি গম্ভীর মালবিকার মুখখানা—কালো পাথরের মত। তারপর ও দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিল। নিতে গিয়ে আটকে গেল সুকুমারের মুখের ওপর। হেসে ফেলল মালবিকা। এমনভাবে হাসল যেন হাসবার ইচ্ছে ছিল না ওর। তবু হাসতে যেন বাধ্য হল। হাসল সুকুমারও।

ঘাড় ফেরাতে গিয়ে অবনী দেখল সুকুমার আর মালবিকা হাসছে। হাসছে যেন ওকে ব্যঙ্গ করেই।

বুঝতে গিয়ে হোঁচট খায় নিজের মনে। মুহূর্তের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করে নিজের ভিতরে। কী হয়েছে ওদের মধ্যে? এমন করে হাসছে কেন ওরা! বিস্ময়টা যেন ওর ভিতরের জ্বালাটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে, কলমটা যেন কাগজের ওপর আর চলতে চাইছে না। মাথার ভিতরে সমস্ত চিন্তা পলকের মধ্যে জট পাকিয়ে ওকে যেন অস্থির করে তুলছে।

বছর চারেকের ইতিহাস। ওর মনের মধ্যে এক মুহূর্তেই সমস্তটা দেখতে পাচ্ছে ও। এ বাড়িতে সুকুমারের যাতায়াতের সুযোগটা ওরই দেওয়া। কোন দিনের কোন অবকাশেই ও অন্য কোন রকম চিন্তা করে নি। বরং ও নিজে আত্মরক্ষার্থে অবাধ সুযোগ দিয়েছে ওদের মেলামেশার। সুকুমার এলে মালবিকাকে ভিড়িয়ে দিয়েছে ওধারে। ও এধারে বসে লিখেছে। নিজের কাজ করেছে, ওদের দিকে মনোযোগ দেয় নি। সেই কাটা-খালের অবাধ সুযোগ নিয়েছে বোধ হয় ঘড়িয়াল। ও নিজে তো একজন চিত্রকর! চরিত্র আঁকে। ওর কলমের ডগায় অনেক চরিত্রের ভিড়। ও তাদের ব্যাখ্যা করে আঁকে। রচনা করে গল্প উপন্যাস।

আমাকে নিয়ে বেরুতে কি তোমার লজ্জা করে?—সরোষে বলে মালবিকা।

অবনী আবার চমকে উঠল। তাকিয়ে রইল মালবিকার দিকে। সেইভাবে রইল বেশ খানিকক্ষণ, চোখ ফেরাতে পারছে না ও। যেন মালবিকাকে ও এই প্রথম দেখছে। তাই দেখে নিচ্ছে ভাল করে। প্রাণ ভরে অনুভব করে নিচ্ছে মালবিকার রূপের বহরটা।

মালবিকা লক্ষ্য করছিল অবনী তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কেমন যেন অসহ্য লাগছিল ওর সেটা। তা ছাড়া ওর কথার জবাব দেয় নি অবনী। বলল, সত্যি, তোমাকে আমি আজও বুঝতে পারছি না।

বোঝবার চেষ্টা করেছ নাকি?—বলতে বলতে অবনীর ভ্রূজোড়া কুঁচকে যায়।

খুব—খুব চেষ্টা করছি।

তাই নাকি, শুনে খুশী হলাম।

হলে তো?

অবনীর ভিতরটায় কেমন যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। রক্ত-প্রস্রবণের বেগটা যেন পলকে পলকে বেড়ে যাচ্ছে। মালবিকার হৃদয়সমুদ্রের তলটা যেন বড় বেশী গভীর এবং কর্দমাক্ত। এসব ও লক্ষ্য করেছে আগেও। সুকুমার এলেই যেন মালবিকার ভাষা এবং ব্যবহারের মধ্যে নতুনত্ব আসে। এর রহস্য কোথায়, তা ও বুঝতে গিয়েও সঠিক একটা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। ভিতরে ভিতরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। টনটন করে ওঠে মাথাটা। কিন্তু বলবার আছে কি ওর! কিছুই নেই। যে বিবেক বুদ্ধির ধারক, যুক্তির খাতায় সেই-ই আজ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। ওরই তো বন্ধু সুকুমার! ও নিজেই তো এনেছে সুকুমারকে এ বাড়িতে। যখন তখন মালবিকার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছে, ওদের একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজে মগ্ন হয়েছে সাহিত্য-সাধনায়!

কথার মাঝখানে একটা নৈঃশব্দ নেমে এসেছে। অবনী আর মালবিকা দুজনেই নীরব। সুকুমারের ভাল লাগছিল না। কেমন একটা অস্বস্তি লাগছিল। ভাবছিল এখান থেকে উঠে চলে যেতে পারলে ভাল হত। একটা কঠিন খাঁচার ভিতরে যেন ও আটকা পড়ে গেছে। এখানে থাকাটা তাই দুর্বিষহ মনে হচ্ছিল ওর কাছে। কিন্তু এমন অবস্থায় উঠেই বা যায় কী করে? অথচ এমন কোন কথা বলতে পারছিল না—যা দিয়ে এই গুমোট নিঃশব্দতাকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া যায়।

মধ্য-ফাল্গুনের দখিনা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। অনুভব করতে পারছে না মালবিকা। ভেবেছিল চুপ করেই বসে থাকবে। ভিতরে ভিতরে পেঁচিয়ে যাওয়া দুর্ভাবনার গিঁট খুলবে। কিন্তু পারল না। কথা শুরু করতে হল ওকেই: অন্ততঃ মনটাকে একটু হালকা কর।

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কপালে হাত দিয়ে বসে ছিল অবনী। কেন যেন মালবিকার এই সাধারণ কথাটাও বুকের মধ্যে শেলের মত গিয়ে বিঁধল। মাথা তুলে ভ্রূ কুঁচকে বাঁকা চোখে একবার তাকাল মালবিকার দিকে। তারপর আবার টেবিলের উপর ঝুঁকে রইল তেমনি।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল মালবিকা। আকাশের রঙটা বড় ঘন নীল। তারই বুকে ছেঁড়া মেঘের দু-এক-টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে—মেলায় হারিয়ে যাওয়া নাবালক ছেলের মত। রাগটা ক্রমশঃই ভিতরে ভিতরে ওর ফুলে ফুলে উঠছিল।

বাইরে থেকে আবার ফিরিয়ে আনল দৃষ্টিটা। বলল, তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?

অবনীর ভিতরের জ্বালাটা যেন এবার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বলল, যা হলে মানুষ তার নিজের স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে তাই হয়েছে।

সমস্ত ঘরটা যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল একবার। চমকে উঠল মালবিকা। হতভম্বের মত অবনীর দিকে
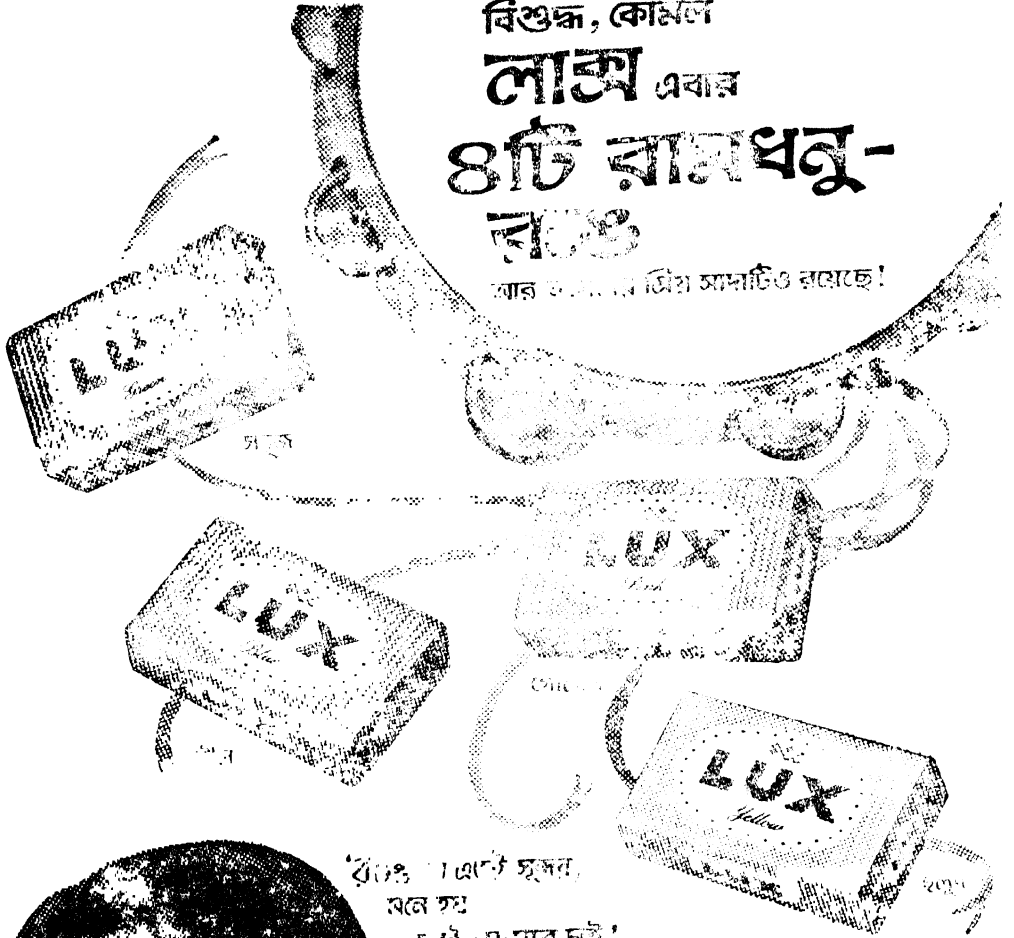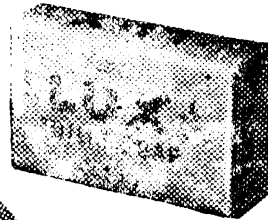
বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
LUX
LUX
LUX
LUX
মনে হয়
আপনি চেয়েছেন।
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈ
LTS. 86A-X52 BG

তাকিয়ে রইল সুকুমার। এ যেন শুধু ঝড় নয়, ঝড়ের সঙ্গে ধ্বংস! আলোর সঙ্গে আগুন!

মালবিকা উঠে দাঁড়াল এবার। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল অবনীর কাছে। হাত রাখল তার মাথায়, তারপর নম্র গলায় বলল, তুমি এমন করে কেন কথা বলছ, বল তো?

এতক্ষণে অবনীর মাথাটা যেন বড্ড বেশী ভারী হয়ে গিয়েছিল। মাথাটা যেন তুলতে পারছিল না। দু চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না মালবিকার দিকে।

সুকুমারও উঠে দাঁড়াল। কালো মুখখানা একবার তুলে ধরল মালবিকার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পিছন ফিরে দেখল একবার অবনী। তারপর কান পেতে শুনল ভারী বুটের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সুকুমার চলে গেল। বোধ হয় রাগ করেই গেল। ঠিক আছে, ভালই হয়েছে। ভাবতে গিয়ে খুঁজে পায় সুকুমারের এ যাওয়ার মধ্যে রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—যা ওর পক্ষে অসহ্য মনে হয়। আবার একটা চিন্তা যেন বর্ষার জলের নাগাল-পাওয়া কেঁচোর মত কিলবিল করতে করতে মাথার মধ্যে ঢুকে অবোধ্য চঞ্চলতা শুরু করে দিল। মাথার ভিতরটা যেন অস্বাভাবিক রকম ভারী ভারী মনে হচ্ছে। মালবিকার প্রতি তা হলে সুকুমারের দরদও জন্মেছে! ওর আর মালবিকার মাঝখানের বিশ্বাসের সেতুটা তা হলে কোন অবকাশে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। অবনীর সারা শরীরটাই একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। ওর সত্তাটা যেন বিপন্ন হয়ে পড়েছে এতক্ষণে। একটা অব্যক্ত দুর্বলতায় যেন কাঁদতে ইচ্ছে করছিল ওর।

কী মনে করে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন বল তো?—বিনয়নম্র গলায় কথাটা বলল মালবিকা।

অবনীর কাছে যেন একটা শাণিত তীরের মত মনে হল কথাটা। সবিস্ময়ে তাকাল মালবিকার দিকে। দু চোখ লাল ওর। আবেগের তীব্রতায় মনে হচ্ছিল উঠে গিয়ে মালবিকার গলা টিপে ধরে। সুকুমারের প্রতি দরদ যেন আর ও-মুখ দিয়ে না বেরুতে পারে। নিজেকে কোনরকমে সংযত রেখে বলল, যা ভাল বুঝেছি তা-ই করেছি, ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।

কী বলছ তুমি?—এতক্ষণে যেন অবনীকে বিকৃত-মস্তিষ্ক মনে হল মালবিকার কাছে।

হেসে ফেলল অবনী। হাসতে গিয়ে ঠোঁট দুখানা অস্বাভাবিক রকম বেঁকে গেল। বলল, ফুলচন্দন দিয়ে আদর করা উচিত ছিল নাকি?

মনের কাল এত গাঢ় তোমার?—এতক্ষণে নিজের ভিতরের যন্ত্রণাটাও টের পাচ্ছিল মালবিকা।

মনের কালি জমতে সময় লাগে আর তা শুধু শুধু গাঢ় হয় না।

তীব্র কটাক্ষ অবনীর চোখে। অবনীর দিকে তাকাতে গিয়ে ভয় পায় মালবিকা। অবনীকে যেন নতুন করে আজ আবার আবিষ্কার করল সে। হাত পা অবশ হয়ে আসে মালবিকার। ভিতরে কান্না জমছে ওর, কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

অবনী মাথা পেতে দেয় টেবিলের ওপর। আর যেন সইতে পারছে না জ্বালা। বড্ড বেশী জ্বালা শুরু হয়েছে ভিতরে, কপালে ঘাম জমছে।

মালবিকা আর কোন কথা বাড়ালো না। নিজেকে জোর করে দমিয়ে নিল। বেলা পড়ে এসেছে, ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গেল বাথরুমের দিকে।

কয়েকটি কাজ সেরে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এল ঘণ্টাখানেক বাদে। মনের ভিতরে রাগটা ফুঁসছিল এতক্ষণ। ঘরে ঢুকে দেখল অবনী তেমনি টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিতরের কান্নাটা যেন এতক্ষণে ঠেলে আসতে চাইছে। বেরুতে চাইছে বাঁধ-ভাঙা জলের মত।

ধীরে ধীরে গেল অবনীর কাছে। অবনী ঘুমুচ্ছে, টের পাচ্ছে মালবিকা। অবোধ মানুষটার জন্য বুকের ভিতরটায় বড্ড বেশী লাগছে। অবনীর কপালে হাত রাখল। সমস্ত হাতটা ভিজে গেল ওর। নিজের আঁচল দিয়ে অবনীর কপালের ঘাম মোছাতে গিয়ে জেগে উঠল সে। জেগে উঠে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল মালবিকার দিকে। মালবিকার গলার ভিতরটা কে যেন দু হাতে চেপে ধরেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। তবু জোর করেই বলল, তোমার রাগটা কি এখনও কমে নি?

অবনী শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই থাকে মালবিকার দিকে। মুখের হাবভাব এখন অনেক নরম। অবনীকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মালবিকা আবার বলে, কথা বলছ না কেন, কী হয়েছে তোমার?

অবনী উঠে দাঁড়ায়। ওর যেন মনে হল মালবিকা জ্বলেছে এতক্ষণ। বলল, তুমি কাঁদছ?

না তো।—ঘাড় নাড়তে গিয়ে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল মালবিকা।

মালবিকাকে টেনে নিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে অবনী।

—

কাশ্মীরের চিঠি

শ্রীঅমিয়ময় বিশ্বাস

গুলমার্গের ফুলের মাঠে

উলার দেখে আসার পরদিনই আমরা গুলমার্গ যাই। ইংরেজ আমলে গুলমার্গের বিশেষ আদর ছিল। গ্রীষ্মকালে হত গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড়দের ভিড় আর শীতকালে বরফে ঢাকা উপত্যকায় চলত সাহেব-মেমেদের স্কেটিং, স্কাইং-এর উদ্দাম উৎসব। তে হি নো দিবসা গতাঃ—আজকাল আর সেদিন নেই। আমাদের দেশীয় যাঁরা বেশীদিন কাশ্মীরে থাকতে চান তাঁরা সবাই এসে জোটেন পহলগামে। গুলমার্গের শীতে এই জুন মাসের গরমের দিনেও সমতলবাসীরা পঙ্গু। গুলমার্গ প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয়ানদের প্রিয় আর আমাদের প্রিয় হচ্ছে পহলগাম।

গুলমার্গে কয়েকদিন থাকব ঠিক করে আমরা জিনিস-পত্র নিয়ে আর বর্ষাতিগুলো হাতে ঝুলিয়ে পর্যটক-দপ্তরে হাজির হলাম। সকাল আটটায় বাস ছাড়ল। সকালের মিষ্টি রোদ শহরের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা আজও সেই উলারের পথে এগিয়ে চললাম। প্রায় ন মাইল এসে বারামূলার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাস চলল দক্ষিণে—গন্তব্যস্থান টাংগমার্গ। বাসের টিকিট দেওয়া হয় গুলমার্গ পর্যন্ত, আসলে বাস যায় টাংগমার্গ। গুলমার্গ পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তার দু ধারে পপলারের সারি, মাঝে মাঝে আখরোটের গাছ, তারপর দূরবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। বহু দূরে বাঁ দিকে পহলগামের পাহাড়ে বরফ দেখা যাচ্ছে।

রাস্তা পিচ দেওয়া বটে কিন্তু কোনও যত্ন নেওয়া হয় বলে মনে হল না। চওড়াও বেশী নয়। এ পথে গাছপালাও খুব কম। চিনারের গাছ একটাও চোখে পড়ল না। 'মগমে'র কাছে একটি ভগ্নপ্রায় দেওদার কাঠের পুল পার হয়ে বাস আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল। নীচে ধানের ক্ষেত আর তার মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। দূরের পাহাড়গুলো ক্রমশঃই এখন কাছে আসতে লাগল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে সবই উঁচু উঁচু পাহাড়। তাদের কারও মাথায় রয়েছে শুভ্র বরফের মুকুট। প্রভাত-সূর্যে তারা ঝলমল করছে। পথের ধারে দেখছি বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ জলস্রোত। তার নাম 'বাবুল কেনাল'। আসছে টাংগমার্গ পাহাড় থেকে। এই কেনাল থেকে পাহাড়ের গায়ে থাক-কাটা ধানের ক্ষেতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের কোলে—টাংগমার্গ পৌঁছে গেলাম।

অগুনতি কুলি, ঘোড়াওয়ালা আর গাইডের চাপে পথ দেখতে পাই না। হঠাৎ পুলিসের চাবুক পড়তে লাগল এলোপাথাড়ি, ভিড় একদম সাফ। খোকাকে জিনিসগুলো নামাতে বলে আমি ফেরবার টিকিট কিনতে গেলাম যাতে ফেরার পথে কোনও গোলযোগ না হয়। এখানেও পর্যটকদের সাহায্যের জন্যে একটি কেন্দ্র আছে, আর আছে ছোট একটি বাজার। এখান থেকে বেসরকারী বাস কুর্দ পর্যন্ত যাতায়াত করে। টিকিট করে এসে দুজন কুলির জিম্মায় জিনিসপত্র গুলমার্গ পাঠিয়ে দিলাম। কুলিরা তাদের লাইসেন্সের পিতলের চাকতি আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে রওনা হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত কারও কোনও জিনিস খোয়া যায় নি।

এর পর এল আমাদের ঘোড়ায় চড়বার পালা। আন্টু ও খোকা প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে, তারা চটপট উঠে বসল। তোমার মা একটু সাহায্য নিয়ে বেশ জুত করে বসলেন। ঘোড়াওয়ালার সাহায্যে আমিও চড়লাম ঘোড়ায়।

ছেলেবেলায় যে ঘোড়ায় চড়ি নি এমন নয়, তবুও আজ ঘোড়ায় বসে আমার দস্তুরমত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। প্রথমে আন্টু তারপর খোকা, খোকার পিছু পিছু তোমার মা, সর্বশেষে আমি উঠতে লাগলাম পাহাড় বেয়ে। প্রথম আধমাইল রাস্তা আমার ভয় ভয় করছিল, কাঁচা রাস্তা পাহাড়ের গায়ে আর ঘোড়াদের রোগ ওই খাদের ধার দিয়ে চলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়াকে নিজের খুশিমত পাহাড়ের ধারে ধারে চালাতে শিখলাম।

পাহাড়ের গায়ে পাইনের ঘন বন, এক একটা গাছ প্রায় একশো ফুট লম্বা হবে। মোটাও খুব, শ্যাওলা জড়ানো কালো তাদের গা। পায়ের নীচে আর পাথর নেই, পাইনের সরু সরু ঝরা পাতায় পথ হয়ে উঠেছে কোমল, মাথায় পাইনের স্নিগ্ধ ছায়া—একসঙ্গে চলেছি বিরাট একদল, একের পিছনে এক—সরীসৃপের মতন একেবেঁকে উঠছি পাহাড়ের গা বেয়ে। পাইনের সৌন্দর্য পথকে ভুলিয়ে দেয়। মাঝপথে আছে একটি চালাঘর, বৃষ্টি-বাদলে পথচারীদের আশ্রয়। আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমে আছে। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে একটু বিশ্রাম করলাম। তারপর আবার অশ্বারোহণ ও যাত্রা। আন্টুর ইতিমধ্যে অনেক বন্ধু জুটে গেছে—সামনে থেকে পিছন থেকে আসছে শিশুকণ্ঠে আন্টু আন্টু ডাক। আন্টুও উত্তর দিচ্ছে তাদের নাম ধরে। আমরা তো অবাক, কখন ওর এত বন্ধু হল! আন্টুও দেখছি তোমার মতন সহজেই সকলের অন্তরের হয়ে পড়ে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করল। সূর্যদেব মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। পাইনের বনে ঘন অন্ধকার নেমে এল, সঙ্গে এল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, তারপর শিল পড়তে আরম্ভ হল। ঘোড়াওয়ালারা দৌড়ে এসে মস্তবড় এক পাইনগাছের তলায় আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল। বর্ষাতিতে গা মাথা ঢেকে ঘোড়ায় বসে ভিজতে লাগলাম। মিনিট পঁচিশ পরেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আবার সবাই চলতে শুরু করলাম। অল্প অল্প সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় দেখলাম একটি কুলি তিন-চার মাসের বাচ্চাকে তোয়ালেতে জড়িয়ে নিয়ে চলেছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে শিশুটির পিতামাতা অশ্বারোহণে এগিয়ে গেছেন, সে এই শিশুটিকে গুলমার্গে পৌঁছে দেবে। আশ্চর্য লাগল ওঁদের এই শিশুটিকে এ ভাবে কুলির হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া! পরে খিলানমার্গেও এই কুলিবাহিত শিশুটিকে দেখেছিলাম। তখনও শিশুটির বাবা-মার সঙ্গে দেখা হয় নি। গুলমার্গের কাঠের বাড়ির রাজ্যে এসে পৌঁছনো গেল। টুরিস্ট হোটেলে অপেক্ষমান কুলিদের পেলাম। হোটেলের দরজায় আবার দেখা পেলাম সাহারানপুরের মাধোপ্রসাদজীর। এঁর সঙ্গে নিশাতবাগেও দেখা হয়েছিল। তিনিই ম্যানেজারকে বলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন গুলমার্গ উপত্যকা দুপুরের রোদে ঝলমল করছে।

গুল্‌মার্গ মানে হচ্ছে—Meadow of Flowers। পারশীতে গুল মানে ফুল—ফুলের ময়দান। সৌন্দর্যরসিক পাঠান নৃপতি ইউসুফ খাঁর দেওয়া নাম। আজ পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে সৌন্দর্যের খ্যাতি নিয়ে। পাঠানের পর এল মোগল, কিন্তু অফুরন্ত জলের উৎসর অভাবেই বোধ হয় মোগল বাদশাদের নেকনজর পড়ে নি এর ওপর। কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মোগলদের কীর্তি আর স্মৃতি। তাদের অপরূপ অবদানে কাশ্মীরকে করেছে ভূস্বর্গ। কিন্তু সবুজ ঘাসে ফুলের গালিচা বিছানো গুলমার্গ রয়ে গেল অনাদৃত, অবহেলিত। বাবারেশির পীরের দরগা ছাড়া মোগল পাঠানের হাতে গড়া আর কিছুই নেই এদিকে। তার পর এল ইংরেজ, গোলাব সিংয়ের মৃত্যুর পর তারাই হয়ে পড়ল সর্বেসর্বা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ ইংরেজ একে তুলে ধরল বিশ্বের সামনে। এখানকার গল্‌ফ খেলার মাঠ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। স্ক্যানডিনেভিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের পর কোনও ট্রপিক্যাল দেশে নেই এমন সুন্দর বরফের রাজ্য। তাই তারা নিয়ে এল তাদের দেশের স্কেটিং, স্কাইং আর স্লেজিং। সবই আধুনিক ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা। ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য আছে গুলমার্গ ক্লাব। সব রকম আধুনিক আরামের জন্য আছে নেডুজ হোটেল

আর আছে প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি করে পাইনের বনের ছায়ায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে অসংখ্য কটেজ।

হোটেলের পাশেই ছোট টিলা। তার ওপরে রয়েছে গুলমার্গের মেট্রোলজিকাল অবজারভেটরী। আমরা সবাই এসে সেই উঁচু জায়গাতে বসলাম। সামনেই তরঙ্গায়িত গুলমার্গের বিখ্যাত উপত্যকা। অনেকটা ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি। এর মাঝখানে আছে আর একটি টিলা। সেখানে আছে নেডুজ হোটেল, স্টেট ব্যাঙ্ক ও আরও কয়েকটি বাড়ি। সমস্ত উপত্যকা ঘন সবুজ ঘাসের আবরণে ঢাকা। তার বুকে ছড়িয়ে আছে গুচ্ছে গুচ্ছে হলদে আর বেগুনী ফুলের স্তবক। ফুলগুলি ঘাসের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে রয়েছে যে মনে হয় যেন নানা রঙের ফুল-তোলা একটি গাঢ় সবুজ কার্পেট ঢাকা রয়েছে সমস্ত উপত্যকায়। এই সবুজ ময়দানে ছড়িয়ে আছে গল্‌ফ্‌ খেলার ছোট ছোট মাঠগুলো। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য আছে সবুজ রঙ-করা বেঞ্চ—প্রকৃতির রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে। ক্ষুদ্র উপত্যকাকে মালার মত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজ পাইন গাছে ছাওয়া নাতিউচ্চ পর্বত-শ্রেণী। তার ভেতর দিয়ে পথ গেছে খিলানের গ্লেসিয়ারের রাজ্যে। পথের ধারে ধারে বয়ে যাচ্ছে বরফ-গলা স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ক্ষীণ মৃদু ধারা। দিগ্বলয়ে দেখা যাচ্ছে তুষারশুভ্র পর্বতরাজি। দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল রৌদ্রে পালিশ-করা রুপোর মত ঝক্‌মক্‌ করছে তাদের শুভ্র অবয়ব। সবুজ মাঠে চরে বেড়াচ্ছে সাদা ভেড়ার পাল। ছোট ছোট টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে নীল আকাশে। ক্ষণে ক্ষণে তারা আড়াল করছে সূর্যের স্নিগ্ধ আলোককে। সেই আধো আলো আধো ছায়া প্রকাশকে করছে অপ্রকাশ, কোমলকে দেখাচ্ছে কোমলতর, সবুজ রঙ মেঘের ছায়াতে হয়েছে আরও গাঢ় সবুজ। আলোর খেলার অভিনবত্বে সমস্ত উপত্যকা রূপায়িত হয়েছে একটি অতি সুন্দর ছবিতে। কিন্তু ছবি নিতেই ভুলে গেলাম। অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের সব ভুলিয়ে দিল। কিন্তু বেশীক্ষণ আর ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকা গেল না। লাঞ্চ খেয়ে এখনই আমাদের যেতে হবে খিলানে—ঘোড়া প্রস্তুত।

খিলানমার্গ এগার হাজার ফুট উঁচুতে। এখান থেকে চার মাইল। পাহাড়ের গা বেয়ে পাইনের বনের ভিতর দিয়ে পাথর ছড়ানো পায়ে-চলা পথে এগিয়ে যেতে হয়। রাস্তা দুরূহ নয় তবে সকালের বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে। ঘোড়া সাবধানে উপরে উঠতে লাগল।

যাঁরা গুলমার্গে রাত্রি বাস করেন না তাঁরা টাংগমার্গ থেকে সোজা খিলানে যান আর তখনই ফিরে এসে বিকেল পাঁচটার বাস ধরে সন্ধ্যায় শ্রীনগরে ফেরেন। একটু বেশী পরিশ্রম ছাড়া আর কোনও অসুবিধা নেই এতে। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর এসে পৌঁছলাম খিলানের বরফের রাজ্যে। এখানে বরফ পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে নেমে এসেছে খিলানের মাঠে। চারিদিকে হলদে ফুলের অপূর্ব সমারোহ। বড় বড় পাথর ছড়ানো মাঠ পার হয়ে বরফের ধারে এসে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। বরফে চড়বার কাঠের শ্লেজ নিয়ে একদল লোক আমাদের ঘিরে মহা গোলমাল শুরু করে দিল। কোনও রকমে তাদের হাঙ্গামা থামিয়ে আমরা চারজনে চারটি শ্লেজে চড়ে বসলাম। ওরা ঘাসের চটি পরে বরফের ওপর দিয়ে আমাদের শ্লেজগুলিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল পাহাড়ের সানুদেশে। বরফের ওপর জুতো পায়ে চলা অসম্ভব। আমি তো চলতে গিয়ে কয়েকবার পড়েই গেলাম। রবারসোলের জুতো পরে গেলে খানিকটা সুবিধে হয় কিন্তু সব চাইতে ভাল ওদের ওই ঘাসের চটি।

বরফের ওপর শ্লেজে বসা আমাদের একটা ফটো নেওয়া হল। খোকা ক্যামেরার সব ঠিক করে একজন শ্লেজ-টানা কুলিকে বুঝিয়ে দিল যে আমরা রেডি বললেই সে যেন চাবি টিপে দেয়। তারপর সবাই বসবার পর যখন রেডি বললাম তখন সেই কুলিটা পরিষ্কার ইংরিজীতে বলে উঠল, স্মাইল প্লীজ। আমরা সবাই হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে। ভাবতেও পারি নি যে এই নোংরা শ্লেজ-টানা লোকটা এত চালাক। ফটো জীবনে অনেক তুলিয়েছি, ভবিষ্যতে আরও তোলাব—কিন্তু এমন স্বতঃস্ফূর্ত হাসি আর হাসব না। জানি না ফটোতে হাসিগুলো ধরা পড়েছে কি না।

তারপর স্লেজে বসে পাহাড় থেকে বরফের উপর দিয়ে নামার পালা। স্লেজওয়ালারা এবার নিজেরাই চড়ে বসল সামনে। আমরা পিছনে পা ছড়িয়ে বসে ওদের কোমর জড়িয়ে ধরলাম। তারপর পিছল বরফের ওপর দিয়ে তীব্রবেগে নামতে লাগল ছোট স্লেজগুলো। মাঝে মাঝে গর্ত, মুহূর্তে সব পার হয়ে সমতলে নেমে এলাম— ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন glide করে নামে sliding chute-এ। কিন্তু শিশুসুলভ আনন্দ এল না মনে। সবাই যেন ভীত সন্ত্রস্ত। থেমে গেলে পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। এই বালসুলভ কৌতুক উপভোগের দক্ষিণা জনপ্রতি দেড় টাকা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম।

এখানেও আমাদের একটা গ্রুপ ফটো নেওয়া হল— তুষারাবৃত পর্বতের গায়ে হালকা মেঘ, সানুদেশে পাইনের বন, এই পটভূমি নিয়ে পাথর ছড়ানো খিলানের মাঠে ঘোড়ায় চড়ে। সমস্ত কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য আর সৌন্দর্য ধরা পড়েছে এই ফটোতে। আনুটুকে এখন দুষ্টু দুষ্টু দেখাচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ আলোকে দেখলাম অস্পষ্ট উলার, ডাল হ্রদ, শঙ্করাচার্য পাহাড় আর হরিপর্বত। এখান থেকেই দেখা যায় হিমালয়ের নাঙ্গা পর্বত—ছাব্বিশ হাজার ফুট উঁচু। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে আমরা দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যা নেমে আসছে। আমরা ওখানকার তাঁবুতে সাজানো রেস্তোরাঁর মালিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে এলাম। অল্পক্ষণ পরেই পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে।

খিলানের পাহাড়ের ওপারে আছে আফারওয়াট লেক—কাশ্মীরীরা বলে আলাপথর। সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে হ্রদের বুকে প্রায় সমস্ত বছরই বরফ জমে থাকে। পরদিন সকালে ওই হ্রদ দেখতে যাব ঠিক করে ঘোড়া গাইড আর পরদিনের খাবারের ব্যবস্থা করে ফেললাম। মাথা বাঁচানোর জন্যে কিনলাম বালাক্লাভা ক্যাপ, যাকে মঙ্কিক্যাপ বলে। তারপরে যখন মাধোপ্রসাদজী আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প-গুজব শেষ হল তখন কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। বাইরের কালো অন্ধকার কালো মেঘের ছায়ায় আরও ঘন হয়ে উঠল। আমরা তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে ঘরে এলা[ম।] মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। ঘরের কাঠের দেয়ালে[র] ফাঁকে ফাঁকে হু-হু করে হিমশীতল বাতাস এসে কাঁপু[নি] ধরিয়ে দিল। সবাই জুতো ছেড়ে আর প্রায় সব গা[য়ের] কাপড় পরেই মাথা টুপিতে ঢেকে লেপে আপাদমস্ত[ক] আবৃত করে শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্য[স্ত] হলাম। শোবার পূর্বে আমরা সবাই একটু করে ব্রা[ন্ডি] জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে নিয়েছিলাম। তারপর কখ[ন] ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

গুলমার্গের প্রথম প্রভাত। জানলার কাচের ভিত[র] দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘন কুয়াশাতে ঢেকে আছে সম[স্ত] উপত্যকা। কোথাও বা শুভ্র-শীর্ষ পর্বতমালা, কোথা[ও] বা পাইনের বন, কোথাও বা পুষ্পাকীর্ণ শ্যামল প্রান্তর বাড়িঘর কিছুই আর দেখা যায় না। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে জলের কণা, দরজা খুললেই ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা কুয়াশাগুলো ঘরে এসে ঢোকে কালকের সন্ধ্যার বাতাসের দাপাদাপি আর নেই, সব চুপচাপ। শুচিশুভ্র গাঢ় কুয়াশাতে সমস্ত অবয়ব ঢেকে গুলমার্গ আজ ধ্যানমগ্ন। প্রভাতী চা এসে গেল। বেয়ারা জানাল যে, ঘোড়া তৈরি আছে কিন্তু এমন দুর্যোগে পাহাড়ে চড়া ঠিক হবে না। আজকের প্রোগ্রামটা মাটি হল দেখে মন বড় দমে গেল।

গুলমার্গ থেকে হেঁটে দুটি জায়গায় যাওয়া সম্ভব। কিন্তু পথ এত দুর্গম যে অধিকাংশ টুরিস্টই এদের বাদ দিয়ে চলেন। একটা হচ্ছে 'আলাপথর লেক' খিলানের ওপারে, দ্বিতীয়টি তোষাময়দান। এই ময়দানে যেতে হয় গুলমার্গ থেকে নীচে নেমে খরস্রোতা ফিরোজপুর নালা পার হয়ে ওপারের পাহাড়কে ডিঙিয়ে। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে এই ময়দান। গুলমার্গ আসতে পথে মগন বলে যে জায়গাটা আছে সেখান থেকেও যাওয়া যায়। এই তোষাময়দানেই চরে বেড়ায় কাশ্মীরের বিশিষ্ট সম্পদ— বিখ্যাত পশমিনা উলের বাহন ভেড়ার পাল। কাছেই আছে কাজিনাগ—কাশ্মীরের অদ্ভুত 'মারখোর' জংলী ছাগলের আবাসভূমি। পোষা মারখোর ছাগলের পাল

দেখেছি কাশ্মীরের পথে পথে। বেশ বড়, এক একটা প্রায় বাছুরের সমান দেখতে। শিঙগুলো সোজা নয়, পাকানো পাকানো আর খুব তীক্ষ্ণ। জংলীগুলোর শিঙ আড়াই ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সমস্ত শরীর লম্বা লম্বা ঘন লোমে ঢাকা, লোম এসে পড়েছে পা পর্যন্ত। আন্টুর ভাষায় ওরা ফ্রক পরে চলেছে।

প্রাতরাশ খেয়ে বাইরে এসে দেখি যে তখনও সমস্ত গুলমার্গ ঘুমিয়ে রয়েছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। ঘন কুয়াশায় ঢাকা সমস্ত উপত্যকা। সূর্যদেব যে কোথায় লুকিয়ে আছেন বুঝতে পারা গেল না। আন্টুর ঘুম ভাঙতে অনেক দেরি হল। কাল সমস্ত দিন বাসে আর ঘোড়ায় বসে কেটেছে, তাই ওকে আর না জাগিয়ে আমরা তিনজনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হলাম। খোকা গেল পোলো গ্রাউণ্ডের দিকে। ওর ইচ্ছে যে ঘোড়ায় চড়াটা ভাল করেই শিখবে। আমরা চললাম উলটো পথে—বাজার, পোস্ট-অফিস পার হয়ে সারকুলার রোড ধরে। ঘন কুয়াশাতে পনেরো হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে স্বল্প পরিসর পাথর-ছড়ানো রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। একদিকে অতলস্পর্শী খদ কিন্তু ঘন কুয়াশা আর মেঘে এমন ঢাকা যে তাদের ভীতিপ্রদ রূপ চোখে পড়ে না। সেই ঘন পেঁজা তুলোর মত মেঘের ভেতর থেকে জেগে উঠেছে খদের পাশের 'ফার' আর পাইনের মাথাগুলো। দূরে সমস্ত অদৃশ্য হয়ে আছে অভিনব শুভ্র মেঘ আর কুয়াশার আবরণে। অতি ধীরে ধীরে আমাদের ঘোড়া চলছে। মাঝে মাঝে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সুদূর উপত্যকা থেকে মেঘগুলো ভেসে আসছে। আমাদের ঢেকে দিচ্ছে মেঘের মায়ায়, চারিদিকে নেমে আসে ঘন কুয়াশার আঁধার। কিছুক্ষণ পরেই আঁধার আবার হালকা হয়ে যায়। পায়ের নীচের রাস্তাটা দেখি বেশ ভিজে গেছে, আমাদের গায়ে মুখে পড়েছে সূক্ষ্ম জলের কণা। মেঘটা পার হয়ে গেল। কখনও দেখছি মেঘগুলো দূর হতে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে, পার হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে। মেঘের খেলা দেখতে দেখতে মেঘলোকে বিচরণ করছি তোমার মা ও আমি। ভারি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে যেন আমরা কোনও এক রূপকথার রাজ্যে ভেসে চলেছি। একটু পরেই গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। সামনের পথও দীর্ঘ। আন্টুকে ঘরে রেখে এসে অস্বস্তিও বোধ করছি। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে হোটেলে ফিরলাম।

হোটেলে এসে দেখি খোকাও ফিরে এসেছে। এখন সে একাই ঘোড়াকে বেশ ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আন্টুও জেগে উঠেছে। আন্টুর ঘোড়াওয়ালা সেলাম করে এসে দাঁড়াল। আবার আন্টু ও খোকা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেল।

দুপুরে খাবার পর একটু বিশ্রাম করে আমরা পায়ে হেঁটে উপত্যকা দেখতে বের হলাম। গুলমার্গ ছোট জায়গা, বাজার বলতে দু-তিনখানা দোকান। বেশীর ভাগ বাড়িই হোটেল। অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি ভগ্নদশায়। পাহাড়ের চূড়ায় একটি শিবমন্দির আছে। সেখানে বৃদ্ধ পূজারীর সঙ্গে অনেক আলাপ হল। যাত্রীদের সস্তায় থাকার ব্যবস্থা আছে মন্দিরের পাশেই। মন্দিরের সমস্ত ব্যয়নির্বাহ হয় মহারাজা রণবীর সিং ট্রাস্ট থেকে। কাশ্মীরের সমস্ত হিন্দু দেবালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এই ট্রাস্টের হাতে। মন্দিরে নিত্য পূজা হয় কিন্তু কেউ বড় একটা আসে না। পর্যটকরা তো নয়ই। পূজারী এ জন্যে বড় দুঃখ করলেন।

পোলো খেলার মাঠ পার হয়ে এলাম গুলমার্গ ক্লাবের সামনে। এখানে অনেকে গল্‌ফ্‌ খেলা শিখছেন। বিদেশীয় একজনকেও দেখতে পেলাম না। পাঞ্জাবীদেরই ভিড়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্কৃতিকে যদি বা গ্রহণ করেছে বাঙালীরা, ফ্যাশান নিয়েছেন আমাদের পাঞ্জাবী ভাইয়েরা। মেয়েরা মুখে রঙ মেখে, স্ল্যাক্‌স্‌ পরে, বব্‌-করা চুল ফাঁপিয়ে, সোয়েটার গায়ে দিয়ে গল্‌ফের লাঠি হাঁকাচ্ছেন। আধুনিকাদের মধ্যেও পাঞ্জাবী ললনা আরও আধুনিকা। মেমসাহেবদের অনুপস্থিতির দুঃখ আর পেতে হয় না। দেশীয় সাহেব-মেমেদের ভিড়ে গুলমার্গ ক্লাব গুলজার।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছেন। চারিদিক বেলাশেষের স্তিমিত আলোকে রমণীয় হয়ে উঠেছে। দূরে পীরপঞ্জালের উচ্চ শৃঙ্গে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের আলো, বরফের ওপর আলোর খেলা দেখতে দেখতে আমরা ফিরে চললুম। আস্তে আস্তে উপত্যকায় নেমে এল শান্ত মধুর সন্ধ্যা। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত উপত্যকা নির্জন হয়ে গেল, সবাই ঘরমুখী। সবুজ মাঠের হাসিমুখ ঢাকা পড়ল আসন্ন আঁধারের ছায়ায়—চারিদিকের পাইনের বনের ছায়াতে সেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। ঘন কুয়াশা তাকে আরও গভীর করে তুলছে। শুধু পীরপঞ্জালের সানসেট পিকটা ঝলমল করছে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিতে। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তার পর নৈশাহার শেষ করে গরম পোশাকে সর্ব শরীর আবৃত করে লেপের তলায় আশ্রয় নেওয়া গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * *

ঘুম ভেঙে দেখি আজ গুলমার্গের হাসি হাসি মুখ। প্রভাতের প্রথম রশ্মি পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। শুভ্র বরফে চলেছে আলোর হোলিখেলা। অনেকেই বেরিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণে। স্থূলবপু মাধোপ্রসাদজী ওভার-কোটে ভুঁড়ি ঢেকে চলেছেন স্বাস্থ্য-আহরণে। আজ আর কালকের কনকনে হাওয়া নেই। প্রকৃতির আনন্দের ছোঁয়াচ সকলের মনে, সবাই হাসিমুখ।

আন্টু এখনও ঘুমিয়ে আছে। প্রাতরাশ খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। খোকা গেল ঘোড়ায় চড়া বিদ্যেটা পাকা করে নিতে। তোমার মা ও আমি চললুম কালকের অসমাপ্ত সারকুলার রোডের চক্কর শেষ করতে। আজ সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের গায়ে কাঁচা রাস্তা দেখে মনে হয় যে আজকাল এ রাস্তার আর আদর নেই। মাঝে মাঝে রাস্তা ভেঙে গেছে। দু ফুট কি আড়াই ফুট মাত্র চওড়া রাস্তার চিহ্ন আছে মাত্র। একদিকে অতলস্পর্শী খদ। আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে ত্রিশঙ্কুর মত ঘোড়ায় বসে হেলতে দুলতে এগিয়ে চলেছি। ডান দিকের খদের দিকে তাকিয়ে মনে হল এ পথে তাঁরাই নিঃশঙ্ক হয়ে চলতে পারেন যাঁদের 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'। সামান্য মাত্র অসাবধানে কোন্ অতলে তলিয়ে যাব, কেউ পাবে না তার কোনও সন্ধান। অতি সন্তর্পণে আমাদের ঘোড়া এগুতে লাগল, সহিসগুলো আর ঘোড়া ছেড়ে দিতে সাহস পায় না, আমরাও হাসতে ভুলে গেলাম। মনে হতে লাগল এমন সুন্দর স্নিগ্ধ আলোকাকীর্ণ প্রভাত এক মুহূর্তেই নেমে আসতে পারে আঁধার হয়ে। নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে হাসিকান্না, সুখদুঃখ ভরা এই প্রেমের সংসার।

রাস্তাটা একটু চওড়া হয়ে এল। মন আবার কল্পনার জাল বুনতে লাগল। এ দিকটা দেখছি একেবারেই জনমানবশূন্য। বাড়িও বড় একটা চোখে পড়ছে না, কেমন যেন নির্জন, নিস্পন্দ। এমন সুন্দর প্রভাতের সূর্যের উজ্জ্বল আলোও আনতে পারে নি প্রাণের চঞ্চলতা। পাখীদের প্রভাতী কলরবও শুনতে পেলুম না। বাতাসও যেন বয় না। সবই যেন ঘুমিয়ে আছে পরীর দেশে।

এই রাস্তা থেকেই দেখা যায় কাশ্মীরের সবচেয়ে উঁচু নগাধিরাজ নাঙ্গা পর্বত। একটা পরিষ্কার জায়গা থেকে দূরবীন দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু সামনের পাহাড়গুলোর ওপর ঘন কুয়াশা। নাঙ্গা পর্বত জানি না আজ কোন্ লজ্জায় শুভ্র মেঘের উত্তরীয় দিয়ে ঢেকে রেখেছেন আপন অভ্রভেদী মহিমা। এ যাত্রা আর দেখা হবে না কাশ্মীরের গিরিরাজের সঙ্গে। নিরাশায় ভরা মন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললাম। পথে দেখা হল কয়েকটি ইউরোপীয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তারাও ঘোড়ায় চড়ে সারকুলার রোড প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছে। ভারতীয় কারও দেখা পেলাম না এই পথে।

রাস্তায় এক জায়গায় দেখি থোপা থোপা হালকা বেগুনী রঙের গ্লাডিওলাসের মত দেখতে ফুল ফুটে রয়েছে। তোমার মার শখ হল যে, এর গাছ নিয়ে বাড়িতে লাগাবেন। ঘোড়া থামিয়ে কয়েকটি চারা সংগ্রহ করলুম। গুলমার্গের মাঠের বেগুনী ফুলের চারাও

নিয়ে এসেছিলাম। ফুলগুলো দেখতে এলিসাম ভায়োলেটের মত, কিন্তু এখানে এনে কাউকে বাঁচাতে পারা গেল না। পাহাড় থেকে নেমে পোলো গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। মাঠে আজ গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড়দের ভিড়। সবাই প্রায় অস্মদ্দেশীয়। উপাদানের মধ্যে মদের স্থান সর্বাগ্রে।

আজ দুপুরের খাওয়া সেরেই গুলমার্গ ত্যাগ। জিনিসপত্র কুলির মারফত রওনা করে দিলাম, আমরা একটু বিশ্রাম করে পরে যাব। ঘোড়াওয়ালাদের ইচ্ছে যে আমাদের বাবাঋষি দেখিয়ে টাংগমার্গ নিয়ে যাবে। সময়ও যথেষ্ট ছিল কিন্তু আর ঘুরপথে যেতে ইচ্ছে হল না। কালই যাচ্ছি আবার যুসমার্গ। এই বাবাঋষির গভীর অরণ্যে আছে মাংসখেকো হিংস্র ভালুক। যদিও তারা মানুষকে আক্রমণ করে না কিন্তু ছাগলের পাল এদের উৎপাতে রাখা মুশকিল। টাংগমার্গ পৌঁছে গেলাম বেশ বেলা থাকতে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে বাস পেলাম। আজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হরমুখ পর্বতকে। ডান দিকে দেখছি অমরনাথ পাহাড়ের শুভ্র শীর্ষ। সন্ধ্যা হয় হয়। বাস এসে থামল শ্রীনগরের সদর বাস-স্ট্যাণ্ডে। টাঙ্গা করে বোটে ফিরে এলাম।

দুধ-গঙ্গা

কাল সন্ধ্যায় গুলমার্গ থেকে এসেছি। দেড় ঘণ্টায় নেমে এলাম ন হাজার ফুট থেকে পাঁচ হাজার ফুটে—বরফের দেয়াল-ঘেরা গুলমার্গের সবুজ দোলা থেকে একেবারে শ্রীনগরের সমতলভূমিতে। অত ঠাণ্ডার পর শ্রীনগরকে আজ ভয়ানক গরম মনে হচ্ছে। এ ছাড়া গুলমার্গের টুরিস্ট হোটেলটা এত নোংরা যে স্নান করার প্রবৃত্তি হয় নি। যদিও চাইলে এরা গরম জল দেয় এবং তা আমাদের দিয়েওছিল। ওখানকার জল এমন যে সাবান আর হাত থেকে যেতে চায় না। মনে হয় সবটা হাত তেলচিটে হয়ে আছে। দশ-পনেরো মিনিট সেই বরফগলা জলে ক্রমাগত হাত রগড়ালে কিছুটা পরিষ্কার মনে হয়। হিমশীতল ঠাণ্ডা জল শিমলা, মুসৌরী, চক্রতার শীতেও ব্যবহার করেছি, এরকম কখনও মনে হয় নি। তবে কার্সিয়াঙের জলেও এ রোগটা আছে বলে মনে পড়ছে।

গুলমার্গের এমন শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশেও পাখীদের দেখা পেলাম না। আছে শুধু কাক। কুকুরগুলো বেশ বড়-সড় আর হৃষ্ট-পুষ্ট। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোমে ঢাকা কুকুরগুলিকে দেখলেই নিয়ে আসতে লোভ হয়। আশ্চর্য, এই সুন্দর কুকুরগুলোর প্রায় সব কটারই কান কাটা। জিজ্ঞেস করে জানলুম যে, এখানকার লোকেদের বিশ্বাস যে কানকাটা কুকুর বেশী তেজী হয়, তাই গুলমার্গের সারমেয় কুলের এই দুর্দশা। আমরা তো জানতুম লেজ কাটলে কুকুর বেশী তেজী হয়। যস্মিন দেশে যদাচারঃ! কোন্‌ প্রক্রিয়ায় কুকুর বেশী তেজী হয় তার পরখ হবে কি করে?

গুলমার্গে মাত্র তিনদিন থেকেই আমাদের চেহারাতে বেশ গোলাপী আভা এসে গিয়েছিল। শরীরও ঝরঝরে মনে হচ্ছিল, কিন্তু শ্রীনগরে থাকতে থাকতেই সেই রক্তাভ সৌন্দর্য যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। বরঞ্চ আমাদের চেহারা পূর্বের চাইতেও কালো হয়ে গেল। এখানে ফিরে আসার পর সবাই অবাক, বলে যে "গোরা হো গয়্যা কালা আউর কালা হো গয়্যা বদরঙ্গী।" এই বদরঙটা এখনও দূর হয় নি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আজ কদিন পর খুব ভাল করে স্নান করা গেল, তার পর টিফিনকেরিয়ারে খাবার নিয়ে নির্দিষ্ট বাসে বসা গেল। ঠিক সময়েই বাস ছাড়ল। যুসমার্গ জায়গাটা এত দিন সরকারী ভ্রমণ-তালিকায় স্থান পায় নি। এইবার প্রথম আরম্ভ হয়েছে যাত্রী-চলাচল। স্থানটি গুলমার্গের দক্ষিণে পীরপঞ্জালের কোলে। আমরা শহর পার হলাম সিল্ক ফ্যাক্টরী রোড দিয়ে। রামবাগ ব্রিজ পার হয়ে রাস্তা দু ভাগ হয়ে গেছে, একটি গেছে এরোড্রামে আর অন্যটি সোজা দক্ষিণে যুসমার্গে। রাস্তার সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্য নয়—সেই অবারিত ধানের ক্ষেত আর ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়ের দেয়াল। কিছুক্ষণ চলার পরই আমাদের বাস ডান দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। মাটির পাহাড়, ধূসর, নিরাভরণ—গাছপালা প্রায়

নেই। পাহাড়ের গা কেটে কাঁচা মাটির নতুন রাস্তা বের করা হয়েছে। চওড়া রাস্তার মাঝে মাঝে দেখছি তীব্র বাঁক। পাশের খদের গভীরতা মারাত্মক হলেও চওড়া রাস্তা বলে চক্রতার পথের মত যাত্রীদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়ে দেবার মতন ভীতিপ্রদ মনে হয় না। রুক্ষ, সৌন্দর্যবিহীন, নিরাভরণ মাটির স্তূপকে সবুজ শাড়ির আড়ালে কমনীয় করে তোলবার প্রয়াসে পথের দু ধারে অজস্র ছোট ছোট চারাগাছ বোনা হচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে ঘুরতে ফিরতে বাস এসে থামল একটা বড় গ্রামের চত্বরে—নাম মনে হচ্ছে চরিয়ার শরীফ। সামনেই বুদ্ধ-মন্দিরের মত একটা মসজিদ। সবাই সেই কাঠের মসজিদ দেখতে গেলেন। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৌদ্ধদের কেয়াং, ঠিক প্যাগোডা নয়। তুমি কখনও কেয়াং দেখ নি। আমরা ছেলেবেলায় যখন আরাকান অঞ্চলে ছিলাম তখন এই ধরনের বৌদ্ধ-মন্দিরের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলাম। তাই একে কেয়াং বলেই লিখলাম—মগদের ভাষায় বুদ্ধমন্দির কেয়াং। কলকাতার ইডেন উদ্যানে খালের ধারে কাঠের যে একটা ব্রহ্মদেশীয় বিহারের নমুনা রয়েছে—অনেকটা ওই রকম। এই মসজিদের দেয়ালে কাঠের সঙ্গে পাথরের কারুকার্য দেখবার মতন। অল্পক্ষণ পরেই বাস ছাড়ল। পথে একটা স্কুল পড়ল বেশ বড় আর সুন্দর, ফটকের ওপরে লেখা—"Enter And Learn", নূতন ধরনের স্বাগতম্ শিক্ষার মন্দিরে।

পুনরায় সেই রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে হেলে দুলে ওপরে উঠতে লাগলাম একটা পুরনো স্টুডিবেকার গাড়িতে। খোকার মহা সন্দেহ যে বাসটা হয়তো চড়াই উঠতেই পারবে না। শেষ পর্যন্ত তার সন্দেহকে দূর করে বাসটা পাহাড় ডিঙিয়ে নীচে নামতে লাগল। পাহাড়ের এই অংশটা গাছ-পালাতে ঢাকা। কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে একটা বাঁক ঘুরেই বাস এসে দাঁড়াল নাতিউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে, যুসমার্গ পর্যটক-দপ্তরের সামনে। নীচে নামতে না নামতেই ঘোড়া আর ঘোড়াওয়ালাদের ভিড়ে সবাই ছিটকে পড়লাম চার দিকে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা তরঙ্গায়িত উপত্যকা। খুবই স্বল্প পরিসর—পাহাড়ের গায়ে পাইন আর দেবদারু গাছের জঙ্গল। মাঠে ফুটে রয়েছে গুলমার্গের মত হলদে আর বেগুনী ফুলের গুচ্ছ। তবে গুলমার্গের ফুলের মতন অত ঘন আর উজ্জ্বল রঙ নয় এদের। এখানকার সমস্ত মাঠ ছেয়ে রয়েছে একরকম ছোট ছোট তারার মত সাদা ফুলে। তাদের সরু সরু বৃন্তগুলো মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে স্নিগ্ধ শীতল সমীরে। এখান থেকে সবাই দেখতে যান নীল নাগ আর দুধ-গঙ্গা। আকাশের অবস্থা দেখে আমরা কাছের দুধ-গঙ্গাতে যাওয়া স্থির করলাম। আর সবাই গেলেন নীল নাগ দেখতে। বাস ছাড়বে বিকেল তিনটেয়, তার আগেই ফিরে আসতে হবে।

অনেকগুলো ঘোড়া দেখে আমাদের চারজনের পছন্দ-মত চারটি ঘোড়া বেছে নিলাম। ঘোড়া নিতে হয় ছোট দেখে, আর ঘুড়ি হলেই সবচেয়ে ভাল। সমান ময়দানে রেকাবে পা দাবিয়ে বসে থাকলেই চলে কিন্তু পাহাড়ে ওঠবার সময় সামনে ঝুঁকে আর তেমনি নামার সময় পিছনে হেলে বসে থাকতে হয়, তা না হলে ঘোড়া ঠিক চলে না আর নিজেরও পড়ে যাবার ভয় থাকে। আন্টু সর্বাগ্রে, পিছনে আমরা বেশ দুলকি চালেই উপত্যকা পার হলাম।

তারপর পাইনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যখন উপলাকীর্ণ কাঠুরেদের পায়ে-চলা কাঁচা রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করেছি তখন অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। সমস্ত রাস্তাটা পাথরে পাথরে সমাচ্ছন্ন। ঘোড়ার পা রাখার মাটিটুকু পর্যন্ত নেই। আর সকালের বৃষ্টিতে সব পিছল হয়ে আছে। আমরা প্রাণ হাতে করে বিরাট খদের ধারে ধারে সেই দুই বা আড়াই ফুট মাত্র চওড়া শিলাকীর্ণ ভীষণ ঢালু রাস্তায় ভিজে ভিজে অনভ্যস্ত অশ্বপৃষ্ঠে বসে সশঙ্ক চিত্তে নামতে লাগলাম। রাস্তা এখানে এত সঙ্কীর্ণ যে ঘোড়াওয়ালারা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারে না। পাশেই পায়ের নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর খদের জঠরে আছে পরম সত্য—মৃত্যুর অনন্তশয্যা। তার আহ্বানকে অস্বীকার করে, মিথ্যা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আর

প্রাণকে আঁকড়ে ধরে আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে প্রাণহীন যন্ত্রের মত নামতে লাগলাম। দুধ-গঙ্গার গম্ভীর গর্জনে, প্রায়ান্ধকার পাইনের ঘন বনে, মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশে যেন শেষ দিনের ছায়া। আমাদের আসন্ন চরম মুহূর্তের আশঙ্কায় প্রকৃতি দেবী অশ্রুপাত করতে লাগলেন। আমরা তাঁর স্নেহধারায় সিক্ত হয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে ঘোড়ায় বসে নামতে লাগলাম। পাহাড়ের নীচেই দুধ-গঙ্গার প্রবল জলস্রোত। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে জলের কোল ঘেঁষে একটা মস্ত বড় পাথরের ওপর এসে বসলাম। কারও মুখে কথা নেই।

বৃষ্টি ধরে এল। দুধ-গঙ্গার প্রবল জলস্রোত উপলখণ্ডে বাধা পেয়ে আবার দুর্বার গতিতে গড়িয়ে চলেছে—নেমে আসছে পাইন-ঢাকা পাহাড়ের কোল থেকে। আর একটু উঁচু থেকে পড়লেই জলপ্রপাত বলে গণ্য হত। দু পাশ থেকে ছোট ছোট জলের ধারা এসে একে আরও খরস্রোতা করে তুলেছে। বেশীদূর পর্যন্ত দেখা যায় না। অল্প দূরেই পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এই উত্তাল জলস্রোত। আমরা হাত ধুয়ে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। আবার বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। ঘোড়াওয়ালার তাগিদে তাড়াতাড়ি রওনা হলাম। ফেরার পথে সহিসগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে চললাম। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই আমরা পাহাড় পার হয়ে মাঠে এসে পড়লাম। বৃষ্টি আরও ঘন হয়ে এল, একটা বড় পাইন গাছের নীচে এসে সবাই দাঁড়ালাম। আনটু ও খোকা নিজের নিজের বর্ষাতি গায়ে দিয়ে ঘোড়ায় বসে রইল। তোমার মা ও আমি একটা বর্ষাতি ভাগাভাগি করে কোনও রকমে মাথা বাঁচিয়ে পাশাপাশি ঘোড়ায় বসে ভিজতে লাগলাম। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই আমরা টুরিস্ট-কেন্দ্রে পৌছে গেলাম।

এসে দেখি আমাদের বাসটা উধাও। চালকের সঙ্গীটিকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? সে যা বলল তাতে আমাদের প্রাণ চমকে গেল। এই রাস্তা নতুন ও কাঁচা মাটির বলে অল্প বৃষ্টিতে খুব পিছল হয়ে যায়। তাই বৃষ্টি দেখে ড্রাইভার গাড়িটাকে নীচে নিয়ে গেছে। যদি বৃষ্টি বন্ধ থাকে ও রাস্তা নিরাপদ মনে করে তা হলে সে গাড়ি ফিরিয়ে আনবে, না হলে সবাইকে হেঁটে নীচে নেমে গিয়ে বাস ধরতে হবে। আমরা তো হতবাক। আমাদের আর সব সঙ্গীরা যাঁরা নীল নাগ দেখতে গিয়েছেন তাঁরা ফিরে এলে পর যথাকর্তব্য করা যাবে স্থির করে চার কাপ কফি দিতে বলে বসে পড়া গেল। এখানে একটি বৃদ্ধ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি ছ বছর কাশ্মীরে আছেন। যুসমার্গের পথ এই প্রথম খোলা হল বলে জায়গাটা দেখতে এসেছেন। ইতিপূর্বে ঢাকা ও কলকাতাতে ছিলেন। এঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে বাইরে এলাম। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, সূর্যের আলোয় সব কিছু দেখাচ্ছে কমনীয় ও রমণীয়। আনটু ও খোকা ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে লাগল সমস্ত উপত্যকাময়। আমরা বাসের অপেক্ষায় সবুজ ঘাসের মাঠে বেড়াতে লাগলাম।

একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে দেখা হল। অল্প বয়স, সঙ্গে স্ত্রীও আছেন। গাজিয়াবাদের রেল-স্কুলের শিক্ষক। এঁরা দুধ-গঙ্গায় যান নি, নীল নাগেও নয়। আমাদের সঙ্গে বাসে এসে এই বিশ্রামালয়ে বসে আছেন। বাঙালীদের উৎসাহের দীপ কি ক্ষীণ হয়ে আসছে!

নীল নাগ-যাত্রীদের প্রত্যাগমনের কোলাহলে কেন্দ্র সরগরম হয়ে উঠল। বাসও এসে গেছে। দু-একজন অত্যুৎসাহী আবার ছুটেছেন দুধ-গঙ্গা দেখতে। তাঁদের নিরস্ত করে ড্রাইভার তাড়াতাড়ি বাস ছেড়ে দিল। রাস্তা ভয়ানক খারাপ, প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা। অল্প কিছু দূর যাবার পরই চাকা পিছলে যেতে লাগল, চালক আর সামলাতে পারে না। অগত্যা মাঝপথে একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হল। পিছনের আর দুটি গাড়িরও ওই অবস্থা। ড্রাইভার লোকজন একত্র করে রাস্তা দেখতে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর বাস আবার চলতে আরম্ভ করল। পথে দেখলাম যুস-যাত্রী দুখানা নতুন কন্‌সাল গাড়ি চলতে না পেরে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা আমাদের মুখে পিছনের ফেলে-আসা পথের বিবরণ শুনে হতাশ হলেন। পথে আর কোনও গোলযোগ হয় নি। ঠিক সময়ের অনেক পরে আমরা শ্রীনগরে ফিরে এলাম।

[ক্রমশঃ]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' [দুই]

"There is the Third Period…in Which I Lived a Correct, Honourable Family Life."

জীবনের হিরণ্ময় পাত্র ভরে যৌবনের সুরা আকণ্ঠ পান করবার পালা শেষ হয়ে এল ; ফুরিয়ে গেল মধুকর গুঞ্জরণে কাঁপা ছায়াতলের বেলা ; বসন্তের দিন হল শেষ। নিরুদ্দেশ যাত্রার সোনার তরী বিবাহিত জীবনের নিরাপদ বন্দরে নোঙর করলেন তলস্তয়। জঙ্গলের বুনো গন্ধ গা থেকে ঝেড়ে ফেলে থাবা গুটিয়ে বসল কপিশচক্ষু এক বাঘ ; স্বেচ্ছায় ধরা দিল ফাঁদে ; লোহার গরাদের আড়ালে নতুন নিরাপদ জীবনের খাঁচায় বন্দী হল আদিম প্রাগৈতিহাসিক রিপু। হতাশা থেকে উত্তেজনায় উত্তরিত ; মরণের উত্তেজনা থেকে জীবনের উদ্দীপনায় জাগ্রত ; জীবন্ত উদ্দীপনা থেকে পরাজিতের আত্মবিনাশী অন্ধকারে পুনর্পশ্চাদবর্তী তলস্তয়ের পৃথিবীতে নব বর্ষার প্রথম আষাঢ়ের অজস্র ধারার সঙ্গে বেজে উঠল সৃষ্টির সংগীত। বিচিত্র বর্ণের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার ফুলে বাজল জীবন-রসভরপুর ফলের আশা। সৃষ্টিছাড়া খেপামির, যৌবনের বেদনারসে উচ্ছল দিন ব্যর্থ হল না তাঁর। আশা-নিরাশার আনন্দ-বেদনার আলোক-অন্ধকারে কাঁপতে লাগল জীবনের রঙীন পেয়ালা ; তার কানায় এসে বসল সতেরো বসন্তের সুধায় কানায় কানায় ভরা এক প্রজাপতি ক্ষণকালের জন্যে ; সপ্তদশী সোফিয়া [সোনিয়া]—তলস্তয় তারই হাতে তুলে দিলেন নিজেকে। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সেই সপ্তদশীর হাতে সঁপে দেবার মুহূর্তে কিছুই গোপন করলেন না বয়সে দ্বিগুণ সোফিয়ার স্বামী লিও তলস্তয়। বিবাহপূর্ববর্তী বাসনাপূর্তির ইতিবৃত্ত সমন্বিত দিনলিপির খাতা তুলে দিলেন নব বিবাহিতার অপ্রস্তুত করকমলে। চোখের জলে ভেজা বিনিদ্র একটি রাত্রির অবসানে সোফিয়া ক্ষমা করল তার স্বামীকে। ক্ষমা করল কিন্তু ভুলল না ; ভুলতে পারল না। ["She forgave ; she did not forget".]

তলস্তয়ের প্রথম যৌবনের ভুলের এবং সোফিয়ার তা ভুলতে না পারার মাসুল দুজনকেই দিতে হয়েছে জীবনের শেষ পর্যন্ত। ভুল করেছিলেন তলস্তয় ; বিয়ের আগেও এবং বয়সে অর্ধেক সোফিয়াকে বিয়ে করেও ভুল করেছিলেন তিনি। রূপের আকর্ষণে এই দুটি ভুল করেছিলেন তিনি বলেই দুটি ফুল—দুটি অপরূপ ফুল ফুটিয়েছিলেন, ফোটাতে পেরেছিলেন হয়তো। জীবনের দুটি রূপের দুটি অপরূপ চিত্রই তলস্তয়ের 'অ্যানা ক্যারেনিনা' এবং 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'।

যৌবন-সমুদ্রের কলকল্লোল জীবন-শঙ্খে বন্দী হল, কিন্তু নীরব হল না। লেখনীর মুখে মুখর হল মূক অভিজ্ঞতা। বিবাহিত জীবনে অভিজ্ঞতার পূর্ণাহুতি পেল অগ্নির ভাষা। সেই অগ্নির ভাষায় উচ্চারিত যৌবনের কাব্য হল : 'অ্যানা ক্যারেনিনা' ; আর জীবন-সংহিতা : 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'। 'অ্যানা ক্যারেনিনা'য় তলস্তয় একজন মানুষের বিপর্যস্ত যৌবনের মুখে উচ্চারণ করেছেন জীবনের বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে' তলস্তয় সমগ্র মানবগোষ্ঠীর রক্তাক্ত আত্মার করেছেন আবরণ উন্মোচন। এক জনের জীবনমৃত্যুজিজ্ঞাসা থেকে সকল মানবের আত্মজিজ্ঞাসায় উত্তরণই হচ্ছে 'অ্যানা

কারেনিনা' থেকে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে' পৌঁছনোর ইতিবৃত্ত। যে বৃত্তের গোলকধাঁধায় ঘুরে ক্লান্ত পথিকের জিজ্ঞাসা: কুয়ো ভ্যাডিস্? 'পথের শেষ কোথায়, কি আছে পথের শেষে?'

পথের শেষ কোথায়, এই প্রশ্নই শিল্পী তলস্তয়কে শেষ পর্যন্ত করেছে—জীবনশিল্পী। জীবনের ঘাটে ঘাটে যৌবনসরসী-নীরে অবগাহনের অতৃপ্তি, রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে মানুষের প্রতি মানুষের অকারণ অবারণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আহত, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে যারা কাজ করে, রোদে পুড়ে, শীতে কেঁপে, জলে ভিজে তাদের হাত ধরে ওপরে তুলে আনার প্রচেষ্টায় ব্যাহত তলস্তয় বিবাহিত জীবনের নিরাপদ বন্দরে নোঙর করলেন যৌবনের সোনার তরী। সপ্তদশী সোফিয়া তাঁকে নিশীথ রাত্রে দিল রমণীয় সঙ্গ, দিবসে দিল পরিচর্যা। একাধিক সন্তান উপহার দিল, তাঁর পাণ্ডুলিপি নকল করে দিল ছাপার উপযুক্ত করতে। ["His handwriting was often difficult to read, but the countess, who copied his manuscripts as each portion was written, grew very skilful in deciphering it and was even able to guess the meaning of his hasty jottings and incomplete sentences. She is said to have copied War and Peace seven times."]

তলস্তয়ের দিনরাত্রি হাসি গল্পে লেখায় কথায় ভরপুর হয়ে উঠল দেখতে দেখতে: "All the family assembled at breakfast, and the master's quips and jokes rendered the conversation gay and lively. Finally he would get up with the words, it's time to work now, and he would disappear into his study, usually carrying a glass of strong tea with him. No one dared disturb him. When he emerged in the early afternoon, it was to take his exercise, usually a walk or a ride. At five he returned for dinner, ate voraciously, and when he had satisfied his hunger he would amuse all by vivid accounts of any experience he had had on his walk. After dinner he retired to his study to read, and at eight would join the family and any visitors in the living-room for tea. Often there was music, reading aloud or games for the children." [LEO TOLSTOY: Ernest J. Simmons.]

তবুও তৃপ্তি নেই তলস্তয়ের। এই সেই অমর অতৃপ্তি, সেই Divine Dissatisfaction—যা সাধারণ লেখককে করে অসাধারণ শিল্পী, অসাধারণ শিল্পীকে করে তার কীর্তির চেয়ে মহৎ জীবনশিল্পী।

সম্ভ্রান্ত পরিচয়, সচ্ছল সম্পত্তি, সুখী সন্তান, রূপে ও গুণে সমান আকর্ষণীয় স্ত্রী সোফিয়া, সৃষ্টির উদ্দাম প্রেরণা, খ্যাতির কলরবমুখরিত প্রাঙ্গণ কিছুই সেদিন ধরে রাখতে পারে নি তাঁকে, কীর্তির চেয়ে মহৎ এক মানুষে উত্তীর্ণ হচ্ছিলেন যিনি নিজেরও অগোচরে; সেই শিও তলস্তয়ের Confession তারই পরিচয়ে প্রদীপ্ত:

"And all this befell me at a time when all around me I had what is considered complete good fortune. I was not yet fifty; I had a good wife who loved me and whom I loved; good children, and a large estate which without much effort on my part improved and increased. I was praised by people, and without much self-deception could consider that my name was famous.... I enjoyed a strength of mind and body such as I have seldom met among men of my kind: physically I could keep pace with the peasants at mowing, and mentally I could work for eight to ten hours at a stretch without experiencing any ill results from such exertion."

এই সময়েই এই জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্তেই তাঁর চরম কনফেশান:

"My mental condition presented itself to me in this way: My life is a stupid and and spiteful joke that someone has played on me."

পতন-অভ্যুদয়ে দুর্গম বন্ধুর জীবনের দীর্ঘপথ তলস্তয়ের। সেই পথ মোড় নিল আরেকবার; শেষবার। এই পথের শেষ কোথায় তাই নিয়েই যুদ্ধ ও শান্তির, জীবন ও মৃত্যুজিজ্ঞাসা তলস্তয়ের শিল্পী-জীবনকে যেমন

আলোড়িত করেছে, তেমনই সেই মহৎ অন্বেষণই তাঁর সব কীর্তির চেয়ে অনেক সৎ, অনেক মহৎ তলস্তয়কে করেছে মহত্তর জীবনশিল্পী।

লিও তলস্তয়ের বয়স তখন পঞ্চাশ।

ছেলেবেলা থেকেই প্রায় অথবা বলা ভাল আকৈশোর তলস্তয় তথাকথিত গীর্জার ধর্মে আস্থা হারিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরবার জন্যেই আকুল হয়ে উঠলেন তিনি। জীবনজিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি, ক্ষ্যাপা খুঁজে বেড়াচ্ছিল পরশপাথর ["He asked himself, 'Why do I live and how ought I to live?'"]। নিজের অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে উত্তর উঠে এল তা হচ্ছে: "If I exist, there must be some cause of it, and a cause of causes. And that first cause of all is what men call God"। নীতিবাগীশদের অপরের জন্য একরকম আচরণ নির্দেশ, নিজেদের নীতিবিরুদ্ধ নব নব চারণক্ষেত্রে বিচরণ, তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তিনি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে থাকলেন অতি সাধারণ, দরিদ্র, অন্নবস্ত্রআশ্রয়হারা মানুষদের স্বাভাবিক, শান্ত, সহজ ভগবদ্বিশ্বাসের দিকে। কুসংস্কারের অন্ধমহিমাচ্ছন্ন জীবন সত্ত্বেও তারা যা পেয়েছে তাতেই দুর্বহ দুঃখের জীবনকেও মেনে নিতে হয়েছে সক্ষম। আলো-হাওয়া-নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন জড়িত এই ভগবদ্বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করল তাঁকে।

যাঁর মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন এই জ্যোতির্ময়ী বিশ্বাসের জাগ্রত ও জ্বলন্ত প্রমাণ—তিনি যীশু।

যীশুখ্রীষ্টের বার্তা দস্তয়ভস্কির মনেও সাড়া তুলেছিল; তলস্তয়েরও। পৃথিবীর প্রচুর লেখককেই ধর্মগ্রন্থ প্রভাবিত করে। কিন্তু জীবনে তার বাণীকে মূর্ত করে তোলার দুঃসাহস করেন না তাঁরা কেউ। তলস্তয় সেই খুরের ওপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও দুঃসাধ্য দুর্গম পথে পা বাড়ালেন। ঈশ্বরতনয়ের বাণীকে মূর্ত করে তোলবার সাধনায় তলস্তয় কিন্তু প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের অনুজ্ঞার প্রতি বিপুল অশ্রদ্ধায় তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। কেবলমাত্র যীশুর বাণীকেই তিনি আক্ষরিক অর্থেও সত্য জ্ঞান করলেন [..."he came to believe that the truth was to be found only in the words of Jesus."] যীশু বলেছেন, "Swear not at all"; তলস্তয় বললেন, আদালতকক্ষে সাক্ষীর অথবা সৈনিক-জীবনসঙ্গত শপথগ্রহণও অকর্তব্য। যীশু বলেছেন "Love your enemies, bless them that curse you,"। তলস্তয় তার অর্থ করলেন যে, শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো না, দেশ আক্রান্ত হলেও ধরো না অস্ত্র। তাঁর কোন বাণীকে বিশ্বাস করা মানেই জীবনে তাকে প্রতিমুহূর্তের কর্মে মূর্ত করা। যীশুর ধর্ম মানে যদি প্রেমের ধর্ম হয়, স্বার্থকে হয় অস্বীকৃতির ধর্ম, দীনতার মধ্যে, আঘাতের প্রত্যুত্তরে আলিঙ্গনের মধ্যেই যদি এই বিশ্বাসের বীজ নিহিত থেকে থাকে, তবে, তলস্তয়ের কাছে তা কর্মক্ষেত্রে অঙ্কুরিত করে না তুলতে পারলে তাকে যথার্থ 'বিশ্বাস' বলে বিশ্বাস্য মনে হল না। [The World's Ten Greatest Novels]

তলস্তয় সমাজের উচ্চমঞ্চ থেকে সর্বহারাদের নীচুতলায় নামলেন। আকাশচুম্বী স্বপ্নলোকের মিনার থেকে দুঃখধন্দার রিক্তপ্রান্তে; মর্ত্যলোকের লৌহবাসরে। বিদায় দিলেন নিজের জীবন থেকে বিলাসবাহুল্যকে। নিজের হাতে নিজের কাজ করার প্রেরণায় উদ্বোধিত তলস্তয় উনুন জ্বালানো থেকে শুরু করে জল বওয়া, কাপড় ধোয়া বাকি রাখলেন না কিছুই। এবং থামলেন না এখানেও। অতঃপর নিজের রুটি নিজে রোজগারের ধান্দায় বেরুলেন মুচির কাছে জুতো তৈরীর কাজ শিখতে ["...he got a shoemaker to teach him to make boots."]। চাষাদের সঙ্গে চললেন চাষ করার, কাঠ কাটার আনন্দে।

মানুষ যতক্ষণ ধর্মগ্রন্থ পড়ে, সেই সব উপদেশ অন্যকে বিতরণ করে, ততক্ষণ ঘরে-বাইরে কেউ বিব্রত বোধ করে কদাচ। কিন্তু ধর্মোপদেশ অনুযায়ী কেউ যদি নিজে চলতে চায়, বদলাতে চায় নিত্যদিনের জীবনধারা, যদি সত্যসত্যই কেউ ধরে ধর্মকে কর্মের মধ্যেও তা হলে তার সম্পর্কে অচিরেই ঘরে-বাইরে লোক ভাবতে শুরু করে। বাইরের লোকের ভাবনার চেয়ে ঘরের লোকের দুর্ভাবনা বাড়ে অনেক বেশী। সোনিয়া তলস্তয় এতদিন একটি কথাও বলেন নি। এবারে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না:

"Of course you will say, that to live so accords with your convictions and that you enjoy it. That is another matter and I can only say : enjoy yourself ! But all the same I am annoyed that such mental strength should be lost at log-splitting, lighting samovars and making boots—which are all excellent as a rest or a change of occupation ; but not as a special employment."

সমারসেট মম্‌ও তলস্তয়ের এই দৈহিক পরিশ্রমের বাতিককে বরদাস্ত করতে পারেন নি :

"It was a stupidity on Tolstoy's part to suppose that manual labour is in any way nobler than mental labour. Even if he thought that to write novels for idle people to read was wrong, it is hard to believe that he couldn't have found a more intelligent employment than to make boots, which he made badly and which the people to whom he gave them could not wear."

কিন্তু এহ বাহ্য। তলস্তয় এখানেই থামলেন না। চাষীর পরিচ্ছদ হল তাঁর অপরিচ্ছন্ন, অগোছাল প্রচ্ছদ। শিকারের নেশায় একদা-পাগল তলস্তয় শিকারই নয় কেবল মাছমাংস ভোজনও ত্যাগ করলেন। তারপর সুরা এবং দুরূহ প্রচেষ্টায় মুক্ত হলেন তামাকুসেবনের হাত থেকে। এই সময় তলস্তয়ের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে মস্কো যেতে বাধ্য করলেন তলস্তয়কে। মস্কোয় অভিজাতদের সঙ্গে বিত্তহীনদের অবস্থার আসমান-জমীন ফারাক প্রত্যক্ষ করে বিক্ষুব্ধ বিচলিত তলস্তয়ের বিক্ষত হৃদয় দুঃসহ, দুরন্ত বেদনায় বিস্ফারিত হল :

"I felt and feel, and shall not cease to feel, that as long as I have any superfluous food and some have none, and I have two coats and someone else has none, I share in a constantly repeated crime."

উপদেশ বিতরণ করাই যাঁদের পেশা, দেশে দেশে, যুগে যুগে, কাব্যের উপন্যাসের প্রবন্ধের চিত্রের কখনও কখনও বিচিত্র মাধ্যমে, বাণীর, সেই প্রফেটরা যা বলেন তা করেন না নিজেরা ; যা নিজেরা করেন তা অন্যদের বলেন না কখনই। কাব্যজীবনের সঙ্গে কবিদের জীবনকাব্যের সম্পর্কের হিসেবে গুরুতর গরমিলই জগতে স্বাভাবিক। রাজনৈতিক বক্তৃতা, নৈতিক উন্নতির বাণী যাঁরা দেন তাঁদের কথা তাঁদের মুখের, মনের নয়। সাধারণ লোক এতে বিস্মিত হয় না আর ; তারা একে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার বলেই মেনে নিয়েছে। এর কারণ, সাধারণরাও যখন অন্যান্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তখনও নিজেদের মনে করে সমালোচনার অতীত। পৃথিবীতে এই ব্যবহারের ব্যতিক্রম সাধারণ্যে ও অসাধারণ্যে এত বিরল যে কোটিকে গোটিক এমন কারো কদাচিৎ দেখা পেলে লোকে তাকে নির্বোধ ভাবে ; নয় ভাবে খেপা। তলস্তয়কে বাইরের লোকরা 'দেবতা' বানালেও তাঁর ঘরের লোক, তাঁর স্ত্রী সোফিয়া [সোনিয়া] তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে এ কথা প্রায় প্রকাশ্যে, আদালতে পর্যন্ত বলবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। হবার কারণ ছিল।

তলস্তয় তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা সম্পত্তির বার্ষিক আয় আড়াই হাজার টাকায় নামিয়ে এনেছেন সম্পত্তি তদারক না করার গুণে। তার ফলে একাধিক সন্তানের সংসার চালানো যখন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তলস্তয়ের স্ত্রী প্রকাশনী ব্যবসার পত্তন করেন ; তলস্তয় ১৮৮১ সনের আগে পর্যন্ত যা লিখেছিলেন সেই বইগুলির ওপর নির্ভর করে এই প্রকাশনী ব্যবসার জন্যে দেনা করতে পর্যন্ত দুঃসাহসী হয়েছিলেন। তাঁর এ দুঃসাহস আশাতীত সাফল্যে পুরস্কৃত হয়েছিল সেদিন। সংসারনির্বাহ ব্যাপারে এনেছিল অনেক নিশ্চিন্ততা। কিন্তু তলস্তয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তখন property is theft। ১৮৮১ সনের পর তাঁর যাবতীয় রচনার স্বত্ব তিনি জাতিকে দান করেন। তলস্তয়ের স্ত্রী ক্ষুব্ধ হলেও, মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হলেও কিছু বলেন নি। কিন্তু তলস্তয় যখন তাঁর সেই সময়ের প্রধান শাগরেদ Chertkov-এর পরামর্শে ১৮৮১ সনের আগের বইও সাধারণের সম্পত্তি করে দিতে উদ্যত হলেন তখনই রুখে দাঁড়ালেন সোনিয়া অথবা সোফিয়া তলস্তয়। সন্তানদের, নিজের, সংসারের চাকা ঘোরা নির্ভর করছে যার ওপর তা দাতব্য করবার অধিকার তলস্তয়ের আছে বলে তিনি স্বীকার করতে পারলেন না।

সোনিয়া বা সোফিয়া তলস্তয়ের মনের ছবি তাঁর

দিনলিপির পাতায় মুদ্রিত হচ্ছিল অনেকদিন থেকেই: "I cannot help complaining because all these things he practices for the happiness of people complicate life so much that it becomes more and more difficult for me to live."

সোনিয়ার তীব্র অন্তর্দাহের কারণ তলস্তয়ের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন যে, সে তলস্তয়ের ওই প্রধান শাগরেদ Chertkov। এই শিষ্যের দুরন্ত প্রভাব গুরু তলস্তয়ের ওপর জীবনের বাকি কদিন গুরুপত্নীকে ক্রোধে আত্মহারা করে তুলল। তলস্তয়কে করল ছিন্নভিন্ন। কারণ: "While to most of Tolstoy's friends his views seemed extreme, Chertkov constantly urged him to go further and apply them rigidly." একদিকে স্ত্রীর ক্ষোভ তলস্তয়ের বদান্যবৃত্তি নিয়ে; অন্যদিকে শিষ্যের চিত্ত-বিক্ষোভ গুরুকে সর্বত্যাগের আদর্শে পৌছতে দেরি করতে দেখে ["He was torn between conflicting claims neither of which he felt it right to repudiate."]।

তীর এল কিন্তু তলস্তয়ের জীবনে যেদিক থেকে তীর আসবে কোনওদিন ভাবেনই নি তিনি।

তলস্তয়ের বয়স যখন আটষট্টি, চৌত্রিশ বছর উদ্‌যাপিত হয়েছে যখন দাম্পত্যজীবনের, ছেলেদের অনেকেই জোয়ান হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহ যখন প্রায় স্থির, তখন সোনিয়া বা সোফিয়া তলস্তয় প্রেমে পড়লেন এক যুবকের সঙ্গে নতুন করে। যুবকের নাম: Tanaev; পেশায় কম্পোসার। সোনিয়া বা সোফিয়া তলস্তয়ের বয়স তখন বাহান্ন। বিচলিত, বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, প্রবঞ্চিত রিক্ত তলস্তয় স্ত্রীকে লিখলেন সোজাসুজি:

"Your intimacy with Tanaev disgusts me and I cannot tolerate it calmly If I go on living with you on these terms, I shall only be shortening and poisoning my life. For a year now I have not been living at all. You know this. I have told it to you in exasperations and with prayers. Lately I have tried silence. I have tried everything and nothing is any use. The intimacy goes on and I can see that it may well go on like this to the end. I cannot stand it any longer. It is obvious that you cannot give it up, only one thing remains—to part. I have firmly made up my mind to do this. But I must consider the best way of doing it. I think the very best thing would be for me to go abroad. We shall think out what would be for the best. One thing is certain—we cannot go on like this."

লিখলেন বটে তলস্তয় কিন্তু তাঁর জীবনীকার জানাচ্ছেন: "But they did not part; they continued to make life intolerable to one another."

স্ত্রীর সঙ্গে অপ্রণয়ের বেদনা, আদর্শের লক্ষ্যে পৌছতে না পারার বিকার তলস্তয়ের জীবনকে আঘাতে-আঘাতে বেদনায়-বেদনায় নিকটতর করল সেই 'কঠিনে'র যে 'কখনও করে না বঞ্চনা', যার নাম সত্য। মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ এবং সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এই জীবন-মৃত্যুর বাণীই 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র মর্মবাণী। এ লড়াই তলস্তয়ের নিজের সঙ্গে। নেপোলিয়নের রাজ্যাভিযান War & Peace-এর বহিরঙ্গ। অন্তরতঃ এ গ্রন্থ তলস্তয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিকৃতি। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, শুভের সঙ্গে অশুভের, 'সুন্দরে'র সঙ্গে 'অসুন্দরে'র, প্রাচুর্যের সঙ্গে অভাবের, নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের, শান্তির সঙ্গে হিংসার, আলোর সঙ্গে ছায়ার, অভয়ের সঙ্গে ভয়ের, অনুরাগের সঙ্গে রাগের, রৌদ্রের সঙ্গে মেঘের, ফুলের সঙ্গে কাঁটার, অপরূপের সঙ্গে রূপের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সংঘাতে যেখানে 'কালের মন্দিরা বাজছে, ডাইনে-বাঁয়ে দুই হাতে,' মহাকালের রণরঙ্গভূমি যে সংঘাতে নিত্য আবর্তিত, মথিত-উন্মথিত হচ্ছে তারই মহাকাব্য 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বিশেষ করে তলস্তয়ের, কিন্তু নির্বিশেষে সকল মানুষের; বিশেষ এক যুগের হয়েও তা চিরযুগের জীবন-মহাকাব্য।

[ক্রমশঃ]

প্রসঙ্গ কথা

[১১৩ পৃষ্ঠার পর]

২. মননক্ষমতার স্ফূর্তি ব্যতীত মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্ভব নয়, কারণ মানুষ অর্থই মননশীল প্রাণী।

৩. অতএব সমগ্র মানবজাতির পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া উচিত।

এখানে একই বক্তব্যের পুনরুক্তি করেছি, কেবলমাত্র একটু রোমান্টিক বর্ণাবলেপনে আকর্ষণীয় করে। রোমান্টিক কারণ এখানে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা যেন স্বার্থপ্রণোদিত নয়: সমগ্র মানুষজাতির উদ্ধারের জন্য যেন বুদ্ধিজীবী অত্যন্ত নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে নামতে চাইছেন।

কিন্তু স্বার্থহীনতার ভান করার প্রয়োজন নেই। রাজনীতিতে ভান প্রচুর হয়েছে; শ্রমিক স্বার্থের ভান, ধর্মের স্বার্থের ভান। ভারতীয়দের উপচিকীর্ষার ভান করে ইংরেজ ভারত-শাসন করেছে দুই শতাব্দী। বুদ্ধিজীবীরা আর ভান না-ই বা করল।

বুদ্ধিজীবীরা বলুক না কেন সোজাসুজি: আমরা অন্য সকল মানুষের চাইতে শ্রেয়তর, কারণ আমরা সকলের চাইতে পূর্ণতর! হিটলারের আর্যজাতির শ্রেষ্ঠতার থীসিস যদি রাজনীতিতে দুদিনও স্বীকৃত হয়ে থাকে, তবে এ থীসিসও স্বীকৃত হবে। বলুক না কেন: বুদ্ধিজীবীর ডিক্টেটরশিপ ব্যতীত রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে সেই পরিপূর্ণ মানবিক সমাজ গঠন অসম্ভব, যে সমাজের স্বপ্ন দেখে এসেছেন প্লেটো থেকে গান্ধীজী। লেনিনের ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলিটারিয়েট মারফত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা যদি অবিশ্বাস্য না হয়ে থাকে, এ থীসিসও অবিশ্বাস্য হবে না। বলুক না কেন: Of the people, for the people, by the people নয়; রাষ্ট্র হোক of the intellectual, for the intellectual, by the intellectual! একমাত্র এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই ক্ষীয়মাণ রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব, একমাত্র এই রাষ্ট্রই মানুষের শোষণে উদ্যত না হয়ে সেবায় ব্যাপৃত হতে পারে। অন্য কোন রাষ্ট্র নয়।

মুসলিম-রাষ্ট্রে হিন্দু আশ্রয় পেতে পারে, কোনদিন হয়তো প্রশ্রয় পেতে পারে; অধিকার পেতে পারে না পরিপূর্ণ মানুষের; তার মনুষ্যত্ব সেখানে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষুণ্ণ। হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমান তেমনি। ধনিক রাষ্ট্রে শ্রমিক শোষিত না হোক শাসিত হবেই। শ্রমিকের রাষ্ট্রে ধনিককে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। সমাজতন্ত্রে ননকনফরমিস্ট শ্বাসরুদ্ধ। গণতন্ত্রে মাইনরিটির রক্ষাকবচ আছে, সমান অধিকার নেই।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীর রাষ্ট্রে কেউ বঞ্চিত, অস্বীকৃত, দূরাপসারিত থাকতে পারে না। কারণ বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমানের মত ধর্মীয় পরিচয় নয়, ধনিক-শ্রমিকের মত পেশা-নির্ভর নয়, মেজরিটি-মাইনরিটির মত জনতার ভোটাভুটিতে নির্ণীত নয়।

বুদ্ধিজীবী হচ্ছে মানুষের মধ্যে সেই মানুষেরা যারা ডারুইনের তত্ত্ব-অনুযায়ী বিবর্তনের সর্বাগ্র সারিতে এসে পৌঁছেছে। আপন স্বার্থে তারা সকল মানুষকে বিবর্তনের সেই স্তরে টেনে নেবে এবং যেদিন সকল মানুষ প্রকৃত মননক্ষমতার অধিকারী হবে—একদিন হবেই, যদি বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্র-পরিচালনা করেন, এ শুধু সময়ের প্রশ্ন—সেদিন রাষ্ট্র হবে নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্রের মৃত্যু-উৎসব সেদিন পূর্ণমানবতাপ্রাপ্ত মানুষের সমাজে।

এর পরেও অসংখ্য প্রশ্ন অনুত্তরিত থাকে। কী ভাবে বুদ্ধিজীবীর রাষ্ট্র সংগঠিত হবে? কী পন্থায় প্রতিষ্ঠা হবে তা? কেন বুদ্ধিজীবী ব্যতীত অপর মানুষ মেনে নেবে সে রাষ্ট্রকে?

এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর আমি জানি না। শুধু এই বলতে পারি, প্রত্যেক রাষ্ট্র যেমন করে জন্মেছে—তেমনি করেই জন্মাবে বুদ্ধিজীবীর রাষ্ট্র: বিপ্লবের ফলে। সে-বিপ্লব সশস্ত্র যদি হয় তবে সে অস্ত্র ইস্পাতের নয়, চিন্তার, মননের। সে-বিপ্লবে যদি রক্তপাত ঘটে তবে সে রক্ত কুসংস্কারের, নির্বুদ্ধিতার।

সকল প্রশ্নের উত্তর যদি আমার জানাই থাকত তবে তো আমিই হতাম সেই অনাগত Philosopher King, কলিযুগাবসানের কল্কি অবতার! আমি সে নই; আমি কেবল তার পদধ্বনি শুনতে পাই; সত্যই, অথবা অলস কল্পনায়—জানি না।

॥ ছয় ॥

এইবার আমার প্রবন্ধ শেষ করার সময় এসে গিয়েছে; অতএব শেষ কথাগুলি বলে ফেলা প্রয়োজন।

আমার আর্টিস্ট সত্তা রোমান্টিক; কিন্তু সেই রোমান্টিক সত্তা ছাড়াও আমার অস্তিত্বের উল্লেখ্য অংশ রয়েছে, যে-সত্তা যুক্তিবাদী। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আমি নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রম নই। আমরা প্রত্যেকেই অংশতঃ যুক্তিবাদী, অংশতঃ রোমান্টিক।

বুদ্ধিজীবীর রাজনীতি সম্পর্কে আমি এতক্ষণ যা কিছু মত প্রকাশ করেছি—যুক্তিতর্ক সহযোগে প্রকাশ করলেও—সেগুলি আমার রোমান্টিক সত্তার বক্তব্য। এ কথা শুনে কেউ যদি আমাকে তিরস্কার করেন তবে তাঁকে স্মরণ করতে বলব সেই বুদ্ধিদীপ্ত জনশ্রুতি: সাহিত্যিকগণ মস্তিষ্কের বক্তব্যকে হৃদয়ের নামে চালিয়ে দেন; আর পলিটিশিয়ান হচ্ছেন তিনি, হৃদয় থেকে উৎসারিত বক্তব্যকে যিনি মস্তিষ্কের বক্তব্য বলে চালান।

রাজনীতি সম্পর্কে প্রবন্ধ-রচনায় তাই যদি আমি দু-চারটি সেন্টিমেন্টাল বক্তব্যকে যুক্তিসম্মত প্রপোজিশন হিসাবে উপস্থাপিত করে থাকি তবে আর্টিস্টের ক্ষমা না পাই পলিটিশিয়ানের ক্ষমা পাব নিশ্চয়।

এবং বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় সত্তার, যুক্তিবাদী সত্তার, বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত: রাজনীতিকে কুশ্রীতামুক্ত করা অসম্ভব; রাজনৈতিক কর্মপন্থার প্রতি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গত প্রতিক্রিয়া—সার্বিক অসহযোগ।

কিন্তু কে বলতে পারে সত্যের অন্বেষণে হৃদয়বৃত্তির সাক্ষ্য সম্পূর্ণই অবিশ্বাস্য কিনা? যাকে আমরা হৃদয় বলি, শারীরবৃত্তের হৃৎপিণ্ড তো নয় তা; সেও তো মস্তিষ্ক—মস্তিষ্কের গভীরতর প্রকোষ্ঠে তো হৃদয়বৃত্তির বাসভূমি! তাই হৃদয়ের বক্তব্যকে উপেক্ষা করি না আমি। গান্ধীজী যখন রাজনীতিতে inner voice-এর উল্লেখ করেছিলেন, সেদিন কেউ কেউ হেসেছিল। কিন্তু তাদের উপহাসসত্ত্বেও কেউ কেউ বুঝেছিল inner voice বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, বরং তা হচ্ছে একটি পরিশীলিত মনের গভীরতায় সঞ্জাত দুর্বোধ যুক্তিজালের প্রকাশিত সিদ্ধান্ত।

পরিশেষে সমগ্র প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন বোধ করছি। তা হচ্ছে এই:

পেশাদার পলিটিশিয়ানদের অসুস্থ প্রভাবে রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে বুদ্ধিজীবীদের ক্রমশঃ নির্বাসন ঘটছে। এখন নির্বাসিত বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য এমন একটি মনন-বিপ্লব সংঘটিত করা যার ফলে রাজনীতি ও রাষ্ট্রসংজ্ঞা দুটির নূতন বিশুদ্ধ অর্থে বিবর্তন হয়; সেই বিশুদ্ধ অর্থে রাজনীতি Philosophy-র নামান্তর, রাষ্ট্রের নামান্তর Humanity.

কোনদিন এরূপ বিপ্লব হবে কিনা সে ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার সাধ্য নয়। আমি শুধু বলতে পারি, এ-বিপ্লবের alternative ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে একটি ছোট ফরমুলায়: যে-ফরমুলাতে গণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন একসঙ্গে প্রকাশিত। সেটি হচ্ছে $E = mc^2$, পরমাণুর রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর মূলতত্ত্ব!

●

শতাব্দী শতক—রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি কবিতা-সংকলন ॥ ১৮৬১-১৯৬১। সম্পাদনা: প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিনয়শঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। চার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক শতাব্দীর (১৮৬১ থেকে ১৯৬১) একশত কবির একশত কবিতা এই 'শতাব্দীশতকে' সংকলিত হয়েছে। সংকলয়িতারা বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উৎসবের পটভূমিকায় এই ধরণের কবিতা সংকলনের উদ্যোগ আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।"

নিঃসন্দেহে এই উদ্দেশ্য সংকলনটির বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্য? সংকলয়িতাদের ভাষায়: "সত্যকার কাব্যরসিক পাঠক-সাধারণের কাছে এ সংকলন শুধু এই দাবীটুকু সবিনয়ে জানাতে চায় যে মধুসূদনের যুগ থেকে এ পর্যন্ত বাংলা কবিতার বিচিত্র বিপুল গতি তরঙ্গের একটি যথার্থ রেখাচিত্র ও তার স্বতঃস্ফূর্ত বিশেষত্বের এমন কিছু স্বাদ এর মধ্যে পাওয়া যাবে যা বিস্তারিত ও ঘনিষ্ঠতর সন্ধানের ব্যাকুলতা জাগায়।"

এই সংকলনকে বিচার করতে হলে এই রেখাচিত্রের যাথার্থ্য বিচার করতে হয় প্রথম। এই কাব্যপ্রবাহ যে স্বাদ বহন করছে তার বিশেষত্বকে নির্দেশ করাও বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

* * *

কবিতা আবিষ্কার। মানুষের চেতনার সমুদ্র থেকে নূতন ভূমিখণ্ড উদ্ধারের মত কিংবা চেতনালোকে এক্সপ্লোরেশন। চেতনার ক্ষেত্রে নব নব দেশ আবিষ্কার। একটা জাতির এক যুগের কাব্যকে পরিক্রমা করলে তার চেতনার মানচিত্রের পরিবর্তন ধরা যায়। ১৮৬১ থেকে ১৯৬১ এই শতাব্দীতে বাঙালী জাতির চেতনার মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা যেমন অভাবনীয় তেমনি দূরপ্রসারী। এই পরিবর্তন এখনও ঘটে চলেছে।

মধ্যযুগের বাঙালী মানসের জাড্য, পৌরাণিক প্রতীক-আশ্রিত চিন্তা, নানা 'ট্যাবু' ও কুসংস্কারের বন্ধনে রুদ্ধশ্বাস ভাবনা, বাছা কয়েকটা অনুভূতির পুনরাবৃত্তির গোলক-ধাঁধা ভেদ করে, চূর্ণ করে আবির্ভূত হলেন মধুসূদন। বাংলাকাব্য বহু যুগের সঞ্চিত শুষ্ক ক্লেদ ভেদ করে নবজন্ম গ্রহণ করল। কাব্যের আকার পর্যন্ত বদলে গেল। মধুসূদনের মধ্যে বাংলা কবিমানস নূতন বীর্য নিয়ে নবজন্ম লাভ করল। পুরাতনের খোলস ভেঙে নূতন চেতনার আবিষ্কার হল। তত্ত্ব নয়, তথ্য নয়, ব্যক্তিগত অনুভবে কবিতা নূতন প্রাণ পেল। জন্ম হল লিরিকের। আশ্চর্য, নৃসিংহের মত পৌরাণিক প্রতীকে নূতন অর্থারোপ করা হল:

> "যাও নারি, যাও ফিরা', নতুবা ও বক্ষ চিরা'
> চুষে নিব হৃদপিণ্ড শুষে নিব হাড়,
> প্রেমের ভীষণ দৃশ্য, নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব,
> ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
> দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।"
>
> (গোবিন্দচন্দ্র দাস, জন্ম ১৮৫৪-১৯১৮)

কবিতায় প্রধান হল অনুভবের লীলা। চেতনার নূতন তন্ত্রী সন্ধান। যে তন্ত্রীতে প্রকৃতি তার অঙ্গুলি সাধে, যে তন্ত্রীতে স্বপ্ন বেজে ওঠে। ব্যক্তিগত অনুভব হল প্রধান। এই অনুভব নিজেকে আকার দেবার প্রেরণায় চার পাশে প্রকৃতির মধ্যে প্রতীক সন্ধান করতে ব্যস্ত হল। পৌরাণিক প্রতীক প্রায় বিলুপ্ত হল। বিহারীলাল ও তাঁর পথের পথিক কবিরা প্রকৃতি থেকে প্রতীক তৈরি করলেন। বাহ্য প্রকৃতিকে আন্তর প্রকৃতির ভাষ্যরচনার কাজে লাগালেন। এই নতুন নতুন প্রতীক সৃষ্টিতে চেতনার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেল। চেতনা তো প্রতীক আশ্রয়ী।

সুদীর্ঘ মধ্যযুগে নারীপুরুষের সম্পর্ক এমনি একটা সামাজিক, মানসিক আবছায়ার মধ্যে ছিল, কুসংস্কারের এমন একটা ঘোলাটে আবহাওয়ায় যে নারীপুরুষের প্রেমের প্রকাশ্য উচ্চারণ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ যে সমাজে

ছিল তা নয়, এই নিষেধ ছিল মনে। এই নিষেধকে অমান্য করে কবি নারীরূপের জয়গান গেয়ে উঠলেন :

"যাদুকরি, তুই এলি —
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য ; তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায় !
শব্দ হয় অর্থবান
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?"

(দেবেন্দ্রনাথ সেন, ১৮৫৫-১৯২০)

চেতনার আর একটা মোহমুক্তি। অনুভবের আর একটা নতুন বিস্ময়কর চত্বর নতুন করে আবিষ্কার। ব্যক্তি-চেতনার দিক হতে দিগন্তরে কবির যাত্রা শুরু হল। ব্যক্তিচেতনায় মুক্তি।

এই ধারার পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। ব্যক্তিচেতনা প্রসার লাভ করতে করতে বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে গেল। কবি বিস্মিত হয়ে নিজের মধ্যে প্রকৃতিকে আর প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলেন :

"আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হ'ল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।"

(রবীন্দ্রনাথ, ১৮৬১-১৯৪১)

এই উচ্ছ্বাসের পর কবিমানস স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠল :

"আমি যে মহান্
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্যপ্রধান !"

বাঙালী কবির চেতনা মধ্যযুগকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ করে স্বাধীন হয়ে উঠল।

রবীন্দ্র-যুগের বা রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মর্মকথা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ('অন্যপৃথিবী') মূর্ত হয়ে উঠেছে :

"এই-যে পরিচয়ের পূর্ব মুহূর্ত কুয়াশার যবনিকাটি ঢুলছে, এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান, একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে, সে দিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে। এই কথাটাই এক-গোছা সবুজ পাতা আমার জানালার কাচের বাহিরে কেবলই যা দিয়ে জানাচ্ছে কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির পর একটি দূত—চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোটো একটি মৌমাছি—তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে, এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে দিনের মধ্যে শতবার।"

চেতনা একটা অজানার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই অজানা জাগ্রতে স্বপ্নে কবিচিত্তকে আকুল করেছে। এখনও বাঙালী কবিমানসকে উন্মনা করছে। সৃষ্টির রহস্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সংস্কারের ঝুলিঝোলা পথে ফেলে দিয়ে বিশ্বের মুক্ত অঙ্গনের কিনারায় দাঁড়িয়ে হারিয়ে গেছে বিস্ময়ে। বিপুল বিস্ময়ের কাব্য রচিত হয়েছে। চেতনার ঘুম যখন সম্পূর্ণ ভাঙল তখন সে চতুর্দিকে চেয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

একদিন যে প্রকৃতিকে চেতনার আত্মপ্রকাশের প্রতীক করা হল, যে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের ভাষায় অনুভব আকারিত হল, সেই প্রকৃতির সঙ্গে কবিমানস একাকার হয়ে গেল। প্রকৃতির সঙ্গে আর কোনও বিচ্ছেদ রইল না।

"ওগো, সে কামনা মোর জ্ব'লে নিবে গেল
শিমুলের শাখে শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি বৈশাখে।"

(মোহিতলাল মজুমদার, ১৮৮৮-১৯৫২)

কবি একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্যপ্রধান।

এইখানে যেন রবীন্দ্র-চেতনার ক্ষান্তি। চেতনার এই একাকার মানচিত্র সহসা বদলে গেল জীবনানন্দ-চেতনায় পৌছে। অনুভবে বিশ্বের সঙ্গে একাকার হয়ে যেন আকার হারিয়ে গেল। জীবনানন্দ আকার সন্ধান করতে লাগলেন। নতুন পদযাত্রা শুরু হল। এবার কিন্তু মননের যষ্টিটা হাতে নিয়ে। চিত্রকল্প বদলে গেল। নতুন প্রতীকের হল সন্ধান। আধুনিক কবিতা জন্মাল। আধুনিক চেতনা বিশ্লিষ্ট চেতনা। একদিকে পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, যুদ্ধ, যুদ্ধভয়, অভাব, দৈন্য, আরেক দিকে সৌন্দর্যের চরম স্বীকৃতি, শান্তির আকুতি। চেতনার এই দ্বন্দ্ব আবির্ভূত হল কবিতায়।

"মৃত-সাগরের চারি পাড়ে আজ আমরা করেছি ভিড়,
ভিড় করিয়াছে গাঢ় তিমিরের তীরে,"
(সজনীকান্ত দাস, ১৯০০)

নিজের সমাজ নিজের দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে কবিমানস তীর্থযাত্রা শুরু করল শান্তির সন্ধানে। কাব্যের বাক্‌প্রতিমার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রশ্ন এল অনুভূতিতে। অনুভূতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

"তুমি ত মরে গিয়েছ,
তবে কেন কাঁপ্‌লে?"
(মনীশ ঘটক, ১৯০১)

এই থেকে নতুন কথার সন্ধান হয়েছে শুরু। সন্ধান শুরু হয়েছে নতুন উপমার।

চেতনার এই গাঢ় তিমিরের তীরে ঝিল্লীর মত জসীম উদ্দীন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়ের গুঞ্জনে বাংলার কবিমানস তৃপ্ত হল না। বেরিয়ে পড়েছে সন্ধানে।

নতুন প্রতীক সৃষ্টি করছে:

"অমার হাওয়ার মত তাহাদের ছায়ার শরীর,
বাতাসে ঝরিয়া পড়ে, তাহাদেরি শ্লথ কবরীর
বিচ্যুত শেফালি ফুল উষালোকে স্রস্ত পলায়নে—
চোখের মনির মত তারা আছে আমার নয়নে।"
(অজিত দত্ত, ১৯০৭)

প্রকৃতির প্রতীক পরিত্যাগ করে কবি অতিপ্রাকৃত প্রতীক সন্ধান করছেন:

"নেভে আর জ্বলে জোনাকি-যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহ্নির বুদ্‌বুদ!
অট্ট হাসিছে রাতের অট্টালিকা,
দ্বারে বাতায়নে বর্তিকাবিদ্যুৎ।
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রূপালী তীরের ফলক ঝলে;
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া
মূষিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমির-দীর্ণ
সূর্য-হীরক হাসে।" (নিশিকান্ত, ১৯০৯)

এখানে এসে আমরা surrealism-এ পৌঁছে গেছি। চেতনায় যখন জীবনের সমস্যার সমাধান হল না তখন কবিমানস অবচেতনে ডুব দিয়ে প্রতীক উদ্ধার করতে নেমে পড়লেন।

নতুন প্রতীকের সন্ধানে, লজিক বিসর্জিত হল, অপ্রকাশেয়কে প্রকাশ করার জন্যে দূর যাদের অর্থের দ্যোতনা এমনি সব কথাকে একসঙ্গে মিলিয়ে তৈরী হল বাক্‌প্রতিমা। চেতনার সমতলে নয়, চেতনার ঊর্ধ্ব-অধঃ দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে।

"আকাশে প্রত্যূষা-লিপি স্বপ্নিকা উষার মন আঁকে।
তেমনি এ মদালসা পৃথিবীর পৃথুলতা তামসী লতাকে
ডেকে আনে, কানে-কানে কয় সেই ছায়া-দূতিকারে;"
(সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১৯০৯)

এই সন্ধানের পরিণতি কোথায় কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই।

এই দুঃসহ সন্ধান থেকে ছুটি নিয়েছেন একদল। কবিতাকে সংক্ষেপিত করছেন। কথাকে সংক্ষেপিত করছেন। এমন কি অনুভূতিকেও। সামান্য একটুখানি ইশারায় অনেক কথায় চেষ্টা চলেছে। অরুণ মিত্র, বিমল ঘোষ, অশোক রাহা আরও অনেকে। বেগটা এঁদের মধ্যে কমে এসেছে। স্থিতিটার দিকে ঝোঁক পড়েছে। আর একদল মননকে আশ্রয় করেছেন। সমাজচিন্তা, যুগচিন্তা ইত্যাদি চিন্তার যষ্টি ধরে কাব্য আবিষ্কার করতে চলেছেন।

অবচেতনের কূলে এসে অনেকে ফিরে গেল। কেউ ইশারা দিয়ে চেতনার নতুন দিক নির্ণয় করতে চাইল, কেউ-বা যুক্তিতর্ক তত্ত্বভাবনার লগি দিয়ে দিয়ে গভীরতা মাপ করতে চাইল। এই সব চেষ্টাই চলেছে একসঙ্গে।

কিন্তু আজ আমরা যেখানে পৌঁছেছি সেখান থেকে ফিরতে গেলেই আমরা ফুরিয়ে যাব। এই অতল অন্ধকার অজ্ঞাতের সমুদ্রে এই চেতনার নীচে যে চেতনা, তার মধ্যে ডুব দিতেই হবে। এটাকে আবিষ্কার করতে হবে। মানুষ আজ বহিঃপ্রকৃতির মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে: অন্তরের মহাশূন্যে ডুব আমাদের দিতেই হবে। সেই ডুবুরি-মহাকবির চরণধ্বনি শোনার জন্যে অপেক্ষায় আছি আমরা। কোনও কিছু নকল নিয়ে আর চলবে না। আত্মার মুক্তি চাই।

সন্ধ্যারাগ

শান্তি পাল

ওই হের সান্ধ্যশশী পূর্বাকাশ 'পরে,
অপলক নেত্রে চাহে হিম-গিরি পানে—
তরঙ্গ-মুখর সিন্ধু মুরছিয়া পড়ে,
চন্দ্রিমার জাল ফেলি নভোলোকে টানে।
দাবদগ্ধ দিবসের দাহ হ'ল দূর,
শুচিশুভ্র বয়ানেতে সুমোহন হাসি—
রাত্রির চারণ তোলে বেহাগের সুর,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালে শুকতারা আসি।

কল্পনায় অবগাহি মানসের নীরে
আজি আমি হেরিতেছি জীবন-সন্ধ্যায়,
যৌবনের রাকা-শশী দেখা দিয়া ধীরে
পশ্চিম দিগন্ত পারে নিমেষে মিলায়।
এই হেরি চেনা মুখ, হেরিনাকো আর,
আমার খেয়ার পথে ঘনায় আঁধার।

উনিশে ডিসেম্বর

জগদীশ ভট্টাচার্য

ভুলে কি গিয়েছ বন্ধু ?—হঠাৎ সে শুধাল আমাকে—
আয়ুক্ষীণ বৎসরের লালচিহ্ন শুভ জন্মদিন।
তারি স্বর্ণমঞ্জুষায় কত মুক্তা আজও অমলিন,
কত আনন্দের ফুল মালা হয়ে ঘিরে থাকে থাকে।
ভুলে কি গিয়েছ বন্ধু ?—শিহর-সিঞ্চিত সেই ডাকে
আমার মর্মের মাঝে মর্মরিত বাসনা রঙিন ;
কত লীলাবিলাসের সুখস্মৃতি তাতে হল লীন,
কত বিরহের ব্যথা অশ্রুক্ষরা তারি ফাঁকে ফাঁকে।

তোমাকে ভুলি নি বন্ধু, তুমি চির প্রাণের দোসর,
তোমার উজ্জ্বল স্পর্শে ফুটে ওঠে চিৎ-শতদল,
[illegible]কোষে জমে মধু—বাঞ্ছিতের পরম-প্রাশন।
[illegible]থবীতে আছে প্রেম, তুমি তারি নিত্য-আভাষণ,—
প্রিয়মিলনের দূতী, নবজন্ম-আবেগ-চঞ্চল ;
তোমাকে অর্পণ করি চিরঋণী প্রেমের স্বাক্ষর॥

—

"নকল সাজেই বুঝি বাঁচতে হবে, অন্ধকারে এ অবগাহনে
জীবনে বিস্বাদ লাগে, সমুদ্রের চেয়ে আরো লোনা।"

সমুদ্রের চেয়ে আরও এই লোনাকে আবিষ্কার করবেন কোন্ কবি ? ভাবলে অবাক হতে হয় আমরা একশো বছরে কোথা থেকে কোথায় পৌছেছি! আরও কোথায় পৌছব কে জানে!

এই সংকলনে বাংলার কবিমানসের যে অভিযানের সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে তার যাথার্থ্য সন্দেহের অতীত।

কিন্তু মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্তের মতন এসে পড়েছে অনেক কবির কবিতা। এরা মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। উত্তরে সংকলয়িতা হয়তো বলবেন :

"বাংলা কবিতা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে কখনো কখনো বিদেশী অনুকরণের মোহে বিভ্রান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত নিজের বেগেই নিজেকে মুক্ত [illegible]রে বর্তমান তরুণতম কবিদের রচনায় পর্যন্ত যে তার সত্যকার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের মর্যাদা রেখে অগ্রসর হচ্ছে এ পরিচয়টুকুও পাঠক এ সংকলনে পাবেন।"

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের এ দোহাই আমি মানতে পারলাম না। এ এক ধরনের মিথ্যা স্বদেশ-স্বজাতিপ্রীতি। সম্পূর্ণ naive।

আরও সন্দেহ হয়, প্রতিষ্ঠাবান কয়েকজন ব্যক্তির কবিকর্মের নিদর্শন ইচ্ছে করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা কবিতা এদের কাছে কোনও দিক দিয়েই ঋণী নয়। এদের সৃষ্টি আর যাই হোক কবিতা হয় নি। নামোল্লেখে বিরত থাকলাম। সংকলয়িতা ও পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন এরা কারা।

সংকলন একদিকে ভারী হয়ে পড়েছে। আধুনিক কবিতার ভারটি অত্যন্ত বেশী। এই আধুনিক কবিদের ভার আরও একশো বছর পরে নিঃসংশয়ে অনেক হালকা হয়ে যাবে। শুধু অতীত আর বর্তমানকালের কর দিলেই চলবে না, ভবিষ্যতকেও কিছু কর দিতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যৎ আমাদের কালের এই স্বার্থপরতায় মুচকে মুচকে হাসবে।

শ্রীদেবব্রত রেজ

—

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

সেই তো মল খসালি!

বিশ্বসাহিত্যবিশারদ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু পুনর্বার রঙ পালটাইয়াছেন। গত ৮ই অগ্রহায়ণের (১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড) 'অমৃত' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি আর-একটি মহামূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির নাম—"দুই রবীন্দ্রনাথ: আসলে এক"। এই প্রবন্ধের ফুটনোটে বলা হইয়াছে: "নু ইয়র্কের 'Saturday Review' পত্রিকার ১৩ মে, ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবানুবাদ।" বসু মহাশয়ের এই 'ঈষৎ পরিবর্ধিত ভাবানুবাদ' যে কী বস্তু, তাহা যাঁহারা 'টু সিটিজে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিষয়ক প্রবন্ধ এবং 'বেতার জগতে' তাহার 'ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবানুবাদ' মিলাইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আমি সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলিতেছি না। আমার প্রশ্ন এই যে, নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের হঠাৎ এই 'ঈষৎ পরিবর্ধিত ভাবানুবাদ' প্রকাশ করিবার কি দরকার পড়িল;—অর্থাৎ, 'দুই রবীন্দ্রনাথ: আসলে এক' লিখিবার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য কি বুঝিতে হইলে প্রবন্ধটির মর্ম কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া দরকার। সেইজন্য উহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি:

"রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে; আর তাই ওরা এমন দিশেহারা—ঐ যারা মস্ত লোক আর যারা কিছুই-না—সকলেই বিমূঢ়, হতবুদ্ধি—কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

"এমন নয় যে অকালমৃত্যু। এমন নয় যে অপ্রত্যাশিত। এমন নয় যে উত্তরাধিকার চিরন্তনে পৌঁছবে না। তবু, সেই মুহূর্তে কঠিন মাটি ফেটে গিয়ে গহ্বর খুলে গেলো। 'কী? রবীন্দ্রনাথ নেই? এ কি সম্ভব? তা হলে আমাদের দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো আমরা? কে আমাদের ভালোবাসবেন, শাসন করবেন? কাকে আমরা উত্যক্ত করবো সেই সব তুচ্ছ দাবি নিয়ে, যা শুধু তাঁরই হাতে বস্তু হয়ে উঠতো? স্বদেশের সংকটের সময় কে আমাদের উপদেশ দেবেন? তর্কযুদ্ধ মিটিয়ে দেবেন কে? জগৎটাকে এনে দেবেন আমাদের দরজায়? আমাদের নবজাত সন্ততির নামকরণ করবেন? আমাদের জীবনে ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্পণ করবেন শ্রী ও মর্যাদা?'...

"সব পেশার, সব ধরণের মানুষ একজন কবির মৃত্যুকে ব্যক্তিগত ক্ষতি ব'লে অনুভব করলে, এটা সম্ভব হলো কেমন করে? এর কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়। আকারে ও বিস্তারে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় কবি আর একজন মাত্র আছেন: তিনি গোটে, আধুনিক জর্মান সংস্কৃতির স্রষ্টা।...এক প্রাচীন সভ্যতা যখন ভগ্নস্তূপ থেকে নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রচনা করেছিলেন সেই নবজন্মের এক অবিকল চিত্রকল্পরূপে যা ভারতের পক্ষে মান্য আর বাংলার পক্ষে দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রী। যেন গান গেয়ে-গেয়ে নিজেকেই তিনি সঞ্চারিত করলেন মানুষের হৃদয়ে, বাদানুবাদে খুঁড়ে-খুঁড়ে মনের তলায় পথ করে নিলেন। এই স্বপ্নালস কবি, মেঘের ও অজানার প্রেমিক, তিনিই আবার গদ্যে এক মহাবল পুরুষ; মিল ও ধ্বনিমাধুরীর এই জাদুকর সাময়িক বিষয়ে মন্তব্যপ্রকাশেও ক্লান্তিহীন। যাকে

আজকাল আমরা সাংবাদিকতা বলি, তা যে কত উঁচুতে উঠতে পারে, তারও অন্যতম চরম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবৎকালের এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, বিমূর্ত বা সাংসারিক—যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন নি ; আর যে-কোনো বিষয়ে দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, ব্যাখ্যা সতেজ ও প্রাঞ্জল, ভাষা স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যেন তাঁকে ভাঙিয়েই বেঁচে ছিলো লোকেরা, তিনিই তাঁদের মানসজীবিকা জুগিয়ে যাচ্ছেন। অসম্ভব ছিলো তাঁর দ্বারা কোনো-না-কোনো ভাবে সংক্রমিত না-হওয়া—বিশেষত তাদের পক্ষে, যারা তাঁর ভাষায় কথা বলে, অথবা তা পড়তে পারে। প্রবীণ রাজনৈতিকের তাঁকে ততটাই প্রয়োজন, যতটা কোনো তরুণ কবিযশোপ্রার্থীর। যাঁরা 'কবিতা-টবিতার ধার ধারেন না' তাঁদের পক্ষে তাঁর গদ্য অনতিক্রম্য।" (অমৃত, পৃ. ২৫৩)

এইখানেই শেষ নয়—আরো আছে :

"'বিশ্বমানব' বলতে রেনেসাঁসের ইটালিতে যা বোঝাতো, রবীন্দ্রনাথ সত্যই তা-ই ছিলেন, সেই ভাস্বর বংশের তিনিই হয়তো শেষ পুরুষ।…যা-কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা সবই তাঁর আগ্রহের বিষয়, আর তাই তাঁর জগৎ থেকে ভগবান বাদ পড়েননি। ধর্ম ও 'মানবিক বিদ্যা'র মধ্যে যে-বিভেদ আজ প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে তার অস্তিত্বই ছিলো না ; তাঁর সব চিন্তাকে স্পর্শ করে আছে বৈষ্ণব কবিদের এই উত্তরাধিকার—এক অবিরল অনুভূতি যে ভগবান যেমন মানুষের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি ভগবানের পক্ষেও মানুষ, একের অভাবে অন্যের পূর্ণতা নেই। যাকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের 'দর্শন' বা তত্ত্বের দিক, তার মর্মকথা হলো এই।…সংশ্লেষ : রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মূলসূত্রই তা-ই ; জগৎ ও ঈশ্বরের, মানুষের শ্রম ও সৌন্দর্যের, প্রাচী ও প্রতীচীর সংশ্লেষ।…" (অমৃত, পৃ. ২৫৩-৫৪)

খুবই ভাল কথা। এবং এইরূপ আরও-অনেক উচ্ছ্বসিত ভাল কথায় এই ক্ষুদ্র এবং কুলিখিত প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ। হঠাৎ এইরূপ অতিভক্তি দেখিলে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে ইহা কিসের লক্ষণ। পাঠক সঙ্গতভাবেই, প্রশ্ন করিতে পারেন, এই বুদ্ধদেব বসু কি সেই বুদ্ধদেব বসু, যিনি 'টু সিটিজ' পত্রিকায় 'Western Influence on Rabindranatn Tagore' নামক মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন ? সেই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখিয়াছিলেন : পাশ্চাত্য জগৎ যে রবীন্দ্রনাথকে শান্তির দূত ও প্রাচ্যের ঋষি বলিয়া জানে, তাহা তাঁহার ছদ্মবেশমাত্র ; এবং—"Tagore himself, we must admit, contributed to this idea of himself, both before and after he was acclaimed in the West." কিন্তু আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোমাত্রায় 'য়ুরোপীয়' ; এবং বাহিরে শান্তির মুখোশ পরিয়া থাকিলেও—"in his authentic poems—not excepting the celebrated Gitan-cycle-there runs a streak of dark turmoil, of conflict, struggle and even anguish." এবং "One can detest an insidious war going on in Rabindranath's mind : between the poet and the Indian nationalist, the artist and the religious and social reformer, the lover of beauty and the avowed enemy of imperialism." রবীন্দ্রনাথ আসলে মনেপ্রাণে ছিলেন য়ুরোপীয় ; এবং পাশ্চাত্য কাব্য হইতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে প্রচুর চুরি করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু পরাধীন স্বদেশবাসীর সেন্টিমেন্টের কথা ভাবিয়াই তিনি চিরদিন নিজের য়ুরোপীয় সত্তাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।—"Tagore's attitude to the West was ambivalent, to say the least ; we suspect his admiration or the West was warmer than he felt it to be compitable with the political status of his nation ; and that was why he strove hard to conceal or disguise it in his writings."

সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্যে পূর্ণ এই দুই প্রবন্ধের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথ একই-রবীন্দ্রনাথ কিনা, এবং রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু একই-বুদ্ধদেব বসু কিনা—সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে না। অবশ্য প্রথম প্রশ্নের উত্তর বসু মহাশয় নিজেই দিয়াছেন, 'দুই রবীন্দ্রনাথ : আসলে এক'। আর, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি দিতেছি, 'দুই বুদ্ধদেব : আসলে এক'। আসলে এক হইলেও বুদ্ধদেব যে দুইজন, এই রহস্য

বুঝিতে পারিলেই প্যারিসীয় বৌদ্ধ প্রলাপের প্রকৃত কার্যকারণসূত্র উপলব্ধি করা যাইবে। বুদ্ধদেব বসু দুইজন। এক বুদ্ধদেব প্রগাঢ় স্বাদেশিক ;—স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকা উলটোরথের নিয়মিত লেখক, এবং স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ধারা বটতলার একনিষ্ঠ ধারকবাহক। অন্য বুদ্ধদেব ঘোর য়ুরোপীয়, য়ুরোপের বশংবদ ভৃত্য ;—য়ুরোপীয় সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ভুল করিয়া আপনার নামে চালাইতে সিদ্ধহস্ত। এক বুদ্ধদেব কিঞ্চিৎ ইংরেজী সাহিত্য এবং রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য ভিন্ন অন্য-কিছুই জানেন না। কিন্তু অন্য বুদ্ধদেব অতুলনীয় পণ্ডিত, বিশ্বসাহিত্য-পারঙ্গম, যাদবপোর মহামনীষী। এক বুদ্ধদেব চির-কিশোর—কুড়ি বৎসরের পর তাঁহার আর বয়স বাড়ে নাই, কিছু উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি দেখাইবার পরই তিনি গাঁজিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্য বুদ্ধদেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বহু ফলপ্রসবিণী প্রতিভার একচ্ছত্র অধিপতি। এক বুদ্ধদেব প্যারিসে কালচারাল্ ফ্রীডম্-জাত বৈদেশিক আসব পানে (ফলি বার্জারাদি ছিল কিনা বলিতে পারিব না) বেসামাল হইয়া এক রবীন্দ্রনাথের সপিণ্ডীকরণ করিয়া মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার ঋণ শোধ করেন এবং আপন হীনমন্যতাবশতঃ শ্বেতাঙ্গ-পদলেহনে কৃতার্থ হন। কিন্তু অন্য বুদ্ধদেব স্বদেশবাসীর চাঁটি খাইয়া 'ম্যুইয়র্কে' লিখিত অন্য-রবীন্দ্রনাথের গুণগান 'অমৃত' পত্রিকায় ছাপিতে দেন। এই দুই বুদ্ধদেব কিন্তু আসলে এক। সেই এক আসল বুদ্ধদেব আজীবন অপ্রাপ্তবয়স্কের চাঞ্চল্য ও চালিয়াতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আপনিই আপনার অনেক-সম্ভাবনাপূর্ণ সৃষ্টিশক্তিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, এবং আপন হস্তে আপনার কবর খুঁড়িয়াছেন। ইহাই আসলে এক, অথচ কার্যতঃ দুই বুদ্ধদেবের লীলাখেলার প্রকৃত রহস্য।

বিংশশতাব্দীর এই বুদ্ধনাটক দেখিয়া উল্লাসে কেবলই যাত্রার একটি গান মনে পড়িতেছে :

রাখালি, সেই তো মল খসালি,—
তবে কেন-বা লোক হাসালি ?

* * *

গঙ্গাযাত্রা

শীত পড়িতে-না-পড়িতেই বঙ্গ-সাহিত্যের বহু লেখক এবং অলেখক (কিন্তু যাঁহারা আপনাদের লেখক মনে করেন) গঙ্গা(টিকুরী)-যাত্রা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ২রা, ৩রা এবং ৪ঠা ডিসেম্বর বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের রজতজয়ন্তী অধিবেশনে যোগদান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন "পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়"। গঙ্গাযাত্রী হ্যাংলা বঙ্গীয় লেখকবৃন্দ ভাবিয়াছিলেন, "তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে" গঙ্গাযাত্রা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইবে। কিন্তু হয় নাই। লেখকেরা কেহ খাইতে পান নাই, কেহ শুইতে পান নাই, কেহ বা অন্যবিধ অসুবিধায় ভুগিয়াছেন। কাজেই, ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা ঘোষ মহাশয়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে এই অধিবেশনের জন্য সরকারের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতে উঠিয়াছিল তিন হাজার টাকা—এই তেরো হাজার টাকা গেল কোথায়, কাহার পকেটে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন একমাত্র ঘোষ মহাশয়। আমি কেবল বলিতে পারি, এই-সকল হ্যাংলা সম্মেলনবাজ লেখকদের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে পারিলে ঘোষ মহাশয় দেশের একটি অতুলনীয় উপকার করিতে পারিতেন।

৺ধূর্জটিপ্রসাদ

গত ৫ই ডিসেম্বর বিখ্যাত অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাহিরে পরলোক এবং শাশ্বত আত্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে ঐকান্তিকভাবে কামনা করিব, সেই পরলোকে গত তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের তথাকথিত জ্ঞানাভিমানী নাগরিক ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদিগকেও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বহু গ্রন্থ পাঠ এবং জ্ঞান সকল ক্ষেত্রে সমার্থক নহে। বহু গ্রন্থ পড়িলে বহু গ্রন্থের নাম জানা যায় এবং উহা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় ;—কিন্তু তাহাতে সকল সময় জ্ঞান জন্মায় না। জ্ঞানের যাত্রা বহু হইতে একের দিকে, জটিল হইতে সহজের দিকে। নূতন হইতে নূতনতর জ্ঞানে যখনই পৌঁছানো যায়, তখনই অধিক হইতে অধিকতর পুরাতন জ্ঞানের সূত্র উহার মধ্যে মিলাইয়া যাইতে থাকে, জটিল ততই সহজ হইতে থাকে—বিশেষ ততই সামান্য হইতে থাকে। যে ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ঘটে, সে ক্ষেত্রে বহু-পঠনের বদহজম ঘটিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। কাজেই, কোটেশ্যনের ঘনঘটা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া যাহাকে-তাহাকে অসাধারণ প্রতিভাধর মহামনীষী বলিয়া ঢাক পিটাইলে সরল বিশ্বাসী দেশবাসীকে ধাপ্পা দিবার অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে—তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালগণ যেন এই কথাটি না ভুলেন।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩৪শ বর্ষ,
৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৬৮

"বাংলার মাটি, বাংলার জলে"র কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৯০৫ সনের বিশে জুলাই লর্ড কর্জনের বঙ্গচ্ছেদ-প্রস্তাবে ভারতের তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট সম্মতিজ্ঞাপন করিবার ঠিক একুশ দিন পরে সাতই আগস্ট তারিখে কলিকাতার টাউন হলে এদেশীয়দের এক মহতী সভায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল, রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিলেন, "বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃদয়ের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে।" ওই সনের ষোলই অক্টোবর, ১৩১২ বঙ্গাব্দের ত্রিশে আশ্বিন সোমবার সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা কার্যকরী হইল। জাতির শোকের জন্য অরন্ধন এবং বিষাদের মধ্যেই ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনের রাখীবন্ধন উদ্‌যাপিত হইল। রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন-সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বয়ং গঙ্গাস্নানান্তে সেদিন কলিকাতায় পথে পথে গাহিয়া বেড়াইলেন

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।···
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে
যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

১৩১৮ বঙ্গাব্দের চোদ্দই মাঘ সমস্ত বঙ্গভাষাভাষীর প্রতিনিধি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে অভিনন্দন-পত্রে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তিতে কলিকাতার টাউন হলে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিলেন তাহাতে ওই রাখীসঙ্গীতের স্মৃতিতে লিখিলেন:

"এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুম-সম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল।"

নদীমাতৃক এই দেশকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি" বলিয়াছেন—

"ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!······
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর,
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর!"

রবীন্দ্রনাথই এই গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমির কবি; বঙ্গদেশ ও বঙ্গের মৃত্তিকা এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে দুই ধারায় প্রবাহিত গঙ্গা তাঁহার কাব্যে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে ওতপ্রোত

হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম" অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী" মাতৃবন্দনা হিসাবে ছোট নয়। রবীন্দ্রনাথের "মাতৃমূর্তি" দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা না হইলেও বাংলাদেশের হৃদয় হইতে অপরূপ রূপে সমুত্থিতা সোনার মন্দিরে স্থাপিতা জননী

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।"

দেশের মাটিকে রবীন্দ্রনাথের মত এমন করিয়া আর কেহ নতি নিবেদন করে নাই, বলে নাই—

"ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ
তোমার বুকে,
তোমার পরেই খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।"

যিনি বিশ্বভুবনের রবি-রূপে কাব্যকিরণজালে একদা জগৎ পরিপ্লাবিত করিবেন,

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে॥…
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
সেই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।"

তাঁহার এই ব্যাকুল প্রার্থনা ঐকান্তিক ছিল বলিয়াই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রীতি স্বদেশী আন্দোলনের আকস্মিক আঘাতে সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, ইহা তাঁহার জন্মগত সংস্কার। ইহার প্রমাণ—তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত বেনামী কবিতা "অভিলাষ" (১৮৭৪, নবেম্বর) হইতে আরম্ভ করিয়া "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" (১৮৭৯) পর্যন্ত স্বনামে বেনামে মুদ্রিত অধিকাংশ কবিতা ও গান স্বদেশ-প্রেম-দ্যোতক, তন্মধ্যে ১৮৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে (কবির বয়স ষোলো) 'ভারতী'তে প্রকাশিত "উৎসর্গ-গীতি"টি ঘোরতর বিপ্লবাত্মক। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলন-পরবর্তী বৈপ্লবিক সংগ্রামের বীর যোদ্ধারা এই গান হইতেই প্রভূত প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছিল। গানটি অংশতঃ এই—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাইবে গান॥
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল
তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে॥
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারি তা' ঢালিতে
নিভাতে তোমার যাতণা।"

বাল্যের এই উৎকট স্বদেশ-প্রীতি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য ও কর্মজীবনে ত্রিমূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে—১। প্রেমে—বন্দনায়, ২। অভিমানে—ব্যঙ্গে এবং ৩। নৈরাশ্যে—ভর্ৎসনায়। বাংলাদেশের প্রতি এই চিরঅন্তঃশীলা প্রেমের ফল্গুপ্রবাহ কখনও অভিমানে ক্ষুব্ধ ও আবিল হইয়াছে, কখনও নৈরাশ্যজনিত ক্রোধে রুদ্র মূর্তি ধরিয়াছে। গহন-গভীর অন্তরের সংবাদ না জানিয়া যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অসীম ভালবাসার শেষ দুই প্রকাশই দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সম্বন্ধে বিচারে ভুল করিয়াছেন।

বঙ্গমাতার প্রতি প্রেম-বন্দনার কথাই আজ আমার আলোচ্য, অভিমান-নৈরাশ্যের কথা নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বঙ্গপ্রীতির সঙ্গে গঙ্গা-প্রীতি অঙ্গাঙ্গী হইয়া আছে। আমি প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের অধুনাবিস্মৃত বিলুপ্তপ্রায় গদ্য-রচনা হইতেই তাঁহার বঙ্গ ও গঙ্গাপ্রীতির নিদর্শন দাখিল

করিতেছি—এগুলি যতদূর সম্ভব কালানুক্রমিক ভাবেই দিতেছি :

১৮৮৩, ১১ই সেপ্টেম্বর—

আমি এই বঙ্গদেশের কত স্থানের কত শত পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি। আমি যাহাদের চিনি না, তাহারা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা আমার পাশে বসিয়া আছেন, আমার মনের ভিতরে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ঘরকন্নার মধ্যে আমি আছি। তাঁহাদের কত শত সুখ দুঃখের মধ্যে আমি জড়িত হইয়া গেছি।

১৮৮৪, এপ্রিল—

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন, বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোলভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমল হৃদয়, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহাঁর কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গালা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন, এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই।...

ভালবাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান।

১৮৮৪, আগস্ট—

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে, কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঁকা একটা পথের মত জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁকে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা! নূতন আস্ত ঘাটগুলির যে কোন শোভা নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলি অনেকদিন একত্রে বাস করাতে চারিদিকের আশপাশের সঙ্গে কেমন ভাব করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এক পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়, এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথ গাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে—প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট

করিয়া, ভাঙা-চোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি গৃহস্থ ঘরের শাশুড়ী, তিনি বড় মানুষের ঝিকে ঘরে আনিয়া তাহাকে নিজের ঘরকন্নার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এখন এ পাষাণ ঘাটের মুখেও একটা কোমল স্নেহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের যে সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার ভাগ্‌নে, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌড়ী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনেও নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেব-প্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণদেহ অতীতের কিয়দংশ যেন বর্ত্তমানের মাঝখানে বসিয়া আছে। তাহার কি গভীর বিষাদপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য! তাহার সেই সন্ধ্যাচ্ছায়াময় বিষাদের, তাহার সেই প্রাচীনতাবেষ্টিত স্বাতন্ত্র্যের কি একটি পবিত্রতা আছে—এই গঙ্গার তীরে শ্মশানের পার্শ্বে তাহার যেমন উপযুক্ত স্থান এমন আর কোথায়! এক এক জায়গায় কতকটা লোকালয়ের মত—জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙ্গায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে, তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু আপন মনে চরিয়া বেড়াইতেছে—গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পূরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সমুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সুমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহারে দুই চারিটি হাঁড়ি কুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারি মধ্যে বাস করে। আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ লাগে—প্রায় তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিক পোড়ো জায়গার মত দেখিতে এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো ইতস্ততঃ কতকগুলি ইট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সম্মুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ী—চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটিরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার তক্‌তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে তুলসীতলা। সূর্য্যাস্তের সময় নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায়া ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপর লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত, ছায়াপথের পরপারবর্ত্তী—সুদূর শান্তি-নিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ

জ্বলিয়া উঠিতে থাকে—সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া শব্দ উঠিতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না—শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ—আর জোনাকিগুলি—অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশত্থ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো, অন্ধকার গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া রহিল, তরঙ্গে ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর খানিকটা আলো পড়িল—সেইটুকু আলোতে ভাল কিছুই দেখা গেল না। কেবল ও পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে—মধুর রহস্যময় করিয়া তুলিল।

১৮৮৪, অক্টোবর—

ভরা গঙ্গা।...জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের নৌকাগুলি ডাঙার বাবলা-গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে। ভরা গঙ্গার উপরে শর প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহার কাঁচা সোনার মত রং, চাঁপা ফুলের মত রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোন সময়ে ত দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

১৮৮৫, মে—

স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ—আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শত সহস্র সঙ্গীরা বাস করিতেছেন, স্বদেশে আমাদের দীর্ঘ জীবন, আমাদের শত সহস্র বৎসর পরমায়ু।

১৮৮৫, জুলাই—

এবারকার চিঠিতে আপনাকে কেবল বাংলার বর্ষাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম—আপনি বসে বসে ভাবুন।—ভরা পুকুর। আমবাগান, ভিজে কাক ও আষাঢ়ে গল্প মনে করুন। আর যদি গঙ্গার তীর মনে পড়ে, তবে সেই স্রোতের উপর মেঘের ছায়া, জলের উপর জলবিন্দুর নৃত্য, ওপারের বনের শিয়রে মেঘের উপর মেঘের ঘটা, মেঘের তলে অশথ গাছের মধ্যে শিবের দ্বাদশ মন্দিরের কথা স্মরণ করুন। মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুলছে; বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে পাঠশালা ও গয়লাবাড়ির সামনে দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে; খুঁটিতে বাঁধা গরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চীৎকার করচে; আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আসচে; প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মত আমবাগান, তার পরে একেকটি করে বাঁশঝাড়, একেকটি করে কুটীর, একেকটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে আসচে, কুটীরের দুয়ারে বসে ছোট ছোট মেয়েরা হাততালি দিয়ে ডাকচে "আয় বৃষ্টি হেনে ছাগল দেব মেনে"—অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেচে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়সড় কম্বলমোড়া মাঝির মাথায় অবিশ্রাম ঝর্‌ঝর্‌ বৃষ্টি পড়চে।

[করাচী-প্রবাসী নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট চিঠি]

১৮৮৫, ডিসেম্বর—

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবজাতিকে আমাদের কি কিছু সংবাদ দিবার নাই?...আমাদের এই শ্যামল সুন্দর বঙ্গভূমি কি এই সুবিস্তীর্ণ মানবরাজ্যের মধ্যে সাহারাক্ষেত্র? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া

থাকিবে ?...আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে স্বর্গের কোন গান বহন করিয়া আনিতেছে না ?...সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙ্গালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে ?...

বাংলা দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিয়া সকলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে—বলিতে ইচ্ছা করে—'ভাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংলা ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া মা বলিয়া ডাক। কেরাণিগিরির ভাষা আপিসের দেরাজের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া মাতৃস্তনধারায় পুষ্ট মাতৃভাষায় জগতের বিচিত্র সঙ্গীতে যোগ দাও। বাঙ্গালী-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্ব-সঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।'

[আনুষঙ্গিক ভাবে একই কালে রচিত একটি কবিতার কয়েক পংক্তিকে এখানেই স্থান দিলাম :

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান!
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাসিবে নয়নজলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—ঘুচে যায় অপমান!]

১৮৯০, অক্টোবর (লণ্ডন)—

এখনো আমাদের সময় উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছিনে। বলতে লজ্জা বোধ হয়; আমার এখানে ভাল লাগছে না।...এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি।...

এদেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্য সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসার সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাইনে।

[এই মনোভাবই দীর্ঘ পনেরো বৎসর পরে ১৯০৫ সনের (স্বদেশী আন্দোলন) একটি গানে প্রকাশ হইয়াছে—

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা,
আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা।]

গঙ্গার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ 'জীবনস্মৃতি' পর্বে (১৯১১-১২) তাঁহার দশ বছর বয়সে দেখা পেনেটির গঙ্গা ও ষোল বছর বয়সের চন্দননগরের গঙ্গার অপূর্ব বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে। কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় ছাতুবাবুদের পেনেটির বাগান বাড়িতে পলায়নের কথা এই : "এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে টানিয়া লইল।...গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন।"

চন্দননগরের স্মৃতি এইরূপ : "আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়। বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনি-করুণ দিনরাত্রি। এইখানেই আমার স্থান, এখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত প্রসারিত উদার আকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।"

১৯৩২ সনের ৩রা জুন পারস্য ভ্রমণ শেষে কবি দেশে ফিরিয়া খড়দহের গঙ্গাতীরবর্তী একটি প্রাসাদে কয়েক

দিন ছিলেন। সেখানে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ নাড়ীর যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান।"

১৯৩৭ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন-ভাষণে এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এই গঙ্গাতীরে আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম যে, বাঙলা দেশের নদীই বাঙলা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।...আমারও সেতার ছিল...তার বাঁধা হয় নি, সুর ধরা হয় নি। সেই মুক্তি পেয়েছিলাম আমি গঙ্গার তীরে তাই নিজেকে আমি গাঙ্গেয় বলে মনে করি। জীবনে বারংবার আমি তার পরিচয় পেয়েছি।"

গঙ্গা যেদিন কাব্যছন্দে কবিকে বিশ্বপ্রকৃতির পথে প্রথম মুক্তি দিয়াছিল সেদিনের স্মৃতি কবির মনে এই রূপ: "সেদিন গঙ্গাতীরের পূর্বদিগন্তে বনরেখার উপরের পথে প্রতিদিন সকালে সোনার আলোয় মাধুর্যের যে ডালি আসত সে আর কারো চোখে তেমন করে পড়েনি, আর সূর্যাস্তের নানা রঙের তুলিতে গঙ্গার জলধারায় রেখায় রেখায় যে লেখন দেখা দিত সে বিশেষ করে আমারই জন্যে।"

১৮৮৬ হইতে ১৯০০ সন অর্থাৎ 'কড়ি ও কোমল' হইতে 'কল্পনা'র প্রকাশ কাল পর্যন্ত—এই পনের বৎসর রবীন্দ্র-কাব্যে বঙ্গবাসীর প্রতি প্রবল অভিমান এবং তজ্জনিত ব্যঙ্গ-ভর্ৎসনার কাল। এই কালে অবশ্য প্রেম ভালবাসা স্তুতি-বন্দনারও কমতি নাই। সহস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এখান-সেখান হইতে এলোমেলো ভাবে কয়েকটি দিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গভূমি, গঙ্গা ও পদ্মা, বাংলার পল্লী, হিন্দুবাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কী ভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করিয়াছে এই উদ্ধৃতিগুলিতে তাহার পরিচয় মিলিবে।

(১) আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাঙলার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিংকিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে— করো আশীর্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

(২) এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠসম, যেথায় সাজে না
কোমলা উর্বরা ভূমি নব নবোৎসবে
নবীনবরণবস্ত্রে যৌবনগৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ
দিবসরাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে, যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে—
সেখানেও যাই যদি মন যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্বঠাঁই হতে।

(৩) তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে, দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।...
...অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ— যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হতে তব যত নদ নদী

ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতা; প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবি-চক্ষে ভরি আসে জল।

(৪) সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

(৫) আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশীতে উঠিছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী তীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
একী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা।

(৬) নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে
জল ভরে।

(৭) ...ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থ ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দন চর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তারপরে
সুদিনে দুদিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।...

উদ্ধৃতিগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা 'নৈবেদ্যে'র (১৯০১) এবং এই কাব্য হইতেই রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্বমুখী হইয়াছে। তাহারও একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৬ সনের প্রারম্ভে করাচীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিই বিদেশ হইতে সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন বাংলার কবির জন্য বিশ্বকবির সিংহাসন ধীরে ধীরে প্রস্তুত

(২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রসঙ্গ কথা

জনপ্রিয় লেখক তৈরির ইস্কুল

অচ্যুত গোস্বামী

ভাবছি জনপ্রিয় লেখক তৈরির একটা ইস্কুল খুলব। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে লেখকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্র আছে। আমাদের বাংলাদেশে অবশ্য সে-জাতের কোন শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন নেই। কারণ বাঙালীরা লেখক হয়েই জন্মগ্রহণ করে। অক্ষর-পরিচয়ের পরই বাঙালী বালক কবিতা লেখে; এবং পাঠশালার সীমা পার হলেই গল্প বা উপন্যাস লেখার যোগ্যতা লাভ করে।

বাঙালীমাত্রেই যে স্বয়ম্ভূ লেখক আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। আমার কাছে সময় সময় অনেক তরুণ লেখক গল্প বা কবিতা বা ওই ধরনের কোন লেখা নিয়ে আসে। হবু লেখকের রচনার গঠনমূলক সমালোচনা করা উচিত এই সূত্র অনুসারে আমি হয়তো উৎসাহব্যঞ্জক কিছু বলে শুরু করার জন্য বলি যে লেখাটার আরম্ভটা বেশ হয়েছে, বা কোন একটা বিশেষ অংশ আমার ভাল লেগেছে, বা লেখার আইডিয়াটা ভাল। কিন্তু এইটুকু শোনার পরেই আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লেখক অনুরোধ করে বসে যে আমি যেন লেখাটা প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিই। আমি তখন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বলি, লেখাটাকে প্রকাশ-যোগ্য করতে হলে অনেক ঘষা-মাজা করা দরকার। অযাচিতভাবেই এও জানাই যে লেখাটার উৎকর্ষবিধানের জন্য কী করা যায় সে সম্পর্কে আমি কিছু আলোচনা করতে পারি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এ কথা শুনে প্রায় অধিকাংশ তরুণ লেখকই খুব অসন্তুষ্ট বোধ করে, এবং 'আর এক সময় আসব' বলে সেই যে চলে যায়, তারপর আর দ্বিতীয়বার কখনও আমার সঙ্গে দেখা করে না।

এই সব অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি যে বাঙালী-মাত্রেই লেখক এবং লেখক হওয়ার জন্য কোন শিক্ষা-লাভের তাদের আবশ্যকতা নেই। এমন কি আমি এই সব তরুণ লেখকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে তারা লেখক হতে হলে পড়াশুনা করার কোন দরকার আছে এ কথাও স্বীকার করে না। যারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তারা স্পষ্টই শুনিয়ে দেয় যে বেশী পড়াশুনা করলে মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

কাজেই আমি লেখক তৈরির জন্য যদি কোন ইস্কুল খুলি তা হলে একটি ছাত্রও পাব না।

অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, বাঙালীমাত্রই যদি লেখক তবে এত কম লোকে লেখে কেন? এই প্রশ্নের জবাবও আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই দিতে পারি। চাকরি বা অন্য ধরনের পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত এমন অনেক মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সম্পর্কে কিছু কিছু শ্রদ্ধাও যে না পোষণ করেন এমন নয়। কিন্তু দৈবাৎ যদি এঁদের কেউ জেনে ফেলেন যে আমি মাঝে মাঝে লিখি, তা হলে সেই মুহূর্ত থেকে আর শ্রদ্ধা থাকে না, তিনি আমাকে কৃপার চোখে দেখতে শুরু করেন। এমনি এক ভদ্রলোক কিছুদিন আমাকে কৃপা করার পর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মশাই, বই লিখে টাকা পাওয়া যায়? বললাম, তা কিছু কিছু পাওয়া যায় বইকি। তেমন

বই লিখতে পারলে ভাল টাকাই পাওয়া যায়। ভদ্রলোক তখন অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তাই বলুন, বই লিখে টাকা পাওয়া যায়। আমিও তাই এতদিন ধরে ভাবছি যে লিখে যদি টাকাই না পাওয়া যাবে তবে আপনি এমন পণ্ডশ্রম করেন কেন?

লিখে টাকা পাওয়া যায় এ কথা শুনে আমার প্রতি ভদ্রলোকের অবজ্ঞার ভাব বোধ করি একটু কমে গিয়েছিল। দিনকয়েক পরে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন যে তিনি একটি ফুল টাইম এবং একটি পার্ট টাইম চাকরি ছাড়াও টিউটোরিয়াল হোম পরিচালনা এবং ইনসিওরেন্সের দালালী করেন। তিনি হিসাব করে দেখেছেন যে এ-সব কাজ করার পরও তাঁর সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা সময় উদ্বৃত্ত থাকে। সেই সময়টুকুতে তিনি কিছু অর্থকরী কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। আমি যদি একটু সাহায্য করি তবে তিনি এই সময়টুকু বই লিখে সদ্ব্যবহার করবেন বলে কল্পনা করছেন।

ভদ্রলোক আরও বললেন যে গল্পের জন্য তাঁর ভাবনা নেই। গল্প তাঁর মাথায় অনেক আছে। কিন্তু তিনি এমন গল্প লিখতে চান যা শুনে লোকে পাগল হয়ে যায় এবং তাঁর বই কেনার জন্য ফুটপাথের উপর কিউ দিয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য তিনি আমার সাহায্য চান। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, একখানা বই লেখার পরিশ্রম তো কম নয়। যদি একখানা বই থেকে দশ-বিশ হাজার না আসে তবে কি অত পরিশ্রম পোষায়?

ভদ্রলোকের কথাগুলো বিশ্লেষণ করে আমি এই বুঝেছি যে, তিনি যে জন্ম-সূত্রেই লেখক তা তিনি জানেন। কিন্তু তিনি যেমন-তেমন লেখক হওয়ার জন্য লেখার পণ্ডশ্রম স্বীকার করতে রাজি নন। একমাত্র জনপ্রিয় লেখক হওয়ার জন্যই তিনি লেখার পরিশ্রম স্বীকার করতে রাজি। এবং সেজন্য সাহায্য পাওয়ার সুযোগ থাকলে তিনি সাহায্য গ্রহণ করতেও রাজি।

অতএব অনেক অভিজ্ঞতা এবং চিন্তা-ভাবনার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাংলাদেশে একটিমাত্র অকর্ষিত ক্ষেত্র আছে এবং সেটা হল জনপ্রিয় লেখক তৈরির জন্য ইস্কুল স্থাপন করা। এ রকম একটা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলে যে ছাত্রের অভাব হবে না এ কথা জোর করেই বলা যায়। আজকাল যাঁরাই লিখতে চান তাঁদেরই আকাঙ্ক্ষা জনপ্রিয় লেখক হওয়া। তাঁরাই স্বপ্ন দেখেন যে পান-বিড়ির দোকানেও তাঁদের বই বিক্রি হবে এবং সিনেমা কোম্পানিগুলো তাঁদের বইয়ের ফিল্ম-স্বত্ব কেনার জন্য বাড়ি [illegible] করবে।

কাজেই আমি এই ধরনের একটা ইস্কুল খুলব বলে ঠিক করেছি। কিন্তু সবাই জানেন এটা পাবলিসিটির যুগ। প্রচার ছাড়া কোন কাজ হয় না। আমি তাই ইস্কুল খোলার আগে কিছু কিছু প্রচারকার্য চালিয়ে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করছি। আমার এই বর্তমান রচনাটি সেই প্রচার-অভিযানের একটা পর্যায়মাত্র। জনসাধারণকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে জনপ্রিয় লেখক তৈরির যোগ্যতা আমার আছে।

অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, সে যোগ্যতা যদি আমার আছে তবে আমি নিজেই কেন জনপ্রিয় লেখক হচ্ছি না? তা হলে তো আমি আরও বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারব। এ প্রশ্নের জবাব খুব সোজা। অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁরা মাত্র পাঁচ সিকে পয়সার বিনিময়ে কামনাপীড়িত ব্যক্তিকে সর্ব-অভীষ্ট-প্রদায়িনী দান করেন, কিন্তু নিজে সেই আশ্চর্য শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন না, আমিও তেমনি সেই মহাজনদের পন্থাই অনুসরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি।

অতঃপর জনপ্রিয় লেখক ও জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পর্কে আমি আমার সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, যাঁরা জনপ্রিয় লেখক হতে চাইবেন তাঁদের সার্থকতাকে অনিবার্য করে তোলার জন্য আমি এক অবশ্য-ফলপ্রদ সঙ্কেত বার করেছি। সেটা আমি এখানে প্রকাশ করব না, কারণ তা করলে কেউ আর আমার কাছে ছাত্র হয়ে আসতে চাইবে কেন?

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এমন সুগভীর জ্ঞান আমি কী করে অর্জন করেছি। কিন্তু এই ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কারণ আমি যদি বলি যে অনেক বইপত্তর পড়ে আমি এই জ্ঞান লাভ করেছি, তা হলে সকলে হেসে বলবেন, আমি একজন নকলনবীস মাত্র। আবার আমি যদি বলি, কোন বই না পড়ে শুধু নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই জ্ঞান লাভ

করছি, তা হলেও সকলে হাসবেন। তাঁরা বলবেন, লোকটা মূর্খ। মূর্খের আবার বুদ্ধি! কাজেই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব হয় না সে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

এইবার আমরা আসল আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

প্রথমেই যে প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন সেটা হল এই : জনপ্রিয় লেখক কাকে বলে? প্রশ্নটার উত্তর খুব সহজ। যিনি পয়সা রোজগারের জন্য বই লেখেন তিনিই জনপ্রিয় লেখক।

আমি জানি, আমার এই সংজ্ঞা শুনে অনেকেই প্রতিবাদ করবার জন্য উসখুস করছেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, পয়সা রোজগারের জন্য অনেকেই তো বই লিখতে পারেন, কিন্তু সে সব বই যদি পাঠকসমাজ স্পর্শমাত্র না করে তবে তাঁদের জনপ্রিয় লেখক কী করে বলা যায়? যাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন তুলবেন তাঁরা ফলপ্রাপ্তি দেখে মানুষের বিচার করেন, উদ্দেশ্যের মহত্বকে তাঁরা কোন মর্যাদা দেন না। এই ধরনের প্রতিবাদকারীর সঙ্গে আমার বিরোধ আমি অকপটে স্বীকার করছি। যে লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ আমি তাঁকেই শ্রদ্ধা করি এবং সেই অনুযায়ী তাঁর শ্রেণী নিরূপণ করি; তাঁর ফলপ্রাপ্তির উপর আমি কোন গুরুত্ব দিই না।

আমি বরং বলব যে উদ্দেশ্যের বিচারে যে লেখক জনপ্রিয়, পাঠকসমাজ যদি তাঁর বই প্রচুর পরিমাণে না কেনে, তবে সেজন্য পাঠকই দায়ী। তাতে পাঠকের পরশ্রীকাতরতা এবং স্বার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাছে তাঁরা বই কেনার ফলে তাঁদের সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে একজন লেখক প্রচুর টাকা পান, এই ভয়েই পাঠকেরা এই লেখকের বই কেনেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : জনপ্রিয় বই কাকে বলে?

উত্তর : যে বই প্রকাশিত হওয়ামাত্র অস্বাভাবিক চাহিদার দরুন পান-বিড়ি ও মনোহারী দোকান পর্যন্ত স্থান লাভ করে, এবং কয়েক বছর পরে যে বই ওজনদরে মুদীরা কিনে নেয় ঠোঙা তৈরির জন্য, তাই জনপ্রিয় বই।

কিন্তু এই ভাবে ছাড়া জনপ্রিয় সাহিত্যের সংজ্ঞা অন্য ভাবেও দেওয়া যায়। যেমন, আমি বলতে পারি, যে সাহিত্য গণতান্ত্রিক বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে অথচ ঈর্ষাকাতর সমালোচকবৃন্দ যাকে সাহিত্য-পদবাচ্য বলেই গণ্য করতে চান না—তাই জনপ্রিয় সাহিত্য।

এই সংজ্ঞাটিতে অবশ্য আপত্তি উঠতে পারে। আমি স্বীকার করছি 'ঈর্ষাকাতর' বিশেষণটা প্রয়োগ না করতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু কী করব, যা সত্য তা প্রকাশে কার্পণ্য করতে আমি অক্ষম। ভেবে দেখুন সমালোচকদের অপরাধ কতখানি গুরুতর। এ যুগের দেবতা হচ্ছেন গণ। জনসাধারণের ভোটের জোরে কে রাজা হয়ে রাজ্য চালাবে তা নির্ধারিত হচ্ছে। আর সেই জনমত যে বইকে উচ্চকণ্ঠে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করছে, সমালোচকদের এমন ধৃষ্টতা যে সে বইকে তারা কলমের জোরে নস্যাৎ করে দিতে চায়। গণতন্ত্রের যুগে একি সহ্য করা যায়? অনেকে হয়তো বলবেন, জনতাই তো দু-চার বছর পরে এ বইয়ের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে। গেলই বা। এ বইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষণস্থায়ী তা না হয় মানলায়। কিন্তু কবি কি এ কথা বলেন নি যে

'One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name?'

জনপ্রিয় সাহিত্যের অন্য রকম সংজ্ঞাও সম্ভব। আমি এও বলতে পারি: জনপ্রিয় সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক; লেখকের উদ্দেশ্য পাঠককে প্রতারিত করা, পাঠকের উদ্দেশ্য স্বেচ্ছায় প্রতারিত হওয়া।

আসলে জনপ্রিয় সাহিত্য এক বিরাট প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতি কখনও পূরণ করা হয় না। বইয়ের শুরুতেই এমন এক উদ্ভট অপ্রত্যাশিত নতুনত্ব থাকে, এমন এক চমকপ্রদ নাটকীয় পরিস্থিতি থাকে যে পাঠক অভিভূত হয়ে ভাবেন অবশেষে এই বইতে তিনি বুঝি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত চরম উত্তেজনার পুলক লাভ করবেন। আশায় আশায় তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বইয়ের মধ্য-খণ্ডের অলস ব্যাজর ব্যাজর পাতার পর পাতা পড়ে যান। অবশেষে বইখানা শেষ হয় একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় নিয়ে। আর কোনকিছুর বিস্ময় নয়—হতাশার বিস্ময়। যে উত্তেজনার কামনা জাগ্রত হয় তার নিবৃত্তি ঘটে না—এইভাবে পাঠক প্রতারিত হন।

কিন্তু পাঠক সেজন্য বইকে দোষী করেন না।

কারণ তিনি বুঝতে পারেন, কামনা জাগ্রত করাই সাহিত্যের কাজ। কামনা চরিতার্থ করার দায়িত্ব জীবনের। এবং জীবন যখন পাঠকের কামনাকে চরিতার্থ করে না, তখন অপরিতৃপ্ত পাঠক আবার অন্য কোন জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যে নতুন কামনার ইন্ধন অনুসন্ধান করেন।

কাজেই জনপ্রিয় সাহিত্য ঠকায় বটে; কিন্তু তাই বলে তার চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রতারণার ব্যাপার রয়েছে দেখে যদি কোন লেখক বিবেক দংশন অনুভব করেন তবে তাঁকে সান্ত্বনা হিসাবে এ কথা বলতে পারি, যারা ঠকতে রাজি তাদের ঠকানোতে পাপ নেই।

আশা করি জনপ্রিয় লেখক আর জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকের এতক্ষণে খানিকটা পরিষ্কার ধারণা হয়েছে।

জনপ্রিয় লেখক যিনি হতে চান তাঁকে কয়েকটি উপদেশ সব সময় মনে রাখতে হবে। তিনি এমন জিনিস লিখবেন যা ভয়ানক রকমের নতুন বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে নতুন নয়। যা একেবারে অপরিচিত বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে অপরিচিত নয়। পাঠকের পরিচিত রস ও ভাবই জনপ্রিয় সাহিত্য নতুন বোতলে পুরনো মদের মত করে সরবরাহ করবে।

যে সাহিত্য যত বেশী জন-সমাদৃত সে সাহিত্য তত-বেশী উৎকৃষ্ট—আমাদের এই সিদ্ধান্তে যদি কোন মতদ্বৈধ না থাকে তা হলে মানতেই হবে যে জনপ্রিয় লেখক সাহসী হবেন, কিন্তু তিনি কোন ঝুঁকি নেবেন না। সাহসের সঙ্গে তিনি সাহিত্যের স্বীকৃত রুচি এবং শালীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবেন, ভাষার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রাধান্য দেবেন (বস্তুতঃ ভাষাগত স্বেচ্ছাচারিতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অন্যতম উপায়), শিল্পসম্মত রচনা-রীতিকে একান্ত অবহেলায় পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু প্রকৃত মৌলিকত্বকে তিনি অবশ্যই পরিহার করে চলবেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌলিক রীতি ও ভাবাদর্শকে যারা উপস্থাপিত করতে চায় তারা নির্বোধ। কারণ মৌলিকত্ব বুঝতে বুঝতেই পাঠকের এক যুগ কেটে যাবে। ততদিনে জনপ্রিয় লেখক উদিত হয়ে মধ্যগগন পেরিয়ে অস্তাচলগামী হবেন। তিনি ক্ষণিকের পূজারী; চিরন্তনত্ব বা দীর্ঘস্থায়িত্বের অলীক মোহ তাঁর স্বচ্ছ বাস্তববুদ্ধির কাছে স্থান পায় না।

জনপ্রিয় সাহিত্যের আদর্শ জনসেবা—জনতার চাহিদা নিবৃত্তি করাই তার সাধনা। তাই এ সাহিত্যে যত নতুনত্বের প্রয়াস তা শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনতা যে-সব আবেগ ও চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত শুধু তাই-ই এ সাহিত্য সরবরাহ করে। এমন একনিষ্ঠ নিরহঙ্কার সেবাব্রতের উদাহরণ পৃথিবীতে সহজে দেখা যায় না। তথাকথিত বড় বড় সাহিত্যিকরা নতুন আদর্শ, পথনির্দেশ বা চিন্তার অনুসন্ধান করুন, জনপ্রিয় সাহিত্যিক একান্ত বিনয়ের সঙ্গে জনতার মুখের সামনে তুলে ধরবেন খানিকটা ফেনিল পানীয়—কিছু তরল উত্তেজনা। সেবা—সেবাধর্মই জনপ্রিয় লেখকের একমাত্র অবলম্বন। আর সেইজন্যই তথাকথিত সীরিয়স সাহিত্যিকরা যখন ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে বেড়ায় তখন জনপ্রিয় লেখকের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স স্ফীত থেকে স্ফীততর হতে থাকে। এইভাবেই সেবাধর্মের পুরস্কার হাতে হাতে মেলে।

এই সেবা-ধর্মেরই অনুপূরক হিসাবে জনপ্রিয় লেখকের আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের জনসাধারণ যে-সব ভাব বা আদর্শকে গুরুত্ব দেয় লেখকও কৌশলের সঙ্গে সেই সব ভাব বা আদর্শের সদ্ব্যবহার করবেন। যেমন, জাতীয়তাবোধ, ধর্মীয় আদর্শ, মহৎ ব্যক্তির পূজা, মানবতাবাদ, সর্বোপরি নরনারীর যৌবন-তৃষ্ণা প্রভৃতি। কিন্তু এ-সব ভাল ভাল জিনিস জনপ্রিয় লেখকের কাছে পণ্য মাত্র; জনচিত্তে এসবের চাহিদা আছে বলে সেবাব্রতের আদর্শ অনুযায়ী তিনি এসবের সরবরাহ করবেন। নিজের জীবনে এসব আদর্শের কোনটিকেই তিনি গ্রহণ বা অবলম্বন করবেন না। একমাত্র অর্থের আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে জনপ্রিয় লেখক হওয়া যায় না। তাঁকে হতে হবে প্রকৃত নির্লিপ্ত পুরুষ—গীতায় যার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। একমাত্র গোলাকার পরমব্রহ্ম, অর্থাৎ টাকা ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিই তাঁর কোন আসক্তি নেই।

এক কথায় জনপ্রিয় লেখক হচ্ছেন প্রকৃত লোকোত্তর

সন্ন্যাসী। তিনি লেখেন বটে, কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে মোহমুক্ত, মৌলিকত্বের অহঙ্কার তিনি বর্জন করেছেন, লোভব্রতই তাঁর একমাত্র অবলম্বন, সমস্ত পার্থিব অপার্থিব আদর্শ সম্পর্কে তিনি নির্বিকার। গীতায় যেমন বলা হয়েছে—'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—তেমনি করে তিনি সমস্ত শ্রেয় এবং প্রেয়কে ত্যাগ করে একমাত্র অর্থের সাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেন।

জীবনে এর চেয়ে উচ্চতর সাধনা আর কী থাকতে পারে? আমার তো ভরসা আছে অনতিদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে যেদিন প্রতিটি বাঙালী লেখকই জনপ্রিয় লেখক হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন।

বুঝতে পারছি, আমি যেসব তত্ত্বমূলক আলোচনা করেছি তা যথেষ্ট নয়। একটি বাস্তব উদাহরণ সামনে উপস্থিত না করলে জনপ্রিয় সাহিত্য রচনার সহজ কৌশলটি নজরে পড়বে না। কাজেই আমি এখানে একটি উপন্যাসের প্লট বিবৃত করে আজকের মত আলোচনা শেষ করব। আর জানেন তো, জনপ্রিয় উপন্যাসে প্লটই আসল; চরিত্র-চিত্রণের দরকার নেই, রসসৃষ্টির দরকার নেই, বক্তব্যের দরকার নেই।

আগেই বলেছি, পরিবেশটি পাঠকের অপরিচিত হওয়া দরকার। কাজেই সাঁওতাল, বেদে, নাগা, পকেটমার বা এই জাতীয় কোন শ্রেণী থেকে চরিত্র সংগ্রহ করতে হবে। ধরা যাক, নায়ক ডক্ অঞ্চলের এক স্মাগলার। যে-সে স্মাগলার সে নয়। এককালে সে গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিল। নিছক লোভবশতঃ সে এমন একটা পেশা গ্রহণ করে নি। পক্ষপাতপূর্ণ দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ তার মূল্যকে একটুও স্বীকৃতি দেয় নি বলে সমাজের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় সেই এ পথ ধরেছে। অনেকটা চালি চ্যাপলিনের মঁসিয়ে ভার্দুর মত। সে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে রত ছিল তখনই নায়িকা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং পরে দুজনের বিয়ে হয়। এখন নায়িকা স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে তার দক্ষিণ হস্ত। এই নায়িকাই আসলে উপন্যাসের প্রধান কেন্দ্র। প্রতিনায়ক হল একজন উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি না করে স্বাধীনভাবে কণ্ট্রাক্টরির ব্যবসা করে এবং সেই সূত্রেই নায়ক-নায়িকার সঙ্গে তার পরিচয়। যথাসময়ে স্বল্পশিক্ষিতা চৌর্য-ব্যাপারে নিযুক্ত নায়িকার সঙ্গে তার গভীর প্রেম জন্মাবে। নায়িকা শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পরে আবার তার স্বামীর প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠবে এবং সে নায়কের কাছে ফিরে আসবে। নায়কের পরামর্শে সে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে প্রতিনায়ককে জেলে পাঠাবে। কিন্তু প্রতিনায়ক জেলে যাওয়ার পর নায়িকা জেলখানায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে আকুলভাবে প্রেম নিবেদন করবে।

কাহিনীর সাব-প্লট হিসাবে থাকবে যে নায়ক গরীব দুঃখীদের গোপনে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে।

বইয়ের প্রথম পর্ব এইখানে শেষ হবে। স্বভাবতঃই প্রেম-দ্বন্দ্বের এমন বিচিত্র কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তখন জনসাধারণের অনুরোধে বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতিনায়ক জেল থেকে ফিরে এসে আবার নায়িকার কাছে যাতায়াত শুরু করবে। নায়িকার কী সাংঘাতিক অবস্থা! একদিকে ক্রুদ্ধ স্বামী, অপর দিকে প্রেম। শেষটায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে স্বামীর কথার ইঙ্গিত অনুযায়ী সে প্রতিনায়ককে হত্যা করবে। কিন্তু যে স্বামীর জন্য এ কাজ করা সে স্বামী হত্যাকারিণীকে নিজের ঘরে স্থান দিতে অস্বীকার করবে। তারপর পুলিস কর্তৃক অনুসৃত নায়িকার পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর করুণ দৃশ্য। সেই অবস্থাতে সে স্বামীর কাছে একখানা হৃদয়-বিদারক চিঠি লিখবে তার হৃদয়হীন আদর্শবাদ আর নীতিবাদের মুখোশ অনাবৃত করে। চিঠিখানা অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠা লম্বা হবে। অতঃপর অনেক অপরাধে অপরাধিনী যে নারী অথচ অপরিম্লান প্রেমের আভায় যার চরিত্র ভাস্বর, সে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পাবে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। প্রেমের আগুন দিব্য আগুনে পরিণত হবে।

এ প্লটটা যদিও আমার কল্পনা-প্রসূত এবং এর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, তথাপি বুদ্ধিমান পাঠক একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন এ গল্প অনায়াসে বাংলাদেশের একজন বিশেষ বিখ্যাত জনপ্রিয় লেখকের কলম দিয়ে বেরুতে

পারত। লক্ষ্য করে দেখবেন এ কাহিনীর মধ্যে পরিবেশের নতুনত্ব, জাতীয়তাবাদের আদর্শ, প্রেম দ্বন্দ্ব অথচ স্বামীর প্রতি আনুগত্য, বিচার, জেলখানা, খুন প্রভৃতি শ্বাসরোধকারী নাটকীয় ঘটনা, মানবতা, সমাজের দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষ, ঈশ্বরপ্রেম, প্রভৃতি সব জিনিসই আছে। এই ভাবে এক ঢিলে অনেক পাখী মারাতেই জনপ্রিয় লেখকের কৃতিত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে। অবশ্য এ কথা বোধ করি বিশদ করে না বললেও চলে যে এসব ভাল ভাল জিনিসই হল প্রলেপ, যাকে সামরিক ভাষায় বলে 'ক্যামোফ্লেজ'। আসল জিনিস হচ্ছে গেঁজে-ওঠা ফেনায়িত উত্তেজনার দৃশ্যের অবতারণা করা, যার সুযোগ উপরোক্ত প্লটে যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তা বোধ করি বুদ্ধিমান পাঠককে বলে দেওয়ার দরকার নেই।

আলোচনা এখানেই শেষ করতে পারতাম, কিন্তু আর একটি প্লট উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এ প্লটটিও আমার মস্তিষ্কপ্রসূত, কিন্তু অনায়াসে বাংলাদেশের একজন অতিশয় জনপ্রিয় লেখকের কলম দিয়েও বেরুতে পারত। বলা বাহুল্য, এটিরও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কেউ কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন না।

এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ তাদের বাবা মা আত্মীয়পরিজন হয়তো আছেন বা ছিলেন, কিন্তু কাহিনীতে তাদের কোন উল্লেখ থাকবে না। তারা উচ্চশিক্ষিত, বিশেষ করে বার্ণার্ড শ' তারা খুব ভাল করেই পড়েছে। স্বভাবতঃই প্রচলিত সমাজ, ধর্ম, নীতি, সংস্কার প্রভৃতি কিছুর উপরেই তাদের কোন বিশ্বাস বা আস্থা নেই। তারা ইচ্ছে করলে অবশ্য এ দেশের মানুষকে গান্ধীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এই অধঃপতিত সমাজের জন্য অত চেষ্টা করার মধ্যে কোন সার্থকতা আছে বলে তারা মনে করে না। নায়ক এবং নায়িকা দুজনে মিলে অনেকটা যাযাবর জীবন যাপন করে। তাদের পৈতৃক বিত্তও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই (তারা অপরের সাহায্য নেবে এমন সন্দেহই অপমানজনক), তারা কোন কাজও করে না, অথচ কখনও তাদের টাকার কোন অভাব হয় না। প্রয়োজন দেখা দিলেই তারা পরের উপকার করে এবং টাকা খরচ করে। পরচিকীর্ষার কোন মূল্য অবশ্য তাদের কাছে নেই, তবু তারা পরোপকার না করে পারে না, ওটা তাদের স্বভাব। যত লোকের সংস্পর্শে তারা আসে তারা সবাই স্বার্থপর এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। পৃথিবীতে একমাত্র তারা দুজনই স্বার্থশূন্য এবং কলুষমুক্ত।

তারা একসঙ্গে চলাফেরা করে, কিন্তু বিবাহিত নয়, কারণ বিবাহে তারা বিশ্বাসী নয়; পরস্পরের বন্ধু নয়, কারণ মেয়ে পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না; পরস্পরকে তারা ভালবাসে না, কারণ ছিঁচকাঁদুনে রোমান্টিক ভালবাসাকে তারা উপহাস করে। তথাপি তারা একসঙ্গে থাকে, এবং কোনরকম নীতিতে বিশ্বাসী না হলেও খুব সাবধানে পরস্পরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। কত অদ্ভুত অবস্থায় তাদের পড়তে হয়। হয়তো এক ঝড়বাদলের গভীর রাত্রে এক ভাঙা ঘরে তারা আশ্রয় নিল। ঘরের মেঝে জলে জলাকার, একটি মাত্র ছোট খাট আছে, সেই খাটে দুজনকে রাত কাটাতে হবে। নায়িকা খাটের মাঝখানে কলম দিয়ে একটা দাগ কেটে বলে, মনে থাকে যেন এইটে লক্ষ্মণের গণ্ডী, পার হওয়া বারণ। তারা পবিত্রতা মানে না, কিন্তু গণ্ডীর পবিত্রতা রক্ষা করে।

এমনি করে কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পর নায়িকা নায়ককে ছেড়ে চলে গেল। ঝগড়াঝাঁটি করে নয়, বা অন্য কোন কারণে নয়। সে স্বাধীনা, যখন খুশি তার চলে যাওয়ার অধিকার আছে। অতএব সে চলে গেল। আর নায়িকা-বিহীন নায়ক তখন সতীশূন্য শিবের মতই ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। সে একান্ত মনে শিল্প-বাণিজ্যের দিকে মন দিল এবং অনতিকাল মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক জগতে দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। কোন মূলধন ছিল না, কিন্তু মুদ্রার মতই শুধু অসাধারণ বুদ্ধি আর চাতুর্যের বলে সে এক এক করে বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করল। বহু ছোট-বড় পুঁজিপতিকে সে পথের ভিখিরিতে পরিণত করল। আপিসে কারখানায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের সে অনেক কম মজুরীতে খাটাতে লাগল। কিন্তু ভারত-সরকার অনেক চেষ্টা করেও কোন আইনের সূত্র ধরেই এই ধুরন্ধর দুষ্টগ্রহকে জব্দ করতে পারলেন না। নায়ক এমন কুচক্রী আর অত্যাচারী হয়ে উঠল যে সারা দেশ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

আমি

কুমুদ ভট্টাচার্য

আমি।
বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থমণ্ডিত মানবক।
চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্
স্বাধিকারে। সর্বোপরি মন।

[কেউ কি আছেন অন্তর্যামী ?
তিনি কি নিদ্রায় অচেতন ?]

দেহ মন প্রাণ আত্মা মস্তিষ্ক হৃদয়
বিচার বিতর্ক বিবেচনা,
দুটি পা মাটিতে রেখে আকাশ-কল্পনা—
এ আমাকে কে দিয়েছে ? সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ
উৎসাহ এবং অবসাদ ?

এ যার নিজের আছে সে ছাড়া কে আর ?
সেই নির্বিকার—
সর্বব্যাপী শূন্যতায় জলে আর স্থলে
আগুনে বাতাসে একাকার !
নিজের যা নেই, কেউ কারে
তাই দিতে পারে ?

শরীরধারী সে নয়, তাই কি শরীরে তার লোভ ?
গড়ে আর ভাঙে আর ভাঙে আর গড়ে,
কবে তার মিটবে যে ক্ষোভ !

কবে—তাকে বোঝা যাবে বাসা যাবে ভালো
পাব সেই আলো ?

[তার আগে
এই অনুক্রমণিকা—সে কি পূর্বরাগে !]

তখন একদিন অকল্পিতভাবে নায়িকা নায়কের অফিসে এসে উপস্থিত হল। নায়ক নায়িকাকে দেখেই চমকে উঠল। নায়িকা কোন ভূমিকা মাত্র না করে বলল, তোমার ব্যাঙ্কের চেকবইগুলো বার কর তো। নায়ক মন্ত্রমুগ্ধের মত চেকবইগুলো বার করল। নায়িকা আবার বলল, ব্ল্যাঙ্ক চেকগুলোয় সই করে বইগুলো আমার হাতে দাও। নায়ক তাই দিল। তখন নায়িকা বলল, ফোন করে একজন অ্যাটর্নিকে ডাক। তোমার যত জায়গায় যত মালিকানা আছে সব আমার নামে দান-পত্র লিখে দাও।

এ কাজ শেষ করতে প্রায় সারাদিন চলে গেল। দানপত্রখানি হাতে নিয়ে নায়িকা বলল, যাদের যাদের তুমি বঞ্চিত করেছ, তাদের সবাইকে আমি হৃতসম্পত্তি ফিরিয়ে দেব। তবে শ্রমিক ও কর্মচারীরা যাতে ন্যায্য বেতন পায় তা আমি দেখব। তুমি এখন যেতে পার, তোমার কাজ শেষ হয়েছে।

নায়ক ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল, আমি এখন কী করব ?

নায়িকা হেসে বলল, তুমি এখন মহাপ্রস্থানের পথে যাও। নিশ্চয়ই শান্তি পাবে।

এখানে কাহিনী শেষ। প্লটটাকে একটু ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে লিখলে অন্ততঃ সাড়ে ছ শো পৃষ্ঠার বই হবে। চার বছরে যে বইখানির পনরোটি সংস্করণ নিঃশেষিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই বইতে যে কী রস সরবরাহ করা হচ্ছে আশা করি তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। সমাজজীবনে নানাবিধ নীতি এবং বিশ্বাসের প্রাধান্য আছে; অনেক বিধি-নিষেধ মানুষকে মেনে চলতে হয়। কোন উপায়ে সেই সব ।বধিনিষেধকে এড়িয়ে যেতে পারলে প্রচুর উত্তেজনার খোরাক পাওয়া যায়। কাহিনীতে কৌশলে সমাজের সমস্ত বেড়াজালকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে; অথচ এমনভাবে যে কোনক্রমেই লেখককে নীতি-লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী করা চলবে না। যাকে বলে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি', তাই এ কাহিনীর লক্ষ্য। জনপ্রিয় লেখকমাত্রেরই এ ধরনের আদর্শ হওয়া উচিত।

জনপ্রিয় সাহিত্য সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে হলে এবং হাতে-কলমে রচনা শিখতে হলে আমার ইস্কুলে ছাত্র হিসাবে যোগ দিতে হবে।

—

শেষ প্রশ্ন ঃ শেষ উত্তর

কৃষ্ণকুমার

বিষণ্ন, তোমাকে আমি এতদিন ভালবেসে···বেসে
এতদূর এসে,
ছোট আদালতে কিনা, দেখলাম উকীলের বেশে!
ছাঁটা গোঁফ, কালো কোট, একেবারে মোলায়েম টেরী
টাকেরও নেইকো বেশী দেরি,
কোথায় কাফ্‌কা, প্রুস্ত! শেষে কিনা ছেঁদো কথা ফেরি!

এপাশে জিলিপী গজা অন্য ধারে রাশি-করা ডাব,
ছিটিয়ে অজস্র থুতু মাথা নেড়ে তোমার কি ভাব!
একটা বিষাক্ত বুড়ো আজই তার হওয়া ভাল জেল
তার সঙ্গে সেকি হাসি! কারণ সে তোমার মক্কেল।

বিষণ্ন, কেন যে তুমি এত কথা বলতে আমাকে
কলেজে, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে—
তোমার কথার ধোঁয়া হৃদয় বিবর্ণ করে রাখে।

বিষণ্ন এখনও শোন। পায়ে পায়ে চলে এস ফিরে
কালচারের চারাগুলি দুজনে বাড়াই ধীরে ধীরে
চল সিনেমায় নামি। ফ্ল্যাট করি নিউ আলিপুরে
বিষণ্ন এখনই আছি। হতে চাই নির্জন শহরে।

বিষণ্ন বলেছে শুধু—আমার সময় বেশী নেই
তা ছাড়া বোঝ না তুমি, বাবার প্র্যাকটিশ এখানেই!

—

প্রত্যাবর্তন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সবুজ আশার ইঙ্গিতে জাগে স্বপনের রঙ্‌খেলা
মনোদিগন্ত মাঝে।
দূর অতীতের স্মরণ-মধুর এল কি সোনালী বেলা?
দেউলে শঙ্খ বাজে।
তুমি যে আসিবে ভাবি নাই কভু আমি
সঙ্গীবিহীন ছিনু যে দিবসযামী।
তোমারই লাগিয়া বহুদিন ধরে বসে আছি কাল গুণে,
দীঘির কাজল জলে নামে ছায়া কাঁকণের ধ্বনি শুনে।

পথ-চলাদের কলরব শুনি গাঁয়ের প্রান্ত 'পরে,
আমারি আঙিনা হতে।
আবেগে আতুর সুর তুলে তুলে চলেছে নদীর চরে
রোদ-ঝলমল পথে।
মুখখানি তব পুষ্প-কোরক সম
তুমি যে আমার চির অন্তরতম,
সচকিত আঁখি হেরিনু তোমার দুয়ারে এনেছ ডাকি,
পারের ঘাটেতে ভিড় জমে গেছে, নীড় ছেড়ে গেছে পাখি।

আজও মনে পড়ে এসেছিলে কবে একা-থাকা অবকাশে
স্রোতের মতন বেগে।
ভেঙে দিলে ভুল মিলনের ক্ষণে চাঁদ হয়ে কথা আসে
হৃদাকাশে ছবি এঁকে।
আশা-পথ চেয়ে গেছে চলে দিনগুলি,
চেতনার তীরে অজানার সুর তুলি
বহু ভ্রান্তির মায়ামরীচিকা তুলেছে পাগল করি,
জীবনে আমার উদ্বেগ সদা ছিল বহুকাল ধরি।

কত চেনা মুখ আয়নার বুকে প্রতিচ্ছায়ার মত
এখনও উঠিছে ফুটে।
ভরা যৌবনে ডাক দিয়ে তারা এসেছে যে অবিরত
আমার পর্ণপুটে।
হাসি উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হয়ে চিত্ত করিতে জয়,
তারা লালসার বহ্নি জালিয়া দিয়েছে যে পরিচয়,
আগুনের ফুল অঙ্গে তাদের, মর্মে বাসনা রাঙা,
তারা ভেবেছে কি মানুষের মন সহজে যায় না ভাঙা?

—

॥ জীবনভাষ্যের পরিশিষ্ট ॥

[কবিমানসীর 'প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে গিয়ে নূতন চিন্তা ও তথ্যের আলোকে কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে পুনর্বিচার প্রয়োজন হয়েছে। গ্রন্থাকারে সেগুলি লিপিবদ্ধ করার আগে 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা কর্তব্য মনে করি। তাই বর্তমান সংখ্যায় প্রথম খণ্ডের পুনর্লিখিত তিনটি প্রসঙ্গ প্রকাশ করলাম। এই প্রসঙ্গত্রয় সম্পর্কে আমার পূর্বপ্রকাশিত অভিমতের পরিবর্তে নূতন বক্তব্যকেই আমার সংশোধিত মত বলে যেন গ্রাহ্য করা হয়—এই আমার নিবেদন। আগামী সংখ্যা থেকে 'কবিমানসী দ্বিতীয় খণ্ড : কাব্যভাষ্য' পুনরায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবে। জ. ভ.]

॥ কবিমানসে নলিনী ॥

কবিমানসী প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রজীবনে আনা তরখড়-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে আনা কবিমানসে কিভাবে বিরাজমানা ছিলেন তা জানবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কবি আনার নামকরণ করেছিলেন নলিনী। নলিনীই তরুণ কবির স্বপ্নলোকবাসিনী কবিমানসী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী'র নায়িকা নলিনী। আনা যখন কবির কাছে একটি নাম চাইলেন তখন এই নলিনী নামটিকেই তিনি তাঁকে সমর্পণ করলেন। রবির সঙ্গে নলিনীর সম্পর্কের কবিপ্রসিদ্ধি তো রয়েছেই, কাজেই কানে-কানে ডাকা নামটির মধ্যেই স্ফুরিত হল পূর্বরাগের প্রথম ভাষা। লাজুক কবি যে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না তা বলা হল 'কবিকাহিনী'র মধ্য দিয়ে। স্বপ্ন এল বাস্তবের রূপ নিয়ে। মাত্র দু মাস সময়, কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই আনা 'কবিকাহিনী'র প্রায়-সবটাই কণ্ঠে নিয়েছিলেন, এর তাৎপর্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু আনাকেই বাংলা ভাষা শেখান নি, নিজেও যথাসম্ভব আয়ত্ত করেছিলেন মারাঠী ভাষা। তুকারামের কয়েকটি অভঙ্গ তিনি মেজদার সাহায্যে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু দুটি মাসের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। এক বৎসর পরে অধ্যাপক লিট্‌ল্‌ডেলের সঙ্গে আনার বিয়ে হল। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে। এই সংবাদে তিনি কি মর্মাহত হয়েছিলেন?

রবীন্দ্র-কাব্যলোকে 'নলিনী'র দ্বিতীয় আবির্ভাব 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্যে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন বিলাতেই ভগ্নহৃদয়ের পত্তন হয়েছিল। কতকটা ফিরবার পথে, আর কতকটা দেশে ফিরে এসে তা সম্পূর্ণ হয়। 'কবিকাহিনী'র নলিনীর সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে

'ভগ্নহৃদয়ে'। কাব্যের পাত্রপাত্রীগণের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি নলিনী সম্পর্কে লিখেছেন "এক চপল-স্বভাবা কুমারী"। 'ভগ্নহৃদয়' বৃহদায়তন গ্রন্থ। তাতে অনেক চরিত্র। মন-দেওয়া-নেওয়ার অনেক কাহিনী তার মধ্যে জটিল রূপ ধারণ করেছে। এই নাট্যকাহিনীতেও আছে কবি আর নলিনী। দূর থেকে নলিনীকে দেখে কবি বলছে:

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা! কোথা যাও কোথা যাও!
একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও!

* * *

আমার এ লঘুপাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি;
তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে! সর্গ ৬॥

নবম সর্গে নলিনী তার সখীগণকে বলছে:

কি হল আমার? বুঝি বা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি!
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লোয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়-মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি!

২

নলিনীর তৃতীয় আবির্ভাব 'নলিনী' গদ্যনাট্যে। ১২৯১ সালের বৈশাখে প্রকাশিত এই 'অকিঞ্চিৎকর' গদ্যনাট্যখানি নলিনীর নামানুসারেই নামাঙ্কিত। নীরদ, নবীন, নীরজা ও নলিনী—এই চতুরঙ্গ হৃদয়সংবাদই নলিনী নাটিকার উপজীব্য। এখানেও নলিনী "মূর্তিমতী চপলতা"। নীরদ নবীনকে বলছে, "এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মূর্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ করে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই বসে ভাবছিলুম।..." উত্তরে নবীন বলছে, "সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে যায়? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ করব না কেন? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে!..."

'নলিনী'র সংশোধিত গীতিনাট্যরূপ হল 'মায়ার খেলা'। 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি বলেছেন, 'ইহার আখ্যানভাগ কোন সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজ-নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি এই গ্রন্থে সাধারণ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই। আমার পূর্বপরিচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।'

'নলিনী'র চরিত্র-চতুষ্টয় হয়েছে 'মায়ার খেলা'র প্রপঞ্চ-পঞ্চক। শান্তা, প্রমদা, অমর, কুমার ও অশোক। সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত এই গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু কবি নিজেই গ্রন্থারম্ভে বলে দিয়েছেন: 'মায়াকুমারীগণ কুহক শক্তি-প্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এই সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নববসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল, প্রমোদপুরে যুবকযুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া মায়ার খেলা খেলিবে।

'নবযৌবন বিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসীমূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এদিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। * * *

'প্রমদার কুমারী-হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত

করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।'

সত্যসত্যই প্রমদার গর্ব থাকল না। প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ল অমর আর প্রমদা। কিন্তু মায়াকুমারীদের খেলাঘরে নায়ক-নায়িকারা অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করল প্রমদা কিছু বলার আগেই সখীরা এসে অমরকে প্রচুর ভর্ৎসনা করল। সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝে হতাশ্বাস হয়ে ফিরে গেল। প্রমদার এই আপাত-প্রত্যাখানের ফলে অমরের 'অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয়' সহজেই শান্তার প্রতি ফিরল। দীর্ঘ বিরহে এবং আর-সবার প্রেম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার 'অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন' অনুভব করার অবসর পেল। শান্তার নিকটে এসে সে আত্মসমর্পণ করল। মিলনোৎসবে অমর যখন শান্তার গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে প্রমদার আবির্ভাব। তার নিতান্ত করুণ দীনভাব দেখে আত্মবিস্মৃত অমরের হাত থেকে বরমাল্য খসে পড়ল। শান্তার মনে হল অমর আর প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। শান্তা অমর আর প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু প্রমদা মিলনের মালা প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'আমার বেলা গেছে, খেলা ফুরিয়েছে। এ মালা তোমরাই পর।' অমর শান্তাকে বলল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়ে নিজের সুখ নষ্ট করেছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাকে দেব, কে আমাকে গ্রহণ করবে।' উত্তরে শান্তা বলল, 'তোমার দুঃখের ভার আমিই বহন করব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর হয়ে জীবনের সুখ-নিশা অবসান হয়েছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শোনাব।' এই ভাবেই অমর আর শান্তার মিলন হল।

বলাই বাহুল্য, 'মায়ার খেলা'র অমর ও প্রমদাই 'নলিনী' নাটকের নবীন ও নলিনীর পরিশোধিত রূপ। 'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়' 'নলিনী' ও 'মায়ার খেলা'র নায়ক-নায়িকার মধ্যে তরুণ কবির হৃদয়-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। 'কবিকাহিনী' সম্পর্কে কবি নিজেই 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো' করে সেখানে দেখানো হয়েছে। 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি পুনরায় বলেছেন, তাঁর পনেরো-ষোল থেকে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত বয়সের রচনায় 'অপরিণত মনের প্রদোষালোকে' আবেগগুলো 'পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি' ধারণ করে একটা 'নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায়' ঘুরে বেড়াত। কবির হৃদয়-অরণ্যের এই ছায়ামূর্তিগুলির রূপায়ণে কল্পনার অনুরঞ্জন যতই থাক্ না কেন, কবি-জীবনের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। নিজের প্রতি আনার অনুরাগ এবং এক বৎসর পরে লিট্‌ল্‌ডেলের সঙ্গে আনার বিবাহকে কবি কি চোখে দেখেছিলেন তার আভাস রয়েছে 'ভগ্নহৃদয়' ও 'নলিনী'র নলিনী এবং 'মায়ার খেলা'র প্রমদার মধ্যে। সেদিন নলিনী ভগ্নহৃদয় কবির কাছে 'মূর্তিমতী চপলতা' বলে প্রতিভাত হলেও জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে কবি যখন নিজ জীবনের সেই কিশোর-প্রেমের নায়িকাকে স্মরণ করেছেন তখন গদ্যে-পদ্যে অনুরাগের ভাষাই কবিকণ্ঠে উচ্ছ্বাসভরে উৎসারিত হয়েছে।

৩

আমরা আনাকে বলেছি কবিজীবনের 'ক্ষণিকা মায়ানায়িকা'। 'পূরবী'র "ক্ষণিকা" কবিতাটি আনার উদ্দেশে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যতর্পণ। 'পূরবী'র "কিশোর প্রেম" সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার মত কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আমাদের কাছে নেই, কিন্তু কবিমানসে যিনি চিরদিনের ধ্রুবতারা তিনি যে আকাশের নীল যবনিকার অন্তরালে হারিয়ে-যাওয়া 'আনন্দের হারানো কণিকা' নন তা বলাই বাহুল্য। ধ্রুবতারা নয়, 'ভীরু দীপশিখা' তার উপমান। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কবিতাটি রচিত হয় হারুনা-মারু জাহাজে ১৯২৪ সনের ৬ অক্টোবর তারিখে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে তার পূর্বদিন লেখা কবির দিনপঞ্জীর যে অংশ

করো।' কিন্তু এখানেও যে রসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তার গৌণকর্মের কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে আছেন প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রেরই পাত্রীটি। ইঙ্গবঙ্গদের চেহারা ও চরিত্র বর্ণনায় অপূর্ব রসিকতা সৃষ্টি করে লেখক লিখছেন, 'এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ-বেতালের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'Oberon' ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়া-রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দভ-মুখোষিত 'Bottom'-এর মতোও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।' বলাই বাহুল্য, এ রসিকতার মুখ্য পাত্রী বৌ-ঠাকরুণ। পত্র প্রথমে বহু-বচনাত্মক সম্বোধন দিয়ে শুরু হলেও শেষে তা একবচনে পরিণত হয়েছে। পত্রের উপসংহারে বড়দার শিখরিণী ছন্দে লেখা 'বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধার করে কবি লিখেছেন, 'এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তা হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্যের কাছে পড়িয়ে নিয়ো, তা যদি না পারো তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড়ো না।' ষষ্ঠ পত্র কোন পুরুষ-আত্মীয়কে লেখা। কবি লিখছেন, 'তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়রাজ্যে এত ভাঙচুর লোকসান করতে পার যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে ওঠে।' সপ্তম অষ্টম ও নবম পত্রের পাত্রী 'তুমি'। নবম পত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করে উপসংহারে কবি লিখছেন, 'তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলল না বলে তুমি হয়তো বলবে 'বিলেতে গিয়ে লোকটার মাতা ঘুরে গিয়েছে।' এ কথা বললে কোনো যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো এক তোপে উড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ করে বলছি, বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে তো সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।' 'তোমাদের এই বিনীত দাসে'র—এই বাক্যাংশটির বাগ্‌ভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। দশম পত্রটি 'ভারতী'র জন্যেই লেখা বলে মনে হয়। একাদশ পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে আবার 'তুমি'র উদ্দেশে মৃদু রসিকতা সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়। দ্বাদশ পত্রের ইঙ্গিত রয়েছে গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায়। কবি লিখছেন, 'তুমি হচ্ছ কবি মানুষ, ছড়াটড়া লিখে থাক, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভালো।' ছড়াটড়া লেখেন ঠাকুর-পরিবারের সেই পাত্র বা পাত্রীটি কে তা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু গ্রন্থের ত্রয়োদশ অর্থাৎ অন্তিম পত্রটির উপান্ত অনুচ্ছেদে যে সরস পরিহাসটুকু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র উদ্দিষ্টা 'তুমি'র পরিচয় সম্পর্কে সংশয়াতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। লণ্ডনে ডাক্তার স্কটের পরিবারে Miss J প্রসঙ্গে কবি লিখছেন, প্রথম-প্রথম কুমারী 'জে' তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখার মত সাহস তাঁর হয় নি। হয়তো তাঁর ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি তিনি দেখবেন। সেই প্রসঙ্গেই কবি লিখেছেন, 'তার পরে যখন আমার মুখ দেখলেন তখন? তখন কী? আমার তো বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে এই মুখ দেখে কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওই তো সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি। কেন, কী মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারো মাথা ঘোরে নি সত্যি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের মাথা আছে?' এ রসিকতা পারিবারিক অন্তরঙ্গজনদের মধ্যে সমবয়স্কা বৌঠাকরুণদেরই করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র "বিলাত" অংশে কবির একটি উক্তি তুলনীয়। সেখানে তিনি বলছেন, 'বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে।' 'জীবনস্মৃতি'র "সাহিত্যের সঙ্গী" অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর কাব্যসাধনা এবং গানের কণ্ঠ সম্পর্কে নতুন বৌঠানের মতামত ব্যক্ত করেও কবি লিখেছেন, 'আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, একথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন—তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে

চাহিতেন না, আর দুই-একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন, তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট।' দেবরের রূপগুণ সম্পর্কে এই ব্যাজস্তুতিকারিণী নতুন বৌঠানই 'য়ুরোপ-প্রবাসী'র অন্তিম পত্রের পরিহাসের পাত্রী। চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম ও দ্বাদশ পত্র ছাড়া বাকি পত্রগুলি তাঁকেই লেখা। পত্র-রচনা সম্পর্কে 'ছিন্নপত্র' থেকে উদ্ধৃত কবির মন্তব্যগুলি পুনরায় স্মরণীয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে যে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে তার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম পেলেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' তাঁর 'ভিতরকার সত্যটি' যে অত্যন্ত সহজে প্রকাশিত হতে পেরেছে তা সম্ভব হয়েছে নতুন বৌঠানেরই আকর্ষণের গুণে।

॥ রবীন্দ্রকাব্যে শেষ 'প্রিয়া-সম্ভাষণ' ॥

প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে "স্বর্ণমৃণালিনী" শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিগত ১৩৬৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস "রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভারতী' পত্রিকার ১২৯১ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত "তোমাকে" কবিতাটি আবিষ্কার করে বলেছেন, ওই কবিতাটিই কবির "প্রথম প্রিয়া-সম্ভাষণ"।

জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে কবিমানসে কবিজায়ার বিরহ কী রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা জানবার কৌতূহল রবীন্দ্র-কাব্যরসিকের চিত্তে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের "কৃতজ্ঞ" কবিতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কবিতাটি ১৯২৪ সনের ২রা নভেম্বর তারিখে দক্ষিণ-আমেরিকার সমুদ্রপথে আণ্ডেস জাহাজে রচিত। বাইশ বৎসর পূর্বে এই নভেম্বর মাসেরই এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় কবি হারিয়েছিলেন কবিজায়াকে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে, 'স্মরণে'র সদ্যোবিয়োগ-ব্যথাতুর কবিহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস ওতে কী অপূর্ব-সুন্দর বাণীসংহতি লাভ করেছে। একটি অন্তরঙ্গ অশ্রুসজল আবেদনের স্মৃতি নিয়ে কবিতাটির আরম্ভ :

> বলেছিনু "ভুলিব না," যবে তব ছল-ছল আঁখি
> নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি।

ভুলে-থাকার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে কবি বলছেন :

> সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
> কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
> শুকায়ে পড়িয়া গেছে ; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
> তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
> কতদিন ফিরে ফিরে।

'মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি'র রূপকল্পটি ঘরোয়া দাম্পত্য-জীবনেরই ভাবানুষঙ্গ বহন করে এনেছে। সেদিনের চুম্বনের উপর 'ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে' কত দিন ফিরে ফিরে এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু তবু এ বিস্মরণ ক্ষমার যোগ্য যে নয় সে কথা অনুভব করেই কবি বলছেন :

> সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
> ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
> অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা করো তবে।

কবিতাটির প্রথমার্ধের এই আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনার পরে দ্বিতীয়ার্ধে আছে কবিজীবনে কবিজায়ার দান সম্পর্কে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। বাইশ বৎসর পূর্বে সদ্যোবিয়োগ-বেদনার মুহূর্তে যে ভাষায় তা উচ্চারিত হয়েছে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও, সেই একই ভাষা কবিকণ্ঠে শুনতে পাওয়া যাবে। 'পূরবী'র "কৃতজ্ঞ" এবং 'স্মরণে'র কয়েকটি কবিতা একসঙ্গে স্মরণ করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

'কৃতজ্ঞ' কবিতায় কবি বলছেন :

> একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
> গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
> আজো নাই শেষ।

'স্মরণে'র নবম কবিতায় বলেছিলেন :

> হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
> সরস্বতী-রূপ আজি ধরেছ মধুর,
> দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল-দলে।
> মানস-সরসী আজি তব পদতলে
> নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।

'কৃতজ্ঞ' কবিতায় :

> রবির আলোক হতে একদিন
> ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন

তোমার আঁখির আলো।

'স্মরণে'র অষ্টম কবিতায়:

তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।

পুনশ্চ, 'স্মরণে'র সপ্তদশ কবিতায়:

'আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক'—

'কৃতজ্ঞ' কবিতায়:

তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভরে
আমারে করায় পান।

'স্মরণে'র দ্বাদশ কবিতায়:

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকে এই সত্যই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, 'স্মরণে'র বিবিধ কবিতার ভাবানুষঙ্গগুলি 'পূরবী'র ওই একটি কবিতার মধ্যেই সংহতিবদ্ধ হয়েছে। কবিতাটি যে কবিজায়াকেই স্মরণ করে লেখা তার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে শেষ চারটি চরণে। কবি লিখছেন:

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সবচেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

"বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে" এবং "সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন" এই দুটি বাক্য প্রেরণার উৎস সম্পর্কে অভ্রান্ত প্রমাণ। স্বীয় সীমন্তিনী ছাড়া অন্য কোন নারীর বিরহের প্রতীক হিসাবে মুছে-যাওয়া সিন্দূরে সন্ধ্যার বিধুরতার কল্পনা ভারতীয় হিন্দুকবির চেতনায় আসতেই পারে না। 'স্মরণে'র ষষ্ঠ কবিতায় কবি বলেছিলেন:

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্ সিন্দূরের লেখা।

সঙ্গীহীন জীবনে শূন্যঘরের শ্রীহীনতাই গৃহিণীহীন গৃহেরই [গৃহিণী গৃহমুচ্যতে] শব্দালেখ্য 'স্মরণে'র চতুর্থ কবিতায় কবি বলেছিলেন:

তোমার সংসার-মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুদিন,—
তখন এ শূন্যঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?

এই কবিতার 'তোমা-হীন' 'শূন্যঘর'ই "কৃতজ্ঞে"র 'সঙ্গীহীন' 'শূন্যঘর' হয়েছে। 'স্মরণে'র সঙ্গে "কৃতজ্ঞ" কবিতার এই সব ভাবসাদৃশ্য দেখে এ কথাই মনে হয় যে, পত্নী-বিয়োগে কবির ভাবনা-বেদনা যে ভাবে 'সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে' উঠেছিল, তেমনি 'সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে' কবির 'অশ্রুবাষ্প' ঘনীভূত হয়ে "কৃতজ্ঞ" কবিতায় মুক্তারাশির আকারে ঝরে পড়েছে।

—

বিদুলা শেষে বিয়ে করল

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

বিদুলা যখন বি. এ. পড়ে তখনই মা বিয়ের তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা গ্রাহ্য করেন নি। তিনি বলতেন, মেয়ের বিয়ের জন্যে আমি লোকের পেছনে ঘুরতে যাব নাকি? মেয়েকে আমার লোকে খুঁজে নিতে আসবে, আমি সেই ব্যবস্থা করছি।

অনন্ত সেই ব্যবস্থা করলেন। মানে মেয়েকে বি. এ. পাস করালেন। কিন্তু লোকে খুঁজতে আরম্ভ করতেই দেরি করতে লাগল।

অগত্যা অনন্তই খুঁজতে আরম্ভ করলেন। আর বিদুলা প্রাইভেটে এম এ. দেবার জন্যে পড়াশোনা শুরু করল। অনন্ত উৎসাহ দিলেন, ভাবলেন, আরও পাকা ব্যবস্থা হবে।

বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থাতে কড়াকড়ি চাপ থাকে না বলে বিদুলার এখন অবসর বেশি। এবং অবসরের অনিবার্য ফলরূপে বিদুলার মনটাও অনির্দেশ্য কি যেন খুঁজতে আরম্ভ করল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে অনন্ত গোটা দুই গেজেট-ভুক্ত কর্মচারী পাত্রের সন্ধান পেলেন এবং মেয়ে দেখানোর আগে অপ্রত্যক্ষ কথাবার্তা মারফত বিবাহের অর্থনৈতিক দিকটার আঁচ নিলেন। আঁচ পেয়ে আঁতকে উঠলেন—অনেকটা জলন্ত কয়লার উনুনের ওপর হাত রাখলে যে রকম আঁচ পাওয়া যায়।

উভয়ক্ষেত্রেই মোটামুটি প্রায় বিশ হাজার টাকার আঁচ।

অনন্ত থমকে গেলেন।

স্ত্রী প্রমীলা বললেন, তা বলে একেবারে বসে পড়লে তো চলবে না। ওদের মেয়ে দেখতে তো বল। যদি ভাল মত পছন্দ হয়ে যায় তাহলে অত চাপ নাও দিতে পারে।

অনন্ত জবাব দিলেন না।

প্রমীলা আর একটু চড়া স্বরে বললেন, তা ছাড়া কিছু বেশি তো লাগবেই। বি. এ. পাস মেয়ে, যার-তার হাতে তো আর দেওয়া যায় না।

অনন্ত অন্যমনস্ক মৃদুস্বরে মুখ খুললেন: হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো।

প্রমীলা উৎসাহ পেয়ে বলে চললেন, অফিসার ছেলেদের কথা অবশ্য আলাদা। নইলে সোজাসুজি দিতে গেলেও তো এম. এ. পাস ছেলে না হলে চলবে না। মেয়ে যখন বি. এ. পাস। তা তারাই কি কমে ছাড়বে নাকি?

অনন্ত তেমনি বললেন, সেইজন্যেই তো।

প্রমীলা শেষ করলেন, তাহলে ওদের খবর দিয়ে দাও—দেখে যাক।

অনন্ত এতক্ষণে সজাগ হলেন। হঠাৎ মাথা সোজা করে বললেন, কাদের?

এবার প্রমীলা পিছিয়ে নিলেন মাথা। হতাশ কণ্ঠে বললেন, এতক্ষণ তবে কি বললাম?

ও—তুমি ওই পাত্রদের কথা বলছ? না না, ওদের আমি মেয়ে দেখাব না। ওরা ভেবেছে কি? ওরা অফিসার হয়েছে, আমার মেয়েও বি. এ. পাস করেছে! এত দায়টা কিসের? দুদিন সবুর কর না—ওরা আপনি আবার আসবে।

তাই আসুক।—বলে প্রমীলা রাগ করে ওখান থেকে উঠে গেলেন।

অনন্ত একটু নরম হয়ে ডাকলেন প্রমীলাকে। বললেন, শোন। না হয় বিশ হাজার টাকাই আমি যোগাড় করলাম। কিন্তু আরও তো দুটো মেয়ে রইল। তখন কি করব? আরও চল্লিশ হাজার? তারপরে ছেলে দুটো আছে। ওদের কথাও তো ভাবতে হবে। তুমি এত ভাবছ কেন? দেখ না—সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রমীলা বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু আমি বলছিলাম যে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেলে অত চাপ নাও তো দিতে পারে।

অকস্মাৎ আবার নতি স্বীকার করলেন অনন্ত। মেয়ে দেখানোই স্থির হল। শেষে বললেন, বেশ—দেখ কি হয়। ও আবার কে!

প্রমীলা অনন্তর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন, বিদুলার সঙ্গে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে বাড়িতে ঢুকল।

প্রমীলা বললেন, ও ওর বন্ধু, কি যেন নাম—মীরা। কিন্তু ছেলেটিকে তো চিনলাম না! আগে দেখি নি।

অনন্ত বললেন, ছেলেটি কোথায় দেখলে তুমি? বেশ জোয়ান বাইশ চব্বিশ বছরের পুরুষ!

প্রমীলা চাপা গলায় হেসে বললেন, হ্যাঁ, ছেলে নয়—পুরুষ! এখন চুপ কর তো।

কিন্তু ওদের নিয়ে বাইরের ঘরেই বসল বিদুলা।

কিছু পরে বিদুলা একা এল। বলল, মা, মীরা এসেছে। ওদের একটু চা খাওয়াতে হয় যে।

প্রমীলা বললেন, আর কে এসেছে?

বিদুলা নির্দোষ ভঙ্গীতে বলল, ওর মামাতো ভাই শুভেন্দু।

প্রমীলা বললেন, লক্ষ্মীর মাকে চায়ের কথা বলে আয়। ছেলেটা কি করে রে?

অনন্তও উৎকর্ণ হলেন।

বিদুলা হেসে ফেলে বলল, কিছুই করে না।

তবে পড়ে বুঝি?

নাঃ, পড়ে না অনেকদিন। ম্যাট্রিক ফেল করবার পরে আর পড়ে নি। আমি ওদের চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।

বিদুলা চলে গেলে অনন্ত আর প্রমীলা একসঙ্গে পরস্পরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন।

অনন্ত বললেন, তা হলে ওদের মেয়ে দেখতে বলি, কি বল?

প্রমীলা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি করো না।

কয়েক দিন পরে দুপুরবেলা বাইরে থেকে এসে বিদুলা মাকে বলল, মা, চাকরি পেলাম।

প্রমীলা অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, কিসের চাকরি?

মাস্টারি।

সত্যি বলছিস নাকি?

বাঃ, তোমার কাছে মিথ্যে বলব কেন?

প্রমীলা এবার উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, কিন্তু তাঁকে কিছু বলিস নি, হুট করে চাকরি ঠিক করে ফেললি, উনি যদি মানা করেন?

কে, বাবা? বাবাকে বলেছি তো। তোমাকেও তো বলেছি। তোমার মনে নেই।

কিন্তু আবার আর একটা পরীক্ষা তো দিবি? তার কি হবে।

মাস্টারী করলেই তো পরীক্ষা দিতে সুবিধে হবে।

কি জানি, যা ভাল বুঝিস কর্। আমি আর কি করব।

বিদুলা হেসে বলল, তোমার কিছু করতে হবে না, মা, আমিই সব করব।

অনন্ত আপত্তি করলেন না। পরদিন থেকেই চাকরিতে যোগ দিল বিদুলা।

কিছুদিন পরে এক রবিবার বিকেলে বিদুলা মাকে বলল, মা, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। শক্তি ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম প্রদর্শনী হবে। চল দেখে আসি।

প্রমীলা তত উৎসাহ বোধ করলেন না। বললেন, এঃ, ব্যায়ামের আবার প্রদর্শনী দেখব কি!

চল না, খুব ভাল। আচ্ছা বেশ, যদি ভাল না লাগে তা হলে চলে আসব। মীরা অনেক করে বলেছে, না গেলেও অসন্তুষ্ট হবে।

বেশ তো, তুই যা।

আমি তো যাবই। ভাল ব্যায়াম প্রদর্শনী তো তুমি বিশেষ দেখ নি, সেইজন্যে বলছি। তা ছাড়া রাত হয়ে যাবে। একা একা অত ঘুরতে আমার ভাল লাগে না।

এটা খুবই শুভ লক্ষণ ভেবে প্রমীলা তখনই রাজি হলেন।

কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসা হল না। ভাল লেগে গেল।

মাঝখানে ঘোষকের একটা নাম ঘোষণায় প্রমীলা

উৎকর্ণ হলেন। নামটা আরও একবার বলল ঘোষক। নামটা কোথায় শুনেছেন মনে করতে পারলেন না।

ছেলেটি এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে নানা রকম পেশীর প্রদর্শনীর কাজ আরম্ভ করে দিল।

চেহারাটাও কোথায় দেখেছেন মনে হল প্রমীলার। বিদুলাকে মৃদুস্বরে তাই বললেন, কোথায় যেন দেখেছি ছেলেটিকে।

নিজের উচ্চারিত 'ছেলেটি' শব্দটাতেই অনন্তর ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে মনে পড়ে গেল সব। বিদুলাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমাদের বাড়িতেই দেখেছিলে। শুভেন্দু। ওই যে, একদিন মীরার সঙ্গে আমাদের বাড়ি গিয়েছিল।

প্রমীলা কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ও এই চর্চাই করে এখন?

শুভেন্দু তখন পেটের পেশী এদিক ওদিক করে নাচাচ্ছিল। প্রমীলার শেষ কথা কয়টি বিদুলা শুনতে পায় নি। শুভেন্দুর এই কসরতটা শেষ হয়ে গেলে বলল, উঁ, মা কিছু বললে?

প্রমীমা বললেন, আর কিছু না। তুই বলেছিলি যে ও ম্যাট্রিক ফেল করবার পরে আর পড়াশুনো করছে না।

বিদুলা বলল, ও, হ্যাঁ। কিন্তু এদিকটাতে ওর বেশ একটু নামটাম হয়েছে। মন্দ না কিন্তু, তাই না?

কি মন্দ না?

বিদুলা এই বেখাপ্পা প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ল। অবশ্য তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, না, মানে, ওর অংশ ভালই করছে। মন্দ শেখে নি তাই বলছি।

প্রমীলা বললেন, হ্যাঁ, ভালই তো।

আর কোন কথা হল না।

গেজেটভুক্ত এক পাত্র এসে দেখল বিদুলাকে। বিদুলা প্রথমে বিদ্রোহ করেছিল। সাজগোজ করে পাত্রী সেজে বসতে পারবে না সে। অবশ্য বসেছিল শেষ পর্যন্ত।

খবর পাওয়া গেল যে পাত্র মোটামুটি পছন্দ করেছে। কিন্তু খবরটা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করেই রণক্ষেত্রে পিতাকে সম্মুখে রেখে পাত্র পিছিয়ে গেল।

পরাজিত অনন্ত আবার ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, মেয়ে দেব, তার সঙ্গে আবার একটা রেফ্রিজারেটর দেব! হুঁ! মেয়ের বাপ বলে বাঘের দুধ যোগাড় করতে যাব নাকি? আর তাই যদি করব তবে এত খরচ করে মেয়েকে অতগুলো পাস করালাম কেন? দেখ না তুমি, আর কটা দিন সবুর কর। মেয়ে এম. এ.টা পাস করে নিক তো আগে।

প্রমীলা বাধ্য হয়ে আবার সবুর করতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু বেশীদিন সবুর করবার আগেই একটা সম্বন্ধ আপনা থেকেই এসে গেল। ছেলে বেশ ভাল মাইনের অধ্যাপক।

এবার বিদুলা বিশেষ আপত্তি করল না। নিজেই বেশ যত্নসহকারে প্রসাধন করল, শরীরটাকে পরিপাটি করে সাজিয়ে তুলল।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। অধ্যাপক ছিল কিছু বেঁটে, আর বিদুলা বেশ লম্বা একহারা গড়নের মধ্যে সুন্দরী বলেই চালু।

প্রথম দৃষ্টিতেই অধ্যাপকের যখন মনে হল কন্যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সুন্দর এবং তার চেয়ে মাথায় বড় হতে পারে তখনই কর্তব্য স্থির করে ফেলল। অর্থাৎ স্থির করল এ কন্যাকে বিবাহ করা তার কর্তব্য নয়।

অধ্যাপক বুদ্ধিমান। কথাটা তৃতীয়পক্ষ মারফত প্রকাশ করল অন্য রঙে। বলল, উপস্থিত হয়তো মা বাবার কথামত বাধ্য হয়ে মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হতে পারে, কিন্তু বরাবরকার স্বামী হিসেবে তাকে ওর পছন্দ হতে পারে না। কারণ সে বেঁটে।

এই নতুন পরিস্থিতিতে অনন্ত আরও হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তিনি অর্থনৈতিক আলোচনা বা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু অমন অদ্ভুত যুক্তিতে পাত্র পিছিয়ে যাওয়ার অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

আবার কদিন সবুর করা ঠিক হল।

বিদুলা এর মধ্যে এম. এ. পাস করে ফেলল। এবং মোটামুটি বেশ ভাল পাস করায় অল্পদিনের মধ্যে এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেল।

মীরার সঙ্গে শুভেন্দুও মিষ্টি খেতে এল। প্রমীলা আড়ালে বললেন, সেই ছেলেটা না?

বিদুলা হেসে বলল, হ্যাঁ মা। কি যে ভুলো মন তোমার—তারপরেও তো কদিন আমাদের বাড়ি এসেছে।

প্রমীলা বললেন, কি জানি! আমি অত লক্ষ্য করি নাকি বাইরের ঘরে থেকেই গল্প করে ফিরে গেছে বোধ হয়। বলে কিছুটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রাখলেন মেয়ের ওপর।

বিদুলা জবাব দিল, হ্যাঁ—তাই তো গেছে। ভেতরে আসে নি কোনদিন।

দিন কয়েক পরে বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে একদিন প্রমীলা বাইরের ঘরে বসে ছিলেন।

বিদুলাদি আছেন?

মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হলেন প্রমীলা। সেই ছেলেটি! জবাব দিতে একটু বিলম্ব হল। বললেন, না—ও তো ফেরে নি এখনও।

ও।—বলেও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল শুভেন্দু।

প্রমীলা বললেন, কোন কাজ আছে? এলে পরে কিছু বলতে হবে?

না, মানে, বলবেন যে শুভেন্দু এসেছিল।

আচ্ছা।

শুভেন্দু চলে গেল।

বিদুলা এলে প্রমীলা বললেন, শুভেন্দু এসেছিল।

বিদুলা প্রথমে একটু চমকে উঠে পরক্ষণে হেসে বলল, নিশ্চয়ই কোন ফাংশন টাংশন আছে ওদের, তাই বলতে এসেছিল বোধ করি।

প্রমীলা বললেন, তাতো কিছু বললে না।

কখন এসেছিল?

এইতো, আধঘণ্টা হবে।

কিছুই বলল না?

না।

বিদুলা হাসিমুখেই বলল, তুমি বসতে বললে না, তাই ঘাবড়ে গেছে বোধ করি।

বসতে বলি নি তুই জানলি কি করে?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিদুলা বলল, বা, এ তো বোঝাই যায়। আমি কখন আসব ঠিক নেই, বসতে বলে লাভ কি, তাই।

মেয়ের চালাকিতে প্রমীলা একটু হাসলেন। বললেন, বসতে বলি নি ঠিকই। ও হ্যাঁ, ও বলেছিল যে বিদুলাদিকে বলবেন শুভেন্দু এসেছিল। তোকে বিদুলাদি বলে—তোর চেয়ে ছোট নাকি?

প্রসঙ্গটা একটু দীর্ঘ হয়ে পড়ছিল। ফলে বিদুলার সপ্রতিভতার ভঙ্গীটা নষ্ট হয়ে আসছিল। কিছুটা আরক্ত-মুখে জবাব দিল, নাঃ, ছোট হবে কি করে! ও-তো মীরার চেয়ে বছরখানেকের বড়। মীরা আমার চেয়ে বেশ কিছুদিনের বড়—সেদিন হিসেব করলাম। তবু—

প্রমীলা চোখ একটু তুলে মাঝখানেই বললেন, সে হিসেব করেছিস?

বিদুলা ইঙ্গিতটা গ্রাহ্য করল না। বলল, হ্যাঁ, তবু ওই রকম বলে। এম. এ. পাস মানুষটাকে ওইটুকু ভক্তি না করে করে কি!

বলে হাসল বিদুলা।

একদিন বেশ খুশী মেজাজে বাড়ি এলেন অনন্ত। এসেই প্রমীলাকে ডেকে এনে কাছে বসালেন। বললেন, শোন, কথা আছে। সেই যে অফিসার পাত্রটি?

প্রমীলা বললেন, কোন্‌টি—ইঞ্জিনিয়ার?

হ্যাঁ গো—সেই যে এসে দেখে পছন্দ করেছিল।

হ্যাঁ, তার কি হয়েছে?

কিছুই হয় নি। বিয়েই হয় নি এখনও।—অনন্তর কণ্ঠস্বরে প্রতিশোধের পরিতৃপ্তি।

তাই নাকি?

বলছি কি! আর কোন মেয়েই তার পছন্দ হয় নি এ যাবৎ। বিদুলাকেই তার পছন্দ। কাজেই এখন আবার খবরাখবর করছে।

দাবিদাওয়া?

দাবিদাওয়ার সে চোট আর নেই এখন নিশ্চয়ই। নইলে আবার টোকাবে কেন?

প্রমীলা বললেন, তা হলে আর দেরি কর না। ওদের খবর দাও। আবার ওদের আর কেউ দেখবে নাকি? দেখুক। তারপরে কথাবার্তা পাকা করুক।

হ্যাঁ, তাই তো। আর দেরি নয়।—বলে তখনই উঠে দাঁড়ালেন অনন্ত।

তা বলে এখনই আবার যাচ্ছ কোথায়?

না, এখন যাচ্ছি না।—অনন্ত আবার বললেন।

নিজের সম্বন্ধে বলেই আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনল বিহুলা। হাসল।

পরের দিন খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়বার পরে বিহুলা প্রমীলাকে আবদারের স্বরে বলল, মা, ওদের খবর দেবার আগে আমি সাতদিন সময় চাই।

প্রমীলা অবাক হলেন। বললেন, সে আবার কি? সময় কিসের?

বিহুলা হাসিমুখ করে বলল, মন স্থির করবার।

প্রমীলা চোখ কপালে তুললেন: সে আবার কি?

বিহুলা বলল, আমি লেখাপড়া-জানা চাকুরে মেয়ে। আমার অমতে তো আর আমার বিয়ে হতে পারে না। তাই না মা?

প্রমীলা এবার হেসে বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোর অমত হবে কেন তা তো বুঝলাম না।

তাই তো ভাবব কদিন।—হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল বিহুলা।

কি জানি বাপু, কি যে সব কাণ্ড তোমাদের।—বলতে বলতে প্রমীলা অনন্তকে বলতে গেলেন ঘরে।

সাতদিন অপেক্ষা করতে হল না, পাঁচদিন পরেই বিহুলার চিঠি পেলেন প্রমীলা। রোজকার মতই সকালে কলেজে গেছে সে। কিন্তু ফেরবার সময়ে বিহুলার বদলে একজন লোক মারফত এল তার চিঠি। খামে বন্ধ চিঠিখানা দিয়েই লোকটি চলে গেল।

চিঠি খুলে প্রথমেই শেষের নামটার ওপর চোখ পড়ল প্রমীলার। আঁতকে উঠলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন লোকটা চলে গেছে।

চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলেন।

মা,

সামনাসামনি তোমাকে বলতে পারলাম না, একটু দূরে এসে চিঠি দিলাম।

তুমি যাকে দেখেছিলে, সেই ছেলেটি—মানে শুভেন্দুর সঙ্গে আমার বিয়ের দরখাস্ত সই করে রেজিস্টারি অফিসে কাল দিয়ে এসেছি।

এই পর্যন্ত পড়েই প্রায় চিৎকার করে উঠলেন প্রমীলা, কি? পাগল নাকি?

চিঠিটা মুঠিতে ধরে ক্ষণকাল শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন।

মা, আমি জানি, তুমি প্রথমটায় খুব আঘাত পাবে, রাগ করবে। ভাববে লেখাপড়া-জানা মেয়ে কি ভুল করল। তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলল না, কাজেই রাগ দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মা, আমি বলছি আমি এতেই সুখী হব। ভাল মাইনের অফিসারের শো-কেসে সাজানো পুতুলের জীবন আমি চাই না। কাজেই তোমাদের ব্যবস্থাতে আমি জীবনভোর দুঃখ পেতাম।

তুমি বোধ করি জান না—শুভেন্দু খুব ভাল স্বভাবের লোক। জীবনে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষাও অনেক। নিজে একটা ব্যায়ামের আখড়া করে সেখানে ও অন্য ছেলেদের তৈরী করবে।

আমার জন্যে ভেবো না। বিশ্বাস কর, অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হলেও তার সঙ্গে কাব্য আলোচনা সম্ভব হত না। কারুরই হয় না। কাজেই ও লেখাপড়া কম জানে বলে আমার কোনই অসুবিধে হবে না।

আমি ওপরের ঠিকানায় এক বন্ধুর বাড়ি আছি। বাড়ি একটা পেয়েছি। বিয়েটা হয়ে গেলেই সেখানে যাব।

বাবাকে বলো বিয়ের পরে প্রণাম করতে যাব। রাগ করলেও আশীর্বাদ না করে পারবে না তো।

প্রণাম ইতি

তোমাদের স্নেহের

বিহুলা

নীড়ভ্রষ্ট

সুনীল রায়

কেমন দেখছেন?

প্রত্যাশিত দৃষ্টিতে সুধীরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন গোকুলবাবু। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু অনিশ্চিত হাসির আভাস টেনে প্রশ্ন করলেন গোকুল রাহা।

তা মন্দ কি! বেশ তো ভালই দেখছি।—সুধীর প্রায় নির্লিপ্ত গলায় সামান্য উৎসাহ আনার চেষ্টা করল।

আকাঙ্ক্ষিত উত্তর পেয়ে গোকুল রাহার সংশয়াকুল হাসিটুকু এবার সারামুখে পরিব্যাপ্ত হল। কিছুদূরের সূর্যালোকিত একটা নিষ্পত্র মরা গাছের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট চোখ দুটো এবার খুশীতে চকচক করে উঠল।

ভালই দেখছেন তা হলে, কি বলেন?—আরও একটু বলিষ্ঠ সমর্থনের আশায় প্রায় বিগলিত গোকুলবাবু সুধীরের পিঠে হাত রাখলেন।

নিশ্চয়ই ভাল—বেশ ভাল দেখছি।

সুধীরের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে এনে এবার সামনের টেবিল থেকে একটা আয়না তুলে ধরলেন নিজের মুখের কাছে। হাসিভরা একটি শীর্ণ মুখের ছায়া পড়ল সেখানে।

প্রশ্নটা সুধীরের কাছে নতুন নয়। পাঁচদিনের আলাপে অন্ততঃ পঁচিশবার এ কথার উত্তর দিতে হয়েছে সুধীরকে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে—স্থান-কালনির্বিশেষে। গোকুল রাহার স্বাস্থ্যের এক ইঞ্চি কম-বেশী, এক গ্রাম ওঠা-নামা নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাতে হয়েছে সুধীরকে। দুধ কম খাবেন, না মাংস বেশী খাওয়া উচিত, দিবানিদ্রা ত্যাগ করাই ভাল, অথবা সন্ধ্যায় দীর্ঘ ভ্রমণটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল কিনা এসব নিয়েও গবেষণা করতে হয়েছে সুধীরকে। শরীরে সরষের তেল মালিশের পদ্ধতিটা কি হওয়া উচিত, সকালে স্নান করাই যুক্তিযুক্ত কিনা ইত্যাদি হাজার প্রশ্নের সদুত্তরও সুধীরকে দিতে হয়েছে। ছুরি দিয়ে কোথাও একটু কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে গোকুলবাবু রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং সেটুকু সারিয়ে তোলবার জন্যে কি ব্যবহার করা যেতে পারে সে পরামর্শও সুধীরকে দিতে হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও গোকুল রাহাকে খারাপ লাগে নি। কারণ গোকুলবাবু না থাকলে ছুটিতে এসে হঠাৎ-পাওয়া আশ্রয়টা জুটতো না সুধীরের। এমন কথা বলার সঙ্গীও পাওয়া যেত না। ধুধু মাঠ আর ধূসর পাহাড়গুলোর মতই নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হত। অনতিপ্রশস্ত সুবর্ণরেখার মতই চারপাশটা নির্জন লাগত।

কিন্তু গোকুলবাবু কথার নির্ঝর। মাঝে মাঝে শারীরতত্ত্বের শক্ত পাথর-নুড়ি ছিটকে লাগলেও বেশীর ভাগ সময়ই নিরেট নয়। গোকুলবাবুর অফুরন্ত কথার স্রোতে ভেসে যাওয়া যায়। কিন্তু যখনই কোন প্রসঙ্গ ঘনীভূত হয়ে আসে তখনই হঠাৎ কঠিন পাথরে ধাক্কা খেতে হয়।

কেমন দেখছেন?—জিজ্ঞেস করেই প্রায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখেন সুধীরকে।

প্রায় পঁচিশবারের মধ্যে দু-একবার নেতিবাচক উত্তরও সুধীর দিয়েছিল। বিরক্ত হয়ে, কিছুটা উত্যক্ত হয়ে।

না, তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না তো। চোখ দুটো বসে গেছে। মুখটাও কেমন শুকনো শুকনো। শরীরটা কি হঠাৎ খারাপ হল?

মুখটা তখন প্রায় ছাইয়ের মত সাদা হয়ে আসত গোকুলবাবুর। মাথাটা আস্তে আস্তে নীচু হয়ে যেত। ভয়-পাওয়া জন্তুর মত কুঁকড়ে যেতেন গোকুলবাবু। বেশ কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে বলতেন, না, শরীরটা সত্যিই আজ ভাল নেই। কাল রাত্রে কুঁড়েমি করে আর রাঁধলাম না, আপনার সঙ্গে হোটেলেও আর গেলাম না। স্টেশনের কাছে একটা দোকানে পুরী, মিষ্টি খেয়ে নিলাম। বাস্, সঙ্গে সঙ্গে পেটটা কিরকম—

গোকুলবাবুর কণ্ঠস্বর প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আসত।

সুধীর রীতিমত ক্রুদ্ধ হবার লক্ষণ দেখাত।

খুব অন্যায় করেছেন। শরীর সারাতে এসেছেন, আর যা-তা খেয়ে রোগ বাড়াচ্ছেন। আমি আজই বউদিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি।

খপ করে হাত দুটো ধরে ফেলতেন গোকুলবাবু।

এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, আর কোনদিন এমন কাজ করব না।

তবে বেশীর ভাগ সময় সুধীরের উত্তরে খুশীই হয়েছেন গোকুলবাবু। বেশ তো, ভালই, এমনি জবাবই দিয়েছে সুধীর। না দিলে গম্ভীর হয়ে বসে থেকে একসময় উঠে যেতেন গোকুলবাবু। নিঃশব্দে গিয়ে নিজের দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়তেন। তখন আবার গোকুলবাবুকে ডেকে তোলার একটাই মন্ত্র জানা ছিল সুধীরের।

বউদিকে তাহলে চিঠি দিয়ে আমায় সব জানাতে হবে।—ঈষৎ উচ্চ স্বরে সুধীরের স্বগতোক্তি শুনে গোকুলবাবুর দরজা তখন আবার উন্মুক্ত হত।

পাঁচদিন ধরে সুধীর দেখছে গোকুলবাবুকে। নেহাতই একটা আকস্মিক যোগাযোগ। কোথাও না কোথাও ছুটি কাটাবার ইচ্ছে হয়েছিল সুধীরের। হাতের কাছে টাইম-টেবল আর পুরনো ব্র্যাড্‌শ যা ছিল উল্টেপাল্টে কোন হদিস পাচ্ছিল না। তুষারাকীর্ণ হিমালয় থেকে সমুদ্রবিধৌত কন্যাকুমারিকা, দার্জিলিং থেকে সুদূর বোম্বাই। এত বড় দেশে বেড়াবার জায়গা অজস্র। অফুরন্ত দর্শনীয় বস্তু। ভ্রমণের নেশা তাই মানুষকে পেয়ে বসেছে। ট্রেন-বোঝাই হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন স্থানান্তরিত হচ্ছে। রিজার্ভেসনের লম্বা লাইন। সাতদিন পর্যন্ত দূরের ট্রেনগুলোর সব আসনই সংরক্ষিত। এই ভিড় ঠেলে দূরের যাত্রী হতে ইচ্ছে হল না সুধীরের। রাজস্থান, অজন্তা-ইলোরা, মাউণ্ট আবু, পুরী, বেনারস-লক্ষ্ণৌ— না, কোথাও না। কাছে, যেখানে কিছুই দেখার নেই, অথচ দেখেও যা ফুরিয়ে যাবে না এমনি এক জায়গায়।

এমনি এক জায়গায় গোকুল রাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। পাশাপাশি ঘরে অধিষ্ঠিত হল সুধীর। স্টেশনেই দেখা। ভোরবেলার এক্সপ্রেস ট্রেনটা পাহাড়ের পাঁচিল ঘেরা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। গোকুল রাহা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। শীত প্রায় না পড়লেও গোকুলবাবু রীতিমত বর্মাচ্ছাদিত। কম্ফর্টার, গলাবন্ধ কোট, পায়ে মোজা। ছোট্ট ছিপছিপে মানুষটা। কিন্তু চোখ দুটো সরস হাসিতে উজ্জ্বল।

স্টেশনে আলাপ হতে গোকুলবাবুই এনে তুললেন নিজের পাশের ঘরে।

আপনিও যখন একা, আর ভবানীপুরের লোক, তখন এখানেই উঠে পড়ুন। বাড়িটা পেয়ে গেলাম। সঙ্গে কুকার, স্টোভ সব এনেছি। খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না।

সুধীর কৃতজ্ঞতার জালে প্রায় জড়িয়ে গিয়েছিল। এমন আতিথ্য অভাবনীয়, অকল্পনীয়। কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি স্কন্ধলগ্ন হওয়াটা অশোভন।

কিন্তু— সুধীর ইতস্তত: করছিল।

আচ্ছা, আমায় কেমন দেখছেন?— গোকুলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন সুধীরের ওপর।

প্রথম দিনেই গোকুল রাহার এই প্রশ্ন। প্রথমটায় একটু থমকে গিয়েছিল সুধীর। কি বলতে চান ভদ্রলোক। ছোট্ট একফোঁটা মানুষটা। বনস্পতিরাজ্যে শীর্ণ একটা বাঁশের মতই হাওয়ায় দুলছেন। দমকা ঝড়ের সম্মুখীন হলে ভূমিচ্যুত হবারও আশঙ্কা আছে। এর মধ্যে কেমন দেখার কি প্রশ্ন থাকতে পারে!

অল্প একটু হেসে প্রশ্নটাকে আরও একটু বিশদ করলেন গোকুলবাবু: মানে আমার শরীরটা— চেহারাটা কেমন দেখছেন?

ও:, শরীর। তা ভাল— ভালই দেখাচ্ছে তো।

ভাল দেখছেন তো!— পরিতৃপ্তিতে গোকুলবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন। বিভাকে একবার—

মাত্র দশদিন এসেছি। জল-হাওয়া বেশ ভালই মনে হচ্ছে। ভেবেছিলাম বিন্ধ্যাচলে যাব, তা বিভা—মানে আপনার বৌদি জোর করে এখানে পাঠিয়ে দিলে। বলল সারা বছর খেটে খেটে পয়সা রোজগার করে চেহারাটা একেবারে ছ্যাকরা-গাড়ির ঘোড়ার মত হয়েছে; কিছুদিন বেড়িয়ে শরীরটা সারিয়ে এসো। আমার শরীরের জন্যে ও আবার সবসময়ই উদ্বিগ্ন কিনা। অথচ—

গোকুলবাবুকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল সুধীর।

মাথায় সাড়ে চার ফুটের মত লম্বা। দেহের কোথাও একফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। কেমন পাকিয়ে গেছে সমস্ত শরীরটা। দূর থেকে দেখলে মাঝারি বয়সের ছেলে বলে ভুল হয়। কাছে এলে মুখের রেখায় বয়স পড়লে প্রায় পঁয়তাল্লিশে দাঁড়ায়।

বউদিকে নিয়ে এলেই পারতেন, বউদি সঙ্গে থাকলে—

ছাড়তে চায় নাকি! বলে আমারও স্কুলের ছুটি এক মাসের ওপর। আসবার জন্যে তো একরকম তৈরি হয়েই বসেছিল। তাই বলে মেয়েদের নিয়ে আসা কি সোজা কথা মশায়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে রেহাই।

পথি নারী বিবর্জিতা—শাস্ত্রোক্ত বাণীটা মেনে চলেছেন গোকুলবাবু। এবং মেনে চলতে তিনি সক্ষমও। অন্ততঃ রান্নার আয়োজন দেখে তাই মনে হয়। রান্নায় বেশ পাকা হাত গোকুলবাবুর। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছাড়া এরকম নিপুণ হওয়া সম্ভব নয়। সুপাচকের প্রায় সবকটা গুণই আছে গোকুলবাবুর। এদিক দিয়ে তিনি স্বাবলম্বী—অণুমাত্র পরনির্ভরশীল নন। আর শরীরের যত্ন—স্বাস্থ্যোদ্ধারের সঙ্কল্প অদম্য।

ভোর পাঁচটায় উঠে পড়েন গোকুলবাবু। প্রাতঃভ্রমণ শুরু হয়ে গেছে। মাথায় উলের টুপি, গায়ে কোট, পায়ে মোজা। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম নেই। ভোরের হাওয়ার সমস্ত অক্সিজেনটুকুই তাঁর চাই।

ফেরার পথে সস্তায় সেরা জিনিসটা সংগ্রহ করে আনেন। বাজারের সঙ্গে কয়েকজোড়া মুরগীর ডিম। কোনদিন মাংস, কখনও মাছ।

গোকুলবাবু রসনাবিলাসী নন। গোকুলবাবুর আহার্য-তালিকা স্থিরীকৃত হয় স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে। আহার্য নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালান গোকুলবাবু। একই বস্তুর পৌনঃপুনিকতা তাঁর আহার্যে নেই।

এখানে তো কত অনিয়মই করেছি। বিভা থাকলে একবার দেখতেন। একচুল এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে থাকত না।

দিনের মধ্যে ওই নামটা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেন গোকুলবাবু। চাকরি করে বিভা-বউদি—স্কুলমিসট্রেস। দুটি জীবনের সুখী যোগবন্ধন। দুজনের উপার্জনে ছোট ফ্ল্যাটে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন। বাড়তি কোন ঝামেলা নেই। বিয়েটাও ঘটেছিল আকস্মিক। পাশের ফ্ল্যাটে বাবা আর মেয়ে। হঠাৎ বাবা মারা গেল বিভা-বউদির। তারপর চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই নিঃসঙ্গ গোকুলবাবুর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভেঙে বিভা-বউদি বিয়েতে রাজী করালেন।

বিভা থাকলে মুরগীর মাংসটা আর এমন গরগরে করে রাঁধতে হত না। দিত হাঁড়িশুদ্ধ টান মেরে ফেলে।

বাড়িতে সকাল হলেই আমাকে আগে বাথরুমে পাঠাবে স্নান করতে। তারপর চা আর খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। রাতে যতক্ষণ না বাড়ি ফিরছি ততক্ষণ ঠায় বসে থাকে।

গোকুলবাবুর যেটুকু বিভূতি তার সবটুকুই যেন বিভার জন্যে। নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। দাম্পত্যজীবনের দিগন্তটা যতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল, ততদিন নাকি গোকুলবাবু দিগভ্রষ্ট ছিলেন। তেপান্তরের প্রান্তে তখন অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু এখন দিগদর্শনের কাঁটাটি বউদির হাতেই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং অসীম প্রান্তরে আর লক্ষ্যহীন চলাফেরা নয়।

বউদির নির্দেশেই এখানে আসা।

গোকুলবাবুর পত্নীনিষ্ঠা দেখে সুধীর মুগ্ধ হয়েছিল। লোকে এজন্যে হয়তো তাঁকে স্ত্রৈণ বলতে পারে কিন্তু তা হবে ঈর্ষার কারণ। আসলে গোকুলবাবু যে সুখী দাম্পত্যজীবনের নীড়ে অধিষ্ঠিত তা একান্তই দুর্লভ। এটা গোকুলবাবুর গর্ব। বেশ গর্বের সঙ্গেই সে কথা বলতেন গোকুলবাবু।

বেশ ছিলেন গোকুলবাবু। হয়তো শেষ পর্যন্ত পুরো একটা মাসই বেশ থাকতেন। কিন্তু দিন বারো পরেই বিভা-বউদির চিঠি এল। আর সেই চিঠি নিয়ে সাক্ষাৎ দুর্ঘটনার মতই হাজির হলেন মালবিকা মিত্র। আর পাঁচজনের মত ছুটিতে স্বামীসমেত বেড়াতে এসেছেন। ইতিহাসের টিচার মালবিকা মিত্র। বিভা-বউদির সঙ্গে একই স্কুলে পড়ান।

স্টেশনের কাছেই খাবারের দোকানের বাইরে আবিষ্কার করলেন গোকুলবাবুকে।

ঠিক ধরেছি, বিভার বর।

(২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

(খ)

ঠিক খুশী হওয়া ওকে বলা যায় না, ভাল লাগার মধ্যে বিস্ময় যা মিশেছিল তার অনুপাত তুচ্ছ করবার মত নয়। নবদ্বীপের বুকের উপর বসেও নবদ্বীপকে ভোলা যায় তাহলে! ভাবছিল অনুপম: সবাই এখানে বোষ্টম নয়।

স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমেই প্রথম দর্শন। তারপর পথে-ঘাটে সর্বত্রই বোষ্টম দেখেছে অনুপম। ডিসপেনসারিতে রুগীর গলায়ও দেখেছে তুলসীর মালা, কপালে তিলক-ফোঁটা। কিন্তু সে রাত্রে ডাক্তার সরকারের বাড়িতে নিমন্ত্রিত সজ্জনদের মধ্যে তেমন তো একজনও নেই!

অমন যে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, বাহ্যিক প্রকাশে তিনিও দশজনের একজন।

কলকাতায় পার্টি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন দেখা যায় তেমন অবশ্য নয়—না সংখ্যায়, না আড়ম্বরে। এটি নিতান্তই ঘরোয়া অনুষ্ঠান। তবু প্রকৃতি একই। পাট-ভাঙা ধুতি-চাদর পরে এসেছেন পুরুষেরা; মহিলারা ঝলমলে শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে আরও বেশী ঝলমলে গয়না। প্রসাধন চাইলেই চোখে পড়ে; তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিলক-ফোঁটা দেখা গেল না।

হয়তো বেছে বেছেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন ডাক্তার সরকার, সবটুকুই সযত্নে তুলে এনেছেন তিনি। তবু জমায়েত নেহাত ছোট হয় নি, বৈচিত্র্যও আছে। স্ত্রী-পুরুষ তো আছেনই, বালক-বালিকাও আছে কয়েকটি। নবদ্বীপে কাছারি নেই বলেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে উকিল একজনও নেই। তবে থানার দারোগা আছেন। কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ এসেছেন সস্ত্রীক ও সকন্যা। বঙ্গবাণীর সঙ্গীত-শিক্ষিকা তরুলতা সেন এসেছেন তাঁর স্বামী জগন্ময়বাবুর সঙ্গে। মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান নিজে আসতে না পারলেও তাঁর ব্যবসায়ী পুত্র সুধাময়কে পাঠিয়েছেন তাঁর হয়ে ক্ষমা চাইবার জন্য। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এসেছেন দুজন, একজন সস্ত্রীক। পাটের আড়তদার শরৎ সাহাও আছেন। হরেশ্বরবাবু স্বয়ং এবং তাঁর প্রধান অতিথি উভয়েই ডাক্তার বলেই বুঝি ডাক্তার অতিথি মাত্র দুজন। একজন স্থানীয় চিকিৎসককুলের শিরোমণি অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন মেজর জি. এম. গোস্বামী; আর একজন স্থানীয় মাতৃমঙ্গল ভবনের রেসিডেন্ট-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার শ্রীমতী সুলোচনা বটব্যাল। তিনি ধর্মে খ্রীষ্টান এবং গার্হস্থ্য পরিচয়ে কুমারী।

ডাক্তার সরকারের আয়োজনে যেমন ত্রুটি নেই, তেমনি অন্ত নেই তাঁর উৎসাহেরও। এক একজন অতিথি আসছেন আর উঠে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন তিনি, ঘরে এনেই আগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন ডাক্তার অনুপম বোস এম. বি.-র সঙ্গে। ভদ্রতা ও অমায়িকতা ছাড়াও আরও কিছু ছিল ওই ছোট অনুষ্ঠানটুকুর মধ্যে—যেন অনুপমকে নিয়ে গর্ববোধ করছেন ডাক্তার সরকার, পুত্রের গৌরবে পিতা যেমন গর্ববোধ করেন।

তবে এক্ষেত্রে বাৎসল্যের সঙ্গে মিশেছিল সৌভ্রাত্র, বন্ধুত্বও। ভিয়ান প্রবীণ ডাক্তারের যুবক সুলভ প্রকৃতির ঘন রসের। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কৌতুকনাট্য পুরোপুরি জমিয়ে তুললেন ডাক্তার সরকার।

নিমন্ত্রণ-কর্তার ভূমিকায় একেবারে কেতাদুরস্ত বক্তৃতা। কিন্তু কি বলতে চাইছেন ডাক্তার সরকার? বলবার এমনই ভঙ্গি তাঁর যে উৎকর্ণ না হয়ে কারও উপায় নেই।

—অনুপমবাবুর সম্বন্ধে আসল কথাটাই এতক্ষণ আপনাদের বলা হয় নি। বাইরে এত তো দেখছেন।

কিন্তু ভেতরে? এইটুকু আয়োজন আমি করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে ওঁর অনুযোগের অন্ত নেই। বুঝুন তাহলে এই অর্বাচীন যুবকের বুদ্ধির দৌড়। না না, ওর ডাক্তারী বুদ্ধি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করি নি আমি, রুগী দেখবার জন্য ওঁকে ডাকলেই আপনারা বুঝবেন যে উনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আর প্রয়োজনে আপনারা যে ওঁকে নিশ্চয়ই ডাকবেন তাও আমি ধরেই নিয়েছি। কিন্তু কেবল ডাক্তার হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবে, আত্মীয় হিসেবেও ওঁকে ডাকবার জন্য আপনাদের আমি অনুরোধ করছি। উনি আপনাদের ডাকবেন না, ডাকতে পারবেন না। তবু আপনারা ওঁকে ডাকবেন। না যদি ডাকেন তো উপযুক্ত সঙ্গ ও সমাজ না পেয়ে উনি হয়তো এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলেই যাবেন, নয়তো ভেক নিয়ে বোষ্টম হবেন।

নাটকীয় ভঙ্গিতে হঠাৎ একেবারে থেমে গেলেন ডাক্তার সরকার।

আর সেই জন্যই ঘরের মধ্যে কৌতুক-হাস্যের ঘন মিশাল দেওয়া সমর্থন ও প্রতিবাদের যে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল তা নির্দিষ্ট একটি রূপ ধরবার সুযোগ পেল। একাধিক কণ্ঠ তখন প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, কোনটাই ঘটতে দেব না আমরা।

অনুপমবাবুকে নিশ্চয়ই আমরা ডাকব।

জোর করে আমাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে যাব ওঁকে।

উনি আমাদের না ডাকলেও ওঁকে আমরা ডাকব।

না ডাকলেই হল নাকি, অনুপমবাবু? আমরা জোর করে আপনার বাড়ি গিয়ে ঢুকব।

শেষের কথাটা বলেছিলেন হেডমাস্টার নীলরতন নন্দী একটি চোখ তাঁর স্ত্রী কণিকার এবং আর একটি অনুপমের মুখের উপর রেখে।

অপ্রস্তুত অনুপম সুযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলল, ঠিকই তো। তাই তো আমি চাই। আমার বাড়িতে আপনাদের পেলে কি খুশীই যে আমি হব!

এই শুনুন।—বলে উঠলেন ডাক্তার সরকার। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ডান হাতখানা প্রায় উলটিয়ে চোখমুখের এমন একটা ভঙ্গি করলেন তিনি যে ঘরের মধ্যে সব কটি নরনারীই হঠাৎ একেবারে থ হয়ে গেল—বিস্ময়, জিজ্ঞাসা ও প্রত্যাশার খিচুড়ি আর কি!

বুঝি এই রকম একটা পরিবেশই সৃষ্টি করবার মতলব ছিল ডাক্তার সরকারের। কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন, এই জন্যেই তো অনুপমবাবুর বুদ্ধির তারিফ করছিলাম আমি। আরে মশায়রা, ওঁর নিজের বাড়িতে আপনাদের পাঁচজনকে উনি ডাকতে পারবেন না বলেই তো আমার বাড়িতে আজকের এই ক্ষুদ্র আয়োজন। ওঁর কি গৃহ আছে, না, অদূর ভবিষ্যতে হবে? গৃহিণী না থাকলে গৃহ হয় কারও? অনুপমবাবু তো বিয়েই করেন নি।

আলোর খড়্গের একটি আঘাতেই অন্ধকার কেটে খানখান হয়ে গেল—অত দীর্ঘ আর অমন দুর্বোধ্য ভূমিকার অর্থ এখন সুস্পষ্ট। ফলও হল মন্ত্রের মত। কথা বলবার জন্য যে মুখ হাঁ করেছিল তা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হল; অস্ফুট শব্দের অস্পষ্ট যে একটা গুঞ্জন উঠছিল তা হঠাৎ গেল থেমে; একেবারে মরে গেল যেন কয়েকজনের মুখের হাসি অথচ প্রায় সব কটি মেয়েরই চোখের দৃষ্টি অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অতগুলি জোড়া চোখের অতরকম দৃষ্টির আঘাতে অনুপমের নিজের মুখখানি কালো নয়, লাল হয়ে উঠল, আর সেই মুখের দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার সরকার।

হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছি, না?—বললেন ডাক্তার সরকার: কিন্তু তা করলাম আপনারই ভালর জন্যে। এই দেখুন না, এখন সবাই কেমন হিংসে করছেন আপনাকে।

তা ঠিক।—বললেন দারোগা বীরেশ্বর জানা: বেশ ভাল আছেন উনি—শান্তিতে আছেন। বিয়ে করলে কি যে সুখ তা হাড়ে হাড়ে বুঝি তো আমরা।

আমরাও কিছু কম বুঝি নে।—ভ্রূভঙ্গি করে বললেন সুন্দরী কণিকা: রোজই মনে হয় যে বিয়ে না দিয়ে মা-বাপ মেয়েকে যদি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতেন তো অনেক বেশী উপকার করা হত মেয়ের।

তা হলে আপনি কোন্ দলে নীলরতনবাবু? হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার সুলোচনা বটব্যাল: কণিকার, না বীরেশ্বর বাবুর?

আবার একটা হাসির রোল উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাত তুলে তা থামিয়ে দিলেন বয়োবৃদ্ধ স্বভাবগম্ভীর ডাক্তার গোস্বামী—আলাপের মোড় ফিরিয়ে দিলেন

তিনি। হাতের জলন্ত পাইপটি ছাই ফেলবার বাটিতে বার দুই ঠুকে নিয়ে উদ্বিগ্ন সুরেই তিনি বললেন, তাহলে ডাক্তার বোসের জন্য ব্যবস্থাটা কি হবে হরেশ্বরবাবু? আপনি তো শুনেছিলাম যে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন।

উত্তরে ডাক্তার সরকার বললেন, একটা ব্যবস্থা মোটামুটি আমি করে রেখেছি।

আপনার এই বাড়িটাই ওঁকে দিয়ে যাবেন নাকি?

দিতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু একা মানুষ উনি, এতবড় বাড়ি নিয়ে কি করবেন? তাই চাকী পাড়াতে কুণ্ডুদের যে নতুন ছোট বাড়িটা হয়েছে সেটা ঠিক করেছি অনুপমবাবুর জন্যে।

আর খাওয়া-দাওয়া?

আমাদের ফটিক ওর সঙ্গেই থাকবে—ডালভাত চাট্টি ফুটিয়ে দিতে পারবে আশা করি।

শুনে মেজর গোস্বামী সন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তার সরকার আবার বললেন, তবু ভাবনা যাচ্ছে না আমার—নিঃসঙ্গতার কষ্ট পেতে হবে অনুপমবাবুকে।

কিন্তু অনুপম স্বয়ং মানে না কথাটা। প্রতিবাদ করে সে বলল, ওইখানেই ডাক্তার সরকার মস্ত একটা ভুল করে আসছেন। আপনাদের এই নবদ্বীপে পা দেওয়া থেকেই মনে হচ্ছে আমার যে এখানে কোন কাজও যদি আমার না থাকে, একটিও সাথী যদি আমি না পাই তবু কেবল পথে পথে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মিছিল দেখে আর তাদের গান শুনে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিতে পারি আমি।

ওই শুনুন!

আবার সেই মন্তব্য করলেন ডাক্তার সরকার; আবার তাঁর হাত ও মুখের বিশিষ্ট সেই ভঙ্গিতে হতাশার প্রকাশ; তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মুখে বললেন, কি করা যায় এমন লোককে নিয়ে—আপনারাই বলুন।

জগন্ময়বাবু কিন্তু হেসে বললেন, একেবারে দেখছি রোমান্টিক প্রকৃতি অনুপমবাবুর। ডাক্তার না হয়ে কবি হওয়া উচিত ছিল আপনার।

স্ত্রী তরুলতা সেন আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, কবি যে উনি নন তা আমরা ধরে নেব কেন? কি বলেন অনুপমবাবু?

অনুপম লজ্জিত ছিলই, এখন বিব্রত বোধ করল। কিন্তু তখনই বর এবং অভয় নিয়ে এগিয়ে এলেন অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ।

আমি কিন্তু, ডাক্তার বোস, সম্পূর্ণ একমত আপনার সঙ্গে।

চোখের চশমাজোড়া খুলে জামার কোণ দিয়ে মুছতে মুছতে তিনি বলে চললেন, মহাপ্রভুর ধাম এই নবদ্বীপ—যিনি স্বয়ং মহা পণ্ডিত হয়েও তাঁর সমস্ত জ্ঞান ওই ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিয়ে প্রেমধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন। সেই সরস ও সার্থক জীবনের স্রোতই তো আজও খরতর বেগে এই নবদ্বীপের পথে-ঘাটে বয়ে চলেছে। সেই স্রোতে মনটাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে আর কি কোন অভাববোধ থাকে!

এবার আর খড়্গাঘাত নয়—মজলিশী সুরের মধ্যে ধ্রুপদীর আকস্মিক প্রক্ষেপ যেন।

এমনিতেই তো সকলেই সমীহ করে চলেন প্রবীণ অধ্যাপককে; তার ওপর রীতিমত গুরুগম্ভীর স্বরে এই তাঁর তত্ত্বব্যাখ্যা। ঘরের মধ্যে সকলেই হকচকিয়ে গেলেন—এতবড় সমর্থন পেয়েও স্বয়ং অনুপমও স্তম্ভিত। চুপচাপ সকলেই, প্রতিবাদ করতে সাহস কারও হচ্ছে না, অথচ সমর্থনও জুটছে না অমন যে পাটের দালাল সাহা মশায়, তার মুখেও।

তাতে আরও উৎসাহিত হয়ে থাকবেন অধ্যাপক; একটু দম নিয়েই তিনি আবার বললেন, গৌর বুঝি সত্যিই কৃপা করেছেন অনুপমবাবুকে যাতে শ্রীধামের আসল রূপটা এখানে আসতে না আসতেই ওঁর চোখে পড়েছে। বৈষ্ণবধর্মের আরও একটু গভীরে যদি উনি প্রবেশ করতে পারেন—

মাফ করবেন।

মাত্রা বুঝি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল বলেই এবার বাধা পেলেন অধ্যাপক।

শ্রীঅরবিন্দঘেঁষা বঙ্গবাণী এবং স্ত্রীর সম্পর্কে সেই বঙ্গবাণীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন যে জগন্ময়বাবু তিনি সবিনয়ে হলেও বেশ দৃঢ়স্বরেই বাধা দিয়ে বললেন, মাফ করবেন মাস্টারমশায়। সব ধর্মই মূলে এক। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে নিন্দা করব তেমন পাষণ্ড আমি নই। কিন্তু তার বাহ্যিক যে রূপটা সম্বন্ধে কথা উঠেছে

তাকে নিয়ে অত বেশী মাতামাতি করা এ যুগে বড়ই বেমানান ঠেকে। জ্ঞান ছেড়ে একটা নির্বোধ ভাবালুতা নিয়ে যারা মেতে আছে, কর্ম ছেড়ে ভক্তিকে আশ্রয় করেছে, সম্বল করে খেটে খায় না যে পরশ্রমজীবীর দল—

থামুন মশায়।

অধ্যাপক বাধা পেয়েই বিরক্ত হয়েছিলেন, এখন বুঝি ক্রুদ্ধ হয়েই বললেন, থামুন মশায়। অন্ততঃ ওই খেটে না খাওয়ার অভিযোগটাকে অত বেশী বাড়াবেন না। মোটেই কোন পরিশ্রম না করেও বুক ফুলিয়ে বেড়ায় এমন সম্প্রদায় আরও অনেক আছে আমাদের দেশে। বৈষ্ণব কৃষ্ণনাম শুনিয়ে ক মুঠো ভিক্ষা আর নেয়? গান্ধী বা জওহরলালের নাম শুনিয়ে বাড়ি-গাড়ি পর্যন্ত যারা করছে তারা সবাই খেটে-খাওয়া মানুষ নাকি? আর এই আমরা—মানে ভদ্রলোকেরা? থিয়েটার-সিনেমা, এমন কি স্কুল-কলেজেও যে কাজ করে মাসে মাসে মোটা টাকা রোজগার করি আমরা, তা খুব মেহনতের কাজ নাকি, না কীর্তনগান বা কথকতা থেকে অনেক উঁচুদরের সমাজসেবা? বৈষ্ণবেরা যা করেন তা তো খোলাখুলি ভিক্ষাই। আমরা যা করি তা চুরি, না হয় ডাকাতি।

কিন্তু বোষ্টমের সমাজে যে ব্যভিচার—

আহা হা যেন আর কোথাও তা নেই। আরে মশায়, স্ত্রী-পুরুষের যে সম্বন্ধটাকে আপনি ব্যভিচার বলছেন তা সমাজের কোন্ স্তরে নেই?

উত্তর দেবার জন্য রুখে উঠেছিলেন জগন্ময়বাবু, কিন্তু তখনই তরুলতার সঙ্গে চোখাচোখি হল তাঁর। স্ত্রী তাঁকে চোখের ইশারায় সতর্ক করছেন, যেন বলছেন যে সত্যি হোক মিথ্যে হোক, অধ্যাপকের বক্তব্য শালীন নয়; শোভন নয় অতজন মহিলার উপস্থিতিতে অমন একটি প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা। আপত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিজেও তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন বলেই যে কড়া কথাটা তাঁর মনে এসেছিল তা জগন্ময়বাবু মুখে আর উচ্চারণ করলেন না।

কিন্তু বৃথা সতর্কতা। মুখের উপর উত্তর না পেয়ে যেন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়েই অধ্যাপক আবার বললেন, মক্ষিকার মত কেবল ব্রণই খুঁজবেন না জগন্ময়বাবু। নিজে মধুকর হলেই মধুর সন্ধান পাওয়া যায়। ভাল করে খুঁজে দেখুন—বৈষ্ণবসমাজে বিরাট মহত্ত্ব, শ্রদ্ধা ভক্তি, কঠোর সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত পাবেন ভূরি ভূরি। কৃষ্ণদাস বাবাজীকে আপনারা সকলেই দেখেছেন—না?

কেউ উত্তর দিল না, কারণ সবাই বিরক্ত। থমথম করছিল ঘরখানা। অগত্যা শান্তিজলের ঘট নিয়ে গৃহকর্তাই এগিয়ে এলেন।

সায় দিলেন ডাক্তার সরকার; বললেন, কে আর না দেখেছে কৃষ্ণদাস বাবাজীকে। এই অনুপমবাবুও দেখেছেন, আমিই দেখিয়েছি ওঁকে।

তখন উৎফুল্ল হয়ে অনুপমের দিকে চেয়ে অধ্যাপক বললেন, দেখেছেন নাকি বাবাজীকে? তা হলে বলুন তো, কেমন লাগল?

অনুপম বিহ্বল। কার কথা যে হচ্ছে তা সে বুঝতেই পারে নি তা উত্তর কি দেবে সে! তবু অধ্যাপকের উৎসাহে ভাটা পড়ল না। অনুপমকে লক্ষ্য করেই তিনি আবার বললেন, দূর থেকে দেখা কোন কাজের দেখা নয় অনুপমবাবু। আপনি একদিন তাঁর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে দর্শন করবেন। বলেন তো আমিই নিয়ে যাব আপনাকে, আলাপ করিয়ে দেব।

অগত্যা ঠিক ঠিক না বুঝেও বলতে হল অনুপমকে, বেশ তো, যাব একদিন।

শুনে আরও উৎসাহিত হয়ে অধ্যাপক বললেন, মহাপুরুষ লোক এই কৃষ্ণদাসবাবাজী। দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু সব কচকচি ছেড়ে এখন মেতে আছেন কেবল "নাম" আর বিগ্রহসেবা নিয়ে। বড়লোকের ছেলে, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি থেকে একটি পয়সাও তিনি গ্রহণ করেন নি, নিজের জীবিকা মাধুকরী। আর কঠোর সন্ন্যাসী তিনি—স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেন না, মুখই দেখেন না স্ত্রীলোকের।

তা হলে তো আমাদের উঠতে হয়, ও কমলাদি!

কৌতুকে সরস, কিন্তু ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আকস্মিক প্রক্ষেপ।

বলেছেন সুন্দরী কণিকা। হাসি তিনি চেপেছেন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। কিন্তু চোখের হাসি তাঁর উপচে পড়ছিল—লক্ষ্য অধ্যাপক-পত্নী হলেও স্বয়ং অধ্যাপকও রেহাই পেলেন না।

অবশিষ্টদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু বেশ উপভোগ করেছেন ওই সরস রসিকতা। স্বভাবতঃই গম্ভীর হলেও মেজর গোস্বামী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, ওটা কিন্তু মস্ত একটা গুণ নয় মনোমোহন-বাবু—মানুষমাত্রেরই মা যখন থাকেন!

ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝে থাকবেন মনোমোহনবাবু; তিনি অপ্রতিভের মত বললেন, আহা, গৃহীর কথা তো বলা হচ্ছে না। সন্ন্যেসী-বৈরাগীর পক্ষে ওটা একটা গুণ বইকি!

থাম তুমি।

বললেন কমলা; আর সহ্য করতে না পেরেই স্বামীকে ধমক দিলেন তিনি: এটা তো আর আখড়া নয়, তোমার নিজের বাড়িও নয়। সরকারমশায় আনন্দ করবার জন্য আমাদের পাঁচজনকে ডেকে এনেছেন। এখানে গল্পগুজব হবে, গানটান হবে। তা বলা নেই কওয়া নেই, তুমি যেন কথকতা শুরু করে দিলে। ভীমরতি কাকে আর বলে!

অধ্যাপক তাতে আরও বিব্রত হয়ে বললেন, তা হোক না গানটান। কে গাইবে— আমাদের অরু?

অরু মানে অরুন্ধতী। মনোমোহনবাবুরই কন্যা। বছর-কুড়ি বয়স। এতক্ষণ ডাক্তার সরকারের ছোট মেয়ে তপতীকে কাছে বসিয়ে তার কানে কানে কি যেন সব কথা বলবার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে এক একবার এক একজনকে দেখে নিচ্ছিল। অধ্যাপকের মুখে আচমকা তার নিজের নামটা উচ্চারিত হতে না হতেই একসঙ্গে অনেক জোড়া চোখের দৃষ্টি তারই গায়ে-মুখে এসে পড়ল।

আঘাতটা বুঝি অপ্রত্যাশিত। অরুন্ধতী বিব্রত হয়ে বলে উঠল, ওমা—আমি কেন! আমি কি গাইতে জানি! কি যে বল তুমি বাবা!

মায়ের আদলেই মুখখানি, ভঙ্গিও মায়ের মুখেরই। কিন্তু গলাটা মিষ্টি; চোখের কোণে, ঠোঁটের ডগায়, ভুরুর বাঁকে উদ্ভিন্ন যৌবনের বিদ্যুদ্দীপ্তি ফুটে উঠে থাকলেও তা কৌমার্যের শুচিতায় স্নিগ্ধ। অপত্যের অধিকারের সহজ ঘোষণা বিরক্ত প্রতিবাদ হলেও মধুর হয়েই বাজল তা।

অধ্যাপক একটু হেসে বললেন, জানবি না কেন! মীরার ভজনগানা সেদিন তো বেশ গেয়েছিলি।

বেশ না হাতী— আমি গাইতে পারব না।

তবে কে গাইবে?

অধ্যাপকেরই কথা, কিন্তু সুরটা অন্য রকম।

অরুন্ধতীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে অনুপমের মনে হল যে তাঁর মুখের হাসিটুকু যেন মরে যাচ্ছে—কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে তাঁর পাকা মুখখানা।

অরুন্ধতীর যেন ধনুকভাঙা পণ। তবে সে না গাইলেও ওই রাত্রে ওই বৈঠকে গান হয়েছিল। গেয়েছিল ডাক্তার সরকারের মেয়ে তপতী; খুব উঁচুদরের দুখানা গান পরিবেশন করেছিলেন সঙ্গীত-শিক্ষিকা তরুলতা সেন। কিন্তু আশ্চর্য, গানে মন দিতে পারে নি অনুপম, থেকে থেকে অধ্যাপকের কথাই মনে উঠছিল তার।

অনুভূতিটুকু ভাল লাগার নয়, অনুকম্পার গা-ঘেঁষা। বয়সের জন্যই মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছেন অধ্যাপক, না সত্যিই আধ্যাত্মিকতার চটচটে রসের মধ্যে অনেকখানি ডুবে গিয়েছেন তিনি, তা জানে না অনুপম। কিন্তু তাঁর অপদস্থ হওয়াটাকে প্রত্যক্ষ করেছে সে। বেচারা! পাঁচজনের সামনে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছেও ধমক খেতে হয়েছে তাঁকে, মেয়ের মুখ থেকেও কড়া কথা শুনতে হয়েছে। তাঁর মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াটা দোষের বলে মেনে নিলেও উপলক্ষ্যটাকেও মানতে হয় তো! সে উপলক্ষ্য অনুপম নিজে। সে রাত্রে অধ্যাপকের মনের আগুনে সেই-ই ইন্ধন জুগিয়েছিল—বোষ্টম-বোষ্টমীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার মুখ থেকে না শুনলে অধ্যাপক হয়তো বৈষ্ণব-ধর্মের মহিমা ও বৈষ্ণব-জীবনের অত খুঁটিনাটি বর্ণনা করবার জন্য অত উৎসাহিত হয়ে উঠতেন না। আর তা না হলে কণিকার মত হালকা মেয়ের কাছ থেকেও অমন একটা খোঁচা তাঁকে খেতে হত না।

খোঁচাগুলো তিনি যে সম্পূর্ণ পরিপাক করতে পারেন নি তা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অনুপম বারে বারেই বুঝতে পারছিল। আর ওই নিমিত্তকারণের উপলব্ধিটা মনে তো তার ছিলই। তাই সে রাত্রে আসর ভাঙবার আগে নিজেই সে অধ্যাপকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল,

ওই যে কৃষ্ণদাস বাবাজীর কথা বললেন আপনি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

প্রথমে বোধ করি বিশ্বাস হয় নি মনোমোহনবাবুর, কিন্তু তারপরে উৎসাহে যেন জ্বলে উঠলেন তিনি। বললেন, আমি নিয়ে যাব আপনাকে— বলেন তো কালই যেতে পারি।

স্বখাত সলিল অনুপমের। সে ঢোক গিলে বলল, অত তাড়াতাড়ি হয়ে উঠবে না। আমি একটু গুছিয়ে বসে নি, তারপর খবর দেব আপনাকে।

বলেই চমকে উঠল অনুপম—আবার বুঝি একটা ভুল হয়ে গেল। সেটা সংশোধন করবার উদ্দেশ্যে পরক্ষণেই সে আবার বলল, আপনার বাড়িতেই যাব আমি। এত জানেন আপনি—এই সব তত্ত্বকথা আপনার মুখ থেকে শুনব। বেশী যদি জুলুম করি, বিরক্ত হবেন না তো?

বিরক্ত হব!

অধ্যাপক যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কৃষ্ণকথা বলতে আমার যদি বিরক্তি আসে তবে যে নরকেও ঠাঁই হবে না আমার।

বলে একটু থেমেছিলেন তিনি, তারপর আবেগ যেন উথলে উঠল।

দুই হাত বাড়িয়ে অনুপমকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে এনে অধ্যাপক আবার বললেন, তুমি বাবা, আমার ছেলের বয়সী। তোমার যখন খুশি তখনি আমার বাড়িতে আসবে - নিজের বাড়ি মনে করে আসবে। আমি কালই নিয়ে যাব তোমাকে।

এর পর প্রণাম না করে উপায় নেই। অনুপম মনোমোহনবাবুর পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করল।

অধ্যাপক তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—কৃষ্ণে মতিরস্তু।

ওষুধ তা হলে ধরেছে— মহা খুশি ডাক্তার সরকার।

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের নিমন্ত্রণকে ভাবোন্মাদের খেয়াল বলে উপেক্ষা করা যেতে পারত, কিন্তু এটিকে তা করা যায় না, এ যে 'প্রফেশনাল কল'।

পরদিন অনুপমকে ডিসপেনসারির চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার সরকার ঝাড়া-হাত-পা হয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল যে তিনি ফিরে এলে দুজনে একসঙ্গেই বাড়িতে ফিরবেন।

ইতিমধ্যে সেই চিঠিখানা এসেছে।

ঝি-শ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক রুগী ঠেলে অনুপমের প্রায় গা ঘেঁষে এসে একখানা খামের চিঠি তার হাতে দিয়ে বলল, চিঠিখানা আপনার যদি হয় তবে দয়া করে এই কাগজটাতে একটা সই করে দিন।

তারই চিঠি—খামের উপর গোটা গোটা ইংরেজী অক্ষরে ডাঃ অনুপম বোস, এম. বি. লেখা রয়েছে। ভেতরে একছত্রের চিঠিতে ডাক্তারকে 'কল' দেওয়া হয়েছে একটা কেস দেখবার জন্যে। সইটা পড়া যায় না, কিন্তু চিঠির কাগজে কি একটা মাতৃমঙ্গল ভবনের নাম ছাপা আছে।

চিনি চিনি মনে হলেও সঠিক চিনতে পারে নি অনুপম। তাই ডাক্তার সরকার ফিরে আসতেই তাঁর হাতে চিঠিখানা তুলে দিল সে।

আর চিঠিতে চোখ বুলিয়েই ডাক্তার সরকার প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, আরে, ওষুধ ধরেছে দেখতে পাচ্ছি। 'কল' তো এসেছে ডাক্তার বটব্যালের কাছ থেকে।

ডাক্তার!

ডাক্তার বইকি! কালই তো তার সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। কেন, সুলোচনা বটব্যালকে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি?

না, ভোলে নি; বেশ মনে পড়ল অনুপমের। কত বয়স তাঁর কে জানে—মেয়েদের বয়স শুনলেও বিশ্বাস করতে নেই, অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু মোটাসোটা ভদ্রমহিলার গোলগাল বাদামী রঙের মুখখানি তখন বেশ মনে পড়ল তার।

কিন্তু মনে পড়লেও সংশয় যায় না। ভ্রূ কুঁচকিয়ে অনুপম বলল, কিন্তু নিজে ডাক্তার হয়েও আমাকে 'কল' দেওয়া কেন?

তবে ডাক্তার সরকারের কাছে ব্যাপারটা কাচের মত স্বচ্ছ। উত্তরে তিনি বললেন, ওদের ওই মেটারনিটি হোম থেকে এ রকম কল মাঝে মাঝেই আমি পেয়েছি। আরে মশায়, মিস বটব্যাল ডাক্তার হলেও মেয়ে তো—কেস তেমন শক্ত হলে ঘাবড়ে যান। তখন ডাক এই

সরকারী ডাক্তারকে—যাতে রুগী মরে-টরে গেলেও কৈফিয়ত দিতে ওঁর কোন অসুবিধে না হয়।

তবুও সংশয় কাটে না অনুপমের। দেখে ডাক্তার সরকার কতকটা যেন অধৈর্য হয়েই বললেন, অত ভাবছেন কি? কল পেয়েছেন যাবেন; ফী পাবেন, রুগী দেখবেন। এতে অত ভাবনা কিসের? চলুন, একটা চেনা রিক্‌শাতে বসিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

রাস্তায় নামবার পরে কিন্তু ডাক্তার সরকার অনুপমের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, এ কিন্তু আপনাদের কলকাতার হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডের মত নয়—মায়েরা এখানে হয় বিধবা, নয় কুমারী। তবে বে-আইনী কিছু নয়—আমি ঠিক জানি।

এতদিন আভাসেই জানা ছিল অনুপমের; আসল রূপটা সেদিন প্রত্যক্ষ করল সে।

'ভবন' অবশ্য ওখানে একটিই, কিন্তু মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আরও অনেক আছে। আকারের তারতম্য আছে, অনিবার্যরূপেই দক্ষিণার অনুপাতে তারতম্য আছে সেবাযত্নেরও। কিন্তু একই প্রকৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের। ওদের একমাত্র পরিচয় এই নয় যে মাতৃত্বের পরিচর্যা ওখানে হয়—পরিচর্যার ক্ষেত্রে ওরা অসংখ্যের অন্যতম কয়েকটি। ওদের বিশিষ্ট পরিচয় এই যে ওরা মাতৃত্বের সঙ্কটমোচন করে। সেবার ওই বিশেষ ক্ষেত্রে ওরা অনন্য।

একটি ওয়ার্ড দেখেই চোখ খুলে গিয়েছে অনুপমের—ডাক্তার সুলোচনা বটব্যাল তাকে বুঝিয়ে না বললেও বুঝতে পারত সে। একটা জায়গায় গিয়ে সব মানুষই যেমন সমান হয়, তেমনই একটি বিচ্যুতিতে সব নারী না হলেও সমাজের সব স্তরের নারীই সমান। আর সব বয়সেরই নাকি? সাজপোশাক, গায়ের রঙ এবং মুখের গড়ন দেখে তো মনে হয় যে বড় ঘরের মেয়েরাই ওখানে সংখ্যায় বেশী। কপালে ফোঁটা কারও কারও থাকলেও কারও সিঁথিতেই সিঁদুর নেই—সিঁদুর পরবার অধিকার যাদের আছে তাদের মাতৃত্বের পরিচর্যার জন্য অন্য প্রতিষ্ঠান আছে। কুমারী বা বিধবা বলেই মাতৃত্ব ওদের সঙ্কট। সেই সঙ্কট থেকে ভালয় ভালয় মুক্ত হতে পারলে ভবিষ্যতে সিঁথিতে সিঁদুর পরবার অধিকার আয়ত্তের মধ্যে আসবে বলেই মাতৃমঙ্গল ভবনের মত প্রতিষ্ঠানে তারা শরণাগতা। প্রতিষ্ঠানের দাক্ষিণ্য অসীম অবশ্য নয়, তবে সাধারণতঃ প্রার্থীদের বিমুখ হয়ে ফিরতে হয় না—কোন না কোন একটিতে স্থান পায় সে।

না, অন্যায় কিছু ওখানে ঘটে না। কালো, কুটিল পথে সঙ্কটমুক্তি চায় যে মেয়েরা তাদের জন্য অন্য জায়গা নাকি আছে; আছে অন্য একশ্রেণীর সেবিকা যারা বাস করে সমাজের কানা গলিতে, কাজ করে রাতের অন্ধকারে, মৃত্যুকে তুক্ করে তাকে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করিয়ে নিতে পারে। মাতৃমঙ্গল ভবন এবং ওই শ্রেণীর আর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের চারিদিকে উঁচু দেওয়াল এবং দ্বারে কড়া পাহাড়া থাকলেও দিনের আলোককে ওরা ভয় করে না, থানা পুলিসকেও নয়; সিভিল সার্জনের মঞ্জুরি নিয়ে শাস্ত্রসম্মত উপায়েই গর্ভিণী নারীর সঙ্কটমোচন করে ওরা। শরণাগতের প্রয়োজনে মাসের পর মাসও তাকে এরা থাকবার জন্য ঘর দেয়, উপযুক্ত খাদ্য দেয়, রোগে দেয় ওষুধ ও শুশ্রূষা। তারপর সময় যখন হয় তখন সবরকম যত্ন নিয়ে এরা তাকে ভারমুক্ত করে। না, এক পরিচয় ছাড়া আর কিছুই এরা গোপন করে না।

আর শিশু? তারও ভার নেবার জন্য আছে ওপারে খ্রীস্টানী মিশন—দু-একদিন, বা দু-চার মাসের জন্য মাত্র নয়, তার সারা জীবনের সম্পূর্ণ ভার নেবার জন্যই। নবজাতকের মাতা বা পিতা তার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন যদি করে তো ভালই, না করলেও কোন শিশুই পরিত্যক্ত হয় না। না, শিশুমেধ যজ্ঞের বেদী নয় এই মাতৃমঙ্গল ভবন। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিত্যক্ত শিশুকে নিরাপদে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে এইসব শরণাগত গর্ভিণীর গোপন আশ্রয়।

মা যদি নিজেই নিতে চায় তার সন্তানকে?—অনুপম জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার বটব্যালকে।

সুলোচনা হেসে উত্তর দিলেন, তা হলে তো আমরা সবাই বাঁচি। কিন্তু যে মায়েদের নিয়ে আমাদের কারবার তারা কেউ তা চায় না—দু-চার ফোঁটা চোখের জল যারা ফেলে তারাও নয়।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য আর কি! কবিরা বড্ড বেশী রঙ লাগিয়ে

এঁকেছেন মাতৃস্নেহকে। আসলে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আরও আদিম, আরও প্রবল। যে ক্ষেত্রে দুই প্রবৃত্তির সংঘাত সেখানে আদিমতর প্রবৃত্তিরই জয়। আমি তো দেখি যে অবৈধ সন্তানকে ফেলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে তাদের মায়েরা।

মেনে নিতে বুঝি কষ্ট হচ্ছিল অনুপমের। অন্ততঃ তাই অনুমান করে একটু পরেই সুলোচনা আবার বললেন, ব্যতিক্রম হয়তো আছে। তবে এখানে আমার আট বছরের চাকরি-জীবনে মাত্র একটি ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে। তবে সে বোষ্টমী। হয়তো বোষ্টমী বলেই তার লাজের বালাই ছিল না।

বোষ্টমী!

হ্যাঁ, বোষ্টমী। তার ব্যবহার দেখে অবাক হয়েছিলাম আমি। বাচ্চাটাকে আমরা বিনা খরচেই রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও তাকে কিছুতেই বুক থেকে নামাল না।

তারপর?

তারপর আর কি—ছেলে নিয়ে নবদ্বীপেই থাকে মঞ্জরী।

মঞ্জরী!

চমকে উঠেছিল অনুপম, লক্ষ্য করে সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, দেখেছেন নাকি তাকে?

অনুপম ঘাড় নাড়তেই সুলোচনা হেসে ফেললেন; বললেন, খুবই স্বাভাবিক তা। ডাক্তার সরকারের সঙ্গে বেশ ভাব আছে মঞ্জরীর—উনি তাকে একটু স্নেহও করেন। সকলেই করে। বেশ মেয়েটি—গান তো জানেই, তা ছাড়া কথায় কথায় হাসি, রঙ্গ, রস। এত দুঃখেও কি করে যে বজায় রেখেছে, ভেবে পাই না।

অনুপম নিজেও তাই ভাবছিল, কোন উত্তর দিল না সে। একটু পরে সুলোচনাই আবার বললেন, তবু কিন্তু এখন ওকে দেখলে ওর সেদিনের সেই আচরণ স্মরণ করে ওর ওপর আমার রাগ হয়—ভীষণ রাগ।

অনুপম বিস্মিত হয়ে বলল, তা কেন?

হবে না?—সুলোচনা বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই উত্তর দিলেন: এক্ষেত্রে মাতৃস্নেহ যে অন্ধ—সন্তানের সর্বনাশ করেছে তা। মঞ্জরী নিজেই তো ভিক্ষে করে খায়—ছেলেটাকে ও খাওয়াবে কি, শেখাবে কি? অমন বুদ্ধিমান ফুটফুটে ছেলেটা অসৎসংসর্গে পড়ে দেখছি গোল্লায় যাচ্ছে। এখন তো আরও ভয়—ওর মায়ের হয়েছে টি. বি.।

জানা কথাই অনুপমের। ও জানা পরের মুখ থেকে শুনে জানা নয়, নিজের চোখে দেখে শিক্ষিত ডাক্তারের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিয়েছে সে—যুবতী নারীর অস্বাভাবিক শীর্ণ দেহে, তার গণ্ডের অত উজ্জ্বল লালিমায়, চোখ দুটির অত চকচকে তীক্ষ্ণতায়, কোকিলকণ্ঠী গায়িকার খুক্‌খুক্‌ কাশির আওয়াজের সঙ্গে তার হাতের মন্দিরার টুংটাং ধ্বনির ভয়ঙ্কর সাদৃশ্যে ইতিপূর্বেই সে যেন প্রত্যক্ষ করেছে মৃত্যুর দূতের সঙ্গে মঞ্জরীর সহ-অবস্থানের বিকট সত্যটিকে। এখন মঞ্জরী বৈষ্ণবীর মুখখানা মনে পড়লেই মৃত্যুর সেই দূতটিকেও মনে পড়ে—এমন দূত যে নিরীহ মেষশাবকটির মতই দোরের পাশে অনেকদিন পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে বসে থাকলেও ইচ্ছে করলেই রুগিণীকে—ধীরে ধীরে টেনে নয়—বাঘের মত পিঠে তুলে নিয়ে এক লাফেই তাকে বৈতরণীর ওপারে নিয়ে যেতে পারে।

সেদিন সুলোচনার মুখ থেকে মঞ্জরীর সম্বন্ধে অতিরিক্ত আরও অনেক সংবাদ জানবার পর একা একা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ডাক্তার অনুপমের ইচ্ছে হয়েছিল মৃত্যুর সেই দূতটার সঙ্গে পাঞ্জা কষবার; ভেবেছিল যে মঞ্জরীর চিকিৎসা করবে সে।

কিন্তু বেঁকে বসল মঞ্জরী স্বয়ং।

ঘটনাটা ঘটল পরদিন সকালেই। মঞ্জরী আবার তার ডিসপেনসারিতে এসেছে। একা নয়, সঙ্গে তার কানাবাবাজী। আর—

[ক্রমশঃ]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' [তিন]

"And Finally There is the Fourth Period in Which I now Live and Hope to Die...."

খ্যাতির গৌরবদীপ্ত আকাশে সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের অবসান এল আসন্ন হয়ে। দেশের মাটির, মানুষের আর পৃথিবীর কবি, জীবনের রূপকার লিও তলস্তয়ের গানের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেক কাল; অশেষ রয়ে গেছে তখনও অন্বেষণের পালা। মৃত্যুভয়ে কাঁপা তারার তিমিরে অপরূপের অনন্ত বার্তা জলে ওঠে কই? আকাশের কালো পাতায় আগুনের অক্ষরে ফুটে ওঠে কই সকল মানুষের হয়ে সকল কালের একজন মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসার নির্ভুল জবাব? দুঃখ, বঞ্চনা, মৃত্যু, বিচ্ছেদবেদনায় বিক্ষুব্ধ বসুন্ধরার বুক বিদীর্ণ হয়ে উঠে আসে কই উত্তরণের পথে মহৎ জিজ্ঞাসার মহত্তর উত্তর? জীবন-সমুদ্র মন্থন করে বসুধার জন্যে সুধার পাত্র হাতে দেখা দেয় কই হিরণ্ময় সত্য? পথের শেষ কি ওই দূরে যেখানে দিনশেষের রাঙা মুকুল সন্ধ্যার চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে হারিয়ে যাবে রাত্রির কালোয়? অফুরান তারার আলোয় তবে কি জ্বলবে না আবার অনির্বাণ জীবনের জ্যোতির্লেখা? যুদ্ধ না শান্তি, মৃত্যু না অমৃত, শেষ না অশেষ, রূপ না অপরূপ, অন্ধকার না আলো—কী আছে পথের শেষে?

তলস্তয়ের দীর্ঘ জীবনের শেষ ক বছর অশেষ অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোয় অন্ধকার। জীবনপাত্র উচ্ছলিত হয়ে মাধবী হয় নি উৎসারিত। একদিকে স্ত্রী এবং একাধিক সন্তানের সম্পত্তি দাবি, অন্যদিকে শিষ্য এবং কনিষ্ঠ আত্মজার তা দিতে অস্বীকার, আদর্শ এবং পারিবারিক স্বার্থের সংঘাতের আবর্তে নিমজ্জিত তলস্তয়ের সেদিন, 'বেদনায় ভরে গিয়েছে, পেয়ালা।'

শতছিন্ন জীর্ণবাস জীবনের ত্যাগ করে সময় হয়েছে নববস্ত্র পরিধানের। কিন্তু ভুলভ্রান্তি চুকিয়ে ফেলে জীবনের, মৃত্যুতে শান্তি পাবার মুহূর্ত তখনও আসতে দশ বছরেরও একটু বেশী। তলস্তয়ের বয়স তখন সত্তর।

একদিকে স্ত্রী এবং এক কন্যা বাদ সব সন্তান; অন্যদিকে এক সন্তান এবং শিষ্য Chertkov।

Tanaev-এর সঙ্গে তলস্তয়-জায়া সোফিয়ার মন-বিনিময়ের আগুন নিয়ে খেলা অবশ্য ভাল করে জ্বলে ওঠবার আগেই নিভে গেল অচিরেই। ফুলের পালা ফুরোবার আগেই ডালা হবার আগেই উজাড়, উড়ে গেল অলি অন্য ফুলের মধুলোভে।

"She realised at last that he was avoiding her, and finally he put a public affront on her that deeply mortified her. Shortly afterwards she came to the conclusion that Tanaev was 'thick skinned and gross both in body and spirit,' and the undignified affair came to an end."

কিন্তু তলস্তয়ের সঙ্গে সোফিয়ার মানসিক দূরত্বের ব্যবধান তাতে বিন্দুমাত্র কমল না। সে কথা তলস্তয়ের নিজের মুখে দিনলিপির পাতায় স্পষ্ট:

"So, I, who am now entering upon my seventieth year, long with all the strength of my spirit for tranquillity and solitude, and though not perfect accord, still something better than this crying disharmony between my life and my beliefs and conscience."

দূরত্ব কেবল পরিবারের সঙ্গে নয়। ব্যবধান বৃহত্তর হতে থাকে বন্ধুগোষ্ঠী, সমাজ-ব্যবস্থা, শাসকপক্ষের সঙ্গে।

বাধবার কথাই ["He became a stranger in his own house."]। তার কারণ :

"The world hailed Tolstoy as a prophet. But his family regarded him as a fool. His wife began to fear that he was losing his reason. His children yawned and turned away whenever he spoke about the brotherhood of man. To live a life of utter unselfishness seemed to them a sure sigh of insanity. It was all very well for him to sacrifice himself, they said, but what right had he to sacrifice his family to his peculiar ideas? He became a stranger in his own house." [Living Biographies]

অভিশপ্ত গৃহে বন্দী এক বিদ্রোহীর দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘলিপির এক পাতায় মর্মন্তুদ :

"Perhaps you will not believe me, but you cannot imagine how isolated I am, nor in what degree my veritable I is despised and disregarded by all those about me."

প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে তলস্তয়ের বিদ্রোহ প্রত্যাশিত পুরস্কার বহন করে আনল ১৯০১ সনে; তিনি Orthodox Church থেকে হলেন চিরনির্বাসিত। রাশ্যার রাজশক্তি তলস্তয়ের নির্ভয় প্রতিবাদে এবং দরিদ্রদের জন্যে প্রীতিবাদে বিচলিত রুদ্রমূর্তি হল। তলস্তয় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে সবহারাদের মাঝে নামলেন। যে মাটির কবির জন্য ধরিত্রী কান পেতে ছিল কতকাল, সেই অন্নহারা, বস্ত্রহারা, সম্মানহারা, সর্বহারা মানুষেরা তলস্তয়ের লেখায় পেল উজ্জীবনের, উদ্দীপনের মন্ত্র। কিন্তু তলস্তয় কেবল লেখার জীবনে নয়, জীবনের লেখাতেও রূপ দিতে নেমে এলেন 'ওদের বেড়ার ধারে নয়,'—ওদের নিঃস্ব জীবনের নির্মম ভয়াবহ অসীম শূন্যতায় সীমাহীন সমবেদনার সঞ্জীবনী হাতে।

যুগান্তের রক্তসন্ধ্যায় প্রতিকারহীন রাজশক্তির অপরাধে বিচারের বাণীর নীরবে নিভৃতে কাঁদার পালা শেষ হয়ে আসছে যখন, যুগান্তরের দৃপ্ত, দুঃসাহসী, দুর্জয় পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তখন তলস্তয়ের লেখায়। তলস্তয়ের জীবনের লেখায় তখন জ্বলে উঠেছে রাজকীয় অরাজকতা, অন্যায় অপব্যয়, বিলাসবাহুল্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-শিখা। নিজের আভিজাত্য, অর্থহীন বংশমর্যাদা, সম্পত্তি, লেখার পারিশ্রমিক, খ্যাতি, কীর্তি বিসর্জন দিলেন না শুধু; যারা বঞ্চিত, যারা হতভাগ্য, 'যারা দিলে সব পেলে না কিছুই,' তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন; নীচু তলায় মানুষের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন তলস্তয়; বললেন : ক্ষমা করো!

মানহারা মানবীর কবি যুগান্তের শিল্পী তলস্তয়ের জীবন হিংস্র প্রলাপের মধ্যে এই সভ্যতার শেষ অশেষ পুণ্যবাণী।

ধর্মসংঘ বিতাড়িত করল যাঁকে, সংসার বিমুখ হল তাঁর প্রতি; রাষ্ট্র তাঁকেই শত্রু গণ্য করল। তলস্তয় হয়ে দাঁড়ালেন এক কথায় : "a communist, a dissenter and a rebel—in short, a true disciple of Christ." সাধারণ লোকও তাঁর কর্মে ও কথায়, এতদূর আত্মীয়তায় বিস্মিত বিমূঢ় বোধ করতে লাগল। যিনি একদিন বলেছিলেন রমণী হচ্ছে সবচেয়ে রমণীয় কৌতুক পুরুষের; তার সঙ্গে ক্রীড়ায় পুরুষের পাপ নেই; পৌরুষের পরিচয় আছে মাত্র; তিনিই সত্তরে পদার্পণ করে বললেন : "He who regards a woman—even his own wife—with sensuality, already commits adultery with her."

সমাজ-সংসার থেকে নয় শুধু, নিজের অতীতের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছেন তখন তলস্তয়। এতদূর সরে এসেছেন যে তাঁর জীবনীকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তা একটি করুণ বিয়োগান্ত দৃশ্যের সূচনা করেছে :

"There is something pathetic in the spectacle of an old man who tries to rebuild the world in the image of his own impotent desires."

এবং এই জীবন-ব্যাখ্যাকারের মতে : "It was the tragedy of Tolstoy to outlive his own greatness."

সব মহৎ মানুষের যে ট্রাজেডি তলস্তয়ের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সমাজ-সংসার-শিল্প-পরিবার নিকট-ভবিষ্যতের সমালোচক সবাই ভুল বোঝে মহৎ

মানুষকে। সমস্ত কীর্তির চেয়ে যে মানুষ মহৎ তাকে বিচার করবে কে? সূর্যমুখী ছাড়া কে বুঝেছে আর সূর্যের নিঃসঙ্গ যাত্রাকে নিঃসীম সুদূরের নিরুপম নীলে!

তলস্তয় ছাড়া কে পেয়েছে এত? কে দিয়েছে তার চেয়ে বেশী?

পরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণ তলস্তয়ের স্বার্থশূন্যতা; তলস্তয়ের শিষ্যের সঙ্গে গুরুর সংঘর্ষ আবার তলস্তয়ের পূর্ণ স্বার্থশূন্যতায় অভিষিক্ত হতে না পারার অভিযোগে। এই পরস্পরবিরোধী আক্রমণে পর্যুদস্ত তলস্তয়ের চরম বিক্ষোভ ফেটে পড়ল যে কারণে যা উপলক্ষ্য করে তা হচ্ছে দিনলিপির খাতা। তলস্তয়ের শেষ দশ বছরের দিনলিপির খাতা তলস্তয় দিয়ে দিয়েছিলেন Chertkov-এর দখলে। সোনিয়া বা সোফিয়া তলস্তয় সেই খাতা দাবি করলেন। দাবি করবার কারণ দুটি; এক, তলস্তয়ের দিনলিপি প্রকাশ করলে তার ব্যবসায়ীক মূল্য অপরিসীম; দুই, এই দিনলিপির পাতায় স্ত্রীর সঙ্গে তলস্তয়ের মনোমালিন্যের দুঃসংবাদ এমন খোলাখুলি, এমন নির্মম অন্তরঙ্গতার সঙ্গে উলঙ্গ উদ্ঘাটিত যা সোফিয়ার পক্ষে দিনলিপির অঙ্গচ্যুত না করে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। [Great Novelists and Their Novels]

সোনিয়া তলস্তয় পত্রাঘাত করলেন দিনলিপি দাবি করে Chertkov-এর কাছে; তাতে ফলোদয় না হতে বিষপানের ভয় দেখালেন, সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার সর্বনাশা প্রতিজ্ঞার কথা শোনালেন। অতিনাটকীয় দৃশ্য সংঘটিত হবার ভয়ে তলস্তয় সেগুলি Chertkov-এর কাছ থেকে নিয়ে সোনিয়াকে দিলেন না, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখলেন। Chertkov দিনলিপির খাতা ফেরত দিলেন; সঙ্গে পাঠালেন প্রতিবাদ-লিপি। এই চিঠির উত্তর প্রায় অশীতিপর ঋষিতুল্য সেই জীবনশিল্পী দিনলিপির পাতায় তাঁর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন এই ভাষায়:

"I have received a letter from Chertkov full of reproaches and accusations. They tear me to pieces. Sometimes the idea occurs to me to go far away from them all."

নিঃসঙ্গ তলস্তয়ের কাছে সমাজ সংসার তখন মিছে সব; মিছে এ জীবনের কলরব।

শুধু Chertkov নয়, প্রত্যেকদিন তলস্তয় পেতে লাগলেন ক্রোধরক্তিম প্রতিবাদের রাঙা পত্র। স্ত্রীর ভয়ে কেন তিনি এখনও সম্পত্তি সর্বসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে ফকিরের মত বেরুতে পারছেন না পথে পথে, এই অভিযোগের উত্তরে তলস্তয় লিখছেন: "Your letter has profoundly moved me. What you advice me has been my sacred dream, but up to this time I have been unable to do it. There are many reasons…but the chief reason is that my doing this must not affect others."

সমারসেট মম কিন্তু এই কারণকে স্বীকার করতে পারেন নি:

"…in this case I think the real reason why Tolstoy did not act as both his conscience urged him to was simply that he didn't want to quite enough to do it. There is a point in writer's psychology that I have never seen mentioned, though it must be obvious to anyone who has studied the lives of authors. Every creative writer's work is, to some extent atleast, a sublimation of instincts, desires, daydreams, call them what you like, which for one cause or another he has repressed, and by giving them literary expression he is freed of the compulsion to give them the further release of action. But it is not a complete satisfaction. He is left with a feeling of inadequacy. That is the ground of the man of letter's glorification of the man of action and the unwilling, envious admiration with which he regards him. It may well be that Tolstoy engaged in manual labor in substitution for his rejected impulses. It is possible that he would have found in himself the strength to do what he sincerely thought right if he had not by writing his books taken the edge off his determination." [The World's Ten Greatest Novels]

মম্ তলস্তয়কে বুঝতে পারেন নি; বুঝতে না পারবারই কথা। বুদ্ধি দিয়ে বোধিকে ধরা যায় না।

মহৎ মানুষের ট্র্যাজেডিও মহৎ ট্র্যাজেডি। এবং এই ট্র্যাজেডির বীজ তাঁদের কাব্যজীবনে উৎসারিত হয় জীবনকাব্য থেকেই। এ বীজ মহৎ মানুষের চরিত্রেই নিহিত। যুধিষ্ঠির কেন যুদ্ধ মিথ্যা জেনেও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে লিপ্ত হন, রাম কেন সীতাকে নিরপরাধ জেনেও অগ্নি-পরীক্ষায় আহ্বান করেন—এর উত্তর যে দেবে, দিতে পারবে, সেই বলতে পারবে কেন তলস্তয় নিজে নিঃস্ব হয়েও, স্ত্রীর এবং সন্তানের নিঃস্ব না হতে পারার ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হন কেবলই। ব্রত উদ্‌যাপন কেন ব্যর্থ হয়, রাত্রির তপস্যা কেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে লোভ-জটিল লালসা থেকে ব্যর্থ হয় মুক্তি দিতে, তার উত্তর বুদ্ধি দিয়ে বিচার্য নয়। অভিজ্ঞতা নয়, উপলব্ধি; স্থূল নয়, সূক্ষ্ম; যুক্তিতে বোঝবার বিষয় এ নয়; হৃদয়ে বাজবার করুণ বিপ্রলম্ভ ধ্বনি এই মহৎ ট্র্যাজেডির।

কুবেরের ধন আগলায় যে যক্ষ তার মত নিঃস্ব যেমন কেউ নয়, তেমনই সহস্র বান্ধব আর অসংখ্য অনুরাগী, ভক্ত, শিষ্যের মধ্যে বাস করে মহৎ মানুষের মত নিঃসঙ্গ আর কে? বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, সক্রেতিস, তলস্তয় এঁদের বাণী আজও পর্যন্ত মানুষের মহত্তম সঙ্গী; কিন্তু জীবনে এঁরা নির্মম নিঃসঙ্গ। এবং তাই এঁদের জীবনকাব্য এবং কাব্যজীবন কখনই কেবল বোঝবার নয়, অন্তরের অন্তঃপুরে বাজবার—যেখানে ক্ষণকালের বীণায় চিরকালের বাণী ললিতে বিভাসে আলাপ করছে বিরহের বীণাপানি।

ব্যর্থতা দিয়ে নয় মহত্ত্বের বিচার; সাফল্য নয় তার একমাত্র মাপকাঠি। সাফল্য-অসাফল্যের অনেক উর্ধ্বে যাঁদের অবস্থান, জয়পরাজয়ের প্রশ্ন যেখানে নিরর্থক, বিত্তের চেয়ে ধনী, কীর্তির চেয়ে মহৎ তাঁরা কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে ধরায় আসেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে, পাওয়া যাবে না কেবল জবাব। প্রশ্নের উত্তরে মানব-ইতিহাসের দিগন্ত মেঘমুক্ত হলে, নিরুপম নিঃসীমে প্রতি যুগের এই প্রশ্নের জবাবে চিরযুগের উত্তরে আঁকা হবে শুধু একটি নীলাঞ্জনরেখা!

ধরার আকাশে এই রেখা দেখা দেয় বারবার, কিন্তু ধরা দেয় না একবারও!

অক্টোবর আটাশ; ১৯১০। সোনিয়া তলস্তয় সেদিনও দেরি করে উঠেছে ঘুম থেকে। স্বামীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে অজানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হল হৃদয় আবার। মেয়ে আলেকজান্ড্রাকে জিজ্ঞেস করে সোনিয়া:

"Where is papa?"

"He has gone away."

... ...

"Has he gone away for good."

"Probably for good."

আলেকজান্ড্রা বলতে পারে না তলস্তয় কোথায়; শুধু বলে: "He told me nothing, only gave me a letter for you."

সেই চিঠিতে তলস্তয়ের ক্ষতবিক্ষত হৃদয় রক্তাক্ত অবারিত:

"My departure will grieve you. I am sorry for that, but please understand and believe that I could not act otherwise. My position in the house is becoming and has become unbearable. Apart from anything else, I can no longer live in these conditions of luxury in which I have been living, and I am doing what old men of my age commonly do: leaving this worldly life in order to live out my last days in peace and solitude." [Leo Tolstoy: Volume II: Ernest J. Simmons]

'ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে একূল হইতে নবজীবনের কূলে' তলস্তয় তাঁর শেষ যাত্রা সারা করতে, লক্ষ লক্ষ তারায় তারায় লেখা সেই ধ্রুব আহ্বানে সাড়া দিতে চলেছেন তখন একা। সোনার তরী এসে পৌঁছেছে নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষে; নদী এসে পৌঁছেছে সিন্ধুর মুখে; জীবনপাত্র নিবেদিত হবার মুহূর্ত হয়েছে সন্নিকট জীবনদেবতার সম্মুখে ["At last he was on the road! The great adventure had begun."]।

তাঁর জীবনীকার জানাচ্ছেন এই শেষযাত্রার পরিবেশ তলস্তয়ের সারা জীবনের স্বপ্নের সঙ্গে মেলে নি:

"But the setting was not the one he had so often imagined—of the Brahmin, bent with years, trudging his solitary way along a dusty path to some lonely wilderness refuge. Tolstoy sat gloomily in a smoky,

crowded, noisy, third-class railway coach. He seemed more like some aged modern Don Quixote with Dushan, his faithful Sancho Panza, off on a hopeless Quest of spiritual knight-errantry."

এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অসুস্থ তলস্তয়কে নিয়ে শম্বুকগতি ট্রেন এসে পৌছল প্রায় সন্ধ্যা হব-হব হলে Kozyolsk স্টেশনে। সেখান থেকে তলস্তয় গেলেন Optina Monastery তে। আশ্রয়ভিক্ষা করলেন তলস্তয় রাতের মত মঠাধ্যক্ষের কাছে:

"My being here may perhaps be disagreeable to you. I'm Leo Tolstoy, excommunicated by the Church, and I've come to talk with your elders and to-morrow will go to my sister at Shamardino."

আশ্রয় মিলল গির্জা থেকে বিতাড়িত তলস্তয়ের। ঘণ্টা বাজছে তখন; ঢং ঢং করে সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে মঠে। না, মঠে নয়, জীবন-দেহলীতে ঘণ্টা বাজছে—শেষ প্রহরের ঘণ্টা।

মৃত্যুর কালোয় জলে উঠেছে জীবনদেবতার আরতির আলো; শেষ প্রহরের ঘণ্টায় শ্রুত হচ্ছে সেই আরতির আহ্বান। তখনও তলস্তয়ের একটি আশঙ্কা দূর হয় নি। সে ভয় হচ্ছে, সোনিয়ার সঙ্গে আবার সাক্ষাতের ভয়। সেই আশঙ্কার আতঙ্কের অনিবার্যতার পথ রুদ্ধ করতে তলস্তয় তাঁর পুত্রদের কাছে তারবার্তায় জানালেন যে, সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ: "because my heart is so weak that a meeting would be fatal,..." কিন্তু সোনিয়া তলস্তয় ততক্ষণে এসে পৌছেছেন Astapovo-তে এই খবর পেয়ে যে লিও তলস্তয় সেখানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সোনিয়ার আসাও চাপা রাখা যেত অনায়াসে কিন্তু তলস্তয়ের মাথার ছোট্ট বালিশটা সঙ্গে আনাতেই এবং তা তলস্তয়ের কাছে নিয়ে যাওয়াতেই তলস্তয়ের জেরার উত্তরে বেরিয়ে পড়ল যে Taniya তলস্তয়ের প্রিয় কন্যা সেখানে উপস্থিত আছে। Taniyaকে সোনিয়ার কথা যত জিজ্ঞেস করেন তলস্তয়, উত্তর এড়াবার জন্যে Taniya তত বলে, "perhaps you had better not talk, papa. You get excited..."

সে রাতে—সেই ৩রা নভেম্বরের রাতে দিনলিপির পাতায় তলস্তয় লিখলেন: "Do what's right, come what may!"

পরের দিন সকালে আর তলস্তয়ের সংবাদ গোপন রাখা সম্ভব হল না ["By Thursday the attention of the world press centered on little Astapovo."]।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত তলস্তয়ের মুখে তাঁর কন্যা যা শোনেন, ডাক্তারের মতে যা প্রলাপোক্তি মাত্র, তা হচ্ছে তলস্তয়ের জীবন-বাণী: "To seek, always to seek." শনিবার, মৃত্যুর কালো ঘিরে ধরবার পূর্ব মুহূর্তে জীবনের শিখা আবার আর একবার শেষবারের মত অশেষ দীপ্তিতে জলে ওঠে; শয্যার ওপর সোজা উঠে বসে অকম্পিত কণ্ঠে বলেন: "But I advise you to remember one thing: there are a multitude of people in the world, but you regard only one, Leo."

চিকিৎসকদের কাছে সম্ভবত এও ছিল প্রলাপোক্তি। মৃত্যু যার শিয়রে দাঁড়িয়ে সে যখন অন্য লোকের সেবার কথা চিন্তা করে, যাদের কেউ নেই তাদের কথা ভাবে, ভাবতে বলে, তার কথা ভাবতে বারণ করে ডাক্তারদের, তার উক্তিকে ডাক্তারেরা প্রলাপোক্তি জ্ঞান করবে যে তা এমন বিচিত্র কি? অভিজ্ঞতায় যার নজির নেই তেমন অভিজ্ঞতা সংসারের লোকের কাছে বাতুলের কাজ, মৃত্যুশয্যায় মাথা খারাপ হবার অভ্রান্ত প্রমাণ ছাড়া আর কিসের পরিচয়ে প্রদীপ্ত?

শনিবার রাত ফুটোয় অর্থাৎ রবিবার সকালে সোনিয়া ঢুকতে পেল স্বামীর ঘরে। স্বামীর কপাল চুম্বন করে হাঁটু গেড়ে বসে সোনিয়া শুধু বলল: ক্ষমা করো!

রবিবার,—ছুটির দিন সকলের; সকলের কাছ থেকে ছুটি নিলেন লিও তলস্তয়।

যুদ্ধ ও শান্তি, জীবন ও মৃত্যু যেখানে একাকার হয়ে অপেক্ষা করছে, সেখানে দীর্ঘ জীবনের শেষে, পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন তলস্তয়; একা—নিঃস্ব; নিঃসঙ্গ।

[ক্রমশঃ]

নীড়ভ্রষ্ট

(২২৪ পৃষ্ঠার পর)

খিলখিল করে হেসে উঠলেন মালবিকা।

গোকুলবাবুও হাসলেন।

হাঁপাচ্ছেন মালবিকা। অনেক দূর থেকে গোকুলবাবুকে দেখে ছুটে এসেছেন।

বিভাকে বুঝি আনতে পারলেন না কিছুতেই। আর যত দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বসল। এই নিন আপনার চিঠি আর বাড়ির চাবি।

গোকুলবাবু অবাক হলেন।

ভাগ্যে আপনাকে দেখতে পেলাম, না হলে আপনার ঠিকানা খুঁজে বাড়ি যেতে হত।

আপনার সঙ্গে বিভা এল না, অথচ কাল আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে এল—নামল আসানসোলে।

গোকুলবাবুর হাসিটুকু এবার মিলিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললেন, বিভার দিদির বাড়ি।

তা তো বললে, দিদির বাড়ি যাচ্ছি।—মালবিকা থামিয়ে দিলেন গোকুলবাবুকে।

কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আসতে পারত। এটা কিন্তু বিভার ভারী অন্যায়। আপনি অসুস্থ মানুষ, আপনাকে একা ছেড়ে দিয়ে বিভার ওখানে বেড়াতে যাওয়া উচিত হয় নি।

সম্পূর্ণ অযাচিত সহানুভূতি। গোকুলবাবু ফ্যাকাশে মুখে সৌজন্যের হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলেন। কিছু দূরে সুধীর দাঁড়িয়েছিল—ওর দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়লেন।

কি লিখেছে চিঠিতে ?—মালবিকার সকৌতুক প্রশ্ন।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে লিখেছে—চাবি পাঠিয়ে দিলাম।

গোকুলবাবু আমতা আমতা করলেন।

কেন, বাড়ি পাহারা দিতে হবে বুঝি! বেশ আছে বিভা—

আদর্শ স্বামী পেয়েছে!—হাসিতে উপচে উঠলেন মালবিকা।

হাসি থামিয়ে বললেন, বিভাকে বলছিলাম, গোকুল-বাবুকে যে ছেড়ে দিলি, এখন কেই বা তোর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চা তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর কেই বা তোকে দুবেলা রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবে।

আবার সেই খিলখিল হাসির কলতরঙ্গ ভেঙে পড়ল।

এর পর সুধীর গোকুলবাবুর মুখের দিকে আর তাকাতে পারে নি। শুধু একবার মাত্র তাকিয়েছিল। গোকুলবাবুর ছোট ছোট চোখ দুটো আরও ছোট লাগছিল। মুখটা ফ্যাকাশে শুধু নয়—প্রায় রক্তশূন্য।

তারপর দুদিন গোকুলবাবু আর পথে বার হন নি, প্রাতঃভ্রমণেও নয়। হয়তো মূর্তিমান শনির মতই মালবিকা মিত্র এসে পথে দাঁড়াবেন। অকারণ, অহেতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে গোকুলবাবুকে বিদ্ধ করবেন।

কিন্তু তার আর প্রয়োজনও ছিল না। গোকুলবাবু এইটুকুতেই—শুধু এইটুকুতেই সব সংযমের বাঁধ ভেঙে দিলেন। এতদিনের পরম রমণীয় ছবিটায় হঠাৎ কালি মাখাতে শুরু করলেন।

প্রান্তশায়ী সুবর্ণরেখার তীরে তখনও বৈকালী আলো ছিল। সুবর্ণরেখার অগভীর জল ভেঙে ভেঙে মানুষ গরু মোষ পারাপার করছে। ওপারের শাল-মহুয়ার পেছনে তখনও অস্তরাগের রক্তিম বর্ণচ্ছটা।

সুধীরবাবু, আর একটু পরেই এই সুন্দর ছবিটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে তো!

গোকুলবাবুর স্বরে চমকে উঠল সুধীর। বিভা-বউদির চিঠি পাবার পর থেকে দুদিন পরে এই প্রথম কথা বললেন গোকুলবাবু। এ দুদিন প্রায় ঘরে বসেই কাটিয়েছেন গোকুলবাবু। সুধীর কথা বলতে গিয়ে শুধু নিষ্প্রাণ উত্তরটুকু ছাড়া আর কিছুই পায় নি। আজ হঠাৎ গোকুলবাবুই টেনে আনলেন সুধীরকে সুবর্ণরেখার তীরে। বেশ একটা কঠিন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে গোকুলবাবুর মধ্যে। একটা অভিমানী অথচ দৃঢ়, নির্মম মন মুখের ওপর কঠিন প্রত্যয়ের ছায়া ফেলেছে।

এ যেন আর এক গোকুলবাবু। হঠাৎ কাব্যে-পাওয়া কবির মত কথা শুরু করলেন। অবশ্য এ রকম সুন্দর নিসর্গাশ্রিত হলে অনেকের মনেই আবেগের সঞ্চার হতে পারে। পশ্চিমের রঙ-ঝরা আকাশ, রূপোর পাতের মত দিগন্তনীল নদী; বনস্থলীর গাঢ় শ্যাম ছায়া মানুষকে ক্ষণকালের জন্যেও সম্মোহিত করে।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন গোকুলবাবু: বেশ আছেন মশায় আপনারা, বিয়ে-থা করেন নি—

গোকুলবাবুর কাছ থেকে এ রকম একটা প্রসঙ্গ অভাবনীয়। সুধীর একবার দেখে নিল গোকুলবাবুকে। একটু আগের কাঠিন্য এবার গলতে শুরু করেছে। চোখ দুটো চকচক করছে। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটছে।

আমিও ছিলাম বেশ। চাঁদের আলো দেখব না বলে মুখ ফিরিয়েই তো ছিলাম।

একটা ঘাস ছিঁড়ে নিলেন। ঘাসটাকে দাঁতের ফাঁকে নির্মমভাবে দু টুকরো করে কাটলেন।

দিব্যি ছিলাম মশায়, আপনাদের মত হৈ হৈ করে কাটিয়েছি। শেষটায় ওই চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকল।

পায়ের কাছে একটা মশাকে সশব্দে মারলেন গোকুলবাবু: চাঁদের আলো তো নয়, যেন ব্লাস্ট ফার্নেসের পাশে ঘর করছি।

সুধীর সঙ্কুচিত হচ্ছিল। গোকুলবাবুর দাম্পত্য-জীবনের খুঁটিনাটি খবর শোনার আগ্রহ ওর নেই। তার চেয়ে গোকুলবাবুর নানা জায়গা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ওর কাছে অনেক বেশী উপাদেয়। তা ছাড়া গোকুলবাবু ক্রমশঃ যেন বেশী প্রগল্‌ভ হয়ে পড়ছেন, কথাগুলোও জড়িয়ে আসছে।

বিভাকে আমি কথা দিয়েছি আমার শরীর ফেরাবই।

আমার চেহারা দেখে ওর ওই নাক উঁচু করা আমি মোটেই সহ্য করব না।

বেশ জড়ানো গলায় বললেন গোকুলবাবু। বিস্ময়ের আকস্মিক ধাক্কায় সুধীর কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে গেল। গোকুলবাবুর চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে। একটা গন্ধ আসছে মুখ থেকে।

বিভা বলে, ও আমায় বিয়ে করেছে, আমি ওকে করি নি।—গোকুলবাবুর শীর্ণ শরীরটা থেকে একটা অট্টহাসি বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু কে করতে বলেছিল ওকে বিয়ে। চাকরে মেয়ে, আর কাউকে দেখেশুনে করলেই পারত। বেশ তো বাবা নিরিবিলি ছিলাম।

পকেট থেকে একটা হুইস্কির ছোট বোতল বার করলেন। ছিপি খুলে মুখে আরও একটু ঢাললেন।

সুধীর প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। গোকুলবাবুকে এখন কোন ট্র্যাজিক নাটকের নায়ক বলে মনে হচ্ছে। কোন এক রাজ্যহারা নির্বাসিত সম্রাট। নরকের অন্ধকার দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আসল কথাটা কি জানেন?—গোকুলবাবু কণ্ঠস্বর নামালেন: বিভা শুধু সামাজিকতার দায় বাঁচাতে আমায় বিয়ে করেছে। একটা লাইসেন্স, বুঝলেন কিনা—

গোকুলবাবু সভ্যতা বজায় রাখছেন না। জামা কাপড় আর ফাঁকা হাসির আবরণে এতদিন যে গোপনীয়তাটুকু রক্ষিত হচ্ছিল, পানীয়ের উত্তেজনা তাকে উচ্ছ্বসিত করে তুলছে।

বিভাই আমায় মদ খাওয়া ধরিয়েছে। বাড়ি ফিরে শান্তি না পেলে— আমায় বিয়ে করে উনি এখন অনুতপ্ত। কিন্তু একদিন এ শর্মা না থাকলে ও কূল পেত না।

উঠতে-বসতে আমার শরীরের কথা তোলে। রাস্তা দিয়ে যখন চলে আমায় বলে পেছনে এসো। ওই তালপাতার শরীর নিয়ে আর পাশে-পাশে হেঁটো না। কি স্পর্ধা দেখেছেন। আমায় বিয়ে না করে একটা গামা-গোবর দেখে বিয়ে করলেই হত।

সুধীর একটা সকরুণ দাম্পত্য-জীবনের আলেখ্য শুনতে চাইছিল না। এমন অনেক কাহিনী অনেক জায়গায় জমা হয়ে আছে। জীবনের অসংখ্য বিড়ম্বনা, অগণ্য বঞ্চনা অনেক মানুষের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে। কি লাভ তার ইতিবৃত্ত জেনে।

অসীম বিরক্তিতে গোকুলবাবুর মুখটা এখন কুইনাইন খাওয়ার মত দেখাচ্ছে।

পায়ে কোনদিন কাঁটা ফুটেছে সুধীরবাবু? দেখেছেন, যতক্ষণ না তুলে ফেলা যায়—

একটু পরে প্রায় ভেঙে পড়লেন গোকুলবাবু: তবুও আত্মসমর্পণ করেছিলাম, অনেক স্বামীই যা করে থাকে।

গোকুলবাবু অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। সুবর্ণরেখার মৃত অবয়বটা চারপাশের অন্ধকারে আবছাভাবে চোখে পড়ে। চারিদিকের পরিকীর্ণ পাথরের স্তূপে, নদীর নিথর বুকে, গাছপালার মৌন অন্ধকারে পৃথিবীর আদিম নৈঃশব্দ। অন্ধকারে গোকুলবাবুকে একটা কঙ্কালের মত দেখাচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রান্তরে, নিরালোক বিধ্বস্ত পৃথিবীতে হাঁটছেন গোকুলবাবু। হাঁটছেন একটা কঙ্কালের মত। বিভা-বউদি স্থূল মেদ-মাংস চেয়েছিলেন। শুধু হাড়ের শুষ্ক নীরস কাঠিন্য তাঁর মনে আসক্তি আনতে পারে নি। হয়তো গোকুলবাবুর একটা মন আছে। সে মনেও আলোছায়া আবর্তিত হয়, সেখানে গান আছে, কামনা আছে, নদীর মত একটা ম্রিয়মাণ হৃদয় আছে। বিভা-বউদি দেহটার ওপরের নীরস কাঠিন্য দেখেই চোখ ফিরিয়েছেন।

কিন্তু গোকুলবাবুকে কোন সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হল না সুধীরের। জীবনের বঞ্চনাকে মহত্ত্বের রাংতা পরিয়ে কোন মায়া সৃষ্টির চেষ্টা করাটা ভুল বোঝানো।

চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন গোকুলবাবু: আপনি ওথেলো পড়েছেন সুধীরবাবু। বিভাকে যদি আমি খুন করতে পারতাম—

ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছে গোকুলবাবুকে। দ্বৈপায়ন-তীরে ভগ্নজানু দুর্যোধন নন, কঠিন রণে মরণ-পণ অর্জুনের মতই।

অস্থির হয়ে বিক্ষিপ্ত পাথর আর টিলার ওপর দ্রুত চলবার চেষ্টা করছেন। হয়তো প্রেমিকের শক্তিমানের সিংহাসনের দিকে। যুগ-যুগের আকাঙ্ক্ষিতকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। মাতাল-অস্থির পায়ে কিন্তু সে শক্তির পরিচয় নেই। তা তাঁকে টেনে নামাল। শিলাস্তূপ থেকে অন্ধকারে ছিটকে পড়লেন গোকুলবাবু।

সুধীরবাবু।—ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন গোকুলবাবু।

বিষণ্ণ সন্ধ্যায় একটা করুণ আর্তির মতই শোনাল গোকুলবাবুর কণ্ঠস্বর, বাঁচবার জন্যে আর্তি। গোকুলবাবু পড়ে গেছেন, পথ থেকে বিপথে পড়ে গেছেন।

সুধীর দু হাত দিয়ে তাঁকে টেনে তুলল। গোকুলবাবু অশক্ত কম্পিত হাতে জড়িয়ে ধরলেন সুধীরকে। বিস্রস্ত বেশবাস, অল্পবল্প আঘাতে ভীতিবিহ্বল। পড়ে গিয়ে নেশার মোহবন্ধন প্রায় কেটে গেছে গোকুলবাবুর। সুধীরের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিন সকালে আবার সেই পুরনো গোকুলবাবু। সেই অধ্যবসায়ী গোকুলবাবু। সিসিফাসের মতই নেমে-আসা পাথরটাকে আবার পাহাড়ের ওপর তুলতে চাইছেন।

মাথায় উলের টুপি, গলায় কম্ফর্টার, পায়ে মোজা। ভোর পাঁচটায় প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছেন।

কেবল একটা কথা, না, কেমন দেখছেন নয়। গোকুলবাবু বলেছিলেন, বিভাকে, মানে আপনার বউদিকে যেন জানাবেন না কালকের কথা।

●

৭ম ফর্মায় পৃষ্ঠা-সংখ্যার মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটিয়াছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৮৯ হইতে ২৯৬-এর স্থলে ২৪১ হইতে ২৪৮ ধরিতে হইবে

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

৪

বরেনের চোখের সামনে যে প্রভাত আকাশে নিঃশব্দ বিস্ফোরণে প্রকাশ হল সেই প্রভাত শীলভদ্রের গ্রামের নদীতীরে সারারাত্রির শিশির চুঁইয়ে হিম হয়ে নামল।

গ্রামের ঘাটে এসে শীলভদ্রের নৌকো থামল। ঘাট নয় তো শুধু একফালি বালুচর। খাড়া পাড় বেয়ে এক খেই সরু পায়ে চলার পথ বালির ওপর দিয়ে এসে যেখানে জলে চুমুক দিয়েছে সেখানটা ঘাট বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

তখনও চারদিকের কুয়াশা কাটে নি। তবে কুয়াশার পর্দাটা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। তবু গাছের মাথায়, জলের ওপর, নদীর পাড়ে সবুজ ফসলের ডগায় ডগায় এখনও টুক্‌রো টুক্‌রো লেগে রয়েছে।

শীলভদ্র সারারাত্রি ধরে এই প্রভাতটির অপেক্ষায় ছিলেন। সুস্মিতা কিন্তু ঘুমিয়েছে। ঘুম ভেঙে দেখল, সামনে একটা অভূতপূর্ব প্রভাত। সুস্মিতা নৌকো থেকে লাফিয়ে বালির ওপর নামল। এমন ঠাণ্ডা সে বালি যে তার আঙুলগুলো চমকে কুঁকড়ে গেল। সুস্মিতা দ্রুতপদে বালিটা পার হয়ে পাড়ে উঠে গভীর শ্বাস নিয়ে সামনে চেয়ে দেখল পূবের সারা আকাশটা সিঁদুর হয়ে গেছে আর এই সিঁদুর ঝরে পড়ছে বিস্তীর্ণ মাঠের সবুজ ফসলের পাতায় পাতায়।

শীলভদ্রও খালি পায়ে নামলেন। মাঝি মালপত্র নামিয়ে দিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শীলভদ্র গায়ের চাদরটা ভাল ভাবে জড়িয়ে নিলেন।

সুস্মিতা দেখল কে একজন আলোয়ান গায়ে একটা কাঁসার বা পিতলের ঘড়া হাতে ঝুলিয়ে নদীর দিকে নামছেন। পাত্রটা দুলছে আর সোনালী আলোর সিগনাল দিচ্ছে।

লোকটি কাছে এলে সুস্মিতা দেখল আলোয়ানটা পুরনো, শতচ্ছিন্ন। লোকটির বয়স অনেক, হয়তো পঞ্চাশের ওপর। লোকটি কাছাকাছি এসে তীব্র কৌতূহলে সুস্মিতার দিকে চেয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কোন কথা না বলে ঘাটের দিকে নেমে গেল নদীর পাড় বেয়ে।

সুস্মিতাও খুঁটিয়ে দেখে নিল, অভূতপূর্ব প্রভাতে দেখা এই প্রথম মানুষটিকে। কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। হাড়-বের-করা ভ্রূর নীচে কোটরগত প্রাণহীন দুটো চোখ। চোখের কিনারায় গাঢ় কালিমা।

হাত-পা কঙ্কালসার। হাড়গুলো খুব পুরু আর মজবুত বলেই দেহটা কঙ্কালসার হলেও বীভৎস নয়।

পায়ের গোছ পর্যন্ত জলে নেমে, কাছে শীলভদ্রের দিকে না চেয়ে, লোকটি জলপাত্রটি মাজতে মাজতে আপন মনে বলল, কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি! তা, এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কিসের সুবিধে, কেনই বা কোন্ অসুবিধে কিছুই আর না বলে যেন নিতান্ত আত্মগত ভাবে পাত্রটাকে মেজে চলেছেন।

শীলভদ্র স্থিরভাবে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারে বলে উঠলেন, ঘোষাল না কি! চিনু ঘোষাল?

লোকটা চমকে পাত্রটা বালির ওপর ফেলে ঝাড়া হাত-পা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ, চিনু ঘোষাল। আপনি কে মশাই?

আমি শী··· ভাল করে দেখ তো ঘোষাল, আমাকে চিনতে পার কি না?

শীল··· মানে, শীলভদ্র! তুই?

চিনু ঘোষাল অধীর আনন্দে শীলভদ্রকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কয়েক মুহূর্ত পরে আলিঙ্গন ছেড়ে চোখ

মুছে কয়েকবার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করল: কী ভাগ্য! কী ভাগ্য! কী ভাগ্য! তারপর বলল, চল শীল, বাড়ি চল! মালগুলোর দিকে চেয়ে বলল, এখানে তো কুলী নেই ভাই, আমি কয়েকটা নিই, তোমরা কিছু কিছু নাও।—বলে, নিজে একদিকের কাঁধে একটা বড় বেডিং আর একটা হাতে সুস্মিতার সুটকেশটা তুলে নিল। বলল, তাই তো মা, ঘড়াটা কী করে নিই! দাও, আমার এই আঙুলটায় ওর কাণা লাগিয়ে দাও।—বলে, যে হাতে সুটকেশ ঝুলছিল সেই হাতের একটা হাড়সর্বস্ব আঙুল বাড়িয়ে দিল। অপর হাতটা দিয়ে কাঁধের জিনিসটা আটকে ছিল।

সুস্মিতা বলল, এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, চলুন।

ঘোষাল গাঢ়স্বরে বলল, আমি ঘট ভরতে এসে ঘটের সঙ্গে সঙ্গে দেবীকে ঘরে নিয়ে চলেছি।

শীলভদ্র আর একটা ছোট বেডিং এবং একটা সুটকেশ ঝুলিয়ে নিলেন দু হাতে।

নদীর পাড় ছেড়ে তিনজন যখন সমতল মাঠে এসে পড়লেন তখন পায়ের নীচে মাটির দিকে চোখের ইশারা করে ঘোষাল বলল, দেখেছ, চন্দনপুরের মাটি? ক্ষীরের মত পুরু পলির স্তর দেখেছ? এমন পলি ত্রিভুবনে কোথাও নেই!

শীলভদ্র মাটির দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, অপূর্ব মাটি! এই মাটি আমার শিরায়।

সুস্মিতা ডান হাতে ঘড়াটা ঝুলিয়ে আনছিল। তার ভারে গতি মন্থর হয়ে গেছে। শীলভদ্র ও চিন্ময় ঘোষালের অনেক পিছনে পড়ে গেছে। শীলভদ্র ও ঘোষাল তা লক্ষ্য করলেন না। আলপথে যেতে যেতে ঘোষাল দু ধারের জমির মালিকের নাম, কোন্ সূত্রে কে কোন্ জমি পেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, কোন্ কোন্ টুকরোয় কোন্ কোন্ ফসল উৎকৃষ্ট ফলে তার বিবরণ দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, শীল, তুমি তো বিয়ে কর নি জানতাম? এত বড় মেয়ে? হেঃ হেঃ হেঃ! এই যাঃ, কই সে? দেখ তো কত পিছনে পড়ে গেছে!

শীলভদ্র কোনও উত্তর দিলেন না। চিনু ঘোষাল মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সুস্মিতার অপেক্ষায়। সুস্মিতা কাছে এলে হেসে বলল, মা, জলপাত্র কাঁখে নিতে হয়। অমন করে বইতে পারবে কেন? নাও নাও, কাঁখে নাও।

সুস্মিতা স্মিত হেসে কলসীটা কাঁখে নিল। ঘোষাল তার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে বলল, এবার ঠিক দেবীর মত দেখতে লাগছে। দেবীমূর্তি দেখেছ তো? দেখবে সবাই এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন যেন মনে হয় অদৃশ্য কলসী নিয়ে আছেন কাঁখে। আমার দেখে কি মনে হয় জান, মা? মনে হয় ওঁরা আমাদের অর্থাৎ মানুষের প্রাণরসে পূর্ণ, অদৃশ্য সব কলস কাঁখে নিয়ে চলেছেন। এ ভঙ্গী আমি সব দেবীতে দেখেছি। দেখেছি মন্দিরের গায়ে মূর্তিতে মূর্তিতে।

সুস্মিতা কাঁখে কলসী নিয়ে সলজ্জভাবে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

ঘোষাল শীলভদ্রের দিকে চেয়ে বলল, দেখেছ শীল, মায়ের চলার ভঙ্গিটা পর্যন্ত বদলে গেছে?

ঘোষাল বলতে বলতে চলল, ভারি সুন্দর মেয়ে! বড় সুন্দর মেয়ে! ছোট বউ একবার দেখলে এমন-ধারা প্রচার শুরু করে দেবে যে, পাঁচ দিনের মধ্যে বিশখানা গাঁয়ের লোক জানবে আমাদের গাঁয়ে দেবী এসেছেন। ছোট বউ এককালে নিজেও দেখতে ভাল ছিল কিনা! গত বছরের অসুখের পর থেকে সে সব খুইয়েছে।

সুস্মিতা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, ছোট বউ কে?

ঘোষালের গলায় যেন একটা কাঁটা আটকে গিয়েছিল। গলা ঝেড়ে সেটাকে নামিয়ে বলল, আমার পরিবার,... তোমার কাকীমা।

এর পর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে এল। তিনজনে নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে নিজের নিজের চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেল।

ছোট বউ, অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর কথা মনে পড়তেই চিন্ময় ঘোষালের মনের সমস্ত প্রসন্নতা মাটির মেঝের ওপর জলের দাগের মত মিলিয়ে গেল। মনের ওপর একটা ছায়া নামল—বোধ হয় ঈর্ষায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর জাগল ঘৃণা।

এই ধনীর মালপত্র সে অযাচিত ভাবে কাঁধে তুলে নিল কেন! বাল্যবন্ধুর প্রতি ভালবাসায়, না, এই ধনীর কাছ থেকে ভবিষ্যতে কোন উপকারের প্রত্যাশায়? এই মাল সে কুলি হিসেবে বহন করলে মজুরি পেত। আজ সে বিনা পারিশ্রমিকে এদের মাল বহন করছে নিজের কাঁধে। তিক্তস্বরে তার ভিতরে কে বললে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়! মহাভাগ্যবান এই শীলভদ্র। সে নাকি কোটিপতি। কিন্তু কোটিপতি বলে প্রখ্যাত শীলভদ্র মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসীর বেশে এই প'ড়ো গ্রামে ফিরে এল কেন? সমাজের ঝড়তি-পড়তি যারা তারাই তো গ্রামে মাথা গুঁজে থাকে! তবে কি এই মেয়েটা! কাঁধে বেদনা বোধ করল ঘোষাল। হঠাৎ জ্যাঠতুতো ভাই মাতাল নরেনের কথাগুলো মনে ঝলসে উঠল। ধনীরা যখন গ্রামে আসবে তখন জানবে ওরা একটা মতলব নিয়ে এসেছে! ওরা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে গুপ্তচর হয়ে আসে। ওরা আসে আমাদের শিবির ধ্বংস করতে কিংবা আমাদের ফৌজের মনোবল ধ্বংস করতে। আমরা যে কালে বাস করছি সে কালে প্রত্যেক মুহূর্তে ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছে। কত কায়দার লড়াই তা তুমি ভেবে শেষ করতে পারবে না। ওদের অস্ত্রের কত যে শ্রেণী তার হিসেব তুমি গুনে শেষ করতে পারবে না। স্কুল থেকে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত ওদের অস্ত্রাগার।

চিন্ময় ঘোষালের জ্যাঠতুতো ভাই এই অঞ্চলের কম্যুনিষ্ট নেতা। সব কথায় তার সংগ্রামী উপমার ছড়াছড়ি।

ঘোষাল বাল্যবন্ধু শীলভদ্রের দিকে আড়চোখে চেয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এখানে বাস করতে এসেছ শীলভদ্র?

শীলভদ্র অন্যমনস্ক ভাবে রাত্রিজাগরণ-ক্লান্ত চোখে আতুর দৃষ্টিতে মাটি দেখতে দেখতে চলেছিলেন। ঘোষালের প্রশ্নের উত্তরে গাঢ়স্বরে বললেন, চারণ—চারণ করতে বেরিয়েছি—ভিক্ষা করতে বেরিয়েছি।

ভিক্ষা!—স্তম্ভিত হয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোষাল। কাঁধে মোটটা একটু নেড়ে নিল। কাঁধ টনটন করে উঠেছে।

শীলভদ্র বললেন, ভূমি ভিক্ষা—আমার দেশের মানুষের অর্ধেক আজ এই ভূমি থেকে উৎসন্ন হয়ে গেছে। এই সব ছিন্নমূল মানুষকে আবার মাটিতে বসাতে হবে। তাহলেই তাদের জীবনে আবার ফুল ফুটবে, ফসল ফলবে।

ঘোষাল সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, শুনেছি, এমনি একটা আন্দোলন চলছে দেশে। কিন্তু জমি? জমি লোক দান করবে কেন? ধর, ওই গাঁয়ের চৌধুরীরা।—ঘোষাল চোখের ইশারায় দূর একটা গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, যারা পাঁচ টাকা ধার দিয়ে হ্যাণ্ডনোটে পঞ্চাশ টাকা লিখিয়ে নেয়, তারপর সেই পঞ্চাশ সুদে আসলে একশো পঞ্চাশে দাঁড়াতে ভিটেমাটি কেড়ে নেয়, ওরা—ওই চৌধুরীরা ভূমি দান করবে?

শীলভদ্র বললেন, কেন দেবে না? মানব মানে, যে জীব মনন করে, বিচারধারা বোঝে, আর বিচারধারার ওপর যার জীবন প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি সবাইকে ন্যায়ের বিচার বোঝাতে পারি, তখন দেখবে সবারই হৃদয়ে দানের প্রেরণা জাগবে। মানুষের মধ্যে কত মহত্ত্ব সুপ্ত রয়েছে তার খবর আমরা জানি না! বহু মানুষ নিজেদের আত্মার মধ্যে যে যে শক্তির আরাধনা করবে, সেই সেই শক্তি নিয়ে মহাপুরুষ জন্মাবেন আমাদের মধ্যে। এঁরা অবতার। আমরা নতুন অবতারের পথ চেয়ে রয়েছি। ইনি আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে, সমস্ত সুখকে, সমস্ত শান্তিকে মানুষের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করে দেবেন। গান্ধীজী, বিনোবাজী—এই অবতারের এক একজন অগ্রদূত।

সুস্মিতা চিন্ময় ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে অনুভব করল ঘোষালও বুঝি এই কথাগুলোয় অত্যন্ত বিব্রত হয়েছে। যেমন সে নিজে বিব্রত হয়। কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখল ঘোষাল অন্য কারণে বিব্রত হয়েছে। কোথা থেকে এক ঝাঁক মাছি উড়ে এসে তার মাথার উপর ভন্ ভন্ করতে শুরু করেছে। সুস্মিতা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ দেখল তারা যেমন নিমেষের জন্যে এসেছিল তেমনি নিমেষের মধ্যে উড়ে চলে গেল মাঠের উপর দিয়ে।

ঘোষাল বলল, আমরা তো আর এসে গেছি।

সুস্মিতা দেখল গ্রামের প্রবেশ-পথের বাঁ দিকে একটা মাঝারি আকারের অশ্বত্থ গাছ। বর্ষার জলে জলে

তার গোড়ার মাটি ধুয়ে পাশের খাল দিয়ে বয়ে চলে গেছে। শিকড়গুলো সব বেরিয়ে পড়ে এক রাশ সাপের মত পরস্পরের মধ্যে জড়িয়ে গেছে—যেন একে অন্যের মধ্যে রস সন্ধান করছে। শিকড়গুলো পরস্পরকে শোষণ করে আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে—তাই এই গাছের না আছে লাবণ্য, না আছে সবুজের জৌলুস।

গ্রামের প্রধান পথে এসে পৌঁছল তিন জনে। পথে লোকজন নেই। দু ধারে আচ্ছাদনহীন কিংবা ভগ্ন-আচ্ছাদন মাটির কুটির। বেশীর ভাগ পরিত্যক্ত। কোথাও একটা মাত্র বর্ষায় গলে-যাওয়া দেওয়াল গা-ময় অজস্র বিবর্ণ খোলার কুচি নিয়ে অতীতের কুটিরের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও সব কটা দেওয়াল ধসে পড়েছে পরস্পরের ওপর। এ গ্রামে লোক বাস করে বলে মনে হল না সুস্মিতার। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা পরিত্যক্ত ভিটের বাইরে একটা বাঁকাচোরা ছোট্ট শিউলি গাছের নীচে গুটিকয়েক শিশু ফুল কুড়োচ্ছে। শীতের সকাল, উত্তুরে হাওয়া—যেমন হিম তেমনি খর-বেগ। শিশুগুলির গায়ে নামমাত্র আবরণ। ফুল কুড়োচ্ছে আর থর থর করে কাঁপছে। শিশু কি না—ফুলের মায়ায় শীতের শাসনকে উপেক্ষা করেছে!

এই শিউলি গাছের পাশে প'ড়ো ভিটেটার দিকে শীলভদ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিন্ময় ঘোষাল বলল, চিনতে পারছ তো শীলভদ্র?

সুস্মিতা মুহূর্তে ঘোষালের ইঙ্গিতটা বুঝে ফেলল: ওই বুঝি আপনার ভিটে?—জিজ্ঞাসা করল শীলভদ্রকে।

শীলভদ্র মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সুস্মিতা দেখল তাঁর দু চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠেছে। শীলভদ্র অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন, মা!

চিন্ময় ঘোষাল শীলভদ্র ও সুস্মিতার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটু সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। সুস্মিতার এই প্রশ্নে তাঁর সন্দেহ দৃঢ় হল। কন্যা নিশ্চয়ই নয়। হলে জিজ্ঞাসা করত, ঐ বুঝি আমাদের ভিটে? তার প্রশ্ন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরন থেকে চিন্ময় বুঝে নিল এরা দুজন পরস্পারের পর। ঘটনাচক্রে এক পথের সাথী হয়েছে পরস্পর। মনে অনেক ধরনের সন্দেহ ভিড় করে এল, [illegible] জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিল। ভাবল, ওদের মধ্যে কী সম্পর্ক তা নিয়ে আমারই বা মাথাব্যথা কেন? ভূমিদান ব্রত যখন গ্রহণ করেছে তখন কিছু পেতে পার আমি ওর কাছ থেকেই।

বাইরে ঘোষাল বলল, দুদিন এই গরীবের অতিথি হয়ে থাকতে হবে কিন্তু।

ঘোষালের স্বরে অনুনয় সুস্পষ্ট।

শীলভদ্র গাঢ়স্বরে বললেন, সকলের ভিটেতেই আমার ভিটে আছে চিন্ময়।

সহসা পায়ে হোঁচট লেগেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক কাঁখের কলসী থেকে জল ছলকে পড়ে সুস্মিতার বাঁ দিকের শাড়ি ভিজে গেল। একে হিম হাওয়া, তায় গায়ের ওপর হিমজল। সুস্মিতা শীতে থরথর করে কেঁপে উঠল।

চিন্ময় ঘোষাল তাই দেখে বলে উঠল, আহা মা, আজ বড় কষ্ট পেলে। আর একটু গেলেই আমার বাড়ি। গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবে।

মনে মনে হয়তো খুশী হল। কেন না, পরমুহূর্তেই নিজের বাড়ির বর্ণনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ির উঠনে বাতাবী ফুলের গন্ধ, চালার উপর লাউয়ের অজস্রতা, দক্ষিণের দাওয়ায় বসন্তকালে প্রথম দক্ষিণ হাওয়ার অপূর্ব স্বাদ ইত্যাদি। ঘোষাল প্রকাশ করতে চাইল যে তার ভিটের তুলনা নেই—রূপরস-বর্ণ-গন্ধে সে অপূর্ব—তার ভাঙা কুটিরের নানা রহস্য; আর এই সব রহস্যে সে অসামান্য। কুটিরের ছায়াটিরও বর্ণনা দিল। সকালের ছায়া, দুপুরের ছায়া, বিকেলের ছায়া, জ্যোৎস্না রাত্রির ছায়া!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চিন্ময় শীলভদ্র ও সুস্মিতাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের আঙিনায় প্রবেশ করল। দক্ষিণের দাওয়ায় মালপত্র রেখেই একটা আচমকা উচ্ছ্বাসে চীৎকার করে উঠল, ছোট বউ. ও ছোট বউ, শুনছ? এসে দেখ কে তোমার জল বয়ে এনেছে নদীর ঘাট থেকে খেয়াঘাটে লক্ষ্মী দেখলাম সকাল বেলায়; এই দেখ তাকে ধরে এনেছি তোমার ঘরে।

ঘোষালের কথায় যেন গভীর আন্তরিকতার সুর বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুস্মিতার মনে অমর কবির বাণী বেজে উঠল: সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!

আর তাই চোখের কোণ জলে ভারি হয়ে উঠল।

৫

ভিন্ন ভিন্ন কাঠের আগুনের ভিন্ন ভিন্ন তাপ ও ভিন্ন ভিন্ন রঙ। ভিন্ন ভিন্ন মনের আগুনের তেজও ভিন্ন, জ্বালাও ভিন্ন। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকাশে সকালের সূর্যের আগুনের তাপও ভিন্ন, বর্ণও ভিন্ন। চন্দনপুরের আকাশে তার এক রঙ। আর, এই কলকাতার ধূমল আকাশে আর এক রঙ। চন্দনপুরের আকাশে সকাল একটা বিস্ফোরণ, কলকাতার আকাশে সে একটা বিলম্বিত দাহ।

এখানে প্রভাতে মানুষ জেগেই দাহের সম্মুখীন। হোক সে দারিদ্র্যের দাহ, নিরাশার দাহ, নিষ্প্রেমের দাহ! কারুর কারুর ক্ষেত্রে রাত্রে এই দাহ স্তিমিত, ঘুমের ভস্মের তলায় কেউ কেউ রাত্রেও দেহপ্রাণকে দগ্ধ করে। পরের সকালে ভস্মের মত মুখ নিয়ে তার সাক্ষাৎ সূর্যের সঙ্গে।

চন্দনপুরের ঘাটে সুস্মিতা নৌকো থেকে হিমেল বালুর উপর লাফিয়ে নামল যখন প্রায় তখনই মধ্যকলকাতার একটা অভিজাত হোটেলের এক সুসজ্জিত কক্ষ থেকে রাত্রিব্যাপী দাহের পর ভস্মের মত মুখ নিয়ে তাপস আর আভা দুজনে বেরিয়ে এল। পথের ওপর নেমে ওরা কয়েক মিনিট দাঁড়াল ট্যাক্সি ধরবে বলে। যাবে স্টুডিয়োতে। চতুর্দিকে অট্টালিকার গায়ে সংখ্যাতীত চৌকো কাঁচের চোখে এই সকাল নিষ্ঠুর হাসি হাসছে তখন। আভা নিজেও হাসল চতুর্দিকে চেয়ে। স্ফিংক্সের মত হাসি!

আভার মধ্যে অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির সমুদ্র সব বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবেশে সুস্থ যৌনবোধ সহজে জন্মায় না। সুস্থ যৌনবোধের জন্যে জীবনের অনেকখানি পরিসরের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিস্তৃত পরিচয়ের পরিসর, নানা দিকে ছড়ানো সামাজিক জীবন, বেশ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য, সুন্দর জিনিসের সান্নিধ্য আর প্রয়োজন মমতা প্রীতি স্নেহ। কিন্তু আমাদের সমাজে নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারে এ সবেরই অভাব।

দারিদ্র্যের জন্য সামাজিক সম্পর্ক সঙ্কুচিত। মাতা-পিতার মধ্যেও সহজ সম্পর্ক বাধাপ্রাপ্ত। তুচ্ছ বিষয়ে নিয়ে মনোমালিন্য, রাগ দ্বেষ। হয় বাবা নয় মা দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা। স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পূর্ণ অভাব। চারিদিকে পরিকীর্ণ দীনতার চিহ্ন। অত্যধিক শাসন, অর্ধাশন, হতাশা। নারীপুরুষের পরস্পর সম্পর্কে অতিরিক্ত সন্দেহ ও সাবধানতা। সবার ওপর নারী পুরুষ সকলের ওপর অতিরিক্ত পরিশ্রমের পাষাণভার। দেহে ক্লান্তি, মনে ক্লান্তি। ফলে যৌনজীবন বাধাপ্রাপ্ত, বিকৃত। অবদমিত আকাঙ্ক্ষার নানারূপ প্রকাশ। কলহে, চিত্তের দৈন্যে, গোপন অন্যায়ে, অতিরিক্ত ভয়ে বা সন্দেহে। এই রকম এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আভা মানুষ। বয়সে এখনও অপরিণত হলেও যৌনবোধের দিক থেকে সে বয়স্কাদের সমান। দেহ অপুষ্ট, মন অপুষ্ট, কিন্তু বাসনা বয়স্ক।

তাই যে রাত্রে আভা অতর্কিতে তার জীবনের প্রথম পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করল সেই রাত্রি থেকে তার প্রবৃত্তি বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। কী এক দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তির বলে সেই-ই তাপসকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট করে নিজের ছায়ার মত শালীনতার সমস্ত গণ্ডী ডিঙিয়ে, রুচির সমস্ত বিধিকে উল্লঙ্ঘন করে এই মহানগরীর স্থানে স্থানে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় নারী অর্ধমানবী, অর্ধদানবী। হিংস্র সিংহীর মত। তার চারিদিকে জ্বালাময়ী মরু। সেই মরুতে শুধু উত্তাপ আর মরীচিকা। এ সেই সনাতন নারী-মরীচিকা—যা পুরুষকে অনাদিকাল থেকে সর্বনাশ থেকে সর্বনাশে আকৃষ্ট করেছে।

ফুটপাথের গা ঘেঁষে একখানা ট্যাক্সি ব্রেক কষে সামনে দাঁড়াতে কে একজন লোক ছিটকে ঠিক তাদের সামনে পড়ল। ছিন্ন বেশ আধাশহুরে লোকটি একটি হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী করে নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল। তাপস ও আভা দুজনেই হেসে উঠল।

লোকটা অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, আভা!

আভা তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল। চোখের ওপর যে মোহের রেশ ছড়িয়েছিল সেই মোহের জালটার মধ্য দিয়ে আভা লোকটাকে প্রথম চিনতে পারে নি। পাশব প্রবৃত্তির হাতে মানুষ যখন নিজেকে ছেড়ে দেয় তখন তার স্মৃতিও ম্লান হয়ে আসে। রাত্রিদিন প্রবৃত্তির মধ্যে মগ্ন বলে পশুর স্মৃতিশক্তি অতি ক্ষীণ।

তাই আভা প্রথমে লোকটাকে চিনতে পারে নি। চমকে উঠে চিনতে পারল যে তার সামনে দারিদ্র্যের

অষ্টাবক্রের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই তারই জন্মদাতা পিতা।

লোকটা আরও একটু সরে এসে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, এতদিন তো বাড়ি যাস নি, আজ একবার যাবি ?

তাপস অন্যমনস্ক হয়ে দূরে চেয়ে ছিল। আচ্ছন্নের মত। কিংবা আহারের পর পরিশ্রান্ত পশুর মত।

আভা ছোট্ট এক লাফে লোকটার কাছ থেকে সরে গিয়ে মণিব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। লোকটা সমস্ত দেহটা কুঞ্চিত করে তাড়াটা লুফে নিল। আভা নিম্নস্বরে শঙ্কিত হয়ে বলল : এইগুলো নিয়ে যাও, আর আমার পিছু পিছু ধাওয়া ক'রো না।

লোকটা টাকাগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে অপরাধীর মত আভার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

তাপস ইতিমধ্যে ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসেছে। ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়ে আভার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ট্যাক্সির এই গুমরে-ওঠা আওয়াজটায় আভার সম্বিৎ ফিরে এল। সে প্রশস্ত একটা হাসি হেসে ট্যাক্সিতে উঠে তাপসের পাশে বসল।

সকালবেলাকার রোদ্দুরের বান ভেদ করে মসৃণ গায়ে রৌদ্র ছিটিয়ে ট্যাক্সি ছুটল। পিচের ওপর প্রথম রৌদ্রের সোনার ঝলক লেগেছে। ঘনকৃষ্ণ গালে আনন্দের মত। চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিসের ঝক্‌ঝকে বাদামী বেল্টে রৌদ্র ঝলসে উঠছে অদৃশ্য তলোয়ারের মত। এই রোদ্দুর আবছা হয়ে গাড়ির ভেতর আভার গালে এসে পড়ছে মাঝে মাঝে চুম্বনের মত।

ওই আলোয় আভার গালের ওপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাশুটে রোমগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তাপসের চোখে। তাপস পাশে বসে ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার আভাকে আপাদ মস্তক দেখল। দেখল চটি থেকে খসে পড়া পা দুটোর গোড়ালিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিড়। এই পা দুটো আর ওই লোকটা মিলে আভার আসল সামাজিক অবস্থার দিকে এমন একটা ইঙ্গিত করল যা তাপসের ভাল লাগল না। তবু বুঝেও বুঝল না।

আভা নিজের থেকেই বলল, ও লোকটা আমাদের জমিদারীর একজন পুরনো কর্মচারী। মদ ভাঙ খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার ওপর মস্ত পরিবার। তাই বারবার আমার কাছে ছুটে আসে।

তাপস ওর কথাগুলো শুনল না। মনে মনে সে আভার দেহটাকে খুঁটিয়ে বিচার করছিল তখন। ওর পায়ের আলতা-পাটির সঙ্গে পায়ের ওপরটার মিল নেই। পায়ের ডিম দুটো মেমসাহেবদের মত। বের করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার মত। এই পা দুটো দেখিয়েই ও জাতে উঠে যেতে পারে। লোকটাকে নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। তাপস আর ভাবল না। আভার ডান হাতটাকে তুলে নিল। এই আঙুলগুলো কিন্তু অভিজাত নয়। দেহের তুলনায় শীর্ণ। ডগগুলি খসখসে। গাঁটের চামড়ায় ছোট ছোট ভাঁজ। কিন্তু হাতের উপরটা অপূর্ব। কলার খোড়ের মত মসৃণ আর গোল।

আভা তাপসের মনের ভাব বুঝে হাসল। হাসিটা স্বাভাবিক নয়। তাপসের মনে হল ওর রাত্রির নেশার ঘোর এখনও কাটে নি !

* * *

তাপস ও আভা যখন স্টুডিয়োর অফিসে ঢুকল তখন সকলেই ওদের সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাল। কুশলীদের বেশীর ভাগ বাইরে গেছে। ঝড়তি-পড়তিরা পড়ে রয়েছে। সমবেত সকলের মধ্যে বেশীর ভাগ উমেদার শ্রেণীর। ক্যামেরার কাজের জন্যে উমেদার কে একজন মিঃ ঘোষ বেশ আসর জমিয়ে বসেছিলেন। তিনিই প্রথম আভাকে দেখে মুখর হয়ে উঠলেন। এই ঘোষ এর আগে অনেকবার নানা ভঙ্গীতে আভার ছবি তুলেছে।

আভা মুখে একটু রহস্যময় হাসি মাখিয়ে নিয়ে একটা শূন্য চেয়ারে বসে পড়ল।

ক্যামেরাম্যান ঘোষ মুগ্ধতার ভান করে বলল, বহুদিন ক্যামেরা নিয়ে কাজ করেছি। আকাশ থেকে মাটির পুতুল পর্যন্ত বহু সাবজেক্ট নিয়ে। কিন্তু আপনার মত ক্যামেরার 'সাবজেক্ট' আমি কখনও পাই নি। যেদিক দিয়েই আপনার ছবি তুলি না কেন, তা হয়ে উঠবে অপূর্ব। আপনার ফিগারকে যে 'পারস্‌পেকটিভে'ই বসিয়েছি সেই পারস্‌পেকটিভই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের

মত, আবহ-সঙ্গীতের মত আপনার ফিগারের স্টীল অর্থাৎ 'নিস্তব্ধ' সুরের সঙ্গে মিলে গেছে। হ্যাঁ, আপনার এক এক ভঙ্গীর এক এক সুর আছে, এক এক অঙ্গের এক এক সুর আছে। শুধু চোখে দেখে আপনার ফর্মের পূর্ণতা অর্থাৎ পারফেক্শন অনুমান করা যায় না।

তাপস একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলল, আপনার শেষ কথাটা বুঝতে পারলাম না মিঃ ঘোষ। ক্যামেরায় সুরের ছবিও ওঠে নাকি ?

ঘোষ একটা ছোট্ট 'বো' করে একটা রহস্যের হাসি হেসে বলল, ওঠে, মিঃ বাসু, ওঠে। আলোও ঢেউ, শব্দও ঢেউ। এক ধরনের ঢেউ অন্য ধরনের ঢেউয়ের ইঙ্গিতও বহন করে। এ বিষয়ে প্যারিসে আমি বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার মঁসিয়ে মালাক্রুকে আলোচনা করতে শুনেছি। বিখ্যাত সুরকার স্ত্রাভিন্স্কিও একবার লণ্ডনে বক্তৃতায় বলেছিলেন এ কথা। হলিউডে—

তাপস অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, ব্যস্ বুঝেছি।

মিঃ ঘোষ নিজের ধাপ্পার জোর দেখে একটা অতি-প্রশস্ত হাসি হেসে আভাকে লক্ষ্য করে বলল, কিছু যদি মনে না করেন আভা দেবি, আপনার আজকের এই মুহূর্তের মুখখানা আমি ছবিতে অমর করে রাখতে চাই।

বলে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটা বিদ্যুৎগতিতে চোখের সামনে ধরে ক্লিক্ করে নামিয়ে নিল। মিঃ ঘোষ গভীর আত্মতৃপ্তির ভান করে বলল, এই মুখখানায় অজস্র মুখ এক হয়ে মিলে রয়েছে।

তাপস বিরক্ত হয়ে বলল, য়ুরোপে রান্না-শিক্ষার জন্যে ইউনিভার্সিটি আছে শুনেছিলাম, কিন্তু তোষামোদের বিশ্ববিদ্যালয় আছে বলে জানতাম না।

ঘোষ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আভার মুখের দিকে নির্দেশ করে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল, লুক, সি ইজ নট এ উওম্যান বাট এ মিষ্ট্রি—নারী নয়, অগাধ রহস্য !

সমবেত সকলে কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। তাপস জোর একটা ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিল।

সবাই চুপসে গেলে, তাপস গম্ভীর ভাবে বলল, আজ আমাদের রিহার্সাল আছে, আপনারা আজ আসতে পারেন। আমাদের লোকেরা থাকবে। অন্যেরা সবাই চলে যাবে। চল আভা, স্টুডিওতে চল।

আভাকে সঙ্গে নিয়ে তাপস স্টুডিয়োর দিকে চলে গেল। পিছু পিছু কয়েকজন কর্মচারীও গেল। মিঃ ঘোষ আর একবার ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে অপসৃয়মান আভার দিকে লক্ষ্য করল। আর একটা ছবি তোলার ভান করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ইভেন্ হার ব্যাক্ ইজ ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল !

* * *

এর কিছুক্ষণ পরে।

তাপসের স্টুডিয়োর সামনে এসে পড়েছেন সমীর ডাক্তার। বাড়ি থেকে ডিস্পেন্সারিতে চলেছেন এই পথ ধরে। স্টুডিয়োর গেটের ওপর কাগজের ফুলের মত ফুলগুলোর দিকে প্রতিদিনের মত আজও একবার চেয়ে দেখলেন। আজ ফুলগুলোকে নীরস মনে হল অন্যদিনের চেয়ে। আসলে বুঝলেন আজ ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সকালের রোদ্দুরের যে ম্যাজিক তা লুপ্ত হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ্দুর মামুলী হয়ে গেছে।

অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছেন তাঁর ঘুম বেড়ে চলেছে। দিনের পর দিন ঘুম থেকে উঠতে ক্রমাগত দেরি হচ্ছে। আজকাল সব রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন ছেড়ে জেগে উঠতে ইচ্ছে হয় না, তাই দেরি হয়ে যায়। ধীরে ধীরে স্বপ্নের হাতে যেন বেশী করে নিজেকে আত্মসমর্পণ করছেন। দিন দিন স্বপ্ন যেন মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠছে। দিন দিন স্বপ্নের তৃপ্তি যেন বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে তার স্বাদ। স্বপ্ন যেন নেশার মত হয়ে উঠছে। তাই ঘুম রাত্রির সীমা ছাড়িয়ে ক্রমশঃ দিনের মধ্যে প্রবেশ করছে। স্বপ্নের মধ্যে রূপ-রস-গন্ধের স্বাদ দিন দিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। কত অদেখা দেশ, কত অদেখা পদার্থ, কত অদেখা মূর্তি দেখছেন স্বপ্নে, কত সুর শুনছেন, নাচ দেখছেন। স্টুডিয়োর গেটের মাথায় ফুলগুলোর দিকে একবার চেয়ে আবার আগের মত মাথা হেঁট করে খুব ধীরে ধীরে পথ চলতে আরম্ভ করলেন—আজকের সকালে তন্দ্রার ঘোরে দেখা স্বপ্নটা মনে মনে স্মরণ করতে করতে।

সহসা কে যেন হাতটা টেনে ধরল : ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, একবার আসুন। একটা রোগী দেখে যান।

ডাক্তারের মনে হল এ ঘটনাটাও তাঁর সকালের স্বপ্নের পূর্বানুবৃত্তি!

*   *   *

স্টুডিয়োর মধ্যে সুন্দর মহড়া চলছিল। ডিরেক্টর তাপস নায়কের অনুপস্থিতিতে তার পাঠটা বলে যাচ্ছিল ও আভা নায়িকার পাঠ করছিল। পাঠ করতে করতে আভা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। তাকেই দেখবার জন্যে রাস্তা থেকে সমীর ডাক্তারকে ধরে আনা হয়েছে।

সমীর ডাক্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আভার শরীর পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু কোথাও কিছু অস্বাভাবিক বুঝতে পারলেন না। মনে হল রোগিণী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অথচ আশপাশের সবাই বলছে পাঠ বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাই তার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় তাঁকে বসে থাকতে হল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পর হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে অভিনয় করতে করতে রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন তার শেষটা শুনলে মন্দ হয় না। হয়তো ওই অভিনয়টার মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যাতে অদৃশ্য আঘাতে অভিনেত্রীর মন তথা স্নায়ুতন্ত্র বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

…দুপুরবেলা। একটা অভিজাত হোটেলে লাঞ্চ খাচ্ছে নায়ক ও নায়িকা। খেতে খেতে নায়ক বলল, আশ্চর্য, এতদিন পরেও তোমার পুরো পরিচয় আমি জানতে পারি নি।

নায়িকা জিজ্ঞাসা করে, কী হবে জেনে? জানলে কি বিয়ে করতে আমাকে?

নায়ক বলে, যদি অসম্ভব না হত।

ও কথা আমি ভাবি নি এখনও।

তোমার বাবা মার, তোমার বংশের—

ও। ইতিহাস চাও? তবে শোন—

নায়িকা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলে চলে।

তবে শোন। প্রায় ষোল বছর আগে সান্দুর্গের মহারাজা আর লক্ষ্ণৌয়ের সুন্দরী বাঈজী চন্দ্রকলা কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘর্ঘরা নদীর ওপর নৌকাবিহার করেছিলেন। তাঁরাই আমার বাবা মা।

নায়ক জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ঘর্ঘরা?

এর পর নায়িকার যা বলার ছিল তা না বলে আভা অন্য রকম বলে গেল। বলল জানি না। কোথায় ঘর্ঘরা আমি জানি না। আমি জানি সান্দুর্গের মহারাজা আর চন্দ্রকলা দেবী আমার বাবা মা। আর জানি, আমার মা আমাকে জেলেডিঙিতে ভাসিয়ে দেন। আর আমি সেই ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে শিলাই নদীর তীরে কাঞ্চনপুর গ্রামের ঘাটে এসে ঠেকি।

ডিরেক্টর এসব শুনে দারুণ বিরক্ত হয়ে এক ধমক দিয়ে ওঠেন। তখন আভা ফুঁসে উঠে জড়িত কণ্ঠে কী একটা বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

সমীর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন, শেষ কথাটি কি?

কেউ মনে করতে পারে না। সমীর ডাক্তার অসহায় বোধ করেন। বুঝলেন এ ব্যাধি নয়। আধির প্রকাশ। কিন্তু অন্যের মনে ডুব দিয়ে আধির কাঠামো তুলে আনা অসম্ভব। তবু এমন তাঁর স্বভাব যে সাঁতারু যেমন নদী দেখলেই নেচে ওঠে তা পার হয়ে যেতে, তেমনি রহস্যময় মন দেখলে তাঁর মনে হয় তিনি একবার ডুব দিয়ে দেখেন। কিন্তু রোগী তো ঘুমন্ত। কথা বলারও উপায় নেই ওর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন রোগিণীর জ্ঞান ফিরল না তখন তিনি আর একবার দেখতে বসলেন। এবার দেখতে দেখতে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মত একটা ধারণা হল। রোগিণীর কপালের দিকে চেয়ে দেখলেন সিঁথিতে সিঁদুর নেই। ধারণাটা মনের মধ্যে চেপে একটা উপযুক্ত প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বললেন, এখন থেকে কয়েক মাস এঁর অভিনয় করা চলবে না। বিশ্রাম দরকার। কিছু ভয় নেই। জ্ঞান এমনিতেই ফিরে আসবে।

বলে, ব্যাগ তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় রোগিণীর জ্ঞান ফিরে এল। সামনে ডাক্তারকে দেখে আকুল হয়ে ডাকল, ডাক্তারবাবু! ও ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারবাবু মাটিতে বসে তার মাথার কাছে মুখ নিয়ে যেতেই বলল, আমার ভয় করছে, ডাক্তারবাবু! বড্ড ভয় করছে।

ডাক্তার আশ্বস্ত করলেন, না না, ভয় কি!

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। আভা কম্পিত ডান হাতখানা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে যেন তাঁকে ধরে রাখতে চাইল। যেন সে ভয়ানক অসহায়!

ডাক্তার চতুর্দিকের লোকজনের দিকে, বিশেষ করে তাপসের দিকে চেয়ে বললেন, না না, ভয় কি! কিছুই ভয় নেই।

ডাক্তার রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন রোদ্দুরটা ঘষা মুদ্রার মত একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। দিনটা অচল, অর্থহীন হয়ে গেছে। ডাক্তার মনে মনে তাঁর রাত্রির স্বপ্নের মধ্যে আবার ফিরে যেতে চাইলেন।

[ক্রমশঃ]

জর্জ টম্পসন ও বাঙালীর রাজনীতি-চর্চার প্রথম পর্যায়

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

স্ব-যুগের শিক্ষিত বাঙালী-জীবনে স্বদেশের ইতিহাস-চেতনার অভাব দেখে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় সক্ষোভে লিখেছিলেন :

"বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। ...বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবন-চরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।...আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।"

বঙ্কিমের এ উৎসাহবাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দের কোন কোন চিন্তাশীল লেখক বাঙালীর ইতিহাস পুনর্গঠনকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় এবং এ দুরূহ কাজ সম্পাদনে তাঁদের সামনে বাধাও ছিল প্রচুর। দীর্ঘকাল পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ঐতিহাসিকের সম্মুখ থেকে সে বাধা অপসারিত হয়েছে। সুখের বিষয় আজ বহু স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি আমাদের বিস্মৃত ইতিহাসের ছিন্ন সূত্রের সংযোজনাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। এরূপ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু স্বদেশের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে আমরা যেন তরল ভাবাবেগ দ্বারা আচ্ছন্ন না হই—সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ইতিহাস তথ্যনির্ভর। এ তথ্যনির্ভরতাকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি আমরা কল্পিত স্বজাতি-গৌরবে উদ্দীপ্ত ভাবনা নিয়ে ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হই তাহলে ইতিহাসের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাস লিখতে গেলে তা ইতিহাস না হয়ে পরিণত হবে উপন্যাসে।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস নবীন ভারতের ইতিহাসে একটি বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে শিক্ষিত বাঙালী-জীবনে নবজাগৃতির আংশিক প্রকাশ ঘটেছিল পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শের ফলে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তিবাদের প্রভাবে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী-মনে এ সময় জীবনের অর্থ সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হল। প্রচলিত মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতি তাঁদের কাছে মনে হল কুসংস্কারের পরিচায়ক। সেজন্য তাঁরা মুখ্যতঃ মনোযোগী হলেন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে। প্রচলিত শিক্ষা সে যুগের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যথোপযুক্ত নয় বলে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই একদল শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবার দাবি জানালেন। এঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। সরকারও রাজনৈতিক কারণে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। রীতিমত শিক্ষাবিভাগ গঠিত করে সরকার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হলেন।

দেশের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল হিন্দু কলেজ। সে কলেজের মননশীল শিক্ষক ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের শিক্ষায় তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে বিদ্রোহ ও

ভাববিপ্লবের বীজ কি ভাবে উপ্ত হয়েছিল তার সবিস্তার বর্ণনা করেছেন বহু লেখক। বর্তমান প্রসঙ্গে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে একটা বিষয় এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সে হল হিন্দু কলেজে নব-আলোকপ্রাপ্ত নব্য বঙ্গের বিদ্রোহ-চেতনার ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সংস্কার এবং রক্ষণশীল দেশীয় নরনারীর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারই ছিল এঁদের বিপ্লবী মনোভাবের প্রধান লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে 'নব্যবঙ্গ' বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে কিরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন তার সোচ্ছ্বাস বর্ণনা দিয়েছেন বাঙালীর নবজাগরণের বহু ইতিহাসকার। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে দু-একজনের বেশী ঐতিহাসিক ইঙ্গিত করেন নি। বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার একটা খতিয়ান নেবার চেষ্টা করা যাক :

১। এ কথা সত্য যে দেশের শিক্ষিত যুবকদের ব্যবহারিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সদিচ্ছায় হিন্দু কলেজের শিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ' ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় একটা কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু রামমোহনের মত ব্যাপক বিজ্ঞান শিক্ষার কোন দাবি তাঁরা সরকারের নিকট উপস্থিত করেন নি।

২। মানবতাবাদী পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়ার ফলে মরিসাস দ্বীপে শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁরা উত্তেজনা প্রকাশ করেন। তৎকালীন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কুলিদের বেগার খাটাবার বিরুদ্ধে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিবাদও করেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিথিল, স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষমতা-গর্বিত শাসনের ফলে দেশের মফস্বল অঞ্চলে পুলিসী অত্যাচারের যে তাণ্ডবলীলা চলছিল সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কোন ব্যাপক চেষ্টা এঁরা করেন নি, কিংবা সরকারী কুশাসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনাও এঁদের ছিল না।

৩। দেশীয় প্রজাদের প্রতি সুবিচারের জন্য এঁরা জুরিপ্রথা প্রবর্তন এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দাবি করেন। এ দাবির মধ্যে অভিনবত্ব ছিল না। রামমোহন রায় ইতিপূর্বেও সরকারের নিকট অনুরূপ দাবি উপস্থিত করেছিলেন। তবে এঁদের একটি দাবির মধ্যে অভিনবত্ব ছিল। সে হল ইংরেজীকে আদালতের ভাষা হিসেবে গণ্য করবার দাবি।

'নব্যবঙ্গে'র মধ্যে একমাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কোম্পানির চার্টার পরিবর্তনের দাবির মধ্যেই রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া রাজনৈতিক জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন শুধুমাত্র একজন 'নব্যবঙ্গ'। ইনি হলেন বিখ্যাত বক্তা রামগোপাল ঘোষ। 'ব্ল্যাক অ্যাক্টে'র খসড়া বিল সমর্থনে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে তিনি জনমত সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁকে বাদ দিলে বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য কোন প্রয়াস 'নব্যবঙ্গে'র বিদ্রোহচেতনায় দেখা যায় না।

বস্তুতঃ, রাজনীতিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অভীষ্ট ফললাভ করতে হলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে রাজনীতি শিক্ষা 'নব্যবঙ্গে'র ছিল না। মনীষী ডিরোজিওর যুক্তিবাদী শিক্ষায় 'নব্যবঙ্গে'র মনে সামাজিক ধারণার সনাতন মূল্যবোধ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ প্রশ্নমনস্কতা জাগ্রত হয়েছিল, একটা ভাবপ্রবণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাও তাঁরা সে শিক্ষা থেকে লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশবাসীর সীমাহীন দুর্গতির জন্য যে বিদেশী কু-শাসন ও শোষণ দায়ী ছিল তার স্বরূপ নির্দেশ করে ভাবশিষ্যদের অন্তরে তিনি স্বাধিকারবোধের চেতনা জাগ্রত করতে পারেন নি। যে ধরনের কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন তাতে সক্রিয় রাজনীতি-চর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। 'নব্যবঙ্গে'র সক্রিয় রাজনীতি-চর্চা শুরু হল কলেজী-শিক্ষার পরে যখন তাঁরা জীবনের কঠোর ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন।

উচ্চ সরকারী কর্মে নিয়োগ ব্যাপারে সরকারের বর্ণবৈষম্যনীতি, অপরাধের বিচারের সময় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যে তারতম্য, দেশীয় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিবেচনা ও সততার প্রতি তৎকালীন সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তাচ্ছিল্য ও অবিশ্বাস 'নব্যবঙ্গে'র মনকে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। কিন্তু দেশের মধ্যে এমন কোন রাজনৈতিক সংস্থা নেই যার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করতে পারেন। কলকাতার

বাইরে বিস্তৃত দেশের মধ্যে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন ছিল না বললেই হয়। সমাজ বিভক্ত ছিল মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে: জমিদার ও রায়ৎ। জমিদারেরা Landholders Association বা ভূস্বামী সভা স্থাপন করে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন ছিল সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের সীমায় সীমাবদ্ধ। সরকারের রোষভাজন হয়ে জমিদারি হারাবার ভয়ে তাঁরা ইংরেজ-প্রভুকে ঘাঁটাতে সাহসী হতেন না।

এ ভূস্বামীদের মধ্যে আশ্চর্য মানুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজানুগত্যে তাঁর জুড়ি বোধ হয় তখন কেউ ছিলেন না। ইংরেজ-চরিত্রের গুণমুগ্ধ এত বড় বাঙালী সে যুগে দেখা যেত না। অথচ স্বজাতিপ্রীতি ও দেশহিতৈষণাও তাঁর কারও চেয়ে কম ছিল না। ভূস্বামীদের স্বার্থের সঙ্গে তাঁর নিজের স্বার্থ জড়িত বলে তিনি জমিদারের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কেও তিনি যে অনবহিত ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে মফস্বল অঞ্চলে পুলিসী জুলুমের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ সমর্থনে পুলিস কমিশনের সামনে তাঁর সাক্ষ্যদানে। স্বদেশের উন্নতির উপায় সম্পর্কে তাঁর কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন সুশিক্ষিত ইংরেজ যত বেশী সংখ্যায় এ দেশে বসবাস করবেন ততই দেশের উন্নতি হবে। শুধু দ্বারকানাথের নয়, রামমোহনেরও এ ধরনের বিশ্বাস প্রবল ছিল। এ বিশ্বাস দ্বারকানাথের মনকে ইংরেজদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট করেছিল। এ পক্ষপাতের প্রমাণ মেলে দ্বারকানাথ যখন নীল হাঙ্গামার পরে অত্যাচারী নীলকরদের সপক্ষে সরকারী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। দ্বারকানাথ স্বদেশের উন্নতির জন্য ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করতেন (রামমোহনের মত স্বাধীনচেতা ব্যক্তিও করতেন)। কিন্তু কোন ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র তাঁর স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে গ্লানিকর কিছু লিখলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। একবার একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে তাঁর স্বদেশবাসী সম্পর্কে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ বেরুলে তিনি সে সংবাদপত্র-সংস্থার অধিকাংশ শেয়ার নিজে কিনে নিয়ে সে পত্রিকাকে তাঁর স্বদেশের সপক্ষে লিখতে বাধ্য করেন। স্বদেশবাসীর উন্নতিসাধনের অভিপ্রায়ে বিদেশী সংবাদপত্র-কোম্পানির শেয়ার কিনে দ্বারকানাথ এভাবে কত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তার পরিসংখ্যান দিয়েছেন ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'Political Thought from Rammohan to Dayanand' নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে।

রামমোহনের মত দ্বারকানাথও বিশ্বাস করতেন দেশীয় যুবকেরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য না হলে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। হিন্দুকলেজের উদ্যোক্তাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। এ অবস্থায় হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি দ্বারকানাথ যে সহানুভূতিশীল হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে তৎকালীন সরকার কি ভাবে ইংরেজী-শিক্ষিত সদ্বংশজাত স্বদেশী যুবকদের দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্যে (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে) নিয়োগ-নীতি গ্রহণ করেন তার বিবরণ দিয়েছেন কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর Memoirs of Dwarkanath Tagore নামক গ্রন্থে।

উচ্চশিক্ষিত স্বদেশীয় যুবকদের দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করেই শুধু দ্বারকানাথ তৃপ্ত থাকেন নি। তিনি অনুভব করেছিলেন, নতুন আলোকপ্রাপ্ত ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকেরাই দেশের আশা-ভরসার স্থল। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এঁরা যদি স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া উপস্থিত না করেন তাহলে স্বদেশের উন্নতির আশা বহু দূরে। সৌভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতকের চারের দশকের দিকে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল একশ্রেণীর উদারতন্ত্রী রাজনীতিবিদের অভ্যুদয় হয়েছিল। লর্ড ব্রোহাম, জর্জ টম্সন প্রভৃতি এ পর্যায়ের রাজনীতিকদের মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত অনুন্নত ভারতবাসীর অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তাঁরা লণ্ডনে স্থাপন করছেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক প্রতিষ্ঠান। এ সোসাইটির ছটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দাসত্বপ্রথাকে সমূলে উচ্ছেদ করবার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বিখ্যাত হয়েছেন তখন

শক্তিমান বাগ্মী ও মানবতাবাদী জর্জ টম্পসন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির ভ্রমণকারী সম্পাদক (Travelling Secretary) হিসেবে ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বৈরাচারী ও অদূরদর্শী শাসন সম্পর্কে তীব্র ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে। লণ্ডনের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) এবং 'উদ্যোক্তা কমিটির সভ্যদিগের নাম' থেকে এ সোসাইটির উদ্দেশ্য এবং সভ্যদের নাম জানা যায়:

ক. Prospectus of the British Committee for forming a / British India Society, for bettering the condition of / our Fellow-Subjects—the Natives of India.

"অস্মদ্দেশীয় রাজশাসনাধীন ভারতবর্ষস্থ / মনুষ্যদিগের দুরবস্থ দূরকরণার্থ যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক সভা / সংস্থাপন করা যাইবেক—তদুদ্যোগকারক কমিটির অনুষ্ঠান পত্র।"

"অপর তদ্দেশে বিংশতি বৎসরাবধি যুদ্ধ বিগ্রহাদি সমস্ত সম্যক রহিত হইয়াছে। তথাপি অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত মনুষ্যবর্গের প্রাণাপহরণ করিতেছে। ইংরাজী ১৮৩৭/৩৮ শালে আগরা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে পাঁচ লক্ষাধিক মনুষ্যের মৃত্যু হইয়াছে। বর্তমান বৎসরেও বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরের উত্তর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইতেছে। এতদ্দারুণ দুর্ঘটনা শ্রবণে চিত্ত বিষণ্ন হয় এবং নিতান্ত আশ্চর্য বোধ হয় কেন না ভারতবর্ষের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা এবং কেহ কেহ কহেন এমত শস্যজনক ভূমির অর্দ্ধেকাংশ বনেতে আবৃত হইয়া পশ্বাদির বাসস্থান হইয়াছে।"

অনুষ্ঠান-পত্রের একই পৃষ্ঠায় অন্যত্র লিখিত আছে:

"কয়েক মাসাবধি এতদ্‌বিষয় সকলের সংবাদ অস্মদ্দেশের নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে পরোপকারী মান্য এবং কোমলান্তকরণ জনগণেরা করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া হিন্দুদিগের (হিন্দু বলতে ভারতবাসী মাত্রকেই বোঝাত—লেখক) মঙ্গলার্থে এই সকল স্থানে অর্থাৎ সেপফিলড্‌ (Sheffield) গেলাসগো (Glasgow) নিউকেষ্টল-আপন-টাইম (Newcastle-upon-time), এডিনবরা (Edinburgh) ডারলিনটন (Darlinton) নগরে সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এমৎ এক সভা রাজধানীতে সংস্থাপনের দৃঢ় বাসনা হইয়াছে যে সভার অনুসন্ধান ও চেষ্টার দ্বারা গ্রেট ব্রিটেইন দেশস্থ এই নূতন পরমহিতৈষী ব্যাপার সম্পন্ন করণের সদুপায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

[এ ছাড়া জর্জ টম্পসন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখের কলকাতার বক্তৃতায় ম্যানচেষ্টারে আর একটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির শাখার নাম উল্লেখ করেছিলেন। সে শাখার নাম ছিল Northern Central British India Society। এ শাখাটি নিয়ে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির শাখা সমিতির সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ছটি।—লেখক]

খ. ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির "উদ্যোক্তাকারক কমিটির সভ্যদিগের নাম"—

উইলিএম এডেম সাহেব, সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

উইলিএম এলডেম সাহেব, জুনিএর, লিডস্‌ নগরে নিবাস।

ডব্‌লু তামস বেলেএর সাহেব, বাথ নগরে নিবাস।

জান বাউরিং সাহেব, এল. এল. ডি.।

মেজর জেনারেল বৃগ্‌স।

লর্ড ব্রোহাম।

এফ. সি. ব্রাউন সাহেব, টেলচিরি (Tellichery, South India) নগরে নিবাস।

তামস ক্রীষ্টি, জুনিএর সাহেব।

তামস কেলার্কসন সাহেব।

স্যার চার্লস্‌স ফরবেশ, বেরোনেট।

বোস লেসলি ফাস্টর সাহেব।

তামস ফ্রাঙ্কলেণ্ড্‌ সাহেব, লিভারপুল নগরে নিবাস।

জোসেফ আলফ্রেড হারড কেষ্টেল সাহেব।

জেমস হারফোর্ড সাহেব, ব্রিস্টল নগরে নিবাস।

উইলিঅম্‌ হোইট সাহেব।

জোসেফ পিস্‌, সিনিয়ার সাহেব। ডারলিংটন নগর নিবাসী।

স্যার কলিং এস্কুলি ইলস্মিথ, বেরোনেট।

জর্জ তাম্পসন সাহেব।

কোষাধ্যক্ষ : মেজর জেনারেল বৃগ্‌স্‌, ১১নং ইয়র্ক গেট, রিজেন্ট্‌স্‌ পার্ক।

সম্ভ্রমার্থ সম্পাদক : এফ. সি. ব্রৌন সাহেব, ২২নং হারলি ইস্টরিট।

ভ্রমণার্থ সম্পাদক : জর্জ তাম্পসন সাহেব।*

ক্রমে মানবতাবাদী জর্জ টম্পসনের ভারতপ্রীতির কথা কলকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদেরও কানে এসে পৌছল। কলকাতার 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে 'কোর্ট অব ডিরেকটারস্‌'-এর নিকট ওকালতি করবার জন্যে ইতিপূর্বেই ভারতহিতৈষী বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টম্পসনকে নিযুক্ত করেছিলেন। তার জন্য তাঁরা জর্জ টম্পসনকে যথোপযুক্ত অর্থও দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে আসবার জন্য দ্বারকানাথ জর্জ টম্পসনকে কোন অর্থ দিয়েছিলেন কিনা তার উল্লেখ অবশ্য কোথাও পাওয়া যায় না। (দ্রষ্টব্য : ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 'Political Thought from Rammohan to Dayanand.')

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথমবার বিলেতে যান তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে জর্জ টম্পসনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁকে ভারতবর্ষে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনৈতিককে এনে ইংরেজী-শিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ'কে রাজনীতি-চর্চায় অনুরাগী করে তুলবেন। ওদিকে জর্জ টম্পসনেরও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে পরের কথায় ঝাল খেয়ে তিনি স্বদেশে এত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন সে দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। এ মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ভারত-প্রেমিক জর্জ টম্পসন দ্বারকানাথের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অজানা দেশের দিকে পা বাড়াতে দ্বিধা করলেন না। দ্বারকানাথের সঙ্গে একই জাহাজে দীর্ঘদিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কলকাতায় এসে অবতরণ করলেন তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। পার্লামেন্টের প্রশস্ত কক্ষতল যাঁর উদ্দীপ্ত বক্তৃতায় সরগরম হয়ে থাকত, দাসত্বপ্রথার দুর্মর সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে যিনি আংশিক কৃতকার্য হয়েছিলেন সে প্রসিদ্ধ বাগ্মী মানবতাবাদী টম্পসনের বক্তৃতা শোনবার আশায় 'নব্যবঙ্গ' আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলেন।

'নব্যবঙ্গে'র মুখপত্র ছিল তখন ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। এ পত্রিকার মাধ্যমে 'নব্যবঙ্গ' দেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করতেন। জর্জ টম্পসনের কলকাতায় আসার সংবাদ শুনে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় :

"শুনা যাইতেছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি উৎসাহী সভ্য এবং এতদ্দেশের বিশেষ মঙ্গলার্থী মেং জর্জ তামসেন সাহেব এতন্নগরে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে উক্ত সভায় উপদেশ দিতে অনুরোধ করিবেন। তিনি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশের বিষয় সকল উত্তমরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন; তাঁহার মানস এই, ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতবর্ষের প্রজাদিগের উপর যে ২ অত্যাচার হয় তাহার আন্দোলন করিবেন।"

জর্জ টম্পসন কলকাতায় উপস্থিত হলে 'নব্যবঙ্গ'-প্রধানেরা তাঁকে তাঁদের সামনে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কলকাতায় তখন এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে জর্জ টম্পসন ভারতবর্ষের তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ক বক্তৃতা করতে পারেন। এমন কোন সাধারণ সভাগৃহও ছিল না যেখানে প্রকাশ্য রাজনীতি বিষয়ক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্য স্থির হল জর্জ টম্পসন হিন্দু কলেজ হলে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (বা 'Society for the Acquisition of General Knowledge') মাসিক অধিবেশনে বক্তৃতা করবেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত সভার সভ্যদের কাছে জর্জ টম্পসন কলকাতায় প্রথম বক্তৃতা করলেন। সভায় দুই শতাধিক দেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ নাগরিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ডাফ, মিঃ কের। সভার আনুষ্ঠানিক সূচী শেষ

* ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির 'অনুষ্ঠান পত্র এবং উদ্যোক্তাকারক কমিটির সভ্যদিগের নাম', শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হলে পর জর্জ টম্পসন বক্তৃতায় তাঁর ভারতবর্ষে আসার কারণ বর্ণনা করেন এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি এ দেশে এসেছেন সে উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য দেশীয় ভদ্রলোকদের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সভার পরে 'নব্যবঙ্গে'র মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গৃহে জর্জ টম্পসনের সম্মানে একটি পার্টির আয়োজন করেন। সে অনুষ্ঠানেও বহু দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হন। তারপর অন্যতম 'নব্যবঙ্গ' চন্দ্রশেখর দেবের বাড়িতে দ্বিতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়, এ সভার সভাপতি ছিলেন রাজা বরদাকান্ত রায়। মাত্র বাইশ জন দেশীয় ভদ্রলোক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোন ব্যক্তির বাসভবন জনসভার পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় সভার স্থান অতঃপর স্থানান্তরিত হয় মানিকতলার শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে। পর পর সেখানে কয়েকটি সভার অনুষ্ঠান হয় (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। প্রত্যেক সভায় কয়েকজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক ছাড়াও দুই শতাধিক দেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন।

এ সমস্ত সভায় জর্জ টম্পসন দেশের বাস্তব অবস্থা এবং সরকারী শাসননীতি সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা করেন তাতে শিক্ষিত কলকাতাবাসীর মনে রাজনীতি চর্চার কৌতূহল জাগ্রত হল এবং রীতিমত রাজনীতি চর্চার জন্য তাঁরা একটি স্থান অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত স্থান মিলল ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় মেসার্স গুপ্ত মিটার অ্যাণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ের দ্বিতলে। এ কোম্পানীর যুগ্ম অংশীদার ডক্টর দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং ডক্টর গৌরীশঙ্কর মিত্র সানন্দে ওপরের প্রশস্ত ঘরখানি জনসাধারণের হস্তে রাজনীতি চর্চার জন্য ছেড়ে দিলেন। গুপ্ত-মিত্র কোম্পানীর ডাক্তার গৌরীশঙ্কর মিত্র নিজেও ছিলেন দেশের রাজনীতি-চর্চায় উৎসাহী ব্যক্তি। ফৌজদারী বালাখানার হলঘরের প্রথম উদ্বোধন হয় ৬ই মার্চ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্বোধনী সভায় জর্জ টম্পসন উপস্থিত তিন শতাধিক ব্যক্তির সামনে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দেন। সে সভায় হলের আসবাব-পত্রাদি কেনবার জন্যে এবং জর্জ টম্পসনের বক্তৃতাগুলো ছাপাবার জন্যে দান এবং চাঁদার জন্যে আবেদন করা হয়। অতঃপর এ হলে পর পর আরও কয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যাও কম হত না। প্রত্যেকটি সভা জর্জ টম্পসন এবং 'নব্যবঙ্গে'র রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা-সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিথিল ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জর্জ টম্পসনের ফৌজদারী বালাখানার জ্বালাময়ী বক্তৃতাকে সরকার-সমর্থক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' তুলনা করতে লাগলেন বালা হিস্সারের কামান গর্জনের সঙ্গে। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যাই বলুক, জর্জ টম্পসনের দৃষ্টি কিন্তু গঠনমূলক পরিকল্পনার দিকে স্থির-নিবদ্ধ। তিনি অনুভব করলেন বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষিত বাঙালীর নব-উদ্দীপ্ত রাজনীতি-চেতনাকে যদি কোন স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত করা না যায় তাহলে তা ভবিষ্যতে বৃথা বাগাড়ম্বরেই পর্যবসিত হবে। তাই ২০শে এপ্রিল, ১৮৪৩-এর সভায় সভাপতি হিসেবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনি ঘোষণা করলেন 'দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। উপস্থিত সকলে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করায় সেদিনই প্রতিষ্ঠিত হল বাংলা দেশের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।'

উনবিংশ শতাব্দের শেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জর্জ টম্পসন ও 'নব্যবঙ্গে'র অনুরূপ আন্দোলনকে হয়তো মূল্যহীন মনে হবে। কিন্তু সেকালের বিচারে এ রাজনীতি চর্চা ও আন্দোলন যে কতটা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ ছিল বারান্তরে তার পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইল।

●

কাশ্মীরের চিঠি

শ্রীঅমিয়ময় বিশ্বাস

ঝিলমের বুকে

যুসমার্গ থেকে ফেরার পরের প্রভাত। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের পিছন থেকে সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছেন। ঝিলমের এপার আলোয় আলোময়, কিন্তু ওপারে বাঁধের নীচে এখনও বেশ অন্ধকার। হাউস-বোটগুলোতে এখনও ইলেকট্রিকের আলো জলছে। আজ আর কোথাও যাবার তাড়া নেই। আজকের দিনটা আমাদের নিজস্ব—আলস্যবিলাসে কাটানোর দিন। বোটের পাটাতনে বসে নদীর উপর পা ঝুলিয়ে প্রভাতসূর্য-উদ্ভাসিত ঝিলমের স্রোতের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে মালবোঝাই নৌকোগুলো মেয়ে-পুরুষে লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বহুদিন পর আমাদের বাড়ির কথা মনে পড়ল। সিরাজগঞ্জে আমাদের বাড়ির নীচে দিয়ে বয়ে যেত বিশাল যমুনা, তার দিকে তাকিয়ে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনটা ফিরে গেল সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতির দুয়ারে। প্রভাতের সোনালী আলোতে স্নান করে মনে নেমে এল অপূর্ব শান্তি—জীবনের সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, পাওয়া না-পাওয়া সব যেন এক হয়ে এল। আনমনা হয়ে বসেছিলাম বহুক্ষণ। চায়ের আহ্বানে চমক ভাঙল—তোমার মা ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে।

আজ সবকিছুই ঢিমেতেতালা তালে চলছে। চা খেতেই সকালটা পার হয়ে গেল। বাড়ি থেকে আসবার সময় তোমার মা রান্নার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলেন। আজ সেগুলো কাজে লাগল। স্নান করে সবাই আজ বহুদিন পর বাড়ির রান্না পরিতোষসহকারে খেলাম। তারপর পরামর্শ হল ঝিলমে বেড়ানোর। একটু বিশ্রাম করে শিকারা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝিলম খুব বেশী প্রশস্ত নয়, গভীরও বেশী নয়। প্রায় সব জায়গাতেই দেখছি লগি দিয়ে নৌকো ঠেলে নিয়ে যাওয়া চলে। ঘোলা জল তরতর করে বয়ে চলেছে, আমরা সেই স্রোতে ভেসে চললুম। নদীর দুই ধারে বড় বড় হাউস-বোট বাঁধা। মাঝে মাঝে শিকারার স্ট্যাণ্ড—অনেকগুলো শিকারা সেখানে জমায়েত হয়ে রয়েছে। চাকচিক্যময় আধুনিক আসবাবে সুসজ্জিত উচ্চতম শ্রেণীর হাউস-বোটগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝিলমের বুকে সৌখিন শিকারার মেলা, মাল-বোঝাই বড় বড় নৌকো আর ভাসমান কাঠের গুঁড়ির ভেলাকে পিছনে ফেলে আমরা চললুম শ্রীনগরের প্রথম পুল "আমীরাকদলে"র অভিমুখে। পুরনো সাতটা পুল আর নতুন দুটো। এই নটা পুল জাগিয়ে রেখেছে শ্রীনগরের দুই পারের প্রাণধারা।

আমীরাকদল: বিখ্যাত পাঠান-নৃপতি আমীর খাঁয়ের স্মৃতিকে বহন করে চলেছে। প্রায় আট শত বৎসরের পুরাতন। কাশ্মীরের বিশিষ্ট ঢঙে দেওদার কাঠের স্তম্ভে আধুনিক ক্যান্টিলেভার প্রথায় তৈরী। সম্পূর্ণ পুলটা ধনুকের মত মাঝখানটা উঁচু। রাস্তা আধুনিক রেওয়াজ অনুযায়ী পিচ ঢালা। এই আমীরাকদলের রাস্তাই হচ্ছে শ্রীনগরের সবচেয়ে বড় পণ্যকেন্দ্র। চাঁদনী চক আর চৌরঙ্গি হাত মিলিয়েছে এই সরণীতে। সব বড় বড় দোকানপাট এই রাস্তায়। লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্কের দরজাও এই অ্যাভিনিউতে। ভারত-সরকারের প্রচার-দপ্তরের কেন্দ্রও এখানে। সবকিছুই পাওয়া যায় এই রাস্তার দু ধারে। যতই পুলের কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়, জিনিসের দাম ততই কমে আসে।

নদীর বুক থেকে উঠে গেছে দোতলা-তিনতলা সব বাড়ি। দু-একটা চারতলাও আছে। বকরীদ

উপলক্ষে মুসলমানদের বাড়িগুলোতে নতুন করে কলি ফেরানো হয়েছে। ইটের দেওয়াল, দরজা, জানলা সব সবুজ রঙ। হিন্দু ও মুসলমানদের বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা। নতুন পুল পার হয়ে সরকারী সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের নীচে দিয়ে বেয়ে চললাম। ভারী সুন্দর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা। একেবারে নদীর বুক থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে এর ভিত্তি। নামবার জন্য আছে ঘোরানো সিঁড়ি। চিনার-শোভিত বিশাল উদ্যানে ঘেরা এই বাড়ি পূর্বে মহারাজের প্রাসাদ ছিল। এরপর এল কাশ্মীরের দ্বিতীয় পুল হাব্বাকদল, পুণ্যশ্লোকা হাব্বার স্মৃতিতে। আমাদের দেশের মীরাবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া চলে। মীরার ভজনের মত হাব্বার গান লোকের মুখে মুখে।

এদিকটায় নদীর জল বড় নোংরা আর দুর্গন্ধময়। দুদিক থেকে এসে পড়ছে শ্রীনগরের যত নর্দমা এই ঝিলমের গর্ভে। নাকে রুমাল চেপে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে বাঁধানো নদীর ঘাটে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। বয়স্ক লোকেরা পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে জলে নেমেছে স্নান করতে। লজ্জার বালাই নেই। এদিকে সিঁড়িতে বসে কাশ্মীরী হিন্দু মেয়েরা কাপড় ধুচ্ছে, বাসন মাজছে।

তৃতীয় পুল ফতেহকদল আর চতুর্থ জয়নাকদল। এ দুইয়ের মাঝে আছে বিখ্যাত শা হামাদান মসজিদ ঝিলমের দক্ষিণ তীরে। কাঠের তৈরি অপূর্ব কারুকার্যশোভিত মন্দিরসদৃশ এই মসজিদ বিখ্যাত পারসীক ফকির মীর হামদানীর স্মৃতিতে। মুসলমান আর কোনও পীর বা ফকিরের এত উদার অন্তঃকরণ দেখা যায় নি। তাঁর মন্ত্র ছিল বসুধৈব কুটুম্বকম্। তিনি হিন্দুকে হিন্দু, মুসলমানকে মুসলমান বলে আলাদা করে মানেন নি। যে প্রকৃত মুসলমান সে হিন্দুকে ভালবাসবে শ্রদ্ধা করবে। হিন্দুর মূর্তিতে নেই কি ভগবান? ভগবান নেই কোথায়? তবে কেন এই হানাহানি? প্রেমের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা তিনি জয় করেছিলেন কাশ্মীরের হৃদয়।

তাঁরই মন্ত্রশিষ্য জয়নাল আবেদীন কাশ্মীরের নৃপতি। তাঁর অনুশাসনে কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমান ভেদ একেবারে মুছে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি সংসার-বিরাগী সাধু হয়ে গেলেন। দেশের লোক বলে ঋষি। আমাদের দেশের ঋষি জনকের মত। তাঁরই স্মৃতিতে মহিমান্বিত হয়ে আছে জয়নাকদল চতুর্থ পুল। বাঁ দিকে রঘুনাথ মন্দিরের কাছে শিকারা বেঁধে আমরা গেলাম একটি শালের কারখানা দেখতে। ঘাট থেকে পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে অনেকটা উপরে। ঘাটের সিঁড়িতে ও পাশে আবর্জনা আর নোংরা জিনিসের পাহাড়। এত দুর্গন্ধ যে এক মুহূর্তও থাকা যায় না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে এসে সবাই হাঁপাতে আরম্ভ করলাম। শ্রীনগরে নরক-দর্শনের আরও এক অধ্যায় আছে। যথাস্থানে তার বিবরণ পেশ করা যাবে। বকরীদের জন্য কারখানা বন্ধ থাকাতে দেখা হল না। কিন্তু বিক্রয়-বিভাগ থেকে কিছু কিনতেই হল। নিকটস্থ কয়েকটি দোকানীর টানাটানি এড়িয়ে শিকারায় ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আরও কয়েকটা পুল রয়ে গেল। আমরা আর দূরে না গিয়ে ফিরে চললাম। এবার স্রোত ঠেলে উজানে যেতে হবে। খোকা ও আন্ট মহা উৎসাহে দুটি ছোট ছোট হালকা দাঁড় নিয়ে মাঝিকে সাহায্য করতে লাগল অনভ্যস্ত অপটু হাতে। রাত্রি প্রায় নটায় বোটে ফিরে এলাম। শিকারার দক্ষিণা দিতে হল সাত টাকা।

সোনামার্গ

আজ আমাদের সোনামার্গ যাবার দিন। কাশ্মীর এসে অবধি যে যাযাবর বৃত্তি নিয়ে উল্কার মত উত্তর দক্ষিণে, পূর্ব পশ্চিমে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, আজই তার শেষ অধ্যায়। তারপর দুদিন বিশ্রাম করে আমাদের কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ।

সোনামার্গ শ্রীনগর থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে। সমুদ্রতট থেকে ন হাজার ফুট উঁচুতে। একই পর্বতের উত্তরে সোনামার্গ আর তার দক্ষিণেই অমরনাথ ও কোলাহাই গ্লেসিয়ার। কিন্তু অমরনাথ থেকে সোনামার্গ যাওয়া সহজ নয়। চিরতুষারাবৃত পাহাড়ের গায়ে পথের সন্ধান আছে, কিন্তু পথ নেই। তবুও অসমসাহসী কেউ কেউ এই ভীষণ দুর্গম পথেও পাড়ি দেন। এবার বাঙালী লেফটেন্যান্ট চ্যাটার্জির নেতৃত্বাধীনে একটি ভারতীয়

অভিযাত্রীদল এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তাঁরা পহলগাম থেকে ষোল হাজার ফুট বরফের পাহাড়কে অতিক্রম করে এসে পৌঁছেছেন সোনামার্গ কার্গিলের পথে। এই সোনামার্গ দিয়েই পথ গেছে কাশ্মীরের অন্যতম অংশ লাদ্দাকে। তার রাজধানী লেহ। কার্গিল হয়ে তুষারাবৃত জোজিলা গিরিপথকে অতিক্রম করে যেতে হয় সেখানে। তার পর রাস্তা চলে গেছে পশ্চিম তিব্বতে। লাদ্দাকের অধিবাসীরা বৌদ্ধ আর আচার-ব্যবহারে তিব্বতী। এই স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধদের নেতৃত্ব করছেন শ্রীকুশক বকুলা—আজকাল কাশ্মীর মন্ত্রীসভার একজন সদস্য।

১৮ই জুন। সকালে পর্যটক কেন্দ্র থেকে রওনা হওয়া গেল। সবাইকে পূর্বেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, রাস্তা দুর্গম, মাত্র সাতদিন হল যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতদিন প্রায় কুড়ি ফুট বরফের নীচে চাপা পড়ে ছিল সমস্ত সোনামার্গ আর তার রাস্তা। বাস আজ উলার থেকে ফেরার পথ ধরে ছুটে চলল। রাস্তার দু ধারে বহু পুরাতন বিশাল চিনারের সারি। গোড়াগুলোর ব্যাস হবে কুড়ি বা পঁচিশ ফুট কিন্তু ভিতরটা প্রায় সব ফাঁপা। আট-দশজন লোক এই ফাঁকের ভিতরে বেশ বসে থাকতে পারে। অথচ এত স্বল্প সহায়তায় কি করে যে দাঁড়িয়ে আছে বটবৃক্ষের চেয়েও বিরাট এই মহীরুহ তা ভেবে অবাক হতে হয়। গাছ যত পুরনো, তার গোড়ার বেড় তত বেশী আর তার ভিতরটা তত ফাঁপা। অথচ এ গাছের কাঠ মজবুত নয় একেবারে। একমাত্র জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহার ছাড়া আর কোন কদর নেই এর। যুদ্ধের সময় এর গুঁড়ির ফাঁকটা স্বাভাবিক পিল বাক্সের কাজ দেবে মনে হচ্ছে।

পথে পড়ল "গন্দববাল" হ্রদ পাহাড়ের মাথায়। সেখান থেকে মোটা পাইপ দিয়ে পাহাড়ের নীচের পাওয়ার হাউসে জল নিয়ে আসা হয়েছে। ঘোরানো হচ্ছে টারবাইন। ছ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। শ্রীনগরের বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে এখান থেকেই। আমরা ফেরার পথে নেমে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ভাল করে দেখে নিয়েছিলাম।

এখান থেকে রাস্তা ঘুরে গেছে পূর্ব দিকে। চিনারের চেয়ে পথের দু ধারে এখন দেখছি খোবানি আর আখরোটের ছোটবড় গাছের সারি। অল্প অল্প চড়াইও আরম্ভ হল। পথে অসংখ্য ভেড়া আর ছাগলের পাল দেখলাম। এখানকার মোটরচালকদের তারিফ না করে পারা যায় না। তারা গাড়ি থামিয়ে ভেড়া ছাগলের পথ ছেড়ে দিতে কখনও ভুল করে না। এরাই যে দেশের সম্পদ তা কাশ্মীরের সবাই ভাল ভাবে জানে ও বোঝে। মাঝে মাঝে পথের দু ধারে দেখছি প্রস্ফুটিত জংলী গোলাপের লতানো গাছের জঙ্গল। নানা রঙের ঝাড় ঝাড় গোলাপের ফুলে পথ শোভাময়, বাতাস মধুমদির। পাশে পাশে বয়ে চলেছে সিন্ধ্ (সিন্ধু নদ নয়) নদীর বিপুল জলধারা। পাথরে পাথরে নদীগর্ভ সমাচ্ছন্ন। এখানে নদীর বিস্তার খুব কিন্তু এই গ্রীষ্মকালে জল এখন স্বল্প বিস্তৃত গভীরতর অংশে প্রবাহিত হচ্ছে। ডান দিকের পাহাড় রুক্ষ ধূসর অথচ বাঁ দিকে ঘন বনানী ঢাকা শ্যামল পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের গায়ে পায়ে-চলা পথ ওপরে উঠে গেছে। শুনলাম সোদর তীর্থে যাবার রাস্তা। দশ হাজার ফুট উঁচুতে ভয়ানক দুর্গম পথের শেষে এই তীর্থ নাকি বিখ্যাত অমরনাথের চেয়েও পুরাতন।

সিন্ধের জল প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। উপলখণ্ডে ব্যাহত হয়ে তার শুভ্র ফেনরাশি সূর্যকিরণে হাসতে হাসতে নেচে চলেছে। দেওদার কাঠের পুলের ওপর দিয়ে নদী পার হলাম। উপত্যকায় চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ঘোড়া আর তাদের বাচ্চাগুলো, পহলগামের রাস্তায় লীডারের উপত্যকায়ও দেখেছি এই ঘোড়া। এই পাহাড়ী মুলুকে খচ্চর জাতীয় ঘোড়ার আদর ও কদর খুবই বেশী।

প্রায় দশটা নাগাদ বাস এসে থামল "কঙ্গনে"। এক পাশে পাহাড়ের নীচেই বয়ে যাচ্ছে সিন্ধ্ নদী। হঠাৎ আমাদের চমক লাগিয়ে ভীষণ শব্দ করে একটা এরোপ্লেন নদীর বুক ঘেঁষে উড়ে গেল। এখানে আছে সরকারী দপ্তরের অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, গোটাকয়েক দোকান ও রেস্তোরাঁ। কাশ্মীরে যেখানেই গেছি, এমন কি নগণ্য গ্রাম্য বাজারেও দেখেছি কাপড়ের দোকান আর তার পাশেই দরজি। অথচ এদের গায়ে পরিষ্কার নতুন জামা কখনও দেখি নি। শুনলাম এখানেই নাকি ছিল রাণী হাব্বার বাড়ি—যাঁর স্মৃতি আজও বহন করছে
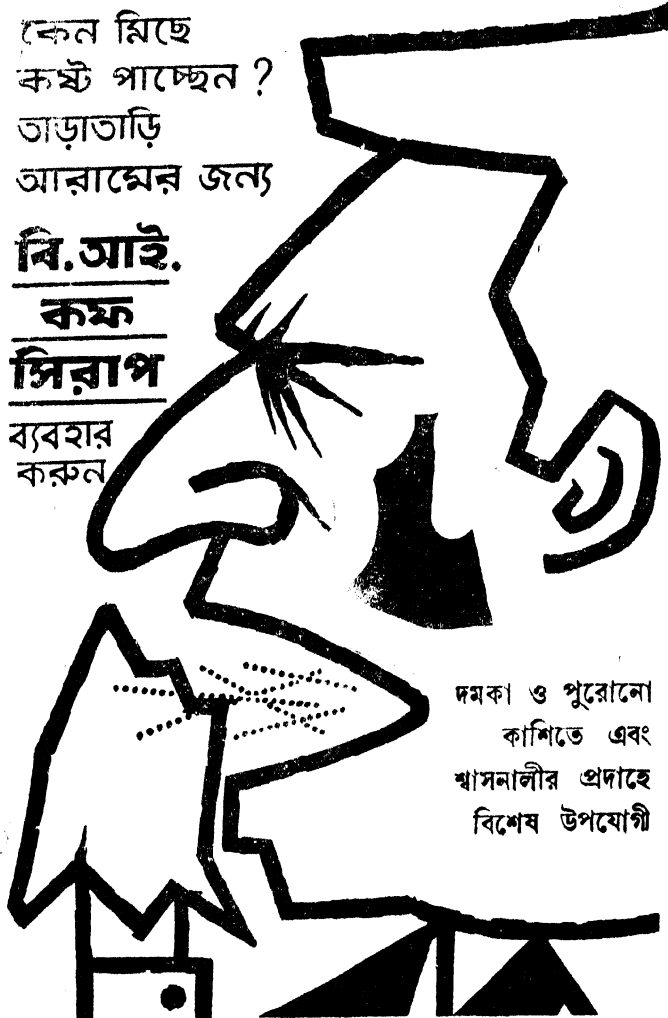
শ্রীনগরের ঝিলমের পুল। প্রায় আধঘণ্টা কসরত করে আমাদের পুরনো শেভ্রোলে বাসটা চালু করতে পারা গেল। আমি তো চিন্তিত হয়ে পড়লাম, দুর্গম পাহাড়ের রাস্তায় চলার এই কি উপযুক্ত বাহন! হঠাৎ যদি বিগড়ে যায় তা হলে তো ন যযৌ ন তস্থৌ।

নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। কিছুদূর অগ্রসর হতেই ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়গুলো কাছে আসতে লাগল। বাঁ দিকের পাহাড়ের চেয়ে ডান দিকের পাহাড়েই গাছপালার বাহার। দূরের পাহাড়ের চূড়ায় এখন বরফ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখছি পাহাড়ের গায়ে সামরিক ঘাঁটি। সমস্ত রাস্তাটা সুরক্ষিত। বেলা প্রায় এগারোটায় বাস এসে থামল "গুণ্ড"তে। রীতিমত ক্যান্টনমেণ্ট। এখান থেকে পনের মাইল ভয়ানক চড়াই ভেঙে যেতে হবে। পথ কাঁচা আর অত্যন্ত সংকীর্ণ, একমুখো পথ। যাবার সময় দেখলুম পথচারীকেও রাস্তার নীচে নেমে দাঁড়িয়ে বাস যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর তার পায়ের নীচেই খদের গর্ভে সিন্ধ্ নদীর প্রবল আস্ফালন। আমরা বরফের রাজ্যে এসে গেছি। দু ধারে পাহাড়ের গায়ে দেখছি হিমানী-প্রবাহ। এক একটা বিরাট জমাট বরফ পর্বতের শিখর থেকে একেবারে সিন্ধ্ নদীর বুকে এসে পড়েছে। চারিদিকের শ্যামল বনানীর অঙ্গে যেন এক শুভ্র উত্তরীয়। নদীর ধারে বরফের পাড় বড় অদ্ভুত দেখতে। মনে হয় যেন একটা বড় চামচ দিয়ে বরফটা কুরে কুরে রাখা হয়েছে। এখানে বরফের রঙ ময়লা ময়লা, তাতে আবার একটু নীলাভ সবুজ আভাও আছে। সেই সব জমাট বরফের নীচে দিয়ে প্রবলবেগে বরফ-গলা জল এসে পড়ছে সিন্ধ্ নদীর উদ্বেল জলরাশিতে তার কলেবরকে আরও স্ফীত করে। বাস চলেছে বরফ কেটে যে রাস্তা করা হয়েছে তার ভিতর দিয়ে। ডাইনে-বাঁয়ে বরফের দেয়াল। খোকা তো বাসে বসেই হাত বাড়িয়ে বরফ ভাঙতে লাগল। ভীষণ কনকনে হাওয়ায় ভরা, বরফের দেয়াল ঘেরা, স্বল্পপরিসর পিছল পথে গাড়ি ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল।

এখানে সূর্যের কিরণে আলো আছে, নেই তার উত্তাপ। তাই পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত ছায়াঘন অংশে বরফ থাকে চিরদিন। যেখানে বরফ গলে গেছে সেখানটায় গাছপালা কী অদ্ভুত সুন্দর গাঢ় সবুজ। পর্বতের শিখরে শিখরে শুভ্র বরফের সমারোহ। উত্তুঙ্গ পাহাড়ের গায়ে কোথাও ঘন সবুজ বনানীর শোভা, কোথাও বা শুভ্র বিরাট তুষার-চত্বরের প্রাণহীন নিস্পন্দ সৌন্দর্য, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের লীলাচঞ্চল ক্রীড়াকৌতুক। প্রকৃতির হাতে গড়া এই অপূর্ব অদেখা দৃশ্য আমাদের পথের ভয়কে ভুলিয়ে দিল। সঙ্কীর্ণ পথে কখন যে বাস খদের পাশে পা পিছলে যেতে যেতে রয়ে গেছে, কখন যে মারাত্মক তীব্র বাঁকের মুখে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে সব আর লক্ষ্যই করি নি। দুরতিক্রম্য, দুর্গম, দুরূহ পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের সকল সন্দেহ আশঙ্কাকে দূর করে বাস নেমে এল সোনামার্গের সমতলভূমিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে বাড়িঘর, লোকজন, আমাদের সঙ্গের আর অন্য বাসগুলোকে। বাস এসে থামল টুরিস্ট দপ্তরের সামনে। ন হাজার ফুট উঠে এসেছি।

এখানে দোকানপাট বেশী নেই। রাস্তার নীচে একটি লম্বা চালাঘরের মত ঘর। তারই খুপরিতে খুপরিতে আছে অতিসাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। এখান থেকে গম নুন কাপড় আরও সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইয়াক আর ঘোড়ার পিঠে যায় লাদ্দাকের বাজারে। জুনের শেষে মাত্র দু-তিন মাস একটা ছোট বাসও যায় কার্গিল পর্যন্ত। তারপর এ পথের অগতির গতি ওই ইয়াক আর ঘোড়া—তাও তিব্বতী ঘোড়া ছাড়া আমাদের সাধারণ ঘোড়া ও-পথে চলতে পারে না। ছোট বাজারের আঙিনায় সব জিনিসপত্র জমা হচ্ছে। সব লাদ্দাক যাবে। আজকাল সামরিক প্রয়োজনে রাজধানী লেহতে একটি ছোট বিমান অবতরণের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে—অঘটন ঘটলে লাদ্দাকবাসীদের প্রাণধারণের জিনিসপত্রও এই পথে সরবরাহ করা হয়।

এখান থেকে অনেকেই গেলেন সিন্ধ্ নদীর উৎসের সন্ধানে। আমরা পরিশ্রান্ত। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট হিমানী-চত্বরের সামনে এসে সবাই বসলাম। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল শুভ্র ফেনায় ফেনায়িত হয়ে ছুটে চলেছে। নদীর ওপারের পাহাড়—রুক্ষ, বৃক্ষলতাহীন। নদীর বুক থেকে উঠে গেছে একেবারে খাড়া তির্যক্-ভঙ্গীতে। এপারের পাহাড়টা ঢালু দেওদার ও

পাইনের ছায়ায় স্নিগ্ধ আর শোভাময়। আমরা নদীর হিমশীতল জলে হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে সেই পাইনের জঙ্গলের ধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে শরীরকে এলিয়ে দিলাম। তখন মধ্যাহ্ন—কিন্তু সূর্যের কিরণ কি স্নিগ্ধ ও শান্ত। চারিদিক আলোয় আলোময়। নীল চন্দ্রাতপের নীচে শুভ্র বরফে পড়েছে সূর্যালোক—এত উজ্জ্বল যে তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

আমরা খুব উঁচুতে এসে বসেছি। সমস্ত সোনামার্গ পায়ের নীচে ছড়িয়ে। দূরে পাহাড়ের গায়ে রিবনের মত দেখাচ্ছে লাদ্দাকের রাস্তা—তরঙ্গ-সঙ্কুল সিন্ধুকে দেখাচ্ছে শীর্ণকায়া ক্ষীণ স্রোতস্বতী। বাড়ি-ঘর সবই কেমন ছোট ছোট দেখাচ্ছে। খেলাঘরের ছোঁয়াচ লাগা সৌন্দর্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি খোকা ক্যামেরা নিয়ে পাহাড় থেকে দৌড়ে নামছে—পিছনে পিছনে আণ্টুও চলেছে। ওদের মাও শেষে ওদের অনুসরণ করলেন—পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়বে এই ভয়ে। কিছুক্ষণ পরে সবাই ফিরে এলেন। খোকা একটা ইয়াকের ফোটো নিয়ে এল। দেখতে মোষের মত—গরুর মত শিং আর ঘোড়ার মত লেজ। আমরা যে তিব্বতের পথে এসে গেছি।

একটু পরেই চারিদিক মেঘে ছেয়ে গেল—বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু হল। আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নীচে নেমে চা দিতে বলে যখন বাইরে এসে বসলাম তখন মেঘ আমাদের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সব অস্পষ্ট হয়ে আসে, আবার মেঘ চলে গেলেই সব পরিষ্কার। চা এসে গেল। চা-পান শেষ করতে না করতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। আর যা শীত! গরম কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে বাসের সব কাঁচ উঠিয়ে দিয়ে তার ভেতর বসে রইলাম। মাঝখানে একবার নেমে পানের সন্ধান করলাম, পান এখানে পাওয়া যায় না। তোমার মা চা-পানের পর পান না পেয়ে অপ্রসন্নমুখে বসে রইলেন। একটু পরেই বাস ছেড়ে দিল।

আবার সেই বরফের রাজ্য পার হয়ে গাড়ি এসে থামল কঙ্গনে। এখানে একটা রেস্তোরাঁতে আমরা চা খেলাম। এখানেও পান পাওয়া গেল না। এবার পানের ব্যবস্থা ঠিক করে না আনাতে আনন্দটা যেন একটু বিস্বাদ মনে হতে লাগল। গুলমার্গেও পান পাওয়া যায়—পহলগামের পথেও পেয়েছি। এদিকে যে একেবারে পাওয়া যাবে না তা কে জানত। পথে গন্দরবালে বিজলীঘর দেখে সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন।

নানা কথা

কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ হয়ে এল। দুদিন পর ফিরে যাব আবার সেই পুরাতন কর্ম-কোলাহলে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কাশ্মীর দর্শনের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন সফলের আনন্দে মন আমাদের ভরপুর। সংসারের ধূলি-মলিন জীর্ণ দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকবে এই মধুর দিনগুলির স্মৃতি। অনাগত ভবিষ্যতে "মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ দূর স্বপ্নসম"।

জাম্মু আর কাশ্মীর মিলে কাশ্মীর। তার সঙ্গে আছে লাদ্দাক ও গিল্‌গিটের পার্বত্য মালভূমি। সবটা মিলে ভারতের মাথায় মুকুটের মত। শুধু যে শীর্ষদেশে তাই নয়, মানচিত্রে এর গঠনও মুকুটের সঙ্গে বেশ মেলে। আশ্চর্য এই দেশ—জাম্মুতে প্রায় সব হিন্দু, কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় সব মুসলমান আর লাদ্দাকে সব বৌদ্ধ। ত্রি ধর্মের এমন ঘনিষ্ঠ ও পৃথক সমন্বয় নেই পৃথিবীর আর কোথাও।

দেশটার ভৌগোলিক ভাগও এইরূপ। জাম্মুর বিস্তৃত মাঠ, কাশ্মীর উপত্যকার বিস্তৃত জলাভূমি আর লাদ্দাক গিল্‌গিটের পার্বত্য মালভূমি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা অভ্রংলিহ হিমালয়, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ এই কাশ্মীরের মুকুটের চূড়ার মত শোভা করে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালাই যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রাচীরের মতই বহুলাংশে আড়াল করে রেখেছে এশিয়ার নব নব জাতির অভ্যুদয় ও পতনের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে।

এশিয়া মহাদেশে থেকেও আমরা যেন সম্পূর্ণ আলাদা এক জাতি। দক্ষিণে সুনীল সিন্ধু, উত্তরে বিশালকায় উত্তুঙ্গ গিরিরাজি আর পূর্বে ও পশ্চিমে তারই শাখা-প্রশাখা একেবারে পৃথক করে রেখেছে আমাদের আকারকে, চরিত্রকে, সংস্কৃতিকে, জ্ঞানকে, ধর্মকে এমন কি বুদ্ধিকেও। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল আছে

নিশ্চয়ই কিন্তু সংস্কারের গভীর মূলে আমরা একেবারে পৃথক—মিল নেই এশিয়ার আর কারও সঙ্গে।

সোনামার্গ থেকে রাস্তা লাদ্দাক হয়ে গেছে পশ্চিম তিব্বতে। এ পথে লাদ্দাকী বৌদ্ধরা তিব্বতে যায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। ভুটিয়ারা আসে তাদের ক্ষুদ্র পণ্যসম্ভারের বিনিময়ে নুন, কাপড়, গম নিয়ে যেতে। কিন্তু মধ্য এশিয়া ও চীনের সঙ্গে সংযোগ আছে গিল্‌গিটের দুর্গম পথে—যে পথে এসেছিলেন পরিব্রাজক হুয়েনসাং বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানের অনুশীলন করতে দু হাজার বৎসর পূর্বে। আবার সেদিন সেই বহু পুরাতন পথে ভারতের মৈত্রী আর পঞ্চশীলের বার্তা বহন করে নিয়ে গেলেন কনফুসিয়াসের দেশে আমাদের স্বাধীন ভারতের রাজদূত মেনন। গিল্‌গিটের দুরারোহ পার্বত্য পথে, সিন্ধু নদের চামড়ার ভেলায়—পামিরের জনশূন্য উত্তুঙ্গ মালভূমিতে জনবিরল সিংকিয়াংয়ের বিজন পথে—ভীষণ দুর্গম "টাকলা মাকান" মরুভূমির নিষ্ঠুর বালুর বুকে এঁকে গেলেন আজকের ভারতের প্রেমের অমর বাণী।

১৯৪৭ সন ১৫ই আগস্ট। আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ইংরেজ গিয়েছে চলে। সমস্ত ব্রিটিশ-ভারত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। দেশীয় নৃপতিরা তখনও মন ঠিক করতে পারেন নি কার গলায় বরমাল্য দেবেন। জিন্নার বড় ভাবনা হায়দ্রাবাদে মুসলমান বাদশা কিন্তু প্রজা সব হিন্দু। কাশ্মীরে হিন্দু নৃপতি কিন্তু প্রজা বেশীর ভাগ মুসলমান। হায়দ্রাবাদে হাত দিতে সাহস হল না মহম্মদ আলী জিন্নার। নজর দিলেন তাই কাশ্মীরের দিকে। কাশ্মীরের সঙ্গে তখন ভারতের ভৌগোলিক সম্পর্ক ক্ষীণ। কাশ্মীরের অস্তিত্বই নির্ভর করে পাকিস্তান সরকারের মর্জির ওপর। তাই কূটবুদ্ধি জিন্না লেলিয়ে দিলেন পার্বত্য আফ্রিদি ওয়াজীরিদের। নেপথ্য থেকে সাহায্য করল পাকিস্তান বাহিনী। বারামুলাকে পুড়িয়ে ঝিলমের ধারে ধারে তারা ধ্বংসের পতাকা উড়িয়ে চলল শ্রীনগরের অভিমুখে। মহারাজার মুষ্টিমেয় পঙ্গু সৈন্য করতে পারল না তাদের গতিরোধ। উপায়ান্তর না দেখে মহারাজা হরি সিং সম্মতি-পত্রে সই করলেন ভারতের পক্ষে। রাস্তা নেই। তখনও পাঠান-কোট বানিহাল শ্রীনগরের পথ আধুনিক সামরিক যন্ত্র-সম্ভার চলাচলের উপযুক্ত নয়। তাই আকাশে উড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ। নিয়ে এল তারা সৈন্য, মোটর, জীপ, কামান। বাধা পেল অসভ্য আফ্রিদী বাহিনী। শ্রীনগর রক্ষা পেল। আস্তে আস্তে হটে গিয়ে তারা বারামুলার স্বল্পপরিসর পাহাড়ী পথে ঘাঁটি করে বসে রইল। পিছনে আছে পাকিস্তানের সুশিক্ষিত প্রবল বাহিনী। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম সামরিক সংঘাতের পুরোধা ছিলেন একজন বাঙালী-ব্রিগেডিয়ার সেন। পাকিস্তানের প্রসারিত বাহু থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুকুটহীন ভারতের শিরে পরিয়ে দিলেন কাশ্মীরের বিজয়-মুকুট।

আদিম কাশ্মীরী কারা? এই প্রশ্নটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ কথা বললে ভুল হবে না যে আর্য জাতি মধ্য-এসিয়া থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পার হয়ে খাইবারের পথে এসে সিন্ধুনদের তীর সামগানে মুখরিত করেছিলেন, তাঁদেরই এক শাখা ঝিলমের ধারে ধারে বারামুলার পথে এসেছিলেন কাশ্মীরে। কিন্তু আজও উত্তর-ভারতের আর্য-অধিবাসী এবং পূর্ব-ভারতের আর্য ও মঙ্গোল আর দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় ও আর্য-রক্তের সংমিশ্রণের ফলে যে জাতিগত আকৃতিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায় সে রকম আকৃতিগত পার্থক্য কাশ্মীরীদের ভেতর কোথাও নজরে পড়ল না। মুষ্টিমেয় যাযাবর গুজ্জর জাতিকে বাদ দিলে কাশ্মীর উপত্যকার জনসাধারণ সবাই প্রায় একই রকম দেখতে—তা হোক না সে হিন্দু বা মুসলমান।

আর্যদের ভারত আগমনে দ্রাবিড়গণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াসে যেমন বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ-ভারতে চলে গিয়েছিলেন তেমনি আদিম কাশ্মীরীরা কি সোনামার্গের পাহাড় ডিঙিয়ে লাদ্দাকের দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন? এই ঊষর দুর্গম পার্বত্য মালভূমি বোধ হয় কোন কালেই আর্যদের প্রলুব্ধ করে নি। তাই এরা হয়ে রইল একেবারে অজ্ঞাত অনাদৃত। বাইরের সঙ্গে এই আদিম কাশ্মীরীদের সংযোগ হল বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে এসে আর্যদের আগমনের প্রায় চার হাজার বৎসর পরে। তখন কাশ্মীর উপত্যকার আর্য-অধিবাসী আর লাদ্দাকের

আদিম কাশ্মীরীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত। সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনায় শিক্ষা দীক্ষায় আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যতায় কাশ্মীরী আর্যরা এগিয়ে গেছেন বহু দূর। এঁদের সঙ্গে আর মিলন সম্ভব হল না তাদের যারা স্থাণুর মতন রয়ে গেল—সেই পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে এই আদিম কাশ্মীরী।

সম্রাট অশোকের রাজ্য কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—ছোটবেলায় পড়েছি। কিন্তু আশ্চর্য মনে হয় তাঁর কোনও স্তম্ভ নেই এই কাশ্মীর উপত্যকায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীর জয় করেন কণিষ্ক। তিনি এখানে এক মহতী বৌদ্ধ সভার আহ্বান করেন, ইতিহাসের আরম্ভ এখান থেকেই। হুয়েন সাং এর প্রায় পাঁচশ বছর পরে ভারত আগমনের পথে গিল্‌গিট হয়ে কাশ্মীরে আসেন, তাঁর লেখাতে আছে কিছু কাশ্মীরের বিবরণ। পৌরাণিক কাশ্মীরের ইতিহাসের মালমসলা আছে 'রাজ তরঙ্গিণী'তে—কহ্লণের লেখা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা ললিতাদিত্যের প্রশস্তি গাইতে গাইতে তিনি গোটা কাশ্মীরের ইতিহাসকে ছন্দে গেঁথে গেছেন হিন্দু রাজা এখানে টিকে ছিল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর-নৃপতি তিব্বতী রিণছন শেষ পর্যন্ত মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও মুসলমান রাজা মেনে নেয় নি কাশ্মীরের জনসাধারণ। তারা রিণছনের মৃত্যুর পর বিদ্রোহ করে উদয়ন দেবকে রাজা করে। এই উদয়নই কাশ্মীরের প্রথম পর্বের শেষ হিন্দু রাজা। এর পর এল পাঠান অত্যাচারী সিকন্দরের আদেশ "কাশ্মীরের সব হিন্দু হত্যা কর।" উপায়ান্তর না দেখে সমস্ত হিন্দু এক দিন মুসলমান হয়ে গেল। এই শোচনীয় অধ্যায়ের কিছুটা সংশোধন হল জয়নাল আবেদীনের শাসনকালে। তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। তাঁর আদেশে হিন্দুত্বের পুনরুদ্ভব সম্ভব হল। রক্ষা পেল তাদের ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতি। কাশ্মীর উপত্যকার মুষ্টিমেয় হিন্দু আজও সেই দুঃস্বপ্নকে মনে করিয়ে দেয়, কেন যে আজ উপত্যকার মুসলমান শতকরা নব্বই জন আর হিন্দু মাত্র দশ জন! কিন্তু জয়নালের আবেদন ব্যর্থ হয় নি। কাশ্মীরে হিন্দু

মুসলমান ভাই ভাই। সমগ্র ভারত যখন জিন্নার দ্বিজাতি নীতিতে তিক্ত—পরস্পর পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরছে তখনও একমাত্র কাশ্মীরেই হিন্দু মুসলমান গলাগলি ধরে গেয়েছেন একতার প্রেমের গান।

পাঠানের পিছনে পিছনে এল মোগল, সেই পুরাতন পথে, বারামুলার পাহাড়ের স্বল্পপরিসর ফাঁকের ভিতর দিয়ে—বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আওরঙ্গজেব—কাশ্মীরে নেমে এল শান্তির স্বর্ণযুগ। বর্তমান কাশ্মীরের গোড়াপত্তন হল সৌন্দর্যপিপাসু মোগল-বাদশাহের বিলাসী-মনের স্নেহচ্ছায়ায়। এল পারস্য থেকে কার্পেটের নতুন ঢঙের কারিগর, এল শালের সূক্ষ্ম কলা-বিশারদ শালকর। উন্নতরুচি মোগলদের শখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাগল বিচিত্রতর কাঠের কাজ আর সোনা-রূপার কারুশিল্প। আজ যে সুদৃশ্য বিশাল চিনারে কাশ্মীর ছেয়ে আছে তাকেও নিয়ে আসেন আকবর। অস্তমিত মোগল-সূর্যের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে আবার এল পাঠান—ওই বারামুলার পথে—এল শিখ, এল ডোগরা, শেষে এল ইংরেজ। এই পাহাড়ে ঘেরা স্বল্পপরিসর উপত্যকার অল্পসংখ্যক মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় এত দ্রুত লয়ে ঘটতে লাগল যে কাশ্মীরীরা আর নিজেদের কাশ্মীরী বলেই মনে করতে পারে না। এ যে তাদের দেশ এ কথা তারা ভুলে গেল, ভুলে গেল তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্য। বার বার বিদেশীর পদানত হয়ে, তাদের খেয়াল-খুশিকে শিরোধার্য করে কাশ্মীরী হয়ে দাঁড়িয়েছে ভীরু কাপুরুষ—"Kashmiris are what their Rules have made them."

ভারতের ইতিহাসে খাইবারের সঙ্কট যদি বা মুছে গিয়ে থাকে কাশ্মীরের ইতিহাসে বারামুলার পাহাড়ী পথের ইতিহাস এখনও শেষ হয় নি। বিগত দু হাজার বৎসরের নাটকের পুনরভিনয় হল ১৯৪৭ সনে, আফ্রিদীদের বারামুলার পথে কাশ্মীর অভিযানে। তার পর কোন্ দিন যে পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই বারামুলার পথে সে কাহিনী এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, অনিশ্চিত কিন্তু অসম্ভব নয়।

* * *

শেখ্ মহম্মদ আবদুল্লা শের-ই-কাশ্মীর। গত ৩০ বৎসরের বর্তমান কাশ্মীরের ইতিহাস এঁকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত। লাহোরে প্রাথমিক শিক্ষা, আলীগড়ের পালিশ দেওয়া কূটনৈতিক মুসলমান। শিক্ষকতা ছেড়ে নামেন পলিটিক্সে। রাজপুত ডোগ্‌রাবংশীয় কাশ্মীর নৃপতি মহারাজ হরি সিংয়ের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের মূলে এই সেখ সাহেব। কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের সর্বাধিনায়করূপে জনসাধারণকে একত্রিত করে বাধা দেন ১৯৪৭ সনের অসভ্য আফ্রিদী লুণ্ঠনকারীদের। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর ইনিই হন কাশ্মীরের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী, আর এঁরই দাবিতে মহারাজা হরি সিংয়ের সিংহাসন ত্যাগ করে নির্বাসন যাত্রা। কাশ্মীরের সমস্ত ক্ষমতা হাতে পেয়ে ইনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বিপক্ষে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন নানা বিদেশীয়দের চক্রান্তে। কাশ্মীরকে সুইজারল্যাণ্ডের মত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করব এই হল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা। কাশ্মীর রবে না ভারতের সঙ্গে, রবে না পাকিস্তানের সঙ্গে। এই কূট রাজনৈতিক খেলার প্রথম শহীদ আমাদের নয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শ্রীনগরে ডাল হ্রদের তীরে বন্দীগৃহে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আজও রহস্যতিমিরে আবৃত।

শেখ্ আবদুল্লার স্বপ্ন সফল হল না। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ—শুধু আজ নয়, সৃষ্টির আদিকাল থেকে। এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ভারতের সহিষ্ণুতার আর উদারতার সুযোগ নিয়ে যারা ভারতের বুকে ছুরি বসাতে চায়, তাদের কখনও সহ্য করবে না ভারত। তাই কাশ্মীরের সর্বজনমান্য, জনগণ অধিনায়ক, পণ্ডিত জওহর-লালের অন্তরঙ্গ বন্ধু, যার অঙ্গুলিহেলনে একদিন কাশ্মীরের মুকুট ধূলায় লুটিয়ে পড়েছিল সেই "কাশ্মীরের বাঘ" আজ বন্দীশালায় পিঞ্জরাবদ্ধ। কালস্য কুটিলা গতি।

* * *

মন্দিরময় ভারতকেই আমরা জানি কিন্তু কাশ্মীরে এসে দেখলাম কাশ্মীরও মন্দিরময়। বহু পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সঙ্গে টিকে আছে আবার অনেক মন্দির কালের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে। হবে না কেন, সবই যে মহা-

কালের মন্দির। শিবমন্দির ছাড়া মন্দির নেই কাশ্মীরে। বহু পুরাতন মার্তণ্ডের সূর্যমন্দির, ক্ষীরভবানী মন্দিরের দুর্গাপীঠ আর শ্রীনগরের রঘুনাথ মন্দির ছাড়া প্রায় সবই শৈবমন্দির। কাশ্মীরী হিন্দুরা শৈব কিন্তু বাংলা আসামের মত বীরাচারী শৈব নয়, তাদের শিব শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্। মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল শিবলিঙ্গ, মহাদেবের যোগাবস্থার একাগ্রতার ইঙ্গিত—যেমন বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা থাকে স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দ। এ শৈবাচারে নেই জাতিভেদ, নেই অস্পৃশ্যতা। এ একপ্রকার একেশ্বর-বাদ—সর্বজীবে সমদর্শন।

আশ্চর্য মনে হয় যে কাশ্মীরের আর্যরা তাঁদের বৈদিক বহু দেবতার পূজা আর তার আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করে কি মোহে এই আদিম ভারতীয় শৈবাচারকে তাঁদের একমাত্র আস্তিক ধর্ম বলে মেনে নিলেন। এর জন্য দায়ী মনে হয় পাহাড়-ঘেরা কাশ্মীর উপত্যকার ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য। সমস্ত ভারত যখন বৈদিক ধর্মের অনুশীলনে, দর্শনে, উপনিষদে জ্ঞানের চর্চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত তখনও কাশ্মীর শৈবপূজার মোহনিদ্রায় অভিভূত। সম্রাট অশোক, কণিষ্কের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে কাশ্মীরীরা রয়ে গেল শৈবাচারী হিন্দু। বৌদ্ধ কোনও নৃপতির উল্লেখ পাই না কাশ্মীরের ইতিহাসে। যদিও হিন্দুরাজা অশোক বসেছিলেন কাশ্মীরের সিংহাসনে, কাশ্মীর-নৃপতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও কাশ্মীরীরা মেনে নেয় নি মুসলমান ধর্মকে। তারপর একদিন পাঠান-নৃপতির অমানুষিক অত্যাচারে কাশ্মীর উপত্যকার সমস্ত হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু অন্তরলোকে তো তারা মুসলমান হয় নি, তাই তাদের আচার-ব্যবহারে রয়ে গেল হিন্দুত্বের প্রবল ছাপ। জয়নাল আবেদীনের উদার নীতিতে হাত মেলালেন সুফী বীর শা হামাদান। এঁদের প্রেমের মন্ত্রে হিন্দু মুসলমান আর পৃথক নয়। দুজনেই দুজনকে মিলে এক। সমস্ত ভারতে যা কখনও সম্ভব হয় নি, কেউ কখনও কল্পনা করে নি তাই দেখছি কাশ্মীরে এসে। এখানে হিন্দুদের মন্দির আর মুসলমানের মসজিদ একই চত্বরে। আবার বৌদ্ধদের স্তূপও আছে তার মধ্যে কোথাও কোথাও। কাশ্মীর হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধদের মিলন-ক্ষেত্র।

* * *

কাশ্মীরে সবচেয়ে সুন্দর কি লাগল? এই প্রশ্নটা প্রায় সকলের মুখে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য ভরা কাশ্মীরের সবই সুন্দর, সবাই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান্—কেউ ফেল্না নয়। কিন্তু কাশ্মীরী ললনার সৌন্দর্য এ মর্ত্ত-ভূমিতে দুর্লভ। আফগান, পারসীক, ইরান, তুরানী, ইউরোপীয়ানদের উদ্ধত শুভ্রতা লালিত্যহীন। নেই তাতে কোমলতা কমনীয়তা। তাই কাশ্মীরী রমণী-কুলের সৌন্দর্য বিশ্ববিশ্রুত। শিশিরস্নাত শুভ্র গোলাপের উপর প্রথম সূর্যকিরণের আলোকসম্পাতের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে তাদের নম্র শুভ্র মুখের শান্ত সলজ্জ আভাকে। কালিদাস মেঘদূতে যে "তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠি" বর্ণনা দিয়েছেন তা একমাত্র কাশ্মীরী ললনাকুলেই সম্ভব। এখানে উপমা কালিদাসস্য নয়। খাঁটি বাস্তব। কৈলাস পর্বতের বর্তমান যক্ষিণীদের দেখলে আর সংশয় থাকে না যে কালিদাস কাদের বর্ণনা করেছেন তাঁর অনবদ্য লেখনীতে। আর একটা আশ্চর্য এই যে হিন্দু রমণীর চাইতে মুসলমান রমণীদের আকৃতি, গড়ন অনেক সুন্দর। কাশ্মীরের হিন্দু রমণীগণ সুন্দরী সন্দেহ নেই কিন্তু নেই সেই মুখাবয়বের হালকা গড়ন। তাঁরা দেখতে যেন একটু squat, বেঁটে, চওড়া, মোটা। কালিদাসের বর্ণনাকে টেক্কা দিয়েছে কাশ্মীরের মুসলমান রমণী—দারিদ্র্যের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে ফুটে বেরিয়েছে তাদের অসামান্য রূপলাবণ্য—পঙ্কেই পদ্মফুল ফোটে।

[ক্রমশঃ]

"বাংলার মাটি, বাংলার জলে"র কবি রবীন্দ্রনাথ

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখনও পঁচিশ হয় নাই, নগেন্দ্রনাথ চব্বিশ বর্ষীয় যুবক। ১৮৮৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি রচনায় তিনি বলিলেন :

"যিনি যাহাই বলুন এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ছন্দগ্রথিত। কাব্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া যে কথা আমাদের হৃদয়ে আজিও প্রবেশ করিতেছে তাহা কবির কথা। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাসকে ছাড়িলে আমরা নিতান্তই দরিদ্র হইয়া পড়ি, হোমর সেক্সপীয়রকে ছাড়িলে ইয়োরোপের ঐশ্বর্য অল্পই অবশিষ্ট থাকে। জগতের এই যে মহাসঙ্গীত, এই যে কাল-বিজয়ী গান, ইহাতে বাঙ্গালী কখন যোগ দিতে পারিবে কি? এমন কথা কখন কি বাঙ্গালীর মুখ দিয়া বাহির হইবে যে সেই কথা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য জগতের অন্যান্য-জাতি কাড়াকাড়ি করিবে?

মহাকবি কখন জন্মগ্রহণ করেন, মহাবাক্য কখন উচ্চারিত হয়? মনুষ্য জাতি সমুদ্র বিশেষ। সেই সমুদ্র মথিত হইলে তবে তাহা হইতে অমৃত উঠে। মনুষ্য সমাজ এইরূপ অনেকবার মথিত হইয়াছে, অনেকবার অমৃত উঠিয়াছে। অনেক মানুষের হইয়া যখন একজনে কথা কয়, অনেক মানুষকে শুনাইবার জন্য যখন একজন কোন সংবাদ লইয়া আসে, তখন সেই কথা অমৃততুল্য, সেই কথার বিনাশ নাই। বহু দুঃখে কিম্বা বহু সুখে বহু দিন পরে এমন বাক্য নির্গত হয়। বাঙ্গালী কি এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে তাহার আকুল হৃদয় মথিত হইয়া অমৃত-মণ্ডিত কোন সঙ্গীত বাহির হইয়া পড়িবে?

*　　*　　*

বাঙ্গালীর কি এখনো কিছু হয় নাই?...বহু দূরে বসিয়া [করাচী] সতৃষ্ণ নয়নে স্বদেশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। দেখিতেছি চারিদিকে কোলাহল, চারিদিকে আন্দোলন,—সমুদ্র চঞ্চল হইয়াছে। নানা দিক হইতে নানা রকমের স্রোত আসিয়া মিশিতেছে, অসংখ্য লোকে স্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। অসংখ্য লোকে আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে, কতক লোকে স্রোতের সঙ্গে যুঝিতেছে।...দুঃখ অভাব চারিদিকে। চারিদিকে লোকের কষ্ট বাড়িতেছে, অন্ন দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, লোকে আকুল হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্রমন্থন বুঝি বা আরম্ভ হয়।

এখন যাহা হইতেছে তাহা থাকিবে না।...বাঙ্গালী একা থাকিয়া কিছু করিতে পারিত না। ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরাইয়াছে। তাহার মুখের ভাব আর এক রকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙ্গালীর গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিঁকিবে। ভারতবর্ষের এত দুর্দশা হইলেও একতা একেবারে কখন নষ্ট হয় নাই। আচার ব্যবহার বেশভূষায় হাজার প্রভেদ থাকিলেও প্রাণের ভিতর একটা মিল আছে। এই বহু জাতির হৃদয় অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া যে গান গাইবে, তাহা বঙ্গদেশেই গীত হইবে। সেই আমাদের গান।

আমরা তবে কি করিতেছি? আমরা সিংহাসন রচনা করিতেছি। বাঙ্গালীর কবি সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিবেন। আমাদের মাথায় পা রাখিয়া তিনি যে গান গাহিবেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই গান ধ্বনিত হইবে।..."

ইহার পরেই যুবক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত (১৮৯১) তাঁহার "নিও-রোমান্টিক মুভমেন্ট ইন বেঙ্গলি লিটারেচার" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে

ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে উচ্চ আসনে স্থাপন করিয়া বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতে নবযুগের পুরোধা। ১৯০০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে ঘোষণা করিলেন, "If ever the Bengali language is studied by foriegners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet." ব্রহ্মবান্ধবের প্রবন্ধের শিরোনামা "The World-Poet of Bengal," "বঙ্গের বিশ্বকবি।" ঠিক ছয় মাসের মধ্যে ১৯০১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিলেন—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শতকোটি কর হানিছে।"

বিশ্বভুবনের পথে বাংলার কবির জয়যাত্রা সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে বিশ্বসাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে তাঁহার অধিষ্ঠানের সেই ইতিহাস সর্বজনবিদিত। বাংলার মাটি ও জল, বঙ্গোপসাগরের তমালতালীবনরাজি-নীল তটরেখা বিশ্বকবির পুষ্পক-যাত্রায় ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। শুধু ত্রিভুবন বিজয়ের সংগ্রাম-অবকাশে স্মৃতিপথে বাংলার মাটি ও জলের স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়া ফিরিতে লাগিল। 'জীবনস্মৃতি'তে তাহার পরিচয় আছে। এই পরিচয় 'চিত্রা'র "দিনশেষে" কবিতায় বাংলার মাটি ও জলের "এসেন্স"-স্বরূপ সুরভি বিস্তার করিতেছে—

"ভালো নাহি লাগে আর
আসা যাওয়া বারবার
বহু দূর দুয়াশার প্রবাসে
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে
কাননে প্রাসাদ চূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥"

মাথা রাখিবার ঠাঁই বারবার হারাইয়াছে এবং কবি বারবার খুঁজিয়া পাইয়াছেন। হারাইবার জন্য অনুতাপও অন্তরের অন্তস্তলে আছে, ১৯২২ সনের ৭ই মার্চ রচিত "মাটির ডাক" কবিতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে :

"কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
'যে জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত্য-ঘরে,
প্রাণভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে!
বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
'গেছিস দূরে, অনেক দূরে'
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা।
তাই এত দিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে;
ফিরেছি তাই নানা মতে
নানান হাটে নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।
আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নেভরা শোভার নিকেতন;

অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক মাঝে
প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজে;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে!
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে শ্রান্ত দিনের শেষে।

* * *

কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এত দিন।
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।"

বিশ্বের সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের হৃদয় জয় করিয়া অশীতিপর কবি-সম্রাট যখন শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন তখন 'রোগশয্যায়' সাময়িক 'আরোগ্য'অন্তে (৩১ জানুয়ারি, ১৯৪১) তিনি তাজমহলের স্বপ্ন দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির অপূর্ব স্মৃতি-চিত্র—

"আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবন-যাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।
গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক বসে
পাশে রাখি হাটের পসরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর।
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
সর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলে নৌকা এল ঘাটে
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।
আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাত রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয় পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দুপহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে-তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ;

চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক্ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা,
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নিচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্য শেষ বাজরার খেতে;
তর্মুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা একসারি।
জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।
গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে;
তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।···

পথে চলা এই দেখা শোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শিল্পী ও মনীষীরা নানাভাবে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙালী বিপিনচন্দ্র পাল যাহা বলিয়াছিলেন, বাংলার মাটি ও বাংলার জলের কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে—

"And the greatest contribution of Rabindranath is this, namely, that he has secured a place for his provincial thought and literature in the world-thought and world-literature of our day."

উনঅশীতি জন্মদিনে "গাঙ্গেয়"-বন্দনা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আজিকার প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

গঙ্গার মেটে জল
হল উদ্বেল পুঞ্জে পুঞ্জে সফেন ঢেউয়ের রূপে;
গাঙ্গেয়, তব জীবন এবার মরণ বিহারে মাতে।
সমুদ্র হতে মানস-বলাকা উড়ে হিমাচল পানে
অদৃশ্যজল বিরাট নদীর কায়াহীন পথ ধরি।
ঝঙ্কারময় ভুবন-মেখলা তোমারে উতলা করি
নাড়ীতে-নাড়ীতে জাগায় তোমার চপল পদধ্বনি
হংস-বলাকা উড়িল আকাশপথে
শূন্যে তুলিয়া বিস্ময়-জাগরণ—
সারা জীবনের স্বপ্ন তোমার, গঙ্গার সন্তান,
ভাষা পেল যেন বলাকা-পাখায় নিঃশব্দের মাঝে
গাহিয়া উঠিলে গান—
তোমার চরম গান
ধ্বনিয়া উঠিল একটি প্রশ্ন মাঝে।···
মানস আকাশে গঙ্গা আবার ধূর্জটিজটাজালে
বাঁধা পড়ে গিয়ে তুলিল কলধ্বনি।···
গাঙ্গেয় পুনঃ গঙ্গোত্রীতে তোমার যাত্রা শুরু।

* বিশ্বভারতী কর্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনে (২৪শে জানুয়ারি) অন্যতম সভাপতির অভিভাষণ।

ডাক্তার জিভাগো : [বরিস পাস্টেরনাক-এর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'ডাঃ জিভাগো'র অনুবাদ] অনুবাদ, মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা-১২। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২।

'সম্পাদকের নিবেদনে' বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "এই অনুবাদ 'ডাক্তার জিভাগো'র ইংরেজি সংস্করণ থেকে রচিত হয়েছে" এবং তিনি আশা করেছেন "বাংলা ভাষার পাঠক এই পুস্তক অনায়াসে পড়ে উঠতে পারবেন, কিংবা যেটুকু আয়াস তাঁকে করতে হবে তা পাস্টেরনাকের বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে, **অনুবাদের অপটুতার জন্য নয়।**" (পাঠক-দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে বড় হরফ আমিই ব্যবহার করেছি)।

সমালোচনার জন্য ইংরেজি অনুবাদকেই মূল বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বিচার করতে গিয়ে মনে প্রশ্ন জেগেছে : ইংরেজি অনুবাদের অস্বচ্ছতা ভেদ করেও পাস্তেরনাকের কাব্যের যেটুকু দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে সেটুকুও কি ধরা পড়েছে এই অনুবাদে ?

প্রশ্ন জেগেছে : পাস্তেরনাক মানবাত্মার যে গভীর স্তরে ডুব দিয়েছেন সেই গভীরের প্রতিধ্বনি ইংরেজি অনুবাদের যে যে স্তরে ধ্বনিত হয়েছে সেই সেই স্তরে বাংলা অনুবাদেও কি তা ধ্বনিত হয়েছে ?

এক কথায় উত্তর : দ্যুতি স্তিমিত হয়েছে, প্রায় বিলীন হয়ে গেছে ; গভীরের প্রতিধ্বনি গেছে মিলিয়ে। এর জন্য 'পাস্টেরনাকের বৈশিষ্ট্যের প্রভাব' দায়ী নয়, দায়ী **অনুবাদের অপটুত্ব।**

এই বৃহৎ অনুবাদের ৭৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী অপটুত্বের বিচার করতে গেলে ১৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনার প্রয়োজন !

* * *

মহৎ কাব্যের দুটো আকার। একটা ভাষার আকার, তার নিজস্ব ব্যাকরণে সজ্জিত। আর একটা অন্তরাকার। এই অন্তরাকারের ব্যাকরণ সৃষ্টির ব্যাকরণ। এই সৃষ্টির ব্যাকরণটা আয়ত্তে না এলে অনুবাদ কখনই সম্ভব নয়। মূল সৃষ্টির যে বিস্তার, যে বি+আ+করণ, সেই বিস্তারের বীজ অনুবাদকের নিজের চেতনার, অনুভবের, মাটিতে নিজের ভাষারূপ আকাশ আলোর লোকে প্রকাশমান হলেই তবে সার্থক হবে অনুবাদ।

এই দুই ব্যাকরণই যে অনুবাদকদের আয়ত্তের বাইরে তার প্রমাণ প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত প্রমাণিত।

ইংরেজি অনুবাদের প্রথম বাক্য : "On they went, singing 'Eternal Memory', and whenever they stopped, the sound of their feet, the horses and the gusts of wind seemed to carry on their singing."

বাংলায় রয়েছে : "......তাদের পায়ের শব্দ, হাওয়ার ঝাপটা আর ঘোড়াগুলো মিলে যেন সেই গানকে এগিয়ে নিয়ে যায়।" ইংরেজির carry on-এর অনুবাদ করা হয়েছে "এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।" এখানে carry on-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ continuation. গান আপাততঃ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তার ছেদ নেই। মানুষের পায়ের তালে ধ্বনিত হয়, ধ্বনিত হয় ঘোড়ার চালে, ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায়। 'ভারিকিনো' পরিচ্ছেদের ৭ম স্তবকে, মূলের ২৫৮ পৃষ্ঠার অনুবাদেও (বাংলা ৩৯২ পৃষ্ঠা) ঠিক এমনি আরেকটা দৃষ্টান্ত চোখে পড়ল। আরও অনেক জায়গায় পড়েছে। ২৫৮ পৃষ্ঠার ব্যবধানেও এই ত্রুটিটা "উজ্জ্বল" হয়ে রয়েছে ! "Faust became a scientist, thanks to the mistakes of his predecessors..." 'Thanks to'-র বাংলা করা হয়েছে " পূর্বসূরিকে ধন্যবাদ।"

'ভারিকিনো' পরিচ্ছেদের এই সপ্তম স্তবকটা নিয়ে

আলোচনা করলেই সমগ্র অনুবাদের প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলি সহজেই চোখে পড়বে।

প্রথম ত্রুটি "আক্ষরিকতা"। "Carry on," "thanks to" ইত্যাদির উল্লিখিত অনুবাদে এর প্রমাণ।

দ্বিতীয় ত্রুটি জড়তা। ইংরেজি অনুবাদে যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য তার লেশমাত্র চিহ্ন নেই অনুবাদে। "The fabulous is never anything but the common-place touched by the hand of genius". "যাকে আমরা অলৌকিক বলি তা প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া সাধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।" "It is'nt that they did'nt think about these things, and to good effect, but they always felt that such important matters were not for them."

"এমন নয় যে তাঁরা এসব বিষয়ে কিছুই ভাবেন নি বা এসব বিষয়ে কিছুই তাঁদের বলার ছিল না, কিন্তু তবু তাঁরা সব সময়েই ভেতরে ভেতরে অনুভব করেছেন যে এ-সব বিষয় ঠিক তাঁদের জন্য নয়।" এই বাংলা অনুবাদটা যে শুধু নিজের জাড্যেই স্থাণু তা নয়, অর্থউদ্ধারেও তা সক্ষম হয় নি।

এখানে যেমন অর্থপ্রকাশে জাড্য, অন্যত্র তেমনি ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে ভাবপ্রকাশের জাড্যের। 'বিদায় অতীত' পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ স্তবকে "It was getting dark. Outside, the houses and the fences huddled closer together in the dusk. The trees advanced out of the depth of the gardens into the light of the oil-lamp shining from the windows. It was hot and sticky. The lamp-light streaming into the yard dribbled down the bark of trees like sweat."

মূলের এই চিত্রটা চলন্ত একটা তেলরঙা ছবি। বাড়ীগুলো, বেড়াগুলো আধো অন্ধকারে গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে বসছে আরো কাছাকাছি, কিন্তু গাছগুলো গভীরতা থেকে এগিয়ে আসছে, অবচেতন থেকে যেমন ক'রে অচেনা রূপগুলো চেতনার মধ্যে এগিয়ে আসে। এই এগিয়ে আসার মধ্যে গাছগুলোর স্বেদাক্ত পরিশ্রমটাও পরিস্ফুট। বাংলায় যে চিত্রটা চিত্রিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ স্থাণু।

'ভারিকিনো' পরিচ্ছেদের ৭ম স্তবকেই দেখা গেল তৃতীয় দোষ। কাব্যীকরণ, poetisation—স্পষ্টকে অস্পষ্টীকরণ, সরলকে বক্রীকরণ, স্বচ্ছকে অস্বচ্ছীকরণ। যে কাব্যীকরণ দোষ carry on-এর 'এগিয়ে নিয়ে যাওয়া' অনুবাদে, 'thanks to'-এর 'ধন্যবাদ' অনুবাদে প্রকট, সেই দোষ সমগ্র অনুবাদের মর্মে। এই ধরনের poetisation, কাব্যীকরণ বা সূক্ষ্ম 'ধ্বনি'র (সংস্কৃত অর্থে 'ধ্বনি') যত্রতত্র আরোপ অর্বাচীন কাব্যবোধের লক্ষণ। অথচ যেখানে 'ধ্বনি'র প্রয়োজন, সেখানে অনুবাদ মূক। পাস্তেরনাকের চিত্রকল্পের মহিমা প্রকাশে অনুবাদ যে কত অক্ষম তার দুটি প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। 'স্তম্ভভবন' পরিচ্ছেদের ১০ম স্তবকে ইংরেজি অনুবাদের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় (বাংলা ৫৫১ পৃষ্ঠা) "...but now the whole breadth of heaven leaned low over his bed holding out two strong, white, woman's arms to him. His head swimming with joy, he drifted into happiness, as though losing his senses....to leave it all for a time to nature, to become her thing, her concern, the work of her merciful, wonderful beauty-lavishing hands." এই বর্ণনার অন্তর্নিহিত চিত্রকল্প 'Imagery' অনুবাদে উপস্থিত নাই। 'Leaned low', 'holding out two strong, white, arms,' 'swimming,' 'drifted'... ইত্যাদি চিত্রকল্প কথার আধারে যে চিত্র চিত্রিত হয়েছে তার অস্পষ্ট সীমাটাও চিহ্নিত হয় নি এই বাংলা অনুবাদে।

এই স্তবকের শেষে যে অপূর্ব বর্ণনা, ভাবের সঙ্গে রূপের যে অপূর্ব মিলন, তার কী দরিদ্র ছবিই না ফুটে উঠেছে বাংলা অনুবাদে!

"To them—and this made them unusual—the moments when passion visited their doomed human existence like a breath of timelessness were moments of revelation, of ever greater understanding of life and of themselves."

এই অংশের অনুবাদ : "তাদের ধ্বংসোন্মুখ মানুষী অস্তিত্বের ওপর, চিরন্তনের নিঃশ্বাসের মত, আবেগের মুহূর্তগুলো যখন নেমে আসত, তাদের তা মনে হত যেন দিব্য উদ্ভাসের জন্মক্ষণ—তখন আরও গভীর করে তারা উপলব্ধি করত নিজেদের এবং এই জীবনকে। আর এখানেই তাদের অসাধারণত্ব।"

বাংলা অনুবাদে মূলভাবের বিকৃতি ঘটেছে। 'breath of timelessness' (চিরন্তনের নিঃশ্বাস) মুহূর্তগুলি নয়। breath of timelessness হল Passion—প্রেমের আবেশ। এই মুহূর্তগুলি, moments of revelation—আত্মা অপাবরনের মুহূর্ত। স্বতঃ-উৎসারিত বোধের মুহূর্ত। নিমেষে নিমেষে এই বোধের সীমা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। যে অস্তিত্বের অবসান নিশ্চিত, সেই পরিসমাপ্তকাল মানবিক জীবনে অসীম কালের স্পর্শ লেগেছে। স্পর্শ লেগেছে জীবনের চিরন্তনতার। অসীম কালে সনাতন কালের প্রবেশ ঘটেছে। এক কথায়, প্রেমাবেশের মুহূর্তে মুহূর্তে জীবনবোধ, আত্মবোধ, বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে। অনুবাদে এই অন্তর্নিহিত ভাবের মহিমা গেছে হারিয়ে।

আরও একটা উদাহরণ দিয়ে এই ত্রুটিটার বিশ্লেষণ সাঙ্গ করব। "গুপ্তভবনের বিপরীত দিকে" পরিচ্ছেদের ১৩শ স্তবকে মূল ইংরেজির ৩৬২ পৃষ্ঠায় (বাংলা ৫৬২ পৃষ্ঠায়) আবার ভাবের অপহ্নব ঘটেছে ; 'All that's left is the bare, shivering human soul, stripped to the last shred, the naked force of the human psyche for which nothing has changed because it was always cold and shivering and reaching out to its nearest neighbour as cold and lonely as itself. You and I are like the first two people on earth who at the begining of the world had nothing to cover themselves with—at the end of it, you and I are just as stripped and homeless. And you and I are the last remembrance of all that immeasurable greatness which has been created in the world in all the thousands of years between their time and ours, and it is in memory of all that vanished splendour that we live and love and weep and clig to one another."

মূলের কী ছন্দ, কী ধ্বনি, কোনোকিছুরই লেশমাত্র নেই। চিত্রকল্প হারিয়ে গেছে। এই Elevated Prose-এর অন্তর্নিহিত গভীরতা ও প্রবাহ কোনোটাই বাংলা অনুবাদে ধরা পড়ে নি। অনুবাদ পড়ে মনে হচ্ছে বাংলা যেন স্প্রিং-চালিত পুতুলের মত কাঠের পায়ার ওপর ঠক্ ঠক্ করে চলেছে। মূল ভাবও ধরা পড়ে নি। গভীর অর্থ অস্পষ্ট নিরর্থকতায় ছড়িয়ে পড়েছে। মূলকথা আত্মার আবরণ-মোচন আর তার সঙ্গলিপ্সা। 'human way of life'টাই আত্মার আবরণ। এটা নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা একা একাকী, হিমশীতল, আতুর, কম্পমান। সভ্যতার আবরণ যখন ছিন্ন হল তখন এই আত্মা cold and shivering. Naked force-এর অনুবাদে উলঙ্গ 'তেজ' কী করে কল্পনা করলেন অনুবাদকবৃন্দ ?

"মানুষের আত্মার উলঙ্গ তেজ—তাতো কোনো বদলের ধার ধারে না, কেন না চিরকাল তা হিম, কম্পিত, তা পৌছতে চায় নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে, যে তারই মতো হিম আর নিঃসঙ্গ।" হায়, হিম ও কম্পিত "তেজ"! আর কী বাংলা রচনা! হায় পাস্তেরনাক!

পৃথিবীর আদিপর্বে আত্মা হিম আর নিঃসঙ্গ আবার এই পৃথিবীর শেষ পর্বে, (at the end of it) সভ্যতার আবরণ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর, তেমনি হিম আর নিঃসঙ্গ। ভাবের এই ধারাটা অনুবাদে নিশ্চিহ্ন। 'Stripped' কথাটার মধ্যে আবরণ হরণের ইঙ্গিত ছিল। "the human way of life" আত্মার আবরণ। এই আবরণ যেন মানবাত্মার তাপ রক্ষা করে, পরিচ্ছদ যেমন দেহের। অন্তর্নিহিত এই অর্থের ইঙ্গিত কোথাও নেই অনুবাদে!

"You and I are like the first two people". সেই আদিম দুই মানুষ আদম আর ইভ! এই অর্থ অনুবাদকবৃন্দের বোধগম্যতার মধ্যে আসে নি। তাহলে লিখতেন না, "সেই দুই আদি মানুষের কত হাজার বছর কেটে গেল!" "দুই আদি মানুষের কত হাজার বছর কেটে গেল"—এ এক অভাবিত ভাষ্য! আদম ইভের কাল থেকে কত হাজার বছর অতিক্রান্ত হল এটাই অর্থ। এটাই ইঙ্গিত।

এই প্রসঙ্গে অনুবাদকর্মের একটা সমস্যার কথা বলতে হচ্ছে। যে কোন সাহিত্যবাক্যের মধ্যে বহু তলের (dimensions) সমাবেশ ঘটে। সবার উপরে যে তল তা আপাত অর্থের তল। তার তলায় ভাবার্থের তল, তারও নীচে চিত্রকল্প-আশ্রয়ী aesthetic তল। তারও নীচে যে অন্তস্তল তা লেখকের নিজস্ব তল, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট dimension. তলগুলি ঠিক পরপর সজ্জিত নয়, এরা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। একটি মাত্র সাহিত্যবাক্য, এমন কি সাহিত্যবাক্যের মধ্যে কখনও কখনও একটি মাত্র পদও, বহু ধ্বনিতে সমৃদ্ধ। কাব্যমাত্রই গণিতের ভাষায় multi-dimensional, বহু তলবিশিষ্ট। অনুবাদে এই বহু-তলত্ব, এই ঘনত্ব রক্ষিত না হলে সে অনুবাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

অনুবাদের অপর ত্রুটির সন্ধানও পাওয়া যাবে ওই একই স্থানে, 'ভারিকিনো' পরিচ্ছেদের সমস্ত স্তবকে, মূলের ২৫৮ পৃষ্ঠায়, বাংলা অনুবাদের ৩৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায়।

চতুর্থ দোষ "গুরুচণ্ডালিত্ব"। 'গালভরা বিষয় সম্পর্কে সলজ্জ ঔদাস্য', 'নিজের ভেতরে সুপক্ক হয়ে উঠেছে···গাছ থেকে পেড়ে-আনা কাঁচা আপেল'। গুরুচণ্ডালি তখনই মারাত্মক হয়ে ওঠে যখন এর ফলে রচনার যে Elevation, যে ঊর্ধ্ব সঞ্চারণ, তা রক্ষিত হয় না। এই অনুবাদ কর্ম আদ্যোপান্ত এই দোষে দুষ্ট। বুদ্ধদেব বসুকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী দানা বেঁধেছে, এ দোষ তাঁদের 'গুণ'!

পঞ্চম দোষ, বাংলা বাক্য রচনার বিকৃতি। বাংলা syntax-এর ওপর বলপ্রয়োগ। "আর তারপর থেকে তাঁদের এই ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলিই সকলের অভিনিবেশের ব্যাপার হয়ে উঠেছে, নিজের ভিতরে সুপক্ক হয়ে উঠেছে তাঁদের রচনা, যেমন করে পেকে ওঠে গাছ থেকে পেড়ে আনা কাঁচা আপেল অনুভূতি ও মাধুর্যে ক্রমশ পূর্ণ ও পরিণত!" না ইংরেজি, না বাংলা! না জর্মন, না রুশ! এই ধরনের ব্যর্থ অনুবাদের লক্ষণ সর্বত্র পরিস্ফুট। এই ধরনের কৌশল সাহিত্যিক-অসততার লক্ষণ।

এই অনুবাদ যে শুধু আক্ষরিকতা দোষে দুষ্ট তাই নয়, গোটা অনুবাদটাকে 'আক্ষরিকতার' 'পাগলা জামা' পরিয়ে তাকে দুমড়ে মুচড়ে লাঞ্ছনাময় করার এই চেষ্টা অসহনীয়! ইংরেজি syntaxকে বাংলায় আত্মস্থ করার প্রশ্ন অন্য ব্যাপার। ইংরেজি Relative clauseকে হুবহু বাংলায় আনার মধ্যে যা প্রকাশ পায় তা অক্ষমতা।

সমগ্র অনুবাদটায় শুধু যে অপটুত্বের চিহ্ন সুপরিস্ফুট তাই নয়, এই অপটুত্বকে আচ্ছাদিত করার জন্য বিবিধ অপ-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

* * *

বিস্তৃত অর্থে যে 'অনুবাদ' তাতে আমরা সকলেই অভ্যস্ত। অপরের কথা শুনে যখন তার মর্ম গ্রহণ করি, তখন অপরের ভাবের অনুবাদ করতেই হয়।

কাব্যসাহিত্যের পাঠক বা শিল্পবস্তুর উপভোক্তা যখন কাব্য ও শিল্পের রসানুভূতিতে মগ্ন তখন তিনিও স্রষ্টার সৃষ্টির 'অনুবাদ' প্রবৃত্ত। এক ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত যে ভাষা সেই ভাষাকে নিজের ব্যক্তিত্বের, সংস্কারের, ভাবের, প্রেরণার আকারে আকারিত করার কাজে পাঠক বা শিল্প উপভোক্তা মাত্রই অভ্যস্ত। আসলে শিল্পসৃষ্টি অন্তর্গূঢ় নিয়মে আকারিত ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু আছে সামাজিক, কিছু সম্পূর্ণ ব্যক্তিক। সামাজিক প্রকাশ বিশেষ ভাষার ব্যবহারে, বিশেষ সংস্কৃতির চিত্রায়ণে। এই সামাজিক (collective) দিকটার অনুবাদের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান। দ্বিতীয় যে দিক সম্পূর্ণ ব্যক্তিক, (indvidual), তার প্রকাশের জন্য প্রয়োজন তন্ময়তা, তদাকারে আকারিত হওয়া। এক আত্মার সঙ্গে আরেক আত্মার একাকারত্ব। এই একাকারত্ব অনুবাদের ভিত্তি।

এই অনুবাদ কর্মে এই 'একাকারত্ব' কোথাও নেই। যা আছে তা snobbery, তা ভান।

শ্রীদেবব্রত রেজ

দু চোখের দেখা : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

দু-চোখে দেখে সকলেই—যারা চক্ষুষ্মান। কিন্তু সবার দেখায় সাহিত্য হয় না। যাঁদের দেখায় হয়, তাঁরা সাধারণ দু-চোখের বাইরেও আর এক চোখের অধিকারী। সেই চোখ শিল্পীর তৃতীয় নয়ন। চর্মচক্ষু নয়—মর্মচক্ষু। আলোচ্য গ্রন্থের কোন কোন রচনাতে সেই তৃতীয় নয়নের অবাঙ্-মানসগোচর দৃষ্টির কিছু কিছু পরিচয় আছে। এবং সেই জন্যই এ গ্রন্থ সাহিত্যপদবাচ্য হতে পেরেছে।

'দু চোখের দেখা'য় যে উনিশটি ছোট ছোট রচনার মালা গাঁথা হয়েছে, সম্ভবত তার সবগুলিই 'যুগান্তর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সে সময়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। করেছিল এই জন্যই যে ও রচনা-মালায় একটি স্নিগ্ধ পরিহাসরসিক কৌতুকময় মার্জিত মনের পরিচয় পেয়েছিলাম আমি। হাল-আমলে সাহিত্যের বারোইয়ারী বাজারে রম্যরচনা নামে যে মাল সস্তা দামে বিকোচ্ছে, 'দু চোখের দেখা'ও সেই রম্যরচনা। কিন্তু তফাত এই যে এতে রম্যতাও আছে এবং এগুলি রচনাও হয়েছে—যেটা বাজারচলতি এই জাতীয় লেখায় বড়-একটা পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এই জাতের লেখা যাঁরা লেখেন, সংবাদপত্রের বার্তাসম্পাদকের পেটোয়া সেই বালখিল্য লেখককুল সর্বত্রই বিজ্ঞে প্রকাশের প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁসফাঁস করে থাকেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর সেই কাণ্ডজ্ঞান-হীন খোকামির ধারে ঘেঁযেন নি। এবং সেইজন্য তিনি রসিক পাঠকের ধন্যবাদার্হ। আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে এই ধরনের লেখাতেই গৌরীশঙ্করের আসল হাত—এতেই তাঁর শক্তির সত্যিকারের স্ফুরণ হয়।

কিন্তু এ গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি নিন্দার কথা না বলে পারছি না। এইটুকু বইয়ে এত ছাপার ভুল কেন? আর, প্রকাশক কি জানেন না যে বইয়ের মলাটেই লেখকের ললাট?

আমার কবিতা তুমি : রণজিৎকুমার সেন। বাণীবিতান, ২৪ এন্, গরচা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-১৯। আড়াই টাকা।

'আমার কবিতা তুমি' রণজিৎকুমার সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ 'শতাব্দী' প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। তারপর রণজিৎবাবুর গল্প-গ্রন্থ বেরিয়েছে অনেকগুলি। কিন্তু গদ্যের প্রবল গোঁয়াতুর্মির যুগে ক্ষীণকণ্ঠ কাব্য প্রায় নীরব হয়েই থেকেছে। সেই নীরবতার অবসান হল দীর্ঘকাল পরে আলোচ্য গ্রন্থে—রণজিৎকুমার সেনের কবিকণ্ঠ আবার শোনা গেল।

কবি হিসাবে রণজিৎবাবু মূলতঃ রবীন্দ্রানুসারী কবি-কুলের প্রথাবদ্ধ পথের পথিক। ছন্দে মিলে চিত্রকল্পে তাঁর মেজাজ বাংলার দেশীয় কাব্যের বিশেষ প্রাচীন ধারার সমর্থক। এ-কথার প্রমাণ আছে এই গ্রন্থের বহু কবিতায়। যেমন—

> অনাদি অতীত ইতিহাস থেকে হ'য়ে আছি ইতিহাস,
> কান্নায় আমি অশ্রু-সলিল, হাসিতে যে উচ্ছ্বাস।
> আমাকে নইলে বিশ্ব-রচনা হ'য়ে যেতো করে ম্লান,
> কোথা থাকতেন মানুষের বুকে মানুষেরই ভগবান?
>
> (আমি—পৃঃ ৩৬)

কিন্তু মেজাজে প্রাচীনপন্থী হলেও বর্তমান কালের জীবনের বিশেষ রূপও রণজিৎবাবুকে স্পর্শ করেছে। দুঃখ-যন্ত্রণা-উদ্বেগ-আকুল জীবনও তাঁর কাব্যের বিষয় হয়েছে। যথা—

> চকিতে সহসা দেখি ঝড় এলো বেগে,
> আকাশ ঢাকিল মেঘে মেঘে।
> হঠাৎ লুকালো কোথা মানুষেরা সব?
> সদলে শার্দুল চলে, পথে পথে জেগে ওঠে সারমেয়-রব।
>
> (স্বপ্ন-ভঙ্গ—পৃঃ ৬)

যাঁরা কাব্যের প্রথাসিদ্ধ রূপরীতির ভক্ত, তাঁরা ছন্দোমিলময় সুবোধ্য এই কাব্যগ্রন্থখানি পাঠে আনন্দ পাবেন বলেই ভরসা করি।

দেবব্রত ভৌমিক
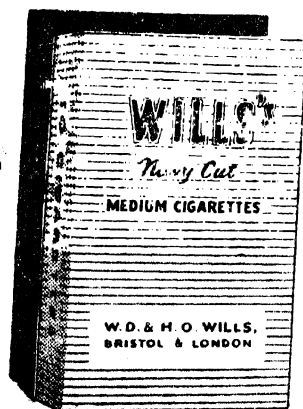
বামী এবং আমি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

হাতের প্রদীপ নিভে গেলে
'বামী' ওঠে কেঁদে
আমায় আমি কী করেছি
হাজার ডুরি বেঁধে!
আমার মনের অন্ধকারে
আমায় খুঁজে পাইত নারে
(তবু) আয়না দেখে করি মুখের
মিথ্যা প্রসাধন—
আপন স্বরূপ ভুলেই গেছি
কে মোর আপন জন।
যাদের ভাবি আপন জনা
তারা আমায় চেনে তো না
মুখোশ পরে নিত্য করি
নূতন অভিনয়,
জাহির করি, হায় রে যাহা
মোটেই সত্য নয়।
কুশীলবের সেজেছি 'রাম'
ভুলেই গেছি প্রকৃত নাম
কোথায় হতে কোথায় এলাম
আবার যাব কোথা
রঙ্গমঞ্চে রঙ্গ করি
নিত্য হেথা হোথা।
কান্না ওঠে গলার কাছে
করে কণ্ঠরোধ

কে আমারে বায়না দিল
কখন হবে শোধ?
আর পারি নে, সাজের সজ্জা
ঈষৎ জ্ঞানে হচ্ছে লজ্জা
রাজা নইকো রাজার মত
পরে জরির সাজ
সুখের চেয়ে স্বস্তি বড়
ভাবছি মনে আজ।
আমায় তুমি লজ্জা দিয়ে
সজ্জা নিও কেড়ে
নেপথ্যে চাই পালিয়ে যেতে
নাট্যমঞ্চ ছেড়ে।
দাও না জেলে মনের আলো
দেখাও আমার 'আমি'—
মুক্ত করে ছদ্ম এ-রূপ
স্বরূপ দেখাও স্বামী।
তোমার পানে চাইতে গিয়ে'
চক্ষু করি নত
মনের কথা বলতে গিয়ে
হয় না মনের মত।
কণ্ঠ ফুটে কাঁদতে নারি
যেমন পারে 'বামী'
যদিও ঠিক বুঝতে পারি,—
—'হারিয়ে গেছি আমি'।

—

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ আশ্রয় ক'রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি সফল করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে, খামারে, কারখানায়, ক্ষুদ্র শিল্পে ও কুটীরশিল্পে উন্নতিমূলক কাজ চলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ৭২ ও ১৫৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৯৩.১৫ কোটি টাকায়; এর মধ্যে কৃষি ৫৩.৬০ কোটি; সেচ ও শক্তি ৬৩.৮৬ কোটি, সমাজ সেবা ৮১.৩২ কোটি; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৬.৫০ কোটি, সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়ন ১৭.৪৩ কোটি; শিল্প ও খনি ১২.১৪ কোটি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ৩৮.৩০ কোটি টাকা।
জনসাধারণের সহযোগিতায় উন্নতি ও সমৃদ্ধির অভিযান
গত দশ বছরে নানা ক্ষেত্রে যে উন্নতি দেখা গেছে তা হচ্ছে: খাদ্য: ৩৯.৭ থেকে ৫৪.৫ লক্ষ মেট্রিক টোন; সেচ: ২৪.৪ থেকে ৩১.৬ লক্ষ একর; বিদ্যালয়: ১৬,৩১৭ থেকে ৩১.৩১০টি, ছাত্র: ২০.৫ থেকে ৩৪.২ লক্ষ জন, হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী: ১,২৮৪ থেকে ১,৯১২টি, বেড: ১৮,৩২৯ থেকে ২৭,৬১১টি; ডাক্তার: ১৮,৩১৬ থেকে ২০,৮৩৪ জন; নার্স: ২,৯৮৮ থেকে ৫,০০১ জন; হাতের তাঁতের কাপড়: ১০ থেকে ১৯ কোটি গজ; পাকা রাস্তা: ১,৩৫২.৯ থেকে ৫,৮৮৮ মাইল, বিদ্যুৎ: ১০৪.৬৭ থেকে ১৮০.৩৭ কোটি কিলোওয়াট; পাট: ১.৩৫ কোটি বেল থেকে ১.৮০ কোটি বেল; কলকারখানা: ২,৫৩০ থেকে ৩,৯৪৩টি; এবং সমবায় সমিতি: ১৫,৫৮৩ থেকে ২৭.৭১৫টি।
প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তের কঠোর পরিশ্রমেই গ'ড়ে উঠছে
নবভারতের সোনার বাংলা
২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
WBG-107

এইখানে স্বর্গ আছে

সুশীলকুমার গুপ্ত

এইখানে স্বর্গ আছে, দেখা যায় এলে চুপি চুপি—
বাগানে ফুলের নাট্যে রৌদ্র নাচে হ'য়ে বহুরূপী,
রূপসী শিশির হাসে, ফড়িঙের চঞ্চল পাখায়
দোলে আকাশের ঢেউ, ঘাসের সবুজ আয়নায়
মুখ দেখে মেঘ, হাওয়া খেলে গাছে প'রে ছায়াটুপি।

এইখানে স্বর্গ আছে, দেখা যায় দাঁড়ালে ক্ষণিক—
শিশুর মুখের মেলা, বধূ কেশে মধুচক্র গড়ে,
বুড়ি বড়ি দেয় ছাদে, বুড়ো রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে
দৈনিক সংবাদপত্র, চাক্‌রে বাবুটি চলে ঠিক
ঘড়ির কাঁটায়, টিয়াময়না খাঁচায় ডেকে মরে।

এইখানে স্বর্গ আছে, দেখা যায় যদি থাকে চোখ ;
বাগান উঠোন ঘরদোর জুড়ে রয়েছে ছড়ানো
যে স্বর্গ ভিতরে তার যেতে পার, যদি তুমি জানো
দরজা-খোলার চাবি, চেনো পাখি আকাশ আলোক।

—

বোধি

সনৎকুমার মিত্র

কখনো ঝড়, কখনো শীত, কখনো শত ফুলে
পৃথিবী সাজে, পৃথিবী কাঁপে, কখনো ওঠে দুলে ;
তবুও এই পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে
হয় না চ্যুত, থামে না তার আবর্তন রেখে,
গ্রীষ্ম-শীত-বর্ষা সব ঋতুর কাকলীতে
নিয়ত ঘোরে, রাত্রিদিন গুটিয়ে চলে ফিতে।

হাজারতরো বিঘ্ন আছে, হাজারতরো কাজ,
কখনো রাজা, ভিখারী কভু, ভিন্নতর সাজ ;
আধি ও ব্যাধি, কান্না-হাসি, নিদ্রা-ক্লান্তিকে
দু হাতে ঠেলে এগিয়ে যাব, পাবই শান্তিকে।
এবং এই চলার পথে আমাকে হবে নিতে
হাজার রঙে পূর্ণ করে আয়ুর এই ফিতে।

—

শ্রীখোশনবীস জুনিয়র

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বঙ্গ-সংস্কৃতি

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন নামে বিজ্ঞাপিত কোন-একটি স্বয়ম্ভূ প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসরই ফ্লাড্-লাইটে ফ্লাডেড্ সজ্জিত স্টেজে আদি ও অকৃত্রিম সাঁওতালী নাচ নাচিয়া বাজিমাত করিয়া থাকেন। এক্ষণে তাঁহারা সাহিত্যেও সাঁওতালী নাচ নাচিবার উদ্যোগ করিয়াছেন—তাঁহারা নিয়মিত একটি মাসিক বাহির করিতেছেন। এই মাসিকে আমাদিগেরও সমর্থন আছে। 'কালপুরুষ'-নামা এই মাসিকের তিনটি সংখ্যা আমার হস্তগত হইয়াছে; এবং উহা পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। কিন্তু কালপুরুষের অঙ্গে কালের দুর্লক্ষণ কিছু কিছু এত বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে উহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

কালপুরুষের তৃতীয় সংখ্যাটির কথাই ধরা যাউক। এই সংখ্যায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আশা প্রকাশ করিয়াছেন :

দু'দণ্ড থাকলে আমি এইখানে মৃত্তিকায় শুয়ে।
এই যে প্রাচীন বট দৃঢ়মূল এখানে দাঁড়িয়ে
পিতাপিতামহদের প্রতিবেশী। সমাহিত পূর্বসূরীদের
সমৃদ্ধ স্মৃতির সাক্ষ্য ; রুদ্ধবাক আমি সে বটের
শাখায় শাখায় দেখি আদিরূপ ; বিগতকালের
প্রশ্নাতীত অশান্তির রেখা। শান্ত, স্থির অন্ধকারে
অদৃশ্য অতীত তার রোমময় বুকে খেলা করে
প্রগাঢ় বিন্যাসে। আর অস্তোন্মুখ সূর্য রেখে যায়
গলিত সোনার রঙ কাণ্ডমূলে, পাতায়, বাকলে ;
বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্ম বর্ষা অকৃত্রিম দৃশ্য রচনায়
একটি বিন্যস্ত ঐক্য নিত্যকাল রেখেছে বজায়
এই প্রৌঢ় বীতশোক সদানন্দ বৃক্ষের শরীরে।
দু দণ্ড থাকবো আজ সন্তর্পণে এইখানে শুয়ে
সুপ্রাচীন বৃক্ষমূলে। প্রত্যয়ের আদিম সংসারে
সমর্পিত হবে দগ্ধ আকাঙ্ক্ষারা। একান্ত নির্ভয়ে
অতীতে প্রেরিত যতো প্রতিবিম্ব। এবং যেহেতু
বৃক্ষই আদিম পিতা, আদিপ্রাণ মৌনতার সেতু,
প্রোথিত অতীত থেকে মৃত্তিকায় দৃঢ়বদ্ধতায়
সম্মানিত, অধিষ্ঠিত,—আজ আমি বিক্ষত শরীরে
অস্থির উদ্বায়ু জ্বালা অন্তর্মুখী আঁধারে ডুবিয়ে
প্রজ্ঞা মেধা মননের এই স্থির ঋষির আশ্রয়ে
উদ্ঘাটন করবোই আবর্তিত হৃদয়ের দ্বারে ;
তৃষাদীর্ণ বাসনারা অতঃপর ঘুমাবে নির্ভয়ে
অন্ধকারে, অন্তরঙ্গ সন্নিধানে, নিহিত উদ্ধার॥

এ-আশা সুআশা সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিবর ধান-ক্ষেতে বেগুন খুঁজিয়াছেন। তাহা কালপুরুষের অপর তিনটি রচনা হইতে প্রমাণিত হয়। এই রচনা তিনটি লিখিয়াছেন গৌরকিশোর ঘোষ, মতি নন্দী এবং অসীম রায়। গৌরকিশোর গৌরকিশোরী কায়দায় মন হইতে বাঘ বাহির করিয়া ধানক্ষেতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের কথা কিছু থাকিলেও শেষ পর্যন্ত উহা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার প্রবাদ অনুসরণ করিয়া প্রবোধ সান্যালী বাক্যবিপ্লব এবং বাচালতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মনের বাঘ বনের বাঘ হয় নাই—মধ্যবিত্তের নোংরা শয্যার 'বাগ্'-এ (bug) পরিণত হইয়াছে। গৌরকিশোরের নায়িকা আদর্শনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এক অশিক্ষিত হোটেলওয়ালার শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ গৌরকিশোরী গুল ;—ইহা বাস্তব নহে। বাস্তব হইলেও তাহা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বাস্তব, বঙ্গদেশের নহে—ভারতের কোন প্রদেশেরই নহে। এইরূপ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বাস্তবের

পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন শ্রীমতি নন্দী। জীর্ণ অট্টালিকা হইতে তিনি যে-সকল স্ত্রী-পুরুষ বাহির করিয়াছেন এবং তাহাদের দিয়া যে-সকল ক্রিয়াকলাপ করাইয়াছেন তাহা এই কলির সন্ধ্যাতেও বঙ্গদেশে সংঘটিত হইতে পারে না। শ্রীঅসীম রায়ও অসীম উৎসাহসহকারে জ্যেষ্ঠতাতসুলভ যে ধূর্জটিপ্রসাদী করিয়াছেন, তাহাও কোনকালে বঙ্গ-সংস্কৃতির অঙ্গ নহে। কাজেই বুঝিতেছি, কবি কিরণশঙ্কর বঙ্গসংস্কৃতি বলিতে যাহা বুঝেন, কালপুরুষের অন্য পুরুষেরা তাহা বুঝেন না। তাহাদের বঙ্গদেশ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় অবস্থিত এবং তাহাদের বঙ্গসংস্কৃতি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাঁওতালী ফকস্ট্রট্-এর সংস্কৃতি।

এই অপরূপ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বঙ্গসংস্কৃতির চাষ এই নূতন নহে—এই কোম্পানিটির একচেটিয়াও নহে। ইহার মূল খুঁজিতে গেলে প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ অনেক রথী-মহারথী এবং অনেক দেশবিখ্যাত কোম্পানির টিকি ধরিয়া টান পড়ে। 'কল্লোলে' এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বঙ্গ-সংস্কৃতিই কল্লোলিত হইয়াছে। এবং ইদানীং ভুঁইফোড় নানা পত্রপত্রিকায় সংঘে-সম্মিলনে বাহিত হইয়া দেশ প্লাবিত করিতেছে।

কিন্তু ইহার কারণ কি? কারণ বহুবিধ—দেশ কাল পাত্র নানা বিষয়ক। এই দেশে এই কালে সাধারণতঃ যে-সকল ব্যক্তি তথাকথিত সাংস্কৃতিক কোম্পানিগুলির গদি ভোগ-দখল করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অন্য জগতের লোক। যিনি আজীবন সরকারী উচ্চ পদে পুচ্ছ গুঁজিয়া দেশ এবং দেশজ সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই মুহূর্তে ভোল পাল্‌টাইয়া সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিখরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বঙ্গসংস্কৃতি দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাই এক্ষণকার রীতি—ইহাই কারণ, ইহাই এই নবযুগের নব অবদান স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বঙ্গ-সংস্কৃতির মূল রহস্য।

* * *

কথাসাহিত্য

এতক্ষণ যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বঙ্গ-সংস্কৃতির কথা বলিলাম, দেশে উহার একটি বিপরীত ধারাও বর্তমান। এই ধারা কেবল বিশুদ্ধ দেশীয় নহে, বিশুদ্ধ হেঁশেলীয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত হেঁশেলের আঁশবটি এবং থোড়বড়িখাড়ার গন্ধে এই সংস্কৃতি পরিপূর্ণ। শ্রীযুত গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ সম্পাদিত মাসিক 'কথাসাহিত্য' এই হেঁশেলীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম ধারাবাহক। মাঝে মাঝে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ দুই-চারিজনের রচনা ব্যতীত ইহাতে যে-সকল রচনা ছাপা হয় তাহা মধ্যবিত্ত হেঁশেলের গন্ধে ভরপুর। অবধূত, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, যম দত্ত প্রভৃতি এই হেঁশেলীয় কথাসাহিত্যের ধারা নিয়মিত ভাবে পুষ্ট করিতেছেন।

কিন্তু 'কথাসাহিত্যে'র ১৩৬৮-র পৌষ সংখ্যাটিতে ইহার একটি বড় ব্যতিক্রম দেখিলাম। শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ইহাতে 'সংবর্তক' নামে একটি বড় গল্প লিখিয়াছেন। এই গল্পটিতে একটি অতি সুস্থ মানবিক মূল্যবোধ এবং সত্যকে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত রূপায়িত করা হইয়াছে। জীবনে বড় হওয়াই যে একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, প্রাণের-জীবনের যে একটি নিজস্ব স্বাভাবিক মূল্য আছে, তাহা 'সংবর্তকে' অত্যন্ত জোরের সহিত বলা হইয়াছে। কেবল বক্তব্য নহে, শিল্পরূপ হিসাবেও গল্পটি অতি উচ্চ শ্রেণীর। ইহা 'কথাসাহিত্যে'র ধারার একেবারেই বিপরীত।

এই সম্পর্কে আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। শ্রীমতী মহাশ্বেতার রচনা পূর্বেও কিছু পড়িয়াছি;—এবং পড়িয়া বিরক্ত হইয়াছি। তিনি এরূপ গল্প কি করিয়া লিখিলেন? তাহা ছাড়া, এ রচনায় নারীর হাতের কোন ছাপ নাই। ইহা সম্পূর্ণই পুরুষালী বলিষ্ঠতায় ভরপুর। ইহা কিরূপে হইল? মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য নারী, না পুরুষ?

কথাসাহিত্যের যুগ্ম-সম্পাদকের নিকট আর একটি নিবেদন। এইরূপ একটি প্রশংসনীয় রচনার কয়েক পাতা পরেই সাহিত্যিক (হায়, ভঙ্গবঙ্গসাহিত্য, ইঁহাকেও সাহিত্যিক লিখিতে হইল) শ্রীশক্তিপদ রাজগুরুকে নষ্টচন্দ্রের পাতা পাড়িতে দেওয়া তাঁহাদের রীতিমত অন্যায় হইয়াছে। এইরূপ ভবিষ্যতে না ঘটিলেই রসিক পাঠক সন্তুষ্ট হইবেন।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৪শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৮

সম্পাদক :
সজনীকান্ত দাস
রঞ্জনকুমার দাস

সংবাদ-সাহিত্য

নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র উননব্বই দিন এবং ছত্রিশ মাইলের ব্যবধানে বঙ্গমাতার দুই পরমাশ্চর্য সন্তানের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যাঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রজ বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পথিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঠাকুর) কলিকাতার জোড়াসাঁকো পল্লীতে ইংরেজীমতে ৭ই মে প্রত্যূষে ভূমিষ্ঠ হন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) কলিকাতার ছত্রিশ মাইল উত্তরে হুগলির খন্ন্যান গ্রামে (অসমাপ্ত)

'শনিবারের চিঠি'র আগামী ফাল্গুন সংখ্যা 'সজনীকান্ত স্মরণ-সংখ্যা'-রূপে প্রকাশিত হইবে। সম্পাদনা করিবেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সজনীকান্ত আর নাই। তাঁর বাষট্টি বৎসরের জীবন বহু সংঘাত ও সংঘর্ষের জীবন বহু কীর্তির জীবন। কীর্তিমান সজনীকান্তের কীর্তিতে ছেদ পড়ে নি, জীবনের প্রায় মধ্যগগনেই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত কক্ষচ্যুত হয়ে মৃত্যুর আকর্ষণে অকস্মাৎ বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের মত বন্ধুজনের জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বন্ধু হারিয়েছি, তাঁর পত্নী পরমজনকে হারিয়েছেন, পুত্রকন্যারা পিতৃহীন হয়েছে, বাংলাসাহিত্য প্রতিভাশালী সেবক হারিয়েছে—'শনিবারের চিঠি' হারিয়েছে কর্ণধারকে; যদি সজনীকান্তের পুত্রকন্যার মতই সেও পিতৃহীন হয়েছে বলি, তবে ভুল বলা হবে না। 'শনিবারের চিঠি' সজনীকান্তের মানসকন্যা। তার সূতিকাগৃহ থেকেই তিনি তার পরিচর্যা করেছেন।

'শনিবারের চিঠি'র প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। তার জন্মক্ষণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পরোক্ষভাবে এবং মোহিতলাল মজুমদার, যোগেশ বিদ্যানিধি থেকে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে সমাদর এবং সেবা করেছেন। সজনীকান্ত সাধারণ কর্ম নিয়ে তার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ওই কর্মের জন্য সংসারে আসেন নি, তাঁর শক্তি ছিল, প্রতিভা ছিল, সর্বোপরি এই কন্যাটিকে দেখে তাঁর অন্তরলোক—সীতার প্রতি জনকের স্নেহের মত স্নেহ-উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। তিনি কামস্কটীয় ছন্দে কবিতা লিখে 'শনিবারের চিঠি'র শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' তখন সাপ্তাহিক। শনিবারের চিঠির বাঁধানো পুরনো সংখ্যাগুলি পড়েছি, পড়েই এ কথা বলছি এবং সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি'র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলছি, তাঁর এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

"যে কামস্কটীয় ছন্দের কবিতার জন্য 'শনিবারের চিঠি'র ভোল পাল্টাইতে চলিয়াছে তাহার রচনাকে বাজে কাজের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারিলাম না।"

এই সব বাজে রচনাকর্ম ছাড়তে উপদেশ দিয়ে কথাটা বলেছিলেন একজন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি। তা বলুন। সজনীকান্ত তাঁর কথা মানলে নিজে ভুল করতেন এবং বাংলা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হত। সমালোচনা-সাহিত্য এবং ব্যঙ্গরচনার ধারা আজ যে পরিমাণে পরিসর এবং পুষ্ট তা হত না এতে আর কোন সংশয় নেই।

সে কথা এখন থাক। 'শনিবারের চিঠি' এবং সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। শনিবারের চিঠির ভোল পাল্টেছিল তাঁর কবিতার সুরে ও ছন্দে। অনেকজনে অনেক সুরে অনেক ছন্দে তাকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'রূপিণী

কন্যাটির কণ্ঠস্বরে সজনীকান্তের দেওয়া সুরই বেজে উঠেছিল স্বভাবসঙ্গীতের মত এবং তাঁর পাঠকবৃন্দই তার গতিপথে সঞ্চারিত করেছিল স্বকীয়তার বেগ। এই সংঘটনের মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর নিজের এবং 'শনিবারের চিঠি'র ভবিষ্যৎ। এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ও ধারণা তাঁর ইংরাজী শিক্ষাধারার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। যদি বলি যে, তখনকার আধুনিক সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁদের তাই হয়েছিল, তাঁরা আমাদের সমাজের আচার-বিচারের যেটুকু জীর্ণতা ও বিকৃতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সমস্ত সমাজকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন, অসুস্থ হৃদপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতীয় হৃদয়কে ছিন্ন করে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন—তবে বাড়িয়ে বলা হবে না। তৎকালীন ইংরেজীভাবে অতিমাত্রায়-প্রভাবিত সাহিত্যিক ও রসিক সম্প্রদায় যতই সে সাহিত্যের বাহবা দিয়ে থাকুন সাধারণ বাঙালী সমাজ—তাঁদের মধ্যে ইংরিজী পড়া ও ইংরিজী না-পড়া মোটা বাঙালী সমাজ এই সাহিত্যকে আনন্দের সঙ্গে আপনার বলে গ্রহণ করেন নি। প্রতিবাদ উঠেছিল বাঙালী-হৃদয় থেকে। তাঁর হৃদয়ের প্রতিবাদ 'শনিবারের চিঠি'র কণ্ঠস্বরের সহায়তায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এবং বাংলাদেশের খাঁটি বাঙালী সমাজ তাকে গ্রহণ করেছিল। এ সত্য—একটা কালের সাহিত্য ও সমাজের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘটনের যে ইতিহাস সেই ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত।

আরও ঘটনাপরম্পরা আছে, যার ফলে শনিবারের চিঠির সঙ্গে সজনীকান্ত জড়িয়ে পড়েছেন—সত্যসত্যই কন্যা-পিতার মত। সে সব ঘটনা অল্পবিস্তর সুবিদিত। শনিবারের চিঠি—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযোগানন্দ দাসের পরিচালনায় সাপ্তাহিক হিসেবে কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হল। কিছুকাল পর আবার প্রকাশিত হল মাসিকপত্রাকারে। এ পর্যায়ে প্রকাশও আবার বন্ধ হল। এর পর সজনীকান্ত গভীর আকর্ষণে ও অন্তরের প্রেরণায় উপার্জনকরী অন্য কর্ম ত্যাগ করে অনন্যকর্মা হয়ে নিজের যথাসর্বস্ব এমন কি পত্নীর আভরণ পর্যন্ত দায়যুক্ত করে শনিবারের চিঠিকে লালনের ভার গ্রহণ করলেন। পুরনো শনিবারের চিঠিগুলি দেখে আমার কতবার মনে হয়েছে, তার লালন-পালনে তিনি তাকে অন্নবস্ত্র-উপার্জনক্ষমা করে তোলার মত শিক্ষায় গঠন না করে, তাঁর আদর্শে ব্রতপালনক্ষমা করে তোলার মত শিক্ষাকেই বড় করে তুলেছিলেন; শনিবারের চিঠির সাহিত্য-জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রেও জাতীয় জীবনের সম্পদ। এই নূতন পর্যায়ে পুরাতন নূতন শক্তিশালী বন্ধু ও সমব্রত-ধারীর অভাব হয় নি। মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ও অধিনায়ক। রবীন্দ্র মৈত্র, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আবার এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও ছিলেন শ্রীগোপাল হালদার—তখন তিনি জাতীয়তাবাদী। এবং আরও অনেকে। এ কালের সব কথা আমার শোনা, চোখে দেখা নয়। যাত্রাপথ সুগম ছিল না, দুর্গমই ছিল। এবং

ভুলও হয় নি এমন নয়। আমার বিচারমত আমি বলছি এ কথা। একালের শনিবারের চিঠি পড়ে এবং পরবর্তীকালে যখন শনিবারের চিঠির আসরে স্থান নিয়েছি তখনকার কালেরও অনেক লেখা সম্পর্কে আমি আপত্তি জানিয়েছি; বলেছি, ভুল হয়েছে। এবং এই সব ভুলের জন্য সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি আইন-আদালতের উদ্যত দণ্ড থেকে সাধারণের অপ্রীতির দণ্ডের সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সে দণ্ড অম্লান মুখে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভুলকে যখনই বুঝেছেন তখনই তা স্বীকার করার মত ঔদার্য এবং মানসিকতার কখনই অভাব হয় নি সজনীকান্তের। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। ১৯২৮ সনের কলকাতা কংগ্রেসে, G. O. C.র ভূমিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আক্রমণ তাঁর ভুল হয়েছিল। কবিগুরুকে নিয়েও এ ভুল হয়েছে। কিন্তু কবিগুরুর শেষ জীবনে সজনীকান্ত এবং শনিবারের চিঠি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে কবিগুরুর ক্ষমাই শুধু পায় নি, তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ তাঁর রচনাও প্রকাশের অধিকার পেয়েছে। সজনীকান্ত ব্যক্তিগতভাবে কবিগুরুর আহ্বান পেয়েছেন, তাঁর চরণে প্রণতি জানিয়ে আশীর্বাদও পেয়েছেন। নেতাজী যদি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করতেন, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর কাছেও এ আশীর্বাদ পেত শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্তও তাঁর স্নেহে ধন্য হতেন। নেতাজীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ না পান—নেতাজী সম্পর্কে সেদিনের ভুল—সজনীকান্ত এবং শনিবারের চিঠি এ কালে বারংবার স্বীকার করে তাঁকে উচ্চকণ্ঠে প্রণতি জানিয়েছে ও তাঁর মহিমা-কীর্তনে মুখর হয়েছে। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন হয় নি। সম্ভবতঃ আমি যাকে ভুল বলেছি তাকে সজনীকান্ত নিজের বিচারে ভুল বলে মানতে পারেন নি।

বঙ্গসাহিত্যের সেবক হিসাবে সজনীকান্ত এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্যা—ব্রতপালিনী কন্যার মত শনিবারের চিঠি এই কর্তব্য ব্রতধর্মের মতই পালন করে এসেছে; তাতে ভুল হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু ভুল ভুল বলে বুঝলে সংশোধনে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নি সজনীকান্ত—সঙ্গে সঙ্গে শনিবারের চিঠি।

এইখানেই সজনীকান্ত এবং তার সঙ্গে শনিবারের চিঠির সাধনার শেষ বা সব নয়। এ মাত্র একটা দিক। এ তো শুধু ভাঙার সাধনা, হোক যা মন্দ যা বিকৃত তাই ভাঙার সাধনা। এতে শক্তির পরিচয় নিশ্চয় আছে—মন্দের উপর হলেও ক্রোধ ক্রোধই, ধ্বংসাত্মক। কিন্তু কোন সাধনা বা সাধক পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ না শক্তির সঙ্গে সৃষ্টিলীলার সমন্বয় ঘটে ততক্ষণ। মহাপ্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে, প্রকৃতিতে তাই ঘটে—তাই নিয়ম; নদী এক কূল ভাঙে, এক কূল গড়ে। ভূমিকম্পের মত ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়েও হিমালয়ের মত নগাধিরাজের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু মানুষের সভ্যতায় ও ইতিহাসে এ নিয়ম অমোঘ নয়; শুধু ধ্বংস অনেক করেছে মানুষ। ব্যক্তি করেছে, দল করেছে, জাতিও করেছে। সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি যদি শুধু আঘাতে আঘাতে ভেঙেচুরে বিকৃতিরোধ করেই সাধনা শেষ করতেন তবে সে সাধনার মধ্যে বীর্য ও সংগ্রামজয়ের যত গৌরবই থাক, সে হত নিষ্ফলা সাধনা। কিন্তু তা নয়, সজনীকান্ত কবি, সজনীকান্ত স্রষ্টা,

তার সঙ্গে শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে সার্থক সৃষ্টিস্বাক্ষরে ধন্য ও উজ্জ্বল। শনিবারের চিঠির আসরের কথা বাংলা দেশে শুধু গল্পের আসর নয়, গৌরবের আসর। মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাস্থবির, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমৃদ্ধ ও তাঁদের সঙ্গে লেখকও সজনীকান্তের আকর্ষণে এসেছেন, পরস্পরের লেখা পড়েছেন, আলোচনা হয়েছে, সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেছেন, সজনীকান্তের উদ্যোগে শনিবারের চিঠির পরিচর্যায় আনন্দ অনুভব করেছেন, সাধক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, শনিবারের চিঠি সৃষ্টিফলের উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে বঙ্গবাণীর মন্দিরে ভক্তিবিনম্র মস্তকে নিবেদন করেছে।

কালের নিয়মে পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরাও পুরাতনের সঙ্গে সমান সমাদরে স্থান পেয়েছেন শনিবারের চিঠির আসরে। মনে পড়ছে যখন বঙ্গশ্রীর আসরে প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল তখন বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হোক বা না-হোক যে কোন রচনা শেষ হলেই ছুটেছি সজনীকান্তের কাছে, আমি পড়েছি, তিনি শুনেছেন, মতামত দিয়েছেন। বঙ্গশ্রীতে তিনি ছিলেন দু বৎসর। দু বৎসর পর বঙ্গশ্রী ছেড়ে চলে এলেন। তিনি যখন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক, তখন তাঁর জায়গায় পরিমল গোস্বামী সম্পাদক হয়েছিলেন। সজনীকান্ত বঙ্গশ্রী ছাড়বার পরও পরিমলবাবু বেশ কয়েকমাসই চিঠির সম্পাদক ছিলেন। এখানেও সেই লেখা শোনানো চলেছে। শুধু কি আমার! আরও কত জন এসেছে, শুনিয়ে গেছে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখা শুনে গেছেন। এই সময়েই শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠায় আমার রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। থাকতাম বালীগঞ্জে মহানির্বাণ রোডের কাছে একখানা পাঁচ টাকা ভাড়ার ঘরে, খেতাম পাইস হোটেলে, দুপুরে এসে বসতাম শনিবারের চিঠির আপিসে। লেখা শোনাতাম, ওখানেই বিশ্রাম করতাম। তারপর একসময়—আমার শরীর তখন ভেঙেছে—১৩৩৯ সন, পাইস হোটেলে খাওয়া সহ্য হয় না, সজনীকান্ত আমাকে আমন্ত্রণ করলেন শনিবারের চিঠির আলয়ে, দু মাসেরও অধিককাল শনিবারের চিঠির পরিচর্যায় পরম তৃপ্তি অনুভব করেছি। জীবনে 'অন্নঋণের' মত নিষ্ঠুর ঋণ আর হয় না, এ যেন সারা জীবনে পরিপাক পায় না, মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে পীড়িত করে রাখে; জীবনে, এই সাহিত্যসাধনার সময়, আমার দ্বারা উপকৃত কোন আত্মীয় বন্ধু (উপকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক) আমাকে তাঁর ওখানে উঠতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর সে অন্নমূল্য আমার উপকারকে তুচ্ছ করে আজও বহুমূল্য যা ক্রমেই গুরুপাক হয়ে উঠেছে, আজও তার দরুন পীড়া অনুভব করি। কিন্তু শনিবারের চিঠির এই পরিচর্যা, এই অন্ন কখন যে পরিপাক পেয়ে গেছে তা বলতে পারব না। কোনদিন কোন পীড়া অনুভব করি নি। শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত বরং এই সত্যই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ধন্য হয়েছেন একজন সাহিত্যসাধকের সেবা করে।

আচার্য মোহিতলালের সেবায় ধন্য হয়েছে শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত। সাহিত্যরথী বনফুলের সেবায় কৃতার্থ হয়েছে শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত। এক্ষেত্রে যে প্রেম দেখেছি তা সচরাচর দেখা যায় না। দুর্লভ।

সজনীকান্ত দোষলেশহীন ত্রুটিহীন চরিত্র মহাপুরুষ এ অবশ্যই বলি নে আমি, 'শনিবারের চিঠি' অতুলনীয় সাহিত্যের আকর তাও বলি নে। গৃহী মানুষ, কর্মী মানুষ, দোষে-গুণের সমন্বয়ে গড়া, জীবন কর্ম ব্যর্থতায় সার্থকতায়, ভ্রান্তিতে সংশোধনে দৃঢ়তায় 'পতন অভ্যুদয় পন্থার মত' বন্ধুর, কিন্তু এই মানুষ এবং তাঁর কর্ম কখনও হীনমন্যতায় দুষ্ট এবং পতিত নয়। বলিষ্ঠ মানুষ, আদর্শবাদী মানুষ, প্রেমিক মানুষ; তাঁর মানসকন্যা শনিবারের চিঠিও তাই। সজনীকান্তের বিয়োগে শনিবারের চিঠি আজ পিতৃহীনা হল।

তাঁর মৃত্যুর ক্ষণে আমি তাঁর পাশে বসে; ডাক্তারেরা চলে গেলেন; পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আমাদের পাটুদা পাশের ঘরে চলে গেছেন—কাঁদছেন; আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, চোখের সামনে সজনীকান্ত চলে গেলেন। ধরাশায়ী বীরের মত তিনি বিছানায় এলিয়ে পড়ে গেছেন। স্ত্রী, পুত্র, পুত্র-বধূ, কন্যারা উৎকণ্ঠা-কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর নিমীলিতদৃষ্টি মুখের দিকে। ভাবছেন চোখ মেলবেন এখনি। বুঝতে পারছেন না কি হয়েছে। আমাকে তাঁর চতুর্থ কন্যা সোমা হাত ধরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল, জ্যাঠামশাই, কি হয়েছে? বলুন না, ডাক্তারেরা চলে গেলেন কেন? পর পর সব মেয়েরা প্রশ্ন করল, তাঁর স্ত্রী কাতর ভাবে প্রশ্ন করলেন, বলুন তারাশঙ্করবাবু? আমাকেই এ নির্মম সত্য প্রকাশ করে বলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মীরা প্রথম, তার সঙ্গে সকলে চিৎকার করে প্রতিবাদ করল, না—না—না।

আমি নিচে নেমে আসবার সময় সজনীকান্তের গ্রন্থাগারের দরজায় যেন আরও কার কণ্ঠের এই প্রতিবাদ শুনেছিলাম। সে কণ্ঠ তাঁর মানসকন্যা শনিবারের চিঠির।

সজনীকান্তের তিরোধানে পিতৃহীনা হল শনিবারের চিঠি; পিতৃগৌরব এবং গুরুবল হারিয়ে আজ সে একা। স্তব্ধ বিষণ্নমুখে সে ভাবছে তার পিতৃদত্ত মন্ত্রসাধনার গুরুভার এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে তো?

সজনীকান্তের সহকর্মী বন্ধু যাঁরা তাঁদের সঙ্গেই আমি বলব, পারতে হবে। এতকালের যে শিক্ষা, তন্ত্রধারক সজনীকান্তের চালনায় যে হোমাগ্নি জ্বলেছে, তাকে অনির্বাণ রাখতে হবে। তিনি তো তোমাকে একাকিনী রেখে যান নি, তোমার চারিপাশে সমবেত করে দিয়ে গেছেন নবীন তপস্বীর দল। হোমকর্মের এক পর্যায় শেষ হল, জীবন ঢেলে দিয়ে সজনীকান্ত পূর্ণাহুতি দিয়েছেন, আবার নূতন তন্ত্রধারকের পরিচালনায় নূতন অগ্নি স্থাপন কর।

তার পূর্বে পিতৃবন্দনাকৃত্য শেষ কর, হাত জোড় করে বল, পিতা, গুরু, দিব্যরথে তোমার ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতরলোকে গতি অব্যাহত হোক, আমরা দিব্যরথের জ্যোতির্লেখা যতক্ষণ দূরতম ঊর্ধ্বলোকে চক্ষুর অগোচর না হয়, ততক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি।

তারপর নবমন্ত্রে আবাহন করে অগ্নি স্থাপন কর।

'কাব্য-তর্পণ'

[সজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। আজ সেই কবিকণ্ঠ নীরব হয়েছে। আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলন 'রাজহংস', 'মানস-সরোবর', 'পান্থ-পাদপ' ও 'পঁচিশে বৈশাখ' থেকে কয়েকটি কবিতার অর্ঘ্য সাজিয়ে 'কাব্য-তর্পণ' রচনা করলাম।]

কে জাগে?

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা ;
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত।—
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে।

জেগে আছে যারা পানের দোকানে মদের
বেসাতি করে,
বিড়ির দোকানে কোকেন যাহারা বেচে ;
চাটের দোকানে প্লেটে সজ্জিত কাঁকড়া, ডিমের ঝাল
গলদা চিংড়ি, বেসনে পলতা-ভাজা—
শীতের হাওয়ায় শুকায়ে হয়েছে কাঠ।

জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—পাখা খুলে দিয়ে ভূতের নৃত্য
করে—
মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন ঘন তারা পানওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে, কাঁদে, গান গায় অকারণ।
বুদ্বুদ-সম কারেন্সি নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়।

জাগিয়া রয়েছে তাহাদের বধূ যাহারা ফেরে নি ঘরে,
মা-হতভাগিনী স্নেহময়ী কারো জাগে,
রাত বাড়ে যত শুকাইছে বাড়া-ভাত,
সদর-দরজা খুলে দিতে হবে, ঘুমে ঢুলে
আসে আঁখি।

সরিষার তেল প্রলেপ করিয়া চোখে
জাগে বধূ, তার জ্বালা-ধরা চোখ জলে ছলছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ পাশের ঘুমানো খোকার
ঠোঁটে।

ললাটে তোলে না হাত,
অদৃষ্টেরে ধিক্কার দিলে পাছে লাগে অভিশাপ।
ভাবে ব'সে আর যত্নে লাগায় তালি,
দুইটি মাত্র পরনের শাড়ি ছিঁড়েছে ধোপার ঘরে।

যক্ষ্মার রোগী জাগিয়া কাসিছে ব'সে,
নয়নের জ্যোতি ঝাপসা হতেছে ক্রমে,
চারিদিকে যত মানুষ এবং ঘরবাড়ি গাছপালা
লাগে সুন্দরতর।
আঁকড়ি ধরিতে চাহিছে যখন, মুঠি খুলে খুলে যায়,
নিবে আসে ধীরে মলিন জীবন-বাতি।

তাহারই শিয়রে বসি
ক্লান্ত প্রেয়সী তন্দ্রায় জেগে আছে,
জাগিবে যে কত দিন!
যত জাগে তত সিঁথির সিঁদুর চওড়া ও গাঢ় করে,
হাতের নোয়ায় মনে হয় তার ঠিকরে হীরক-দ্যুতি।

জাগে কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে কাল যার আয়ু
শেষ—

যে জন শোনে নি বহুকাল কানে, প্রিয়া ডাকে,
"ওগো, শোন"—

সাধের কন্যা ডাকে, "শোন শোন, বাবা।"
সহসা শিহরি মর্মের মাঝে ডাক শুনে জেগে
আছে ;—
কোথায় যেন রে বিনিদ্র ঘরে প্রিয়া ফেলে নিশ্বাস;
ঘুমায়, তবুও খুকী ছটফট করে।
কম্বলে তার শুয়ে আধখানা, আধখানা গায়ে দিয়ে,
লাপ্‌সি ভুলিয়া আঁধার কক্ষে চেয়ে কড়িকাঠ পানে
জাগ্রত আঁখি ঝাপসা যাদের হয়—
তারাও জাগিয়া আছে ;
তারা প্রতীক্ষা করে—
প্রিয়া-বাহুপাশ একদা জড়াবে গলে,
সাধের কন্যা কণ্ঠলগ্না হবে,
আছে আশা, আশা মনে তবু কত আছে।

কাল যার আয়ু শেষ—
সে জন জাগিয়া খোঁজে আকাশের তারা,
কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে চোখ দেয়ালে
কি যেন খোঁজে,
চটা উঠে গিয়ে এখানে সেখানে ফুটে ওঠে কত ছবি,
কত চেনা মুখ, অচেনা ভঙ্গী কত ;
ভুলে-যাওয়া কোন্ বাল্য-সখীর ঠিক যেন এলো
খোঁপা।
কবন্ধ আর ছিন্নমস্তা-ছায়া
দেয়ালে দেয়ালে জাগে—
চমকি জাগিলে মিলায় পলকপাতে।
মনে প'ড়ে যায়, পাশের বাড়ির মেয়ে
একদা আসিয়া বলেছিল কবে, ভেঙে গেছে পেন্সিল,
বেড়ে দিতে হবে—সকাতর অনুরোধ ;
ধমকিয়া তারে বলেছিল, নাহি হবে।
যে বেদনা-ছায়া নেমেছিল কালো চোখে,
সেই স্মৃতিখানি কেন তার মনে আসে,
কাল যার আয়ু শেষ।
মার আঁখিজল নহে,
কবে কোথা দ্রুত সাইকেলে যেতে, নেহাত
অসাবধানে
চাপা পড়েছিল একটি কুকুরছানা,
তাহারই আর্তনাদ।

জাগে পাগলিনী, পাগলা-গারদে গরাদে
রাখিয়া হাত,
ঘুম নাই তার চোখে,
মুখে হাসি ঘন-কান্নার মত ঠেকে,
পরনে জীর্ণবাস।
একে একে তার সন্তান যত মরিল কালের ঘায়ে—
জাগ্রত মহাকাল।
তাহাদেরই পথ চেয়ে জেগে আছে জননী
উন্মাদিনী—
অন্ধকারের চরণ-শব্দ শোনে নিবিষ্ট মনে,
হঠাৎ হাসিয়া উঠে ;
হঠাৎ আর্তনাদে
স্তব্ধ নিশার নিবিড় শান্তি ক্ষণ-বিঘ্নিত করি
ডাকে, আয় বাছা, হাঁটি হাঁটি পায় পায়।
প্রসারিত বাহু ব্যর্থ শীতল হয়,
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়ে—
ফোঁটা ফোঁটা দুধ কারার ধুলায় পড়ে টপটপ
করি—
যুগান্তরের সঞ্চিত কালো ধুলা।
সৃষ্টি শিহরি উঠে,
কাঁদে গতি-বন্ধ্যায়।

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান—
জাগে নিগুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্বিকার ;
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর,
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া
পড়ে—
তারে তিনি দেন কোল।
জাগে অশক্ত সর্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান !
শুধু হাসে মহাকাল—
হা-হা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী-দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ,
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে !
সে ক্রুর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত
দোতলায়
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

কালকূট

পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলুষিত হয়েছে যাহারা,
লোভে ক্ষোভে জিহ্বা-মুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
দূর হতে লালাস্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা,
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
দু কথা তাদের কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।

রৌদ্র নাহি ভালবাসে, মাথার উপরে ঘোরে পাখা,
কেঁদে যায় আকাশের হাওয়া।
ছবির মেঘের বুকে দেখে তারা সিনেমার চাঁদ,
স্টুডিও-উইয়ের-ঢিবি হিমালয়ে করিছে আঁধার।
জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাম্বু-বিস্তার,
উঠানের টবে হেরে বারিধির উন্মত্ত নর্তন ;
সাগরে জলের ঢেউ আছাড়িয়া তটেরে কাঁদায়।

বালুময় বেলাভূমে ছাতার আড়ালে রহে তারা,
সেথাও ড্রইংরুম-প্রেম।
তাদের বসন্ত আসে, ঝরে না গাছের মরা-পাতা,
রঙে সাজে কাগজের ফুল,
নিখুঁত জ্যামিতি-কষা 'বেডে' ফোটে ফুল মরসুমী—
অপরূপ নাম তাহাদের ;
সে নাম যাহারা শোনে, মালীরে ধুলার দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে কানে শোনাব মৃত্যুর শতনাম।

দশ ধাপ সিঁড়ি উঠে, বেঞ্চ-পাতা 'হলে' যাহাদের
নির্লিঙ্গ দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গ্যানে কোরাস ;
তত ধর্ম যত ওঠে হাই,
চর্মের ভ্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়া,
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি বালি কর্দম কঙ্কর।
মর্মর-বেদীর 'পরে দেখিয়াছি হাসিছে করোটি—
দেবতা মৃত্যুর পাত্রে পান করে জীবন-আসব—
পান করে, হাসে খলখল।
পমেটম-ক্রীম-ঢাকা চর্মে হায়, লাগে না শিহর,
কর্ণে নাহি পশে অট্টহাসি !
ধর্মের মন্দির-গর্ভে চিতাধূম দেখিয়াছি আমি—

প্রেমের বেদিকামূলে লেলিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল-ভ্রূকুটি।
মায়া-মোহ-যবনিকা ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
জীবনের রঙ্গমঞ্চে দেখাব মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া নমস্কার।

স্বার্থের উদ্দাম লীলা লালসার উলঙ্গ মত্ততা,
প্রেমের মুখোশ পরি কি বীভৎস কামের কলুষ !

সন্তান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আয়ার সাধনা,
ক্লীব স্বামী ঔদার্যের ছলে
পত্নীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে
পর-অর্থে চালায় সংসার।

সংসার!
ঝ'ড়ো হাওয়া আকাশে আকাশে—
ধূলি বালি ওঠে আবর্তিয়া,
শাখাচ্যুত শুষ্ক পত্র শুষ্ক ফুল উড়িছে চৌদিকে,
ঝলসিছে শ্যাম কিশলয়।
ফুলের সংসার আর গাছের সংসার—
মরিয়া ঝরিয়া পড়ে ফুরাইলে আয়ু,
মরে আর বাঁচে।
জরাগ্রস্ত বিকৃতেরে বাঁচাবার নাহিক প্রয়াস,
পীতেরে সবুজ নাহি করে।

মানুষের ঘরে ঘরে ফুলের বাগান—
মাঠে মাঠে পথে ঘাটে গৃহের প্রাঙ্গণে
মানুষের প্রতিবেশী গাছেরা বিকৃত হয়ে আসে,
স্বভাব বীভৎস হয় ক্রমে;
শতদল হয় দলহীন—
মৃত্যু হয় নিতান্ত মরণ।
সে-মরণ-ভীত আমি, মৃত্যুরে জেনেছি মহীয়ান—
জানাইতে চাই সবে মূঢ় সেই মরণ-স্বরূপ।

শিশুর পীযূষ-স্তন্য চাটিতেছে দন্তহীন বৃদ্ধের রসনা,
যে মরিবে সে মারিছে যে বাঁচিবে তারে;
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিরূপ বীভৎস হয়ে জীবনের রোধিয়াছে পথ।

একের লালসা—
অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রের অন্ন-দানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্যার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিরুচি,
মোটর-ব্যসন আর হোটেল-বিলাস—
সব কিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা।
বহুরে বঞ্চিত করি।
এক-কাম-বহ্নি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আহুতি;
দগ্ধ-প্রেম-ভস্মে জন্মে উদরের সামান্য সংস্থান।

রমণীর মাতৃত্বেরে দিকে দিকে করিছে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ;
বক্ষে ক্ষীর আসিতে না পায়।
দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের দুগ্ধ করে ক্রয়—
দেহ-জাত হায় রে সন্তান!

যুগযুগান্তর ধরি পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিছে মায়ের কোলে বসি—
মাতা অসহায়—
সাম্রাজ্য ফ্যাক্টরি মদ আফিম কোকেন
তাড়িখানা রেস্তোরাঁ হোটেল
পথে পণ্যরমণীর ক্ষুধার্ত ইঙ্গিত—
সভ্যতার রথচক্র ঘর্ঘরিয়া ছুটিছে উদ্দাম।
লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সম্মুখে
রথচক্রতলে তার ছিন্নভিন্ন দেহ—
রক্তস্রোতে কর্দমাক্ত ধূলি।
সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরূপ মৃত্যুর বৈভব।

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী দেখিয়াছি মানুষের চোখে
লালসার পঙ্কিল ইঙ্গিত।
মানুষের যন্ত্ররূপ, মানুষেরে করিতে হনন—
সর্পরূপে পশুরূপে পরস্পর চলে হানাহানি।
প্রভুত্ব দাসত্বে হানে, কদর্যতা হানে সুন্দরেরে—
বাহিরে মোহন আবরণ।
নাট্যালয়ে অভিনয়, সিনেমায় চলচ্চিত্র ছবি,
মানুষে টানিছে নীচে, টানে টানে ঘোর উন্মাদনা—

অর্থ দিয়া করে বিষপান।
আঁকড়িয়া ধরিবারে প্রিয় প্রিয়তর জীবনেরে
জীবন চুঁইয়া পড়ে মুঠিতল দিয়া,
মৃত্যু আসে নিঃশব্দ-চরণ।

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি।
ভূমিকম্প নহে তাহা, নহে গিরি-বিদারণ-রূপ—
সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত,
দিকে দিকে থৈ-থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব।
তারই মাঝে জীবন-অঙ্কুর
শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

আমার মৃত্যুর মাঝে দধীচির নিজ অস্থিদান,
রাজা শিবি দেহ-মাংস অকাতরে করে নিবেদন
কপোত-শরণাগত লাগি।
ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ মোর সে-মৃত্যু মহান—
অগ্নিদগ্ধ বীরাঙ্গনা-রূপ,
মৃত্যুতীর্থ-স্নানে ধায় বীরদল উত্তর মেরুতে,
হিংস্র শ্বাপদের মুখে অরণ্যে গহন,
সুনিশ্চিত সলিল-সমাধি।
জীবের কল্যাণ লাগি মোর মৃত্যু করে আবিষ্কার
নব জীবরসায়ন,
অপরূপ যন্ত্র-উদ্ভাবনা, মৃত্যুকর স্পর্শি হাসিমুখে—
হাসিমুখে ঝাঁপ দেয় ঘোরতর সমর-অনলে
আর্ত পীড়িতের সেবা-কাজে।
বন্দীর বন্ধন
মুক্তিকামী মৃত্যু মোর আপনার গলে লয় তুলি—
সে মৃত্যুরে করি নমস্কার।

দূর কর মোহ-আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
হাসুক শ্যামল কিশলয়।
যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়,
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে
সে জীবনে বার বার জানাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কালকূট।

বজ্র-আশীর্বাদ

হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
সুদুর্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।
ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে, যাহা পাই, মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে
অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস!

এর মাঝে তোমাদের কোথা স্থান, হে বাসব,
তোমরা অমরলোকবাসী—
নন্দনের পারিজাত-মাল্য শোভে গলে তোমাদের,

নিশিশেষে মালা না শুকায়।
নৃত্যরতা উর্বশীর নগ্নতা বীভৎস নাহি হয় ;
স্খলে না চরণ তার, থামে না সে অশ্রুসিক্ত আঁখি,
কামনা-জড়িত কণ্ঠে তীব্র স্বরে ওঠে না ঝঙ্কারি।
তোমরা চাহিয়া থাক নিত্যকাল অপলক-আঁখি,
ঘুমঘোরে নাহি পড় ঢুলে,
কাম-কন্টকিত দেহে আছাড়ি পড় না কোনো
অপ্সরা-চরণে,
ব্যর্থতার অশ্রু কভু গড়ায় না দুই চোখ বেয়ে।
কামহীন মৃত্যুহীন অবিরহী হে দেবতাকুল,
আমরা কাঁদিয়া মরি তোমাদের ভাগ্যহীনতায়—
আমাদের মাঝখানে তোমাদের কোথা দিব স্থান ?

তোমরা উর্ধ্বেতে থাক, হে দেবতা নন্দননিবাসী,
উর্ধ্ব হতে আমাদেরে কর কর বজ্র-আশীর্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মৃত্তিকাবক্ষে পদচিহ্ন নিমিষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেষ হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতি ব্যর্থ স্মৃতির মন্দিরে
স্মৃতির শ্মশানভস্ম কালস্রোতে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পুনঃ
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

আপনারে উৎসারিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙেচুরে চ'লে যাই নিঃশঙ্ক গর্বান্ধ পদাঘাতে,
দলিয়া পিষিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে ;
নির্মম কুঠার হানি সম্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ খলখল হাসি অট্টহাসি।

সবারে পশ্চাতে ফেলি দূরে গিয়ে ফেলি অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী ;
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিক প্রয়োজন।
চোখে পুন লাগে রঙ, ধরা পড়ি, করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেয়সীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহ্বল নেত্রে মধ্যরাত্রে পূজি বারাঙ্গনা,
শুচিস্নান করি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।

এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায়, পুনঃ আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

শাশ্বত নন্দনে তব, হে বাসব, কে আছে দেবতা—
পড়ে পাষাণের লেখা, গনে নর-জীবনের ঢেউ ?
কেহ নাই, নিঃসঙ্কোচে হান হান হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্ধা কত মিশিল ধুলায়—
কত উর, বাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে যুগে কত জাতি জন্ম নিল, মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গীজ, তৈমুর—
পাষাণ-মর্মর-মূর্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণ-ভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত-সীমায়।

বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা ত্যজি ধরাপৃষ্ঠে নামিয়াছি মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায়,
মেঘচুম্বী দেবলোকে মুহুর্মুহু হানিতে কুঠার
করেছি আকাশযাত্রা কামনার ডানা ঝাপটিয়া।
সাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিকায় জলসর্প শুয়ে যেথা প্রবাল-শয্যায়।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে শ্বাপদ-গুহায়,
মর্ত্যের মৃত্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাণিক্য-সন্ধান,
হিমাচল-শৈলচূড়ে মৃত্যুসাথে যুঝি বারম্বার,
তুষারেতে পদচিহ্ন মুছে যায় হিমমেরু-পথে।
বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের

উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাসধ্বনি!
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান
স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অতিলুব্ধ মানব-সন্তানে—
আমারে করেছ ক্ষমা?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে যুগে কর আশীর্বাদ,
রূঢ় বজ্র হানিয়াছ বারম্বার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা ঊর্ধ্বে থাকি প্রবল বিক্ষেপে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্ধা মোর ভাসায়েছ কতবার প্রলয়-প্লাবনে,
ফুঁসিয়া বাসুকী তব বারম্বার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে ঢাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অতলে,
কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহামারী-রূপে।
কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব? এরি মাঝখানে
আমার প্রচণ্ড দম্ভ বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন—
মুহুর্মুহু গর্জিল কামান,
বিষবাষ্প ছড়াল চৌদিকে—
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।
আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি?
কর নাকি বজ্র-আশীর্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল হুঙ্কারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে?
আর কত বজ্র আছে, হে বাসব, ওহে বজ্রপাণি,
কত অস্থি, কত দধীচির?
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী,
তোমাদেরে করি না স্বীকার—
বজ্র হান, বজ্র হান শিরে,
বজ্র হান, হে বাসব।

আমি

প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি বারতা,
মাটির আঁধার হতে বিষ-বাষ্প দিয়াছে উত্তর।
মোর শান্ত মুহূর্তের অন্তরের সহজ কামনা—
উদার পরিধি আর অনন্ত বিস্তার,
আলোকের প্রসার বিপুল—
উত্তেজিত মুহূর্তের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চক্রব্যূহে
কুণ্ডলিত সর্পসম পাকে পাকে জড়ায়ে জড়ায়ে
ফুঁসিয়াছে জীর্ণ ক্ষুদ্র আপন বিবরে;
বৃহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা,
অভ্রচুম্বী চূড়া মোর নিমেষে করেছে ধূলিসাৎ।
কে আমি, কি মোর পরিচয়—
এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি পাসরি
ভালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ, রস, রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব;
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল,
হবে না প্রকাশ কোন দিন।

জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহতেরে বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।
দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, ভুল-ভ্রান্তি স্খলন-পতন—
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিত,
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার ঝরে অশ্রুজল।
সমস্ত ক্ষুদ্রতা-ক্ষোভ অসহ্য যন্ত্রণা-দুঃখ মাঝে,
প্রতিদিবসের অতি ব্যর্থ শূন্য নিরর্থক কাজে—
মাথার উপরে স্থির স্তব্ধ শূন্য অনন্ত আকাশ,
দীর্ঘ বনস্পতি-শিরে নবশ্যাম কচি কিশলয়,
নামহীন পাখীদের গান,
নিভৃত অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে গেয়ে-ওঠা বঞ্চিতের
অসম্পূর্ণ গান,

হঠাৎ কাঁপিয়া-জাগা সুর,
হঠাৎ ভাঙিয়া-পড়া বন্ধুত্বের প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রচুর।
নিজে বেশ ভাল আছি, অকস্মাৎ বুঝিয়া বিস্ময়ে
নিপীড়িত দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে দুই চক্ষে ছলছল জল—
যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যত আমি ব্যর্থ হই,
বৃহতে বিরাটে নমস্কার,
নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো নমো নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।

ঊর্ধ্বে শূন্য নীলাকাশ,
বারম্বার তবু ভুল হয়—
ঘরের কপাট রুধি, বাহিরের রুধিয়া বাতাস,
আপনার বিষ-বাষ্পে আচম্বিতে হাঁপাইয়া উঠি;
মর্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,
রূঢ় কহি প্রিয় বন্ধুজনে—
বিকৃত বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
আপনি শিহরি উঠি নিজেরে প্রত্যক্ষ করি
মনের মুকুরে।

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,
মোর মূর্তি সত্য এ তো নহে—
সে তো নহি আমি।
পীড়িতের ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে
একা জাগি আমি,
একা গাহি গান—
কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—
অর্থ তার গুপ্ত রহে সুর আর ছন্দের আঁধারে,
আমি—মোর নামের আড়ালে;
নাম সে মরিয়া যাবে, উদার নিঃসীম শূন্যে
আমি তবু রহিব জাগিয়া।
বন্ধু, শোন তোমাদেরে বলি
অনন্ত আমার এই চোখে-দেখা খণ্ড ইতিহাস,
যতটুকু আমি তার জানি—

আকাশে খসিছে তারা, নদীতটে ভেঙে পড়ে ঢেউ,
ছায়া কভু পড়ে নাকো শুভ্র স্বচ্ছ আকাশের নীলে,
দাগ কভু পড়ে নাই টলমল বারিধির বুকে;
সে বিরাট শূন্যতায় আমি পরিচয়-হীন
তোমাদের কাছে;
তোমরাও নহ প্রয়োজন।
সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার-
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর।

শূন্যতায় রৌদ্র করে মায়ার সৃজন,
রূপে রঙে তাহার বিকাশ—
মানুষেরে রঙ দেয় রূপ দেয় শুধু ভালবাসা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে একমাত্র মায়া-যাদুকর।
আমি ভালবাসার কাঙাল—
আমারে ডাকিয়া কাছে আমারে নির্মাণ করি লও
ক্ষণিকের আলোক-সম্পাতে,
তোমাদের প্রেমের আলোকে।
দেহহীন মানুষেরা নিরালম্ব ভাসিছে অসীমে
পরস্পর-পরিচয়-হীন—
যার যত ভালবাসা তার কাছে ততই প্রকাশ।

বিশ্ব তার ভ'রে ওঠে রূপের গৌরবে,
প্রেমের রহস্যে ঘেরা এ বিশ্বের পরিধি বিপুল—
আমারে তোমরা দাও প্রেম,
রূপ দাও, দেহ দাও মোরে।

সমস্ত বেদনা-বিষ এ জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে;
মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের
আর কোনো নাহি পরিচয়।

পুনর্বসন্ত

আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যাম তৃণদল পড়িছে ঢাকা,
নদীতীরবাহী প্রান্তরে পুনঃ নব পথরেখা উঠিছে জেগে,
জাহ্নবীবুকে লঘু মেঘছায়া মায়া-মনোহর সৃজন করে,
সন্ধ্যার বায়ে ভাসিয়া আবার আসিছে শ্রবণে হারানো সুর।

তুমি একদিন ধরেছিলে হাত, স্মরণে কি আছে সন্ধ্যা সেই ?
ধূলি ও ধোঁয়ায় কালো শহরের মাথায় আকাশে গোধূলি-রঙ,
ঠিক মনে হ'ল, মুমূর্ষু দিবা বিদায়ের হাসি উঠিল হেসে—
শূন্যে উধাও ছুটেছিল যেন লাইনে বদ্ধ ট্রামের চাকা।
সহজ স্নেহেতে আপনার হাতে নিয়েছিলে মোর হস্তখানি,
জানিতে কি সখি, সে পাণি কখনো হবে না পীড়িত মন্ত্রপাতে ?
গঙ্গার জলে একজোড়া মুখ তড়িৎ-আলোকে ফেলিছে ছায়া,
কাঁপা কাঁপা জলে পড়িতে সেদিন পেরেছিলে ছায়া-মুখের ভাষা ?
মনের ভাষা তো পড়িতে শিখি নি, মনে আছে শুধু গানের ভাষা।
কে জানে কখন কোন্ ভাবাবেশে সুরে গাঁথে কথা বিশ্বকবি—
তাঁরি জবানিতে প্রশ্ন-আতুর মন পেয়েছিল জবাব বুঝি,
তোমার মনেতে কি ছিল হয়তো জানিতে আজিও পারি নি তাহা।

তারপর এল শ্রাবণ-রাত্রি, অমা-যামিনীর অন্ধকারে
উদ্যতফণা ফণীও করিল সংহত তার দশন-লীলা।
মনের কামনা মনে র'য়ে গেল, দেহের মিলন বাতাসে কাঁপে,
তুমিও বুঝিলে, আমি বুঝিলাম, নিঃশ্বাস এল রুদ্ধ হয়ে,
ক্ষণ-ইতিহাস ভেসে গেল সখি, বিরাট কালের স্রোতের জলে,
মহাসমুদ্রে প্রবাল হইয়া হয়তো কোথাও জাগিয়া আছে।
তুমি কি চেয়েছ, আমি কি চেয়েছি, ফিরে পেতে সেই হারানো ক্ষণে,
বাঁকা ঠোঁটে তব হাসির রেখাটি বেদনা গোপন বহে কি আজো ?
অনেক সয়েছি, ভুলে গেছি কথা—কথাহীন সুর মরমে জাগে
ঠোঁটে ঠোঁট আর বুকে বুক মিলে চাপিয়া মারে নি গানের সুর।
হায় সখি হায়, অধরা রহিলে তাইতে যে ধরা রঙিন মম—
বিফল প্রয়াসে শোণিতবিন্দু ভুলিতে চাহে নি সিন্ধুভাষা।
আকাশ সাগর মিলিল না আজো তাই ওঙ্কার শূন্যে বাজে,
তাই রবিকরে সাগরের জল মেঘের শোভায় আকাশ ঢাকে।

তুমি ঢাকিয়াছ আমার আকাশে, আমিও ফেলেছি তোমাতে ছায়া,
ধারাবর্ষণে কাঁদিয়াছি কভু, সাগরের ডাক শুনেছি বুকে,
নিশীথশয়নে জাগিয়া চকিতে খুঁজেছি তোমারে পাই নি কাছে—
বহুদূরদেশে মন ছুটে গেছে কমলালেবুর সোনালী বনে,
ডিঙায়ে গিয়াছে মসমাইধারা, উপলবহুল ডাউকি নদী।

আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল পড়িছে ঢাকা,
হারায়েছি যাহা করি নাই দাবি, সে কি আর সখি ফিরিয়া পাব ?
জল উবে গিয়ে জলই হয় জেনো, মন কোনদিন হয় না দেহ—
হাতে হাত রাখা প্রেমে কভু সখি স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরে না বুকে।
দুই স্রোত আসি এক হয় যদি, তবেই সাগরে নদীর গতি,
অবিরাম চলে, তাই তো সময় অসময় হয়ে ওঠে না কভু—
শ্মশানের চরে পলি প'ড়ে পুনঃ সবুজ ফসল গজিয়ে ওঠে।

বিরহচিতার আগুনে পুড়িয়া নবরূপ ধরি জেগেছি মোরা—
ভয় পেও নাকো, দুয়ার এখন মৃদু করাঘাতে খুলিয়া যাবে।
পাইনের বনে পথ ভুলে পথ চকিতে সেদিন খুঁজিয়া পেলে,
মরু-বালুকায় পথ যে হারায় মরীচিকা তার আশা যে শুধু।
আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল পড়িছে ঢাকা,
কাছে এস সখি, চুলের গন্ধে বিবাগী মনেরে ঢাকিয়া দাও।
দেহ আর মন চলে পাশাপাশি বুঝিতে পারি নি সেদিন ইহা—
দেহের শুচিতা বাঁচাইতে গিয়ে রুদ্ধ করেছি মনের দ্বারও।
কাছে এস সখি, ভুলে ভুলে আজ আসল কথাটি পড়েছে ধরা—
আবার যুগল পায়ের চিহ্নে শ্যামতৃণদল ফেলিব ঢাকি।

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

সারা দেহ জুড়ি প্রদোষে উষার নভচারী পাখীদের
কূজন ও কোলাহল—
স্তিমিত আলোয় উড়িয়া ক্লান্ত পক্ষের বিধূনন,
ভোরের আঁধারে দীপ্ত আশায় ডানা ঝাপটিয়া জাগা।
নীড়ে ও কুলায়ে প্রাণস্পন্দনে চকিত বিচঞ্চল—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?
পাদদেশে তার শতসহস্র পাদপ-সম্ভাবনা
খর্বায়তন লতাগুল্মের বিফল বিকারে হত।
রৌদ্রপুষ্ট সবুজ কোথায় ? পাণ্ডুর বনতল—
বনস্পতির মৃত্যুতে তারা পেয়েছে মুক্তি সবে ?
উদার আকাশে মেলিয়া অযুত বাহু
হয়েছে উতলা বিস্তার-কামনায়,
বনস্পতির বিহনে বনে কি জ্রমিছে এরণ্ডেরা ?
লালসালোলুপ দৃষ্টি এখনি জাগিছে কাহারো চোখে,
কোনো বঞ্চিত, ওষ্ঠে তাহার ফুটিছে মলিন হাসি—
জীবনের লোভে মৃত্যুশীতল হাসি ;
তবু আমি জানি, আশ্রয়হারা কাঁদিতেছে বনভূমি,
অভ্যাসবশে বনস্পতির নিবিড় চন্দ্রাতপ
কামনা করিছে সবে।
ধূসর রৌদ্র ভাল নাহি লাগে, আকাশের গাঢ় নীল ;
বনস্পতির মহিমায় আজো কানন আত্মহারা।
একের মাঝারে সবার সার্থকতা,
অদ্বিতীয় সে একের বিয়োগে বহুর যে কাতরতা
পেতেছে প্রকাশ নয়নে বাষ্প হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ নভপ্রাঙ্গণ করিছে মেঘমেদুর—
রহি রহি আজো ধারাবর্ষণে ঝরিছে অবিশ্রাম ;
লতাগুল্মের অরণ্যে হের ঝঞ্ঝার মাতামাতি,
মাথার উপরে আশ্রয় কারো নাই ;
কাননভূমির চির-আশ্রয় একক বনস্পতি—
বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?

বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে
কবি—

কোথায় উজ্জয়িনী ?
শুধু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।
শত-পারাবত-কূজন-মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

হায় রে উপমা, বিফল উপমা যত !
সকল উপমা হারাইয়া গেছে কাল-তমসার নীরে
হায়, 'বলাকা'র কবি,
বাঁকা ঝিলমের দুই তীর ব্যাপি নেমেছে অন্ধকার,
জমেছে আঁধার নিরবধি-চলা "বিরাট নদী"র জলে !

তুষারমৌলি নগ-অধিরাজ দেখিয়াছি হিমালয়,
স্থিত পৃথিবীর মানদণ্ডের মত—
পূজিয়াছি হিমালয়ে।
যত দেখিয়াছি, তত করিয়াছি বিস্ময় অনুভব।
ভূমিকম্পের প্রবল তাড়নে সহসা কি একদিন
চৌচির হয়ে ফাটিয়া পড়িতে দেখিয়াছ হিমালয়ে ?
সহস্রশির বিরাট নগাধিরাজে
গুঁড়া গুঁড়া হয়ে ভাঙিয়া পড়িতে তোমরা
দেখেছ কেউ ?

"মর্ত্য-মানব মোরা—
ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই অসহায়,
ধ্বংস-জরার ক্রূর হাত হতে নিস্তার কারো নাই।"
ক্ষণ-বিস্মৃতি—ক্রোধে বেদনায় চাহি অপলক
চোখে—
পাগলের মত চাহি বিহ্বল চোখে
দেখিনু মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানি—
প্রশান্ত মুখে দুটি অপলক আঁখি,
আয়ত নয়নে দৃষ্টি কেবল নাই।
যে আঁখি একদা সূর্যের মত জ্বলিত দীপ্ত তেজে—
জ্বলিত তীক্ষ্ণ তেজে—
সন্ধানী আলো—চকিতে দেখিত গোপন মর্মতল,
বিশ্বের ব্যথা জমাট বাঁধিয়া কালো সে গভীর চোখে,
দৃষ্টির লেশ নাই।

কি যে হ'ল মনে, বিহ্বল ক্ষণে কল্পনা অদ্ভুত,
মৃতের বধির শ্রবণে চাহিনু শোনাতে আর্তস্বরে—
"চাও আঁখি মেলি, কথা কও কও মর্ত্যের সন্তান,
আমরা মর্ত্যবাসী
ডাকিতেছি সবে, নয়ন মেলিয়া চাও।"
মনে মনে ডাকিলাম—
ঘরের বাতাস ভারী হয়ে এল, কেহ শুনিল
না কানে।

মর্ত্যের কবি, চিরজীবী কবি, কখন অকস্মাৎ
মলিন মর্ত্য হইতে বিদায় নিয়েছে অনিচ্ছায়।
সুন্দর এ ভুবন—
ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরম ক্ষণে।

* * *

বিমূঢ় স্তব্ধ দেখিলাম চেয়ে নিবেছে দিনের আলো—
মেঘে মেঘে কালো গাঢ় আকাশের নীল।
মানুষের কাঁধে কাঁধে চ'লে গেল মৃত মানবের দেহ,
পাবক-অগ্নি জ্বলে জাহ্নবীতীরে,
জ্বলিছে রাত্রিদিন।

* * *

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে;
সম্বিৎহারা সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হ'ল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

—

দ্বিতীয় খণ্ড : কাব্যভাষ্য

॥ প্রস্তাবনা ॥

॥ প্রীতিরতি এরস্-তত্ত্ব ও প্রেমধর্ম ॥

১৪

ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক সহজিয়া ধর্মে কাম-শক্তির উদ্গতি বা উদ্গমনের মহত্তম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'Obscure Religions Cults' গ্রন্থে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"The most important of the secret practices is the yogic control of the sex-pleasure so as to transform it into transcendental bliss, which is at the same time conducive to the health both of the body and the mind. This yogic practice with its accessories, being associated with the philosophy of Siva and Sakti, stands at the centre of the net-work of the Hindu Tantric systems, and when associated with the speculations on Prajna and Upaya of later Buddhism, has given rise to the Tantric Buddhist cults including the Buddhist Sahajiya system ; and again, when associated with the speculations on Krisna and Radha conceived as Rasa and Rati in Bengal Vaisnavism, the same yogic practice and discipline has been responsible for the growth and development of the Vaisnava Sahajiya movement of Bengal."[৭১]

উদ্গতিপ্রাপ্ত কামশক্তিকে সাধনপ্রক্রিয়ার মূলশক্তিরূপে অঙ্গীকার করে নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে ধর্মসাধনার একটি ধারা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। এর মূলে রয়েছে তন্ত্রের শিব-শক্তি-তত্ত্ব। এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা এবং বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটেছে। এঁরা সবাই এক অদ্বয় পরমানন্দ-তত্ত্বকেই চরম সত্য বলে মনে করেন। এই অদ্বয় আনন্দতত্ত্বের দুটি ধারা বর্তমান। পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে প্রকাশিত এই দুটি ধারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবার ফলে আবার এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীর ভাবে মিলিত হয়ে যে চরমতত্ত্ব রচনা করে তাই অদ্বয় তত্ত্ব। এই রূপতঃ দুই অথচ স্বরূপতঃ এক তত্ত্বের

নামই মিথুনতত্ত্ব বা যামলতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব। তান্ত্রিক মতে এই দু ধারার নাম শিব ও শক্তি। এই শিব-শক্তির মিলন-জনিত কেবলানন্দই হল তান্ত্রিকের পরম সাধ্য। এই সাধ্যলাভের সাধনপদ্ধতি বহুবিধ। সাধক নিজের দেহের মধ্যেই এই শিবশক্তিতত্ত্বকে পূর্ণজাগ্রত ও পূর্ণপরিণত করে নিজের ভিতরেই এই উভয়তত্ত্বের মিলন-জনিত অপূর্ব সামরস্য-সুখ বা কেবলানন্দ অনুভব করতে পারেন। এই শিবশক্তিতত্ত্বের বহুবিধ সাধনার মধ্যে একটি হল নরনারীর মিলিত সাধনা। এই সাধনার সাধকগণের বিশ্বাস শিবশক্তি নিত্যতত্ত্বটি স্থূলে পৃথিবীর নর-নারীর ভিতর দিয়ে রূপ লাভ করেছে। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম সাধ্য হল নর ও নারীর মধ্যে সুপ্ত শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ জাগরণ। সেই অবস্থায় উভয়ের যে মিলন তা সাধক-সাধিকাকে পূর্ণ সামরস্যে পৌঁছে দেয়—এই পূর্ণ সামরস্য-জনিত যে অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি তন্ত্রের ভাষায় তারই নাম সামরস্য-সুখ। সহজিয়া বৌদ্ধেরা তাকেই বলেন মহাসুখ, সহজিয়া বৈষ্ণবগণের ভাষায় তা মহাভাব-স্বরূপ।[৪২]

বৌদ্ধরা মূলে নির্বাণপন্থী। সুকঠোর আত্মনিগ্রহের দ্বারা চিত্তনিরোধের পথই তাঁদের ধর্মপথ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান-পন্থ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুটি মত প্রচলিত হল। যোগাচার মতাবলম্বীরা যোগশাস্ত্র চর্চার ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্বীকার করে অনাত্মবাদী মহাযানদের মধ্যেও পরোক্ষে আত্মবাদ প্রচার করলেন। ধীরে ধীরে মন্ত্রযানের উদ্ভব হল। এই মন্ত্রযান বৌদ্ধরাই বিভিন্ন শক্তিপূজার সঙ্গে তান্ত্রিকতাকেও অবলম্বন করলেন। প্রথমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসধর্মে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয় নি। বুদ্ধশিষ্য আনন্দই নারীজাতিকে সন্ন্যাসের অধিকার দিয়েছিলেন। তারই ফলে ধীরে ধীরে বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের মত শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয় পেয়েছিলেন। এঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য অবশ্যই ছিল নিবৃত্তিমার্গ। কিন্তু পরে এঁদের মধ্যেই পুরুষ ও নারীর মিলিত সাধনার পথ গৃহীত হতে লাগল। এই মিলিত সাধক-দল প্রচার করলেন, নিরবচ্ছিন্ন ভোগসাধনের ফলে যে সহজানন্দ লাভ হয় তা দিয়েই নির্বাণপদ সিদ্ধ হতে পারে। এই নবসম্প্রদায়ের নাম হল 'বজ্রযান'। প্রবৃত্তি-মার্গী এই নবসম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ এবং বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁর শক্তির কল্পনা করে বজ্রসত্ত্বযান বা বজ্রযান মার্গ প্রচার করলেন। 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাবজ্ঞান'রূপ মহাসুখই বজ্রযান বৌদ্ধদের প্রধান লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ 'চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই গ্রন্থের আটশো বছর আগে হাতে-লেখা একখানি টীকার কিয়দংশ নকল করে এনেছিলেন। তাতে 'সহজতত্ত্বে'র ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। তা থেকে জানতে পারা যায়, বজ্রযানদের মতে আনন্দ চতুর্বিধ: আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। এর মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায়, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের যাতে অনুরাগ জন্মে তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট লীলাবিলাস ও সম্প্রয়োগের দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় বজ্রপদ্মসংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয় তার নাম 'আনন্দ'। তৎপরে পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হলে তাকে বলে 'পরমানন্দ'। পরমানন্দের পরবর্তী স্তর 'সহজানন্দ'। তাতে গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান বর্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। তার পর নিশ্চেষ্ট হয়ে আমি সুখভোগ করেছি এইরূপ বিকল্প অনুভবের নাম 'বিরমানন্দ'। এই বিরমানন্দই সহজৈকস্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ। মহাযান সম্প্রদায় ছিলেন জ্ঞানমার্গী। বজ্রযান সম্প্রদায় রসমার্গের পথিক। শুধু বজ্রযান সম্প্রদায়ই নয়, সাধারণভাবে সহজপন্থীরা সবাই রসমার্গের পথিক। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই তাঁরা পুরুষার্থ বলে মনে করেন। তাই এই সাধনায় যাঁরা সিদ্ধ তাঁদের বলা হয় 'রসিক' ভক্ত।[৪৩]

নরনারীর মিলিত সাধনার এই পথকে 'সহজ-পথ' বলা হয়েছে। বস্তুত, সাধনপন্থা হিসাবে এ পথ মোটেই সহজ পথ নয়; পদে পদে পদস্খলন হবার সম্ভাবনাই সমধিক। এ সাধনা সুকঠোর আত্মসংযমের পথে দুশ্চর তপশ্চর্যার অপেক্ষা রাখে। নইলে তা অসংযত কাম-কেলিতে অর্থাৎ মদনমহোৎসবলীলায় পর্যবসিত হয়। এই সাধনার নাম সহজ-সাধনা, কারণ তা সহ-জ অর্থাৎ সহজাত। জন্মগত অধিকার-সূত্রেই তা প্রাপ্তব্য, এই

অর্থেই তা সহ-জ। উচ্চ-নীচ, কিঞ্চন-অকিঞ্চন নির্বিশেষে সকলেরই এতে সমান অধিকার। কিন্তু এই অধিকারকে আয়ত্ত করা সকলের সাধ্য নয়। চণ্ডীদাস তাই বলেছেন :

রসিক রসিক সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥

১৫

গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সাধনপদ্ধতির কথা বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় লেখা 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-বিলুপ্তির যুগে আর্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে বৌদ্ধসমাজ ও হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের ভেদরেখা একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেল। নিত্যানন্দ-তনয় বীরভদ্র মুণ্ডিতমস্তক শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ ও শ্রমণীগণকে বৈষ্ণব ধর্মের উদার সত্রতলে আহ্বান করে চরম দুর্গতি থেকে উদ্ধার করলেন। এই নেড়ানেড়ীর দলই ছিলেন বজ্রযানপন্থী সহজিয়ার দল। অবশ্য সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম এই দলগত ধর্মান্তরীকরণের বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা দাবি করেন, রায় রামানন্দ জগন্নাথের দেবদাসীর সঙ্গে, চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর সঙ্গে, বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের পত্নী লছমী দেবীর সঙ্গে, জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে, রূপ গোস্বামী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির সঙ্গে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্যামাঙ্গিনীর সঙ্গে সহজ-ধর্ম আস্বাদন করেছিলেন। তন্মধ্যে রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গল এই পাঁচজন 'পঞ্চরসিক' বলে অভিহিত। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সহজিয়ারা ব্রহ্মসূত্র-স্বরূপ মনে করেন। তাতে আছে

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

এতে 'পঞ্চরসিকে'র কাব্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদনীয় ছিল, এই সূত্র ধরে সহজিয়ারা চৈতন্যদেবকেও তাঁদের রসিক-সমাজভুক্ত করার স্পর্ধা করেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগেও যে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল তার অভ্রান্ত প্রমাণ চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদাবলী। বস্তুত, চণ্ডীদাসই সহজ ধর্মের মহত্তম কবি-রসিক। তরুণ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থে বলেছেন, রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী-রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস সহজিয়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর মতে, "চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর মধ্যেই চণ্ডীদাসের সহজিয়াত্ব আছে। এবং তাহা আছে বলিয়াই আমাদের নিকট চণ্ডীদাসের সহজিয়া জীবনতথ্য বাস্তব-সত্য।" [দ্রষ্টব্য : উক্ত গ্রন্থ, পৃ° ১৬]

নারী-পুরুষের মিলিত সহজ-সাধনা বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ-লাভ করে একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর লাভ করল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে—এমন কি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরেও যা ছিল মূলত একটি যোগ-সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে তা যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করেই একটি প্রেম-সাধনায় পর্যবসিত হল। তান্ত্রিক শিব-শক্তি এবং বৌদ্ধ প্রজ্ঞা-উপায়ের বদলে বৈষ্ণব সহজ-তত্ত্বে রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা হল। শিব-শক্তির মিলন-জনিত সামরস্য ছিল আনন্দস্বরূপ, বৌদ্ধরা তাকেই বলেছেন মহা-সুখস্বরূপ। বৈষ্ণব সহজিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন-জনিত আনন্দকে বললেন প্রেম। অবশ্য চরম অবস্থায় প্রেমই আনন্দ, আনন্দই প্রেম। যে-পথে এই চরম অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটে বৈষ্ণবগণ তাকে যোগের পথ বললেন না, বললেন প্রেমের পথ।[৪৪] তাঁদের সাধনা প্রেম-পিরীতি-মার্গের ভজন। 'রাগের ভজন'।

এই রাগের ভজন, এই প্রেমের পথ ধরেই বাংলায় আর একটি সহজিয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠল, তার নাম 'বাউল'। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে বলেছেন, "চৈতন্য-পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম বাউল ধর্মের প্রাথমিক স্তর। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বদর্শনই বাউল ধর্ম ও সাধনার ভিত্তি। সাধনা-অংশে বাউল-ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য বা নূতনত্ব দেখা যায়, তাহার বীজ চণ্ডীদাসের বা চণ্ডীদাস-নামধারী এক বা একাধিক কবির রচিত বা নরোত্তম দাস, লোচন দাস, বিদ্যাপতি,

চৈতন্যদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির ভণিতা-যুক্ত সহজিয়া-পদে এবং নানা সহজিয়া-গ্রন্থে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ বীজ হইতে উদ্ভূত তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিচয় বাউল-গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।" [পৃ° ৩৫৫-৫৬]

উপেন্দ্রনাথের অনুসরণে বাউলধর্মের মূলসূত্রগুলির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাউলদের সাধনা কামের মধ্য থেকে প্রেমকে নিষ্কাশন করা; কামের বিষ নাশ করে প্রেমের অমৃত লাভ করা। তাঁরা ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-বাদে বিশ্বাসী। তাই এই মানবজীবন ও মানব-দেহকে বাউলরা পরম সম্পদ বলে মনে করেছেন। তাঁদের সাধনার মূল আশ্রয়ই দেহ। তাঁদের দৃষ্টিতে মাধুর্যময় যুগল-ভজনের ক্ষেত্র নরদেহ, তার মধ্যেই পরমতত্ত্বের বাস, তাই বাউল নরদেহকে পরম শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের চোখে দেখেছে এবং নর-জন্মকে সার্থক মনে করেছে। মানব-দেহস্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বাউল বলেছে 'মনের মানুষ'। বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের একটি গানে আছে :

এই মানুষে আছে, রে মন,
যারে বলে মানুষ রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন,
পারলাম না রে চিনিতে।[৫৫]

এই 'মানুষ রতন', এই 'মনের মানুষ'ই বউলের পরম অম্বিষ্ট ধন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন

সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

তখন তিনি বাউল-সাধকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই কথা বলেন।

১৬

বস্তুত, বৈষ্ণবই হোক আর বাউলই হোক, সমস্ত সহজিয়া ধর্মই প্রেমের ধর্ম। আর তা একান্ত ভাবেই মানব-ধর্ম। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয় :

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই॥

সহজিয়া-গ্রন্থ 'রত্নসারে'ও বলা হয়েছে 'মানুষ বিগ্রহ ভজি ব্রজপ্রাপ্তি হবে।' মানুষের মধ্যেই যে দেবতা আছেন, এবং মানবপ্রেমই যে দিব্যপ্রেমের আধার, এই সত্যই সহজিয়া ধর্মের মূল সত্য। "It was a religious process of the divinisation of the human love and the consequent discovery of the divine in man."[৫৬] সহজিয়া পরিভাষায় মানুষের মধ্যে এই দেবতা-দর্শন-তত্ত্বের নাম আরোপ-তত্ত্ব। রূপের মধ্যে স্বরূপের আরোপ। সহজিয়ারা বলেন, প্রতি পুরুষই কৃষ্ণ, প্রতি নারীই রাধা। রূপত তারা পুরুষ ও নারী, স্বরূপত কৃষ্ণ ও রাধা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের এখানেই পার্থক্য। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে প্রতি পুরুষই স্বরূপত কৃষ্ণ, এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তা কখনোই স্বীকৃত হয় নি। আসলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে অসীমের কোটিতে পৌঁছে গীত হয়েছে রসতত্ত্বের গান, আর সহজিয়া ধর্মে সীমার কোটিতে দাঁড়িয়ে "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"

নরনারীর ভিতর দিয়ে যে রাধাকৃষ্ণের সহজ-রসের লীলা চলে, এই তত্ত্বটি বিশদীভূত করতে হলে বৈষ্ণব সহজিয়াগণের স্বরূপ-লীলা ও শ্রীরূপ-লীলা এই দুটি লীলাকে ভাল করে বুঝতে হবে। প্রাকৃত জগতের একজন পুরুষের যে পুরুষ-রূপ তা হল তার বাইরের 'রূপ' মাত্র; এই বাইরের রূপের ভিতরে এই রূপকে আশ্রয় করেই একটি 'স্বরূপ' অবস্থান করে। সে স্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপ। তেমনি প্রতি নারীর নারী-রূপের মধ্যে অবস্থান করে রাধা-স্বরূপ। সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা হল এই রূপ থেকে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। স্বরূপে স্থিতিলাভ করবার জন্যে নর-নারীর যে মিলন তাই হল প্রেমলীলা—তার ভিতর দিয়েই ঘটে বিশুদ্ধ সহজ-রসের আস্বাদন। 'শ্রীরূপ' তাই সাধকের সাধনপথে অবলম্বনমাত্র, এই শ্রীরূপ অবলম্বনে

স্বরূপেই তাঁর আসল স্থিতি। সহজিয়াদের প্রথম সাধনা তাই হল শুধু বিশুদ্ধির সাধনা। সোনাকে যেমন পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিখাদ করে তুলতে হয়, তেমনি মর্ত্যের প্রাকৃত দেহমনকেও পুড়িয়ে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। বিশুদ্ধতম দেহমনকে অবলম্বন করে যে প্রেম তা তখন হয়ে ওঠে 'নিকষিত হেম', তাই পূর্ণ সমরস, তাই ব্রজের মহাভাব-স্বরূপ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সহজিয়াগণের মতে মর্ত্য এবং বৃন্দাবন, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের ভিতরে যে ভেদ তাও সাধনা দ্বারা মুছে ফেলা সম্ভব; অর্থাৎ প্রাকৃতকেই সাধনা দ্বারা অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত করা যেতে পারে। তখন 'শ্রীরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ শ্রীরূপ।' অর্থাৎ রূপের ভিতরেই স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রূপ ও স্বরূপের ভেদ তিরোহিত হয়।[১৭]

এই শ্রীরূপে স্বরূপ আরোপিত হলেই প্রাকৃত কামই অপ্রাকৃত প্রেম হয়ে ওঠে। সহজিয়া মতে তাই কামেরই উদ্গত বা উর্ধ্বায়িত অবস্থা প্রেম। মনোবৃন্দাবনের সরণি বেয়ে দেহবৃন্দাবনে নিত্যবৃন্দাবনের লীলারস আস্বাদনই তার নিঃশ্রেয়স। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এখানেও সহজিয়া মতের পার্থক্য। চৈতন্যচরিতামৃতকার কাম ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ বোঝাতে লৌহ ও স্বর্ণের তুলনা দিয়েছেন। সহজিয়ারা বলেছেন আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই কাম বটে, কিন্তু দেহ ও মনঃসংযমের দ্বারা তাই বিশুদ্ধীভূত অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-মুক্ত হয়েই প্রেমে পরিণত হয়। সুতরাং প্রেমের উদ্ভব কামের মধ্যেই। 'রত্নসারে' বলা হয়েছে :

সেই ত উজ্জ্বল রহে রসে ঢাকা অঙ্গ।
কাম হৈতে জন্মে প্রেম নহে কাম-সঙ্গ ॥
লৌহকে করয়ে সোনা লৌহ পরশিয়া।
তৈছে কাম হৈতে প্রেম দেখ বিচারিয়া ॥
পরশের গুণ শ্রেষ্ঠ তাহে লৌহ হেম।
কামের কঠিন গুণ পরশিতে প্রেম।
কাম-বস্তু চন্দ্রকান্তি পরশ পাথর।
প্রেম-বস্তু সুখময় নির্মল ভাস্কর ॥
অগ্নির ভিতরে লৌহ থাকয়ে যাবৎ।
হেমের সদৃশি বস্তু থাকয়ে তাবৎ ॥
অগ্নিতেজ সুখাইলে পুন লৌহ হয়।
এই মতে কাম প্রেম জানিহ নিশ্চয় ॥[১৮]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে রতিকে সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা-ভেদে ত্রিবিধ স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। কুব্জার রতি সাধারণী, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই সেখানে মুখ্য। 'সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা।' কৃষ্ণ-মহিষীগণের রতি সমঞ্জসা। তাতে নিজের এবং দয়িতের পরিতৃপ্তিবিধান সমভাগে বিভক্ত। সমর্থা রতিতে নিজের সুখের কথা বিস্মৃত হয়ে দয়িতের সুখসংবিধানই একমাত্র লক্ষ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই সেখানে সর্বসাধ্যসার। চণ্ডীদাস যখন শ্রীরাধার কণ্ঠে বলেন 'কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া'—তখন তিনি সমর্থা রতিরই জয়ধ্বনি করেন। এই সমর্থা রতিই সহজিয়াগণের সাধ্য ও আস্বাদ্য রতি।

পরকীয়াতেই এই সমর্থা রতি সম্যক্ আস্বাদ্যমান হয়, তাই সহজিয়াগণ পরকীয়া-সাধনার কথাই বলে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্বকীয়া-প্রেম ও পরকীয়া-প্রেমের তর-তম-ভেদের প্রশ্ন ওঠে। রসিকগণ স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়াতেই অধিক রসের উল্লাস লক্ষ্য করেছেন। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে শীলা ভট্টারিকার একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নায়িকা তাঁর সখীকে বলছেন :

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
স চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

অর্থাৎ, যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন আজ তিনিই আমার বর। আজও সেই চৈত্ররজনী, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনে লীলায়িত সমীরণ, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদীতটের বেতসী-তরুতলে যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি তার প্রতিই আমার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এই পদটির তাৎপর্য বোঝাবার জন্যে রূপ গোস্বামী স্বয়ং একটি পদ রচনা করে বলছেন :

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

অর্থাৎ, রাধা বলছেন, হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত, আমিও সেই রাধা ; সেই-ই এই আমাদের সঙ্গম-সুখ, কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরে খেলা হত সেই কালিন্দীপুলিনস্থ বনের জন্যেই আমার মন অভিলাষী।

এই দুটি শ্লোকে স্বকীয়া থেকে পরকীয়া-রতিকেই অধিকতর উৎকর্ষ দান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে নূতন আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সহজ ধর্মে স্বকীয়া হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকে জানে যে স্বকীয়া অর্থে নিজের স্ত্রী, আর পরকীয়া অর্থে পরের স্ত্রী। বস্তুতঃ লোকসমাজে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহের করণে সহজিয়ারাও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই অর্থেই শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন, কিন্তু মনের করণের ধর্ম-ব্যাখ্যায় ইহারা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা স্বকীয়া শব্দে সকামসাধনা, এবং পরকীয়া শব্দে নিষ্কাম সাধনা নির্দেশ করেন।" [পৃ° ৮০]

এই পরকীয়া সহজ সাধনা সম্পর্কে চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদটি অতুলনীয়। চণ্ডীদাস বলেন :

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ॥
বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা ॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা ॥
পরপতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
তোরা না হৈবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমত হইলে
তবে ত পিরীতি সাজে ॥

'নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি ভাবিনী ভাবের দেহা'—বিশুদ্ধ পরকীয়া প্রীতি সম্পর্কে এ জাতীয় সংকেত-ভাষণ একমাত্র চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভব। রূপের মধ্যে স্বরূপের আরোপ-সাধনায়ও চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম সহজ-সাধনার পরাকাষ্ঠা। রামীর মধ্যেই তিনি রাধাকে আরোপ করে সাধনা করেছেন। এই আরোপ-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর রামী হয়ে উঠেছে 'বেদবাদিনী হরের ঘরণী'। তখন 'রজকিনী-রূপই কিশোরী স্বরূপ।' অর্থাৎ রসিক-সাধকের 'একাগ্র' চিত্তভূমিতে তাঁর 'একতান' চেতনায় রামীই মূর্তিমতী শ্রীরাধা। সেই দিব্যভাবে বিভোর হয়ে কবি বলেন :

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

১৭

এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস-পন্থ প্রেমের কবি। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের "বৈষ্ণব কবিতা"য় তিনি সামান্য প্রাকৃত নায়িকার মধ্যেই রাধা-স্বরূপ আরোপের কথা বলেছেন। "বৈষ্ণব কবিতা"য় রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি সহজিয়া-দৃষ্টির সগোত্র। তাঁর প্রেমচেতনার তুঙ্গ শিখরে

জীবনদেবতা-তত্ত্বের আরোপের মধ্যেও এই সহজিয়া-দৃষ্টিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর-লগ্নে ব্রজবুলির অনুসরণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখেছিলেন। এদিক দিয়ে বিদ্যাপতিই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন চণ্ডীদাসের ভাব-সাধনাই তাঁর চিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছে। একুশ বৎসর বয়সে, ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে, 'ভারতী'তে তিনি "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর 'সমালোচনা' গ্রন্থে সে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।" "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন; চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।" "চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।" "যে তোমার অধীন নহে, তোমার নিজেকে তাহার অধীন কর; যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র কর; যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী কর; সে কি কঠোর সাধন!" "চণ্ডীদাস হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল।" "এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়?" "চণ্ডীদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন, 'কামগন্ধ নাহি তায়'।"

"এক স্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন,

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥

"দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে।"[৪৯] এই সব উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় সেদিন রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের প্রেমকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।" উক্ত প্রবন্ধের অন্তিম অনুচ্ছেদে তিনি নিজেও এক জগতের কল্পনা করেছেন যেখানে "প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে।" একুশ বৎসর বয়সে যৌবনে পদার্পণ করে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকামনা।

১৮

এবার, প্রেম সম্পর্কে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি কি ছিল তার ইঙ্গিত দেবার জন্যে তাঁর ইংরেজি রচনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি সংকলন করে এ আলোচনার উপসংহার রচনা করব:

In human nature sexual passion is fiercely individual and destructive, but dominated by the ideal of love, it has been made to flower into a perfection of beauty, becoming into its best expression symbolical of the spiritual truth in man which is his kinship of love with the Infinite.[৫০]

With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love.[৫১]

This joy, whose other name is love, must by its very nature have duality for its realisation. When the singer has his inspiration he makes himself into two; he has within him his other self as the hearer, and

ভোগের উপকরণের উপাদান নিয়ে বিব্রত হয় কদাচ, যে রোগ ধরতে চায়, শুধু সেই জীবনবারিতে সূক্ষ্মতম বিচারের বড়-করে-দেখাতে-সক্ষম কাচের তলায় খুঁজে বেড়ায় ক্রটির বীজাণু। মূর্তির মধ্যে যে মূর্তকে দেখতে পেয়েছে, তার কাছে কি দিয়ে তৈরি তার মৃন্ময়-দেহ, এ কোনও জিজ্ঞাসা নয়। মূর্তির মধ্যে যে অপরূপকে প্রত্যক্ষ করতে নয় উন্মুখ, সেই রূপবিশ্লেষণকারীই শুধু মূর্তিকে খুঁড়তে খুঁড়তে মাটি করেছে কেবল।

মহাভারত তাই পণ্ডিতের কাছে, সমালোচকের কাছে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' যথাক্রমে মহাকাব্য এবং মহৎ উপন্যাস। জীবনজিজ্ঞাসুর কাছে মহাভারত মহাকাব্যের পাত্রে পরিবেশন করেছে মহত্তম কথাশিল্পের অমৃত; জীবনজিজ্ঞাসুর কাছে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'ও মহাকাব্যের বেদনায় ভরে গিয়েছে কথাশিল্পের পেয়ালা।

কুরুক্ষেত্রের রক্তাক্ত প্রান্তরে কুরুপাণ্ডবের ঘোর যুদ্ধফল মহাভারতের, আর নেপোলিওর রাশ্যাভিযান 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র উপলক্ষ্য মাত্র; ওই দুই গ্রন্থেরই লক্ষ্য—সকল কালের, সকল দেশের মানবজীবনজিজ্ঞাসা। মানুষের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অবারিত দুই মহৎ গ্রন্থেই। সুরাসুরের দ্বন্দ্বে আলোড়িত স্বর্গমর্ত্যের অবস্থান যে মানুষের মনেই, আর কোথাও নয়, দুই গ্রন্থেরই অলক্ষ্য ইঙ্গিত সেই দিকে প্রসারিত। অসীমলোকে উত্থিত মানবমনের সীমাহীন ভাবের তরঙ্গ উত্তাল উদ্দাম আক্রোশে নিষ্ফল মাথা খুঁড়ে মরেছে চিরকাল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বেলাভূমিতে; যুদ্ধ ও শান্তির এই জীবন-মৃত্যু-জিজ্ঞাসা হচ্ছে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'; কর্মফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্মযোগের পরমোত্তর হচ্ছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত। 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে' জীবন-সমুদ্রের যত জিজ্ঞাসার উত্তরে, মহাভারত চিরনিরুত্তর হিমালয়।

এবং এইখানেই মহাভারত এখনও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহৎ। নিরবধিকাল ধরে বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে কলমের মুখে আজ পর্যন্ত যত ব্যথা কাব্য হয়েছে, যত কথা হয়েছে শিল্প, একটি জায়গায় এসে থেমে গেছে তারা সবাই। এগিয়ে গেছে শুধু ব্যাস-কথিত, সিদ্ধিদাতা-গ্রথিত মহাভারত-কথা। তাই এ কথা ঠিক যে মাত্র মহাকাব্য বললে মহাভারতের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে না। কুমারসম্ভব যে অর্থে মহাকাব্য, ইলিয়াড এবং অডিসি যে বিচারে এপিক, মহাভারত সে বিচারের নাগালের অনেক বাইরে, আর এক মহত্তর অর্থে মহাকাব্যাতিরিক্ত সংজ্ঞাতীত এক সৃষ্টি।

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র পরিক্রমা যেখানে শেষ, মহাভারতের অশেষ অর্থবহ যাত্রার আরম্ভ সেইখান থেকে। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথে চলতে চলতে থেমে গেছে চতুর্পাণ্ডবসহ দ্রুপদ-কন্যা। পথে দেখা গিয়েছিল যাদের, পথ শেষ হলে দেখা গেল সেখানে ধর্ম আর ধর্মপুত্র একা। মহাভারতের সঙ্গে চলতে চলতে পৃথিবীর মহাকাব্য আর মহৎ কথাশিল্প সকলের গতিরুদ্ধ হয়েছে যেখানে সেখানে মানবজিজ্ঞাসার উত্তরে,—হিমালয়ের মত মহাভারত ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি-নির্দেশে ইশারা করছে; সে ইশারার উত্তরে অযুত নিযুত বৎসর ধরে সাড়া দিচ্ছে লক্ষ কোটি তারা।

তারার আলোয় সে পড়তে পেরেছে সেই ইঙ্গিতময়ী অশ্রুতবাণী, কেবল সেই বলতে পেরেছে, মহাভারতকে মহাকাব্য বললে তার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়।

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' যখন লিখতে শুরু করেন তলস্তয় তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ বছর [..."an age at which an author's creative gift is generally at its height,..."]; এবং "it was not till six ysars later that he finished it." নেপোলিওঁর যুদ্ধ, রাশ্যাক্রমণ,মস্কোর অগ্নিকাণ্ড এবং নেপোলিওঁর পশ্চাদপসরণ ও তার সৈন্যদের ধ্বংসপ্রাপ্তি,—'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসের কালব্যাপ্তি এই। পাঁচশতাধিক চরিত্র এই উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে এসেছে এবং গেছে। উপন্যাসটি যখন শুরু করেন তলস্তয় তখন তাঁর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম:

"When Tolstoy started upon his novel it was with the notion of writing a tale of family life among the gentry, and the historical incidents were to serve merely as a backgroud."

ব্যক্তিপরিবারের কথাই বিশ্বপরিবারের কাহিনী হয়ে হয়ে উঠেছে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'।

মহাভারত ও কুরুপাণ্ডবকুলের কথা হতে গিয়ে সমস্ত কালের সমগ্র মানবকুলের কাব্য হয়ে গেছে কখন মহাভারতকারের অজানতে! এবং কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে

রক্তাক্ত এই কুরুক্ষেত্র প্রত্যেক মানুষের মনোক্ষেত্রের প্রতীক ছাড়া আর কি? যে মানুষের মন শুভাশুভের দ্বন্দ্বে আলোড়িত অনাদিকাল থেকে, সংসার-সংগ্রামের শেষে সে মানুষ একদিন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে একা। যার শেষ একমাত্র সঙ্গী ধর্ম ছাড়া আর কেউ নয়, সেই মানস-কুরুক্ষেত্রের কাব্য বলেই মহাভারত মানবজীবনমহাকাব্যও বটে। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'ও ব্যক্তিজীবনজিজ্ঞাসা থেকে বিশ্বজীবনজিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে তলস্তয়ের অজ্ঞাতে। নিজের যে মন পাপ ও পুণ্যের, স্বর্গ-নরকের, শয়তান ও বিবেকের সঙ্গে মুহুর্মুহু সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে খুঁজেছে জীবনের অমৃত, সংগ্রাম ও শান্তি, 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' সেই ব্যক্তিমনের মহৎ জিজ্ঞাসা।

তলস্তয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রূপ ও অরূপের বিপরীত আকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়েছেন। তাঁর জীবনীকার সিম্‌মন্‌স্ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন; সেটি কামনার আগুনে রাঙা উজ্জ্বল সেই উদাহরণ। Domna বলে সেই মেয়েটির কথা বলেছেন, রাঁধুনী যে মেয়েটির আগুনে-ঝলসানো রূপ বাহান্ন বছরের বেশ রুপোলী দাড়িওলা, ধর্মের পথে ঈশ্বর-অন্বেষক তলস্তয়কে টানল—কাচপোকাকে যেমন টানে টিকটিকি: "At first he was contended merely to walk behind her, observing but one day he whistled softly, caught up with her, chatted, and made a rendezvous in a quite lane for the next day. Conscience struggled with desire as he set out for the appointed spot on the way he had to pass under the windows of the childrens school-room. At that critical moment little Ilya poked his head out of the window and reminded his father that it was time for their Greek lesson. Fate was on the side of conscience. He gave the lesson." [Leo Tolstoy : Earnest J. Simmons.]

Domna-র উদ্ধতবক্ষের দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় শয়নের লোভাক্রান্ত তলস্তয় Alekseyev-এর কাছে আর্তনাদ করে উঠেছেন: "I'm assailed by temptation of the flesh, and it seems that I'm utterly powerless to resist. I'm afraid I'll give in. Help me!"

কিন্তু 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' অথবা তার লেখকের কান্না শুধু প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গের ক্রন্দন নয়। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'ও না; দস্তয়ভস্কির 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ'ও নয়। ওই দুটি গ্রন্থই মহৎ অন্বেষণের মহত্তর মহাকাব্য। দস্তয়ভস্কি এবং তলস্তয় দুজনেই ক্ষ্যাপা; দুজনেই খুঁজে বেড়িয়েছেন সেই পরশপাথর যা মানুষের মধ্যে যা তামা তাঁকে মুহূর্তের স্পর্শে সোনা করে দেবার জাদু জানে। দস্তয়ভস্কি তাকে হাতড়ে ফিরেছেন লেখার জীবনে; তলস্তয় জীবনের লেখায়।

দস্তয়ভস্কি এবং তলস্তয়ের, দুজনেরই জীবন ও কাব্যের নায়ক যিশুখ্রীষ্ট। তলস্তয় ও দস্তয়ভস্কি দুজনেই: "...Were seekers after God, and in faith in Him they saw the only possibility of salvation. Dostoyevosky, however, attempted to realize the Kingdom of God in his art; Tolstoy sought through his active deeds to establish it on earth."

পৃথিবীর সব মহৎ শিল্পকর্মই গভীরতর অর্থে মহত্তর আর এক শিল্পস্রষ্টার অন্বেষণমাত্র। এবং উপনিষদের ক্রোড়ে যে লালিত নয় সে যেমন রবীন্দ্ররচনায় সৌন্দর্যের অনুরাগী মাত্র; রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীরে প্রবেশ যেমন তার সাধ্যায়ত্ত নয়, তেমনই বাইবেল নয় যার জীবনের বাণী তার পক্ষে দস্তয়ভস্কি এবং তলস্তয়কে অনুধাবন করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। বুদ্ধির দীপ্তি সত্ত্বেও বোধির অভাবে সৎ সমালোচনাও 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভে' 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র চরম বিচারে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। কারণ কোনও সৃষ্টিই বোঝবার নয়; জানবার। কারণ তা কেবল সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য।

ঠিক এই ভুলই করেন সমারসেট মম্, যখন তিনি বলেন: "...he believed that it was not, as commonly thought, great men who affected its course, but an obscure force that ran through the peoples and drove them unconsciously to victory or defeat."

এবং তারপর আবার:

"I presume it was to illustrate his idea that he devoted so many chapters to a factual account of the retreat form Moscow. It may be good history, but it is not good fiction." [The World's Ten Greatest Novels.]

রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ মিলহীন এবং কাব্যছন্দছাড়া বলে যদি কেউ বলে যে এ কবিতা হয় নি, তাহলে সে যে ভুল করবে তার চেয়ে বেশি ভুল অবশ্য মম্ করেন নি যখন তিনি তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র কোনও একটি ভগ্নাংশকে বলতে বাধ্য হয়েছেন তা 'good history' হলেও 'good fiction' নয়। এই উক্তি যে কেউ করলেই তাকে সে কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া

প্রয়োজন তা হচ্ছে পৃথিবীর কোনও মহৎ কথাশিল্পই 'good fiction' লিখব বলে লেখা নয়। বালজাকের 'ওল্ড্ ম্যান গোরিও', স্তাঁদালের 'রেড অ্যাণ্ড ব্ল্যাক', দস্তয়ভস্কির 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ' বা তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' 'good fiction' লিখবেন বলে বদ্ধপরিকর কেউ লেখেন নি।

বস্তুতঃ যিনি অন্যপক্ষে একই নিঃশ্বাসে বলেছেন, "I think Balzac is the greatest novelist the world has ever known, but I think Tolstoy's War and Peace is the greatest novel."—সেই সমারসেট মমের কাছে কি এ বার্তা অজ্ঞাত যে, পৃথিবীর মহত্তম রচনা লেখা যায় না; লেখা হয়। মাস্টারপিস লিখব বলে কেউ লেখে না; Masterদের কোনও কোনও 'পিস' তাঁদের অজ্ঞাতেই মাস্টারপিস হয়ে যায়। কি করে হয়, এর উত্তর আজ পর্যন্ত কোনও মাস্টারপিসের স্রষ্টা, কোনও লিটারারি মাস্টার দিতে পারেন নি। দেবার চেষ্টাও তাঁরা কোনদিন করেন নি। যাঁরা এই হাস্যকর প্রয়াস করেছেন তাঁরা স্রষ্টা নন, সমালোচক। সেই সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা সৃষ্টিশক্তির অধিকারী তাঁরা কোনও মাস্টারপিস আত্মপ্রকাশ করলে হঠাৎ কখনও জানতে পারেন কালোত্তীর্ণ রচনা বলে, কখনও জানতে পারেন না। যখন জানতে পারেন তখনও জানাতে পারেন না তার জন্মরহস্য।

যার স্পর্শে জীবনের কালো আলো হয়ে যায় সেই পরশপাথর কেউ দেখলে, কোটিকে গোটিক কেউ জানলেও জানতে পারে; কিন্তু কোন্ গুণে কোটিকে গোটিক পাথর পরশপাথর হয় তা জানতে পারে না কোনদিন এবং তাই তা জানাতেও পারে না।

বসন্তে কোকিল ডাকে; কোকিলকে ডাকে বসন্ত। কিন্তু বসন্ত কোন্ পথে কেমন করে আসে সে বার্তা নিয়ে যে ব্যস্ত সে পাখির নাম কোকিল নয় কখনই; কোকিল কেন ডেকে ওঠে তার সাড়া পেতে গেলেই এ নিয়ে যার কৌতূহল সে নয় ঋতুরাজ বসন্ত!

সমারসেট মম তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র ত্রুটির দিক যেমন বলেছেন তার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও অবশ্য সমান সোচ্চার:

"No Novel with such a wide sweep, dealing with so momentous a period of history and with such a vast array of characters, was ever written before, nor, I surmise will ever be written again. It has been justly called an epic. I can think of no other work of fiction that could with truth be so described." [Great Novelists And Their Novels]

কিন্তু মম্ এই উচ্ছ্বাসের পর যে কারণগুলি দিয়েছেন সেগুলি এই মন্তব্যের তুলনায় যুক্তি হিসেবে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর; যেমন:

এক: "There are said to be something like five hundred characters in the book. They are sharply individualised and clearly presented to the reader. This in itself is a great achievement.

দুই: "One of the difficulties a novelist has to cope with when his theme requires him to deal with more groups than one is to make the transition from one to another so plausible that the reader accepts it with docility....On the whole Tolstoy has managed to do this so skilfully that you seem to be following a single thread of narration.

তিন: "...and in her [অর্থাৎ Natasha] Tolstoy has created the most delightful girl in fiction.

চার: "But if Tolstoy's energies flagged in this last part of his stupendous novel he richly made up for it in the epilogue. It is a brilliant invention."

এর একটা অথবা সমবেত কারণের জন্যেও কি কেবল কোনও উপন্যাস মহত্তম কথাশিল্প হয়? না; এহ বাহ্য। তলস্তয়ের 'War and Peace';—"It has been justly called an epic"—সে এই কারণের জন্যে নয়।

সমুদ্রজলে ফসফরাস আছে বলে সমুদ্র কবির অথবা দার্শনিকের মহৎ প্রেরণা নয়। সমুদ্র অসীমের আভাস দেয় সীমার মানুষকে; হিমালয় দেয় ঊর্ধ্বের ইশারা, তাই তারা কবির আর ধ্যানীর প্রণম্য। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', দস্তয়ভস্কির 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ', স্তাঁদালের 'রেড অ্যাণ্ড ব্ল্যাক', বালজাকের 'ওল্ড ম্যান গোরিও' মহাকাব্য; মহৎ কথাশিল্প মর্ত্যলোক থেকে মুহূর্তের জন্যে হলেও নিয়ে যায় অমর্ত্যলোকে। অন্তহীন মুহূর্তের চলিষ্ণু মিছিল থেকে ছিটকে-পড়া একটি মুহূর্ত মানুষকে উপহার দেয় একটি 'অনন্ত মুহূর্ত'।

[ক্রমশঃ]

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

জয় গৌর।

শুনেই চমকে মুখ তুলেছিল অনুপম।

টেকো মাথায় পেছন দিকে শণের নুড়ির মত সাদা, পাতলা, লম্বা লম্বা চুল; দাড়িও তেমনি; ভাঙা গাল, ফোকলা মুখ; একটি মাত্র চোখেও দৃষ্টি আছে কি নেই বোঝা যায় না। শীর্ণ দীর্ঘ দেহ কোমরের কাছে বেঁকে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে, নির্ভর ডান হাতের লাঠিখানার উপর; বাঁ কাঁধে ঝুলছে বিবর্ণ একটি গোপীযন্ত্র, হাত ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে মঞ্জরী—ওতেই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয়।

বেশ তো লোকটি, অন্য বৈরাগীর মত নয়। বৈরাগী না বাউল, তাই ভাবছিল অনুপম। তখনই ফোকলা মুখে হাসি ফুটল বাবাজীর; সেই সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কথাও।

চোখে ভাল না দেখলেও দেখতে এলাম বাবা, দয়াল গৌর যদি আমার এই মা'টিকে একটি ভাই জুটিয়ে দিলেন, তার কাছে ছুটে না এসে কি থাকতে পারি। মঞ্জরীর মুখে তোমার কথা শোনবার পর থেকেই তো ভাবছি, কখন গিয়ে দেখব সেই আমার নিতাইচাঁদকে যে পাপী-তাপী বিচার না করে সকলকে সমানে কোল দেয়। আর সেই ভাবই, বাবা, আমার মঞ্জরীরও। তুমি ওকে দিদি বলে ডেকেছ বলে কী যে ডগমগ ভাব ওর!

অনুপম তো ভেবেছিল অন্যরকম, একেবারে বিপরীত। তাই চমকে মঞ্জরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে।

চোখে চোখ মিলতেই ফিক করে হেসে ফেলল মঞ্জরী; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কানা বাবাজীকে আলগোছে একটি ঠেলা দিয়ে তাকেই সে বলল, তুমি যে বাবা ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করলে। ধানাই-পানাই শোনবার সময় আছে নাকি ছোট গোঁসাইয়ের? যার জন্যে ওর কাছে তুমি ছুটে এলে সেই কাজের কথা আগে বল।

হয়তো মেয়ের শাসন মেনে চলাই বাবাজীর স্বভাব, তৎক্ষণাৎ সংযত হয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ বাবা, কাজের কথাই আগে বলি তাহলে। তোমার কাছে আমরা এলাম একটু ওষুধ চাইতে।

কার জন্যে, দিদির নাকি?

কেবল কৌতূহল নয়, আগ্রহের স্বরেই জিজ্ঞাসা করেছিল অনুপম। কিন্তু উত্তরে কানা বাবাজী মাথা নেড়ে বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, ও কি ওষুধ খাবে বাবা? তুমি দিলেও খাবে না।

তবে কার জন্যে ওষুধ চান?

এই আমার নাতিটির জন্যে, কি যে কাশছে কদিন যাবৎ। হ্যাঁ বাবা, মঞ্জরীরই তো!

এতক্ষণ অনুপমের চোখে পড়ে নি, এবার পড়ল।

বছর ছয়েক বয়সের একটি ছেলে। একমাথা লম্বা লম্বা কালো চুল চূড়া করে বাঁধা। ময়লা একটা প্যাণ্ট কোমরে আছে, তা ছাড়া একেবারেই নিরাবরণ, নিরাভরণ দেহ। ধূলিধূসর, কিন্তু কী সুন্দর—যেন ছাইচাপা আগুন। ধূলির পাতলা আবরণ ভেদ করে সোনার কান্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

আর কেবলই কি বর্ণ ও লাবণ্য! সুঠাম, সুগঠিত দেহ, কিন্তু ননীর মত কোমল; হাড় আছে কি নেই, বোঝাই যায় না। ফোলা ফোলা গাল, টিকলো নাক; বড় বড় টানা টানা চোখ দুটিতে অথৈ রহস্য।

তার মায়ের মতই। একই সঙ্গে সামান্য আর বিশেষের জড়াজড়ি। একনজরে চোখে পড়ে না; কিন্তু পড়লে আর ফিরতে চায় না চোখ, চোখের সামনেই একটি কুঁড়ি একটি একটি করে তার পাপড়িগুলোকে খুলে দেখায় যে!

আর ফুলটি যে অনুপমের চেনা।

মঞ্জরীর চেয়েও বেশী চেনা। অনুপম তার দিকে

তাকাতেই ডালিমের দানার মত কয়েকটি দাঁত বের করে হাসল ছেলেটি আর তখনই মনে পড়ল অনুপমের যে সেদিন গঙ্গার ঘাটে এই ছেলেটিকেই সে দেখেছিল।

নিজে প্রাতঃস্নান করতে নয়, অপরের স্নান দেখতে রাণীর ঘাটে গিয়েছিল অনুপম। অতীতে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে যে পুণ্যস্নানের কিছু কিছু ছবি সে দেখেছে, তারই সেদিন চাক্ষুষ দর্শন তার। বেশ লাগছিল দূর থেকে দেখতে। স্নান আর পূজা একসঙ্গে করছে কেউ কেউ, কেউ বা স্নানের পর পূজা—কেউ গঙ্গাকে, কেউ সূর্যকে, কেউ বুঝি আর কোন ইষ্টদেবতাকে। হাঁটু-জল, কোমর-জল বা গলা-জলে দাঁড়িয়ে, মুখে নাম না মন্ত্র জপ করতে করতে অর্ঘ্য দিচ্ছে—ফুলতুলসী, তিলতুলসী অথবা আঁজলা ভরে গঙ্গাজল তুলে তাই আবার গঙ্গায় ঢেলে দিচ্ছে। স্নান সেরে উপরে এসে শুকনো কাপড় পরে তীরে বসেও আবার পূজো করছে কেউ কেউ। নানারকম উপচার ওই রকম স্নানোত্তর আরাধনার—বসবার জন্য কুশাসন বা কম্বলাসন থাকে, উৎসর্গ করবার জন্য ফুলতুলসী ছাড়াও নৈবেদ্য। আরও ভাল লাগছিল অনুপমের ঘাটের উপর এই সব পূজো দেখতে। গরদের ধুতি বা শাড়ি পরে বসেছে কেউ কেউ, কারও সাধারণ বেশ। কিন্তু একই পদ্ধতি, একই ভাব। পূব দিকে মুখ সকলেরই—হেমন্তের কাঁচা রোদ সদ্য-স্নানের পরিচ্ছন্নতা ও স্নিগ্ধতার উপর কি যেন এক অপার্থিব সুষমা ছড়িয়ে দিয়েছে।

চেয়ে চেয়ে দেখছিল অনুপম, এক ফাঁকে চোখ পড়ল তার।

খেঁকিয়ে উঠেছে এক প্রৌঢ়া: কে রে পোড়ারমুখো ছেলে—স্নান করে উঠতে না উঠতেই ছুঁয়ে দিলি! ওমা, আবার জড়িয়ে ধরে যে!

একটি শিশু দুই হাতে প্রৌঢ়াকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। স্ত্রীলোকটির কোমর পর্যন্তও পৌঁছয় নি যে সহাস্য কচি মুখখানি, তা যেন কালো কালো পাতায় ঢাকা সদ্য-ফোটা ফুল একটি—পাতা তার মাথার ছড়িয়ে-পড়া কুঞ্চিত কালো চুল।

কিন্তু প্রৌঢ়া ঠেলে তাকে সরিয়ে দিয়ে বকের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেকটা দূরে সরে গেল। দুই চোখের আগুনের সঙ্গে সমানে মুখ থেকে গালিবৃষ্টিও চলেছে: কি দুরন্ত, অসভ্য ছেলে গো—কার না কার—ওমা, এত তীর্থ করলাম, এমন তো কোথাও দেখি নি। মুখে আগুন এমন ছেলের—যা যা, দূর হয়ে যা।

তবে ততক্ষণে আর একটি বৃদ্ধা হাত ধরেছে ছেলেটির। মিষ্টি সান্ত্বনার কথা তার মুখে: ষাট ষাট, অচেনা মানুষের কাছে যাস কেন তুই? এইখানে বোস্ শান্ত হয়ে। প্রসাদ দেব'খন, আগে পূজো তো করি।

শোনামাত্রই সেই দুর্দান্ত ছেলেটি জোড়াসনে বসল বালির উপর; পুষ্ট পুষ্ট হাত দুটি কোলের উপর গুটিয়ে নিল যেন যোগীর ভঙ্গিতে; তারপর বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে হাসল দাঁত বের করে।

ঠিক সেই হাসিই মঞ্জরীর ছেলেটির মুখেও। না, অনুমান নয় অনুপমের, গঙ্গার ঘাটে সেদিন ঠিক এই ছেলেটিকেই সে দেখেছিল।

সুশ্রী প্রিয়দর্শন বালক। অনুপম হেসে জিজ্ঞাসা করল: নাম কি তোমার?

বাঁশীর মত মিষ্টি মিহি সুরে উত্তর হল: নিমাই, বড় হলে গৌর হব।

দিব্যি সপ্রতিভ; আর তার মায়ের মতই বাক্‌পটু তো! অনুপম উৎফুল্ল হয়ে বলল, বল কি!

সঙ্গে সঙ্গেই সে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল ছেলেটিকে, কিন্তু চট্ করে সরে গেল সে, ধরল কানা বাবাজীর একখানা হাত।

তবে প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা নেই। মাথার চূড়া আর চোখের তারা দুটিকে একই তালে নাচিয়ে নিমাই বলল, হ্যাঁগো, দাদু বলেছে। তাই না দাদু? গৌর হব না আমি? হরি বলে বাহু তুলে কীর্তন করব না নেচে নেচে?—

ভাল করে দেখবে বলেই অনুপম ওদের তিনজনকে বসিয়ে রেখেছিল। আর সব রুগীকে বিদায় করবার পর ওদের পালা।

নিমাইয়ের বুক পিঠ গলা ইত্যাদি ভাল করে পরীক্ষা করবার পর অনুপম একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, বেশ শক্ত ছেলেটির ফুসফুস, যক্ষ্মারোগের পোকা সহজে সে দুর্গ ভেদ

করতে পারবে না। সর্দির জন্য ভাল একটি ওষুধ লিখে দিয়ে তার গাল টিপে দিল অনুপম।

তারপর মঞ্জরীর মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, এবার আপনি আসুন দিদি।

কিন্তু অত লোভনীয় প্রস্তাব শুনেও বেঁকে বসল মঞ্জরী। তবে ভঙ্গিটি মধুর ; যেন আঁতকে উঠে দু পা পেছনে সরে গিয়ে সে বলল, ওমা—আমি আবার কেন ?

অনুপম বলল, দেখি, কি হয়েছে আপনার।

কি আবার হবে ! উহুঁ, কিচ্ছু হয় নি।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসি চেপেছে মঞ্জরী ; কথাটা সে বলল মাথাটাকে তার দুলিয়ে দুলিয়ে। যেন ছেলেমানুষি ভাব—কতকটা নিমাইয়ের মতই।

অনুপম হেসে বলল, না হয়ে থাকলে তো সুখের কথা, ওষুধ খেতে হবে না। কাজেই দেখতে দোষ কি ?

দরকারই বা কি ? কেন মিছিমিছি কষ্ট করবেন !

কিন্তু আপনার বাবা যেন বললেন—

কানা বাবাজী সায় দিয়ে মাথা নেড়েছিলেন, কিন্তু মঞ্জরী উত্তর দিল : বাবা কি জানেন—উনি তো আর ডাক্তার নন !

মঞ্জরীর ভাব দেখে হাসতে হাসতেও বিস্মিত হচ্ছিল অনুপম ; এখন সে গম্ভীর হয়ে বলল, দেখুন, আমি নিশ্চয়ই একজন ডাক্তার। আপনাকে দূর থেকে দেখেই আমার মনে হয়েছে যে আপনার একটা শক্ত রোগ থাকা অসম্ভব নয়। আর ডাক্তার হিসেবেই বলি, ও রোগকে উপেক্ষা করা আপনার উচিত নয়। আমাকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তো অন্য ডাক্তারকে দেখান।

তা আমি দেখিয়েছি।—ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল মঞ্জরী, মুখের হাসি তার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন।

অনুপম একটু বিব্রত হয়ে বলল, কাকে দেখিয়েছেন, ডাক্তার সরকারকে ?

মঞ্জরী উত্তর দিল, তাঁর চেয়েও বড় ডাক্তারকে।

কে তিনি ?

আমার শ্যামসুন্দর।—বলতে বলতে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল মঞ্জরী, প্রণাম করল বৈষ্ণবী তার ইষ্টদেবতাকে।

এ জিনিস বোঝে না যুবক ডাক্তার অনুপম বোস। সে বিরক্ত হয়ে বলল, তা দিদি, আমাদের, মানে, ডাক্তারদের জ্ঞানবুদ্ধিও তো ভগবানই দিয়েছেন। তার এক-আধটুকু নিতে দোষ কি ?

দোষ না থাকলেও বাধা আছে।

কি বাধা ?

আমরা যে বোষ্টম। গোবিন্দর চরণ একবার ধরলে তা আর ছাড়তে নেই।

কিন্তু রোগ-টোগ—

তাঁর ইচ্ছাতেই হয়, সারবার হলে তিনিই সারাবেন।

হাল ছেড়ে দেবে ভাবছিল অনুপম ; কিন্তু তখনই তার চোখ গিয়ে পড়ল নিমাইয়ের মুখের উপর, ছেলেটি তার বড় বড় চোখ দুটি মেলে অনুপমকেই দেখছে।

তবে খোকার জন্যে ওষুধ নিলেন যে ?

ফস করে কথাটা অনুপমের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে— বলবেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল সে। কিন্তু তখন আর ওটা ফিরিয়ে আনবার উপায় নেই। যা সে আশঙ্কা করেছিল ঘটলও তাই, কথাটা গিয়ে মঞ্জরীকে বিঁধল যেন তীক্ষ্ণ একটি তীরের মতই। এক নিমেষেই কালো হয়ে গেল তার মুখখানি।

নিমাইকে তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নিয়ে মঞ্জরী ধরা গলায় বলল, মন মানে না ছোট গোঁসাই, তাই। এটার মুখের দিকে চাইলে ধর্মকর্ম সব আমি ভুলে যাই।

অনুপম অপ্রতিভ হয়ে বলল, তা কেন ? যে কোন রুগীকেই ওষুধ দেওয়া, সেবা করাও তো শুনেছি ধর্মই। নিমাই তো আপনার নিজের ছেলে। ওর অসুখে ওষুধ ওকে খাওয়াবেন বইকি, নিশ্চয়ই খাওয়াবেন।

মঞ্জরী ঘাড় নেড়ে বলল, খাওয়াব ছোট গোঁসাই, খাওয়াব বলেই তো নিলাম।

বেশ করেছেন। লাগলে আরও নেবেন, যত লাগে তত ওষুধ দেব আমি।

একটু থেমে সে আবার বলল, আপনার সম্বন্ধেও আমি, দিদি, ওই কথাই বলি। দেখে-শুনে আমি একটা ভাল ওষুধ আপনাকে দিতে চাই। খাবেন তা ?

কিন্তু মঞ্জরী মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না ছোট

গোঁসাই। ওর কথা আলাদা। আমি এক চরণামৃত ছাড়া আর কোন ওষুধ খাব না।

অনুপম ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, তাহলে আমি আর কি করতে পারি!

কি আর করবেন, ঠাকুর যদি সাজা দেন তো মানুষে কি করবে!

মঞ্জরীর কণ্ঠে এবার আর দৃঢ়বিশ্বাসের ঝংকার নেই, কেমন যেন বিষণ্ণ তা। শুনে অনুপমের মনে আবার একটু দোলা লেগেছিল। কিন্তু মুখ তুলতেই এবার যে মুখ তার চোখে পড়ল তা মঞ্জরীর নয়, কম্পাউণ্ডার রতন জানার। অসহিষ্ণু ভাব সে মুখের।

বেলা তখন অনেক হয়েছে। সেটা রতনের অসহিষ্ণুতার একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু ভাবটা কেবলই অসহিষ্ণুতা না যদি হয়! গরিব রুগীর দিকে বেশী না ঝোঁকবার পরামর্শ সেদিন ডাক্তার সরকার তাকে দিয়েছিলেন এই রতন জানাকে শুনিয়ে শুনিয়েই। বিচক্ষণ গুরুর উপযুক্ত শাগরেদ হিসাবে রতন এখন মঞ্জরী বৈষ্ণবীর সম্বন্ধে অত তার আগ্রহ দেখে মনে মনে তাকে ভর্ৎসনাই করছে কি আর কিছু, তা কে জানে! সুতরাং নিজেকে সামলে নিল অনুপম; মঞ্জরীর দিকে আর না তাকিয়েই সে বলল, তা হলে আজ আপনারা আসুন। আমারও ওঠবার সময় হয়েছে।

তারপর নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নেবার জন্যই অন্যমনস্ক হয়েছিল অনুপম এবং সেইজন্যই বৈষ্ণবীর ডাক শুনে সে চমকে উঠল।

কাঠের তিন থাক সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় ডিসপেনসারির উঁচু বারান্দা থেকে নীচে সড়কের উপর। এক হাতে কানা বাবাজীর এবং আর এক হাতে নিমাইয়ের কচি হাতখানা ধরে সেই সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়েছে মঞ্জরী। অনুপম ডাক শুনে মুখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে আবার বলল, একটা কথা আপনাকে শুধোব ছোট গোঁসাই?

বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতূহলও জাগল অনুপমের মনে। বলল, কি কথা দিদি?

ডাক্তারি কোথায় পড়েছেন আপনি?

কলকাতায়।

কোন্ কলেজে?

আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে।

বেলগাছির কলেজ নয় তাহলে?

নয় কেন! ওই কলেজকেই কেউ কেউ বেলগাছিয়া কলেজ বলে।

ও, তাহলে তো—

বলেই কিন্তু থেমে গেল মঞ্জরী। বেশ যেন চেষ্টা করে থামা। সেই চেষ্টারই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তার বিস্ফারিত দুটি চোখে, তার চাপা ঠোঁট দুটিতে, তার চিবুকের কঠিনতায়। অনুপম অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, তা হলে কি? থামলেন কেন দিদি? বলুন না।

কিন্তু ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মঞ্জরী; ফিরে আর সে তাকাল না, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে সে বলল, কিছু না, অমনি মনে এল কথাটা।

বেলগাছিয়ার হাসপাতালে কোনদিন ভর্তি হয়েছিলেন বুঝি?

না ছোট গোঁসাই, ওই পথে যেতে যেতে দেখেছিলাম একবার।

তখন কিন্তু পথের ভিড়ের মধ্যে কানা বাবাজীর দীর্ঘ দেহের বিশিষ্ট উপর দিকটা দেখা গেলেও মঞ্জরীকে আর দেখতে পাচ্ছে না অনুপম।

(গ)

কলকাতার বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে নবদ্বীপের মঞ্জরী বৈষ্ণবীর মনে অমন আগ্রহ কেন!

অনুপমের মনে বেশ একটু কৌতূহল জেগেছিল বইকি! কিন্তু তার চরিতার্থতার পথে বাধা এল একাধিক। মঞ্জরীদের সঙ্গে ইদানীং তার দেখাই হচ্ছিল না। আরও বড় বাধা—অনুপম আর দুটি জালে জড়িয়ে পড়েছিল যার একটি তার নিজের এবং অপরটি ঘটনাচক্রের। ডাক্তার সরকার নবদ্বীপে উপস্থিত থাকতে থাকতেই তার নিজস্ব গৃহিণীহীন গৃহস্থালি তাকে গুছিয়ে নিতে হচ্ছিল। আর জের টানতে হচ্ছিল তাকে ডাক্তার সরকারের বাড়িতে তারই সম্বর্ধনার জন্য আয়োজিত সে রাতের সেই অবিস্মরণীয় ভোজসভার।

আন্দাজ ঠিকই করেছিলেন ডাক্তার সরকার যে ওষুধ ধরেছে, সামাজিক নিমন্ত্রণ ও রুগী দেখবার 'কল' দুই-ই পাচ্ছিল অনুপম।

নিজের ঝঞ্চাট তো আছেই।

চাকীপাড়ার নতুন বাড়িটাকে বাসযোগ্য করে নিয়ে তাতে সংসার পাততে হিমশিম খেয়ে যায় অনভিজ্ঞ অনুপম। নামই সে জানে না যেসব জিনিসের এবং দেখলেও যা সে চিনতে পারে না, তাও নাকি সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য—তা সে সংসার মাত্র একজনের হলেও। অথচ অত খরচ করে অত আয়োজন যেখানে করা হল সেখানেও এক পেয়ালা চা চাইলে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তার শুভ আবির্ভাবের জন্য। ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে একমাত্র ক্ষীণ আলোকরেখার মত অনুপমের একমাত্র ভরসা ফটিক। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয় অনুপম যে ফটিকের মত অমন দক্ষ একজন পরিচারক পেয়েছে সে। ফটিক কেবল দক্ষই নয়, উৎসাহও আছে তার। অনুপম নিজে যখন বিরক্ত না হয় তখন নিরুত্তাপ থাকে সে। কিন্তু ফটিকের উৎসাহ সর্বদাই টগবগ করে ফুটছে।

সেই প্রথম দিনই মুখ কাচুমাচু করে বলেছিল ফটিক: বাবুর বুঝি পেটই ভরল না। আমি কি আর রাঁধতে পারি!

অনুপম উদার ভাবে উত্তর দিয়েছিল, কেন, বেশ তো রেঁধেছিস তুই। দেখছিস না যে, সব চেঁচেপুঁচে খেয়েছি।

কিন্তু ফটিক যেন শুনতেই পায় নি উত্তরটা; সে বলল, আর দশটা দিন সবুর করুন বাবু। আমার বউ এলেই এ দুঃখ ঘুচবে। সে রাঁধে ভাল।

গোড়া থেকেই অবশ্য ঠিক হয়ে আছে যে ফটিক সপরিবারে অনুপমের পরিচর্যা করবে। তবুও দিন দুই পর আবার ফটিকের মুখে ঠিক ওই কথাটাই শুনে অনুপম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ রে, তোর বউকে যে বাড়ি থেকে নিয়ে আসবি তাতে তোর বাপ-মা আপত্তি করবে না?

করবেই তো, করছেও।

তবে আনবি কেন তাকে?

আপনার যে কষ্ট হচ্ছে বাবু! আমি যা রাঁধি, তা কি আপনার মুখে দেবার যোগ্য!

উদ্‌গত হাসি চেপে গিয়েছিল অনুপম; আবার সে তারিফ করেছিল ফটিকের রান্নার: তুইও মন্দ রাঁধিস কি, ভালই তো খেলাম আজ।

তবু রোজই খাওয়ার সময় কুণ্ঠা প্রকাশ করে ফটিক; তারপর আশ্বাস দেয় অনুপমকে দিন গুনে গুনে—তার বউয়ের আসবার দিন এগিয়ে আসছে।

দিন সাতেক পর কিন্তু ওই আশ্বাস শুনে অনুপম হেসে বলল, ওরে, দ্রৌপদীকে যে আনবি, তার রান্না খাবে কে? আমি তো—দেখছিস নে, প্রায় রোজই নেমন্তন্ন খাচ্ছি।

কথাটা খুব অতিরঞ্জিত নয়, তখন প্রায়ই বাইরে নিমন্ত্রণ হচ্ছিল অনুপমের। ফটিকের স্ত্রী শশীমুখীও বাড়িতে এসে হেঁশেলের ভার নেবার পরেও সেই অবস্থাই চলছিল।

সে রাত্রে ডাক্তার সরকারের বাড়িতে যাঁর যাঁর সঙ্গে অনুপমের পরিচয় হয়েছিল তাঁরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছিলেন অনুপমকে। একজনের সম্পর্কে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছিল তার এবং এমনি করে পরিচয়ের গণ্ডী বেড়েই চলছিল। নিজের বাড়িতেও তাকে আর নিঃসঙ্গ থাকতে হয় না। বরং—

কোন কোন দিন ভিড়ই জমে ওঠে। সকালে রুগীর, বিকেলে শুভার্থীদের। গোড়ার দিকে কেউ কেউ সকালেও আসতেন সুপ্রভাত কামনা মুখের কথায় তাকে শুনিয়ে যাবার জন্য। জগন্ময়বাবু এসেছিলেন সস্ত্রীক। এমন যে প্রবলপ্রতাপ থানার দারোগা, তিনিও একদিন তার বাড়িতে এসে আড্ডা দিয়ে গেলেন।

ভালই লাগছিল অনুপমের। একটু যা সে বিব্রত হয়েছিল তা কেবল অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষকে নিয়ে।

ওটা তার স্বখাদসলিলে ডুবে মরবার অবস্থা আর কি! তাই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় অনুপম। প্রথম দিকে সে কৌতুক অনুভব করত; তারপর বিব্রত ভাবকে হাসির আড়ালে লুকিয়ে চলছিল সে, কখনও নিতান্তই কাষ্ঠহাসির।

প্রথম পরিচয়ের উপসংহার হয়েছিল এক পক্ষের প্রণাম ও বিনিময়ে অপর পক্ষের আশীর্বাদে। দ্বিতীয় পর্বেও তারই জের চলল।

রাণীর ঘাট ছেড়ে চাকীপাড়ার ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে এলেন অধ্যাপক। আর সেই সকালেই নোটিস দিয়ে গেলেন যে বিকেলে তাঁর নিজস্ব রিক্‌শা অনুপমের দোরগোড়ায় আসবে তাকে অধ্যাপকের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।

রিক্‌শাখানাকে ফিরিয়ে দিতে পারে নি অনুপম। কিন্তু ফলে ডুবু-ডুবু অবস্থা তার।

অধ্যাপক বুঝি ধরেই নিয়েছিলেন যে অনুপম শিক্ষা ও পেশাতে ডাক্তার হলেও অতীন্দ্রিয় জগতের অপার রহস্য সম্বন্ধে সক্রিয় কৌতূহল মনে আছে তার; ভক্তের প্রতি ভক্তি আছে, আগ্রহ আছে ভক্তিসাধনার গুহ্যতত্ত্ব অবগত হবার। তাই অনুপমকে বৈঠকখানায় বসিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মৌলিক পার্থক্য তাকে তিনি বোঝাতে শুরু করলেন। সে বক্তৃতা আর শেষ হয় না।

সেদিনের অভিজ্ঞতার আরম্ভের মত উপসংহারও অনুপমের কাছে অপ্রত্যাশিত।

অধ্যাপকের ক্লান্তি নেই, অনুপমেরও শক্তি ছিল না তাঁকে বাধা দেবার। তবু যে বাধা পড়ল এবং অনুপম ছুটি পেল তার ওই অবাঞ্ছিত ক্লাশ থেকে তা বুঝি ওই তার কৃষ্ণকথা শোনবারই হাতে হাতে পাওয়া সুফল, সকৌতুকে তাই ভাবতে ভাবতে সে রাত্রে অনুপম তার বাড়িতে ফিরেছিল।

এ কি কাণ্ড!

বিস্মিত নারীকণ্ঠের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। কিন্তু ওইটুকুই জগদ্দল একখানি পাথরের মত অধ্যাপকের বক্তৃতাস্রোতকে এক নিমেষেই একেবারে থামিয়ে দিল। প্রশ্ন যিনি করেছেন তাঁকে দেখে অনুপমও অধ্যাপকের মতই বিব্রত।

বৈঠকখানার দোরের পাশ দিয়েই বাইরে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে দোরের কাছে থমকে দাঁড়িয়েছেন অধ্যাপক-গৃহিণী কমলা এবং কন্যা অরুন্ধতী। কন্যার বৈশিষ্ট্য তার সাজেগোজে, বাইরে যাচ্ছে সে; গৃহিণীর বৈশিষ্ট্য তাঁর ভ্রূকুটিতে, সে ভ্রূকুটির লক্ষ্য তাঁর স্বামী।

একটি আঘাতেই রীতিমত ঘায়েল হয়েছেন অধ্যাপক; তিনি অপরাধীর মত বললেন, অনুপমকে আমিই নিমন্ত্রণ করে এনেছি।

উত্তরের প্রত্যুত্তর অনুপমের মনে হয়েছিল যেন ঝড়ের গর্জন। কিন্তু ওই ঝড়ই মেঘকে বিদ্যুদ্বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যে রোদ উঠল তা ভিজে ভিজে বলেই আরও মিষ্টি।

সেই সনাতন দাম্পত্যকলহ; আরম্ভে বহু, ক্রিয়া লঘু।

কমলা বললেন, তা কি আর বুঝি না আমি? তুমি ছাড়া ভূভারতে এমন কর্ম আর কে করতে পারে!

কেন, কি হয়েছে?

হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ঘুণাক্ষরেও কথাটা কি তুমি আমাকে জানিয়েছ? ছি ছি, ভদ্রলোককে এক কাপ চা পর্যন্ত দেওয়া হয় নি, আর ঘণ্টাখানেক যাবৎ তুমি তোমার ওই ছাই-পাশ বক্তৃতা শোনাচ্ছ ওঁকে!

এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনুপম, কিন্তু তারপর হাসি সে আর চেপে রাখতে পারে না।

অধ্যাপক প্রতিবাদ করে বললেন, এক ঘণ্টা এখনও হয় নি, চল্লিশ মিনিটেরও কম।

হলই বা। নিমন্ত্রণ করে যখন এনেছ তখন ভদ্রলোককে অন্ততঃ এক কাপ চা তো দিতে হবে!

তা দাও না চা। তবে একেবারে খালি চা দিও না, খেলে অপকার হয়। ঘি দিয়ে মেখে চাট্টি মুড়ি—

চুপ কর তুমি। তুমি বলেই এর পরেও মুখে কথা ফোটে তোমার।

এতক্ষণ পর অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে কমলা বললেন, আপনার কাছে মাফ চাইবারও আমার মুখ নেই অনুপমবাবু, আপনি নিজের গুণেই মাফ করবেন আমাকে। আর দয়া করে আমাদের এই কুঁড়েঘরে যখন এসেছেন তখন আরও কিছুক্ষণ আপনাকে এখানে আটক থাকতে হবে, এক কাপ চা না খেয়ে যেতে পারবেন না আপনি।

অরুন্ধতী তখন উসখুস করছিল, কিন্তু কমলা তার মুখের দিকে চেয়ে কর্তৃত্বের কঠিন স্বরে বললেন, এক্ষুনি তোমার যাওয়া হচ্ছে না অরু, দেখছ তো কি কাণ্ড উনি বাধিয়েছেন! এখন ভেতরে গিয়ে ঠাকুরকে বল চায়ের কেটলিটা আবার উনুনে চাপিয়ে দিতে। আর—

তা কমলার মুখের অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষের ছোট ওই কথাটিই সেদিন মাত্র আধঘণ্টাখানেক পরেই চায়ের সঙ্গে যে রূপ ধরে অনুপমের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল, বৈচিত্র্য

ও রসে তা যে-কোন নিমন্ত্রিত অতিথিকেও অভিভূত করবার মত। তবু ক্ষোভের যেন সীমা নেই কমলার। মুখের ভাবে, পরিবেশনের সঙ্কোচে, টুকরো টুকরো কথায় বার বার প্রকাশ পাচ্ছিল তা।

অধ্যাপকের নিজের ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ। একবার অনুপমের কথায় সায় দিয়ে তিনি বললেন, ঠিকই তো, বেশ তো হয়েছে। বিকেলের জলখাবার আবার এর চেয়ে বেশী কি হবে!

শুনেই কমলার চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তা রীতিমত রুষ্ট। কিন্তু অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে তিনি হেসেই বললেন, নিজের চোখেই তো দেখছেন অনুপমবাবু, ভদ্রলোকের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। যেটুকু বা ছিল তাও ওঁর এই ধর্মের বাতিক উপস্থিত হবার পর একেবারেই গিয়েছে।

পরিচয় সংক্ষিপ্ত। তবু বুঝতে পারছিল অনুপম যে কমলার মনের তলে অনেক দিন ধরে তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে ওই তাঁর ক্ষোভ।

অতিথিকে বিদায় দেবার আগে আবার কমলা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, একেবারে কোন খবর উনি আমাদের দেন নি বলে অরুও দেখুন এ সময়ে উপস্থিত থাকতে পারল না।

ওটা ভূমিকা। একটু থেমে কমলা আবার বললেন, আর একদিন সময়মত আপনাকে এ বাড়িতে আসতে হবে অনুপমবাবু। যদি না আসেন তো আমি মনে করব যে আমাদের সকলের উপরেই আপনার রাগ হয়েছে।

রাগ নয়, ভয় পাচ্ছিল অনুপম, যেমন আতিথ্যের আতিশয্যকে, তেমনি অধ্যাপকের সস্নেহ শুভাকাঙ্ক্ষাকেও।

কিন্তু তখন তার আর পালাবার পথ নেই।

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষকে এড়াতে চাইছিল অনুপম, কিন্তু গল্পের কম্বলের মত তিনি অনুপমকে ছাড়ছেন না। নিজের বাড়িতে তেমন সুবিধে হয় না দেখে অনুপমের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে শুরু করলেন তিনি।

বিরক্তি বোধ হলেও তা প্রকাশ করা যায় না, এমনি সহজ ব্যবহার অধ্যাপকের। অনুপমের সঙ্গে দেখা হলেই ধর্মীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তিনি, মহাপ্রভুর জীবন ও ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, দেবদর্শন, ভাগবত-শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যকীর্তন করে বিশ্বাস ও অনুরাগের প্রমাণস্বরূপ আচরণ দাবি করেন অনুপমের কাছে। তার চাওয়ার অপেক্ষা না করেই নিজের লাইব্রেরি থেকে সটীক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ তাকে পড়তে দিয়েছেন অধ্যাপক; তাঁর মুখ থেকেই অনুপম মোটামুটি পরিচয় পেয়েছে নবদ্বীপধামের বড় বড় মন্দির ও মঠের। নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অনুপমকে তিনি একদিন মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করালেন, শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ করালেন। আর একদিন ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলিসঙ্কেতে ওপারে শ্রীধাম মায়াপুরে গৌড়ীয় মঠ, চৈতন্য মঠ ইত্যাদির চক্রপতাকালাঞ্ছিত ঐশ্বর্য দেখালেন তাকে।

সময় নেই অজুহাত দেখিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আসরকে তখন পর্যন্ত এড়িয়ে চলছিল অনুপম, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়াতে একদিন একরকম জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক।

সে আর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অনুপমের। নবদ্বীপ প্রবাসের প্রথম দিন দূর থেকে বাবাজীকে পথের কুকুরের পদধূলি গ্রহণ করতে দেখে কেবলই সে কৌতুক অনুভব করেছিল, এখন কাছ থেকে বাবাজীকে দেখে সে বিহ্বল হয়ে গেল।

বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে। মহাপ্রভুর মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এবং গোবিন্দমন্দির ও আরও দু-একটির প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে যে রকম লোকের ভিড় দেখেছে অনুপম এখানে তার কিছুই নেই। মন্দির হয়েও মন্দিরের পরিচয় এর নেই—এটি আশ্রম। এর পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের নামে নয়, কৃষ্ণদাস বাবাজীর নামে। প্রসাদ এখানে পাওয়া যায় না, বাবাজী কেবল নামামৃত বিতরণ করেন এবং তাও বিকেলে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক। নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী কৃষ্ণদাস বাবাজী; বিশ্বাস ও আচরণে কঠোর সন্ন্যাসী। নারীর মুখ দর্শন করেন না তিনি—তাঁর আশ্রমে প্রবেশেরই অধিকার নেই কোন নারীর।

বোধ করি অনুপমের হৃদয়ের ক্ষেত্রকে বাবাজীর

প্রসঙ্গ গ্রহণের উপযুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই অধ্যাপক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাকে শুনিয়েছিলেন।

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"—স্বয়ং মহাপ্রভুর স্বরূপ বর্ণনা।

বৈষ্ণব ধর্ম বড় মধুর, কিন্তু কঠোর-সাধনা বৈষ্ণবের। অশীতিপর বৃদ্ধা মাধবী দেবী। স্বয়ং তিনি তপস্বিনী এবং পরমা বৈষ্ণবী। পরম বৈষ্ণব ছিলেন ছোট হরিদাসও, প্রত্যহ তিনি কীর্তন শোনাতেন স্বয়ং মহাপ্রভুকে; তাঁর প্রিয়পাত্রদের অন্যতম তিনি। সেই ছোট হরিদাস আর একজন পরম বৈষ্ণব ভগবান আচার্যের নির্দেশে সেই অশীতিপর বৃদ্ধা মাধবী দেবীর কাছ থেকে কিছু সুগন্ধি সরু চাল ভিক্ষা করে এনেছিলেন, নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নয়, মহাপ্রভুরই ভোগের জন্য।

কিন্তু ওই অপরাধেই ছোট হরিদাসের প্রতি নির্বাসন-দণ্ড দিয়েছিলেন মহাপ্রভু:

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।"

কারণ

"দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন।"

মহাপ্রভুর সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন কৃষ্ণদাস বাবাজী। প্রকৃতি সম্ভাষণ করেন না তিনি, পথেঘাটেও নারীর মুখের দিকে তাকান না।

তখন পর্যন্ত বুঝি পুরুষ ভক্তদেরও আসবার সময় হয় নি। সুতরাং ভিড় মোটেই ছিল না। হয়তো সেইজন্যই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল অনুপম।

কুঞ্জের মতই বাড়িখানা। ছোট বলেই আরও মনোরম। অপরাহ্ণের ম্লান আলোকে প্রাঙ্গণের সযত্ন-রক্ষিত ফুলের বাগানকে আলপনার চিত্র বলেই ভ্রম হয়। নানা জাতের ফুলের গন্ধের সঙ্গে ধূপের সৌরভ।

তবু যেন স্বাভাবিক নয়। সম্পূর্ণ নির্জন এবং একেবারে নিঃশব্দ নয় বলেই বুঝি ওখানে ঢুকলেই গা অমন ছমছম করে।

অদ্ভুত একটা ধ্বনি কানে এল অনুপমের।

গানের সুর আছে, কিন্তু স্বর কর্কশ। একটিমাত্রই পদ ঘুরছে ফিরছে, উঠছে নামছে—গৌর হে, নিতাই হে—

আর ওই সঙ্গে চলেছে অন্য একটি কণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আরও একটু এগুতেই চোখে পড়ল অনুপমের—সস্তা দামের ওভারকোট গায়ে দেওয়া কে একজন লোক বারান্দায় শাস্ত্রসম্মত দণ্ডবৎ প্রণামের ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে মেঝেতে অনবরত তার মাথাটাকে ঠুকে যাচ্ছে। অত্যন্ত দীনহীনবেশে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মুণ্ডিতমস্তক বৈষ্ণব, তাঁর মুখে কিন্তু প্রসন্ন হাসি।

উনিই কৃষ্ণদাস বাবাজী।

পরে অধ্যাপক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অনুপমকে যে শ্রীধামে নবাগত একজন ভক্ত গললগ্নীকৃতবাসে কৃষ্ণদাস বাবাজীর কাছে বৈষ্ণবীয় করুণা প্রার্থনা করছিল তার নিজের হৃদয়ে সদ্য-অঙ্কুরিত ভক্তিলতাতে জল সিঞ্চনের জন্যে।

সমগ্রভাবে দৃশ্যটি মনোরম নয়, কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

কৌপীনবহির্বাসসর্বস্ব ভেখধারী বৈষ্ণবকে প্রথম দিন অনুপম দূর থেকে দেখেছিল। আজ কাছ থেকে দেখে ভালই লাগল তার। বেশ সৌম্যমূর্তি। বর্ণ গৌর না হলেও উজ্জ্বল শ্যাম। তিন-চার দিনের দাড়ির নীচেও সুপুষ্ট গণ্ড দুটিতে অটুট স্বাস্থ্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। বেশ শক্ত, মেদহীন, সুঠাম দেহ—যে কোন শ্রমসাধ্য কার্যেরই উপযুক্ত।

তিনিই উপদেশ দিলেন অনুপমকে: নাম করুন, অনন্যচিত্ত হয়ে কৃষ্ণনাম জপ করুন, গান করুন। কর্ম তো শিকল—সোনার হলেও তা শিকলই। আর জ্ঞান? তার তলও নেই, কূলও নেই। জানতে জানতেই আয়ু ফুরিয়ে গেলে এই দুর্লভ মানবজীবনের ব্যবহারটা কি হল? হরিবোল হরিবোল—গৌর হে—নিতাই হে—

নামজপ আর শ্রীবিগ্রহের সেবা—এই নিয়েই আছেন কৃষ্ণদাস বাবাজী। শয়ন, উত্থান, স্নান, কেশ-বেশবিন্যাস, ভোজন, কুঞ্জবিলাস—সবই আছে শ্রীবিগ্রহের। রাধা-কৃষ্ণের সুসজ্জিত যুগলমূর্তি অনুপমকে দর্শন করালেন বাবাজী। না মেনে উপায় নেই—নিখুঁতভাবে অঙ্গমার্জনা

করে চমৎকার সাজিয়েছেন যুগল বিগ্রহকে। সব নিজের হাতে করেছেন কৃষ্ণদাস বাবাজী। রোজই করেন—শেষ রাতে শুরু হয়, তবু দুপুর রাতেও শেষ হয় না।

অধ্যাপকের মুখে আগেই শুনেছিল অনুপম যে কলেজে পড়তে পড়তে বৈরাগী হয়েছেন কৃষ্ণদাস বাবাজী। পড়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। দীক্ষা নিয়ে সেখানেই সাধনা করেছিলেন বছর দুই। তারপর নাকি তিনি আদেশ পান শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে রাধাকৃষ্ণের দুয়ে মিলে এক সত্তার উপলব্ধির জন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পদ্ধতিতে সাধনা করবার। তাই তিনি করছেন বিগত প্রায় আট বৎসর যাবৎ।

সে যে কি সাধনা তার কিছু কিছু যেন বুঝল অনুপম। কিন্তু সিদ্ধি? প্রশ্নটা ফস করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল : এত যে নাম করছেন, সেবা করছেন—তা, কি পেলেন বাবাজী?

প্রশ্ন শুনে আহত হয়ে থাকবেন তিনি, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন তাঁর ইষ্টদেবতার দিকে। কিন্তু ফিরে যখন অনুপমের মুখের দিকে চাইলেন তিনি তখন আবার সহাস্য মুখ তাঁর। হাসিটুকু বজায় রেখেই অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে তিনি বললেন, আপনাকে আমি বাদ দিচ্ছি ডাক্তারবাবু, সবে তো প্র্যাক্‌টিস শুরু করেছেন আপনি। মনে করুন যাদের আপনি সংসারে খুবই সার্থক বলে জানেন, স্ত্রী-পুত্র-গাড়ি-বাড়ি-ব্যাঙ্কব্যালান্স ইত্যাদি সব যাঁদের আছে, তারা কে কি পেয়েছেন কখনও শুধিয়েছেন কাউকে?

অনুপম জিজ্ঞাসা করে নি, বিব্রত হয়ে ঘাড় নাড়ল সে।

কৃষ্ণদাস বাবাজী তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, সংসারে চাওয়াটাই সার ডাক্তারবাবু, এখানে কেউ কিছু পায় না। আমিও কিছুই পাই নি। তবু আমাদের মধ্যে অনেক তফাত; সেই না-পাওয়া আমার বুকের জ্বালা নয়, গলায় মালা হয়ে আছে তা।

অধ্যাপক সেদিন খুবই প্রীত এবং উৎসাহিত। বাইরে এসে উৎসাহের আতিশয্যে একেবারে অনুপমের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, শুনলে তো বাবা। উচ্চ কোটির সাধক ইনি। এসো মাঝে মাঝে এঁর কাছে, এলে শান্তি পাবে।

অনুপম সেইমাত্র যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে মনের কথাটা মনেই চেপে গেল সে, অত উঁচুতে বারবার ওঠা তার পোষাবে না।

ভাগ্যিস নবদ্বীপে নিম্ন কোটির লোকও আছে!

সবাই ওখানে বৈরাগী নয়। বৈষ্ণব ছাড়া শাক্তও আছে। ঘোর সংসারীও আবিষ্কার করল অনুপম বাজারে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে গিয়ে। তবে নিজে সে ঠকছে বুঝলেও ভাল লাগে তার—আকাশে উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে আবার মাটির কোলে আশ্রয় পাওয়ার মত, মণ্ডা-মেঠাইয়ের ভূরিভোজে মুখ বদলাবার জন্য নিমকি বা চাটনির মত।

মন্দির ছাড়াও দর্শনীয় জিনিস আছে ওখানে, কীর্তন ছাড়াও সঙ্গীত আছে, কৃষ্ণকথা ছাড়াও কথাবার্তা আছে। অমন যে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ তাঁর বাড়িতেও তাঁর গৃহিণী কমলাদেবী স্বামীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে অনুপমের সঙ্গে সাধারণ সুখদুঃখের কথাও বলেছেন।

সুতরাং ভালই লাগছিল অনুপমের।

পরিচয়ের গণ্ডি আর যদি নাও বাড়ত তবুও নিজেকে অনুপমের নিঃসঙ্গ মনে হত না। আসলে তার পরিচিতের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছিল; আর নবদ্বীপ থেকে সপরিবারে ডাক্তার সরকারের চলে যাবার পর বোধ করি ওই কারণেই তার আদর-আপ্যায়নও।

এক এক বাড়িতে একাধিকবার নিমন্ত্রণ হয় তার; কারণে অকারণে অনেকেই এসে তার সঙ্গে দেখা করেন, আলাপ করেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাঝে মাঝে ডিসপেনসারিতে এসে তার কাজের অনেক ক্ষতিও করেন।

ডাক্তার শ্রীমতী সুলোচনা বটব্যালের সঙ্গে আরও দুবার দেখা হয়েছিল তার। মেজর গোস্বামী অনুপমের সংবর্ধনার জন্য নিজের বাড়িতে রীতিমত একটি ডিনার-পার্টি দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব-তীর্থ নবদ্বীপে শাক্ত আচারের পরাকাষ্ঠা সেদিন। নিরামিষ পোলাওয়ের সঙ্গে যে মাংস পরিবেশন করা হল তা নিষিদ্ধ পক্ষীর। অনুপম ডাক্তার হয়েও 'ও-রসে বঞ্চিত' বলেই কারণের বোতলটি বৈঠকখানাতে আবির্ভূত হয়েও আবার আলমারিতে ফিরে গিয়েছিল।

সেই পার্টিতে শ্রীমতী বটব্যাল বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন অনুপমের পাশের আসনে। সকলকে শুনিয়েই প্রস্তাব করেছিলেন তিনি: কোন এক রবিবারে কৃষ্ণনগর চলুন ডাক্তার বোস, আমাদের মিশনের সেবাকর্মের আর একটা দিকও নিজের চোখে দেখে আসতে পারবেন।

সে প্রস্তাব পরম উৎসাহে সমর্থন করেছিলেন মেজর গোস্বামী: হ্যাঁ, দেখবার মতই বটে। আমরা তো ধর্মের খোলস নিয়েই মাতামাতি করি, আসল ধর্মানুশীলন আছে এইসব খ্রীষ্টীয় মিশনেই।

আর একদিন অনুপমের ডিসপেনসারিতেই এসেছিলেন ডাক্তার বটব্যাল। কোন এক গৃহস্থ-বাড়িতে যেন রুগী দেখে তাঁর নিজস্ব ভবনে ফেরবার পথে রিকশা থেকে নেমে অনুপমের কাছে গিয়ে বসলেন। অতগুলি রুগীর সামনেও সেদিন দুই ডাক্তারের আলাপ যা হল তা একেবারে ঘরোয়া।

শুরু করেছিলেন সুলোচনাই: বলি ও অনুপমবাবু, আপনার বাড়িতে আমাদের কবে নেমন্তন্ন করছেন আপনি?

অপ্রতিভ অনুপম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন সুলোচনা। অনুপমকে অপ্রতিভ দেখেই আরও মুখরা হয়ে উঠলেন তিনি: আমি কিন্তু কারও ধার ধারি নে ডাক্তার বোস, দেখছেন তো কেমন বেপরোয়া জীবনযাত্রা আমার? নিজে আপনি নেমন্তন্ন না করলেও আমিই একদিন আপনার বাড়ি গিয়ে উঠব। আপনার হাঁড়ি থেকে নিজের হাতে ভাত বেড়ে খেয়ে আসব, দেখবেন।

ঝ'ড়ো হাওয়ার মত ওই কৌতুক অনুপমের কুণ্ঠাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সে বলল, তাহলে ওই সৌভাগ্যের জন্যে অপেক্ষা করব। যে পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এসেছিল সেটা আপাততঃ চাপা থাকবে।

কি পরিকল্পনা ছিল আপনার?

ফটিক তার বউকে নিয়ে আসবে বলেছে। ভেবেছিলাম যে মহিলাটি এলেই একদিন ডাকব আপনাদের সবাইকে।

ও হরি।

বলে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করলেন সুলোচনা: এই পরিকল্পনা আপনার? বেয়ারার বউকে সম্বল করে ভদ্রমহিলাদের নিজের বাড়িতে ডাকতে চান আপনি? তাতে কেউ আসবে না অনুপমবাবু। মিস্টার বসুর নয়, মিসেস বসুর আতিথ্য চাই আমরা। তাঁকে আপনি কবে ঘরে আনছেন, তাই বলুন।

পরিহাসের এই ধারাটি স্বয়ং ডাক্তার সরকার চালু করে গিয়েছিলেন। দিনে দিনে সয়েও গিয়েছিল অনুপমের। সুতরাং সেদিন সুলোচনার মুখে ওর পুনরাবৃত্তি শুনে তার মনে তেমন কোন সাড়া জাগে নি।

কিন্তু ওই পুরাতন পরিহাসই দিন কয়েক পর মঞ্জরীর কণ্ঠে শুনেই তার মনে হল যে পুরনো গানে নতুন সুর সংযোগ হয়েছে।

সরস প্রসঙ্গের সরসতর পরিণতি।

আবির্ভাব চোরাগলির পথে; দেখাও হয়েছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে।

সকালবেলায় প্রাইভেট রুগী একটি দেখে অনুপম হেঁটে যাচ্ছিল ডিসপেনসারির দিকে। হঠাৎ কীর্তনের একটি পদ কানে এল তার:

"বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে।"

দ্বৈত সঙ্গীত, পুরুষের ভাঙা ভাঙা মোটা গলার সঙ্গে চমৎকার সঙ্গতি রেখে বেজে চলেছে মধুর নারীকণ্ঠ। বেশ একটু দূরে থেকে শুনলেও শুনেই চেনা চেনা ঠেকেছিল অনুপমের; ফটক পার হয়ে প্রাঙ্গণে উঁকি দিতেই সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন।

কানা বাবাজী আর মঞ্জরী। সোনার গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে গাইছে দুজনে।

রোজই গায়। মাধুকরী করতে বেরবার আগে ওটা নাকি ওদের নিত্যকর্ম, লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবার অপরিহার্য উপক্রমণিকা কিছুই না চেয়ে ঠাকুরের কাছে গানের সুরে আত্মনিবেদন।

ব্যাখ্যাটা অনুপম শুনেছিল অনেক পরে। তখন গানই তাকে টান দিয়েছিল। চেনা মানুষ দুজন আরও

জোরে টান দিল তাকে। সেই যে নিমাইয়ের জন্য ওষুধ নিয়ে গিয়েছে তারপর ওদের কারও সঙ্গে তার দেখা হয় নি। কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করবার জন্য ফিরে সদর রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করছিল অনুপম।

কিন্তু মঞ্জরীই আগে তাকে দেখল, আগে সম্ভাষণ করল তাকে: ছোট গোঁসাই!

মিষ্টি মিহি স্বর যেন এক লাফেই তারায় উঠে গিয়েছে; শুনে কানা বাবাজী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রে মঞ্জরী?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর হল: ছোট গোঁসাই গো বাবা, আমাদের ডাক্তারবাবু।

অ্যাঁ!

একটি তো মাত্র চোখ কানা বাবাজীর। তাতেও তখন আবেশের ঘন ঘোর, এই মাত্র তাঁর ঠাকুরের কাছে যে আত্মনিবেদন করেছেন তিনি, তারই আবেশ। সেই ঘোর ঘোর দৃষ্টি দিয়ে অনুপমকে চিনতে একটু দেরি হয়েছিল, কিন্তু চিনতে পারবার পর তাঁর ভাষায় যা ফুটল তাও ঘনতর আবেশ। গদগদ স্বরে বাবাজী বললেন, তবে তো ঠিকই হল রে, শ্যাম বঁধুয়াই তো এলেন আমার কাছে। আহা হা, এই সকালবেলা, এই ঠাকুরের মন্দির! তোমার রাইবিনোদিনীকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসতে বাবা, তবে কি আনন্দই যে আজ হত!

গোবিন্দ!

মঞ্জরীও যেন মুঞ্জরিত হয়ে উঠল; ডান হাতের কটি অঙ্গুলিতে বিচিত্র একটি মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে কানা বাবাজীকে সে বলল, তা কি হবার জো আছে বাবা! তোমাকে বুঝি বলি নি আমি, রাই কোথায় তোমার এই নবীন কানাইয়ের? বিয়েই তো এখনও করেন নি এই ছোট ডাক্তারগোঁসাই।

তারপর অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি তাকেই প্রশ্ন করল মঞ্জরী: এমন কেন গো ছোট গোঁসাই? শূন্য কুঞ্জ কেন আপনার? বিয়ে করেন নি কেন?

তার চোখের কোণে কোণে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে তখন। অনুপম বিব্রত নয়, রোমাঞ্চিত হয়ে বলল, আপনি তা কেমন করে জানলেন দিদি?

ওমা!—যেন আরও একটু ফুটে উঠে মঞ্জরী বলল: খুঁজে খুঁজে সেদিন আমি যে আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম ছোট গোঁসাই, ভেবেছিলাম যে পুরো একটা সিধা আদায় করে আনব বউদিদিমণির কাছ থেকে। কিন্তু গিয়ে দেখি যে ফটিকের বউ ঘর আগলাচ্ছে আপনার। তার মুখেই শুনলাম কথাটা।

ঠিকই শুনেছেন।

কিন্তু কেন?

অনুপম নিরুত্তর। কিন্তু কৌতুকের ফুলঝুরি ফুটছে মঞ্জরীর চোখেমুখে। উত্তর পেল না বলেই যেন আরও উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, এমন কেন গো আপনারা? আমার ওই ডাক্তার দিদিমণিরও তো বিয়ে হয় নি, আপনারই মত একা একা থাকেন তিনি। কি বিচ্ছিরি যে লাগে আমার চোখে। কেন বলুন তো, এমন একা একা কেন থাকেন আপনারা?

ধৃষ্টতা বলে মনেই হয় না অনুপমের—এমনি সরল বিশ্বাস বেজে উঠেছে বৈষ্ণবীর সকৌতুক কণ্ঠস্বরে।

তেমনি সরল বিশ্বাস আর সরস কৌতুকের সুরে কানা বাবাজী বললেন, তা হলে তো মা, একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

দরকারই তো!—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল মঞ্জরী; তার পর অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে আবার বলল, জানেন ছোট গোঁসাই, আমার তখনই সাধ জেগেছিল দূতীয়ালি করবার।

কথাটা তার কানে একেবারে নতুন ঠেকল বলেই অনুপম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, সেটা কি জিনিস দিদি?

ওমা, তাও জানেন না নাকি?

বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছিল মঞ্জরী, কিন্তু পরক্ষণেই হাসির একটা ঝঙ্কার তুলে উত্তর দিল সে: ঘটক ঘটকী লাগান না আপনারা—ভদ্দরলোকেরা? আমরা বোষ্টমেরা তাকেই বলি দূতীয়ালি। ও আমাদের বৃন্দাসখীর ভাব।

খুব স্পষ্ট না হলেও একেবারে দুর্বোধ্য নয়। অনুপমের কানের কাছটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল—নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা মেয়ে হলেও রসশাস্ত্রের উঁচু পাঠ পড়েছে যে বৈষ্ণবী সে বুঝি তার সজীব কল্পনাকে বলগাছাড়া ঘোড়ার

মত সম্ভাবনার অনন্ত প্রান্তরে চাবুক মেরে ছুটিয়ে দিয়েছে। কত দূরে, কোথায় যে তা যাবে, কে জানে!

কিন্তু মঞ্জরী নিজেই রাশ টানল।

তবে ভঙ্গিটি অদ্ভুত। কপালে ছোট্ট একটু করাঘাত করে ঠোঁট উলটিয়ে সে বলল, কিন্তু বিধি বাম সেধে রেখেছেন ছোট গোঁসাই, এ ক্ষেত্রে তা হবার জো নেই।

তবু ভাল। মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনুপম। তবে আর নয়, পালিয়ে বাঁচবার ওই তার সুযোগ। গম্ভীর হয়ে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করল সে: সেদিন ওষুধ নিয়ে গেলেন, তা খেয়ে ছেলেটি আছে কেমন?

ভালই আছে ছোট গোঁসাই।—মঞ্জরীও সংযত হয়ে উত্তর দিল।

অনুপম বলল, তবু একটু সাবধানে রাখবেন, অনিয়ম বেশী যেন না ঘটে। আচ্ছা, এখন আমি চলি দিদি, হাসপাতালে আমার রুগীরা বসে রয়েছে।

রুগীর কথা নয়, নিমাইয়ের কথাও তত নয়, চলতে চলতে মঞ্জরীর কথাই ভাবছিল অনুপম, যে কথাগুলো এতক্ষণ তার মুখ থেকে শুনেছে সে, তারই কয়েকটি। পুরনো গানে নতুন সুর দিয়েছে মঞ্জরী; সেই সুরের রেশই তখনও যেন অনুপমের মনের কানের কাছে বেজে চলেছে। সেই জন্যই পেছন থেকে মঞ্জরীর ডাকটা অনুপমের কানে কেমন যেন বেসুরো ঠেকল।

ব্যতিক্রম মঞ্জরীর মুখখানাও। সেই মুখই, কিন্তু তাতে হাসিটুকু কেমন যেন মরা মরা। কাছে এসে গলাটা একটু খাটো করে মঞ্জরী বলল, রাগ করলেন নাকি ছোট গোঁসাই?

অনুপম বিব্রত হয়ে বলল, না তো, রাগ কেন করব?
পোড়া স্বভাব তো যায় না আমার, তাই ভাবলাম—
কি যে বলেন, আমার তো ভালই লাগছিল।
ডর লাগে নি?
কিসের ডর?
সাপের?

চট্ করে সেই প্রথম দিনের সব কথাই অনুপমের মনে পড়ে গেল। চমকে উঠেছিল সে; কিন্তু মঞ্জরীর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখবার পর সে হেসেই বলল, সেই কথাটা দিদি, এখনও দেখছি ভোলেন নি আপনি।

ভোলবার কি জো আছে গোঁসাই।

কেন নেই?

আমি যে মেয়েমানুষ।

ধরা ধরা গলা মঞ্জরীর; বলতে বলতে তার ঠোঁট দুখানিও যেন কেঁপে উঠল।

তবে একটি মুহূর্তও নয়; পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে, মুখ ফিরিয়ে মঞ্জরী আবার বলল, শুনে মনের বোঝাটা আমার নেমে গেল ছোট গোঁসাই। আজ তা হলে আসি—জয় গৌর।

ছুটে গিয়ে কানা বাবাজীর হাত ধরল মঞ্জরী; তারপর আবার শুরু হল তাদের দ্বৈতসঙ্গীত:

কলের নৌকা কলের বৈঠা
কলে কল বায়
মদনগঞ্জ ডাইনে থুইয়া
সিদ্ধিরগঞ্জ যায়।

চমৎকার গানখানি। কিন্তু তাল কেটে গিয়েছে। না, ওদের দ্বৈতসঙ্গীতের নয়; একটু আগেই অনুপমের মনের বীণায় নতুন যে অনুরণন বেজে উঠেছিল, তার। মনটা তার হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

সরু ও মোটা দুটি সুর একসঙ্গে বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে গেল—কোথায় বুঝি ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে কানা বাবাজী ও মঞ্জরী। তখন হাসপাতালের দিকে পা চালিয়ে দিল অনুপম।

কিন্তু চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল যে মঞ্জরীর জীবনটাও যেন ওই দ্বৈতসঙ্গীতের মতই—হাসি-রঙ্গ-রসের তলা দিয়ে ফল্গুধারার মত না জানি কোন গোপন বেদনার স্রোত ক্ষীণ হলেও অবিরামবেগে বয়ে চলেছে।

[ক্রমশঃ]

তন্ত্রাচার্য উড্রফের ভারত-আবিষ্কার

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

অনেকে মনে করেন, আমাদের বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে শ্রদ্ধা-বুদ্ধির একটা বিরোধ আছে। এ কথাটা আদৌ সত্য নয়, কেন না শ্রদ্ধা কথাটার মানে অন্ধভাবে কোন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া নয়, শ্রদ্ধা কথার অর্থ, সত্যের প্রতি দৃঢ় ও অবিচলিত নিষ্ঠা। এই অর্থেই কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করেছিল। সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করেন এতে কোন ভুল নেই। যিনি শ্রদ্ধাবান তাঁকে অবশ্য তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় হতেই হবে, আর তিনিই জ্ঞানলাভ করে পরম শান্তির অধিকারী হবেন। এই জ্ঞানলাভের জন্যে দুটি জিনিসের প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানবার ইচ্ছা ও শুশ্রূষা অর্থাৎ শোনবার আগ্রহ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, খনিত্রের দ্বারা ভূমি খনন করতে করতে মানুষ যেমন জলপ্রাপ্ত হয়, তেমনি শুশ্রূষু শিষ্য গুরুগত সমস্ত বিদ্যা লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যিই বলেছেন, অন্য কোন ভাষায় শ্রদ্ধা কথাটির অনুবাদ করা চলে না। অবশ্য, বেদান্তে বলা হয়েছে, গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, কিন্তু এ বিশ্বাসও অন্ধ বা বিচারবিহীন নয়, এ বিশ্বাস blind faith বা dogmatism নয়, এ বিশ্বাসের অর্থ দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনায় লেগে থাকো, কারণ, এই দৃঢ়তা যার নেই, সে সিদ্ধিলাভ করতেই পারে না।

পাশ্চাত্ত্যের মনস্বী সন্তান সার্ জন উড্রফের ভেতর এই শ্রদ্ধা-বুদ্ধি ও বিচার-বুদ্ধির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এ যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। সেই সঙ্গে তাঁর ভেতরে ছিল সত্যিকারের শুশ্রূষা। এই শুশ্রূষা হচ্ছে সরস্বতীর ধারা, তাঁর রচনাবলী পাঠ করার সময় যে ধারাটি আমাদের চোখে পড়ে না। আইন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সর্বজন-বরেণ্য বিচারপতি উড্রফ এদেশের পণ্ডিতদের পদতলে উপবেশন করেই যোগশাস্ত্র, বেদান্ত, তন্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেছিলেন। বাংলা দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এদের ভেতর দুজন ছিলেন তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত ও ক্রিয়াকুশল। এঁদের নাম শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও হরিদেব শাস্ত্রী। তিনি বেদান্ত পড়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত মনস্বী তারকচন্দ্র দাসের কাছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমনি নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে।

'মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গো পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোঃ গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥'

জস্টিশ উড্রফ ছিলেন এমনি মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ বা জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য। তিনি নানা গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেই ভারতের দর্শনশাস্ত্র অধিগত করেছিলেন। গ্রন্থ রচনায় তিনি আর একজন বাঙালী পণ্ডিত ও সাধকের সহায়তা লাভ করেছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ)। অবশ্য, প্রতীচীর অনেক পণ্ডিতই প্রাচীন ভারতের দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, কলা-বিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের ভেতর ম্যাক্স মুলার, পল ডয়সেন, রিজ ডেভিস ও মিসেস রিজ ডেভিস, সার্ আর্থার বেরিডেল কীথ, ম্যাকডোনেল, উইণ্টারনিট্‌স প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একমাত্র জস্টিশ উড্রফ ভিন্ন আর কোন মনীষীই গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশের সঙ্গে ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র-সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। তা ছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতেরা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন, কিন্তু মনস্বী উড্রফ ভারতের মর্ম-বাণী আবিষ্কার করেছেন। এর কারণ, তিনি ত্রিশ বছরের অধিক কাল ভারতে বাস

করেছেন, এ দেশের পণ্ডিতদের কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ও শাস্ত্রের মর্মকথা জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি ভারতকে জেনেছেন শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা নয়, সাধনা ও তপশ্চর্যার দ্বারা। যে উড্রফ বাঙালী পণ্ডিতের কাছে তন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, আজ বাংলা দেশ যে তাঁকে প্রায় ভুলে গেছে, এটা গভীর ক্ষোভের কথা।

পাশ্চাত্ত্যের বহু পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মত উইলিয়াম আর্চার নামক এক ব্যক্তিও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানা বই লেখেন। উইলিয়াম আর্চার ছিলেন একজন নাট্য-সমালোচক কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা দুয়েরই একান্ত অভাব ছিল। তাঁর বইখানার নাম 'India and the Future.' এতে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবাসী তার ধর্মে, সমাজ-ব্যবস্থায়, শিল্প-কলায়, এক কথায় বলতে গেলে সকল বিষয়ে প্রায় বর্বরের অবস্থায় রয়েছে, তবে সে যে পরিমাণে পাশ্চাত্ত্যের সভ্য জাতিদের অনুসরণ করবে, সেই পরিমাণে সভ্য ও উন্নত হতে পারে। উইলিয়াম আর্চারের এই সব অশোভন, শুধু অশোভন নয়, বিদ্বেষ-প্রসূত উক্তির প্রতিবাদে স্যার্ জন উড্রফ একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বইখানির নাম 'Is India civilised?' এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, তারপর বইখানির আর একটি সংস্করণও হয়। সে যুগে এই বইখানি অনেকের কাছেই অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করে। আবার উড্রফের স্বদেশবাসী অনেকে তাঁর ওপর ক্ষুণ্ণ হন। এমন কি উড্রফকে অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। যাঁরা ভারত-সম্পর্কে উড্রফের মতামত সংক্ষেপে জানতে চান, এ বইখানি তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম থেকে 'ভারত কি সভ্য?' নামে বইখানির একটি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন কালীশঙ্কর চক্রবর্তী। বাংলা বইখানিও সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

স্যার্ জন উড্রফ তাঁর বইখানাতে দেখিয়েছেন, সভ্যতার আদর্শ সকল দেশে সমান নয়, ভারতীয় সভ্যতার একটা নিজস্ব আদর্শ আছে, যা পাশ্চাত্ত্য আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র। কোন দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করার আগে সেই দেশকে জানা দরকার—জ্ঞানে জানা ও ধ্যানে জানা। প্রত্যেক দেশ ও জাতিরই একটা স্বধর্ম আছে, সেই স্বধর্মের অনুসরণ করাই তার পক্ষে কল্যাণের পন্থা। অবশ্য স্বধর্ম পালনের অর্থ এ নয় যে, অন্য দেশ বা জাতির কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে হবে না। জীবন্ত জাতির লক্ষণ হচ্ছে এই যে, সে অনুকরণ করবে না, আত্মসাৎ করবে। এই আত্মসাৎ-করণ বা স্বাঙ্গীকরণের ফলেই ভারত সহস্র বিপর্যয়ের ভেতরেও আত্মরক্ষা করেছে।

উড্রফ বলেছেন, তন্ত্রশাস্ত্র মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, পশু অর্থাৎ যাদের ভেতর তমোগুণ প্রবল, বীর অর্থাৎ যাদের ভেতর রজোগুণের আধিক্য ও দিব্য অর্থাৎ যাদের ভেতর সত্ত্বগুণ প্রধান। ক্রমবিকাশের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের আত্মাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করা। সাধনার বলেই মানুষ দেহ ও মনের রূপান্তর সাধন করতে পারে, মানুষ মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব লাভ করতে পারে।

উড্রফের মতে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার মূলেও একটা আদর্শ ছিল। ভারতের ঋষিগণ চেয়েছিলেন, প্রত্যেক মানুষ যাতে নিজের প্রকৃতির অনুসরণ করে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। আবার তন্ত্রশাস্ত্র নারীজাতিকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছে। তন্ত্রের উপদেশ হচ্ছে, প্রত্যেক নারীকে মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা বলে মনে করতে হবে। ভারতের সমাজে অনাচার প্রবেশ করে নি, এ কথা অবশ্য সত্যি নয়, সেই সব অনাচার অবশ্য দূর করতে হবে কিন্তু ভারতের জাতীয় প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে নয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নানা বিষয়ে যেমন ভারতবাসীর কল্যাণ হয়েছে, তেমনি নানা বিষয়ে অকল্যাণও হয়েছে। সবচেয়ে বড় অকল্যাণ হচ্ছে এই যে, ভারতবাসী স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।

অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতের জাতিভেদ-প্রথার

নিন্দা করেন। তাদের মনে রাখা উচিত যে, তাদের নিজের দেশেও জাতিভেদ বা শ্রেণিভেদ প্রথা কম মারাত্মক নয়। শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোর প্রতি বিদ্বেষ কী ভয়াবহ হৃদয়হীনতার পরিচায়ক! মৃত্যুর পরেও যেন তাঁরা এই বিদ্বেষ ত্যাগ করতে পারেন না। তাই সমাধি-ক্ষেত্রেও কৃষ্ণাঙ্গ খ্রীষ্টানের জন্যে পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকে। ভারতের জাতিভেদ-প্রথা নিন্দনীয় হলেও তার মূল আছে বর্ণাশ্রম-ধর্মে আর সেটা হচ্ছে অধিকারবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উড্রফ বলেন, পাশ্চাত্ত্য জাতির একটি প্রধান দোষ কপটতা। তাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে কাজ করেন, তারও নাকি মূলে থাকে নিঃস্বার্থ পর-হিতৈষণা। এদেশের অনেক মিশনারিও খ্রীষ্টধর্মের মহান আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট কিন্তু সেকথা তাঁরা কখনও মুখে স্বীকার করেন না। মহামানব খ্রীষ্টের অনেক বাণী তো ভারতীয় ঋষিদের বাণীরই প্রতিধ্বনি। খ্রীষ্ট তো ছিলেন মানবধর্মেরই প্রচারক, অথচ মিশনারিরা অনেক সময় পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। পরধর্ম সম্পর্কে ভারত শুধু সহিষ্ণুই নন, শ্রদ্ধাবানও বটেন।

আমরা জষ্টিশ উড্রফের কয়েকটি বাণী নিয়ে উদ্ধৃত করছি। উড্রফ যে ঋষিকল্প পুরুষ ছিলেন, এই বাণীগুলি পড়লেই তা বোঝা যাবে। এই সঙ্কয়নে আমরা 'ভারত কি সভ্য?' বই থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

ভারতবর্ষের চাইতে অন্য কোনো দেশ যুক্তির ওপর অধিকতর নির্ভর করে নি। ভারতবর্ষের উপদেশ—যুক্তিযুক্ত হোলে বালকের বাক্যও গ্রহণ কোর্ব্বে।

ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম, লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা যাতে লাভ হয়, তেম্নি ভাবে তার সমাজ সংঘটিত হোয়েছে।

মানুষ ও পশুর আত্মার পার্থক্য, প্রকারভেদে নহে, স্তরভেদে।

স্ত্রী-পুত্রাদির পরিপালনে, অসহায়কে সাহায্যদানে, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় জগন্মাতারই সেবা এবং অর্চ্চনা করা হয়।

জগৎপ্রপঞ্চে আবদ্ধ আত্মাকে ক্রমশঃ মুক্ত করাই প্রকৃত আত্মোন্নতি-সাধন।

যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার সম্প্রদায়ের আপাত প্রয়োজন ও চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হয়, তাই প্রকৃত সভ্যতা।

আত্মজ্ঞান-বিমূঢ় মানব-সমাজ সংসারাবর্ত্তে ঘুরে মরচে, কিন্তু বীর সাধক সংসারের মায়াপাশ অতিক্রম কোরেছেন, তিনি নিজেই নিজের প্রভু।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূল নীতিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হোলে এবং সেই ভাবে সকলে চলতে আরম্ভ কোরলে সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হোলেও ধর্ম্মহীন বলে তা প্রাচ্য জাতির পক্ষে হলাহল-স্বরূপ।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস, যা প্রকৃত মূল্যবান, তা কখনো নষ্ট হোতে পারে না। হিন্দুর মূল তত্ত্বসকল কখনো বিনষ্ট হবার নয়।

মানুষ-জন্ম পেয়ে যে তা সার্থক করে না, সে আত্মঘাতী।

পুরাতন প্রথা যুক্তিযুক্ত হোলেই তা রক্ষা করা উচিত।

পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করাই সভ্যতার লক্ষ্য।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির মধ্য দিয়ে জগজ্জননী আপনাকে অভিব্যক্ত কোরচেন। ভারতবাসী ভারতের সেবার ভেতর দিয়েই মহামায়ার সেবা করেন।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ যদি দিকে দিকে প্রচারিত হয়, তাতে নিখিল বিশ্বের কল্যাণ হবে।

যে পর্য্যন্ত মানুষ ভগবৎ-প্রেমে প্রতিষ্ঠিত না হবে, সে পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের অবসান হবে না।

যে জাতি নিজের ভাষাকে বিসর্জ্জন দেয়, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করে অথচ নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দেয়, তবে ভারত আর ভারত থাকবে না, আর যাঁরা ভারতকে শাসন কর্ব্বেন, তাঁরাও গায়ের রং ছাড়া সকল বিষয়েই ইংরেজ হবেন।

ছেবেবেলায় মিশনারী স্কুল বা খ্রীষ্টানদের পরিচালিত স্কুলে যারা পড়ে, তারা প্রায়ই বাপমাকে মূর্খ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলে মনে করে।

সকলেই শক্তিমান হও, পৌরুষের অভাবই হচ্ছে মানুষের চরিত্রের সব চাইতে বড়ো কলঙ্ক।

পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতেরা যখনই স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় নেন, তখনই তাঁদের বেদান্তদর্শনের অনুসরণ করতে হয়।

ভারতভূমিতে এক দিকে যেমন ধ্যানযোগীদের আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি বহু কর্ম্মকুশল ব্যক্তিও এদেশে জন্মগ্রহণ কোরেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ ভিন্ন, কিন্তু তাতে এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রাচীর সভ্যতা প্রতীচীর সভ্যতা থেকে নিকৃষ্ট।

ভারতীয় সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মুক্তি অর্থাৎ স্বারাজ্য লাভ করে।

অতীন্দ্রিয় সত্যকে জানতে হোলে চাই সাধনা, চাই তপস্যা।

আগে দেহকে সবল করা চাই, তা হোলেই মনে বীর্য্যের সঞ্চার হবে। (কথাটি যেন স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি।)

পক্ষপাতশূন্য হোয়ে অপর জাতির সভ্যতার বিচার কোরতে পারেন, এমন লোক দুর্লভ।

আত্মস্থ ব্যক্তি আপন স্বভাবকে প্রকাশ করেন, তাই বাঁচবার অধিকার তাঁরই।

জাতীয় ভাবধারাকে অবিকৃত রাখবার জন্যেই প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষার। শিক্ষা দেওয়ার অর্থই—যা ভেতরে আছে, তা' বাইরে প্রকাশ করা। (স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, 'Education is the manifestation of the perfection already in man'.)

আমরা জষ্টিশ উড্রফ-রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের তালিকা নিম্নে দিলাম।

গ্রন্থ-পঞ্জী

১. Sakti and Sakta.
২. Principles of Tantra.
৩. The Tantra of the great liberation.
৪. The Serpent Power.
৫. Garland of letters.
৬. Power as life.
৭. Power as mind.
৮. Power as matter.
৯. Power as consciousness.
১০. Is India civilised?

এ ছাড়া উড্রফের ব্যয়েই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্ব (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

৬

যে নিউরসিস সমগ্র দেশের মানসকে গ্রাস করে ফেলেছে সেই নিউরসিসের মূলে অতৃপ্ত ক্ষুধা। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা প্রহর—কি সকাল, কি সন্ধ্যা, কি মধ্যরাত্রি একটা না একটা ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রাম করছে। একটা করে দিন কাটছে আর এই ক্ষুধা বিস্তৃত হচ্ছে। আমরা এই ক্ষুধা বণ্টন করে চলেছি। ক্ষুধার উত্তরাধিকার অর্জন করছি আবার ক্ষুধার উত্তরাধিকারই দিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে নিউরসিস বণ্টন করে চলেছি।

সেদিন দুপুরে তাপসের স্টুডিয়োতে আভার ক্ষেত্রে যে হিস্টেরিয়ার মুখোমুখি হয়েছি সেই হিস্টেরিয়াই দূরে, চন্দনপুর গ্রামের পরিবেশে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। মনে হয় আমাদের এই 'কালটাই' হিস্টেরিয়াগ্রস্ত হয়ে গেছে। কোথাও সে কাঁদছে যুদ্ধে অত্যাচারে নৃশংসতায়, কোথাও অট্টহাসি হাসছে মানুষের হাজার রকমের ব্যর্থ খুশীর ভানে।

*　　*　　*

সন্ধ্যার পর চন্দনপুর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের ভাঙা চালার 'আড়কাঠ' থেকে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলছে। এগুলোর নীচে শীলভদ্রের ভূদানযজ্ঞের প্রথম প্রচার-আসর বসেছে। শীলভদ্র বক্তৃতা করছেন। তাঁর এই বক্তৃতা খালি-গা, কালোচামড়া একদল শীর্ণ বিরূপ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে এক ধরনের হাহাকারের প্রবাহের মত বয়ে যাচ্ছে। সুস্মিতা শর্টহ্যাণ্ডে তাঁর বক্তৃতা একখানা খাতায় টুকে যাচ্ছে মাথা হেঁট করে।

শীলভদ্রের বক্তৃতা অনুসরণ করতে করতে সুস্মিতা কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে বুঝতে পারে নি। হঠাৎ এক ঝাঁক নিশাচর পাখি এক ঝাঁক পালক-বসানো তীরের মত শব্দ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তাদের পাখার ধাক্কায় শীলভদ্রের বক্তৃতা কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। সুস্মিতার সম্বিৎ এল ফিরে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের গালের ওপর একটা অস্বস্তি অনুভব করল। বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখে কে একজন একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। লোকটি উঠে এসে শীলভদ্রের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তার গায়ে কাশ্মীরী আলোয়ানের রঙিন কল্কাগুলো লণ্ঠনের আলোয় ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল।

শীলভদ্রের আসরের নিম্নশ্রেণীর শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতার মর্ম অনুধাবন না করতে পারলেও এই বক্তৃতার অন্তঃসারী সূক্ষ্ম হতাশার সুরটি তাদের মনে ঠিকই বেজেছিল। নিশাচর দলের পাখার শব্দ ওদের সকলেরই কানে গেছে। কে একজন নিম্নস্বরে অপর কোনজনকে জিজ্ঞাসা করে: চৌধুরীদের বাগানে কি এখনও ফল আছে রে? বাদুড়গুলো তো ওইদিকেই উড়ে গেল! জিজ্ঞাসিতজন আরও নিম্নস্বরে উত্তর দেয়: থেকো ফলগুলোই হয়তো আবার খেতে যাচ্ছে, কিংবা এবার ফল নয়, বাগানের ইঁদুরগুলোকে ধরতে যাচ্ছে।

কাশ্মীরী শাল গায়ে ভদ্রলোক প্রণাম সেরে শীলভদ্রের কাছেই বসে পড়লেন। শীলভদ্র হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মনে মনে কি যেন বললেন। পাশে চিন্ময় ঘোষাল বসে ছিলেন। তিনি এই সুদর্শন ভদ্রলোকের সঙ্গে শীলভদ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি এই মৌজাটার জমিদার: রণেন চৌধুরী। চিন্ময় ঘোষালের বর্ণনায় 'মহানুভব ব্যক্তি'। শীলভদ্র স্পষ্টতঃ খুব খুশী হলেন। এতদিনে তাঁর আহ্বান হয়তো ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ শক্তিমানদের আত্মতুষ্টির দেওয়াল ভেদ করে তাঁদের কানে প্রবেশ করেছে। বাণী পৌঁছেছে বিম্বিসারদের কানে!

সুস্মিতা কোন দিকে না চেয়ে নিজের মনে নোটবইয়ে দাগ টানতে টানতে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা প্রশ্নচিহ্ন এঁকে ফেলল!

শ্রোতাদের ভিতর থেকে ওদেরই মত কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহ দোহারা-চেহারার একটি লোক কিছু বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। শ্রোতাদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। সুস্মিতা চেয়ে দেখে লোকটি যেন রণেনের ফোটো-নেগেটিভ! আশ্চর্য হয়ে ভাবল এই কাল বুঝি সারা পৃথিবীতে একই জাতের বহু বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে!

লোকটির পরিধানে ময়লা ধুতি কিন্তু সামনে কোঁচা। গায়ে কুর্তা, সেটাও ময়লা। চোখ দুটো অত্যন্ত অস্থির, সন্ধানী, এক ধরনের কালো জ্বালায় উদ্দীপ্ত। কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো চুল— যাত্রার দলের অভিনেতার মত।

লোকটা বুঝি পৃথিবীকে একটা রঙ্গমঞ্চ ভেবে নিয়ে সজ্ঞানে একটা পাঠ বেছে নিয়েছে। সেই পাঠটা যেমন করেই হোক এই মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে সে বদ্ধপরিকর।

শীলভদ্রের পাশে উপবিষ্ট ঘোষাল নিম্নস্বরে শীলভদ্রকে কিছু বলল। সম্ভবত লোকটার পরিচয় দিল।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে চেয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল, এতকাল আমরা সব 'খেকো' জিনিস নিয়ে বেঁচেছি। আমাদের ছেলেরা চৌধুরী-বাগানের বাদুড়-খেকো ফল কুড়িয়ে কুড়িয়ে বাল্যকাল কাটিয়েছে। আমাদের পরিবারের মেয়েদের ইজ্জত ধনী নিশাচরদের ঠোঁটের ঘায়ে খেকো হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। সেই সব খেকো নারী নিয়ে আমরা ঘর করছি। যে জমি আপনারা আমাদের দান করবেন তাও এমনি খেকো হবে। বহু বর্ষ ধরে তার উৎপাদিকা-শক্তিকে নিঃশেষ করে আমাদের হাতে তুলে দেবেন আমাদের রক্ত দিয়ে আবার ভিজিয়ে দেবার জন্যে। আমরা আপনাদের এই খেকো জমির দান নেব না। আমরা অটুট ফল চাই, অটুট ফসল চাই, অটুট স্ত্রী চাই, অটুট জমি চাই…

জমিদার রণেন চৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠে কাশ্মীরী শালখানা খুলে আর একবার পাট করে গায়ে চড়ালেন। লণ্ঠনের আলোয় তার কল্কার বাহার ঝলমল করে উঠল। অনতিদূরে তাঁর পাইক বসেছিল। সেও দাঁড়িয়ে উঠে এক হাতে দীর্ঘ লাঠি ও অন্য হাতে একটা লণ্ঠন বাগিয়ে ধরল। রণেন চৌধুরী মাথা হেঁট করে শীলভদ্রের পা ছুঁয়ে মৃদুস্বরে কী একটা কথা বলে ভিড়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। কোন অজ্ঞাত জাদুতে এই ভিড় দু ভাগে ভাগ হয়ে তাঁর পথ করে দিল।

সুস্মিতার সহসা মনে হল সে একটা যাত্রার আসরে বসে রয়েছে। রণেন চলে গেলে শীলভদ্র পূর্বের বক্তাকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, নরেন, অনেক কাল আমরা লড়াই করেছি পরস্পরের সঙ্গে, এবার আমাদের লড়াই বন্ধ করে মিলতে হবে। একদিন মানুষে মানুষে মিলেই পৃথিবীর ভূমিকে উর্বর করেছিল, একদিন মানুষে মানুষে মিলেই প্রকৃতির মুঠি থেকে অন্ন সংগ্রহের কৌশল আবিষ্কার করেছিল। আমাদের আবার সেই মিলনে ফিরে যেতে হবে। অত্যাচারীকে ভালবাসলে অত্যাচার বন্ধ হবেই। মানুষ অত্যাচার করে ভয়ে। ভালবাসা পেলে তার ভয় যাবে কেটে, অত্যাচারও বন্ধ হয়ে যাবে।

নরেন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, পৃথিবীতে ভালমন্দ যেমন চিরকালের জন্যে পরস্পরবিরুদ্ধ, আলো অন্ধকার যেমন পরস্পরবিরুদ্ধ, তেমনি অত্যাচারিত ও অত্যাচারী পরস্পরবিরুদ্ধ। এরা কোনদিন মিলবে না, মিলতে পারে না। দুর্যোধনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের মিলন হয় নি কেন? জরাসন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের?

ফিন্‌ফিন্‌ করে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। সভার উপর দিয়ে এক ঝলক কনকনে হাওয়া বয়ে গেল। শ্রোতৃমণ্ডলীর কিছু কিছু লোক চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। শীলভদ্র সভা সাঙ্গ করলেন। নরেনকে ক্যাম্পে দেখা করতে বললেন।

* * *

সভা শেষ করার পর তাঁর ক্যাম্পে অর্থাৎ ঘোষালের বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে বসে বসে পড়ছেন শীলভদ্র। অনতিদূরে সুস্মিতা গত সন্ধ্যার বক্তৃতার একটা অনুলিপি লিখছে। লেখা শেষ হলে পড়ল: ভূমির ওপর কোনও মানুষের একার অধিকার নেই। এই যে ভূমিখণ্ডের ওপর আমরা বসে রয়েছি এর ওপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কত প্রাণী আর তাদের কনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী কত মানুষ যুগ

যুগ ধরে এখানে চলেছে ফিরেছে। ভিটে তৈরি করেছে। কত বংশ জন্মেছে, কত বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে এই কয়েক বর্গহাত ভূমিখণ্ডে! কোনও জন এর ওপর অনন্তকালের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। কখনও মানুষ বীজ ছড়িয়েছে এইটুকুতে। সেই বীজ শস্যে হরিৎ হয়েছে, এর অন্তস্তলে নিহিত জীবনরসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাণ্ডের মাথায় নতুন বীজরূপে টেনে তুলেছে। আবার পরের হেমন্তে শেষ হয়ে এসেছে এদের রসাকর্ষণের ওষধি জীবন। কখনও এখানে কুটির তৈরি হয়েছে, কখনও প্রাসাদের একাংশ। ছবির পর ছবি মিলিয়ে গেছে। এর উপর কোনওদিন কারো অধিকার বর্তায় নি। এ ভূমি সকল মানুষের···এমন কি, সমস্ত প্রাণীজগতের অধিকার এর ওপর!

শীলভদ্র বললেন, আমার ভাবের ওপর তোমার কথার দীপ্তি কী সুন্দর ফুটেছে স্মিতা! এই কথাগুলো যে আমিই বলেছি, এ আর মনে হচ্ছে না আমার! ওরা যেন আমার থেকে স্বতন্ত্র—যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়া বীজ!

সুস্মিতা উত্তর দেবার আগেই ঘোষাল নরেনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করে শীলভদ্রকে বলল, এই নাও ভাই, এই মশালটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম।

শীলভদ্র নরেনের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে ভাল করে বোঝার জন্যেই আমি আজ তোমাকে ডেকেছি। তোমার মধ্যে যে সত্যটা স্ফুলিঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সত্য আমার সত্যের স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে আশে-পাশের অন্ধকার অনেকদূর সরে যাবে। এস, বস।

শীলভদ্র নরেনের সঙ্গে সুস্মিতার পরিচয় করিয়ে দিলেন: নরেন-ভাই ঘোষাল-ভাইয়ের আত্মীয়, অর্থাৎ আমারও ভাই!

সুস্মিতা, আমার ক্যাম্প পরিচালিকা, সেক্রেটারি, বন্ধুকন্যা···আমার সহায়।

নরেন সন্দিগ্ধ-চোখে সুস্মিতার দিকে একবার চেয়ে দেখল। ঘরে আলো কম, তবু যেন কত আলো! লণ্ঠনের ঈষৎ আলো ওর মার্বেলের মত মুখে হাতে গলায় পড়ে ঠিকরে যেন তীব্রতর হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই রূপের সামনে সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতসারে ওর কাছ থেকে দূরে মাদুরের একটা কোণে বসে পড়ল। নরেন ঘরে ঢুকতে দেশী মদের গন্ধে ছোট্ট ঘরটা ভরে গেল। সুস্মিতা আঁচলটা মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নিল। ঘোষাল দরজার কাছে বসে পড়ল—যেন পাহারা দেবার জন্যে।

শীলভদ্র অন্য কোনও কথায় না গিয়ে সোজা নরেনকে প্রশ্ন করলেন, তুমি মদ খেয়েছ, নরেন?

নরেন উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এতে কি লাভ হয়েছে তোমার?

নরেন সুস্মিতার মুখের ওপর আঁচল বুলিয়ে যাওয়া দেখে তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল, কুকুরের মত জীবন আমাদের। আপনাদের সমাজের আইনে আমরা যে উচ্ছিষ্ট পাই তাই দিয়ে আমরা বাঁচি। তাই, আইনের বাইরে কিছু তৈরি করে খেলে—তা বিষ হলেও, আমাদের আত্মা তৃপ্তি পায়।

শীলভদ্র আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বিয়ে করেছ নরেন?

নরেন ঘোষালের দিকে একটা জ্বলন্ত চাউনি নিক্ষেপ করে বলল, আমার স্ত্রী হয়ে যিনি আছেন তিনি জাতিতে বাগ্দী!

শীলভদ্র বললেন, স্ত্রী হয়ে আছেন! মানে, বিয়ে কর নি?

নরেন গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়, আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা যদি বলেন, তা হলে বলব, না। আপনাদের তৈরি অনুষ্ঠানকে আমি মানি না। বিয়ে অনুষ্ঠানের চেয়ে বড়। তা ছাড়া—

তীব্র একটা চাবুকের ঘায়ের মত একটা কথা ঠোঁট পর্যন্ত এগিয়ে এসে থমকে গেল। সেটাকে প্রাণপণে চিবিয়ে ফেলল। সুস্মিতার দিকে চেয়ে নিম্নস্বরে বলল, অনুষ্ঠানকে আপনিও তো মানেন না?

শীলভদ্র নরেনের হাবভাব, তার চোখের প্রত্যেকটা চাউনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করছিলেন। সার্কাসের বাঘের টেমার যেমন খেলার সময় বাঘটাকে লক্ষ্যে রাখেন তেমনি। নরেনের চোখের শেষ চাউনির দিক ও তার শেষ কথাটার ইঙ্গিত বুঝে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অতি সাবধানী লোক শীলভদ্র। বুঝলেন এর সঙ্গে আপোস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শীলভদ্র ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা নরেন, তুমি বাইরের সমাজের অসঙ্গতি সম্পর্কে যতটা সচেতন নিজের ভেতরের অসঙ্গতি সম্পর্কে কি ততটাই সচেতন ?

নরেন প্রশস্ত হাসি হেসে বলে, আমার ভেতরে তো অসঙ্গতি আছেই, আর, তা আমি জানি। আমি জীবন নিয়ে পরীক্ষা করতে নেমেছি, অসঙ্গতি তো জন্মাবেই মনে। এই অসঙ্গতিটাই হয়তো ভেতর থেকে আমাকে শক্তি যোগাচ্ছে।

শীলভদ্র নরেনের কথাবার্তার ধরন ও তার কথার শব্দবিন্যাস দেখে বুঝলেন সে অশিক্ষিত নয়। হয়তো উচ্চশিক্ষিতই। ও কিসের দুঃখে কিংবা কিসের প্রেরণায় এই অধঃপতিতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে !

নরেনের প্রশস্ত হাসির উত্তরে শীলভদ্রও মৃদু হাসলেন। প্রকাশ্যে বললেন, ঠিক বলেছ। আমার জীবনটাও আমার পরীক্ষা। আমরা দুজনেই গবেষণা করছি জীবন নিয়ে। দু জন দু ধারায়।

শীলভদ্র ঠিকই বললেন। কিন্তু কে কোন্ ধারায় জীবন নিয়ে পরীক্ষা করছে সে সম্বন্ধে তাঁরও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তিনি আপাততঃ মনে করছেন এ তাঁর জীবনের অধ্যাত্মসাধনা। আর নরেন মনে করছে সমাজ-সাধনা। কিন্তু দুজনেই পরস্পরের অজ্ঞাতে একই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন। উর্ধ্বের সঙ্গে অধঃর বিভেদটা ঘুচিয়ে দিতে। একজনের কাছে এই বিভেদটা পরিস্ফুট হয়েছে মানসক্ষেত্রে, অপরজনের ক্ষেত্রে সমাজে। কিন্তু দুজনের একই পদ্ধতি। দুজনেই উর্ধ্ব অধঃকে একাকার করে দিয়ে বিভেদ ঘোচাতে চাইছেন।

শীলভদ্রের কথায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে নরেন নিজের অদৃশ্য বর্মটা সাময়িকভাবে খুলে রেখে গভীর অনুভূতির সঙ্গে বলল, জানেন তো, এই বাংলা দেশের ওপর কত লড়াই হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কত মা-বোন বিদেশী সৈন্যদের অঙ্কে ইজ্জত বলি দিয়েছে। কেউ ভয়ে, কেউ লোভে, কেউ স্বেচ্ছায়। কলাগাছের 'বাস্না'র মত চরিত্রগুলোকে কালস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে সমাজের শ্রাদ্ধ করেছে তারা। তবু তো আমরা জন্মেছি। এখনো দেশটা জনমানবহীন হয় নি। চরিত্র নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। কে কাকে স্বামী বা স্ত্রী বলে মানল, কে কাকে কি ভাবে গ্রহণ করল তা নিয়ে জাতির মাথাব্যথা নেই। আমি চরিত্র বলি অন্য কিছুকে—

শীলভদ্র যেন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন নরেনের ব্যথাটা কোথায়। ওর জীবনের ইতিহাসটা না পেলে ওর এই ভূমিকাটার কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করেন, চরিত্র বলতে তুমি কি বোঝ ?

নরেন বলল, তা আমি জানি না। তবে লোকে যাকে চরিত্র বলে সেটা যে মোটেই চরিত্র নয় তা আমি মনে-প্রাণে বুঝেছি।

বাইরে দরজার পাশে খসখস আওয়াজ হতে সুস্মিতা সেদিকে চেয়ে দেখে, কে একটি বউ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের লণ্ঠনের আলোটা তার আধঘোমটা দেওয়া মুখের একাংশে পড়েছে। মুখখানা যেন কালো পাথরে তৈরি। যে শিল্পী মানুষের মুখের অবয়ব নিয়ে অহোরাত্র কাজ করছে সেই-ই এই কালো পাথরের মুখখানায় নিঃশেষে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। কালো কপালে সিঁদুরের টিপ। তারও ওপরে গাঢ় লাল রঙের চওড়া সিঁদুরের সিঁথি।

নরেন বাইরের দিকে চেয়ে বলল, আমি এখন উঠি ঠাকুরমশাই, আমাকে ডাকতে এসেছে।

নরেনের অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণদের 'ঠাকুর মশাই' বলেই সম্বোধন করে। নরেন তাদের সম্বোধনটি পর্যন্ত আয়ত্ত করে নিয়েছে।

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করেন, তোমার স্ত্রী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই-ই।

সুস্মিতা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, রাত্রিবেলায় ও যেখানে-সেখানে যেতে ভয় পায় না ?

নরেন হেসে বলল, না। মাঝে মাঝে রাত থাকতে ও এখান থেকে এক ক্রোশ দূরের বিলে মাছ ধরতে যায়। ভয় পেলে ওর চলবে কেন ? ও কেন এসেছে, জানেন ? ও আপনাদের বিশ্বাস করে না। ভেবেছে আমাকে বুঝি আপনারা ঘরের মধ্যে আটকে বুকে বাঁশ দিয়ে মেরে ফেলবেন। ওর বাবাকে চৌধুরীরা এই ভাবে মেরেছিল কিনা !

সুস্মিতা বিস্ময়ে ভয়ে কাঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, রণেন বাবুরা ?

নরেন বলল, হ্যাঁ।

বাইরে নরেনের বউ বলল, ধ্যেৎ!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বলল, কিংবা ও হয়তো ভেবেছে যে কূল ভেঙে বেরিয়ে আমি ওর ঘাটে পৌঁছেছি হয়তো আপনাদের মোহে পড়ে ওকে ত্যাগ করে আবার সেই কূলে ভিড়ে পড়ব। ও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মেলামেশা পছন্দ করে না আমাকে হারাবার ভয়ে।

বাইরে আবার সেই বউ বলল, ধ্যেৎ!

হাঃ-হাঃ করে উচ্চহাসিতে ভেঙে পড়ল নরেন। নরেনের বউ অস্ফুটকণ্ঠে কী একটা বলে দ্রুত সরে গেল দরজা থেকে।

নরেন যেতে যেতে বাইরের চৌকাঠে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে সুস্মিতার দিকে ঘুরে বলল, ও কালো। কিন্তু বাংলাদেশের কালো মাটির মত ও স্নিগ্ধ। আমার দেশের এই কালো পলির মত নরম আর উর্বর ওর মন। বাংলা-দেশের মত সর্বতোভাবে উর্বরা আমার ওই ছোটলোক স্ত্রী।—বলে, দ্রুত বেরিয়ে গেল।

সুস্মিতার কানে ওর ওই কথাগুলো সূক্ষ্ম উপহাসের মত শোনাল। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল না কী ইঙ্গিত করে গেল নরেন।

এদিকে আঙিনায় ঘোষালের বউ নিম্নকণ্ঠে গালাগালি জুড়ে দিয়েছে। একটা কথা সুস্মিতার কানে গেল: ছোটলোকের মেয়ে বামুনের মাথায় চেপে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ধুচুনির স্বর্গবাস!

ঘোষাল সুস্মিতার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চেয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, বাগ্দীবউ বোধ হয় দাওয়ায় কাপড়চোপড় ছুঁয়ে থাকবে!

ঘরের মধ্যে আবহাওয়াটা লণ্ঠনের গ্যাসে বুঝি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সুস্মিতার মনে হল তার শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। দেখল কালপুরুষ বিরাট দু পা বাড়িয়ে কোমরে তারাখচিত তলোয়ার ঝুলিয়ে আকাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কম্পিত চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ কার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে চকিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঘোষালের স্ত্রী বিরজাদেবী পাশে দাঁড়িয়ে।

ফিস্‌ফিস্ করে বিরজা নরেনের এই অধঃপতিত ভূমিকা গ্রহণের একটা বিকৃত ব্যাখ্যা করে গেল। বিরজা যা বলল তার সারমর্ম এই, যেহেতু নরেন রক্তের দিক থেকে অধঃপতিত তাই সে অধঃপাতে চলেছে। চৌধুরীদের ঠাকুর-বাড়ির পুরোহিতের একমাত্র সন্তান নরেন। উচ্চ-শিক্ষিত, কিন্তু ঘৃণিত। চৌধুরীরাই ওর সত্যিকারের পিতৃ-পুরুষ। ওর জন্মের পর থেকেই সে কথা সকলেই জানত। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও তা জেনেছে।

তবু বিরজা নরেনের এই বাগ্দী-স্ত্রী গ্রহণ করাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। বিরজা নরেন এক পাড়ায় মানুষ, ছেলেবেলা থেকে পরস্পর পরিচিত। দুজনের মধ্যে পরস্পরের অগোচরে হয়তো কিছু অদৃশ্য মানসবন্ধনও সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সে কথা কিন্তু কেউ স্বীকার করে না দুজনের মধ্যে। নরেন বিরজার রুগ্নতাকে সময় সুযোগ পেলে তার সামনে তুলে ধরে। আর বিরজা নরেনের সামনে তুলে ধরে তার অনাচারকে। তবুও এদের মধ্যে আলাপের সূত্রটা ছিন্ন হয় নি। নরেনের পৌরুষ, তা সে যতই উচ্ছৃঙ্খল হোক না কেন, বিরজাকে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট করে।

নরেনের স্ত্রী-গ্রহণের পর বিরজার সমস্ত ক্ষোভটা পড়েছে তার স্ত্রীর ওপর বিদ্বেষের চেহারা নিয়ে।

বিরজা সুস্মিতাকে বলল, নরেনের বউটাকে দেখেছেন? কি বেহায়া? দিনরাত্রি মানুষকে নিজের গা দেখিয়ে বেড়ায়! ওই করেই তো নরেনকে বশ করেছে! কলকাতার মেয়েদের মত আঁটসাঁট করে শাড়ি পড়ে যে শরীরটা চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেন বাপু, বুকটাও ভাল করে আঁচল দিয়ে ঢাকতে পার না?

সুস্মিতা আগে লক্ষ্য করে নি। চকিত হয়ে তাকাল বিরজার অস্থিসার বুকখানার দিকে।

বিরজা প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে চলল, আর, হাসি দেখেছেন? যেন বর্ষার মেঘে বিজলীর চক্র! সময় নেই অসময় নেই ঝলসে উঠছে! মরণ আর কি! এমন ডাবুনে মেয়েমানুষ তুমি খুব কম দেখবে দিদি।

এর পর সুস্মিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব নিম্নস্বরে বলল, বিয়ে হয় নি, কিন্তু সেদিন শুনলাম ওর পেটে নরেনের ছেলে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

সুস্মিতা সহসা যেন এই অস্থিসর্বস্ব রূপযৌবনহীনা নারীর অন্তস্তল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পেল। এই প্রায়-নিঃশেষ-হয়ে-যাওয়া-প্রাণ নারীর সন্তানকামনা তার শেষ কথাগুলোর মধ্যে হাহাকার করে উঠল।

সুস্মিতা কোনদিন লক্ষ্য করে নি, করলে দেখতে পেত ওষধিলতার যখন পরমায়ু শেষ হয়ে আসে সে তখন শরীরের যে কোনও একটা অংশে সমস্ত রস সংহত করে যেমন করেই হোক একটা না একটা ফল দিয়ে যায়।

সুস্মিতা আনমনে বলে উঠল—ভালই তো।

ঘোষাল-গিন্নী কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল সুস্মিতার এই মন্তব্য শুনে। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনারা তো কাল বিকেলে চৌধুরীদের গ্রামে যাচ্ছেন। চৌধুরী-বাড়ির ছোটবাবু ডাক্তার। একবার জিজ্ঞেস করবেন তো আমার ওষুধটা কি? পাওয়া যাবে কোথায়? দাম কী? তিনি যদি ওষুধটার নামধাম বলেন তো আপনি কলকাতা থেকে চিঠি লিখে আনিয়ে দেবেন। এলে পর ওঁর হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কিসের ওষুধ ওঁকে বলবেন না। বলবেন কাশির ওষুধ।—আবেগের অশিষ্টতায় বিরজা হঠাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। লক্ষ্মী দিদি, আমার এই উপকারটুকু করো। আমি চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাকব।—পরমুহূর্তেই আবেগ সামলে নিয়ে বলল, আমার কাছে পাঠানোর অসুবিধে হবে না, উনি তো আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবেন ঠিক করেছেন। ওঁর বন্ধু নাকি বলেছেন আমাদের ছোট্ট সংসারটা তিনিই চালিয়ে দেবেন। বেশ ভাল চাকরি। বন্ধু না হলে কেউ কি কারুর জন্যে এতটা করে?

সুস্মিতা কিছু না বলে আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইল।

* * *

কয়েকটা দিন পরে। বিকেলবেলায় বিরজা কাপড় ছেড়ে চুল বেঁধে সিঁথিতে নতুন করে সিঁদুর দিয়ে সদরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ ঘোষালের ফিরে আসবার কথা।

সামনের বকুল গাছের মাথায়ও সিঁদুর লেগেছে বিকেলের রোদ্দুরে। নজরে পড়ল নরেন দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে। কপাটের আড়ালে বিরজা সরে এল।

নরেন দরজার কাছে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে হেসে বলল, কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ?

বাজে কথা বলো না, যেখানে যাচ্ছিলে যাও।

যদি বলি আমি কোথাও যাচ্ছি না, এখানেই এসেছি!

বিরজা দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন একটা দমকা হাসি হেসে বলল, আমি নিজের কাজেই যাচ্ছিলাম বিরজা, তোমার এই সাজসজ্জা দেখে একমুহূর্ত দাঁড়াতে হল। হঠাৎ মনে হল এমনি করে আমার জন্যেও তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে! তাই কথাটা বললাম। কিছু মনে করো না। নিছক ঠাট্টা করেই বলেছি। এবার তুমি বেরিয়ে আসতে পার, আমি যাচ্ছি। বলতে বলতে যেমন দ্রুতপদে এসেছিল তেমনি দ্রুতপদেই অন্য দিকে চলে গেল।

বিরজার বাড়ি গ্রামের একটা মোড়ের ওপর।

বিরজা দরজা খুলে আবার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। দেখল নরেন সত্যিসত্যিই দ্রুতপদে অন্যদিকে চলেছে। চৌধুরীদের গ্রামের দিকে। মনে কি একটা অস্পষ্ট শঙ্কা জাগল।

যতক্ষণ দেখা যায় নরেনের দিকে ততক্ষণ চেয়ে রইল। পথের আর একটা বাঁক ঘুরে নরেন অদৃশ্য হয়ে গেল। একবারও সে ফিরে চেয়ে দেখল না। কী একটা দুঃখে বিরজার বুকটা মুচড়ে উঠল। চোখের কোণে বুক-নেঙড়ানো কয়েক ফোঁটা অশ্রুও জমল।

চেয়ে দেখল বেলা পড়ে এসেছে। তবু ঘোষালের দেখা নেই।

* * *

ঘোষাল যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত্রি এক প্রহর পেরিয়ে গেছে।

সদরদরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। অর্গল ছিল না। সন্তর্পণে শোবার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝল ঘরে আলো জ্বলছে। পুরনো দরজার ফাটলের ভিতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। গায়ের জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে বিরজা দরজা খুলে দিল।

না, ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। বিরজা একাই

রয়েছে। সাধ্যমত রূপসজ্জা করেছে। বিয়ের শাড়িটা পরে রয়েছে। কিন্তু মুখ বর্ষারাত্রের আকাশের মত ঘনঘটাচ্ছন্ন।

বিরজা কিছু বলল না। পরিচর্যার কাজে লেগে পড়ল যন্ত্রের মত।

তারপর গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘোষাল বলল, এবার আমাদের ভাগ্য ফিরবে বিরজা।

কি রকম?—বিরজা জিজ্ঞাসা করে নিস্পৃহভাবে।

কয়েক বিঘে জমি দান করবেন শীলভদ্র।

ছোট্ট একটা 'ও' উচ্চারণ করে বিরজা পাশ ফিরে শুল। দামী শাড়িটাই পরে শুয়েছে। এটাই তার একমাত্র ঐশ্বর্য।

ঘোষাল সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ওর দেহটায় হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তবু, ভাবে ঘোষাল, এই হাড়ের খাঁচায় যে প্রাণটা বাস করছে তার দুঃখের যেন অবধি নেই। ঘোষালের চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে গেল।

সহসা বিরজা তাঁর দিকে পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করে, ওষুধ পাও নি? ওষুধ?

কিসের ওষুধ!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে ঘোষাল।

যাক্ গে! বলে ঘোষালকে হতচকিত করে বিরজা তাঁর গলাটা শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে জড়িয়ে ধরে মুখের ওপরে একটা জলন্ত চুম্বন বসিয়ে দিল।

যার কল্পিত মুখের উপর এই জলন্ত চুম্বন পড়ল সে তখন চৌধুরীদের গ্রাম সুবর্ণপুরের হরিজন পল্লীতে তারা-খচিত আকাশের নীচে গোপনে সভা চালনা করছে। কয়েক সপ্তাহ পরে মাঠে ধান পাকবে। এই ধান রাতারাতি কেটে হরিজন ভাগচাষীদের খামারে তুলে ফেলতে হবে। যাদের শ্রম মাটিতে পড়ে ফসলে রূপান্তরিত হয়েছে তাদেরই ঘরে ফসল তুলে আনতে হবে। জমিদার এতদিন ওদের বঞ্চিত করেছে, এবার জমিদারকে বঞ্চিত করবে ওরা।

সভা শেষ করে কয়েকজন ভাগচাষীকে সঙ্গে নিয়ে নরেন মাঠে বেরিয়ে পড়ল চৌধুরীদের জমিগুলোকে চিনে নিতে। সে জানতেও পারল না তারই একটা বিকল্প মূর্তির বাহুবন্ধনে প্রায় একটা প্রহরব্যাপী নিদারুণ উত্তেজনার পর বিরজা তখন অসাড় দেহে নিষ্প্রভ মনে এলিয়ে পড়েছে।

ঘোষাল সন্তর্পণে বিরজার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে অতি সাবধানে দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এল। বিরজার এই অতর্কিত আক্রমণে সে একেবারে মূঢ় হয়ে গেছে। শুধু যে মূঢ় হয়ে গেছে তাই নয়, নিজের অশক্তির গ্লানিতে তার সমস্ত মন কানায় কানায় ভরে গেছে। তাই বেরিয়ে পড়েছে খোলা আকাশের নীচে। ক্লান্ত মূঢ় চোখে আকাশের দিকে চেয়ে রাত্রি মাপতে চাইল। কখন প্রভাত হবে! দেখল, কালপুরুষ যেন যুদ্ধ জয় করে আকাশের কানায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

তৃতীয় পর্ব

অভিক্রিয়া বা একস্‌পেরিমেণ্ট

কয়েক মাস পরে।

যে কালপুরুষকে ঘোষাল সে রাত্রে পূর্ব আকাশে দেখেছিল সেই কালপুরুষ এখন পশ্চিম আকাশে ওঠে। সেই রাত্রিশেষের প্রভাতবেলায় যে সংখ্যাতীত ফুলে পরাগযোগ ঘটেছিল তাদের অসংখ্য ঝরে গেছে, আরও অসংখ্য ফলে পরিণত হয়ে গেছে। কাল নিষ্ক্রিয় নেই। ইতিমধ্যে কতশত কিশোরীর দেহ পরিপূর্ণ হয়ে যৌবনের ডৌল পেয়েছে। কত সুডৌল দেহের সীমারেখায় সহসা অস্পষ্ট কুঞ্চন জেগেছে। অসংখ্য মানুষের অসংখ্য আশার ফুল ঝরে গেছে আর আরও অসংখ্য মানুষের জীবনে অসংখ্য অপ্রত্যাশিত ফললাভ ঘটে গেছে।

ডাক্তার সুব্রহ্মণ্যম্ নরেনকে তাঁর নূতন কর্মকেন্দ্রে নিয়ে গেছেন তাঁর একটা মৌলিক গবেষণায় সাহায্য করতে। তাঁর এই গবেষণা কেন্দ্রটি একটি ইস্পাতশিল্পসংস্থার অনতিদূরে একটা মালভূমিতে অবস্থিত।

শীলভদ্র স্বগ্রাম চন্দনপুরের পাশের গ্রাম সুবর্ণপুরের চৌধুরীদের কাছারিতে এ অঞ্চলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেছেন এবং ভূদানযজ্ঞের কঠিন ব্রত পালন করে চলেছেন।

ঘোষালমশায় ইতিমধ্যে চৌধুরীদের কয়েক বিঘে পতিত ডাঙ্গা পেয়েছেন ভূদানযজ্ঞের দানস্বরূপ।

সুবর্ণপুরের মাঠে হৈমন্তী ফসল পেকে একেবারে সোনা হয়ে গেছে। আর···

১

আর···

প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে আভার দেহের মধ্যে নতুন প্রাণের অঙ্কুর জন্মেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার অজ্ঞাতসারে। তাপস প্রথমে বিশ্বাস করে নি। আভা নিজের কাছেও এটা স্বীকার করতে চায় নি। আভার উদ্‌ভ্রান্ত প্রবৃত্তির রোমাঞ্চ-জীবনকে বিদ্রূপ করে নিষ্ঠুর বাস্তব নিজের অলঙ্ঘ্য নিয়মে কাজ করে গেছে।

আভা যদি মনে করে থাকে যে জীবনকে শুধু তপ্ত সুরার মত পান করে নিঃশেষ করে দেবে, তা হলে সে ভুল মনে করেছে। প্রবৃত্তি তার স্থূল হস্তে এই সুরাপাত্রটি ভেঙে দিয়ে, নেশা চূর্ণ করে, তাকে এই সুস্থ-অসুস্থ, ক্ষুধা আর ক্ষুন্নিবৃত্তিতে, চাওয়া-পাওয়ার পরস্পর দ্বন্দ্বে ব্যথিত মাটিতে টেনে নামিয়ে এনেছে। এই প্রবৃত্তিই তাকে উত্তপ্ত কল্পলোক থেকে, কাহিনীর লোক থেকে, নিজের পরিবারের নিঃশ্বাস রুদ্ধ-করা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনেছে।

এমনই প্রকৃতির বিধান যে, প্রত্যেক কর্মই কোন না কোন একটা স্থূল ফলে আত্মপ্রকাশ করে। উদ্‌ভ্রান্ত কামনার রোশনাই-জ্বালা প্রবৃত্তির মহোৎসবের পর তার একটা স্থূল পরিণতি ঘটে। কোন কিছুই বেশীদিন স্থূলের আকর্ষণ উপেক্ষা করে টিকতে পারে না। ফুলের অবয়ব সূক্ষ্ম, তার সৌরভ সূক্ষ্ম, তার পরাগযোগপর্ব আরও সূক্ষ্ম শব্দে গুঞ্জনে মধুর, কিন্তু পরিণতি-ফল একেবারে স্থূল। এই স্থূলটাই শেষ সত্য। আভার দেহের ভিতরে যে প্রাণ-ফল ধরেছে তা একান্তই স্থূল। ইচ্ছাশক্তি বা প্রবল বিরাগ কোন কিছু দিয়েই একে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করা যাবে না।

প্রথম প্রথম এই স্থূল বস্তুটা সম্বন্ধে আভা সচেতন ছিল না। সমীর ডাক্তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে গেলেও না। তারপর দিনের পর দিন যায়, দেহে পরিবর্তন ঘটে; পরিবর্তন ঘটে মনে। স্নায়ু চেতনায়। দেহময় একটা মন্থরতা নামে।

আরও দিন যায়, বুকের মধ্যে একটা অপূর্ব অনুভূতি জাগে। নবজাত প্রাণপিণ্ড ঠেলে ঠেলে উপরে উঠে হৃদপিণ্ডটাকে আঁকড়ে ধরতে চায়—বোধ করি বুকের ভিতর মুখচাপা নির্ঝরটার মুখ খুলে দেবার জন্যে।

দিনের পর দিন যায়। সঙ্গে সঙ্গে আভার শঙ্কাও বাড়ে। আভার প্রতি তাপসের নেশাও কমে আসে। একদিন আভার সমস্ত ভাবনার লক্ষ্য ছিল তাপসকে সদা উত্তেজিত করে নিজের পশ্চাতে ছায়ার মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে। আজ তার ভাবনার জগৎ বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিন সে অনন্যচিন্ত হয়ে তাপসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজ চিন্তার জগতে একটা নতুন স্বতন্ত্র লোক সৃষ্ট হয়ে গেছে।

আভার দেহমনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করতে করতে তাপসের নেশায় ভাটা পড়েছে। এই স্থূল পরিণতি থেকে কী করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই ভাবনায় তাপস বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

আভাকে তাপস একদিন বলল, ওর দায়িত্ব আমার নয়। আমার ইচ্ছায় ঘটে নি, আমি ওটাকে নষ্ট করব।

আভা প্রথমটায় স্বীকৃত হয় নি। স্বাভাবিক সংস্কার আর নবজাগ্রত অপূর্ব অনুভব তাকে বাধা দিয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সমাজের স্থূল বিচারের ভয় লেগেছে মনে। সেই ভয় দিনের পর দিন বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে তার দিনরাত্রির ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

যা এসেছে প্রকৃতির বিধানে সমাজের বিধানে তার আসার অধিকার সিদ্ধ হয় নি। এই নবজাগ্রত অনুভূতিতে তার অধিকার নেই। সমস্ত বুকভরা এই প্রাণিন্ পদার্থটার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ স্বীকৃত হবে না। এটা যেন স্থূল শাস্তির রূপে একেবারে তার মর্মের গোড়ায় জন্মেছে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শেষে একদিন তাপসকে সেও বলে বসে, আমিও চাই না। আমিও চাই না। তুমি যা ভাল বোঝ সেই ব্যবস্থাই কর।

* * *

গ্যারেজ-চেম্বারে বসে বসে সমীর ডাক্তার আগের মতই পথের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলেন।

চটুল চড়াই পাখির মত ছোট ছোট চিন্তার দলটাকে উড়িয়ে দিয়ে চকিতে সামনে বসে পড়ে সেদিন ওষুধ চাইতে এসেছিল এক মেয়ে। আর এই মেয়ে—আভা দেবী। শীলভদ্রের তেতলাটা আভা দখল করেছে। কোন্ অধিকারে তা তিনি জানেন না। কিন্তু তাঁর সন্দেহ এ দখল জবরদস্তির দখল। কেন না, এই দখলটাকে আভা তীব্রভাবে জাহির করে।

ওই তো একফালি মেয়ে, কিন্তু দেহের সব দোলনগুলো এমন আয়ত্ত করেছে যে সমীর অবাক হয়ে যান। অভিনেত্রী কিনা!

সেদিন স্টুডিয়োতে ওর মূর্ছার চিকিৎসা করতে গিয়ে সমীর ডাক্তার অনুমানে যা বুঝেছিলেন তার কোনও লক্ষণই আর তিনি দেখতে পান নি ওর দেহে। দিনেদিনে ও আরও চপল হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ ও এই বাড়িটাতে থাকে ততক্ষণই এই বাড়িময় একটা স্পন্দন জেগে থাকে। তার যাতায়াতের ঝিলিকে এই পথটাও জেগে থাকে।

তাপস রাতদিন আসে যায়। তার মোটরটা রাস্তার ধারে রোদে পোড়ে, শিশিরে বৃষ্টিতে ভেজে। কয়েকদিন আগে তাপস তাঁকে এই গ্যারেজ থেকে উঠে যাবার নোটিস দিয়েছে। আইনতঃ সে এখন শীলভদ্রের এজেন্ট। সমীর ডাক্তার এই গ্যারেজটায় আর বসতে চান না। ছেড়ে দিতে পারলেই খুশী হন। নতুন একখানা ঘরও দেখে এসেছেন আজই, সকালবেলায়। হাজার টাকা সেলামী দিতে হবে। হাজার টাকা। সমীর ডাক্তার আপনমনেই হাসেন। তাঁর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে হাজার টাকার অঙ্কটার এমন একটা অসঙ্গতি আছে যে তিনি এই অসঙ্গতি বুঝে না হেসে পারেন না। অন্য কেউ হলে এই পরিস্থিতির কথা ভেবে ভেবে কপালে ঘাম বের করে আনত। সমীর ডাক্তার অন্য প্রকৃতির।

গত কয়েকদিন ধরে সামনের পথটার ওপর আভা দেবীর যাতায়াতের ঝিলিক লাগে নি। এখন বিকেল-বেলায় পথের ওপর সোনালী রোদ্দুর ঝিমিয়ে পড়েছে। এই সময় আগে আগে আভা প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। এই ঝিমিয়ে-পড়া রোদ্দুর তার সিল্কের শাড়িতে লেগে হেসে উঠত। এ কদিন তার হাসিটা বন্ধ হয়ে গেছে। উপরে, আভাও হাসে না। কদিন আগেও সমীর ডাক্তার শুনেছেন আভা দেবীর হাসি ছোট্ট রূপালী জলপ্রপাতের মত বায়ুর অদৃশ্য সিঁড়িতে সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পথে ছড়িয়ে গড়িয়ে চূর্ণ হয়ে পড়েছে। কোনও মানুষেরই প্রতি সমীর ডাক্তারের বিদ্বেষ নেই, মানুষের হাসি, মানুষের চলা—সবকিছুর মধ্যেই সমীর বিস্ময় খুঁজে পান।

মনে মনে ভাবছেন এই সোনালী রোদ্দুরের নিজস্ব কোনও বিস্ময় নেই। মানুষের সঙ্গে মিলেই তবে এ বিস্ময় হয়ে ওঠে।

সহসা তাপসের গাড়িখানা সাঁ করে গড়িয়ে এসে ডাক্তারের দৃষ্টিপথ আড়াল করে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমেই তাপস সমীর ডাক্তারকে সঙ্গে উপরে আসতে বলল।

দোতলায় শীলভদ্রের ঘরে তাঁর চেয়ারে ডাক্তারবাবুকে বসিয়ে তাপস নিজে স্মিতার আসনে বসল।

তাপস বলল, ডাক্তার, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

এটা আদেশ না অনুনয় সমীর ডাক্তার বুঝতে পারলেন না। সোজা চেয়ে দেখলেন তাপসের চোখের দিকে। না, এটা বাঘের চোখ নয়, বেড়ালের চোখ। বিদ্যুৎগতিতে একটা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা খেলে গেল মাথায়। আজকের দিনে মৃত মানুষের চোখ দিয়ে অন্ধদের চক্ষুষ্মান করা হচ্ছে; একদিন, হয়তো মৃত পশুর চোখ দিয়ে অন্ধেরা চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে। কিংবা ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই চেতনা-অন্ধ মানুষের চোখে পশুর চোখ বসিয়ে আসছেন। যেমন এই তাপসের চোখ বেড়ালের চোখ।

তাপস আবার বলল, আপনি যা চাইবেন, যত টাকা চাইবেন, দেব।

ডাক্তার ভাবলেন, যদি হাজার টাকা চাই! নিজের রোখ বজায় রাখতে তুমি আমার নতুন ঘরের সেলামীটা কি আক্কেলসেলামী দেবে! ভাবলেন আর মুচকে হাসলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে হবে?

স্টুডিয়োতে আভাকে পরীক্ষা করে সেদিন কিছু বুঝতে পারেন নি আপনি?

তাপসের চোখ দুপুরবেলায় বেড়ালের চোখের মত হয়ে গেল।

বুঝেছিলাম বইকি!

ওর শরীরের এই···পরিবর্তনটা আপনাকে সারিয়ে দিতে হবে।

বেড়ালের গলায় কাঁটা ফুটেছে, তুলে দিতে হবে।

সমীর ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, ওটা তো রোগ নয় যে সারানো যাবে!

তাপস শক্ত হয়ে বলে, রোগিণী যদি এটাকেই তার রোগ বলে মনে করে তো আপনার সারাতে আপত্তি কি?

ওসব আমার দ্বারা হবে না।

টাকা চান না আপনি?

চাই বইকি! তবে এমন রোগ সারিয়ে নয়। তা ছাড়া—

যে কোন কারণেই হোক চিন্তার প্রবাহের ওপর ডাক্তারের মনের শাসনটা আলগা। একবার কোন একটা চিন্তা তাঁর মনে উঠলে সে তার নিজের স্বভাবে অজস্র পার্শ্বচিন্তাকে টেনে নিয়ে এমন একটা প্রবাহ সৃষ্টি করে যার ওপর সমীর ডাক্তারের মন নিশ্চেষ্টের মত ভেসে যায়।

নিজেই এই স্বাভাবিক দুর্বলতাকে সমীর ডাক্তার নিজের কাছে যে তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেন তার মূল কথা হল চিন্তারা পদার্থ, আর পদার্থে পদার্থে যেমন রাসায়নিক প্রণয় আর বিরাগ আছে তেমনি একটা চিন্তার সঙ্গে অপর চিন্তার স্বাভাবিক প্রণয় কলহ আছে।

—তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে ends আর means—অর্থাৎ 'লক্ষ্য' আর 'উপায়ে'র পারস্পরিক সম্পর্কের গোটা দর্শনটা এসে পড়ে!

তাপস হো হো করে হেসে উঠে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা এক ঝটকায় জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, আপনাকে আমি যদি বিনা পয়সায় এ কাজ করাই?

মানে!—সমীর তাপসের চোখের দিকে চেয়ে দেখেন। বেড়াল যেন অন্ধকার দেখেছে। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। ঝক্‌ঝক্ করছে।

আপনি আমার বাড়িতে থাকেন, তা জানেন?

আপনার বাড়ি! কি করে হল? হলই বা আপনার বাড়ি!—ছেলেমানুষের মত ডাক্তার তাপসের চোখের দিকে চেয়ে বললেন।

এই সূত্রটা ধরে আপনাকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারি, জানেন?

এবার ডাক্তার মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন: ভয় দেখাচ্ছেন? আরে, কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? এ গ্যারেজের ডাক্তার! একেবারে তলা থেকে প্রাক্‌টিস শুরু করেছে, একেবারে তলা থেকে!—হেসে উঠলেন হো হো করে।

রোগী নেই পত্তর নেই, কি করে চলে আপনার? আমি বলছি 'অ্যাবর্শন' করা আপনার পেশা। আমি প্রমাণ করিয়ে দেব। আপনাকে আমি পুলিসে ধরিয়ে দেব। আমি প্রমাণ করিয়ে দেব আপনার জীবিকা···

ডাক্তার ডান হাত নেড়ে মৃদু হেসে বললেন, জীবন নষ্ট করে? এই বলবেন তো? একটা ভুল করেছেন তাপসবাবু, আবার আর একটা ভুল করবেন কেন? আমি জীবনকে ভীষণ ভালবাসি।

ডাক্তার দেখলেন তাপসের চোখ লাল হয়ে গেছে। গোটা মুখটায় একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রোধের সঙ্গে শঙ্কা লড়াই করছে মুখের ওপর। মনে হল এই-ই তো একটা রুগী!

লোকটার ওপর মায়া হল। লোকটা নিজেকে নিজের কাছ থেকে রক্ষার জন্যে অপরকে বিকৃত রূপে কল্পনা করছে। মানুষের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অতি দুঃসহ না হলে সে নিজেকে অপরের মাপে বা অপরকে নিজের মাপে কাটে না। অপরের কল্পিত পাপের মধ্যে নিজের পাপস্খালনের চেষ্টা করে না। নিজের অপরাধ পারিপার্শ্বিকের অপর মানুষের উপর যে চাপিয়ে দেয়, সে মানুষ বড় ভাগ্যহীন, বড় একা। আহত বন্য পশুর মত অদৃশ্য আঘাতকারীর সন্ধানে মুমূর্ষু।

মনের আর একটা অংশে কিন্তু সমীর ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই দ্বিতীয় অংশ তার নিম্নমধ্যবিত্তের ব্যক্তিত্ব। এই দ্বিতীয় অংশের মানুষটা প্রথম অংশের মানুষটা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই দ্বিতীয় মানুষটা ছেলেবেলা থেকে অর্থের সঙ্গে ক্ষমতাকে এমনভাবে জড়িয়ে

দেখেছে যে, সে এই অর্থবান লম্পটের শাসানিতে বিচলিত না হয়ে পারল না। এই দ্বিতীয় মানুষটা শৈশব থেকে অর্থ-হীনতার অভিশাপে সমাজে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর হয়ে প্রকাণ্ড থেকে প্রকাণ্ডতর অপমানের ভার সয়ে ভারবাহী পশুর মত জোয়াল দেখলেই নিজের অজ্ঞাতে ঘাড় এগিয়ে দেয়। এই দ্বিতীয় মানুষটার আরও একটা দিক আছে। সেটা গৃধ্নুতার দিক। যে অর্থের অভাবে তার জীবন তুচ্ছ হয়ে গেছে, যে অর্থ তার চোখে দুর্লভ সুখের স্বর্গের চাবিকাঠি, সেই অর্থের প্রতি তার অসীম আকর্ষণ। অর্থ তার কাছে পিরামিডের চিরপ্রহরী অর্ধমানবী অর্ধসিংহী স্ফিংক্সের মত।

নিম্নমধ্যবিত্তের সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সমীর ডাক্তারের মধ্যে একটা অসাধারণ সত্তা আছে, সেটা তার নিজেরও অচেনা একটা অগ্রসর সত্তা। সত্তার এই অংশটুকু তার নিম্নমধ্যবিত্ত মানসজীবনের ঘোলা প্রবাহের মধ্যে একখণ্ড স্ফটিক পাথরের মত জেগে আছে। এখানে নোঙর করে তার চিত্ত ভরাডুবি থেকে আত্মরক্ষা করে।

সমীর ডাক্তার আর কিছু না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ে গ্যারেজ-ডাক্তারখানায় ফিরে এলেন। মাথায় চিন্তা-গুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

বা রে, মজার দেশ! আমার পয়সা আছে, অতএব প্রতিপত্তি আছে। আমি গায়ের জোরে আমার পাপ তোমার পাপ বলে চালিয়ে দেব! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে!

ডাক্তারের চিন্তার ধারা পাক খেতে খেতে বয়ে চলেছে। শরীর অসুস্থ হলে সে যেমন টলমল করে, পায়ের চালের সঙ্গে হাতের চাল, হাতের চালের সঙ্গে চোখের চাল মেলে না, তেমনি মন অসুস্থ হয়ে উঠলে কথার সঙ্গে ভাবের, ভাবের সঙ্গে কথার মিল থাকে না।

...হাজার টাকা! একখানা ঘর! একজোড়া ভাল ফ্লানেলের ট্রাউজার! একজোড়া নতুন জুতো! পঁচিশ টাকা পনরো আনায়, বাটার! এক-আলমারি বই—ক্যান্সার রোগের ওপর! সমীর ডাক্তার ক্যান্সার তত্ত্বে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট। ক্যান্সার। সমাজের, দেহের, মনের। ক্যান্সার-আক্রান্ত দেহকোষগুলোর সঙ্গে শিশু-কোষের মিল। আশ্চর্য! ক্যান্সারে রুগ্ন কোষগুলোর মধ্যে জীবনের ধর্ম দেখা যায় কেন? রোগের কেন্দ্রে জীবনের চিহ্ন? রোগকে অতিক্রম করে কি নতুন জীবন সৃষ্ট হতে চায়?

...সুস্থ আর অসুস্থ এ দুটো অবস্থার মধ্যে সীমারেখা নেই কোন। সুস্থ অবস্থা শরীরের static অবস্থা, অভিব্যক্তির শুদ্ধ অবস্থা। প্রকৃতির বিধানে এই স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি ঘটছে ক্ষণে ক্ষণে, প্রকৃতি যেন ল্যাবরেটরিতে দেহমনের পরিপোষক অবস্থাগুলোর মধ্যে অদলবদল করে এক্সপেরিমেণ্ট করছে। এক্সপেরিমেণ্ট! ল্যাবরেটরি! ল্যাবরেটরির পাশেই বিশ্রামের ঘর... টেবিল। রজনীগন্ধা। কুকুর। ডাক্সহুণ্ড। ছোট পাম-গাছ। লাল টকটকে ফুলের থোকা। সোফাটার ধারে... আর সেই মুখখানা...তাঁর এপিলেপটিক ফিটের পর দেখা সেই নার্সের মুখখানা...যেন সমুদ্রের উপর কুয়াশা আর কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ-ওঠা সূর্য...অনেক টাকা, অনেক টাকা চাই...বেরিয়ে পড়বেন সেই মুখখানাকে খুঁজতে... এদেশ থেকে ওদেশ। একাল থেকে ওকাল।...বনে বনে হরিণের মত...ঘাসের কার্পেটের ওপর দিয়ে...হাসপাতালে ...আয়ডোফর্মের আবহাওয়ায়...

চিন্তার ধারাটা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। টুকরো টুকরো হয়ে কথাগুলো যে যার সঙ্গে হোক ভিড়ে গেল... রজনীগন্ধার...ক্যান্সার...ডাক্সহুণ্ডের ট্রাউজার...হরিণের জুতো...আয়োডোফর্মের কার্পেট...এর পর একটা কিম্ভূত-কিমাকার ছবি তৈরি হল সমীর ডাক্তারের মনে এই কথাগুলোকে মিলিয়ে।

আয়ডোফর্মের কার্পেটের ওপর দিয়ে জুতো পরে চলে গেল হরিণ ট্রাউজারে ক্যান্সার ঢেকে আর হাতে নিয়ে রজনীগন্ধা! হো হো করে আপন মনে হেসে উঠলেন সমীর ডাক্তার। হঠাৎ চেয়ে দেখলেন পথটা চমকে উঠল। কার ঘোর লাল রঙের শাড়ির ওপর পড়ে সোনালী রোদ্দুর এক ঝলক হেসে নিল।

[ক্রমশঃ]

সংসার

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনও সূর্যোদয় হয় নি, চারদিক আবছা কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে, অবিনাশ হাজির হল নরেনবাবুর বাড়ির গেটে।

ভোরের আবছা আলোর জন্যেই হয়তো সে প্রথমে বাড়িটা চিনতেই পারে নি। আরও একটা কারণ ছিল। বাড়ির সামনেটায় মস্ত বড় একটা প্যাণ্ডেল খাটানো হয়েছে। তাতেই বাড়ির সামনেটার পরিচিত চেহারাটা সে ধরতে পারে নি। পরিচয়ই বা কতটুকু তার! বড় সাহেব-স্থানীয় ব্যক্তির বাড়ি; মস্ত ধনী। তাঁরই প্রিয়পাত্র অনুগত হিসেবে তাঁরই কর্মের প্রয়োজনে ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে মাঝে মাঝে যেটুকু আসতে হয়। তার বেশী কিছু নয়। প্যাণ্ডেলের ভিতর দিয়ে বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। গেটের গ্রীলের দরজাটা আজ এই ভোর থেকেই একেবারে খোলা।

সামনের বারান্দায় বসেছিলেন নরেনবাবু আর তাঁর ছোট ভাই বরেনবাবু। টেবিলের উপর চা দিয়ে গিয়েছে। অবিনাশকে দেখেই নিশ্চিন্ত হাসি হেসে উচ্চকণ্ঠে নরেনবাবু বললেন, এই যে, অবিনাশ এসে গিয়েছে বরেন। এস, অবিনাশ এস। নাও, হিয়ার ইজ মাই এভার ফেথফুল, নেভার ফেলিং অবিনাশ!

তারপর অবিনাশের দিকে ফিরে নরেনবাবু বললেন, বরেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তোমার জন্যে। তা এখন বস, বস। চেয়ার টেনে নাও।

মৃদু সঙ্কুচিত হাসি হেসে আপ্যায়িত হওয়াটা প্রকাশ করে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে। তারপর হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, আমাকে ছটায় আসতে বলেছিলেন, ছটা বাজতে এখনও মিনিট পাঁচেক আছে।

তুমি দেরি করবে না সে আমি জানি। কিন্তু এদিকে বরেন আর বাবা দুজনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি আর চিন্তিত হবার ভান না করে কি করি! নাও, চা খাও।

বলে টেবিলের উপরের এক কাপ চা তিনি এগিয়ে দিলেন অবিনাশের দিকে।

সঙ্কুচিত হাসি হেসে অবিনাশ বলল, আপনাকে দিয়েছিল, আপনি খাবেন না?

না, তুমি খাও। আমি খাব না। আমি আবার রাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করব তো!

নরেনবাবুর সব খবরই রাখে অবিনাশ। অন্ততঃ নিজের সব খবর নরেনবাবু তাকে বলেন, এবং সে যে সব শুনে তাঁর সব কিছুতেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে এটাও বোধ হয় তিনি প্রত্যাশা করেন মনে মনে। সেই হিসেবেই অবিনাশ বলল, আপনি কন্যা-সম্প্রদান করবেন কেন? সে রকম তো কই শুনি নি! কথা তো ছিল—

বলে থেমে গেল সে।

নরেনবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, কথা তো তাই ছিল যে বাবা সম্প্রদান করবেন মঞ্জুকে। তা বাবাই কাল বললেন, না হে, তুমিই সম্প্রদান কর। কন্যা-সম্প্রদানের অনেক পুণ্য! তাই করছি।

বরেনবাবু এবার কথা বললেন, তা কন্যা-সম্প্রদান করবে তো রাত্রে। চা খেতে দোষ কি? তাম্রকূটে ধূমপানে যেমন দোষ নেই তেমনি চা-পানেও কোন দোষ নেই।

নরেনবাবু হেসে বললেন, না, চা-পান অশাস্ত্রীয় এ কথা বলছি না, তবে একদিনই তো! এ দিন তো আর প্রতিদিন আসবে না। আজ নির্জলা উপবাসই করি। কি বল অবিনাশ?

তিনি অবিনাশের সমর্থন চাইলেন যেন।

অবিনাশ হেসে বলল, চা খেলে দোষের কিছু হত না হয়তো! শরীরটাও কিছু পেত। তবে যখন ইচ্ছে হচ্ছে না তখন খেয়ে কাজ কি? এই তো চোদ্দ-পনের ঘণ্টার ব্যাপার!

সে দুজনকেই সমর্থন করে কথাটার শেষ সমাধান করে দিল যেন। এ কাজ সে ভালই পারে। নরেনবাবুর সঙ্গে কাজ করে এ কৌশল সে ভালই আয়ত্ত করেছে।

সে চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, মাছের টাকাটা—

নরেনবাবু ফতুয়ার পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে টাকা বের করে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন আপনার টাকা। টাকা নিয়েই তো বসে আছি। তিনশো আছে—দেখে নিন।

অবিনাশ চায়ের কাপটা রেখে টাকা গুনতে লাগল।

নাও নাও, অত ব্যস্ত হতে হবে না। চা-টা খেয়ে নাও দিকি।

এই শান্ত পরিবেশে অকস্মাৎ ঝড় উঠল। চিৎকার করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন এক বৃদ্ধ। সত্তরের উপর বয়স। তবু শক্ত-সমর্থ চেহারা। সেই চেহারার উপযুক্ত একজোড়া পাকা গোঁফ। তিনি রাগের সঙ্গে বলতে বলতেই এলেন, তোমরা তো এখানে বেশ খাসা জমিয়ে চা খেতে বসেছ। কিন্তু আমি ভাবনায় সকাল থেকে পাগল হয়ে ফিরছি। মাছ আনার ব্যবস্থা তো এখনও হল না!

বৃদ্ধ আস্ফালন করতে করতে আসার মুহূর্তেই অবিনাশ উঠে দাঁড়িয়েছিল।

নরেনবাবু বললেন, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই তো অবিনাশ এসে গিয়েছে।

আরে অবিনাশ তো এসে গিয়েছে, কিন্তু সে এসে গেলেই কি মাছ এসে যাবে?

সবিনয়ে সপ্রতিভ হাসি হেসে অবিনাশ বলল, আজ্ঞে, এর আগে গেলে বাজারে মাছ পাওয়া যাবে না। মাছ সব এইবার আসছে আর কি। আমি এই যাচ্ছি এক্ষুনি।

চলুন, আমিও যাব।

হেসে অবিনাশ বলল, আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন? আমিই তো যাচ্ছি।

অবুঝের মত ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। বললেন, না, আমিও যাব চলুন। আপনি মাছ চিনতে পারবেন না। মাছ পচা বা নরম হলে একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে।

মেনে নিল অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে, বলল, চলুন।

তারপর নরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, গাড়িটা বের করতে বলুন স্যর্। আমি ততক্ষণে ভেতরে রান্নার জায়গাটা দেখে আসি।

বাগানের মধ্যে, পিছনের দিকে মস্ত শামিয়ানা টাঙিয়ে রান্নার জায়গা হয়েছে। সেখানে গিয়ে শামিয়ানার নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অবিনাশ ব্যবস্থা সব ঠিক আছে কি না। উনুন সারি সারি পাঁচটা ঠিকই হয়েছে, ওপাশে কয়লা আর ঘুঁটে রাখা বাগানের মুরগির ঘরের মধ্যে। সব ঠিকই আছে। সে এগিয়ে গেল মুরগির ঘরটার দিকে। কেরোসিন তেল এনে রেখেছে কি? উনুন ধরাবার জন্যে লাগবে তো!

ঘরটার কাছে গিয়েই সে শুনতে পেল ওপাশে ঝাউগাছটার ওদিকে কারা কথা বলছে। একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী-কণ্ঠের গলা।

এত ভোরে গিয়ে করব কি? দরজা খোলা পাব?— পুরুষের কণ্ঠস্বর।

স্ত্রী-কণ্ঠে রাগত জবাব এল, যেতে যদি ইচ্ছে না হয় যেয়ো না। তুমি নিজে থেকেই যাব বলেছিলে বলে মনে করিয়ে দিলাম।

অসহায় কণ্ঠে পুরুষটি বলল, যাব তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আর একটু বেলা হোক, হলে যাব। তাই বলছিলাম।

তখন যাবে কিসে? এখন গাড়ি যাচ্ছে ওই দিকে মাছ কিনতে, ওই সঙ্গে চলে যাও। তোমার তো পথেই পড়বে। নেমে পড়বে সেখানে। আসবার সময় ট্যাক্সি করে চলে এস।

অবিনাশ দেখেশুনে যাবার জন্যে পা বাড়াল। নাঃ, কেরোসিন তেল রাখে নি। ওটার ব্যবস্থা করবার জন্যে বলে যেতে হবে।

এই সময়েই ঝাউগাছটার আড়াল থেকে মেয়েটি বেরিয়ে চলে গেল। তাকে দেখে মেয়েটি চলার বেগটাকে বাড়িয়ে দিল। পরমুহূর্তেই বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবিনাশ চিনতে পারল মেয়েটিকে। নরেনবাবুর বড় মেয়ে সুষমা। আসন্নপ্রসবা অবস্থা। কথাটা শুনেছে সে নরেনবাবুর কাছ থেকেই। সেই জন্যেই চিনতে পারল।

এই ভোরে ওর কি দরকার পড়ল! একটু হাসল অবিনাশ। তার ভেবে কাজ কি! সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাইরে এসে হাজির হল।

বরেনবাবু বললেন, আপনার গাড়ি রেডি অবিনাশবাবু। বাবাও দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর ছড়িটা এলেই হয়।

এই অবসরে অবিনাশ বলল, কেরোসিন তেল আধটিন আনিয়ে রাখতে বলেছিলাম। এনেছে কিনা জানি না। যদি এনে থাকে তা হলে টিনটা কয়লা ঘুঁটের কাছে রেখে দিতে বলবেন। আর না এনে থাকলে একটু আনিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবেন।

ঠিক আছে। আমি দেখে রাখছি।

এই সময়ে বেরিয়ে এলেন ওঁদের বৃদ্ধ পিতা দেবেনবাবু, কাঁধে চাদর হাতে লাঠি নিয়ে। মুখে পাকা গোঁফের নীচে মস্ত চুরুট জ্বলছে। তিনি বেরিয়ে এসেই বললেন, চলুন, আর দেরি নয়।

চলুন।

বলতে বলতে অবিনাশ দেবেনবাবুর সঙ্গে রাস্তায় গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অবিনাশ দরজাটা খুলে ধরল দেবেনবাবুর জন্যে। দেবেনবাবু ওঠার পর সে উঠতে যাবে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল একটি তরুণ বাড়ির ভিতর থেকে।

গাড়ির ভিতর থেকে দেবেনবাবু সেটা দেখেছিলেন। তিনি বললেন, কি ব্যাপার মণি? তুমি যাবে নাকি মাছ কিনতে আমাদের সঙ্গে?

অবিনাশও দেখেছিল। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

তরুণটি অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল, না, আমি রাস্তায় নেমে যাব।

অবিনাশ তরুণটিকে চিনল এবার। সুষমার স্বামী। সে তাকে ভিতরে দেবেনবাবুর পাশে বসতে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

দেবেনবাবু প্রশ্ন করলেন, এত সকালে যাবে কোথায়? সুষমার কোন বরাত আছে বুঝি?

নাতজামাই মণি কোন জবাব দিল না। তবে ড্রাইভারের সামনের আয়নায় ফুটে-ওটা তার মুখের ছবিতে একটু অপ্রতিভ হাসির ক্ষণিক প্রকাশ দেখতে পেল অবিনাশ।

দেবেনবাবু চুরুটের ছাই ঝেড়ে একটু হাসলেন। বললেন, মেয়েটা তোমাকে এই বয়সেই তো বড় জব্দ করেছে হে! এমন জব্দ তো আমরা ষাটের আগে হই নি!

ছেলেটির মুখে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল।

অবিনাশের মুখেও বোধ হয় একটু হাসি নিজের অগোচরেই ফুটে উঠেছিল। একটা জবাবও না চাইতেই এসে গিয়েছিল তার মনে। তার মনে হল মণিবাবু কেন বলতে পারল না, আপনার মত মানুষের নাতনীর হাতে পড়েছি বলেই তো এত তাড়াতাড়ি জব্দ হলাম!

কিন্তু সে কে? সে তো এখানে দর্শক মাত্র! তার বেশী তো কিছু নয়।

গাড়িটা ছুটে চলেছে।

অকস্মাৎ দেবেনবাবু বললেন ড্রাইভারকে, একটু দাঁড়াও তো হে, চুরুট কিনে আনি।

গাড়ি দাঁড়াতেই দেবেনবাবু নেমে গেলেন। অবিনাশ লক্ষ্য করল নামবার আগে পকেটে হাত পুরে বৃদ্ধ কি যেন ভাল করে দেখে নিলেন। অবিনাশ বুঝল পকেটের পার্সটা ঠিক আছে কি না দেখে নিলেন দেবেনবাবু। বুঝে অবিনাশ হাসল একটু। অত্যন্ত সতর্ক-বুদ্ধি মানুষ।

পিছনের সীটে ততক্ষণে মণিবাবু নড়েচড়ে বসেছেন ভাল করে। তিনি ড্রাইভারকে বললেন, আমাকে একটু অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে নামিয়ে দেবেন তো!

বলে যেন খানিকটা কৈফিয়তের স্বরেই তিনি বললেন, ওখানে রাস্তার ধারের ঠাকুরবাড়িতে যাব একবার।

বিস্ময় বোধ হল অবিনাশের। সেটা সে চাপতে না পেরে বলল, ঠাকুরবাড়িতে যাবেন?

লজ্জিত হাসি হেসে মণিবাবু বললেন, হ্যাঁ, একটু চরণামৃত আনব, আর কিছু সামান্য প্রণামী দেব—এই আর কি!—বলে আবার একটু হাসি।

অবিনাশের বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। এখানে শহরে লেখাপড়া-জানা উচ্চ কোটির উপার্জনক্ষম মানুষ এখনও সারাদিনের বহু জটিল কর্মচক্রের ভিতরে দিন যাপন

ও মন স্থাপন করার পরও পুরনো দিনের দেবতার মন্দিরে যায়? কিন্তু বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না বলেই সে আর কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

দেবেনবাবু চুরুটের বাক্সসমেত এসে আবার গাড়িতে উঠলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, দু আনা পয়সা বেশী নিলে। বলে দাম বেড়েছে। ফরেন গুডস, ডলার, স্টার্লিং সব শুনতে হল সকালবেলায়—আর তা শুনতে হল চুরুটওয়ালার কাছ থেকে।

এইবার মণিবাবু কথা বললেন। হাসতে হাসতে বললেন, আপনি তো আপনার অফিসে গিয়ে ব্যবসার লেন-দেনের সময় ওই কথাগুলোই শোনান দাদু অন্যদের।

অবিনাশ ভেবেছিল মণিবাবুর কথায় দেবেনবাবু চটে যাবেন। কিন্তু দেখল বৃদ্ধের রসবোধ আছে। বৃদ্ধ হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, এটা ঠিকই বলেছ তুমি।

এই সময় গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল, মণিবাবু নেমে গেলেন।

আগের হাসির জের টেনেই দেবেনবাবু বললেন, কোথায় চললে তুমিই জান! তোমার গুপ্ত সংবাদ জেনে আমার কাজ নেই। তবে তুমি শক্ত পাল্লায় পড়েছ দেখতে পাচ্ছি।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে মণিবাবু বলে গেলেন, তাতে তো আপনার দুঃখের কারণ নেই দাদু, খুশী হবারই তো কথা আপনার।

খুশী হয়েই তো বলছি হে! তুমিও তো খুশী মনেই করেছ এইটে দেখেই আমার আনন্দ। তুমি যদি মুখ-ভার করতে তাহলে মনে মনে দুঃখ পেতাম আর মুখে কৌতুক দেখাতাম।

পরমুহূর্তে অবিনাশকে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

দেবেনবাবুর পাশে এসে বসতে হল অবিনাশকে। দেবেনবাবু সহৃদয় সমাদর করে বললেন, বসুন, ভাল করে বসুন। আরাম করে বসুন। চল হে।

গাড়ি চলতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর দেবেনবাবু অকস্মাৎ বললেন, খাসা ছেলে। তুখড় ছোকরা! জীবনে উন্নতি করবে।

অবিনাশ বুঝল নাতজামাইয়ের সম্পর্কে মুগ্ধ বৃদ্ধ প্রশংসা করছেন।

আবার বললেন দেবেনবাবু, জানেন—

এবার বাধা দিল অবিনাশ। সবিনয়ে বলল, আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমাকে তো আপনার বাড়িতে এর আগে দেখেওছেন মাঝে মাঝে।

খুশী হয়ে হাসলেন দেবেনবাবু, বললেন, দেখেছি বইকি আপনাকে। তবে যে-কোন বয়স্ক অনাত্মীয় মানুষকে আমি সহজে 'তুমি' বলি না। বললে যেন অসম্মান করছি তার এমনি মনে হতে পারে।

বাধা দিল অবিনাশ, বলল, না না, সে কি কথা!

তার কথার উপরেই দেবেনবাবু বললেন, আচ্ছা, আপনি যখন নিজে 'কিন্তু' অনুভব করছেন তখন তুমিই বলব আপনাকে। তা বলব। মানুষ সম্মান করলে, নিজে থেকে সম্মান দিলে সে সম্মান না নেওয়াটাও একরকম ঔদ্ধত্য। তা তুমিই বলব তোমাকে।

দেবেনবাবুর একটা কথা বলার আবেগ এসে গিয়েছে। তিনি চুরুটে টান দিয়ে বললেন, অথচ মজা কি জান, যখন আমার বড় নাতনীর, মানে নরেনের মেয়ের বিয়ের কথা হয়, নরেন এ ছেলের সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে দেবে না। বলে, ঘরে কিছু নেই, ছেলে বড় চাকরিও করে না, কী ব্যবসা করে। আমিই সব বড় বড় চাকুরে পাত্র নাকচ করে দিয়ে বিয়ে দিলাম এই ছেলের সঙ্গে। বিয়েতে নগদ পয়সা একটিও দিই নি, নরেনকেও দিতে দিই নি। বিয়ের পর হাজার দশেক টাকা ওর ব্যবসার মূলধনে বাড়িয়ে দিয়ে বড় করে কারবার করে দিলাম। এখন ওই ছেলে মাসে হাজার টাকার ওপর রোজগার করছে। ব্যবসাটা দিন দিন ফেঁপে উঠছে।

একটু চুপ করে থেকে দেবেনবাবু চুরুটে গোটা দুয়েক টান দিয়ে বললেন, নরেন অবশ্য ওকে তিন চার শো টাকা মাইনের চাকরি করে দিতে পারত। কিন্তু কি হত তাতে?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বলল, সত্যিই তো! কি হত তাতে!

দেবেনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, সেই তো কথা। কিন্তু সে কথা নরেনকে বোঝাতে তখন আমাকে বেশ

বেগ পেতে হয়েছিল। এখন নরেন বোঝে সে কথা, বলে, বাবা ভালই করেছিলেন।

চুরুটে একটা লম্বা টান মেরে দেবেনবাবু বললেন, নরেনের কথা শুনে হাসি। আমি ভাল করব না, ভাল বুঝব না, বুঝবে নরেন? বড় অফিসে বড় চাকরি করে বলে ও ভাল বুঝবে আমার চেয়ে? জান, আমি কেরিয়ার আরম্ভ করেছি কেমন করে? বাগবাজারের খড়ঘাটে খড়ের ব্যবসা করে জীবন আরম্ভ করেছি।

অবিনাশ কান দিয়ে ওঁর কথা শুনছিল, চোখ নিবদ্ধ রেখেছিল দেবেনবাবুর মুখের উপর, কিন্তু তার মনটা পড়ে আছে মাছের বাজারে। সে তাঁর কথা শুনতে শুনতে এক-সময়ে বাইরে তাকিয়ে নিয়ে বলল সসঙ্কোচে, আমরা এসে গিয়েছি সার্।

সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে ফেললেন দেবেনবাবু। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, গাড়ি থামাও।

পরমুহূর্তেই দরজা খুলে রাস্তায় নেমে তিনি অবিনাশকে ডাকলেন, কই, এস।

বাজারে মাছের সুপ্রচুর আমদানি। এক জায়গায় বড় মাছের দিকে নজর পড়তেই অবিনাশ সোৎসাহে তাঁকে বলল, ওই দেখুন, চমৎকার বড় বড় রুই রয়েছে। ওই দিকে চলুন। দেখে তো মনে হচ্ছে মাছগুলো খুব ভাল আছে।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে মৃদু হেসে দেবেনবাবু বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। দাঁড়াও, তুমি বরং আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।

দেবেনবাবু সমস্ত বাজারটা ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে। দু-এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন এক-আধ মিনিটের জন্যে, এক-আধ জায়গায় আলতোভাবে মাছ ছুঁয়ে পরীক্ষাও করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এক জায়গায়। সেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট চেহারার মাছের ভিড়।

অবিনাশ একটু অবাক হল। সে বললেও কথাটা মুখ ফুটে, ওখানে ওই বড় রুই মাছগুলো দেখলেন না সার্।

দেবেনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, মাছগুলো নরম হবে! নরম না হলেও এগুলো ওর চেয়ে অনেক টাটকা। দেখ দরেও অনেক কম হবে। তোমার বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখে এস।

অবিনাশ অবশ্য পরীক্ষা করতে গেল না। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। তবু একটু অবাকও হল সে, ক্ষুণ্ণও হল হয়তো একটু। এ অভিজ্ঞতা তারও খুব কম নয়। বহু আত্মীয়-স্বজন, অফিসের বন্ধুবান্ধবের বাড়ির কাজেকর্মে সেই-ই সব করেছে, করে থাকে এক হাতে।

দেবেনবাবু তার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সেই ছোট আকারের মাছের দর করতে লাগলেন। একবার মাত্র অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত মাছ ধরা আছে ফর্দে? দু মণ নয়?

দু মণই। একবার মাত্র ছোট্ট দুটি কথা বলার সুযোগ পেল অবিনাশ। তারপর তাকে শুধু দ্রষ্টা হয়ে চুপ করে যেতে হল।

দেবেনবাবু দর করে মাছ কিনলেন প্রায় পৌনে তিন মণের কাছাকাছি। মাছ কিনে গাড়িতে তুলে চেপে অবিনাশকে সহাস্যে আহ্বান জানালেন, এস।

ভেটকি মাছ কিনবেন না ফ্রাইয়ের জন্যে?—গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ প্রশ্ন করল।

কিনব। ভুলি নি। তুমি এখন উঠে এস তো।

অবিনাশকে উঠতে হল। সে দেখতে পেল, পরিষ্কার বুঝতে পারল সে এখানে সঙ্গী এবং দ্রষ্টার বেশী কিছু নয়। একজন দর্শকের পক্ষে যথাসম্ভব নিরুৎসুক হওয়াই বোধ হয় সঙ্গত। সেই নিরুৎসুক মনটিকে মনে মনে আহ্বান করতে করতেই সে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়িতে উঠতেই তিনি হেসে বললেন, ভেটকি কিনলেই তো শুধু হবে না, কাটার লোক চাই। সে—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, নিজের অভিজ্ঞতার অহঙ্কারকে প্রকাশ করবার জন্যে সে বলল, সে তো এই বাজারেই পাওয়া যেত।

ভাল যেত না। তুমি এস তো আমার সঙ্গে। এখন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যাব।

চুপ করে গেল অবিনাশ।

দেবেনবাবুও আর কোন কথা বললেন না। গাড়ি সোজা এসে দাঁড়াল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের দরজায়। দেবেনবাবু বললেন, এস, নেমে এস, শিখে নাও দেখে।

শিখে নাও দেখে! গা জ্বলে গেল অবিনাশের। এতকাল পরে এত কাজ করে শেষে আবার মাছ কেনা, মাছ কোটার ব্যবস্থা করা আবার নতুন করে শিখতে হবে তাকে! কি করবে, সে নিরুপায়। তার উপরওয়ালার বাবা বলছেন, সহ্য করতেই হবে, উপায় নেই। অন্য কেউ হলে সে এখান থেকেই চলে যেত। চুপ করে গেল সে।

মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে সোৎসাহে ভেটকি মাছ কিনে এবং মাছ কাটবার লোক সংগ্রহ করে বিজয়ীর মত গাড়িতে উঠলেন দেবেনবাবু। অবিনাশকে ডাকলেন: উঠে এস হে অবিনাশ! ভুলি নি তোমাকে।

গাড়ি চলতে লাগল। দেবেনবাবু আরাম করে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, আমি জানি অবিনাশ, তুমি নিজে বহু কাজকর্মে বাজার করেছ, কর। মাছ কেনবার অভিজ্ঞতাও আছে তোমার যথেষ্ট। কিন্তু কথাটা কি জান, আমার মাছের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তার কাছে তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকু? কিছুই না। আমি আমার প্রথম জীবনে বছর দুয়েক মাছের ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছি। সে এক বিচিত্র ব্যবসা! যত টাকা খাটাব তাতে দৈনিক তত পয়সা লাভ। তার মানে মাসে ক্লিয়ার ফিফটি পার্সেণ্ট লাভ থাকত।

বলে হাসতে লাগলেন দেবেনবাবু। হাসতে হাসতে বললেন, অনেক করেছি হে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি, তবে না আজ এখানে পৌছেছি!

তাঁর হাসি গাড়িখানা ভরে তুলে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অবিনাশের মনে হল তাঁর জীবনের পরম প্রাপ্তির তৃপ্তিটুকু যেন আজ সশব্দে উথলে উঠছে। আর সেই তৃপ্তির অন্তরদেশে একটি 'আমি' নিজেকে সশব্দে প্রচারিত করে অপরূপ আনন্দ আস্বাদ করছে।

অকস্মাৎ দেবেনবাবু গাড়িখানা থামালেন। ড্রাইভারকে বললেন, একটু দাঁড়াও তো হে!

অবিনাশ তাকিয়ে দেখল এটা সেই রাস্তার মোড়, যেখানে মণিবাবু নেমে গিয়েছিলেন।

দেবেনবাবু বললেন, দেখ তো, মাণ দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

ভাল করে দেখে অবিনাশ বলল, না, নেই তো।

চল। ও চলে গিয়েছে তা হলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি বাড়ি পৌছে গেল।

বাড়ির চেহারাটা বদলে গিয়েছে। ভোরবেলা যে বাড়িকে অবিনাশ ফেলে গিয়েছিল এ যেন সে বাড়িই নয়! বাড়িটায় বিবাহের মহোৎসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সামনে প্যাণ্ডেল, প্যাণ্ডেলের মূল উচ্চ মঞ্চের মাথায় সানাই বাজছে। সানাইয়ের অপরূপ করুণ-মধুর সুর একটা অলৌকিক ঐশ্বর্যের মত সমস্ত পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে একটা বিচিত্র মহিমা দিয়েছে যেন।

গাড়ি থেকে নামতেই দেখা হয়ে গেল নরেনবাবুর সঙ্গে। তিনি যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বলে মনে হল অবিনাশের। সে জিজ্ঞাসা করল, এমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন সার্?

উৎকণ্ঠাকে অপ্রকাশ না রেখেই নরেনবাবু বললেন, এখনি পাত্রদের বাড়ি থেকে ফোন করেছিল গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে ওরা পৌছেছে কি না? অনেকক্ষণ বেরিয়েছে বললে, অথচ এখনও পৌছল না। কি ব্যাপার তাই ভাবছি!

দেবেনবাবু চটে উঠলেন: ভেবে তুমি কি করবে? বেরিয়েছে যখন তখন ঠিক এসে পৌছবে। তুমি না ভেবে ভেতরে এস তো।

নরেনবাবু মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, অনেকক্ষণ বেরিয়েছে বললে কি না!

ক্রোধের সঙ্গেই দেবেনবাবু বললেন, বললে তো কি হয়েছে? আর অতই যদি ভাবতে হয় তাহলে তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও, পথ থেকে ওদের ধরে নিয়ে এস।

নরেনবাবু চুপ করে গেলেন। তাঁকে তাঁর বৃদ্ধ পিতার পিছন পিছন সরেই আসতে হল শেষ পর্যন্ত।

অবিনাশ ততক্ষণে মাছগুলো নামাবার ব্যবস্থা করে ভিতরে চলেছে। তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। দেবেনবাবু ছেলেকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকছেন। বলতে বলতেই ঢুকছেন, এই সকালবেলা থেকে যদি কারণে অকারণে উৎকণ্ঠা ভোগ করতে আরম্ভ কর তবে রাত পর্যন্ত কাজ করবে কি করে? তার ওপর উপবাস করে থাকবে। যত সব কাণ্ড!

চোখ তুলতেই তাঁর নজরে পড়ল নাতনী সুষমা দাঁড়িয়ে। ভারী দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখেমুখে

ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তার উপর তার মুখেচোখে বোধ হয় উদ্বেগও লক্ষ্য করেছিলেন দেবেনবাবু। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুই এমন করে দাঁড়িয়ে কেন রে? কি হয়েছে?

না, কিছু হয় নি।—এইটুকু বলেই সুষমা বাড়ির ভিতর চলে যাচ্ছিল।

দেবেনবাবুই কি ভেবে ডাকলেন তাকে, এই সুষমা, শোন্?

সুষমাকে ফিরে আসতে হল। সে অনিচ্ছুক মুখ তুলে তাকাল তাঁর মুখের দিকে।

কি, দাঁড়িয়েছিলি কেন বাইরে এসে?

এমনিই!—ছোট্ট করে জবাব দিল সে।

এমনিই?—তার কথাটারই প্রতিধ্বনি করলেন দেবেনবাবু একটু তির্যক্ ভঙ্গিতে। অবিনাশের মনে হল যেন তিনি ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন।

তারপর ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, মণি ফিরেছে?

না।

কোথায় পাঠিয়েছিস তাকে ভোরবেলাতেই? তারই জন্যে দাঁড়িয়েছিলি?—বেশ ক্রুদ্ধভাবেই বললেন দেবেনবাবু। তারপর বিশেষ বিরক্তির সঙ্গে ঠোঁটে পিচ কেটে, ঘাড় নেড়ে বললেন, তোর হাতে পড়ে ছোকরার নাকালের একশেষ হল। সেই কোন্ ভোরে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পথে নেমে গেল। আমি দুটো বাজার ঘুরে, এত কাজ সেরে ফিরলাম আর তার ফেরবার নাম নেই!

তাঁর কথার ঝাঁজ না সহ্য করতে পেরেই বোধ হয় সুষমা দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল। তার চোখে তখন জল এসে গিয়েছে।

দেবেনবাবু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তিনি রূঢ়ভাবে বললেন, এই সুষমা, বলে যা কোথায় পাঠিয়েছিস তাকে?

ফিরতে হল সুষমাকে। সে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছে চরণামৃতের জন্যে।

চরণামৃত আনবার জন্যে! ভেঙিয়ে উঠলেন দেবেনবাবু: পুণ্যবতী আমার! পুণ্য করার শখ হয়েছে! তাই যদি মনে ছিল তো তাকে না পাঠিয়ে বাড়ির ছেলেটেলেদের কাউকে যেতে বল নি কেন?

সুষমা আর দাঁড়াল না, দাঁড়াতে পারল না। ছুটে পালিয়ে গেল কাঁদতে কাঁদতে।

দেবেনবাবু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তিনি রূঢ় পরুষ-কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, ড্রাইভার, ওহে ড্রাইভার! শোন। তুমি বিডন স্ট্রীটের ঠাকুরবাড়ি চেন তো? সেখানে যাও একবার। গিয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে এস।

বাধা দিলেন নরেনবাবু। মৃদুস্বরে বললেন, সেই কোন্ ভোরে গিয়েছে যখন তখন এখুনি এসে যাবে। গাড়ি পাঠাতে হবে না।

নাঃ, গাড়ি পাঠাতে হবে না! তুমি সব জান! যাও হে, গাড়ি নিয়ে যাও। আর মণি ফিরলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

পরমুহূর্তেই সমান তেজের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, মাছ সব গিয়েছে ভেতরে? চল হে অবিনাশ, মাছ দেখি।

বলে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিতরে চলে গেলেন।

অবিনাশ শুনতে পেল পিছন থেকে মৃদুস্বরে নরেনবাবু বলছেন, একটু আগে আমাকে ব্যস্ত হতে বারণ করেছিলেন। এখন নিজেই চঞ্চল হয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে অন্য লোককে দুর্ভাবনা করতে বারণ করবেন অথচ নিজে দুর্ভাবনা করবেন অন্যের চতুর্গুণ। কিন্তু কথাটা বলে কে?

রান্নাশালায় এসে একটা চেয়ারে আরাম করে বসলেন দেবেনবাবু। পাশের চেয়ারটা অবিনাশকে দেখিয়ে বললেন, বস হে অবিনাশ। এইবার সুস্থির হয়ে বস।

বসল অবিনাশ চেয়ারে। দেবেনবাবু আরাম করে চুরুট ধরাবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। চুরুটটা ধরাতে ধরাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অবিনাশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, কি হল! উঠলেন কেন?

আরে, এক দণ্ড কি সুস্থির হয়ে বসবার উপায় আছে? এই তো বাইরে যেতে হবে। শুনতে পাচ্ছ না, বাইরে শাঁখ বাজছে, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এসে গেল। দেখি একবার! কি এল, কতজন লোক এল, কত টাকা বকশিশ দিতে হবে—

বলতে বলতে অস্থির হয়ে বেরিয়ে গেলেন দেবেনবাবু।

একটু হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল অবিনাশ। এক টান টেনে, ধোঁয়া ছেড়ে আবার হাসল সে। দেবেনবাবু প্রবীণ গম্ভীর মানুষ হলে কি হবে, একটা দুরন্ত অস্থিরতা ওঁর মনের মধ্যেই বাসা বেঁধে রয়েছে। সেটা স্থায়ীও হতে পারে, আবার এই বিয়ে উপলক্ষ্যে সাময়িকও হতে পারে, অবিনাশ সঠিক বলতে পারে না, জানে না সে। তবে এটা ঠিক, সেই অস্থিরতার তাড়নায় উনি অমন করে ছুটে ফিরছেন।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় সেটা তাকে ফেলে দিতে হল হস্তদন্ত হয়ে। নরেনবাবু এসে পড়েছেন। হাসিমুখে তার কাছে এসে বসলেন। বললেন, এ তো আর অফিস নয়, ওটা ফেলে দিলে কেন?

কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসল অবিনাশ।

নরেনবাবু বললেন, এখানে সিগারেট ফেলো না, ফেলার দরকার নাই, উচিতও নয়।

অবিনাশ হেসে বলল, তা আপনি কেন এখানে এলেন স্যার্? আসার তো কিছু দরকার ছিল না।

হেসে নরেনবাবু বললেন, আরে, এলাম কি আর সাধে? বাবার তাড়ায় আসতে হল। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এসেছে আর উনি গিয়ে পড়লেন সেখানে। আমাকে হুকুম হল, তুমি রান্নাশালায় যাও।

অবিনাশও একটু হাসল মাত্র। একটু আলতো, ভদ্রতার হাসি। তার চারপাশে যত আবেগ, যত ক্রোধ, যত মমতা, যত উৎকণ্ঠার স্রোত চলেছে সে তার দর্শক মাত্র। তাই সে এর চেয়ে জোরে হাসবে কি করে!

নরেনবাবু বললেন, যা দেখছি তাতে বাবা আজ বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বেন না।

কেন স্যার্?—প্রশ্ন করল অবিনাশ।

আরে, বাবার যে 'হাই ব্লাডপ্রেসার' আছে। ওঁর এই বয়সে এমন ধরনের ছুটোছুটি আর রাগারাগি করা কি উচিত হচ্ছে?

তা বটে। তা ওঁকে কোনরকমে এদিকে পাঠিয়ে দিন না কেন?

হাসলেন নরেনবাবু। বললেন, সে সাধ্যি আমার নেই। উনি তো আজও আমাকে খোকা বলে মনে করেন। আমার কথা কি আর কানে তুলবেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই হস্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন দেবেনবাবু। সঙ্গে নাতজামাই মণীন্দ্র। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তিনি আসছেন: তোমার যদি এই মনে ছিল বাপু তবে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি আবার তোমার ওখানে যেতে বলে দিলে না কেন?

অপ্রস্তুত হয়ে মণি কৈফিয়ত দিয়ে চলেছে তখন। বলছে, কি করব, এ রকম ভেবে তো যাই নি।

তবে কি ভেবে গিয়েছিলে?—মাঝখান থেকে কথা কেটে দিলেন দেবেনবাবু।

মণি বলল, পুজো হল, তবে তো চরণামৃত পেলাম।

চা তো খাওয়া হয় নি। যাও, এখন পুণ্য বস্তুটি তার হাতে দিয়ে এস। এসে চা খাও। আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

মণি চলে গেল।

দেবেনবাবু বললেন, এক কাজ কর তো অবিনাশ। দিনে খাবার জন্যে কিছু মাছ বাড়ির ভেতর হেঁশেলে পাঠিয়ে দাও। দুপুরে খাব আমরা।

অবিনাশ বলল, কথাটা আমার খেয়াল ছিল না। এখুনি ব্যবস্থা করছি।

অকস্মাৎ ছেলের দিকে ফিরে দেবেনবাবু বললেন, ওদের একশো টাকাই দিলাম হে নরেন!

বিস্মিত হয়ে নরেনবাবু বললেন, কাদের দিলেন বাবা?

বিরক্ত হয়ে দেবেনবাবু বললেন, আঃ, তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে হে! কাদের দিলাম? যারা গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল, তাদের।

নরেনবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, ও, আচ্ছা। ভালই করেছেন।

হাসতে হাসতে দেবেনবাবু বললেন, তোমার বেয়াইয়ের বেশ-কিছু টাকা খরচ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিলাম বাবা। ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে গেলে ওটাই তো খরচ করতে হবে।

বলে আবার সেই হাসি।

অবিনাশ একটি সংসারী মানুষের অহঙ্কৃত মত্ততাকে একবার এক ঝলক প্রত্যক্ষ করল সেই হাসির মধ্য দিয়ে।

হাসতে হাসতে দেবেনবাবু আবার চলে গেলেন সেখান থেকে।

আবার দেখা হল তাঁর সঙ্গে দুপুরে খাবার সময়।

এ সময়টা বোধ হয় তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অবিনাশ ছিল রান্নার জায়গায়। রান্নাশালায় তখন পুরোপুরি ব্যস্ততা, প্রচণ্ড বেগে কাজ চলেছে। সমস্ত মনোযোগটা ব্যাপৃত করতে হয়েছিল অবিনাশকে। তবু তারই মধ্যে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর একবার পেয়েছিল। বোধ হয় দোতলা থেকে। একতলায় সমস্ত বাড়িটায় তখন হাসি আর হৈ-হৈ চলেছে। কন্যাকে গায়ে-হলুদ দিয়ে রঙখেলা চলছে তখন। ছুটোছুটি, দাপাদাপি, চিৎকার, হাসি, সমবেত কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে তখন সমস্ত বাড়িটা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। সেই সময় একবার বৃদ্ধ চিৎকার করে বলেছিলেন, বড় বউমা, সুষমা যেন দাপাদাপি না করে দেখ একটু। ওকে বরং এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখ।

আর তাঁর অস্তিত্বের সংবাদ পায় নি অবিনাশ। চোখের সামনে অত উল্লসিত আনন্দ পার হয়ে গেল, সে খানিকটা দেখল শুনল নিরাসক্ত রসিকের মত। দূর থেকেই বেশ লাগল তার। তার বেশী আর কি!

দুপুর তখন দুটো হবে। ওকে নরেনবাবুই ডাকতে এলেন, বললেন, ওহে অবিনাশ, খাবার জায়গা হয়েছে, খাবে এস।

নরেনবাবুর সঙ্গে খাবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই আসন থেকে দেবেনবাবু ডাকলেন, এস হে অবিনাশবাবু, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

নরেনবাবু বললেন, আজ আপনার খেতে দেরি হয়ে গেল বাবা। আপনি একটায় খান, আজ দুটো বেজে গেল।

কি আর করা যাবে? কাজের বাড়ি। বউমা, তুমি রাত্রে আমার খাবারটা বরং আমার ঘরে রেখে দিও। আমি ঠিক সময় খেয়ে নেব।

বললেন পুত্রবধূকে, তিনি পাশেই বসেছিলেন। বোধ হয় খাবার তদারক করতে।

পাশাপাশি তিনখানা আসন। দেবেনবাবু, মণিবাবু আর সে। সে খাবারের পরিমাণ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। ভাত যাই হোক, এক-একটা বাটিতে যে পরিমাণ মাছ দেওয়া হয়েছে সেটা দেখে সে ভয় পেয়ে গেল রীতিমত। সে বলল, আমার বাটি থেকে মাছ তুলে নিন। দু-এক পিস রেখে সবটাই তুলে নিন।

মণিবাবুও তার কথার প্রতিধ্বনি করলেন শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

দেবেনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন: না না, একখানা মাছও তুলবে না বউমা। আমি দু মণের জায়গায় পৌনে তিন মণ মাছ আনলাম, সে কি সব খাওয়াবার জন্যে? নিজেও তো খাব বাপু খানিকটা! আর ওই সামান্য মাছ খেতে পারবে না এ কেমন কথা? খাও, এখন তো খাবার বয়েস তোমাদের।

তা সত্ত্বেও অবিনাশ সবিনয়ে প্রতিবাদ করল। হেসেই বলল, এত খেতে পারব না। খেলে ঘুমোতে ইচ্ছে করবে, আর কাজ করতে পারব না।

দেবেনবাবু রাগ করে বললেন, প্রোটিন খেলে ঘুম আসে না হে! প্রোটিন বরং বেশী কাজ করবার শক্তি দেয়। তা ওরা যখন খাবে না তখন ওদের বাটি থেকে মাছ তুলেই নাও বউমা। তবে আমার বাটিতে যেন হাত দিও না মা।

শেষের কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠল হা হা করে। অবিনাশও হাসল। সেই সঙ্গে এই মানুষটির খাবার শক্তি ও ইচ্ছা দুটোই খানিকটা আন্দাজ করল সে।

খেতে খেতে দেবেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন পুত্রবধূকে, সুষমা খেয়েছে মা?

পুত্রবধূ ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ, খেয়েছে।

দেবেনবাবু বললেন, ওকে একবার ডাক তো মা আমার কাছে।

পুত্রবধূ কিছুক্ষণের মধ্যেই সুষমাকে ডেকে নিয়ে এলেন। অবিনাশ দেখল সুষমা মুখ নীচু করে ঘরে এসে ঢুকল। সেটা নিজের ভারি দেহের লজ্জায় না পিতামহের প্রতি অভিমানে সেটা ঠিক বুঝতে পারল না অবিনাশ।

সে ঘরে ঢুকতেই দেবেনবাবু প্রশ্ন করলেন, খেয়েছিস?

সুষমা শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল, হু।

কি করছিলি?

এইবার মুখ খুলতে হল সুষমাকে, বলল, শুয়েছিলাম।

একটু হাসলেন দেবেনবাবু, হেসে প্রশ্ন করলেন, মা মাছের মুড়ো দিয়েছিল?

এইবার একটু হাসল সুষমা, বলল, না।

দেবেনবাবু দৃষ্টিতে তিরস্কার মিশিয়ে পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকে মাছের মুড়ো দাও নি মা? তবে আমি এত মাছ কার জন্যে আনলাম? দাও, ওকে মাছের মুড়ো দাও।

বলতে বলতে জলের গ্লাস ঢাকা-দেওয়া ডিসটা নামিয়ে নিজের বাটি থেকে একটা মাছের মুড়ো তুলে সুষমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খা।

সুষমা ডিশটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এইখানে আমার সামনে বসে খা। লজ্জা করতে হবে না।

পুত্রবধূ ততক্ষণে আর একটি মাছের মুড়ো এনে শ্বশুরের বাটিতে রেখে দিলেন।

মুড়োটা থালায় নিয়ে আঙুলের চাপ দিয়ে ভেঙে ফেললেন দেবেনবাবু। অকস্মাৎ মুখ তুলতেই তাঁর নজর পড়ল বড় ছেলের দিকে। তাঁকে দেখেই বললেন, তুমি তো উপোস করে আছ, একটু শুয়ে বিশ্রাম কর না গিয়ে। যাও।

নরেনবাবু মুখে হাসি নিয়েই এই আনন্দিত পরিবেশ থেকে যেন অনিচ্ছুকভাবে সরে গেলেন।

দেবেনবাবু একটু জোরেই যেন ছেলেকে বললেন, একটু খুকীকে পাঠিয়ে দিও তো নরেন, বলো আমি ডাকছি।

একটু পরেই লাল রঙের নতুন মূল্যবান শাড়ি-পরা একটি মেয়ে দরজার দুই বাজুতে দু হাত দিয়ে এসে দাঁড়াল ছবির মত। অন্ততঃ অবিনাশের তাই মনে হল। উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি পরনে, হাতে একহাত নতুন গয়না, চোখে কাজলের ছোঁওয়া, মাথার পিছন দিক থেকে খোঁপার উপর রূপোর কাজললতা উঁকি মারছে। মুখে পৃথিবীর বাইরের কোন এক লোকের আশ্চর্য স্বপ্ন আর সুষমা সব এসে আশ্রয় নিয়েছে সুকুমার মুখখানিতে। বিবাহের কন্যার চিরাচরিত অথচ আশ্চর্য রূপ! দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল অবিনাশের।

মেয়েটি ঈষৎ লজ্জিত হাসি হেসে বলল, আমাকে ডাকছিলে দাদু?

মুড়ো চিবতে চিবতেই দেবেনবাবু বললেন, হুঁ। আয়। এখানে সুষির পাশে বস্।

মেয়েটি সঙ্কুচিত, ধীর পায়ে এসে বসল বড় বোনের পাশে।

মাছের কাঁটাটা চুষে পাশে ফেলতে ফেলতে সহাস্যমুখে দেবেনবাবু বললেন, কি রে, এরই মধ্যে অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন? না কি লজ্জার রিহার্সাল দিচ্ছিস?

খুকী লজ্জিত হাসি হেসে মুখ নামাল।

দেবেনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন, গয়নাগুলো সব পছন্দ হয়েছে তো?

হেসে ঘাড় নেড়ে খুকী জানাল, হয়েছে।

এতক্ষণে পুত্রবধূ কথা বললেন। মাথার ঘোমটা একটু সরিয়ে গলা খাটো করে বললেন, আপনি যত খুশী সোনা চাপালেন, ভাল হবে না?

দেবেনবাবুর খাওয়া তখন শেষ হয়েছে। মাছের মুড়োর শেষ কাঁটা চুষে ফেলে দিয়ে, পাতাটা একবার চেটে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, মা, ও তো তোমার মেয়েরই রইল।

বলতে বলতে জলের গ্লাসে চুমুক দিলেন দেবেনবাবু।

এই সময় একটি ছেলে এসে বলল, সাহেব এসেছেন।

গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে দেবেনবাবু বললেন, কে? প্যারেজা সাহেব?

ঘাড় নাড়ল ছেলেটি।

বসিয়েছিস?

হ্যাঁ। সাহেব প্যাণ্ডেল দেখছে।

অবিনাশ চমকে উঠল। প্যারেজা সাহেব! মানে তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর! প্যারেজা সাহেব অবশ্যই এখানে নরেনবাবুর বাড়িতে আসতে পারেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর অফিসের একজন বড় অফিসারের কন্যার বিবাহে অবশ্যই আসতে পারেন। কিন্তু দেবেনবাবুর সঙ্গে এত পরিচয় কিসের প্যারেজা সাহেবের? তা হলে নরেনবাবুর শক্তির মূল উৎস কি তাঁর বাবাই!

সেইটা দেখবার কৌতূহলী অভিপ্রায় নিয়েই উঠল অবিনাশ। একবার ব্যাপারটা আড়াল থেকে দেখবে সে।

পান চিবতে চিবতে সে যখন ড্রইংরুমের জানলার আড়ালে দাঁড়াল তখন ঘরের মধ্যে যুগল কণ্ঠের মিলিত

হাস্যোচ্ছ্বাস উঠছে। হাসছেন প্যারেজা সাহেব আর দেবেনবাবু। জানলার আড়াল থেকে সে দেখল অট্টহাস্য করতে করতে দেবেনবাবু হাস্যরত প্যারেজা সাহেবকে ডান হাত দিয়ে বয়স্যোচিত ধাক্কা দিচ্ছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারল অবিনাশ। তাহলে আসল আলাপটা প্যারেজা সাহেবের দেবেনবাবুর সঙ্গেই। নরেনবাবু তাহলে আসলে সূর্য নন। সূর্য তা হলে দেবেনবাবুই। সেই সূর্যের আলো ধার করেই নরেনবাবু চাঁদের আলোর মত শোভা পান!

ওই তো নরেনবাবু একপাশে ভাল ছেলের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

আশ্চর্য, নরেনবাবু তাঁকে এত কথা বলেছেন, নিজের পরিবারের খুঁটিনাটি কথা পর্যন্ত বলেছেন, কিন্তু দেবেনবাবুর সঙ্গে প্যারেজা সাহেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাটা কোনদিন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি!

অবিনাশ দেখল একপাশে নরেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কাছেই দেবেনবাবুর চেয়ারের পাশে বিবাহের কন্যা দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে বসে আছেন প্যারেজা সাহেব। তাঁদের সামনের টেবিলে একটা ভেলভেট কেসের মধ্যে একটা নানান রঙের পাথর-বসানো সোনার হার ঝলমল করছে।

উপহার নিশ্চয়ই। প্যারেজা সাহেব কন্যাকে উপহার দিচ্ছেন।

পরিচয়ের গাঢ়তাটা সে পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল।

সে জানে প্যারেজা সাহেব বাংলা জানেন। দেবেনবাবু লজ্জাবনতমুখী পৌত্রীকে বললেন, দেখ্‌ খুকী, এখনও দেখ্‌, নেকলেসটা তোর পছন্দ হয়েছে তো? যদি না হয়ে থাকে এখনও বল্‌, প্যারেজা সাহেব বদলে আনবেন।

খুকী বলল—হেসেই বলল, খুব ভাল নেকলেস হয়েছে। বদলাতে হবে কেন?

দেবেনবাবু বললেন, বাস্‌, তাহলে আর কথা নেই। কিন্তু আপনি এখন এলেন কেন? খাবেন না কিছু?

আজ রাত্রে বোম্বে যাচ্ছি। কাজেই দুপুরে না এসে করি কি?—ইংরেজীতে বললেন প্যারেজা সাহেব।

এই সময় সন্তর্পিত পায়ে সেখান থেকে সরে গেল অবিনাশ। সামান্য কর্মচারী সে, তার এখানে থাকা আর উচিত নয়। তা ছাড়া তার প্রচুর কাজ রয়েছে রান্নাশালায়।

সন্ধ্যার মুখে গোটা বাড়িটার চেহারাটা বদলে গেল অবিনাশের চোখের সামনেই।

আগেও সে এঁদের বাড়িতে এসেছে। আজ সকাল থেকে বাড়িটাকে কেমন অন্ধকার অন্ধকার আর বুক-চাপা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্যাণ্ডেলটার জন্যে। সেই প্যাণ্ডেলের জন্যেই বাড়ির চেহারাটা বদলে গেল।

রাশি রাশি অপর্যাপ্ত আলোয় আলোয়, অজস্র গাড়ির আর অজস্রতর সুবেশ নর-নারীর সমাগমে, হাসিতে ঐশ্বর্যে সমস্ত বাড়িটা ঝলমল করতে লাগল। এরই মধ্যে অনেক শাঁখ বাজল, বহুতর নারীকণ্ঠে হুলুধ্বনি উঠল। তারই মধ্যে বিশিষ্ট বর এসে বৃত হয়ে বসল প্যাণ্ডেলের সিংহাসনে তার বিবাহের পিঁড়িতে।

বাড়ির ভিতর একতলার বড় হলঘরে বিবাহ-মণ্ডপ সজ্জিত হয়েছে। বিবাহ-মণ্ডপ ঘিরে চারপাশে জীবন-যাত্রার বহুবিধ মূল্যবান উপকরণ থরে-থরে সজ্জিত। আলোয় ঝলমল করছে সব। তারই মধ্যে বর-কন্যা বসেছে সামনাসামনি, নরেনবাবু গরদের কাপড়-চাদরে সজ্জিত হয়ে কন্যা-সম্প্রদান করছেন। দেবেনবাবু বসে আছেন একপাশে।

অবিনাশ কাজের মধ্যে মধ্যে দ্রুত চঞ্চল পায়ে যেতে আসতে এক একবার এক ঝলক করে দেখে গেল। দেখার সময় কোথায় তার! এখন অতিথি ও বরযাত্রীরা খেতে বসেছেন। সেই খাওয়ার তদারক করতে ছুটোছুটি করছে সে।

একসময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘটনা তার চোখে পড়ল।

দু ব্যাচ খাওয়া হয়ে গেল। কন্যা-সম্প্রদানও হয়ে গিয়েছে, বর-কন্যা উপরতলায় উঠে গিয়েছে বাসর-ঘরে। খানিকটা অবসর পেয়ে সে রান্নাশালার একটা গোপন কোণে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। কাছেই কারা চাপা গলায় কথা বলছে। একজন স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষ।

সে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখল অন্ধকারের মধ্যে। সে চমকে উঠল। কথা বলছে দেবেনবাবু আর নরেনবাবুর স্ত্রী।

চাপা গলায় দেবেনবাবু বলছেন, সে কি কথা! কোন্ হারের কথা বলছ? প্যারেজা দুপুরে যে নেকলেসটা দিয়ে গেল?

চাপা গলায় নরেনবাবুর স্ত্রী বললেন, সেইটাই।

রেখেছিলে কোথায়?

আমার ট্রাঙ্কে। এখন পরাতে গিয়ে দেখি বাক্সটা পড়ে আছে, হারটা নেই। আমার মনে হয় বাবা—

দেবেনবাবু প্রায় ধমক দিলেন চাপা গলায়, এখন ওসব কিছু করতে যেও না। চুপ করে থাক। বিয়েটা, আজকের রাত্রিটা পার হয়ে যাক নির্বিঘ্নে। তারপর কাল সকালে যা হয় হবে। এখন যাও, যে কটা বাকি আছে সে কটা যাতে খোয়া না যায় দেখ। এ সম্পর্কে মুখ ফুটে একটা কথাও বলো না। আর ব্যাপারটাও জানিও না কাউকে। যাও।

অবিনাশ বুঝল প্যারেজা সাহেবের দেওয়া হারটা চুরি গিয়েছে। সংবাদটা পেয়ে অতি বিচক্ষণ গৃহকর্তার যা করা উচিত তাই করলেন দেবেনবাবু।

দেবেনবাবু অকস্মাৎ ডাকতে লাগলেন, অবিনাশ, অবিনাশ আছ নাকি?

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল অবিনাশ: ডাকছেন?

হেসে দেবেনবাবু বললেন, তোমার খাওয়াদাওয়া সব চুকে গেল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই লাস্ট ব্যাচ বসবে।

হেসে চুরুট ধরালেন দেবেনবাবু। বেশ নিরিবিলি। অবিনাশ আশ্চর্য হল দেখে যেন কিছুই ঘটে নি এমন সহজ ভাবে হাসছেন দেবেনবাবু।

নিজের উপহারটার কথা মনে পড়ল অবিনাশের। সে পকেট থেকে ছোট্ট একটি বাক্স বের করে সসংকোচে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, এই একটু সামান্য উপহার, একজোড়া দুল এনেছিলাম খুকীর জন্যে। এইটুকু দয়া করে ওকে দিয়ে দেবেন।

বাক্সটা খুলে দেখলেন দেবেনবাবু। অত্যন্ত যত্ন করেই দেখলেন। দেখে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, বাঃ, খাসা জিনিস! তা তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এস।

হাত জোড় করে অবিনাশ বলল, না স্যর্, আমি আর যাব না। কাপড়-চোপড় নোংরা হয়ে আছে। আপনিই দিয়ে দেবেন দয়া করে।

বাক্সটা হাতে নিয়ে চুরুট টানতে টানতে হাসিমুখেই চলে গেলেন দেবেনবাবু।

অবিনাশ মনে মনে বৃদ্ধের ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারল না।

কয়েকটা মুহূর্ত।

নরেনবাবু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন। বিব্রত মুখে প্রশ্ন করলেন, অবিনাশ, বাবা কোথায়?

তিনি তো একটু আগে উঠে গেলেন এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন নরেনবাবু। যেতে যেতে ফিরে ডাকলেন, তুমিও এস তো অবিনাশ।

অবিনাশ ছুটল বিভ্রান্ত হয়ে। কি হল!

বিভ্রান্ত হবারই কথা। আসন্ন-প্রসবা সুষমার প্রসব-যন্ত্রণা উঠেছে।

নরেনবাবু, দেবেনবাবু, মণিবাবু, বরেনবাবু সকলে বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নরেনবাবুর স্ত্রীর মাথার ঘোমটা সরে গিয়েছে। সকলেরই মুখ বিবর্ণ।

অবিনাশ গিয়ে দাঁড়াতেই নরেনবাবু সংবাদটা তাকে শুনিয়ে বললেন, ওই হলঘরে, মানে যে ঘরে বিয়ে হল, সেই ঘরের কোণে টেবিলে ফোন আর ফোন-গাইড আছে, তুমি একবার মেট্রোপোল নার্সিংহোমের ফোননম্বর দেখে ফোন কর তো।

যাই।—বলে পা বাড়িয়েই সে প্রশ্ন করল, তা এত চিন্তা করছেন কেন স্যর্?

ওহে, ওর এমনি ডেলিভারি তো হবে না। ওর সিজারিয়েন করতে হবে। অপারেশন না করে উপায় নেই। এই অবস্থায় এখনও সব খাওয়া শেষ হয় নি।

বরেনবাবু বললেন, তার জন্যে এত ভাবছ কেন? বউদি, মণি আর সুষমাকে নিয়ে আমি নার্সিংহোমে যাচ্ছি। দাদা আর বাবা থাকুন এখানে। অবিনাশবাবু খাওয়া-দাওয়াটা দেখাশোনা করে চুকিয়ে দেবেন। বাবা, আপনি

বরং ব্যস্ত না হয়ে খাবার জায়গায় যেমন ছিলেন তেমনি থাকুন। কাজও হবে, অন্যমনস্ক হয়েও থাকবেন। সেই ভাল হবে।

ফোনে কানেকশন পাওয়া গিয়েছে। নরেনবাবুকে ডাকল অবিনাশ। নরেনবাবু গিয়ে ফোন ধরলেন।

ডাক্তারবাবু, মানে ডাক্তার ঘোষ আছেন তো? সিট খালি আছে তো? আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি আমরা এখুনি। পনরো মিনিটের মধ্যে গিয়ে পৌছচ্ছি।—ফোন নামিয়ে রাখলেন নরেনবাবু।

টাকা সব ঠিক করা আছে?—উদ্বিগ্ন মুখখানা কুঁচকে দেবেনবাবু বললেন।

সেই খামে মুড়ে যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রাখা আছে।—পুত্রবধূ বললেন।

তবে আর দেরি করছ কেন অনর্থক। চলে যাও।—ব্যস্ত হয়ে তাড়া লাগালেন বৃদ্ধ।

আমি দেখছি সার্।—বলে ছুটে গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গেল অবিনাশ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সব জিনিসপত্র নরেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে রওনা করিয়ে দিল গাড়িখানাকে।

নরেনবাবু আর দেবেনবাবু প্যাণ্ডেলের দরজায় গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন আসল ভিড় অনেকটা কমে গিয়েছে। তবু কিছু মানুষ, কিছু গাড়ি তখন পর্যন্তও দাঁড়িয়ে। তাঁরা এই বিচিত্র আকস্মিকতায় সকলেই অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

গাড়িটা যখন ছাড়ছে তখন দেবেনবাবু চিৎকার করে বললেন, পৌঁছেই একটা ফোন করে দিও আমাকে।

গাড়ি থেকে মুখ বের করে নরেনবাবু বললেন, আচ্ছা। আপনি এখন ভেতরে যান। সব দেখুন গিয়ে।

গাড়িখানা চলে গেল।

দেবেনবাবুকে ঘিরে ধরল সকলে আশপাশ থেকে।

কি ব্যাপার?

কখন বেদনা উঠল?

প্রথম সন্তান? সিজারিয়েন করতে হবে?

নরেনবাবু অবিনাশকে ইঙ্গিত করতেই সে চলে গেল খাবার প্যাণ্ডেলে তদারক করতে। তার মনে হল একবার বিচলিত বৃদ্ধকে সে যদি কোমক্রমে নিয়ে যেতে পারত খাবার জায়গায় তদারক করবার অছিলায়, তাহলে সেটা ভাল হত ওঁর পক্ষে।

কিন্তু এমনিই যোগাযোগ যে রান্নাশালায় যাবার পথে টেলিফোনটা সেই-ই ধরল। নার্সিংহোম থেকে ফোন। সুষমাকে অপারেশনের জন্যে নিয়ে গিয়েছে। ভাবনার কিছু নেই।

খাবার শেষ ব্যাচ তখন উঠে গিয়েছে। কাজেই অবিনাশের তখন আর হাতে কাজ নেই। সে খুঁজতে লাগল বৃদ্ধকে। নীচে কোথাও তাঁকে খুঁজে পেল না, প্যাণ্ডেলেও নেই কোথাও। সে উপরে উঠে গেল। বাসরঘরে হাসির হর্‌রা উঠছে। ও একটা স্বতন্ত্র জগৎ যেন!

অবশেষে বৃদ্ধকে খুঁজে বের করল সে চুরুটের আলো দেখে। অন্ধকার বারান্দায় আলো নিভিয়ে চুরুট টেনে উদ্বেগটা পরিপাক করছেন তিনি।

অবিনাশ তাঁকে সংবাদটা দিতেই তিনি বললেন, এখনও অপারেশন হয় নি? এরা করছিল কি এতক্ষণ?

হবে এইবার।—সান্ত্বনা দিল অবিনাশ।

আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াও তো অবিনাশ।

অবিনাশ খুঁজেপেতে যখন জল আনল তখন সমানে পায়চারি করে চলেছেন দেবেনবাবু।

জলের গেলাসটা হাতে দিয়ে অবিনাশ বলল, আপনি অত চঞ্চল হবেন না সার্!

জলটা খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে দেবেনবাবু বললেন, ভাবনা যাক বললেই কি যায়! তবে আমি ভাবছি না বিশেষ কিছু। আচ্ছা, তুমি নীচে যাও। হাতমুখ ধোও গিয়ে।

আপনি যাবেন না?

যাচ্ছি, চল। কটা বাজল? সব চুকল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কেবল বাড়ির লোক বাকি। রাতও বেশী হয় নি। সাড়ে দশটা বেজেছে।

বলে সে নীচে নেমে গেল।

আধঘণ্টা পর একবার নার্সিংহোমে ফোন করবে তো?

নামতে নামতেই সে বলে গেল পিছন ফিরে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিছন ফিরে সে দেখতে পেল বারান্দার অন্ধকারে

অন্ধকারের ক্রুদ্ধ চক্ষুর মত চুরুটের আগুনটা দপদপ করছে।

কিন্তু কতক্ষণ পর? আধঘণ্টাও হয় নি তখনও। মানে এগারোটা বাজে নি।

উদ্বৃত্ত খাদ্য হুকুম দিয়ে সাজিয়ে রাখছে অবিনাশ, এমন সময় একজন চাকর এল ছুটতে ছুটতে, বড়বাবু ডাকছেন আপনাকে। প্যাণ্ডেলে আসুন এক্ষুনি!

বড়বাবু! মানে বুড়ো বাবু?

চাকরটা চোখ বড় বড় করে এক মুহূর্ত তাকাল তার মুখের দিকে, তারপর শুধু বলল, বুড়োবাবুর ছেলে বড়-বাবু। বুড়োবাবু মারা গিয়েছেন।

প্যাণ্ডেলে গিয়ে অবিনাশ দেখল অপর্যাপ্ত আলোর মাঝখানে সন্ধ্যায় যে সজ্জিত বরাসনে বর বসেছিল চারপাশে ভেলভেটের তাকিয়ার মাঝখানে, সেই আসনে দেবেনবাবু শয়ান রয়েছেন। চোখ দুটি মুদ্রিত। দেখলে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। চারপাশে লোকের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে একজন, হয়তো তিনি ডাক্তারই হবেন, শায়িত মানুষটির মণিবন্ধ ধরে রয়েছেন নাড়ী দেখবার জন্যে। তাঁর মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল অবিনাশ। মুখখানা পাথরের মুখের মত, ভাবলেশহীন। নরেনবাবু বিবর্ণ, কাঁদো-কাঁদো মুখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অবিনাশের দেখে মনে হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অগোচরেই মৃদু মৃদু কাঁপছেন নরেনবাবু। সে আস্তে আস্তে নরেনবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর একখানা হাত প্রায় বাহুমূলে চেপে ধরল।

যে ভদ্রলোক মণিবন্ধে নাড়ী দেখছিলেন তিনি নামিয়ে দিলেন হাতখানি। হাতখানিকেও যেন শুইয়ে দিলেন।

নরেনবাবু আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন একবার, বাবা—বাবা নেই তাহলে? বাবা!

অবিনাশ তাঁকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। না হলে তিনি হয়তো পড়ে যেতেন।

অবিনাশ পরম বিস্ময়ে শান্ত-শয়ান মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ময়ে তার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে। এই মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার আজ সকালেই, আর আজ মধ্যরাত্রি হতে না হতে ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত আশা, বাসনা, বিজ্ঞতা-বিবেচনা, ক্রোধ-অহঙ্কার, সবকিছুর সম্মিলিত মানস-যাত্রাকে মধ্যপথে খণ্ডিত করে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সে অভিভূত হয়ে ভাবছিল। কিন্তু ভাবতে ভাবতে কখন যে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে তা সে জানে না।

নরেনবাবুকে সে সরিয়ে নিয়ে এল। এনে ড্রইংরুমে সোফায় বসিয়ে দিল। তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন নরেনবাবু। তার চোখে জল দেখে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন নার্সিংহোমে ফোন করে বরেনকে আসতে বল।

ফোন করে ফিরে এসে অবিনাশ বলল, উনি আসছেন। সবাই আসছে সঙ্গে। সুষমার ছেলে হয়েছে। সুষমা ও ছেলে ভাল আছে।

নরেনবাবু শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। বললেন বাবার আজই স্ট্রোক হবে কে জানত! হাই ব্লাড-প্রেসার ছিল। সারাদিন আজ নানান রকমের ধকল গেল।

বলতে বলতে চুপ করে গেলেন তিনি।

অবিনাশ দেখল গোটা বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গিয়েছে। সব চুপ, স্তব্ধ। যেন আচমকা মার আর ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছে। যে আলোগুলো এতক্ষণ উৎসবকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল সেই আলোগুলোই যেন এই নিদারুণ আকস্মিক শোককে উৎকটতর করে তুলেছে। একটা শূন্য স্তব্ধতার মধ্যে আলোগুলো যেন একটা বুকফাটা হাহাকার ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে।

নরেনবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসে বললেন, একটা ডাক্তার ডাকারও সময় পেলাম না!—একটু চুপ করে থেকে বললেন, চল, ফোন করতে হবে। আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে হবে।

এতক্ষণে তাঁর চোখ দিয়ে নিঃশব্দ ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যেন স্থাণু হয়ে গিয়েছিলেন।

রাত এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটে।

এই সমস্ত ক্ষণটা অবিনাশ কেবল ফোন করেছে। আত্মীয়স্বজন থেকে খবরের কাগজ পর্যন্ত। মস্তবড় ধনপতি ছিলেন দেবেনবাবু।

সমস্ত বাড়িটা ততক্ষণে লোকে ভর্তি হয়ে উঠেছে। স্থির হল সকাল নটায় শবযাত্রা আরম্ভ হবে।

নরেনবাবুই অবিনাশকে বললেন, তুমি একবার বরং বাড়ি যাও। বাড়ি থেকে সোজা শ্মশানে চলে যেও।

অবিনাশ আপত্তি করেছিল, কিন্তু নরেনবাবু শোনেন নি। বলেছিলেন, তোমার পরিশ্রম, সাহায্য এখন আমার প্রতিদিন দরকার হবে। আমার কাজের জন্যেই একবার বাড়ি যাও। এখানে সারাদিন খেটেছ। বিশ্রাম পাও নি।

কাজেই যেতে হয়েছিল অবিনাশকে।

সে পথে এসে দাঁড়াল। রাত তখন সাড়ে তিনটে পার হচ্ছে।

বাড়ির সামনেই একটা অতি উজ্জ্বল বাতির দীপ্তিতে চারপাশের জনহীনতা ও নীরবতা কেমন যেন একটা ভূতুড়ে চেহারা ধারণ করেছে।

চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ, নিজের পদক্ষেপের শব্দটা নিজের কানেই বাজতে লাগল একান্ত স্পষ্ট হয়ে। বাড়িটার দিকে যেতে যেতে একবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে তার মনে হল ওই বাড়িটার সমস্ত আনন্দ বেদনা শোক ওই বাড়িটার চৌহদ্দির ভিতরেই যেন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, তার বাইরের সংসারকে এতটুকু স্পর্শ করে নি।

হঠাৎ মনে হল দেবেনবাবু সন্ধ্যার সময় নিজে হাতে তাকে একটা চ্যাঙারিতে করে খাবার সাজিয়ে দিয়েছিলেন তার বাড়ির ছেলেদের জন্যে। সেটা সে ফেলে এসেছে ভুলে। কিন্তু তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হল না। যেন এক জন্মের অভিজ্ঞতার বোঝা জন্মান্তরের পথে একান্ত বোঝার মতই সে পরিত্যাগ করে এসেছে।

নজর পড়ল হঠাৎ পাশের ফুটপাতে। একটি পুরুষ আর একটি মেয়ে। এই বিচিত্র পরিবেশে তাদের দেখে তার যেন কেমন অদ্ভুত লাগল। তা সত্ত্বেও মনে হল যেন ওদের দুজনেই খানিকটা চেনা-চেনা। পরমুহূর্তেই মনে হল দেবেনবাবুর বাড়ির ঝি আর চাকর। একান্ত নিবিষ্ট হয়ে দুজনে কিছু বলছিল চুপি চুপি। দেখে তার হঠাৎ মনে হল সেই হার চুরির সঙ্গে এই দাঁড়িয়ে থাকার যেন কোন যোগাযোগ আছে। তাকে দেখেই তারা দুজনে তাড়াতাড়ি সরে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। হয়তো ওরাই নিয়েছে, হয়তো নেয় নি। সারাদিনের বিচিত্র ঘটনার পর তার যেন আর কিছুতে কিছু এসে যায় না। সে এগিয়ে চলল।

পথ জনহীন, সমস্ত সংসার সুষুপ্ত। ঘন ধোঁওয়া আর শীতের শেষ রাত্রির কুয়াশা নেমে এসে চারদিক ঢেকে ফেলছে মুহূর্তে মুহূর্তে। যেন সৃষ্টির একটা কল্প তার চেতনা থেকে আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

পিছনে পড়ে রইল জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রঙে ও রেখায় আকীর্ণ বাড়িটা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-বিধৃত পৃথিবীর মত। সে চলল এগিয়ে। যেন লোক থেকে লোকান্তরের পথে তার যাত্রা। মন সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অভিঘাতে উদাসীন ক্লান্ত জীর্ণ।

পথের ইলেকট্রিক আলোর পোস্টের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার দেহের ম্লান দীর্ঘ ছায়াটা বৃহত্তর ও হ্রস্বতর আকার নিয়ে দেখা দিল। সে দিকে নজর পড়তেই তার মনে হল, আর কেউ সঙ্গী নেই এই একক যাত্রায় তার নিজের এই ছায়াটা ছাড়া। দীর্ঘপথযাত্রী তার প্রাণের একমাত্র অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী তার এই দেহের মত।

—

কাশ্মীরের চিঠি

শ্রীঅমিয়ময় বিশ্বাস

সুরলোকে অসুর

শঙ্করাচার্য পাহাড়ের পিছনের অংশ দেখবার কৌতূহল নিয়ে একদিন বের হলাম। সঙ্গে চলল বোটের রমজান গাইড হয়ে। টুরিস্ট-সেণ্টারের চিনারের ছায়ায় ঢাকা স্বল্প আলোকিত স্নিগ্ধ বীথি পার হয়ে এলাম খরৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত পাহাড়ের পাদদেশে। এখানে রাস্তা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—সম্মুখের পথ গেছে চিনার-বাগের খাড়ির ধার দিয়ে ডালের পারে। পথের অন্য অংশ পাহাড়কে বেষ্টন করে চলেছে উত্তরে। এদিকটায় পাহাড় কেটে অনেকটা সমতল জায়গা বের করা হয়েছে। পথ ও পাহাড়ের মাঝের এই ফাঁকটুকু আর বেশীদিন থাকবে না। অল্পদিনেই ভরে যাবে দ্বিতল ত্রিতল বিশাল হর্ম্যারাজিতে, যেমন দেখছি হরিদ্বারের হর্-কী-পৌরীর ঘাটে। আজকাল সুদূর লছমনঝোলাতেও পড়েছে মানুষের কঠিন নিষ্ঠুর হাতের ছাপ। প্রকৃতিদেবীর কোল থেকে সদ্য-ছাড়া-পাওয়া যৌবনচঞ্চলা জাহ্নবীকে শাড়ি পড়ানো হচ্ছে নানা দেশের বিভিন্ন রুচির আগন্তুক পর্যটকদের প্রলুব্ধ করবার উদ্দেশে। এ যুগের নবতম ব্যবসায় ফন্দি হচ্ছে নানা দেশের পর্যটকদের আমদানি করা। এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিপ্রভাবিত পর্যটনে আমাদের পুরাকালের ধীর মন্থর গতি তীর্থযাত্রার ভক্তি বিনম্র ভাবের অবকাশ নেই। আছে শুধু ঔৎসুক্য বা কৌতূহলের তাড়নায় অতি দ্রুতবেগে ধূমকেতুর ন্যায় ছুটে চলা। আকাশযানের মারফত চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী পরিক্রমা করে এলেও এঁদের আশ মেটে না। মানুষের চিন্তার বেগ যে আরও বেশী। সেই বেগের নেশায় ঘুরে বেড়ান আধুনিক তীর্থযাত্রী টুরিস্টরা। টুকিটাকি কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুত জিনিসে থলি ভরলেও অন্তরে শূন্য ছাড়া আর কিছু জমা থাকে না।

পাহাড়ের পিছনের এই রাস্তা জনবিরল। ছোট একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল পার হয়ে পিচ দেওয়া মসৃণ পরিষ্কার চওড়া রাস্তা ঢালু পথে পাহাড়ের গায়ে গায়ে নীচে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে দেখছি মিলিটারি অফিসারদের বাসভবন, দরজায় শান্ত্রীর পাহারা। রাস্তায় যানবাহন খুবই কম, নির্জন পথের শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করে ছুটে চলেছে বড় বড় কালো অক্ষরে U.N. লেখা দুনিয়ার শান্তি-সমিতির সাদা সাদা জীপগাড়ি। প্রখর রৌদ্রে ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগল না, ফেরার পথ আবার চড়াই। কাছে কোন টাঙ্গার আড্ডাও দেখতে পেলাম না। রৌদ্রদগ্ধ হয়ে যেতে হবে সেই চিনারবাগের খাড়ির পারে টাঙ্গা সংগ্রহের আশায়। রমজানকে এ কথা বলতে সে একটি গলি দিয়ে সহজ পথে নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে এগিয়ে চলল, পিছু পিছু আমরাও।

গলিটা বড্ড নোংরা। পথের দু ধারে ভগ্নপ্রায় কুটীর-গুলিতে বাস করে দরিদ্র কাশ্মীরী মুসলমান পরিবার। পথের ধারে খাটিয়াতে বসে পুরুষরা ধূমপানে মগ্ন। সরু পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি হুটোপাটি। আলোশূন্য বাড়িগুলিতে গৃহকর্মরত মুসলমান রমণীগণ কাজের ফাঁকে পথের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। মেয়েদের ডাগর চোখে হরিণের চোখের সরলতা, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন ভাবহীন, প্রাণশূন্য। কাশ্মীরী মুসলমান মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে কখনও কোন ঔৎসুক্য লক্ষ্য করি নি, কেমন যেন একটা কঠিন নির্লিপ্ত ভাব। নানা দেশের নানা বয়সের নানা ঢঙের নানা বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত পর্যটকদের দেখে দেখে এরা আর আমাদের সচল আবির্ভাবে সচেতন হবার কারণ খুঁজে পায় না। পুরুষরা এ বিষয়ে মেয়েদের ঠিক বিপরীত।

এগিয়ে চলেছি। একটি অন্ধকার কুটীরের ভিতর

থেকে কে যেন রমজানকে ডাকল। আমরা ওর অপেক্ষায় পথেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়ে তোমারা মোকান হ্যায়? সে বলল, তার এক বৃদ্ধ চাচা এখানে থাকে। পূর্বে বারামুলারের কাছের এক গ্রামে এর বাড়ি ছিল, ১৯৪৭ সনের হাঙ্গামার সময় দেশ ছেড়ে এখানেই আছে। বর্তমান কাশ্মীরের ইতিহাসে ১৯৪৭ সনের আফ্রিদী অভিযান একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ঘটনাপরম্পরায় ঘাতপ্রতিঘাতে কাশ্মীর তখন ছিন্নভিন্ন। পুরাতনকে ভস্মীভূত করে জাগছে আজকের নতুন কাশ্মীর। সেই নাটকীয় পরিস্থিতির বিবরণ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনতে কৌতূহল হল। রমজানের চাচার সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম এবং সে সযত্নে সেই কুটীরে নিয়ে গেল। 'সেলাম আলেকুমে' নমস্কারের পালা শেষ করে বসে পড়লাম।

চাচা খুবই বৃদ্ধ। বয়স আশীর ওপর হবে। শুভ্রকেশ শ্মশ্রুতে সমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল। আমরা ছিন্ন খাটিয়াতে বসে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলাম। লোকটা যেন কানে কম শোনে, তা ছাড়া মুখের বাঁ অংশটা পাগড়ির কাপড় দিয়ে একেবারে ঢাকা। কথা এত অস্পষ্ট ও জড়ানো যে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। রমজানকে সে কথা বলাতে সে বৃদ্ধকে কি যেন বলল। বৃদ্ধ তার কথা শুনে মুখের কাপড়ের ঢাকাটা সরিয়ে দিতে আমরা তার মুখের বীভৎস অংশ হঠাৎ দেখে একেবারে চমকে উঠলাম। সমস্ত শরীরে এমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল যে বলবার নয়—এ কি?

বৃদ্ধের মুখের বাঁ দিকটায় মাংস কোথাও নেই। শুধু পাতলা চামড়ায় ঢাকা। সেই চামড়ার ভিতর দিয়ে অস্থিগুলি দেখা যাচ্ছে। এপাশের কয়েকটি দাঁতও বেরিয়ে আছে। বাঁ চোখটাও নেই, বাঁ কানও নেই। এই বিকটাকার বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃদ্ধ আবার মুখ কাপড়ে ঢেকে আস্তে আস্তে তামাক টানতে লাগল। রমজান তার বাঁ হাতের আস্তিনটা উঠিয়ে দেখাল যে লোকটার বাঁ হাতও নেই। আমরা হতভম্ব হয়ে বৃদ্ধের কাপড়ে ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমাদের এহেন আকস্মিক আগমনে এই বৃদ্ধের জীর্ণ হৃদয়ে বহুদিনের আড়াল করে রাখা শুষ্ক বেদনারাশি আজ যেন স্মৃতির ছোঁয়া লেগে চোখের জলের ধারায় গলে পড়তে লাগল।

আমরা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

পথে চলতে চলতে রমজান বলল যে, তার এই চাচা যৌবনকালে যেমন শক্তিমান ছিল তেমনি ছিল সুন্দর। আর স্বভাব ছিল যাকে বলে মাটির মানুষ—সদা হাস্যময়। গাঁয়ের লোকে আদর করে নাম দিয়েছিল গুলবাবা। এখনও এই বৃদ্ধ গুলবাবা নামেই পরিচিত। গ্রামের শান্ত পরিবেশে স্বল্প আয়ে সংসার চালাত এই গুলবাবা, ভেড়া চরানো আর তার লোম বিক্রি এই হচ্ছে এদের জাত-ব্যবসা। বৃদ্ধের সংসারে এক নাতি ছাড়া আর কেউ ছিল না। গুলবাবা অনেক খুঁজে কাশ্মীরীদের মধ্যেই সুন্দরী বেছে বিয়ে দিয়েছিল তার নাতির। ভারি আনন্দে কাটছিল ওদের দিন। কিন্তু ভগবান বোধ হয় এদের এত সুখ সইতে পারলেন না। কোথা থেকে উঠল ঝড়, দুর্দান্ত আফ্রিদীরা পথের দু পাশের বাড়িঘর পুড়িয়ে গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার করে বিভীষিকার ঝটিকা বয়ে নিয়ে এল শান্তিতে ভরা দরিদ্র কাশ্মীরীদের ঘরে ঘরে।

বর্বরদের প্রতিরোধ করতে দাঁড়িয়েছিল এই গুলবাবা। গৃহরক্ষার ভার নিজ স্কন্ধে নিয়ে পালাতে বলেছিল তার নাতি ও নাত-বউকে। তার নাতি কিছুতেই যাবে না তার আদরের দাদুকে ফেলে কিন্তু ঘরের বউয়ের ইজ্জত সবার উপর। সেই ইজ্জত রক্ষা করতে তারা পিছনের পাহাড় বেয়ে লুকোতে যাচ্ছিল বহু দূরে। এদিকে দস্যুদের কঠোর আঘাতে ভেঙে পড়েছে তাদের পুরাতন ভগ্নপ্রায় দরজা। গুলবাবা টাঙি নিয়ে রুখে দাঁড়াল অত্যাচারীদের বাধা দিতে। কিন্তু একক বৃদ্ধ কি করতে পারে এতগুলো হিংস্র লোভাতুর রক্তোন্মাদ পশুদের বিরুদ্ধে। তাদের এক তলোয়ারের আঘাত সামলাতে গিয়ে কাটা পড়ল গুলবাবার বাঁ হাত। মাথা বেঁচে গেল বটে কিন্তু মুখের বাঁ অংশের সবটা খসে পড়ে গেল। ডান হাতের অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ আর পেল না এই বৃদ্ধ। সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল দরজার ওপর। দস্যুরা ঘরে ঢুকে সব ভেঙেচুরে তছনছ করে খুজতে লাগল তার নাত-বউকে। সেই পলায়নপরা রমণীকে ধরার আশায় দস্যুরা ছুটে

চলল সেই পিছনের পাহাড়ের পথে। সমীপবর্তী দস্যুদের বাধা দিতে ছেলেটি ফিরে দাঁড়াল কিন্তু এ অসম যুদ্ধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তীক্ষ্ণ বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল বীর বালক। মেয়েটি যখন দেখল তার স্বামী বর্শাঘাতে মৃত্যুমুখে তখন বর্বরদের হাত থেকে বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে খদে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ দিল নিজের মান বাঁচাতে।

বিজেতার ওপর জেতার নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীই ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। অসভ্য মানুষ আজ সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে, শুধু বিজেতার মনোভাবের পরিবর্তন হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর বুকে মিত্র সৈন্যদের 'দরদী' হবার আড়ালে কত না শোচনীয় পাশব নাটকের অভিনয় হয়েছে। জাপানের আত্মসমর্পণের পর আমেরিকান জি. আই.-দের জাপানী মেয়েদের নিয়ে খোলাখুলি বেলেল্লাপনার কাহিনী সভ্য জাতির মুখে কলঙ্কের কালিমা পরিয়ে দিয়েছে। যান্ত্রিক-সভ্যতায় জগৎ আজ অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করেছে কিন্তু নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষে আমরা এখনও সেই আদিম বর্বর মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে পারি নি। আমাদের উন্নতির মান আজ যন্ত্রাধিক্য কিন্তু আত্মিক উন্নতি না হলে যে যদুবংশের ধ্বংসের মতন পরস্পর হানাহানি করেই শেষ হতে হবে তার পূর্বাভাস সমস্ত মানবজাতিকে আজ শঙ্কাকুল করে তুলেছে। মহর্ষি কণাদের পরমাণুবাদের চরম পরিণতি হয়েছে মৃত্যুর কণাবাদে। আমরা অন্ধের মত সেই মৃত্যুবাণকে আরও শাণিত করবার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছি—

"নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের। শুধু নিম্নে মোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের, সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে................"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বোটে ফিরে এলাম।

শেষ দুদিন

এই শেষ দুদিন কাটাব শ্রীনগরে। একে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে পেতে চাই। এর মানুষকে, বিশাল চিনারের ছায়ায় ঘেরা পথকে, নীল আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘগুলিকে, ওই দূরের নীল পর্বতের চূড়ার বরফগুলিকে—সব উপভোগ করতে চাই প্রাণ ভরে। কাশ্মীরে আর আসা হবে না।

হাউসবোটের আবদুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুব ভাবছি। কিন্তু আজ ওরা খুব ব্যস্ত, ঝিলমে জল বেড়েছে। পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, পঙ্কিল জলরাশি স্ফীত হয়ে দু পারের অনেকটা ডুবিয়ে দিয়ে ঢেউ তুলে চলেছে তীব্র বেগে। এ সময় হাউস-বোটটা পারের কাছে টেনে না বাঁধলে ভেসে যাবার ভয়। বোটের লোকগুলো স্বস্তিতে থাকতে পারে না কোনও দিন। শীতকালে যখন তুষারপাতে সব ঢেকে যায় তখনও এরা রাত্রি দিন পাহারা দেয়। যদি ছাতে বেশী বরফ জমে তাহলে হাউসবোটটা ভেঙে যাবার ভয় থাকে। সে সময় রাত্রিতেও এরা হ্যারিকেন জেলে বোটের ছাতের বরফ পরিষ্কার করে। আবার সমস্ত গ্রীষ্ম আর বর্ষা এদের কাটে ঝিলমের খামখেয়ালীর সঙ্গে তাল দিতে। কাশ্মীরের জনসাধারণ যে গরীব তার কারণ হচ্ছে যে বৎসরেরর বেশীর ভাগ সময়েই তাদের কোনও কাজ নেই। গ্রীষ্ম আর শরৎকালের প্রত্যাশায় বসে বসে কাটিয়ে দিতে হয় সুদীর্ঘ শীতকালের দীর্ঘ রাত্রি আঁধারের শেষে আশার আলোকের প্রত্যাশায়।

কার্পেট ফ্যাক্টরি দেখে আসা গেল। নক্শা তৈরি করা, তাতে রং দেওয়া, তার পর পশমের গাঁঠ দিয়ে সেই নক্শাকে ফুটিয়ে তোলা—সব হলদে সরু সরু কাগজে পারশীতে লেখা। সেই কাগজের টুকরোগুলো দেখে কার্পেট বোনা হয়। এক একটি পরিবারের হাতে এক একটা কার্পেট। পুরাদস্তুর কুটিরশিল্প। একজন সেই কাগজ সামনে রেখে পড়ে যেতে থাকে আর সবাই শুনে শুনে রঙ মিলিয়ে পশমের গাঁঠ বেঁধে যায়। ছোট ছোট সাত আট বছরের বাচ্চারাও এত ক্ষিপ্র হস্তে গাঁঠ বাঁধছে যে দেখে অবাক হতে হয়। যে কার্পেটের জমিতে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যত বেশী গাঁঠ তার মূল্য তত বেশী। অবশ্য তার সঙ্গে রঙ ও নক্শারও একটা আলাদা মূল্য আছে। সাধারণ কার্পেটে থাকে প্রায় চারশো গাঁঠ প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে। হাজার গাঁঠের কার্পেটটিও তৈরি

হচ্ছে দেখলাম। এদের বিশেষত্ব যে এরা একই ঢঙের দুটো কার্পেট তৈরি করে না, ছোট মাপের জোড়া কার্পেট ছাড়া। কাজেই সব কার্পেটই নতুন—নিজের রঙ ও নক্‌শার নতুনত্বে। দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে।

আমরা যতদিন কাশ্মীরে এসেছি—একদিনও বৃষ্টি বা বাদল পাই নি। শ্রীভগবানের অপার করুণা বলতে হবে। আমরা নিশ্চিন্ত মনে ভেসে বেড়াচ্ছি স্নিগ্ধ সূর্যালোক-উদ্ভাসিত শ্রীনগরের পথে পথে। কাশ্মীরের মধ্যমণি, পাহাড়ে ঘেরা ঝিলমের স্রোত-বিধৌত এই শ্রীনগরকে স্থাপিত করেন রাজা প্রবরসেন ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। হুয়েন সাং‌ও এই শ্রীনগরকে দেখে গেছেন। যে ঝিলমের বুকে এতদিন ভেসে এসেছে কাশ্মীরের ধনদৌলত, তার সমস্ত ঐশ্বর্য আজ সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীনগরের নাগপাশ। হাজার হাজার বছরের পলিমাটিতে ঝিলমের বুক ভরে উঠেছে আর উলারের গভীরতা এখন দাঁড়িয়েছে উপকথায়। তাই বৃষ্টি হলেই শ্রীনগরে জলপ্লাবন। আবার কাগজে দেখছি পাকিস্তান ঝিলমের স্রোতকে আটকাচ্ছে মঙ্গলা বাঁধ তৈরি করে। তিনশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু আর ন হাজার ফুট লম্বা। যদি সত্যি সত্যিই এই বাঁধের পরিকল্পনা রূপ নেয় তাহলে রুদ্ধগতি ঝিলমের স্রোতে কাশ্মীর ভেসে যাবে। বিনা যুদ্ধে লুটিয়ে পড়বে পাকিস্তানের পায়ে।

একদিন আমরা গেলাম সরকারী শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে। এই প্রদর্শনী ভবনটি পূর্বে ইংরেজ রেসিডেন্টের বাসভবন ছিল। দূরবিস্তৃত সবুজ ঘাসের লনে—বিশাল চিনারের ছায়ায় স্থানটি মনোরম। আর্ট এম্পোরিয়ামের উপযুক্ত পরিবেশ। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই হলঘর। তার দু পাশে দোতলায় যাবার সিঁড়ির দু পাশে রয়েছে ভয়ালদর্শন রয়াল বেঙ্গল টাইগারের খড়-ভরা মূর্তি। কাশ্মীরের জঙ্গলে এ-জাতীয় বাঘ নেই। বড়-জাতের শিকার বলতে এদেশে বোঝায় হিমালয়ের কালো ভালুক। লীডারের উপত্যকায় আর থাজাওয়াস্‌ নালার ধারে মাঝে মাঝে চিতা বাঘের দর্শন মেলে। তা ছাড়া সমস্ত কাশ্মীরের পাহাড়ে জঙ্গলে চরে বেড়ায় নানা জাতের হরিণ আর পাহাড়ী ছাগল। কাশ্মীর শুধু মৎস্য-শিকারীদের প্রিয়। অগণিত হ্রদে ঝিলে আর বিলে আছে নানা জাতের জলচর পক্ষী—হাঁস, চিকোর, স্নাইপ, টিল্‌। এদের খোলসগুলোকে বেশ সুন্দরভাবে বড় বড় কাঁচের বাক্সে যথাসম্ভব স্বাভাবিক পরিবেশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পর্যটক কেন্দ্র দপ্তরের বড় হলঘরে। প্রদর্শনীর সবগুলি বিভাগই ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। সংগ্রহ খুব বেশী নয় আর যা আছে তাও নীচুদরের। তবে দাম শুনলে কোষ্ঠির ফলাফলের জয়হরির মতন লাফ দিয়ে পিছু হটে আসতে ইচ্ছে হয়। কাঠের কাজ, শালের কাজ, কার্পেট, সোনারূপার কাজ, রেশম সবই অল্পবিস্তর রাখা আছে। বিক্রির চেষ্টা আছে তবে চড়া দামের জন্যে বিক্রি হচ্ছে না। সবই পুরনো মনে হল। কাশ্মীর সিল্কের খুব নাম আছে তাই ওই কাউণ্টারে অনেকটা সময় দেওয়া গেল। এদের রেশম খুব পাতলা আর বুনোটও ঠাস নয়, অল্পেতেই ফেঁসে যাবার ভয়। বাংলার মুর্শিদাবাদের রেশমের তুলনায় এদের জিনিস অতি খেলো বলে মনে হল। সিল্কের টুক্‌রোতে রেশমের সুতোর কাজ করা শাড়ির কদর আছে কিন্তু ওই রেশমের দোষে তেমন আদর হচ্ছে না। একখানা মোটামুটি কাজ-করা শাড়ির দাম সত্তর-আশি টাকা।

জিনিসপত্র কিনতে হলে যেতে হয় সরকারী কেন্দ্রীয় পণ্যশালায় আর আমীরাকদলের বড় বড় দোকানগুলোতে। স্মরণচিহ্ন হিসাবে কিছু কেনার জন্যে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বিচিত্র পণ্যসম্ভারে দোকানগুলি ঠাসা। পছন্দ করা আর দাম ঠিক করা দুই-ই অসম্ভব। এরা দাম চাইতে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। ফলে অর্ধেক দামে কিনেও মনে সংশয় জাগে বুঝি ঠকে এলাম। কাশ্মীরীরা বেশ জানে যে কাশ্মীরকে পরোক্ষে সাহায্যদানের রাজনৈতিক বলির পশু এই বিদেশীয় পর্যটকরা। সুতরাং তাদের কর্তব্যে যাতে ত্রুটি না হয় সেদিকে এদের মন সর্বদাই সজাগ। মাঝে মাঝে এক-দামের দোকানও দেখলুম তবে সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম। কিছু না কিনতে পারলেই মগজ আর পকেট দুইই রক্ষা পায়। কিন্তু রক্ষা করতে পারা গেল না। সঙ্গে তোমার মা। আমাকে পছন্দ করার মেহনত থেকে বাঁচানোর গুরুকর্তব্য তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। ফলে পকেটটা বেশ হালকা হয়ে গেল।

২০শে জুন। সকাল থেকেই আজ গোছগাছ শুরু হয়েছে। এবার পাত তাড়ি গোটাতে হবে। কাল সকাল এগারোটায় প্লেন ছাড়ছে। আজ সকালে আর বেরুনো হল না। এখানে ভারি মজা—বোটে বসেই সব কিছু পাওয়া যায়। ঝিলমের স্রোতে শিকারা ভাসিয়ে আসে ফলওয়ালা, ফুলওয়ালা, শালওয়ালা। আখরোটের কাঠের তৈরি কত বিচিত্র জিনিস—কাগজের মতন হালকা, ধূসর বর্ণের কাঠগুলি দিয়ে কত রকমারী সুন্দর জিনিসই এরা তৈরি করে। ইচ্ছে করে সব কিনে নিয়ে আসি। 'পেপির মেসের' জিনিস কাশ্মীরের নিজস্ব সম্পদ। এ জিনিস আর কোথাও তৈরি হয় বলে জানি না। কাগজগুলো পচিয়ে তার সঙ্গে আরও কিছু জিনিস মিশিয়ে কাদার মতন একটা পদার্থ তৈরি হয়। তা দিয়ে এরা নানারকম জিনিস তৈরি করে। সেগুলোর গায়ে সোনালী রূপালী রঙের সূক্ষ্ম কারুকার্য। আমরা দুটো ফুলদানি কিনলাম। এক একটার দাম পড়ল প্রায় কুড়ি টাকার মতন। নৌকোয় বসেই পৃথিবীর সঙ্গে আদান-প্রদানও চলে। নৌকোতে আসে পোস্ট-অফিস। এই ভাসমান পোস্ট-অফিসে শুধু চিঠি দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থাই আছে।

বিকেলে আমরা শেষদিনের মত ঝিলমে বেড়াতে গেলাম শিকারা নিয়ে। এবারে চললাম উজানে স্রোত ঠেলে। শহরের এ অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জন। বাঁধের ওপরে মহারাজার অতিথিশালা। কয়েকটা বেশ বড় বড় সুন্দর হাউসবোটও বাঁধা রয়েছে। কাশ্মীরের আইনে—অকাশ্মীরীদের জমি কেনবার অনুমতি নেই। সেজন্য বড় বড় বোটেই বাড়ি তৈরি করে বাস করছেন সৌখিন ইউরোপীয়ানরা। বাঁধের নীচেই আছে বিরাট ক্যান্টনমেন্ট। নদীর অপর পারে কোনও বাড়িঘর নেই, শুধু ধানের ক্ষেত। নদী থেকে মাঠে জল তুলে দেওয়ার জন্য সারি সারি মাচা বাঁধা রয়েছে। মাঠে চরে বেড়াচ্ছে গরুর পাল। এখানকার গরুগুলো ছোট ছোট আর বেশীর ভাগ গরুর রঙ কালো। এত কালো গরুর সমাবেশ আর কোথাও দেখি নি।

সন্ধ্যা আসন্ন। আমরা শিকারা ঘুরিয়ে বোটে ফিরে চললাম। হঠাৎ খোকার খেয়াল হল যে ডাল হ্রদ থেকে চিনারের খালে জল আসার সংকীর্ণ জলপথের দরজা খোলার খেলা আর ওই পথে নৌকো পারাপারের কৌশল না দেখে সে ফিরবে না। অগত্যা শিকারা নিয়ে পর্যটক-কেন্দ্রের পিছনের খাল দিয়ে চিনারবাগে যেখানে ডালের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে সেখানে চললুম। এই খালটি খুবই অপরিসর। দু ধারে বাঁধা রয়েছে অতি নীচু শ্রেণীর হাউসবোটগুলো। তাদের মাঝে শিকারা যাওয়ার একফালি জল। আমাদের শিকারা দু ধারে বাঁধা বোটগুলো ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলল। জল তাত্র দুর্গন্ধময়, ন্যক্কারজনক। এই আঁস্তাকুড়ের নর্দমায় তাঁরাই আস্তানা নেন যাঁরা কাশ্মীরে এসে এই চতুর বোটওয়ালাদের খপ্পরে পড়েন। গবর্মেন্টের উচিত এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে হাউস-বোট রাখা আইন করে নিষেধ করে দেওয়া। ডাল গেটের দরজার সামনে এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আরও অনেক নৌকো দাঁড়িয়ে—ডালের জল উঁচুতে আর চিনার-বাগের খাড়ির জল নীচে। ডালের জল লক্-গেটের ফাঁক দিয়ে ফুলে ফুলে বেরিয়ে আসছে চিনারের খালে। কালো দুর্গন্ধময় জল। রাত হয়ে আসছে—কখন যে গেট খুলবে তার স্থিরতা নেই। দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না। আমরা আর অপেক্ষা না করে আবার সেই পচা নর্দমার ভিতর দিয়ে ঝিলমের পরিষ্কার জলে এসে হাঁপ ছাড়লাম। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেও স্বর্গের পথে নরক দর্শন করতে হয়েছিল—ভূস্বর্গে বেড়াতে এসে শেষদিনে আমাদের কপালেও জুটল চিনারবাগের নরক দর্শন।

বিদায় কাশ্মীর

আজি স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন। সকালে উঠেই জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হল। হাউসবোটের সবাই এসে সাহায্য করতে লাগল। এই অল্প কদিনেই আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেছে ওদের স্নেহমধুর ব্যবহারে। যাবার প্রাক্কালে আমাদের মনটা ভারি হয়ে উঠল ওদের ছেড়ে যাচ্ছি মনে করে। জিনিসপত্র নিয়ে বিমান-দপ্তরে এলাম। হারুন, আবদুল্লা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে বিদায় নিল। আর হাত ধরে অনুরোধ—যেন আবার দেখা পাই। সংসারচক্রের আবর্তনে কে যে কোথায় চলে যাব—আবার দেখা হবার সম্ভাবনা একেবারেই সুদূর-পরাহত। মন ভারি বিষণ্ণ হয়ে রইল।

পর্যটক-কেন্দ্রের রেস্তোরাঁতে খেয়ে নিলাম। মালপত্র

যথানিয়মে ওজন হল, আমাদেরও ওই সঙ্গে। ফেরার পথে আমাদের মালপত্রের ওজন কম বলে ভাড়া কম দিতে হল। এ নিয়ে বিমান-অফিসের কর্মচারীরা হেসে ঠাট্টাও করলেন। আমাদের সঙ্গে কলকাতার এক দলও ফিরে চলেছেন। বাস এসে থামল এরোড্রোমে।

এখানে দেখি এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক পকেটে স্টেথিস্কোপ নিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কি কোনও রুগীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন?

তিনি ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করাতে একটু রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। আমি হেসে বললাম, যখন রুগীই নেই তখন ওই বোঝাটা আর পকেটে রাখা কেন? তিনি একটু অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়ে চোঙটা ব্যাগে পুরে ফেললেন। পরিচয়ে বললেন, তিনি দিল্লীর তীরথ্‌রাম হাসপাতালের চিকিৎসক। বেশীর ভাগ ডাক্তারদের এই স্টেথিস্কোপ দেখিয়ে বেড়ানো একটা রোগ। পেশার তকমা এঁটে নিজেকে জাহির করে দুনিয়াতে চলার ভেতর আছে মনের দৈন্যতা। মানুষ হিসাবে মানুষের যা দাম সেইটাই সত্যি। ব্যবসায়ের উজ্জ্বল খোলসের ভেতর লুকিয়ে আছে সেই সত্যিকার মানুষটি।

আমাদের মালপত্র প্লেনে উঠে গেছে। লাউডস্পীকারে ডাকছে পাঠানকোট যাত্রীদের। মস্ত বড় রুপালী পাখীটা ডানা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ি বেয়ে তার পেটে ঢুকে পড়া গেল। পিছনের অংশে মালপত্র, একেবারে সামনে পাইলটের কামরা। মাঝখানে যাত্রীদের জন্য দু ধারে একজোড়া করে গদিআঁটা চেয়ার। দু পাশের চেয়ার-গুলোর মাঝখানে যাতায়াতের একফালি সরু রাস্তা। আমরা চারজনে একধারে বসলাম। সামনে আনটু ও তার মা, পিছনে খোকা আর আমি। একটু পরেই প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর ভীষণ গর্জন করে প্রপেলারের পাখা ঘুরতে লাগল। সামনে পাইলটের দরজায় ফুটে উঠল বেল্ট বাঁধার আদেশ। এত ভীষণ শব্দ যে আমি পাশে বসেও খোকার কথা ভাল শুনতে পাই নি।

প্লেন সিমেণ্টে ঢাকা পথের উপর দিয়ে ছুটে চলল মোটরগাড়ির মতন। খোকা ও আমি ঠিক করে আছি যে কখন প্লেন মাটি ছেড়ে শূন্যে ভেসে ওঠে তার প্রথম অনুভূতিকে বেশ ভাল করে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু কখন যে প্লেন ভাসতে আরম্ভ করেছে বুঝতেই পারলাম না। নামার সময় মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লেন ধাক্কা খায়। তার ঝাঁকুনি স্প্রিঙের গদি-আঁটা আসনে বসেও বেশ বোঝা যায়, কিন্তু ওঠবার সময় দেখছি কিছুই অনুভব হয় না। পাশের ছোট কাঁচ-আঁটা জানলা দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কানের কাছে মিহি সুর—মুখ ফিরিয়ে দেখি ট্রেতে লজেন্স প্রভৃতি সাজিয়ে হাওয়াই জাহাজের ফিটফাট পোশাকে সজ্জিত বিমানের পরিচারক। লোকটি কালো এবং মোটা। মাথার কালো টুপির নীচে বিরাট কালো গোঁফজোড়াকে মোম দিয়ে ছুঁচলো করে পাকানো, অতি বিনীতভাবে মেমসাহেবী সুরে ইংরেজীতে কিছু নিতে অনুরোধ করছেন। একে যদি সিন্ধু-ঘোটকের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে আসার সময় ভাগ্যে জুটেছিলেন এক জলহস্তী। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো এবং অতিকায়। মাটির মায়ার বন্ধন ছেড়ে যখন পাখীর মত নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি, সেই অভিনব আনন্দবিহ্বল মনের রোমাঞ্চকর অনুভূতির পটভূমিকায় এই সব পুরুষ সেবাধারীদের উপস্থিতি বিসদৃশ বলেই মনে হয়। এয়ারহোস্টেস ছাড়া এয়ারসার্বিস চলবে না এ কথা বুঝে নিয়েছেন দুনিয়ার সব দেশের ঝানু ব্যবসায়ীরা। কেবল আমাদের কর্তাদের খেয়াল হয় নি এই কথাটা। বিশেষ করে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পুষ্পকরথে গুঁফো সেবায়েতদের আবির্ভাব একেবারে মর্মান্তিক।

ডাকোটার এঞ্জিন দুটো ভীম গর্জনে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বারো হাজার ফুট উঠতে হবে, সামনেই বানিহাল পাস। মাঝে মাঝে এরোপ্লেনটা হু-হু করে নীচে নেমে যাচ্ছে আবার এঞ্জিনের শব্দ বাড়ে, প্লেন ওপরে উঠে আসে। এই ভাবে ওঠা-নামা করতে করতে আমাদের বিমান-জঠরে পঁচিশটি প্রাণীকে পুরে আর পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নিয়ে মহাশূন্যে উল্কার মতন ছুটে চলেছে। নীচে ঘন সবুজ জ্যামিতিক রেখায়িত মাঠ, গাছপালার কালো কালো ঝোপ, রুপালী ফিতার মত জলভরা নদীনালা এঁকেবেঁকে চলেছে। দু পাশে নীল পাহাড়ের সার সাদা সাদা মেঘ-গুলোকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের কারও কারও মাথায় বরফ এই জুন মাসের প্রখর গ্রীষ্মেও জমে রয়েছে। বানিহাল পাস পার হলাম।

চারিদিক প্রখর রৌদ্রে মুহ্যমান, দিকচক্রবাল পিঙ্গল, অস্পষ্ট। রুক্ষ পাহাড়ে নেই আর সবুজের কোমলতা। পায়ের নীচে নদী বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জলধারা শীর্ণ। হঠাৎ যেন দৃশ্যপট পরিবাতত হয়ে গেল। প্লেন নামতে আরম্ভ করেছে, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে পাঠানকোটের এরোড্রোম। আমরা দেশে ফিরে এলাম।

সমাপ্ত

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

ইন্দ্রধনু

বনফুল

তোমার কাগজে তোমার মৃত্যু নিয়ে
কবিতা লিখতে হবে
এ কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি তো।
কিন্তু হায় রে, এই দুনিয়ায়
স্বপ্নাতীতও ধরে বাস্তব রূপ।
নিমেষে পলক-পাতে
অসম্ভবও যে মনে হয় স্বাভাবিক।

ভেসে আসে কানে দরাজ গলার
'বলাই' 'বলাই' ডাক
ভেসে আসে কানে, 'কই সুধারাণী, হ'ল ?'
লক্ষ স্মৃতির কণা
অন্ধকারেতে জোনাকির মতো ভিড় করে আসে মনে,
তারপর তারা ভিড় করে গিয়ে
দূরে মহাকাশে
নক্ষত্রের দলে।

বসে আছি চুপ করে ;
বসে আছি একা,
বসে আছি অসহায়।

বসেছি টেবিলে এসে
কিছু তো লিখতে হবে।

বন্ধ করিয়া ঘরের জানালা দ্বার
যে আলোটা ভাই তোমারি সঙ্গে গিয়ে
এনেছিনু কিনে এই তো সেদিন
ধর্মতলার মোড়ের দোকান থেকে
সেই আলোটাই জ্বেলে
লিখছি তোমার কথা
যে-তুমি আজকে নেই !

নেই ?
বিদীর্ণ হিয়া ক'রে ওঠে হাহাকার,
চিৎকার করি বলিতে চায় সে
না, না, আছে, আছে, আছে।
মৃত্যু-হীনের মৃত্যু কখনও হয় ?
অমর কখনও মরে ?
বল, বল, বল
দাও এর উত্তর।
হৃদয় মথিয়া ওঠে মূঢ় চিৎকার।

নিষ্ফল চিৎকার
প্রতিহত হয়ে ঘরের প্রাচীরে
ফিরে আসে বার বার।
লজ্জিত হয়ে বসে থাকি অধোমুখে !

সুইচের গোলমালে
তোমার কেনা সে বিজলী বাতিও
হঠাৎ নিবিয়া গেল।
অন্ধকারেতে ভরে গেল সারা ঘর।

তারপর দেখি—এ কি বিস্ময়—
ভেদ করি সেই অন্ধ তমিস্রারে
জানালার ফাঁক দিয়ে
প্রবেশ করেছে সূর্য-কিরণ-রেখা
স্বর্ণ-শায়ক সম।

সহসা চিনিনু তারে
সহসা বুঝিনু ফিরিয়া এসেছ তুমি
বন্ধু এসেছে বন্ধু-সম্ভাষণে।

চোখের জলেতে সে আলোক রেখা
রচিল ইন্দ্রধনু।

—

সজনীকান্ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার প্রতিভা, তোমার শক্তি—
যেন ভুলে গেছি সকল কথা,
রয়ে রয়ে শুধু মনে যে পড়িছে
নিবিড় তোমার আত্মীয়তা।
সেদিন দেখিনু সুস্থ, সবল,
নিরাময় দেখে মনে এল বল,
সোনার প্রদীপ দপ্‌ করে নিভে—
এমন করিয়া গেল রে কোথা?

২

তুমি আমাদের মহারথী ছিলে—
তুমি আমাদের সব্যসাচী,
দেখা আনন্দ— মনে হত সদা—
দূরে থেকে কত নিকটে আছি।
তুমি দিকপাল, গোষ্ঠীপতি হে,
সবল কঠোর কোমল অতি হে
অবজ্ঞাত ও অমানীকে তুমি—
নিজে যশ মান দিয়াছ যাচি।

৩

পূজ্য পূজাই—উৎসব তব
বিনয়ের তব তুলনা নাহি
কত শিবেতর করিয়াছ নাশ
অনুরাগে গেলে জীবন বাহি।
ফুটায়েছ ফুল ফোটায়েছ হুল,
কত দর্পীর ছোটায়েছ ভুল
কত প্রতিভার করেছ বিকাশ
বিস্ময়ে সবে দেখি যে চাহি।

৪

গড়িয়াছ শুচি শনিমণ্ডল—
গড়েছ মনের মতন করে,
অমৃত তুমি তুলিয়াছ সখা—
লবণ জলের নীল সাগরে।
কতই দম্ভী চিত্ররথেরে—
জয়রথ হতে আনিয়াছ ধরে,
মানিক-কেশর হেম চম্পকে
বাণীমন্দির দিয়াছ ভরে।

—

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

সজনীকান্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। 'শনিবারের চিঠি'তে আমার লেখা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বেরুত মাঝে মাঝে, আমার সহযোগীদের রচনাও রেহাই পেত না। প্রথম প্রথম রাগ করতাম, 'সম্মিলনী' নামক পত্রিকায় আমিও বেনামীতে উত্তর দিতাম।

আমার কবিবন্ধু মোহিতলালের কাছে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। মোহিতলাল বলেছিলেন—"রাগ করবেন না, রসিকতায় কি কেউ রাগ করে? দেখবেন যারা নগণ্য তাদের লেখা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ রসিকতা করা হয় না, যাদের সজনী গণ্যমান্য সাহিত্যিক বলে স্বীকার করে নেয়, তাদেরই আক্রমণ করে। আপনাকে সে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকই মনে করে, তাই আপনার লেখা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করে।"

কথাটা আমার মনে লাগল। তার পর থেকে আর রাগ করি নি। তবে লেখা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সাবধান হলাম। ক্রমে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। তারপর থেকে আমি সজনীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু হয়ে উঠলাম।

প্রত্যেক বৎসর একজন মাত্র সাহিত্যিক বিজয়ার পর সস্ত্রীক এসে আমাকে প্রণাম করে যেত, সে হল সাহিত্যিক সজনীকান্ত।

সজনীকান্তও দেখলেন, ক্রমে দেশে যে সব কবির আবির্ভাব হল এবং যাদের প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল তাদের চেয়ে আমি কবি হিসাবে তাঁদের ঢের বেশী আপন জন। আমিও তার কবিতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারলাম না।

একদিন বাণী রায়ের কাছ থেকে সজনীর একখানি কাব্যগ্রন্থ ফেরত দিয়ে আর একখানি পড়বার জন্য নিচ্ছি, এমন সময় সজনী এসে পড়ল। দেখে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, "দাদা, আমার কবিতার বই আপনি পড়ছেন? আমাকে হুকুম করলেই সব বই বাড়িতে দিয়ে আসতাম। কাল সব বই (গদ্য পদ্য) পাবেন।" তার পর গোটা সেট নিয়ে পরদিন এল। তারপরে তার সমস্ত রচনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে গেল।

সজনীকান্তকে নব্যযুগেরই কবি বলা যেতে পারে, তার রচনারীতি প্রাক্তন ধারার বটে, কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান যুগের উপযোগী। সজনীকান্তকে আমি দুই যুগের সেতু বলে মনে করি।

'শনিবারের চিঠি' এলেই তার সংবাদ-সাহিত্য আগেই পড়ে নিই, এমন চিত্তাকর্ষক বস্তু সচরাচর মাসিকপত্রে আর পাই না। সংবাদ-সাহিত্যে সজনীকান্তের বৈদগ্ধ্য, চিন্তাশীলতা, অধ্যয়নশীলতা, তথ্যসংগ্রহে পটুতা ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি তাঁর শাণিত বাক্‌চাতুর্য ও কৌতুকরসাঢ্যতা সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিকে পরম উপাদেয় সাহিত্যে পরিণত করে।

সাহিত্যের বিবিধ শাখায় এমন অক্লান্ত অবদান খুব কম সাহিত্যিকেরই আছে।

সজনীকান্তের স্মৃতিকথা বাংলা দেশের একটা যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিদগ্ধ সমাজের ইতিহাস। সরস ভঙ্গীতে রচিত বলে উপাদেয় সাহিত্য। এই স্মৃতিকথায় তাঁর সাহিত্যের আলোচনা আমি করব না, আমাদের বান্ধবতার কথাই বলব।

তার শ্রদ্ধা ও প্রবোধদান আমার ক্ষুব্ধ অবসন্ন চিত্তে বহুবার বল সঞ্চার করেছে। আমার কোন কোন রচনায় যুগবিবর্তনে অনিবার্য অনাদরের জন্য আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছিল—সজনী আমাকে বলেছিল, "দাদা, ক্ষোভ করবেন না, আপনি যা পেয়েছেন তাই বা কজনে পেয়েছে? আজ শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বেঁচে থাকলেও এই বিবর্তিত যুগে তাঁদেরও দুর্দিন আসত।" এভাবে কেউ আমাকে আশ্বস্ত করে নি। 'শনিবারের চিঠিতে'ও যুগবিপর্যয়ের কথার উল্লেখ করে সে আশ্বস্ত করেছিল।

১৪ বৎসর পরে কলকাতায় নিখিল-ভারত-বঙ্গসাহিত্য

সম্মেলন অধিবেশন হয়ে গেল। এতে সজনীকান্ত আমার সহযোগীরূপে সাহিত্যের কাব্যশাখার সভাপতি হয়েছিলেন। আমি শুনেছিলাম, সজনী আর কোন 'শাখা'য় সভাপতিত্ব করতে স্বীকার করবেন না। আমার কাছে যখন ওই অধিবেশনের মূল সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ এল তখন শুনলাম সজনীকান্ত কাব্যশাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। আমি বললাম, সে এ বয়সে শাখা-সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃত হবে না। পরে শুনলাম, সজনীকান্ত, আমি মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি শুনে আনন্দ প্রকাশ করে তাঁর পূর্বসংকল্প ত্যাগ করেছেন। সজনীকান্ত আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কাব্যশাখার পৌরোহিত্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন শুনে আমিও গৌরব বোধ করলাম। আমি বন্ধুদের বলেছিলাম, আমার অভিভাষণে যা অকথিত থাকবে, আমার অনুজ তার শূন্য স্থান নিশ্চয়ই পূরণ করবে। আমার এ প্রত্যাশা নিষ্ফল হয় নি।

ইদানীং আমি চিঠিতে ও মুখে সজনীকান্তকে বলতাম, "ভাই, মনের বল তোমার অটুট আছে স্বীকার করি কিন্তু দেহ আর তার অনুগামী নয়। এত পরিশ্রম আর কোরো না—মনে রেখ তুমি এখন invalid।" সজনীকান্ত উত্তরে বলত, "দিন তো ফুরিয়ে এল, বিধাতা যখন চোখের দৃষ্টি ফিরিয়েই দিলেন, যতটা পারি বলবার কথা বলে যাই, মৃত্যু যত দ্রুত আগিয়ে আসছে—আমাকেও তত দ্রুত কলম চালাতে হবে। ফষ্টিনষ্টি করে জীবনের অনেক সময়ই তো অপচয় করেছি—আপনাদের নিষেধ শুনি নি। তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে। দীনেশবাবুর মত আঙুলে কালির দাগ নিয়েই আমাকে বিদায় নিতে হবে।" শেষজীবনে তার চিত্ত কিরূপ অনুদ্ধত, অনসূয় পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রসন্ন হয়েছিল—তার পরিচয় পাওয়া যায় তার রচিত 'নবায়ন' কবিতায়—

অন্ধতার আবরণ বিদূরি বিজ্ঞান-শলাকায়
সুনিপুণ হস্ত যাঁর প্রকাশিল নব সূর্যালোক—
লভি নয়নের জ্যোতি তাঁর প্রতি নতি মোর ধায়,
অবারিত দৃষ্টি মোর দিনে দিনে দূরগামী হোক।
তমসা-আচ্ছন্ন আঁখি যা দেখেছে কটু ও কষায়
চারিদিকে যা দেখিয়া ভেবেছিনু অন্ধ হোক চোখ,
নবীন দর্শন লভি চিত্ত মোর প্রার্থনা জানায়—
সুন্দর হউক ধরা মানুষেরা হোক বীতশোক।
বহুদিন ভুলেছিনু পৃথিবীতে এত আছে আলো,
যত আলো এ আকাশে এ মাটিতে তত ভালবাসা—
জড়ত্বের আবরণ মানুষেরে দেবত্ব ভুলালো,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচুক এ তম সর্বনাশা।
দরদী বিজ্ঞানী এসো, এ আঁধারে দৃষ্টি-দীপ জ্বালো,
আনন্দে হাসুক পৃথ্বী, দূর হোক নিষ্ফল হতাশা॥

সজনী আমাকে বলত, "আপনার সাধুভাষা আপনি ছাড়বেন না—আপনিও চলতি ভাষায় লিখছেন দেখে দুঃখ হয়। মনে রাখবেন আমরা দু-চারজনই বঙ্কিম ও যৌবনের রবীন্দ্রনাথের ভাষার ধারা রেখে চলেছি। আমরাই শেষ—এর পর মহামহোপাধ্যায়রাও আর সাধুভাষায় লিখবেন না।"

সম্মেলনের অভিভাষণ সাধুভাষায় লিখেছি দেখে সজনী আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

সজনীকান্তের শেষ চিঠি—

৫।২।৬২

শ্রীচরণেষু

দাদা, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক জয়ন্তীতে আমার পঠিত প্রবন্ধ আপনার আশীর্বাদ পেয়ে সার্থক হল। রবীন্দ্রনাথের বাঙালীত্ব ও হিন্দুত্ব নিয়ে যাঁরা বিবাদ করেন, তাঁরা একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের কথার এমন সমাবেশ দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনার সমর্থন আমাকে আশ্বস্ত করল। আপনি ও বৌদি আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত সজনীকান্ত।

শোকভারাক্রান্ত চিত্তে বেশি কথা আজ লিখতে পারলাম না।

রাস্তা থেকে মেঘমন্দ্রে 'দাদা আছেন' ডাক আর শুনতে পাব না—এই কথা ভেবে অশ্রুসংবরণ করতে পারছি না।

—

সজনীকান্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। এ সত্যের চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কিন্তু সে পরিণামে উপনীত হওয়ার একটি ক্রম আছে। ক্রম ভঙ্গ করে এই পরিণাম যখন আসে তখন যারা থাকে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে— এই অনিবার্য সত্যকেও মেনে নিতে পারে না। মানতে হয় অনেক হাহাকার করে। সজনীকান্তের মৃত্যু মেনে নিতে আমার অন্তর এই হাহাকার করে উঠেছে। আমি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমার মত অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা তাঁদের বাদ দিয়েও সমগ্র দেশে সাহিত্যানুরাগী ও পাঠকসমাজও এই মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে হায় হায় করেছেন ও করছেন। সজনীকান্ত নামটি সাধারণ নয়, বর্তমান বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্র গুণের ও শক্তির সমন্বয়ে এ নামটি বিশিষ্ট এবং বিচিত্র। কয়েকটি গুণ ও শক্তির ক্ষেত্রে অনন্য। এই নামটি উচ্চারণে বা স্মরণে মনে শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ই জাগে সর্বাগ্রে। মনে ছবি জেগে ওঠে এক যোদ্ধার মূর্তি। ভুল তাদের হয় না। সত্যই সজনীকান্ত ছিলেন নির্ভীক অমিতবিক্রম যোদ্ধা। সাহিত্যে সমাজে জাতীয়জীবনে অনাচার কদাচার ও যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ ক্লান্তিহীন ক্ষমাহীন। মৃত্যুদিনের দুদিন আগে পর্যন্ত তিনি এই যুদ্ধ করেছেন। যেদিন রাত্রে তাঁর এই মৃত্যুরোগের আক্রমণ হয় সেদিনও তিনি সংবাদ-সাহিত্য রচনা করেছেন। এবং কবিতাও রচনা করেছেন। সজনীকান্তের পরিচয় পূর্বেই বলেছি—বিচিত্র—তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষমাহীন যোদ্ধাই শুধু নয়—তবে এই পরিচয়টাই সবচেয়ে বড় এবং প্রথম হয়ে উঠেছে। নইলে সজনীকান্তের কবি হিসাবে পরিচয়- গবেষক-প্রবন্ধ লেখক হিসাবে তাঁর দানের মূল্য তো কম নয়—ছোট নয়; আমি বলব সেই পরিচয় সজনীকান্তের যোদ্ধা পরিচয়ের চেয়ে অনেক বড় অনেক সত্য পরিচয়। মানুষের কাছে আজও তার আরণ্যজীবনের প্রসুপ্ত স্মৃতি তাকে বাঁশীর সুরের চেয়েও যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্র ঝনৎকারের প্রতি আকর্ষণ করে বেশী, তাই যোদ্ধা সজনীকান্তের পরিচয় তাঁর বংশীবাদক বীণাবাদক পরিচয়ের চেয়ে সাধারণের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। রাজহংস, মানস-সরোবরের কবি—বাংলা সাহিত্যের গদ্যের প্রথম যুগ ও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের পণ্ডিত গবেষক—শনিবারের চিঠির সম্পাদক পরিচয়ের আড়ালে পড়ে গেছে। এর অন্তরালে আছে তাঁর শ্রেষ্ঠ সত্য, বিপুল ব্যক্তিত্ব, উদার হৃদয় ও কোমল প্রাণের পরিচয়। সংসারে বিশেষ গুণপণায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁদের ভাগ্যে এমনই ঘটে থাকে; সমগ্র পরিচয় হয়তো বা আসল পরিচয়টিই চিরকালের জন্য অজ্ঞাত থেকে যায়।

আমার সঙ্গেও সজনীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর এই যোদ্ধা সাহিত্যিক খ্যাতির আকর্ষণেই। আমার সাহিত্যজীবনে লিখেছি—(সজনীকান্তও তাঁর আত্মস্মৃতিতে তা উদ্ধৃত করেছেন) "সেই সময় (১৯৩০ সাল) শনিবারের চিঠির দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিস বসলেই শনিবারের চিঠির কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না। ······একদা ইচ্ছা হল শনিবারের চিঠির দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি। কেমন সে লোকটা!"··· রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে "জবরদস্ত কাঠামো, মোটা নাক, বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখ, ফরসা রঙ সজনীকান্ত চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁকে দেখেই ফিরে এলাম, কয়েকটা কথা বলেছিলাম

মাত্র, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নি—আমিও দিই নি।" পড়লেই যে কোন পাঠক অনুভব করবেন—লেখকের মনোভাবের মধ্যে বিস্ময় ছিল, শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধাও ছিল—কিন্তু প্রীতি ছিল না। দেখা হল, পরিচয় হল না—এই কারণেই।

পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হল বঙ্গশ্রীর আসরে। সেও সংক্ষিপ্ত। দূরে থেকে গেলাম পরস্পর থেকে। বঙ্গশ্রীতে লিখবার জন্য একবার বললেন না পর্যন্ত। পনেরো দিনের মধ্যে সজনীকান্তের সম্মুখ থেকে একপ্রস্থ আবরণ সরে গেল। একটি গল্প লিখেছিলাম, সে গল্পটি শ্রীকিরণ রায় আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন এবং আমার অসাক্ষাতেই সজনীকান্তকে শোনালেন। সাহিত্য-প্রেমিক যোদ্ধা সজনীকান্ত সেই মুহূর্তে টেলিফোন তুলে আমাকে ডাকলেন; আমি তখন বালিগঞ্জে আমার আত্মীয়-বাড়িতে রয়েছি। বললেন, আপনি দয়া করে এখনি আসুন। প্রথম সংখ্যাতেই (বঙ্গশ্রী) ছাপতে চাই আপনার গল্প। গুণগ্রাহী সম্পাদক সজনীকান্তকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই পেলাম সেদিন। যে সজনীকান্ত তাঁর বোধ ও উপলব্ধি অনুযায়ী বহু সাহিত্যিকের উগ্র আধুনিকতাকে অভারতীয় এবং অকল্যাণকর বলে নিষ্ঠুর আঘাত করে বিরোধিতা করেছেন—সেই সজনীকান্ত শুধু আমি নই আমার সমসাময়িক ও আমার পরবর্তী নবীন অনেক কয়জন সাহিত্যিককেই সপ্রেম গুণগ্রাহিতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভে যে সাহায্য করেছেন—সে আমি চোখে দেখেছি এবং বিস্মিত হয়েছি। সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পাদক ও সমালোচক যোদ্ধা সজনীকান্ত তাঁর প্রখর শরাঘাতে শুধু ভাঙার কাজই করেন নি; তিনি গড়েছেন, তাঁর সে সংগঠন অনেক সম্ভাবনা এনেছে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে; সার্থক সুন্দর রচনা পড়ে বা শুনে—তাঁর বড় উগ্র-দৃষ্টি চোখে সে যে কি আনন্দোজ্জ্বল, কোমল ক্ষেত্রবিশেষে সজল দৃষ্টি ফুটে উঠত—সে তো আমি ভুলতে পারব না!

কয়েক মাস যেতে—আর এক পরিচয় পেলাম। এই কয়েক মাসের মধ্যে সজনীকান্তের আর এক রূপ দেখেছি। বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। অভিভূত হয়েছি তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্যের উল্লাসময় অভিব্যক্তিতে। দিনের পর দিন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—বিখ্যাত সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে সাহিত্যযশোপ্রার্থীদের নিয়ে—সে কি প্রাণোচ্ছোল আলোচনা আসর—আনন্দ-বাসর। যত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা তত কি কৌতুক রস-রসিকতার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের কাছে সজনীকান্ত অবশ্যই তুলনায় নিষ্প্রভ ছিলেন, কিন্তু কৌতুক রস-রসিকতায় সজনীকান্ত ছিলেন মধ্যমণি, ক্ষণে ক্ষণে বৈদগ্ধ্যের রশ্মিপাতের প্রতিফলনে রসিকতার প্রতিচ্ছটা ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ত। মজলিস হাসিতে মুখর হয়ে উঠত। জীবনের শেষ দিন—রবিবার দিন—বেলা একটা তখন, তাঁর নাকে অক্সিজেনের টিউব, তাঁর তৃতীয়া কন্যা মীরা পর পর তিনটি পিল খাওয়াচ্ছিল, শেষ পিলটি তাঁর সামনে ধরে মীরা বলল, বাবা, এই পিলটাও খেয়ে নাও। সজনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, আবারও পিল? এ যে পিল পিল করে পিল খাওয়াতে শুরু করলি। লিখতে বসে মনে হচ্ছে জীবনকে কেউ নেয় হাসির সঙ্গে—কেউ নেয় বেদনার অশ্রুর সঙ্গে; সজনীকান্ত জীবনে সুখ দুঃখ সব কিছুকে হাসির মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে চেয়েছেন—ব্যক্ত করতেও চেয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি পূর্ণ জ্ঞানে ছিলেন, কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণার একটা বায়ুশূন্য আবরণপাত্র দিয়ে মৃত্যু তাঁর হাস্যোজ্জ্বল জীবন-দীপশিখাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল বলে আমরা তা দেখতে পাই নি।

যাক্‌, যে কথা বলছিলাম, বঙ্গশ্রীতে আলাপের মাস তিনেক পর একদিন আমার নিজের ব্যয়ে প্রকাশিত প্রথম বই চৈতালি ঘূর্ণীর দপ্তরী বঙ্গশ্রী আপিসে এসে আমাকে ধরলে। সে বইগুলি সবই জুস বাইণ্ডিং করে রেখেছে—তার দরুন সে ৬০৲ টাকা পাবে, তার সেই টাকা চাই, না পেলে—বই বাতিল কাগজের দরে বিক্রী করে দেবে। কয়েকটা অপমানজনক কথাও বলেছিল। আমার কাছে টাকাও ছিল না, উত্তরও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সজনীকান্ত অন্তরাল থেকে কথাটা শুনে ফেলেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দপ্তরীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, আপনি সঙ্কুচিত

হবেন না তারাশঙ্করবাবু—আজ থেকে আমি আপনার পাবলিশার হলাম। বইয়ের ভার আমার রইল।

সেদিন তিনি পৃষ্ঠপোষক থেকে আত্মীয় হয়েছিলেন আমার। বয়সে বড় ছিলাম আমি—মুখ ফুটে অনেকের মত সজনীদাদা বলতে পারি নি। কিন্তু সম্ভ্রমে আচারে তাঁকে জ্যেষ্ঠের সম্মান দিয়েছিলাম। তিনিও সহজভাবে নিয়েছিলেন। এমন ঘটনা শুধু আমার সম্পর্কেই ঘটে থাকলে এটা সজনীকান্তের চরিত্রগুণ বলতাম না, এটা সর্বজনীন পরিচয়ের অঙ্গ হতে পারত না। কিন্তু কিছু কাগজ দৈবক্রমে আমার চোখে পড়েছে যাতে দেখেছি অনেক সাহিত্যিক তাঁর কাছে এইভাবেই ঋণী। এর মধ্যে দু-একজন—তাঁদেরই মধ্যের দু-একজন যাঁদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন।

সজনীকান্তের পরিচয়ের সম্মুখের আর একটা আবরণ উঠে গেল।

এর পর ক্রমে ক্রমে নিকটে এসে বন্ধু হয়েছি। তাঁর সঙ্গে চরিত্রগত অমিল আমাদের বন্ধুত্বের পথে অন্তরায় ছিল। তিনি হাসির মানুষ—আমি তার উল্টো। বেদনার কান্নার সঙ্গেই জীবনকে গ্রহণ করেছি, কখন তা বলতে পারি না, হয়তো বা জন্মলগ্নে। তিনি বাক্যে রসিক ছিলেন, ভোজনে রসিক ছিলেন, উল্লাসের প্রকাশে রসিক ছিলেন; আমি তা ছিলাম না—আমি তা নই। কিন্তু তবুও বন্ধু হয়েছিলাম, সম্ভবত অতিক্রম করেছিলাম, বাইরের সব কিছুকে।

হঠাৎ একদিন আমাকে ডাকলেন, বড়বাবু বলে।

প্রশ্ন করলাম, কেন? এ নাম কেন? রসিকতা?

না। তুমি বড় হয়ে গেছ বলে!

আমি হেসে বলেছিলাম, তা হলে তুমি ছোটবাবু।

খুব ভাল।

বাংলাদেশের অনেকেই এ নাম জানেন। এই স্বীকৃতি—এ কি আমি পারি? বা আর কজনে পারে? যাক্। সজনীকান্তের এত কাছে এলাম যে, তাঁর ভালমন্দ সবকিছু আমি দেখলাম—দেখতে পেলাম। দোষ তাঁর ছিল। নির্দোষ মানুষ সংসারে কজন? কিন্তু গুণ, আমি দেখেছি, যাচাই করেছি, সে অনেক এবং তা সুদুর্লভ। এত গুণের মানুষ—বর্তমানকালে বেশী নেই। তবে সাহিত্য-বিচারক, সাহিত্য-প্রেমিক হিসাবে তাঁর দোসর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। শনিবারের চিঠির দায়িত্বে—সেকালে এবং একালেও চিঠিতে প্রকাশিত বহু কটু প্রবন্ধের দায় তাঁর উপর বর্তেছে, বেনামী অনেক প্রবন্ধের লেখক বলেও তিনি গণ্য হয়েছেন এবং পুরাতন নূতন অনেক সাহিত্যিকের কাছে অপ্রীতিভাজনও হয়েছেন কিন্তু তিনি কখনও এ লেখা আমার নয় বলে বেনামীর নাম প্রকাশ করে দেন নি; তাঁর কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের উপরে বা নীচে লিখে দেন নি, মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন; এ সবই তাঁর দায়িত্বজ্ঞানের লক্ষণ। কিন্তু অনেক সাহিত্যিকের, যাঁরা তাঁর উপর বিরূপ, তাঁদের সম্পর্কেও তাঁর কাছে অনেক প্রশংসা শুনেছি।

তাঁরা কাছে এলে একজন সত্যকারের সাহিত্যরসিক ও মানুষ হিসাবে একজন উদার মানুষকেই পেতেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁর মৃত্যুর দিন বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি ঘটনার কথা বললেন। তারই মধ্যে সজনীকান্তের বিচিত্র সত্য চরিত্র দিনের আলোর মত প্রকাশ পাবে। প্রেমেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন অনেক। কিন্তু বঙ্গশ্রী সম্পাদনার ভার নিয়ে—তিনি নিজে গিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্রের কাছে, শৈলজানন্দের কাছে। বঙ্গশ্রীর আসরে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রীতি গাঢ় হয়। এ কালেও টালার বাড়িতে প্রেমেন্দ্রকে নিয়ে তাসের আসর পেতেছেন। পরস্পরে সম্বোধন করেছেন 'তুই' বলে। সম্প্রতি মাস দুয়েক আগে বেথুন স্কুল মাসিকপত্রের রবীন্দ্র-সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র একটি লেখা দিয়েছিলেন। সেই লেখা নিয়ে সজনীকান্ত সংবাদ-সাহিত্যে প্রেমেন্দ্রকে শরাঘাত করলেন। প্রেমেন্দ্র আমাকে বললেন, ভাবছিলাম একদিন গিয়ে খুব বলে আসব। হঠাৎ রেডিও থেকে একটি প্রোগ্রামের অনুরোধপত্র পেলাম। বিষয়টা কবির লড়াই। প্রতিপক্ষ সজনীকান্ত। তিনি টেলিফোন করলেন রেডিও অফিসে। এতে তাঁকে কেন টানা হয়েছে? কর্তৃপক্ষ বললেন, সজনীকান্ত বলেছেন প্রেমেন্দ্র ভিন্ন অন্যের সঙ্গে তিনি লড়বেন না। সজনীকান্তকে টেলিফোন করলেন প্রেমেন্দ্র। সজনী বললেন, গাল খেতে হয় তোর গালাগাল খাব;

অন্তের সঙ্গে লড়ব না। প্রেমেন্দ্র এর পর প্রশ্ন করলেন, আমায় 'চিঠি'তে এসব কি বলেছিস? সজনী বললেন, তুই এসব লিখেছিস কেন? কয়েকটি বাদানুবাদের পর টেলিফোনের দুই প্রান্তে দুটি কণ্ঠের হাস্যরোল উঠল। তারপর প্রেমেন্দ্র বললেন, তা হলে বিষয় স্থির রইল আধুনিক কবিতা। তুই স্বপক্ষে আমি বিপক্ষে। বিচিত্র সজনীকান্তের এই বিচিত্র পরিচয়। কবি সজনীকান্তের পরিচয় দেবার যোগ্য স্থান এ নয়, সে পরিচয় দেবার যোগ্য পাত্রও আমি নই। তবে রাজহংস, মানস সরোবর আমার প্রিয় কাব্যগ্রন্থ।

আমাকেও সজনীকান্ত এবং তাঁর কাগজে অন্যে কটূক্তি করেছেন। এবং হঠাৎ দু-একদিন পরই এসে ডেকেছেন, বড়বাবু! আমি উত্তর দিয়েছি—এস ছোটবাবু।

এর পর বড়বাবু থেকে একদিন তিনি আমাকে ডাকলেন বড় ভাই বলে। সে তাঁর পরিবারে একটি সঙ্কটের দিন। আমি গিয়ে পড়েছিলাম। এবং সে সঙ্কট উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিলাম। যে মুহূর্তে সঙ্কট উত্তীর্ণ হন সেই মুহূর্তে আমাকে তিনি বড় ভাই বলে প্রণত হতে দ্বিধা করলেন না। এইভাবে যে বৃহৎ—সম্মানোন্নত মস্তককে ঋণ স্বীকার করে নত করতে পারে তার মত বলিষ্ঠ বৃহৎ তো শুধু বৃহৎই নয়—সে মহৎ।

মৃত্যুব্যাধি যেদিন রাত্রে তাঁকে আক্রমণ করলে, শুক্রবার সরস্বতীপূজার রাত্রে। তখন রাত্রি বারোটা। আকস্মিক যাঁরা বলবেন তাঁরা তাই বলুন, আমি বলব কারও-বা কোনকিছুর প্রচ্ছন্ন নির্দেশ বা চক্র; যাতে করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাঁর শয্যাপার্শ্বে। তাঁর গৃহচিকিৎসক অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন সেদিন, তাঁকে না পেয়ে তাঁর ছেলে আমাকে টেলিফোন করলেন আমার ছোট জামাই ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের খোঁজ করে। বললেন, বাবার অসুখ, বিশ্বনাথবাবু বাড়ি আছেন? তাঁকে কি—। আমি উঠে ছুটে গেলাম মেয়ের বাড়ি এবং জামাইকে নিয়ে গেলাম। সজনীকান্ত ডাক্তারকে চেয়েছিল, তার সঙ্গে আমাকে দেখে উল্লাসে আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমাকে বললেন, আমাকে আশীর্বাদ কর। মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। সেদিন রাত্রি দুটোর সময় তাঁকে কিছুটা সুস্থ দেখে ফিরে এলাম। সকালে উঠে গেলাম। বিকেলে গেলাম। শেষ মুহূর্ত কেন—শ্মশান পর্যন্ত তাকে অনন্তের পথে এগিয়ে দিয়ে এলাম। বারবার শুনলাম সে আমার অনুপস্থিত অবসরে বলেছে—বড়বাবু আমাকে সত্য সত্য ভালবাসে। বড় ভালবাসে। আমার ভালবাসায় নিঃসংশয় হয়ে যে তার উল্লাস তার মধ্যে তার একটি অযুক্ত কথা রয়ে গেছে। আমিও বড়বাবুকে বড় ভালবাসি।

এইটেই আমার পরম সান্ত্বনা।

হয়তো এই শেষটুকু ব্যক্তিগত ঘটনা ও কথা। সজনীকান্তের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও কীর্তির যে পরিচয় ও মূল্য লেখার মাধ্যমে দেশের কাছে নিবেদন করা কর্তব্য ও উদ্দেশ্য—তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও এই ব্যক্তিটির হৃদয় এইখানে পরম সত্যে উদ্‌ঘাটিত বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রতিষ্ঠার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী সজনীকান্ত, দুর্লভ নির্ভীকতার অধিকারী বলিষ্ঠ যোদ্ধা সজনীকান্ত, কবি সজনীকান্ত, পণ্ডিত সজনীকান্ত, অপরূপ হৃদয়ের অধিকারী সজনীকান্তের তুলনা করেছি আমি শুক্রগ্রহের সঙ্গে। বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক—যিনি দেবলোকের অন্যায়কেও সহ্য করতে পারেন না, শিষ্য এবং অনুগতের অন্যায়কেও ক্ষমা করেন না—সেই দীপ্ত জ্যোতিষ্ক আজ দিগন্তে অস্তমিত হয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করলেন।

তিনি আজ আমার জ্যেষ্ঠ—তাঁকে প্রণাম করি। তাঁকে সত্যই বড় ভালবাসতাম আমি।

[রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) হইতে পুনর্মুদ্রিত]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে কবে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে ১৯২২ সালে বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ আর আলাপ-পরিচয় ঘটে, পরে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ মিত্রতায় পরিণত হয়। আমরা একটু বিভিন্ন পরিবেশের মানুষ হলেও, আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব-সাম্য ছিল, সমান-ধর্মিতা ছিল যাতে ক'রে আমাদের দু'জনকে নিকট-আত্মীয় ক'রে তুলেছিল। সজনীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, যতদূর মনে হচ্ছে, 'প্রবাসী' আপিসে, আর তা স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর জামাতা ও আমার সতীর্থ সহকর্মী মিত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, এঁদের মাধ্যমে। বিলেতে থেকে ফিরে এসেছি, বয়স তখন বত্রিশের উপর, আমার সমধর্মীদের সঙ্গে যেখানে মেলা-মেশা করতে পারি, এমন ক্লাব বা আড্ডার অভাব। বিলেত যাবার পূর্বে আমাদের একটি মিত্র-গোষ্ঠী জমা হ'ত বালিগঞ্জে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে, আর সেখানে আসতেন স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, কিরণশঙ্কর রায়, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, আমার এক ছাত্র প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও জন কয়েক। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ির এই মিত্র-গোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছিল 'সবুজের দল', আর একে অবলম্বন ক'রে তিনি তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যিক পত্রিকা 'সবুজ-পত্র' বার করতেন, চৌধুরী মহাশয়কে মুখপাত্র ক'রে তখনকার ঠাকুর-বাড়ির 'বিচিত্রা' সভার সঙ্গে আমাদের সবুজের দলেরও একটু যোগাযোগ হয়েছিল। আর আমরা ক্রমে 'বিচিত্রা'রও সদস্য ব'লে গণ্য হই। তার পরে আমাদের আর একটি ক্লাব গ'ড়ে উঠেছিল, সেটির কোনও নাম ছিল না। তবে আমরা একে দুটো নামে অভিহিত করতুম,—নাম ছিল না বলে 'বিনামা' ক্লাব, আবার সোমবার দিন এই ক্লাব বসত বলে একে 'মন্-ডে' ক্লাবও (Monday Club) বলা হ'ত। সদস্যদের এক একজনের বাড়িতে এক এক সপ্তাহে এই ক্লাবের অধিবেশন বসত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কালিদাস রায়, কিরণকুমার সান্যাল আর আরও অনেকে এর সদস্য ছিলুম। ১৯১৮ সালের পরে এই ক্লাবটির অস্তিত্ব লোপ পেলে, আমরা অনেকেই বিদেশে গেলুম, অনেকে কার্যান্তরে জড়িয়ে পড়লুম।

১৯২২ সালের পরে, দেশে ফিরে এসে একটি আড্ডার বা ক্লাবের অভাব বড়ই অনুভূত হ'ল। সাবেক কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিট্যুট, যেখানে শিশির ভাদুড়ীকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের কলেজ-জীবনে আর তার কিছু পরে পর্যন্ত একটি লক্ষণীয় মিত্রগোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছিল, সেখানে আমরা বয়স্কদের দলে প'ড়ে গিয়েছি। এমন সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকার আপিসে বিকালের দিকে আমাদের একটি আস্তানা পাওয়া গেল। এবং সেটি হ'ল 'প্রবাসী'র অন্যতম সহকারী সম্পাদকরূপে তখন 'প্রবাসী'র অন্যতম সাহিত্যিক কর্ণধার সজনীকান্তকে অবলম্বন ক'রে।

সন তারিখ ঠিক মনে নেই—তবে যখন সজনীকান্ত, যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় এঁদের সাহচর্যে সাপ্তাহিক একখানি ক্ষুদ্র পত্র বা পুস্তিকা 'শনিবারের চিঠি' নাম দিয়ে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন তখনই আমাদের এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী বা আড্ডা জমে উঠল। কি ভাবে কবে আমি ওই আড্ডায় পৌঁছে যাই, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার একজন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি, সে কথা ঠিক মনে পড়ছে না। অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, যোগানন্দ দাস ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী অধ্যাপক সুশীল দে ছিলেন, আর ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, আর কালিদাস নাগ। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সজনীই তার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সকলের কাছে যেন একটা সাধারণ গ্রন্থনসূত্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি সাহিত্যিক বা "কাব্যিক" subtlety অর্থাৎ সূক্ষ্মতম বা খুঁটিনাটি কখনও বুঝতুম না, জানতুমও না, আমি একটু downright অর্থাৎ সাদাসিধে ধরনের মানুষ ছিলুম। সাহিত্যে আধুনিকতার আর বস্তুনিষ্ঠতার নামে তখন বাংলাদেশে যে পঙ্কিলতা আর নীতিবোধের অভাব দেখা দিচ্ছিল, আর সংক্রামক ব্যাধির মত যা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তা দেখে আমি আরও পাঁচজনের মত অস্বস্তি বোধ করছিলুম। সজনীকান্ত যেন আমাদের এই মূক অস্বস্তিকে মুখর প্রতিবাদে এমন কি বজ্রনির্ঘোষ বিক্ষোভ-পূর্ণ ধিক্কারে পরিণত করে তুললেন—আমাদের মনের কথা শনিবারের চিঠির মাধ্যমেই যেন ভাষা পেল। আমাদের ভাবের ভাবুক একজন সহৃদয় অথচ রসজ্ঞ সাহিত্যিক মিত্রকে যেন আমাদের পুণ্যফলেই পেয়ে ছিলুম।

তারপরে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে। সজনীকান্তের সাহিত্যিক নানামুখিতার প্রমাণ আমরা দিনের পর দিন ধ'রে পেতে থাকলুম, সাহিত্য-বিষয়ে তার অনন্যসাধারণ "কারয়িত্রী প্রতিভা" আর "ভাবয়িত্রী প্রতিভা" আমাদের যেমন বিস্ময় উৎপাদন

করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তার বলিষ্ঠ মনন নির্ভীক আলোচন আর কর্মকুশল সংগঠন, এ সব দেখে আমাদের তেমনই অদ্ভুত বলে মনে হ'ল। সজনীকান্ত নিজের চারিত্রিক সুজনতায়, আর মিলবার আর মেলাবার বিধিদত্ত শক্তি হেতু বন্ধুবান্ধব পরিচিত সকলেরই কাছে প্রিয় হলেন—কিন্তু তাঁর নৈতিক একটা দৃঢ়তা ছিল সাহিত্যধর্ম পালন বিষয়ে, সেই দৃঢ়তার জন্য অপ্রিয় সত্য ভাষণে তিনি কখনও বিরত হন নি। এইজন্য জীবনের পথ অনেক সময়ে তাঁর পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাঁর সাহিত্যিক আর সামাজিক ভাবশুদ্ধি, যাঁরা ব্যক্তিগত কারণে তাঁর উপর হয়তো প্রথমটায় বিরূপ হয়েছিলেন, শেষটায় তাঁদেরও মনে পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছিল।

সজনীকান্ত বাঙালীর ইতিহাসে কতকগুলি কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অবশ্য তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনি ছিলেন সাহিত্যকার ও সাহিত্য-রসিক কবি ও লেখক, সাহিত্যিক রস-সর্জনার ক্ষেত্রে সজনীকান্তের প্রতিভার দীপ্তি নানা দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তিনি একদিকে ছিলেন বিরাট শক্তিসম্পন্ন কবি, অন্য দিকে ছিলেন আবার দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবুক—একাধারে সাহিত্যের ধারক ও বাহক। এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের অভিমত এই যে, সজনীকান্তের সাহিত্য-ধর্ম মুখ্যতঃ ছিল কবিরই ধর্ম—সত্য-দর্শনের সঙ্গে সত্যের প্রকাশ। তিনি যদি কেবল তাঁর কবিতাগুলি রেখে যেতেন, তা-হলেও কেবল তার-ই জোরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু তারও বাড়া তিনি ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গ-রচনায় বোধ হয় বাংলা দেশের এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে সমান মর্যাদা পাবার যোগ্য। তিনি ঔপন্যাসিক ছিলেন, ছোট গল্পও লিখেছেন, সংখ্যায় কম হলেও তাঁর এই রচনাও বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব বিশিষ্ট স্থান ক'রে নিয়েছে। কিন্তু বাঙালীর সাহিত্য আর সমাজ নিয়ে তিনি যে নিবন্ধগুলি দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলির মূল্য অনেক। সজনীকান্ত কেবল যে সাহিত্যিক সুনীতি ও সুরুচি রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তা নয়, সাহিত্যের আলোচনাও যাতে সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ হয় আর উপলব্ধ তথ্যের আধারে স্থাপিত হয় সেদিকে তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আর বিশেষ ক'রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব আর বিকাশের আলোচনায় তিনি উত্তরকালে সম্পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন। দিব্যশক্তিসম্পন্ন কবি ও সাহিত্যরসিক সজনীকান্ত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে কিছু কম ছিলেন না। কবিত্ব-শক্তির মাধ্যমে উপলব্ধ রস-বস্তু আর বস্তুনিষ্ঠ একান্তপরিশ্রমলব্ধ ঐতিহাসিক সত্তার বোধ—এক কথায়, এই তত্ত্ব আর তথ্য, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আমরা সজনীকান্তের কৃতিতে পাই। কবি সজনীকান্ত, সমালোচক সজনীকান্ত, সাহিত্যধর্মের সংরক্ষক সজনীকান্ত, দুর্নীতির জাতশত্রু সজনীকান্ত, ঐতিহাসিক গবেষক সজনীকান্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে সংগঠক ও সংস্থা-পরিচালক সজনীকান্ত—তাঁর জীবনের কত বিভিন্ন প্রকাশ আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে আছে।

সজনীকান্তের বহুমুখী প্রতিভার কথা তাঁর তিরোধানে ততটা মনে আসছে না যতটা তাঁর সঙ্গে আমাদের মিত্র-সুলভ হৃদ্যতার কথা। তিনি একজন কৃতী সাহিত্যিক পুরুষ ছিলেন, সাহিত্যে রুচি ও নীতির লঙ্ঘনকারীরা তাঁকে যমের মত ভয় করত, তিনি বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজে প্রায় সকলকারই অমায়িক মিত্র হয়েছিলেন। তিনি নিজের সহকর্মী আর অনুগামীদের অনেকের মধ্যে খনিগর্ভস্থ হীরকের মত তাঁদের সাহিত্যিক বিভূতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, দেশের ও দশের সামনে তাঁদের তুলে ধরতে সাহায্য করেছিলেন, নিজে জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন, আর শেষে সেই জীবন-সংগ্রামে জয়ীও হয়েছেন—এ সব কথা তেমন মনে আসছে না, এ গৌরবময় জীবনের দৃশ্যপট যেন আমাদের চোখের সামনে কুহেলী দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে সজনীকান্তের সদা-হাস্যময় মুখ, তাঁর চোখের কোণে কৌতুকের ইঙ্গিত, তাঁর প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বের প্রকাশক তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর সরল সহজ অনাড়ম্বর ভঙ্গী, সহৃদয়তার মিত্রতার প্রতীকস্বরূপ তাঁর প্রতিমূর্তি।

আপার সার্কুলার রোডে সেদিনকার 'প্রবাসী' আপিসের আবেষ্টনী এক রকম ছিল, পরে সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ভার নিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটে 'বঙ্গশ্রী'-কার্যালয়ে তাঁর নিজের বিশিষ্ট ক্ষেত্র গ'ড়ে তুললেন, সেখানে দিনের পর দিন কয়েক বৎসর ধরে আমাদের অবাধ মেলা-মেশা, বিচার-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা-মস্করা, গম্ভীর বিষয়ে চিন্তা, এ-সব এখন আমাদের যেন আকুল করে তুলছে। তার পরে 'শনিবারের চিঠি'র আসর শ্যামবাজারে ফড়েপুকুরে স্থানান্তরিত হ'ল; কিন্তু সেই দু'টি ছোটো ঘরে 'শনিবারের চিঠি'কে অবলম্বন ক'রে—যে-দলে আমরাও ছিলুম—বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সচ্চিন্তা আর সুগুণের পরিপোষণের জন্যে কতটা না জ্ঞান আর রসবোধ নিয়ে মাতৃভাষার সার্থক সেবা চ'লেছিল! এ-সব এখন অতীতের বস্তু—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও তার সাক্ষ্যরূপে বর্তমান রয়েছি, আর আমরা যারা সজনীকান্তের মিত্র আর সমানধর্মা, তাদের কাছে, এই সব কথা মনে হলে, সজনীকান্তের স্মৃতি যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, আর তাঁর প্রতি আমাদের মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে প্রীতি স্নেহ শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়ে প্রাণ-মনকে আপ্লুত করে তোলে।

সজনীকান্ত-স্মরণে

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

অনন্তের কোন মহা কোণে ;
শব্দ নাই গন্ধ নাই স্পর্শ নাই যেথা,
নাহি যেথা আলোক, নাহিক অন্ধকার,
প্রেম হিংসা ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নাই,
আমি নাই তুমি নাই আর কেহ নাই।
কিন্তু আছে নব এক প্রাণের স্পন্দন
শিহরিত যার ছন্দে সে মহা শূন্যের
কায়াহীন কলেবর ; ধ্বনিত যেখানে
শব্দহীন স্বরের রণন ; উদ্ভাসিত কিবা
কোন বর্ণে ; কেহ নাহি শুনিতে দেখিতে।
মহা সিন্ধুতটে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র শিশু যথা
মা'র হাত ধরি দেখে কত বড়, কত দূর,
শেষ নাই যার ; গভীর গর্জনে
যার জলধারা চরাচরে গ্রাসিবে বলিয়া
ধেয়ে চলে উন্মাদের উদ্দাম আবেগে ;
কিন্তু, থেমে যায় শিশুর চরণতলে ;
মা তাহার হাত ধরি আছেন বলিয়া।
তেমনি আমরা আছি অনন্তের কূলে ;
স্মৃতি শ্রুতি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস
মাতৃরূপ ধরি' আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে
করিবারে আশার সঞ্চার, নূতন ইঙ্গিতে।
বলে আমাদের "শুন, শুন শিশু,
যে গন্ধ বহিয়া যায় বাস্তবের পরপারে
তারে নাহি পারে ধরিবারে বুঝিবারে
মানব-চেতনা ইন্দ্রিয়ের পথে চলি'।
যে বর্ণ চলিয়া গেছে আলোকের পথে
আলোকের সীমানা ছাড়িয়া আরো দূরে,
সে বর্ণ কি পারে তত দূরে গিয়া
আমাদের এ অন্তরে জাগাইতে
কোনো সাড়া ? কিন্তু তাই বলি'
সে বর্ণ কি নাই ? অনুভূতি যত
দূর হতে আরো দূরে, সূক্ষ্ম হতে
সূক্ষ্মতর রূপ ধরি' ক্রমশঃ সেথায়
হয় অনুভূত ; যেথা নাই জড় অনুভূতি
জড় চেতনার অবয়ব। প্রাণ যেথা
ইন্দ্রিয়বর্জিত নব চেতনার রসে
পূর্ণতম আনন্দের অবসাদে
নিমজ্জিত নূতন আবেশে।"

মা যাহা বলিল মোরে সেই কথা
শুনিয়া, তাহার মর্ম মনের নিভৃত কোণে
যত্নে রাখি অল্পে অল্পে নিবিড় আগ্রহে,
দেখিয়াছি বিচারের বিশ্লেষণে যেন
অণুবীক্ষণের যন্ত্রপটে, দিব্য চক্ষু মেলি।
দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, লভিয়াছি স্পর্শ প্রাণে ;
মর্মে মর্মে লব্ধ সে ঘনিষ্ঠ অনুভূতি।
গন্ধ আছে, বর্ণ আছে, শব্দ আছে
আর আছে স্পর্শ, স্বাদ বহু রসবোধজ্ঞান,
ইন্দ্রিয়ের প্রাকারের পরপারে।
মানব-চেতনা, বোধ, মানুষের জ্ঞান
যাহা দিয়া গড়া হয় আকারে প্রকারে ;
সে সকল উপাদান বাস্তবের সীমানার পারে
থাকিতে পারে না আর ; মিলে যায়
অবাস্তবে নব রূপ ধরি। তার বর্ণ,
তার গন্ধ, স্পর্শ, স্বর, চেতনার নব ছন্দে
নব তালে, নব রসে অপরূপ।
অরূপের কিবা রূপ, কি বর্ণনা, কে বলিবে ?

মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার উত্তরোত্তর আরও বিকাশ ও উন্নতির পথ খুলিয়া যায় বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। ইহা ইংরেজীতে যাহাকে wishful thinking অথবা কামনাজাত চিন্তার ফল বলে তাহাই মাত্র অথবা এই বিশ্বাসের মূলে বহু যুগের সাধকদিগের গভীর সত্যানুসন্ধান-চেষ্টা নিহিত আছে, এই প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে ? শত শত ত্যাগী মহাপুরুষের সত্যবিশ্লেষণলব্ধ যে বিশ্বাস তাহাকে শুধু কামনাজাত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না এবং বিজ্ঞানের যে বস্তুবিচার তাহাকেও অস্বীকার করিয়া কল্পনাকে ধ্রুবতারা করিয়া মানবাত্মার অমরত্ব স্থির নিশ্চয় করিয়া লওয়াও পূর্ণরূপে ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। মানবাত্মা নরদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দেহের জন্ম, পরিপুষ্ট পূর্ণায়তন রূপ ধারণ ও তৎপরে দেহত্যাগ অবধি যে ভাবে নিজ উন্নতি ও গঠনের কার্য সাধন করে তাহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে ও উপলব্ধি করিতে পারি। বিজ্ঞানও এই ক্ষেত্রে আমাদিগকে দেহ ও মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মানবমন ও ব্যক্তিত্বের গঠন ও পরিণতির কথা উত্তম ও গভীরভাবে বুঝিতে সাহায্য করে। কিন্তু নরদেহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে ও দেহত্যাগ করিবার পরে মানবপ্রাণ বা আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না

এবং থাকিলে তাহার স্বরূপ ও স্বভাব কী সে কথা বিজ্ঞান আমাদিগকে জানিতে সাহায্য করে না। ঋষিদিগের মতে বিজ্ঞান শুধু আমাদিগের জ্ঞানকে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু অবধি নিজ পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যে অমরত্বের স্বরূপজ্ঞান তাহা বিজ্ঞানের পরের কথা ও তাহাই সত্য বিদ্যা অথবা সত্য জ্ঞান।

আমরা অবশ্য সহজে যাহা বোধগম্য হয় তাহাই অবলম্বন করিয়া চলিতে চাহি। অর্থাৎ নরজন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে মানবাত্মা অবস্থিত থাকে কি না এবং থাকিলে কি রূপে থাকে এই কথার বিচার সহজসাধ্য নহে এবং তজ্জন্যই এই কথার আলোচনা বুদ্ধিমানজনের মধ্যে প্রচলিত নাই। কারণ বুদ্ধি সততই কার্যকরী ও অর্থোপার্জনের অস্ত্র বলিয়া পরিচিত; এবং সেই বুদ্ধিকে যদি কেহ হাট-বাজার হইতে দূর-দূরান্তরে অবাস্তব সত্তা সকলের আসরে গমন করিয়া নূতন নূতন অজানা ও অচেনার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে নিযুক্ত করে তাহা হইলে সেইরূপ প্রচেষ্টা বুদ্ধির অপব্যয় বলিয়া প্রচার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবাত্মা কোন বস্তুনিচয়ের অপরূপ সংমিশ্রণের ফল মাত্র এবং সেই সকল বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ কোন কারণে নষ্ট হইয়া যাইলেই মানবাত্মা তৎক্ষণাৎ লোপ পায় এ কথা ভাবিলেও বুদ্ধির চরমে পৌঁছানো হইল তাহা মানব-বুদ্ধিই মানিতে চাহে না। বস্তুর অনন্ত আকরের আশ্রয় যে সীমাহীন, সময়হীন, রূপগুণহীন চির-অস্তিত্বের প্রবাহ, যাহার মধ্যে সকল বস্তু, সকল রূপ, সকল গুণ ও সর্ব সম্ভাবনা চিরতরে নিহিত, সেই অস্তিত্বের প্রবাহের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নাই এ কথা মানা চলে না।

ঋষিদিগের মতে সকল প্রাণ শেষ অবধি সেই পরম প্রাণের প্রবাহে যাইয়া মিলিত হয়। আমরাও এই কথাতেই বিশ্বাস করি।

এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগ্রত হয় যে বিদেহী আত্মা নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়াই প্রাণের সীমাহীন সময়হীন ক্ষেত্রে চিরতরে অবস্থান করে অথবা তাহার নিজত্ব ও ব্যক্তিত্বের কোন পরিবর্তন ঘটে। প্রাণের ও দেহের ক্ষেত্রে, এমন কি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ নক্ষত্র সকলের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সকল কিছুরই একটা আরম্ভ ও একটা পরিণতি আছে। এই নিয়মের সহিত ছন্দ মিলাইয়া সম্ভাবনার কল্পনা করিলে দেখা যাইবে যে বিদেহী আত্মা শুধু নিজ পার্থিব ব্যক্তিত্ব ও নিজত্ব লইয়া অসীমে বিরাজ করিতে পারে না। দেহমুক্ত হইলেই তাহার একটা প্রসারের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। এবং বাস্তবের বন্ধনমুক্তিও অনন্ত বিস্তার ও অভিব্যক্তির পথ খুলিয়া দেয়। সে বিস্তার ও প্রসার বাস্তব স্থানকালপাত্রকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্ত হয় ও তাহার ফলে মানবাত্মা কী রূপ ধারণ করে তাহার কল্পনা এক নতুন উন্মাদনার শিহরণ মানবপ্রাণে জাগাইয়া দেয়। ঠিক যে কি হয় তাহা বলা যায় না। একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতির ও অতি বিস্তৃত প্রাণবত্তার কথা, যাহার বর্ণনা সম্ভব নহে, কেন না কোন্ তুলনা অথবা কোন্ উপমা দিয়া সে বর্ণনা করা যাইতে পারে?

আজ যখন আমরা পরলোকস্থিত আত্মার সহিত মিলিত হইবার আগ্রহে আকুল, আমরা তখন সসীম অস্তিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়াও শুধু কল্পনায় সেই অসীম ক্ষেত্রে বিচরণক্ষম হইতে পারি যদি আমরা নিজের নিজের ক্ষুদ্র নিজত্ব ও ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ করিয়া রূপগুণহীন সেই অনন্ত প্রাণপ্রবাহে অবগাহন করিতে পারি। ফুল নিজ রূপ ও আকার ত্যাগ করিলেও তাহার সুগন্ধ যেমন বহুকাল বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিয়া আকাশকে মধুময় করে, বিদেহী আত্মাও তেমনই অনন্তকাল নিজ প্রতিভা বিশ্বের প্রাণপ্রবাহে মিলাইয়া দিয়া যুগে যুগে নিজ বর্ণ, নিজ সুর ও নিজ ছন্দ দিয়া সৃষ্টিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া থাকে।

সজনীকান্ত সবল-আত্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সকল চেষ্টা সতেজ ও বলিষ্ঠ ছিল। তিনি নিজ প্রতিভার বলে যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে তাঁহার আত্মা বস্তুবন্ধনমুক্ত হইয়া নবরূপে প্রসার ও বিস্তার লাভ করিয়া নিজ আদর্শের প্রসার ও বিস্তারের কারণ হইবে। এই পৃথিবীর ভাষায় তাঁহার সঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভ করিতে আমরা আর পারিব না, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার আস্বাদন আমাদিগের মধ্যে চিরজাগ্রত থাকিবে।

বঙ্গ-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন যুগে আমরা যে সকল নব নব প্রেরণার প্রকাশ লক্ষ্য করি তাহাতে দেখা যায় যে সাহিত্যের স্বরূপ যুগধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। কোন যুগে পাশ্চাত্ত্যের সংঘাত প্রবল হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে এক নূতন পথে চালাইয়াছে, কোন যুগে আবার নিজ কৃষ্টি ও নিজ আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর শক্তিতে বঙ্গ-সাহিত্যকে অন্য পথে লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-যুগে ভারতীয় সভ্যতার নবজীবন লাভ ও সংস্কৃত সাহিত্যের মহাযুগের আদর্শগুলিকে নূতন প্রাণ দান করিবার চেষ্টা শুধু সাহিত্যে আবদ্ধ ছিল না, চিত্রকলা সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতিতেও সেই প্রগতি প্রতিফলিত হইয়াছিল। ওই যুগের বক্ষেই আশ্রয় লইয়া বহু নির্বীর্য লেখক কষ্টকল্পিত ও কৃত্রিম প্রেরণার অনুভূতির অভিনয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে এক-সময় সত্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে অতি নিম্নে নামাইয়া দিয়াছিলেন। সেই একই সময়ে আমাদের জাতীয় চিন্তা-ধারার মধ্যে বহু নিম্নস্তরের বিদেশী উপ-আদর্শ আসিয়া পড়িয়া জীবনপ্রবাহের স্বচ্ছ ভাব নষ্ট করিয়া সকল কিছুই ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছিল। নবজাগ্রত "এছলামি"

সজনীকান্ত দাস

হুমায়ুন কবির

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সজনীবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি তখন 'প্রবাসী' সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য, আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। আমার দুয়েকটি লেখা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ হবার পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং তিনি যে সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন তা আজও মনে আছে।

'শনিবারের চিঠি' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সারা বাংলাদেশে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আজকের দিনে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁদের অনেকেই সেদিন সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। তারুণ্যের চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্যও তাঁদের রচনায় অনেক সময় প্রকাশ পেত, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দীপ্তিতে তাঁদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল বলে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধ আলোক সব সময়ে চোখে পড়ত না। 'শনিবারের চিঠি' সেদিনকার আধুনিকতাকে যে ভাবে রোধ করতে চেয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা স্মরণীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা আক্রমণে রূপান্তরিত হত, কিন্তু সাহিত্যের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হয়তো সে তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের প্রয়োজনও ছিল।

সেদিনকার দ্বন্দ্ব-কোলাহল আজ পুরনো স্মৃতি। সে যুগের বিরোধীদের মধ্যে অনেকে আজ পরস্পরের অন্তরঙ্গ বান্ধব, সেদিনকার বন্ধুদের অনেকের মধ্যে নতুন মতভেদ দেখা দিয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে সাহিত্যের যে সেবা সজনীবাবু করেছেন, তা ছাড়াও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে তাঁর দান স্মরণীয়। বর্তমানের বহুবিস্মৃত এবং বিস্মৃয়মান সাহিত্যিকের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সজনীবাবুর চেষ্টা বাঙালী বিদগ্ধ সমাজের কৃতজ্ঞতার দাবি করে।

তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা দেশের যে ক্ষতি হল, তা সহজে পূর্ণ হবে না।

—

প্রগতি, তথাকথিত দেশসেবার ব্যবসায়, ইয়োরোপের বিকৃতমস্তিষ্ক হৃত যৌবন স্বাস্থ্যহীন শিল্পকলা, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও চালচলনের ধাক্কা প্রভৃতি তৎকালীন মানসিক বিকারসমূহের ফিরিস্তিতে প্রকটভাবে উপস্থিত ছিল। শনিবারের চিঠির অভিযান আমাদিগের জীবন-প্রবাহকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সত্য আকাঙ্ক্ষার পথে চালাইবার জন্য আরম্ভ হইয়াছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, চালচলন, কাব্য, সাহিত্য—এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রই সে অভিযানের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

সজনীকান্ত যখন আমাদের মধ্যে আসিলেন তখন শনিবারের চিঠি বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মোড়লদিগের মধ্যে একটা ভীষণ অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজদরবারে, দেশনেতাদিগের আখড়ায়, কাব্যের ঋালকে ও কৃষ্টির আসরে শনিবারে চিঠি তখন এক মহা দুর্মুখের ন্যায় সকল ঘাটোয়াল ও বুনিয়াদি দখলদারদিগকে নাড়া দিয়া বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শনিবারের চিঠির শক্তির প্রকাশ সজনীকান্ত ও মোহিত-লালের আগমনে প্রবলতর হইয়াছিল। সজনীকান্ত স্বভাব-কবি ও স্বভাব-স্বাধীন পুরুষ ছিলেন। অপরের পদচিহ্ন অনুসরণে তিনি চলিতেন না এবং তাঁহার দৃষ্টি কাব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ছিল। সজনীকান্ত বঙ্গসাহিত্যকে হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার প্রতিদান তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, কিন্তু যদি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সফলতা লাভ করে তাহা হইলে তাঁহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। জাতীয়-জীবনের যে বেখাপ্পা ভাব তাহা যদি কিছুটাও ছন্দোবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে তাঁহার সারা জীবনের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

—

স্রষ্টা সজনীকান্ত

যোগানন্দ দাস

ছাপার অক্ষরে সজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের শুরু শনিবারের চিঠিতে।

কিন্তু ছাপার আস্বাদ পাবার অনেক আগেই জন্ম নিয়েছেন কবি সজনীকান্ত—হাতের লেখায়, গোপন খাতায়।

শনিবারের চিঠিতে জন্ম হল সমালোচক সজনীর। সদ্যোজাত শনিবারের চিঠির যোদ্ধা ও বিদ্রোহী আদর্শে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, রবি মৈত্র, অশোক চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীল দে প্রভৃতি বিশাল শনিমণ্ডলের প্রবল প্রভাবে, স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব-কবি সজনীকান্ত একটি বিশিষ্ট চেহারা নিয়ে গড়ে উঠলেন সমালোচক সজনীকান্তরূপে, যোদ্ধা সজনীকান্তরূপে।

পরবর্তীকালে, মোহিতলালের পৃথক ও প্রবল প্রভাবে, সেই সমালোচক ও যোদ্ধা সজনীকান্তই আরও তীব্র জ্যোতি নিয়ে ফুটে উঠলেন ভিন্ন রূপে, চললেন ভিন্ন পথে।

আরও পরে, যখন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব এসে পড়ল সজনীকান্তের উপরে তখন সেই সজনী-মোহিতলাল-ব্রজেন্দ্রের ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত থেকে উত্থিত হলেন এক নূতন সজনীকান্ত—গবেষক সজনীকান্ত।

মারামারি হানাহানি দ্বন্দ্ব-কোলাহলে চাপা পড়লেন অনাবিল আনন্দের স্বতোচ্ছ্বসিত কবি সজনীকান্ত। যোদ্ধা সজনীকান্তের হুঙ্কার ভেদ করে মাঝে মাঝে ভেসে আসে কবি সজনীর ক্ষুব্ধ ক্রন্দনধ্বনি।

* * *

গবেষণা সমালোচনা পরিবর্তনশীল।

বিজ্ঞানের বড় বড় সিদ্ধান্ত আজ আছে, কাল বদলে যায়।

ইতিহাসের গবেষণা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, আগামীকাল নব নব তথ্যের সংযোজনায়, অভিনব তত্ত্বের দীপ্ত আলোকে একেবারে ভিন্ন দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়, নতুন তার চৌহদ্দি, নতুন তার দিগন্ত।

সমালোচনার ধারাই বদলে যায় যুগে যুগে। ভিক্টোরীয় যুগে সাহিত্য-সমালোচনা যে নীতির উপর দাঁড়িয়ে ছিল বিংশ শতাব্দীতে তার ভিত নড়ে গিয়েছে, আজ এসেছে আবার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী।

সমালোচক সজনীকান্ত, গবেষক সজনীকান্ত পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী।

তবে কোন্ সজনী স্থায়ী, কোন্ সজনী শাশ্বত?

* * *

ইংলণ্ডের ধনতন্ত্রে ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে সাম্যবাদে বিরোধ থাকতে পারে, বিরোধ আছে।

তবুও উভয়ের মিল কোথায়?

আজ সকল দ্বন্দ্ব সকল কোলাহলকে দাবিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের আসন রচিত হয়েছে যেখানে শেক্সপীয়রের রুশীয় অনুবাদ সংস্করণের পর সংস্করণ নিমেষে নিঃশেষ হচ্ছে।

মাঠে হাটে, পুকুরের ঘাটে, পথে পথে, পথ চলতে ঘাসের ফুলে ফুলে সজনীকান্ত যে কবিতালক্ষ্মীর দেখা পেয়েছিলেন, পাশের বাড়ির ছাদের মেয়ে, ভিজ্-ল্যাণ্টার্নের ক্যালেণ্ডার, আরও কত অজস্র কাব্য-উৎস যে সজনীকান্তকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, কোলাহল নেই, বিভিন্ন মতবাদের কলহ নেই, আছে শুধু নব নব সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ, সেই চিরন্তন জগতের কবি সজনীই স্থায়ী, শাশ্বত।

* * *

অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যখন অঙ্গনের বাইরে প্রাচীর ঘিরে শিবাকুল সারারাত চিৎকার করে, কলহ বিবাদ লাঠালাঠির কোলাহল চলতে থাকে, সেই সময়ে দূরে মানস-সরোবরের কূলে রাজহংস বসে নীর থেকে বিন্দু বিন্দু করে ক্ষীর সযত্নে সঞ্চয় করতে থাকে।

রাত্রি কাটে, অন্ধকার চলে যায়, কোলাহল থেমে যায়।

ক্ষীরের পাত্র সঞ্চিত থাকে, পিপাসুর পিপাসা নিবারণের জন্য।

সজনীকান্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শরীরটা ছিল অসুস্থ, তাই আর শ্মশানে যেতে পারলাম না, সবাই নিষেধ করল। সজনীকান্তকে পাঠিয়ে দিলাম। ফুলের বিছানায় শুয়ে চিরনিদ্রিত চিরনিশ্চিন্ত বন্ধু আমার চলে গেল। মুখে এতটুকু বিকৃতি নেই, বেদনার এতটুকু চিহ্ন নেই।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরছি। তারই লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ল। আমাকে দিয়ে সে তার কবিতা পড়াতে খুব ভালবাসত। কবিতার বই খাতা নিয়ে কতদিন সে ছুটে এসেছে আমার বাড়িতে, কতদিন টেলিফোনে ডেকেছে তার বাড়িতে যাবার জন্যে। আমি পড়েছি, সে চোখ বুজে শুনেছে। নিজে শুনেছে, স্ত্রীকে ডেকেছে—'সুধা, শুনে যাও। শৈলজা বড় ভাল পড়ে।'

তারই সেই অজস্র কবিতার মধ্যে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ল।

'কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার,
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ রস রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি। সেই আমি সংসারের জীব
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল
হবে না প্রকাশ কোনদিন।'

বড় দুঃখেই এই কথাগুলি লিখেছিল সজনীকান্ত। কারণ তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল—তার সত্য পরিচয় কেউ বুঝি জানল না। জানল শুধু সে একজন নিষ্ঠুর সমালোচক। সে শুধু বিগত যুগের শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যের লেখক ও সম্পাদক।

এ কথা বলছি শুধু এইজন্য যে শনিবারের চিঠির জন্ম-ইতিহাস আমি জানি। নিতান্ত খেয়ালের বশে কয়েকজন বন্ধুর একটি জমজমাট আড্ডা থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় বেরুলো ছোট্ট একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'পত্রিকা' না বলে তাকে 'চিঠি' বললেই ভাল হয়। কারণ তার আকারও ছিল ঠিক চিঠির মত। নজরুল তখন 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে তখনকার দিনের সাহিত্যের আড্ডায় বেশ আলোড়ন তুলেছে। এরই সূত্র ধরে মোহিতদার (স্বর্গত কবি মোহিতলাল মজুমদার) সঙ্গে নজরুলের একটু গোলমাল বাধল। গোলমালটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং ছেলেমানুষী। গোলমালটা বাধিয়েছিলেন মোহিতদাই। প্রত্যেক সত্যিকারের কবির মধ্যে একটি শিশু থাকে। কবি মোহিতলালের মধ্যে যে শিশুটি ছিল সেটি ছিল যেমন দুর্বিনীত তেমনি দুরন্ত। মোহিতদার মুখ থেকে 'কাঁচা কাঁচা বাখান্' (গালাগাল) শোনবার লোভে আমরা তাঁকে প্রায়ই খেপাতাম। সজনীকান্তও একদিন তেমনি এক খেয়ালের বশে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার 'প্যারডি' লিখে বসল।—"আমি ব্যাং, আমার লম্বা লম্বা ঠ্যাং।" 'প্যারডি' শুনে সে কী হাসি মোহিতদার! এ হাসি নজরুলের ওপর বিদ্বেষবশতঃ নয়। এমনিই ছিল মোহিতদার স্বভাব। 'কালিকলম' অফিসে বসে আমাদের মুখের ওপরই মোহিতদা বলতেন, 'গত জন্মে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলে ছাগল!' আমাদের 'ছাগল' বলে গালাগালি দিতেন, আর মুখ টিপে টিপে হাসতেন। আমরা কেউ কিছু মনে করতাম না। মনে করতাম না এই জন্যে যে, মোহিতদাকে খুব ভাল করে চিনতাম বলে। বড় ভাই ছোট ভাইকে যেমন তিরস্কার করে এও ছিল যেন ঠিক তেমনি। সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রথম সংসার। দ্বিতীয় সংসার ছিল তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। সজনীকান্তর সঙ্গেও বিরোধ তাঁর হয়েছে। ভালও বেসেছেন যত, গালাগালিও দিয়েছেন তত।

সেই মোহিতদার প্ররোচনাতেই সজনীকান্ত শনিবারের চিঠিতে নজরুলের কবিতার প্যারডি ছেপে বসল। ওদিকে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখবার জন্যে এক কপি শনিবারের চিঠি নিয়ে গেলাম নজরুলের কাছে। আমি বলবার আগেই দেখি প্যারডিটা সে মুখস্থ করে ফেলেছে। 'আমি ব্যাং, আমার লম্বা লম্বা ঠ্যাং।' বলছে আর হো

হো করে হাসছে। ইচ্ছে করছিল—সজনীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাই। কিন্তু তখন আর সেটা ঘটে ওঠে নি। ঘটেছিল অনেকদিন পরে। তারও সাক্ষী আছি আমি।

মাঝে একদিন নজরুল বলল, সজনীকান্তর সঙ্গে দেখা হল ট্রামে। সজনীবাবুই আমাকে কাছে ডেকে পরিচয় করলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী কথা হল?

নজরুল বলল, বিশেষ কিছু হল না। তক্ষুনি আমাকে নেমে পড়তে হল। আমাদের আস্তানায় তাকে একদিন আসতে বললাম।

তারও অনেকদিন পরে দুজনের দেখা হল। দেখা হল ভবানীপুরে হাজরা পার্কের কাছে একটা বাড়িতে। সে দিনটির কথা আমি জীবনে ভুলব না। প্রথমে দু হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন, তারপর দুজন দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে সে কী নৃত্য!

মনে হয়েছিল, মোহিতদাকে ডেকে এনে সেই দৃশ্যটি দেখাই। কিন্তু তা আর ঘটে ওঠে নি।

উপরি-উপরি দুদিন তারা সেই বাড়িতে ছিল সম্মানিত অতিথি হয়ে। একই ঘরে একসঙ্গে থাকা, খাওয়া, শোওয়া, হাসি, গল্প, গান আর হুল্লোড়!

এইটিই ছিল সজনীকান্তর সত্যিকার রূপ। প্রাণচঞ্চল, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল একটি মানুষ।

বাংলাসাহিত্যের একজন নির্মম নিষ্ঠুর এবং কঠোর সমালোচক বলে যে অখ্যাতি তার রটেছিল, সেটাকে সে তার অঙ্গের ভূষণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল শনিবারের চিঠির জাত বাঁচাবার জন্যে। এই পত্রিকাটি তার জন্মলগ্নে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল, যে রূপে সে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তার সেই রূপটিকে বজায় রেখেছিল সজনীকান্ত। সেইটেই কিন্তু শনিবারের চিঠির আসল রূপ নয়। ব্যঙ্গ-কৌতুকের একটি ছোট্ট পত্রিকাকে কোন্ যাদুমন্ত্রবলে সজনীকান্ত বাংলার একটি সর্বজনসমাদৃত অনন্যসাধারণ সাহিত্যপত্রিকার মর্যাদা দান করেছিল, পুরনো দিনের একখানি শনিবারের চিঠির দিকে তাকালেই সেকথা বুঝতে দেরি হয় না।

আজ সজনীকান্তর মহাপ্রয়াণের দিনেই এইসব কথা আমি ভাবছি—তার সেই কবিতার লাইনটি আমার মনে পড়ে গেল বলে—

'সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল
হবে না প্রকাশ কোনোদিন।'

বাড়ি ফিরলাম।

অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়ছে।

সেই সব কথাই ভাবছি বসে বসে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ধরলাম।

কে?

আমি অচিন্ত্য।

বললাম, সজনী মারা গেল।

অচিন্ত্য বলল, গিয়েছিলে নিশ্চয়ই?

বললাম, সেইখান থেকেই আসছি। শ্মশান পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার শরীরের জন্যে সবাই আমাকে ফিরিয়ে দিল।

অচিন্ত্যকুমার বলল, আমাকে কেউ একটা খবর পর্যন্ত দিলে না?

খবর পেলে কি করতে? আসতে?

শনিবারের চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যের অতি কঠোর সমালোচনা একাধিকবার ছাপা হয়েছে জানি বলেই ওকথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে অচিন্ত্য বলল, নিশ্চয়ই যেতাম।

আমি চুপ করে শুনে গেলাম। অচিন্ত্য বলতে লাগল, সজনীকান্ত ছিল আমাদেরই সময়ের মানুষ। চলে গেল। একবার শেষ দেখা দেখতাম তাকে।

গলাটা ধরা-ধরা। আন্তরিকতার স্পর্শ পেলাম।

বলল, আমাকে গালাগালি দিয়ে আমাকেও সে কম বড় করে নি। সে আমার বন্ধুর কাজই করেছে।

টেলিফোনটা নামিয়ে দেবার পর আর একটি দিনের কথা আমার মনে পড়ল। অচিন্ত্যকুমারের 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে'র প্রথম খণ্ড তখন বেরিয়েছে। বইখানি ছিল সজনীকান্তর টেবিলের ওপর। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পড়লে নাকি?

সজনীকান্ত বলেছিল, বড় ভাল লিখেছে। পড়ে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছি।

মহাস্থবিরের চিঠি

শঙ্কর ভাই,

সজনী সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছ, কি লিখব তাই ভেবে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এত শীগগির এত অকস্মাৎ ও যে চলে যাবে তা কখনও কল্পনাতেও আনতে পারি নি। কিন্তু দেখছি এই বিচিত্র দুনিয়ায় কল্পনাতীতেরই মরসুম পড়েছে।

সজনী আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। সুদূর অতীতে আমার জীবনের এক দারুণ দুর্দিনের সময় তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। আমি তাকে আগেই জানতুম—সেও আমাকে জানত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মুখোমুখি চেনা-জানা ছিল না। আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ঘটতে কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পর এক মিনিটও লাগে নি। পরিচয়ের পরেই প্রেমভাব—তারপরেই বন্ধুত্ব। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান কোন বাধাই ঘটাতে পারে নি। সে সময়টা তারও দুঃসময় ছিল, কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে "কুছপরোয়া নেই চালাও"—ভাবটা তাকে অভিভূত করতে পারে নি। তার চরিত্রের মধ্যে ঝড়ের মত সবকিছুকে উড়িয়ে দেবার বলিষ্ঠ ভাব সেদিন তার প্রতি আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিল।

বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে সে এসেছিল ঝড়ের মত ; আর প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল ঝড়ের মতন বেগে সে চলে গেল। তার সঙ্গে কত উৎসবে ও ব্যসনে মত্ত হয়েছি, আমার শোকতাপিত চিত্তে তার সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েছি, কত অবসাদগ্রস্ত মুহূর্তে তার উৎসাহপূর্ণ বাণী আমাকে সঞ্জীবিত করেছে—তা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। কিন্তু যে সব কথা নেহাতই ব্যক্তিগত তা প্রকাশের যোগ্য নয়।

যে সজনী কাব্য লিখত, অক্ষম বা উন্মার্গগামী সাহিত্যিকদের প্রতি যে সজনী ব্যঙ্গ ও শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করত, যে সজনী শক্তিমান সাহিত্যসমালোচক ছিল এবং ব্রিটিশ ব্যুরোক্র্যাটদের অত্যাচারের নির্ভীক সমালোচনা করতে ভয় পায় নি, সে সজনীর তো মৃত্যু হয় নি—বরঞ্চ তার পুনর্জীবন ঘটল। আজ থেকে ভবিষ্যতের কত বিদগ্ধজন তার লেখা ও কার্যকলাপের আলোচনা করবে—তাতেই সে বেঁচে থাকবে।

লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটল আমাদের সজনীর—যে ছিল আমাদের বন্ধু, সখা, দরদী ও মরমী। তাই জীবনসায়াহ্নে আলো ও আঁধারের মধ্যে সজলচক্ষে সেই সজনীর মুখখানি অনুসন্ধান করছি—যে মুখ চিরতরে অন্তর্হিত হয়েছে। শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে আছে সেই সজনীর কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য যা চিরতরে নীরব হয়েছে।

প্রেমাঙ্কুর

সাংবাদিক সজনীকান্ত

দেবজ্যোতি বর্মণ

সজনীকান্ত দাস কবি, সজনীকান্ত দাস সাহিত্যিক, ইহা সকলেরই জানা আছে কিন্তু বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে সজনীকান্ত দাসের স্থান কত উর্ধ্বে তাহা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'র দান শুধু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সামাজিক সমস্যার বহু স্তর তাঁর প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গীতে তাঁর বিশ্লেষণ-ক্ষমতার প্রয়োগ বাংলা এবং ইংরেজি উভয় সাহিত্যে সমানভাবে হইয়াছে, বহু মেকী বহু ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যে শুচিতা, সংযম এবং শালীনতা রক্ষাকে তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেই ব্রত পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়া গিয়াছেন। সমালোচনামাত্র তাঁর কাজ ছিল, পথনির্দেশ তিনি করেন নাই ইহা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বেশী করিয়া অনুভব করিয়াছি সাংবাদিক সজনীকান্তের দান। আশা করিতেছি ভবিষ্যতে তাঁর প্রকৃত কীর্তি দেশের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারিব।

স্মরণ

শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু

সজনীকান্ত নাই! একান্তে বসিয়া স্মরণ করিতেছি ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। হঠাৎ যেন কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন আসিয়া সজনী দাস ও 'শনিবারের চিঠি' বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র আলোড়িত করিয়া তুলিল। সে সময়ে আমাদের জীবন, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি সাহিত্য বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্র সমস্তই যেন সহজপন্থী। অক্ষম লোকের আস্ফালনে, না হয়তো মৃদু গুঞ্জরণে আবিষ্ট হইয়াছিল। এমন সময়ে একটা ঝড়ের আবির্ভাবে আমাদের চেতনা সঞ্চার করিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সজনীকান্ত যেন সেই প্রয়োজন পূরণ করিতে আসিলেন। যদিও সাহিত্যক্ষেত্র তাঁহার মুখ্য অবলম্বন ছিল কিন্তু তাহারই মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ক্রমে কোনও ক্ষেত্রেই 'শনিবারের চিঠি' কঠিন আঘাত করিতে দ্বিধা করে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা সহজিয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব বিকারগ্রস্ত ভাবধারা প্রবল করিয়া তুলিতেছিল, তাহাতে আবার চটকদার বিদেশী সাহিত্যের সমর্থন অতি সহজে ইন্ধনস্বরূপ হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় সহায়সম্বলহীন সজনী দাস যে এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা পরম বিস্ময়ের কথা। ক্রমে তাঁহার সমর্থকমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই, তথাপি বলিব, তাঁহার একক সাধনা, প্রাণবানতা ও আদর্শবাদিতা নিঃসংশয়ে প্রশংসা দাবি করিতে পারে।

আমি জানি যে জাতীয় জীবনে শিথিলচিত্ততার গ্লানি তাঁহাকে মর্মান্তিক পীড়া দিত এবং ক্রমে তাহা এমনই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনেই তাঁহার ভাবাবেগ ভাষা পাইল ক্ষমাহীন প্রবল বিদ্রূপ বাক্যবাণে। জমাট অশ্রু যেন বাঁধ ভাঙিয়া অট্টহাস্যে খলখল করিয়া উঠিল। আমি সাহিত্যিক নই—শিল্পকলার একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমার বিচরণ। আমাদের চিত্রকলা যেন একটা ভাবালুতার আবেশে আচ্ছন্ন ছিল এবং স্বদেশী বিদেশী নানা রীতিনীতির আশ্রয়ে ও আড়ালে আমাদের শিল্পকর্ম আত্মম্ভরিতার সুখতৃপ্তিতে নিশ্চিন্ত ছিল, এ পরিবেশ বড় গ্লানিকর মনে হইত। 'শনিবারের চিঠি'তে একটা সুস্থ সবল মানবিকতার আশ্বাস পাইয়া, সজনীকান্তের দৃষ্টি চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ করা যাইতে পারে, এই ভরসায় একদিন বন্ধুবর যামিনী রায় ও সতীশ সিংহ মহাশয়ের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথম পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে বেশীদিন লাগিল না। এই পরম উৎসাহী, উচ্ছল অট্টহাস্যপরায়ণ, আদর্শবাদী মানুষটি তাঁহার ব্যক্তিত্বে অতি সহজে আমাকে অভিভূত করিলেন। পরে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি আঁকিয়া আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আজ সেসব দিনের কথা স্মরণ করিয়া অনুজ-বিয়োগ দুঃখ পাইতেছি।

বাংলা সাহিত্যে সজনী দাসের স্থান সাহিত্যিকেরা নিরূপণ করিবেন। আমি শুধু বলিতে চাই যে কোনও প্রতিভাশালী শিল্পীর ভাবাবেগ চিরকাল সমান থাকিতে পারে না, ফলে তাঁহার সকল শিল্পকর্মই একই উচ্চস্তরের পর্যায়ে পড়ে না—তাঁহার পরিচয় থাকিয়া যায় সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনে। তেমনই সজনীকান্তের পরিচয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনায়। সেগুলি একত্রে প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যে সম্পদস্বরূপ হইয়া উত্তরকালে ভাস্বর হইয়া থাকিবে, ইহা আমার বিশ্বাস। সুনীতিবাবু, তারাশঙ্কর-বাবু প্রমুখ কলাবিদ্‌ ও সাহিত্যিকেরা যদি অগ্রসর হন তবে এ কাজ সফল হইতে পারে।

বন্ধুবর সজনীকান্ত স্মরণে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমরা যখন তরুণ ছিলাম
এখন থেকে অনেক আগে
স্বপ্নচোলাই সে-সব স্মৃতি
পড়লে মনে অবাক লাগে।
সবই তখন তরুণ ছিল
তরুণ ছিল বসুন্ধরা
চলতি পথের মোড়ে মোড়ে
ছিল যে বিস্ময় ভরা।
ঘাসের উপর গা মেলেছি
পা মেলেছি সবাই মিলে,
দখিন হাওয়ার কুমন্ত্রণা
কি মন্ত্র না প'ড়ে দিলে!
এ সব দিনের অন্ত নাহি
ছিল মনে এই ধারণাই
চিরটা কাল থাকবো তরুণ
ছিল মনে এই কথাটাই।
কালের অসি সজাগ ছিল
কে জানত তা এমন করে,
সুতোর পরে ছিঁড়ছে সুতো
জীবন শূন্যতায় ভরে।
স্বর্ণরেখা নদীর ধারে
ছিঁড়ল হঠাৎ একটি সুতো
শাল পিয়াশাল শস্যক্ষেতের
ছিলই সে যে মন্ত্রপূত।
আরেক সুতো ছিঁড়ল সেদিন
এই নগরীর ঐকতানে,
জীবন বসন আলগা হয়ে
আসছে ক্রমে শেষের পানে।
দর্পণেতে দেখতে যে পাই
জটিল কুটিল বলির রেখা,
হঠাৎ দেখি ধরার মুখে
কত যুগের বয়স লেখা।
কোথায় গেল তারুণ্য সে
কোন্ সে অমোঘ মন্ত্রবলে?
শুধাই কারে! সবাই শুধায়
এই কথাটাই নানান ছলে।
ছিন্ন সুতো কোন্ সে গুণী
নিচ্ছে টেনে আপন হাতে?
শুধাই কারে? সবাই শুধায়,
লেখে নি কেউ বইয়ের পাতে।
অলখ্ বসন হচ্ছে বোনা
এই সুতোরই রূপান্তরে
চিরতরুণ গুণীর হাতে
চির-সরস কী মন্তরে।
হয়তো বা তাই, কিন্তু আহা,
সেকালের সেই তরুণ দিন!
আমরা সবাই চির অমর,
আমরা সবাই চির নবীন!
অনেক দেখি ছিঁড়ছে সুতো,
পড়ছে ভেঙে নদীর পাড়,
দিগন্তের ওই কোলটি ঘেঁষে
উঠছে জমে ঘন আঁধার।
ব্যাকুলভাবে বন্ধু খুঁজে
যেদিক পানে হাত বাড়াই,
ব্যর্থ বাহু ফিরে আসে
আঘাত করে শূন্যতাই।
তবুও সেই তরুণদিনের
নানা সুতোর টানা-পোড়েন
মোদের কাছে অমূল্য তা,
আর কেহ দাম নাইবা দেন।

—

সজনীকান্ত দাস

নির্মলকুমার বসু

বন্ধুবর ৺অনাথনাথ বসুর কল্যাণে সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তখন তিনি মোহনবাগানে থাকেন, নীচের তলায় শনিবারের চিঠির আফিস ও ছাপাখানা। শনিবারের চিঠিকে উপলক্ষ্য করে যে সাহিত্যামোদীগণের সমাগম হত, তাতে বহুবার শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। কত বিভিন্ন চরিত্রের লেখকের সঙ্গেই না আলাপ হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম। একদিকে নীরদ চৌধুরী ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরদিকে মোহিতলাল মজুমদার ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলেই আসতেন এবং মন খুলে সাহিত্যের ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করতেন। মতের দ্বন্দ্ব স্বভাবতঃই হত, কিন্তু বন্ধুবর সজনীকান্তের মধ্যে একটি গুণ লক্ষ্য করতাম।

তিনি সমালোচনায় রূঢ় হতে যেন ভালবাসতেন। কিন্তু সে লক্ষণ আপাত-সত্য মাত্র। কারণ নতুন লেখকের গুণের সন্ধান করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সত্যকারের গুণ বা প্রতিভার আস্বাদ পেলে কত সমাদরেই না তিনি অপরকে বক্ষে আকর্ষণ করতেন। অনেকে এ কথা বলেছেন যে তাঁর সমালোচনার মধ্যে বলিষ্ঠ আঘাত থাকলেও মানুষ হিসাবে অন্তরে তিক্ততা পোষণ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সাহিত্যে শুচিতা এবং সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি সমালোচনার আসরে নেমেছিলেন সত্য, মানুষকে আঘাতও করেছেন সত্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে তাদের বন্ধু বলেও গ্রহণ করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে ভেবেছি, কি করে এরকম সম্ভব হয়? ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখেছি, নিতান্ত যোগ্যতাবিহীন মানুষকেও তিনি পক্ষবিস্তার করে আশ্রয় দিচ্ছেন। ভেবে ভেবে মনে হয়েছে, সত্যের প্রয়োজনে আঘাতবর্ষণ করলেও আসলে মানুষের বিচারে তিনি সত্যের ক্ষমাহীন মাপকাঠি প্রয়োগ করতেন না, বরং হৃদয় বা ভালবাসা দিয়েই তাদের যাচাই করতেন। মানুষের প্রতি ভালবাসা, তার দুঃখে সহবেদনাই তাঁর কাছে পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্ততঃ শেষের কয়েক বৎসরের মধ্যে এইটিই যেন তাঁর চরিত্রে আরও গভীরভাবে বিকশিত হয়েছিল।

হয়তো মানুষের প্রতি ভালবাসার মূলে তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস বর্তমান ছিল। ঈশ্বর আছেন কিনা জানি না। মৃত্যুর অবশেষে আমরা যখন আত্মীয়দের সম্পর্কে ভাবি যে তাঁরা চিরন্তন কোনও লোকে স্থানলাভ করেছেন, তখন আমাদের অসহায় ব্যাকুল চিত্ত হয়তো সান্ত্বনার অধিকারী হয়। কিন্তু আমরা যাঁদের স্মৃতি নানা আকারে, গ্রন্থে, মঠে, মন্দিরে, চিরদিনের বন্ধনে সজীব রাখার চেষ্টা করি, সে-স্মৃতি সত্যই স্থায়ী হয় কি না তাও জানি না। কিন্তু আজ যখন আমরা বহু আত্মীয় সজনীকান্তের শ্রাদ্ধবাসরে সম্মিলিত হয়েছি, তখন আমাদের সকলের অন্তরে শূন্যতার বোধের মধ্যেই হয়তো তাঁর স্মৃতির আসন প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

পরিষৎ-কান্ত সজনী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাটুদা)

সজনীকান্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার আত্মীয় সুসাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হোগুলকুড়িয়ার বাড়িতে। সে সময়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার প্রায়ই সুরেশবাবুর বাড়িতে আসতেন তাঁর সদ্যরচিত কবিতাগুলি শোনাতে। এমনি এক দিনে তিনি সজনীকান্তকে সুরেশদার বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর কবি-প্রতিভার বর্ণনা করে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সজনীকান্তর নাম তখনও শুনি নি, তাঁর কবিতা বা কোন লেখা তখন পর্যন্ত পড়ি নি, মোহিতবাবুর প্রশংসা বন্ধু-বাৎসল্যজনিত অত্যুক্তি বলে মনে হয়েছিল, ভদ্রলোকের চেহারা বা সেদিনকার সামান্য কথাবার্তা আমাকে আকৃষ্ট করে নি।

তারপর মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হলেও তাঁর সঙ্গে পরিচয় গভীর হবার সুযোগ হয় নি। তাঁর বিখ্যাত আড্ডায় বাংলার তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর প্রভৃতি বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে তীক্ষ্ণ সরস আলোচনার গল্প শুনেছি, তাঁরই কাগজে তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতা, সমালোচনা ইত্যাদি পড়েছি এবং লোকটির আশ্চর্য সাহিত্যিক বুদ্ধি ও লেখনীর ধার দেখে মুগ্ধ হয়েছি এবং তারিফ করেছি। তাঁর লেখা পড়বার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকতাম কিন্তু সর্বমান্য গুণী ব্যক্তিদের তাঁর অত্যুগ্র সমালোচনার দ্বারা ধরাশায়ী করবার প্রয়াস দেখে ব্যথিত হতাম, সরস উক্তিগুলি উপভোগ করলেও তাঁর বক্তব্যগুলিকে গ্রহণ করতে বাধত, এমন কি বেশ বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করতাম। বহুবার সুযোগ উপস্থিত হলেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার ইচ্ছা তখন জাগে নি।

তারপর অযাচিতভাবে আসল মানুষটিকে জানবার সৌভাগ্য হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্রবে এসে। আমরা জানতাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার, তাঁর প্রেরণাতেই সব কাজকর্ম হয়। কাছে এসে দেখলাম ব্রজেনদা কর্তা বটে। কিন্তু প্রায় সমস্ত নূতন পরিকল্পনার মূল উৎস সজনীকান্ত, তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করা সম্ভবপর নয়, পরিষদের সদস্যগণের উপর তাঁর প্রভাব অসীম।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে সজনীকান্ত সাহিত্য-পরিষদে যোগদান করেন। সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা সে সময়ে খুব ভাল নয়। নূতন কোন কাজ সে সময়ে "বিশেষ-কিছু" হচ্ছিল না। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় এবং ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সাহিত্য-সাধক চরিতমালা প্রমুখ নানা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে সাহিত্য-পরিষদে নূতন প্রাণ সঞ্চার হল এবং বাংলা সাহিত্যের অনেক অজ্ঞাত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের কয়েকজন সাহিত্যিকের নূতন করে মূল্যায়নও হল। এ কাজ সামান্য নয়, অনেক অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে এ কাজ সম্ভব হয়েছে। নাম না থাকলেও প্রত্যেকটি কাজে সজনীকান্তর যোগ আছে ও তাঁর পরিশ্রম অপরিসীম। অর্থাভাবে যে পরিকল্পনা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি, পরিষৎকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত রেখে নিজেদের দায়িত্বে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশনের পরিকল্পনা কার্যকরী করে তিনি সাহিত্য-পরিষদের কাজ এগিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী স্বয়ং প্রকাশ করে পরিষদের ঝাড়গ্রাম তহবিল প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিঃস্বার্থ সাহায্য পরিষদের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠার একটি আশ্চর্য নিদর্শন।

সজনীকান্ত আজীবন পরিষৎকে নানা ভাবে সেবা করে গেছেন—পত্রিকাধ্যক্ষরূপে, গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে, সম্পাদক-রূপে, সহকারী-সভাপতিরূপে, সভাপতিরূপে—এমন কি শেষের কয়েক মাস কোষাধ্যক্ষরূপে। এ ছাড়া প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-রচনা, নানা গ্রন্থ সম্পাদনা করেও তিনি পরিষৎকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। পরিষদের জন্য তাঁর অনুরাগ অসামান্য।

পুরনো দিনের কথা

উমা দেবী

মানুষ তার নিজের পরিচয় কতভাবে ছড়িয়ে রেখেছে—জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে আর হৃদয়ের ক্ষেত্রে। তার অনুভূতির আলো বিচিত্র ভাবে বিকীর্ণ হয়ে যেখানে উপলব্ধির প্রত্যয়ে ঐক্য পেয়েছে সেখানে সে পূর্ণ। এই পূর্ণ-পরিচয় লাভ করা বড় সহজ নয়। মানুষকে আমরা কত অল্প জানি, কত ভুলও জানি। ব্যক্তিত্ব যত প্রখর, ততই সে বিচিত্র, ততই সে জটিল। সেই জটিলতার গ্রন্থিগুলি খুলে ফেলে সূত্রের পরিমাপ করা সহজ নয়। তাই মানুষকে বিচার করার চেয়ে গ্রহণ করাই সহজ।

সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে অনেক কথাই মনে পড়ছে। তিনি বাংলার সাহিত্যাকাশে একজন দিক্‌পাল, এ কথা আজ চারিদিকেই ধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্য দেবে বর্তমানে বিদগ্ধজন, ভবিষ্যতে উপরন্তু জনসাধারণ। একটু দূরে গেলে কাজ সহজ হয়।

তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। পরে অবশ্য শেষের কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সর্বদা সম্ভব হয় নি। কিন্তু এও জানি, তাঁর শুভেচ্ছা ও কল্যাণকামনা আমাদের জন্য ছিল।

সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে প্রথম আমার পরিচয় ঘটে ১৯৪২ সনে, তখন আমি সাংখ্যযোগদর্শনে এম.এ. দেবার জন্য তৈরি হচ্ছি। তার পূর্বেই এই মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। অনেকদিন আগে তাঁর "সূর্যমুখী" কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। 'শনিবারের চিঠি' ছাড়া অন্য পরিচয়-লাভের সুযোগ তার আগে

সাহিত্য-পরিষদের কাজের মধ্যেই আসল মানুষটির সাক্ষাৎপরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁকে দেখেছি, তাঁর গুণ দোষ দুইই লক্ষ্য করেছি কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সকল কাজের মধ্যে তাঁর গুণাবলীর যে সম্যক্ পরিচয় পেয়েছি অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনটি আর দেখি নি। পরিষদের ও সেই সঙ্গে আমাদের যা ক্ষতি হল তার আর পূরণ হবে না। চিরকাল আমাদের এই আক্ষেপ করে কাটাতে হবে যে যে-সজনীকান্তকে আমরা দেখলাম তিনি সর্বসাধারণের সজনীকান্ত হতে পারলেন না। কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, গবেষক হিসাবে তিনি থাকবেন, কিন্তু যে প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ আমাদের প্রাণে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তা সমস্ত জাতির প্রাণে ধরিয়ে দেবার সময় পেল না। সজনীকান্তকে যাঁরা চিনতেন, তাঁদের কাছে মানুষ সজনীকান্ত কবি সাহিত্যিক সমালোচক সজনীকান্তের চেয়ে ঢের বড়, তাঁর সাহিত্যকে চাপা দিয়ে তাঁর মনুষ্যত্ব, তাঁর পৌরুষ, তাঁর প্রাণ বড় হয়ে রইল। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাদের অভিভূত করে রেখেছিলেন।

মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। শুধু রবিবার একটু বিশ্রাম নিয়ে সোমবার থেকে 'ভারত-কোষে'র জন্য লেখাগুলো আরম্ভ করে দেবেন, অন্যান্য লেখকদের রচনাগুলি সম্পাদনা করে দেবেন, আমাকে সাহায্য করবার জন্য নিজের লাইব্রেরি থেকে কতকগুলি বই খুঁজে বার করে দেবেন, পরিষৎ-পত্রিকার জন্য তাঁর রচনাটি দু-এক দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলবেন ইত্যাদি বহুবিধ পরিষৎ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। একদিনের জন্য যে বিশ্রাম চেয়েছিলেন, তা চিরবিশ্রামে পরিণত হল।

পরিষৎকে যে তিনি কত ভালবাসতেন তা আমরা যারা তাঁর সহকর্মী ছিলাম তারা বিশেষ ভাবেই জানি। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে এই ভালবাসা যে কি অপরিসীম ছিল তা তাঁর "অন্তিম বাসনা" নামক ব্যঙ্গকবিতার মধ্যে পরিস্ফুট রয়েছে :

"শেষ অনুরোধ মোর—
ব্যথিত হয়ো না যদি চোখে তব লাগে কোন নব ঘোর ;
আমারে ভুলিও, দিও ফুটিবারে তব মন-কোকনদে—
বইগুলি মোর শুধু করো দান সাহিত্য-পরিষদে।"

টে নি। কোনদিন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবে মন আশা কল্পনাতেও ছিল না। কোনও একটি ময়িক পত্রিকায় আমার লেখা একটি গল্প ছাপা য়েছিল। আমি তখন ভাগলপুরবাসিনী। 'শনিবারের চিঠি'তে তার ওপর একটি ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা মন্তব্য রিয়েছিল। সেই মন্তব্যে আমি আহতও হয়েছিলাম, ানন্দিতও হয়েছিলাম। তারও বহুকাল পরে প্রেমাঙ্কুর াতর্থী সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে য়েছিলেন। মনে আছে সেটা উনিশ শো বিয়াল্লিশের র্চ মাস—আজ থেকে বিশ বছর আগে।

এই বিশ বছরে ঘটনাবর্তের কত পরিবর্তন ঘটে য়েছে। 'শনিবারের চিঠি'তে তেরো শো আটচল্লিশ লের শ্রাবণ মাসে আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয়। র আগে মাত্র একটি কবিতা স্বর্গত অজিত চক্রবর্তী বীজাণু'তে বার করেছিলেন। কিন্তু সে পত্রিকা বীজাণুর তই অদৃশ্যপ্রায় ছিল। 'শনিবারের চিঠি'তেই বলতে লে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ কবিরূপে, এবং সেজন্য াজ কৃতজ্ঞচিত্তে সজনীকান্তকে স্মরণ না করে পারি না। াই নতুন লেখিকার বড় বড় কবিতাও তিনি সাহসের ঙ্গই 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই সময় কৈলাস বসু স্ট্রীটে আমাদের বাড়িতে একটি োট্ট সাহিত্যিক-আড্ডা গড়ে উঠেছিল। প্রেমাঙ্কুর াতর্থী সেই বাড়িতেই 'মহাস্থবির জাতক' রচনা রেছিলেন। আমি যত কবিতা লিখতাম সবই সজনীবাবু আতর্থী মশাইকে প্রথম পড়ে শোনাতাম। সজনীবাবুও তুন কবিতা লিখলে এনে পড়ে শোনাতেন। সাহিত্যিক সাহিত্যরসিক আরও কেউ কেউ এসে মাঝে মাঝে াগ দিতেন। মাঝে মাঝে আমরা ব্রিজ খেলতাম র নতুন নতুন মাংসের রান্না সকলে মিলে উৎসাহ করে খতাম। আমার বড়দা ছিলেন রান্না-বিষয়ে সবচেয়ে সাহী।

সেই সাহিত্যিক-আবহাওয়ার মধ্যে ধীরে ধীরে ামার মনে জগতের একটি নতুন রূপ নতুন দ্বীপের মত গে উঠছিল। অনেকেই আসতেন। নানা আলোচনা ত, কাব্য পড়া চলত, 'মহাস্থবির জাতক' পড়া হত, ত নতুন চিন্তা, কত নতুন আলাপন—শুধুমাত্র সংলাপ-রসের মধ্য দিয়েই চিত্তকে আবিষ্ট করে তুলত। সে সব দিন হারিয়ে গেছে। যাঁরা দীপধারী ছিলেন, তাঁদের "একে একে নিভিছে দেউটি।"

এই সময়ে সজনীবাবু তাঁর সমস্ত বই আমাকে দিয়েছিলেন—ছোট ছোট কবিতা রচনা করে। যদি হারিয়ে যায়, এই মনে করে আজ সেগুলি সাধারণের কাছে ধরে দিলাম। কত যত্ন ও সমবেদনার সঙ্গে তিনি আমার মধ্যে কবিপ্রাণকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করতেন, এগুলিতে তার নির্দেশ আছে।

কুড়ি বছরের পরিচয়ের ইতিহাস দু পাতায় শেষ হয় না, ভাল করে বলার অবসরও এটা নয়। পুরুষসিংহ ছিলেন তিনি, কোমলে-কঠোরে মেশানো ছিল তাঁর চরিত্র। ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুর জন্য কিছু দিতে তাঁর বাধত না, আবার বাণীর কমলকাননে কোন উৎপাত পরম বন্ধুর ক্ষেত্রেও সহ্য করতেন না। সজনীকান্ত দাসের সাহিত্যকৃতির আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে।

এখানে টুকরো কবিতাগুলি সাজিয়ে দেওয়া হল :

মানস-সরোবর

শ্রীউমা দেবী কল্যাণীয়াসু—

আমার মানসসরোবরজলে ফুটিয়াছে শতদল—
শতদলরূপে বাহিরে তাহারা প্রকাশ পেয়েছে কিনা,
তাহার বিচার তুমি করো কবি, বহে আনা মোর কাজ,
বহে নিয়ে যাওয়া অনাগত কালে সে কাজ সাধিও তুমি।
সমাপ্তি মোর আমারি মাঝারে এই মোর বিশ্বাস,
এক হয় শেষ, তাহারি জন্মে নূতন জন্ম লভে ;
আমার জীবনে যা শিখেছি তার দিনু শুধু ইঙ্গিত—
তোমার জীবনে তোমার জীবন সার্থক হোক কবি।

২৯. ৫. ৪২ শ্রীসজনীকান্ত দাস

রাজহংস

পাখায় করি ভর
উড়েছিলাম উর্ধ্বাকাশে, মনোবিলাস হবে ;
ঝিমিয়ে এল পাখা যখন, তখনো দিন বাকী,
তাকিয়ে দেখি লোকালয়ের ধারে
আকাশ পানে ব্যাকুল চেয়ে হাতছানি কে দেয়,
নেমে এলাম ছুঁয়ে—
ওগো অজানা তোমার সাথে চেনাই ছিল বাকী।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আলো-আঁধারি

আলো আর আঁধারের দ্বন্দ্বে
আমি যে খুঁজিয়া পেনু পথ ;
যে মায়া ঘরের বাহুবন্ধে
বাহিরে তাহারি জয়রথ।
এ হেঁয়ালি কাহারে বুঝাই
হয়তো বুঝিবে তুমি কবি,
যত বাধা তত এঁকে যাই
মনে মনে মুক্তির ছবি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

পথ চলতে ঘাসের ফুল

ভালোবাসায় বেসেছিলাম ভালো
তারি আভাস "ঘাসের ফুলে" আছে—
জগৎ জুড়ে মিলছে আঁধার আলো
গৌরী ফেরেন হরের কাছে কাছে।
নানান দেশের খবর মিলবে এতে,
একই রক্ত সকল দেহে বয়,
গভীর বনে সবুজ ধানের ক্ষেতে
মলয় পবন একটি কথাই কয়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

মনোদর্পণ

যা কিছু দেখেছি মনোদর্পণে কুটিল কামের ছবি,
তাহারি বেদনা ছন্দ হইয়া ফুটেছে কাব্য মম,
সে ছবি দেখো না, নূতন যুগেতে হও কল্যাণী, কবি,
শুধু মনে জপ আলোর প্রকাশে বিদূরিত হোক তম।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

অঙ্গুষ্ঠ

দেখেছি আমি দেখাতে নাহি চাই,
কাল-বারিধির বিপুল বালুতটে—
কোন্ রসিকের আঙুল নাড়াটাই—
দিকে দিকে তারি খবর রটে।
ভয় পেয়েছি—হালকা হাসির তলে
চাপতে গিয়ে ভাসি নয়ন জলে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গরণভূমে

এ বঙ্গের রণভূমে রক্তহীন বঙ্গ শুধু আছে
তারি ছবি আঁকিয়াছি দেখিবে বুকের রক্ত দিয়ে,
এ দুর্ভাগ্য জাতি শুধু ছুটিতেছে আলেয়ার পাছে,
বল কে করেছে যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে মৃত সৈন্য নিয়ে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমতী উমা দেবী কল্যাণীয়াসু

যে বৃক্ষের শাখা হতে গন্ধপুষ্প করিয়া চয়ন
সযত্নে গাঁথিয়া মালা দুজনে বন্দিনু ভারতীরে,
সে বনস্পতিরে আমি শ্রদ্ধাভরে করি নিবেদন
ছন্দের এ মালাখানি, তারি এক খণ্ড তুমি কবি,
গ্রহণ করিয়া ধন্য কর মোর 'পঁচিশে বৈশাখে।'

২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৯ শ্রীসজনীকান্ত দাস

কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল

হাসি নয় শুধু নয় এ ছন্দ
কাহারে বুঝাই হায়,
যত চেপে করি মুঠাটি বন্ধ
জল গলে গলে যায়।
জলের ধারাই চোখে দেখা যায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়
কান্নার মাঝে হাসিতে আমার
এখনো যে ভাল লাগে,
বুঝিবে অতল মনের বেদনা
পড় যদি অনুরাগে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মধু ও হুল

অনেক দিনের কথা
মধু ছিল তবু হুল ফোটাবার অকারণ অধীরতা।
সেই ইতিহাস হেথা হল লেখা, চপল কাহিনী,
সচকিতে দেখা
আজ এতদিনে তুমি কি বুঝিবে, আমার সে ব্যাকুলতা!
তবু এর মাঝে রয়েছে গোপন, মধুসঞ্চয় ভাবী আয়োজন,
কণ্টকলতা হ'ল যে কখন পুষ্পস্তবকনতা।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাল

শ্রীমতী উমা দেবী কল্যাণীয়াসু

কলিকালের মেয়ে তুমি, বুঝবে আমি জানি
গল্প আমার আড়ালে তার বহিছে কোন বাণী—
পথের মাঝে নিত্য মেলে নতুন পরিচয়—
নতুন করে ভালবাসি—জয় তোমাদের জয়।

৯ই ভাদ্র, ১৩৪৯ শ্রীসজনীকান্ত দাস

অজয়

যে নদীর নাম নাই ডুব দিয়ে জলে তার,
একদা ভেবেছি মনে মিলিয়াছে পারাবার।
চপল লহরীলীলা দেখি আর ভাবি আজ,
ডুব দেওয়াটাই ভুল, আমি কার কে আমার!
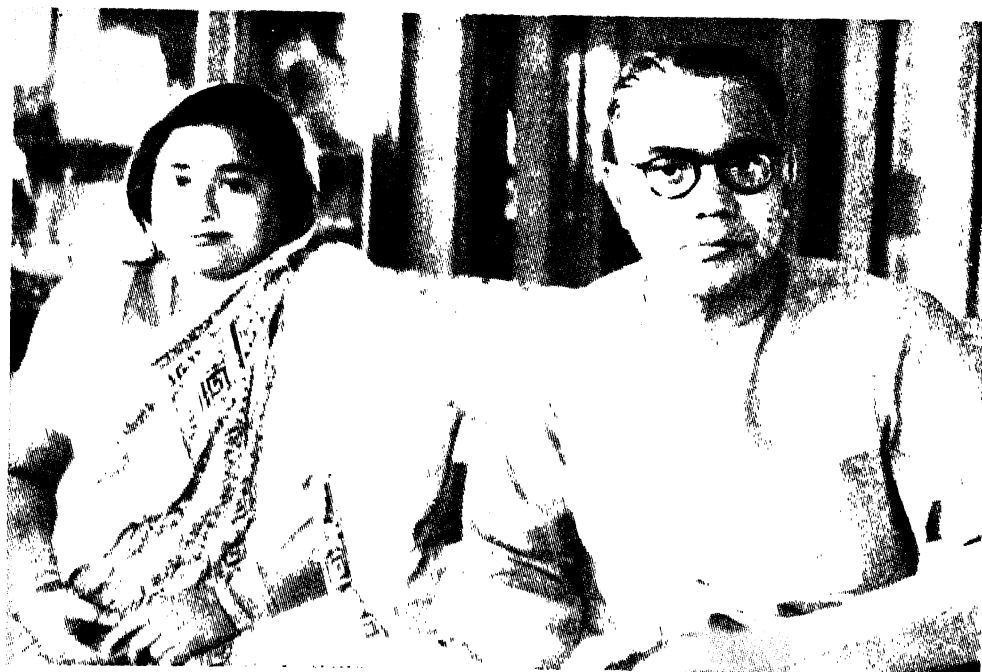
শ্রীসজনীকান্ত দাস

সস্ত্রীক সজনীকান্ত

বিবাহের অব্যবহিত পরে

পরিণত বয়সে

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্যাস্টেল

অতুল বসু অঙ্কিত তৈলচিত্র

স্মরণে

পরিমল গোস্বামী

সজনীকান্তের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বছর কাটিয়েছি ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত।

অতি অল্প পরিচয়ে তিনি একদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকভাবে আমার উপর শনিবারের চিঠির সম্পাদনা এবং পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি বাংলা ১৩৩৯ সালের পৌষ থেকে সম্পাদনাভার গ্রহণ করি। ঐ সংখ্যায় সজনীকান্ত শনিবারের চিঠির পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করেন এবং আমাকে পাঠক-সমাজে সম্পাদকরূপে পরিচয় করিয়ে দেন।

সজনীকান্ত তখন বঙ্গশ্রীর সম্পাদক, তখনকার দিনের তুলনায় বেতন ভালই বলতে হবে, যতদূর মনে পড়ে দু শ টাকা মাসে।

শনিবারের চিঠি থেকে খুব বেশি আয় হত না। দুজন কম্পোজিটর, এবং আমি ও আমার সহকারী প্রবোধচন্দ্র নানের খরচটা চলে যেত। এবং শেষ পর্যন্ত শনিবারের চিঠির যে সামান্য দেনা ঘাড়ে নিয়েছিলাম তা প্রবোধ নানের নিষ্ঠায় শোধ হয়েও কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত ছিল। হিসাবের ব্যাপারটাও শেষ দিকে সম্পূর্ণ আমাদের উপর ছিল।

প্রথমে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে ও পরে মোহনবাগান রো'তে শনিবারের চিঠির সঙ্গে বাস করেছি। তখন শ্রীমান রঞ্জন ও তস্য ভগিনী শ্রীমতী উমা আমার কাছে গল্প শুনতে আসত। অফিস ঘরই ছিল শোবার ঘর এবং আড্ডার ঘর। একবার আমি দেশে যাই এবং সে সময় সজনীকান্তের অনেক স্বজন এসে পড়েন ঐ বাড়িতে। আমাকে সজনীকান্ত একখানা চিঠিতে জানান (১৯৩৫) তিনি এখন স্থানাভাবে অফিস ঘরের বেঞ্চে রাত কাটাচ্ছেন (বসুমতী, মাঘ ১৩৬৮ দ্রষ্টব্য)।

সে সব দিনের কথা আমি নানা স্থানে লিখেছি। আমার জীবনের একটি বড় আনন্দময় অধ্যায় সেটি। ঐ সব লেখার মধ্যে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার সে সব স্মৃতিকথা লিখতে গেলেই মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ শিহরণ জেগে উঠেছে এবং তা আমার লেখার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমি কখনও ভুলতে পারি নি সে হচ্ছে সজনীকান্তের আকর্ষক চরিত্র, যে চরিত্র সব সময় একটা রহস্যের আবরণে ঢাকা থাকত, এবং যা অত্যন্ত খামখেয়ালির বাঁধনভাঙা ধর্মে ওতপ্রোত ছিল। তিনি এই সব মিলিয়ে এমনই আশ্চর্য এক মানুষ ছিলেন যে, সব সময় একটা বৃহৎ গোষ্ঠীকে তিনি নিজের চারদিকে টেনে রাখতে পারতেন। তাঁর বন্ধুত্বের উদারতার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না। পরস্পরবিরোধী চরিত্রের মালিক ছিলেন তিনি নিজে, এবং হয়তো বা সেই জন্যই বহু পরস্পরবিরোধী চরিত্রের মানুষ তাঁর গোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছে।

আমি ১৯৩৩ সনের একটি স্মৃতির কথা লিখেছিলাম একখানি মাসিকে। সে রচনাটি "সম্বলপুরের অরণ্য পথে" নামে আমার 'পথে পথে' বইতে সংকলিত হয়েছে। তাতে লিখেছি—

> বঙ্গশ্রী অফিস ছিল ধর্মতলা স্ট্রীটে। বেলা একটার পর থেকেই সেখানে আড্ডা জমতে শুরু করত। ওখানে এলে কারো সময়ের হিসাব থাকত না। যাঁর যখন খুশি আসতেন এবং যতক্ষণখুশি আড্ডা জমাতেন। যে-কোনো বিষয়ে আলোচনা তর্ক বা ঝগড়া এমন কি হাতাহাতিতেও কারো কোনো ক্লান্তি ছিল না। (১৯৪৫)

১৯৫৫ সনের শনিবারের চিঠির পূজা সংখ্যায় 'নানা রঙের দিনগুলি' নামক একটি স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছিলাম ('সপ্তপঞ্চ' নামক বইতে সংকলিত)। তাতে বঙ্গশ্রীর আড্ডার একটি অদ্ভুত দিকের কথা বলেছি। তার এক জায়গায় সজনীকান্ত সম্পর্কে বলেছি—

> ঘরটাতে অন্তত পঁচিশজন ব'সে তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছেন।
> নবাগতের প্রশ্ন: "সজনীবাবু কোথায়?"
> "তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

"বড়ই দরকার ছিল।"

"ঘণ্টাখানেক পরে এলে দেখা পাবেন।"

আধঘণ্টা পরে পাশের তালাবন্ধ ঘর (গণপতি চক্রবর্তীর ইলিউশন বক্স!) থেকে আর এক দরজার খিল খুলে সজনীকান্তের আবির্ভাব। (১৯৫৫)

আর এক জায়গায়—

সজনীকান্তের গুণগ্রহণের ভাষা ছিল "ওয়ান্‌ডার-ফুল!" যা শুনতেন, সব ওয়ান্‌ডারফুল। এজন্য কোনো কোনো লেখকের অধঃপতন ঘটেছে সন্দেহ নেই, সময়কালে অপ্রিয় সত্য বললে হয় তো লেখকের উপকার হত। কিন্তু তবু বলব ঐ 'ওয়ান্‌ডারফুল' কথাটি পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছিল বলে আজও অনেকে সাহিত্যের পথে চলেছেন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে।

সজনীকেন্দ্রিক 'বঙ্গশ্রী'কে ঘিরে কি বিচিত্র ভিড়, কি বিচিত্র সম্ভাবনা।

সজনীকান্তের চরিত্র ছিল রহস্যময়। তিনি কখনো তার শেষ দেখতে দিতেন না।...অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে রহস্য বাড়াতেন। অনেক জটিল সমস্যার কি ক'রে যে সহজ সমাধান খুঁজে পেতেন তা আজও জানি না।

সেদিনের আড্ডায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্বীকার করবেন, একটি চরিত্রের এই রহস্যময় বৈচিত্র্যই সে দিনের ছিল সর্বপ্রধান আকর্ষণ।

ভীরুতা দেখিনি কখনো।

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিধা দেখিনি কখনো, তা সে নিজের জন্যই হোক বা আশ্রিতের জন্যই হোক।

আমার স্মৃতিচিত্রণ বইতে সজনীচরিত্রের দীর্ঘ বর্ণনা আছে। তার এক জায়গায় আছে হঠাৎ খেয়ালের ঝোঁকে চলায় সজনীকান্তর জুড়ি ছিল না। একেবারে চরমপন্থী।...এমন ইম্‌পালসিভ একটি চরিত্র সব সময় চিত্তাকর্ষক। নিজে সম্পাদক হয়ে সহকারী সম্পাদক কিরণকুমার রায়কে কত বার ভয় দেখিয়েছে, কাজ ফেলে আড্ডায় যোগ না দিলে চাকরি খেয়ে দেব। এ কথাটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে এর মনোহারিত্বের জন্য।

সজনীকান্তের মৃত্যুর পরে যেখানে যিনি যেটুকু লিখেছেন, অথবা তাঁর সম্বন্ধে সভায় বলেছেন, তিনিই অন্য সব কথার মধ্যে তাঁর চরিত্রের এই দিকটির উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ সজনীকান্তের বন্ধু বানাবার এবং বন্ধুকে টেনে রাখবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আজকের দিনে এ জিনিসটি দুর্লভ হয়ে এসেছে।

তাঁর পুরনো দিনের আক্রমণের লক্ষ্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ তাঁর টানে তাঁর বন্ধুরূপে কাছে চ'লে এসেছিলেন, মাত্র দু-একজন ছাড়া। আমি নিজচোখে দেখেছি সজনীকান্তের সবাইকে কাছে টানবার আকুলতা। এবং এ কথা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না যে যাঁদের সাহিত্যক্ষেত্রে গাল দেওয়া হয়েছে বা যাঁদের লেখা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তিনি অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও নিষ্ঠুর ভাবে অক্রমণ করেছেন কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের হানি ঘটেনি। তারাশঙ্কর সেদিনও বলেছেন, তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রমথনাথ বিশীকে আক্রান্ত হতে দেখেছি। অথচ এঁরা কেউ এক দিনের জন্য সজনীকান্তকে অবন্ধু মনে করেননি। অবশ্য আমার বিরুদ্ধে তিনি কখনও কিছু লেখেননি অনেক ক্ষেত্রে মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও।

আমার শনিবারের চিঠিতে আসবার আগে যাঁরা ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিলেন তাঁরা একমাত্র সজনীকান্তকেই কেন যে আক্রমণকারী মনে করেছিলেন তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় সজনীকান্তের উপর নিষ্ঠুর প্রত্যাক্রমণ হলেও তিনি কখনও শনিমণ্ডলের অন্য কাউকে betray করেন নি। এ সমস্ত আমার নিজের জানা।

এই কথাটি আমি গত ১৯৫৫ সনের জানুয়ারি মাসে তাঁর আত্মস্মৃতি সমালোচনা উপলক্ষে বলেছিলাম। সমালোচনাটিতে আমার স্বাক্ষর ছিল, এবং যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি তার ভূমিকায় যা বলেছিলাম তার মর্ম হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে যে কারণে সাহিত্যপত্ররূপে রূপান্তরিত শনিবারের চিঠির আবির্ভাব ঘটেছিল, তার সার্থকতা তৎকালীন বাংলা দেশের রথী-মহারথী সবাই স্বীকার করেছিলেন।... একদল তরুণ সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে আর একদল তরুণ সাহিত্যিক। এই দলে রসিক এবং ব্যঙ্গনিপুণ ব্যক্তির সংখ্যা বেশি ছিল।...খাশ শনিধর্মে

দীক্ষিতের সংখ্যাও কম ছিল না।...এঁদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন মোহিতলাল এবং নবীনতম ছিলেন সজনীকান্ত। তবু প্রতিপক্ষের সঙ্গে সর্বস্ব পণ ক'রে স্থায়ীভাবে লড়াই চালাবার যোগ্যতা ছিল একমাত্র সজনীকান্তের। এই যোগ্যতা তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে। তিনি একাধারে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর চরিত্রের একদিকে যাবতীয় দুষ্টুমিভরা একটি বালক, অন্যদিকে বেপরোয়া লড়াইয়ের সাহস-সম্পন্ন এক যোদ্ধা। অবশ্য সবাই ছিলেন সমধর্মী, কিন্তু অন্যের পক্ষে যেখানে নিজেকে ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে থাকবার দরকার হয়েছিল, সজনীকান্ত সেখানে স্ব-পরিচয়ে নিজের মাথাটি শত্রুর সীমানায় এগিয়ে দিয়েছিলেন। উপরন্তু অন্য সবার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত লাঠিগুলিও নিজে মাথা পেতে নিতে কখনও ভয়ে পিছিয়ে যাননি। কারণ, একদিকে তিনি অতি আধুনিকদের মতোই impulsive, অন্যদিকে নিষ্ঠাবান, স্থিরমস্তিষ্ক এবং দুঃসাহসিক। সুতরাং স্বভাবতঃই তিনি বাইরে থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আপন যোগ্যতাবলে মণিচক্রের কেন্দ্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

ভূমিকায় যা লিখেছিলাম তা প্রায় সবটুকুই উদ্ধৃত করা হল। যা লিখেছিলাম তার ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই আশা করি। বহু প্রতিষ্ঠাবান লেখক আড়ালে ছিলেন, সজনীকান্ত ছিলেন প্রকাশ্যে, কাজেই লাঠির আঘাতটা তার উপর দিয়েই যেত সব সময়।

কোনো কোনো কাগজে সজনীকান্তের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ চলত অতি নিষ্ঠুর ভাবে এবং অভদ্র ভাষায়। সজনীকান্ত একেবারে নির্বিকার। এতে তাঁর মন তিলমাত্র বিচলিত হ'ত না, এতে আমি খুব বিস্ময় বোধ করেছি তখন।

সর্বশেষ তাঁর সবচেয়ে বড় সুহৃৎ মোহিতলাল মজুমদার তাঁর বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বিরাট এক প্রবন্ধ লিখলেন এবং মোহিতলালের মৃত্যুর পর একখানা মাসিকে ছাপা হ'ল, সে প্রবন্ধটি আমি পড়ে দেখেছি খুব যত্ন করে। আক্রমণের আয়োজন দেখে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু প'ড়ে দেখি লেখক সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বা স্পষ্ট অভিযোগ কিছুই ছিল না, নিজেকে শুধু উপহাসের পাত্র ক'রে তুলেছেন ওটা লিখে। মোহিতবাবু শেষ বয়সে কিছু inferiority complex-এ আক্রান্ত হওয়াতেই এটি ঘটেছিল।

মোহিতবাবুর প্রতি সজনীকান্তের কোনও বিদ্বেষ ছিল না। মোহিতবাবুরও থাকবার কথা নয়, কিন্তু শেষে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল, তাই নিজেকে সজনীকান্তর দ্বারা অবহেলিত মনে করতেন। সজনীকান্তেরও নিজের প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তার জন্য অগ্রজোপমের হাতে ওই বিদ্বেষ তাঁর প্রাপ্য ছিল না।

আজ দুজনেই ভালমন্দের উর্ধ্বে, তাঁদের এ সব সাময়িক মান-অভিমানের বাইরে তাঁরা দুজনেই যা দান ক'রে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করবে। তবু সজনীকান্ত তাঁর জীবিতকালে যে প্রীতি-ভালবাসা লাভ ক'রে গেছেন আশা করি তাঁর মৃত্যুর পরে সেজন্য তাঁকে আর কেউ ঈর্ষা করবেন না। এ প্রীতি-ভালবাসার সঙ্গে হৃদয়ের সত্য সম্বন্ধ ছিল, তাই বাংলাদেশ তাঁর অকালমৃত্যুতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রীতিনিবেদন করেছে, যাঁর হৃদয় আছে তিনিই তাঁর মৃত্যুতে কেঁদেছেন। কারণ তাঁর অকালমৃত্যু শুধু দৈহিক অকালমৃত্যু নয়, তাঁর পরিকল্পিত বহু বৃহৎ গঠনমূলক কাজেরও যেন তাঁর সঙ্গে তাঁরই মতো অকালমৃত্যু ঘটল। এ ক্ষতি সমস্ত বাংলা দেশের।

—

স্মৃতির পাতা থেকে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে প্রবাসী কার্যালয়ে সজনীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তখন আমার কয়েকটি কবিতা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সজনী তখন প্রবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক। ঐ সময়ে আমার লেখা কাব্যগ্রন্থ 'ব্যথার পরাগে'র পাণ্ডুলিপি তাকে পড়তে দিই। কয়েকদিন পরে সজনী আমাকে চিঠি লিখে প্রবাসী কার্যালয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখি শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও সজনী একসঙ্গে বসে আছেন। সজনী অশোকবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার 'ব্যথার পরাগে'র অকুণ্ঠিত প্রশংসা করলে। পরে আমার সে কাব্যখানি প্রবাসী কার্যালয় থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার প্রকাশক ও মুদ্রাকর হয়েছিলেন যথাক্রমে অশোকবাবু ও সজনী।

আলাপ ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হল। আমরা দুজনে যেন দুজনকে পেয়ে বসলাম। সজনী লিখে শোনায় আমাকে, আমি শোনাই সজনীকে। আমি তখন বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করি। কি একটা কারণে এর কিছুদিন পরে সজনী প্রবাসীর কাজ ছেড়ে দিল। তারপর শুনলাম বিডন স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে শনিবারের চিঠি সম্পাদনা করবার ভার নিয়েছে সজনী। সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

ও শ্রীযোগানন্দ দাস প্রথম বের করেছিল—সম্পাদক হিসাবে যোগানন্দ দাসের নাম ছিল। এখন সজনী হল তার সম্পাদক ও পরিচালক। আগে অনেক সুপরিচিত সাহিত্যিক সেখানে আড্ডা জমিয়েছিলেন, এখন আরও অনেকে আসতে লাগলেন। শনিবারের চিঠির কথা তখন লোকের মুখে মুখে। সে সময়ে শনিবারের চিঠিতে কদাচিৎ লেখকের আসল নাম থাকত। কল্পিত নাম দু-চারজনের থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন নামই থাকত না। আমার অনেকগুলি কৌতুক গল্প ও ব্যঙ্গ কবিতা সে সময়ে শনিবারের চিঠিতে কল্পিত নামে (মদনানন্দ মোদক) ও নামহীনভাবে প্রকাশিত হয়। একদিন সজনী একটি গল্প সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে। গল্পটির নাম "পদ্মবউ", লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটি পড়ে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে সজনীকে যেসব কথা বলেছিলাম, এখন তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই প্রথম তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার আলাপ। তখনকার দিনে শনিবারের চিঠির 'সংবাদ-সাহিত্য' ও 'মণিমুক্তা' পড়বার জন্যে পাঠক-মহলে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যেত। ক্রমে শনিবারের চিঠির জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল, কার্যালয় স্থানান্তরিত হল মোহনবাগান রো'র বাড়িতে। সেখান থেকে আবার ক্যানাল রোডের বাড়িতে। সাহিত্যিক আড্ডা ক্রমেই জমে উঠতে লাগল। শনিমণ্ডল যে এক ক্ষমতাশালী লেখকগোষ্ঠী নিয়ে চলছে, এটা তখন সকলেই বুঝতে পারলেন।

একদিন শুনলাম সজনী ৺সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গশ্রী পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছে। পরিমল গোস্বামী তখন নিলে শনিবারের চিঠির সম্পাদনার কাজ। অবশ্য তার অনেক কিছুই দেখত সজনী। আমরা ধর্মতলা স্ট্রীটে বঙ্গশ্রীর অফিসেই আড্ডা জমাতাম বেশী। সে আড্ডায় নিয়মিত আসতেন প্রমথনাথ বিশী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ৺বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রবীন্দ্র মৈত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বলাই মুখোপাধ্যায় (বনফুল), হেম বাগচি, জসিমুদ্দিন, পরিমল গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার, সুকুমার সরকার প্রভৃতি অনেকেই। শনিবারের চিঠিতে তখন আমার ব্যঙ্গগল্প যুগুর, বিস্তি, থ্যাঙ্কস্ ও ব্যঙ্গ কবিতা বন্ধুর বোন প্রকাশিত হয়েছে। তারপরই বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হল ব্যঙ্গ-রচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে সিরিয়াস্ রচনা ট্রেন (গল্প), রূপ ও তৃষ্ণা (কবিতা), চাঁপার গন্ধ আরও যে নিবিড় হল (কবিতা) প্রভৃতি। সজনীকান্ত তার জীবনস্মৃতিতে "আমার চাঁপার গন্ধ আরও যে নিবিড় হল" কবিতাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছে। অবশ্য বছর দুই পরে সজনী বঙ্গশ্রীর সম্পর্ক ত্যাগ করে আবার শনিবারের চিঠির সম্পাদকরূপে ফিরে এল। কিছুদিন সচিত্র ভারতের ও অলকার সম্পাদনাও সজনী সে সময়ে করেছিল।

সজনীর হাতে বঙ্গশ্রীর যে কতদূর উন্নতি হয়েছিল, পরিমল গোস্বামী তার আত্মস্মৃতিতে সে কথা স্পষ্ট ভাবে বলেছে। বাংলা দেশে তখন অমন উন্নতধরনের পত্রিকা আর একখানিও ছিল না।

সজনীর সঙ্গে সুখে দুঃখে অনেকদিন কাটিয়েছি। তার নিজের লেখা অনেক বইয়ের পাণ্ডুলিপি সজনী আমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছে। তার শেষ কবিতার বই পান্থপাদপ (প্রেস কপি) ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়িতে বসে শুনেছি। সে সময়ে তার গুণবতী সহৃদয় সহধর্মিণীও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। মন্মথ রায়ের নতুন কোন নাটক শোনবার সময়ে সজনী আমাকেও খবর পাঠাত। আমার লেখা গল্পের চিত্ররূপ দর্শন করতে সজনী আমার সঙ্গে কলকাতার অনেক চিত্রগৃহে যেত। সজনীর স্মৃতি আমার অন্তরে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে সর্বদা মনে হয় সজনীকে কোনদিন হারাই নি, হারাতে পারি না। সজনী আছে, আর চিরদিনই থাকবে। শুধু বাংলা-সাহিত্যে নয়, বন্ধুদের অন্তরেও সে অমর হয়ে আছে। সজনীর সান্নিধ্যে গেলে মনে হত যেন মনের অনেক গ্লানি, অনেক বেদনা লোপ পেয়েছে। সে মধুর আলাপন, বন্ধুত্বের সে আন্তরিকতা, সমালোচকের সে পাণ্ডিত্য আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এবং সবচেয়ে বড় একখানি শান্তস্নিগ্ধ গুণগ্রাহী কবি-হৃদয় আর কোথাও যে দেখতে পাব না, এই দুঃখই আমার জীবনে চিরদিন বড় হয়ে রইল।

'সে প্রচণ্ড গতি অবসান'

জীবনময় রায়

দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার খেসারত সকলকেই দিতে হয়। জীবনে সেই খেসারত দিতে দিতে অজানার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। চলিয়াছি এই বিরাট ব্যাপ্ত তমসাবৃত অজানার বক্ষ ভেদ করিয়া স্বল্পাবৃত আলোআঁধারি-জ্ঞানের ছায়াপথ পথে। কোথা হইতে আসিয়াছি জানি না, কোথায় চলিয়াছি তাহারও কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। চলিয়াছি শুধু খণ্ডিত কালস্রোতের অমোঘ প্রবাহের টানে নিরবলম্ব হইয়া। সেই ন-আলোক ন-আঁধার পরিবেশের মধ্যে আমার অজানা যাত্রাপথের সঙ্গীদল চলিয়াছে দলে দলে। হৃদয়ে হৃদয়ে সান্নিধ্যের উত্তাপে, প্রাণে প্রাণে আনন্দবেদনার স্পর্শে কত সম্পর্ক গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে, নিকটে আসিতেছে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে। প্রাণের আলোক বহন করিয়া চলিয়াছে দলে দলে, সারে সারে, সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, নিকটে দূরে। আমার অর্ধস্তিমিতপ্রায় প্রাণপ্রদীপটি বহন করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে নিশিতে পাওয়ার মত আবিষ্ট হইয়া আমিও চলিয়াছি। দিন যাইতেছে, মাস যাইতেছে, বৎসর যাইতেছে—যুগের পর যুগ চলিয়া গেল—আমার চলার যেন আর বিরাম নাই। "কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত" একই জায়গায় ঘুরিতেছি যেন—কিন্তু তা তো নয়! কালের দুনিবার স্রোতের নিরবগ্রহ আকর্ষণে চলিয়াছি—চলিয়াছি দুর্জ্ঞেয় দূরান্তরের পানে ও টানে। এই অনন্তযাত্রাপথের সঙ্গীদল সেই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে আপন আপন দেউটিটি লইয়া চলিয়াছে কেহ ঘন নিবিষ্ট হইয়া পাশে পাশে, কেহ বা ব্যবধান রাখিয়া দূরে দূরে। একটি একটি করিয়া দেউটি নিবিতেছে—কেহ দূরে, কেহ নিকটে, সে অন্ধকারের আড়ালে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। কোথায় গেল? খবর চাহিলে সকলে নির্বাক হইয়া পরস্পরের মুখে তাকায়। সকলের নয়নে সেই প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি—কোথায়? ওগো, কোথায়? দেখিতে দেখিতে পিতার অভয় হস্ত খসিয়া গেল। মাতার বক্ষ হইতে চ্যুত হইলাম। মা, মাগো, কোথায় মা, এই অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেলে? আকুল হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম, আর সাড়া মিলিল না। আঁধার পারাবারের নিয়তির মত দুর্বার, স্রোতের টানে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিল। অন্বেষণেরও অবসর দিল না। গেল, গেল, একে একে নিবিল দেউটি। কত বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় মহৎ হৃদয় গেল, কত প্রেমার্ত হৃদয়ের দৃঢ় আলিঙ্গন স্খলিত হইয়া নিরুদ্দেশের অন্ধকারে ডুবিল; কত বয়স্য গেল, কোথায় গেল তারা গো? কত প্রতিভাদীপ্ত জীবন্ত মানুষ; কত প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবার জন চলিয়া গেল; চলিতে চলিতে চাকতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কিন্তু গেল কোথায় গো?

তবু এই জরাজীর্ণ জীবনভার লইয়া স্তিমিতায়মান প্রাণদীপটি বহন করিয়া আমার এই অসহায় যাত্রার বিরাম নাই। যাহারা সমবয়স্ক তাহারা মিলাইয়া গেল, যাহারা বয়ঃকনিষ্ঠ তাহারাও এই গভীর অন্ধকারে কোথায় লুকাইল। কে বলিয়া দিবে। আমার প্রাণের এই ক্রন্দন কাহার নিকটে গাহিব। সকলেই যে সেই একই অন্ধকারের যাত্রী?

সজনীকান্তের জন্মদিন ৯ই ভাদ্র ১৩০৭। ঠিক ঐ দিন ১২ বৎসর আগে আমার জন্ম। তাই ভাবিতেছি এমন হয় কেন? এমন সতেজ সবল প্রজ্বলন্ত বহ্নিবৎ প্রাণশক্তি এমন দপ করিয়া নিবিয়া গেল কি করিয়া আর স্তিমিতপ্রাণ লইয়া আমিই বা কেন পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিয়া ভগ্নচক্র গো-শকটের মত চলিয়াছি তো চলিয়াছিই—তাহার আর বিরাম নাই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিচিত্র ঘটনার জটিলতায় সমস্ত স্মৃতি আমার তালগোল পাকাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। শুধু এই গভীর তমসাচ্ছন্ন জীবননদীর বিস্মৃত পার হইতে ভরা হৃদয়ের সেই হৃদয়ভরা ডাক কানে আসিয়া বাজিতেছে—জীবনদা! ঐ! ওই আমাদের সজনীকান্ত। সকলকেই সে তার ওই প্রাণভরা ডাকে আপনার গভীর অন্তরে নিবিড় বন্ধনে চিরদিনের মত বাঁধিয়া রাখিয়া গেল।

আর তার 'স্বরূপ' ছিল, তার দুর্বার গতিবেগ, অমোঘ তার প্রাণশক্তি। 'কে রোধিতে পারে তার গতি?' তার সেই ঝঞ্ঝামদমত্ত গতিবেগ, অন্যেপরে কা কথা, তার নিজেরও রোধ করিবার সাধ্য ছিল না। অণুপ্রমাণ বীজ হইতে উৎপন্ন বটবৃক্ষের মত পৃথিবীর সমস্ত প্রতিকূলতাকে সমস্ত ঝড়বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতের অপঘাতকে জয় করিয়া আপনার দুর্জয় প্রাণশক্তিতে সে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—কেহ সেই গতি রোধ করিতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই ভুল ধারণা থাকা অসম্ভব নয় এবং সজনীকান্তের নিজের মধ্যেও সেই ভুল ধারণা ছিল যে তার প্রচণ্ড অগ্রগতির পথে কোন কোন অবস্থায় কেহ কেহ তাহার হাত ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। সজনীকান্ত সম্পূর্ণ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির অনিরুদ্ধতায় অপ্রতিহতগতিতে সামান্যতা হইতে অসামান্যতার ঊর্ধ্বতর সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ বীর্যশালী পৌরুষের তুলনা মেলা কঠিন।

আজ "সে প্রচণ্ড গতি অবসান।"

বন্ধুবৎসল সজনীকান্ত

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সজনীকান্ত মধু ও হুলের কবি। সারাজীবন তিনি অবাঞ্ছিত সাহিত্যসৃষ্টিকে হুল ফুটিয়েছেন। সেই দংশন থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নি। এ যুগের যেসব খ্যাতিমান লেখক কল্লোলযুগীয় তাঁদের সকলেরই সজনীকান্তের হুলের তীব্রতা সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। তবে সে হুল ফোটানোর ফলে পাঠকসাধারণ রসোপভোগ করতে পেরেছেন অনেকক্ষেত্রে।

শনিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থ সজনীকান্তকে অনেক সাহিত্য-যশঃপ্রার্থীই সে যুগে শনিগ্রহ বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু সেই মন্দগ্রহ মন্দ মন্দ চালে শেষ পর্যন্ত অনেকেরই সৌভাগ্যের সহায়তা করেছে।

সজনীকান্তের সাহিত্য-বিচারে যা-কিছু অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছে, তাকে তিনি রেহাই দেন নি। তাঁর সাহিত্য-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর মতানুযায়ী শ্লীল-অশ্লীল ভেদরেখা একদিন প্রভূত বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল, আজ বোধ হয় তা থেমে গেছে; কারণ কল্লোলী প্লাবনের পঙ্কিল অংশ এমনিতেই থিতিয়ে গেছে, তার প্রাণশক্তিও হারিয়েছে তার বেগ।

তাই সজনীকান্তের সাহিত্য-বিচারের আদর্শ নিয়ে নতুন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আজ নিষ্প্রয়োজন। তবে তখনকার সাহিত্যসাগরে তাঁর মন্থনদণ্ড চালনায় কেবল যে মণিমুক্তাই 'সেট-ফোর্থ' হয়েছিল তা নয়, সাহিত্য-সৃষ্টির কল্লোল অনেক জোরদার হয়েছিল।

অথচ আশ্চর্য, সজনীকান্ত চারদিকে হুল ফুটিয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সকলেরই নিবিড় সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর বিশেষ একজন এই পবিত্র গাঙুলীর সঙ্গে সজনীকান্তের প্রীতি ছিল গভীর আন্তরিকতায় ভরা।

সাহিত্যিক মতবাদের পার্থক্য কি বৈপরীত্য সজনীকান্তের ব্যক্তি-সম্পর্ককে কোনদিন প্রভাবিত করে নি, এইটিই ছিল সজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য। মজলিসী তর্কে মতানৈক্যের ফলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, অথবা পত্রপত্রিকায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে ব্যক্তিসম্পর্কের তিক্ততা দেখতে আমরা এমন অভ্যস্ত যে, সজনীকান্তের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি।

সাহিত্যের আসরে যাঁদের সঙ্গে ফাটাফাটি, তাঁদেরই প্রতি বন্ধুবৎসল সজনীকান্তের গভীর প্রীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আর সে প্রীতি শুধু বাক্য-নির্ঝরনিষেকে স্নিগ্ধ করে ক্ষান্ত হত না, প্রত্যক্ষ কর্মপ্রচেষ্টায় দুঃখ-বিষাদ নিরসনে এগিয়ে আসত অপরিসীম ব্যাকুলতা নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার সামান্য রূপান্তর করে বলতে পারি, সজনীকান্তের আমি বহুদিন ছিলাম প্রতিবেশী, দিয়েছি যত পেয়েছি তার বেশী। অন্তরের প্রতিবেশীত্বে আমি যদি কিছু দিয়ে থাকি তাঁকে, তা নিছকই বস্তুসত্তা-বিহীন আন্তরিকতার ভাঁওতা। অথচ তিনি তাঁর সে যুগের সমগ্র আক্রমণের লক্ষ্যকেন্দ্র কল্লোলের এই ব্ল্যাক-শীপটিকে কতভাবে যে সাহায্য করেছেন, আজ তা ভাবতেও আমি বিহ্বল হয়ে পড়ছি। শুধু সাহিত্যের আদর্শে নয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসেও আমাদের পার্থক্য ছিল মেরুবৎ, কিন্তু কোনদিন সেদিক দিয়ে আমাদের সৌহার্দ্যে চিড় ধরে নি, বরং রাজনীতি যাতে আমাদের মধ্যে কোনরকম বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁকে সদাসচেতন থাকতে দেখেছি।

বেকার অবস্থায় তখন গন্তব্য অগন্তব্য নানা স্থানে সময় কাটাই। মনোমোহন থিয়েটারে তখন 'চাঁদসদাগর' অভিনয়ের সরগরম। প্রবোধদার (প্রবোধচন্দ্র গুহ) স্নেহের সুবাদে সেই পরিবেশে নিজেকে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। মাতব্বরিও কিছুটা করে থাকি। এমন অবস্থায় একদিন অভিনয় শুরুর মুখোমুখি দোতলায় প্রবোধদার ঘরে যাবার সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল সদলবল সজনীকান্তর সঙ্গে। প্রবোধদা ঘরে নেই, সজনীকান্তরা অভিনয় দর্শন-প্রয়াসী। কাজেই আমিই নিয়ে তাঁদের বসিয়ে দিলাম।

এক অঙ্ক শেষ হতে প্রবোধদা এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। সজনীকান্ত প্রবোধদাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

সজনীর স্মরণে

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

সাহিত্যিক হিসাবে পরিচয় দেবার স্পর্ধা আমার নেই, তবুও কলম ধরেছি বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস সম্বন্ধে দুটো কথা বলার জন্যে। সজনীর সঙ্গে পরিচয় প্রবাসী অফিসে, সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন শনিবারের চিঠিকে গড়ে তোলার জন্য তোড়জোড় চলেছে। পরিচয় কখন আড়ষ্টতাপূর্ণ ভদ্রাচারের সীমানা পার হয়ে সহজ ঘনিষ্ঠতার দিকে ঝুঁকেছিল মনে নেই। ক্রমে সঙ্কোচের বাধা অপসারিত হওয়ায়, নানা বিষয় আলোচনা হত। আলোচনা উত্তেজনার স্তরে এসে পড়লে বক্তব্য অনেক সময় বচসার সীমানায় এসে গিয়েছে, বিরুদ্ধ মতের মিল না ঘটাতে পারলে মনোমালিন্যকে পাশ কাটাতে পারি নি, কিন্তু পুনরায় মিলিত হয়েছি সত্যকে মানার জন্য। ত্রুটি স্বীকারে দ্বিধা আসে নি, বরং নত হতে পারার আনন্দ পেয়েছি। সংক্ষেপে প্রাচীন উপদেশ—যথা "সত্য বলিতে হইলে প্রিয় বাক্য ব্যবহার করিবে, অপ্রিয় হইলে কদাচ তাহা উচ্চারণ করিবে না" এই জাতীয় বাণী মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে যুক্তিপূর্ণ বিচার কঠোর হলেও

আমি তাঁর থিয়েটারে চাকরি করছি কিনা। যখন জানলেন, নেহাত অনারারি, প্রবোধদার স্নেহের সুবাদেই কাজ করছি, পরে আমায় প্রশ্ন করে জানলেন, আমি তখন বেকার। একটু পরে প্রশ্ন করলেন, 'পবিত্রদা, চাকরি করবেন প্রবাসী প্রেসে?' এই প্রথম সজনীকান্ত আমার পরবর্তী জীবনের ডাকনাম বনে যাওয়া 'পবিত্রদা' বলে সম্বোধন করলেন।

সজনীকান্তের নির্দেশে প্রবাসী প্রেসে এসে হাজির হলাম। কিছুটা সংকোচ নিয়েই সজনীকান্ত বললেন, চাকরিটা সামান্য, আপনার উপযুক্ত নয়, প্রুফরীডারি। মাইনেও সামান্য, সংসার চালাবার মত নয়, তবে যাতে চলে তার জন্য উপরি রোজগারের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে বলে আশা করছি। সজনীকান্ত তখন প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজার। প্রেসে বইয়ের বেশ ভাল ভাল কাজও হচ্ছে।

উপরি রোজগারের ব্যবস্থার জন্য সজনীকান্ত সচেতন। প্রবাসী প্রেস খরিদ্দারের একটা প্রুফ দেখবে, লেখক-প্রকাশকের দায়িত্ব বাকি প্রুফ দেখা। লেখক-প্রকাশকের পক্ষে ওই কাজটুকু করে দিয়ে সজনীকান্তের চেষ্টায় কিছু কিছু উপরি উপার্জন নিয়মিতই পেতে থাকলাম। একজন লেখকের রচনা ঘষে মেজে দিয়ে প্রুফ দেখার তাবৎ দায়িত্বের বিনিময়ে থোকে একশো টাকা পাইয়ে দিলেন সজনীকান্ত।

শনিবারের চিঠি অথবা প্রবাসী প্রেস—একটা বেছে নিতে হবে, দু নৌকোয় পা দিয়ে চললে চলবে না, এই নির্দেশে সজনীকান্ত যেদিন প্রবাসী প্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অভিনন্দন লাভ করলেন সুস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে। আমি তারও পরে আরও বছর-খানেক প্রবাসীতে রইলাম, তবে উপরি বন্ধ হয়ে গেল। বিকেলের দিকটা বীডন স্ট্রীটে শনিবারের চিঠি অফিসে কাটাই।

সজনীকান্ত প্রতিদিন আমার ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে জানেন, যখন যে ভাবে পারেন সাহায্য করেন।

কবি লেখক সমালোচক সম্পাদক গবেষক সজনীকান্ত, শুধু যে কোন মাত্র একটি দিকে অভিন্ন মনঃসংযোগ করলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি স্থায়ী আসন লাভ করতেন, সেই সজনীকান্ত আমার বিচার্য নন, তা রসিক সমঝদারের। আমি ব্যক্তিমানুষটিকে ভালবেসে-ছিলাম। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুবৎসলতায় স্নিগ্ধ হয়েছি আজীবন। তাঁর বিরহ, দাদাকে পিছনে ফেলে তাঁর আগে চলে যাওয়া—আমাকে বিহ্বল করেছে। জীবনের বাকি কটা দিন এ বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারব না, চাইও না। অন্য কলকোলাহলের ও নিজস্ব ব্যক্তিসম্মানের নেশায় সজনীকান্তকে ভুলে থাকা আমার কাম্য নয়, তাঁর বিরহবেদনা আমার অন্তরের এক গভীরতম অনুভূতি।

তাকে সুবিচার বলে গ্রহণ করতে শিখলাম সজনীর কাছে। প্রয়োজন অনুসারে ক্ষুরধার কঠোরোক্তির দ্বারা সজনী যেমন ব্যভিচারিতার পৃষ্টপোষককে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতেন তেমনি রসসৃষ্টির বিচারে তাঁর ঔদার্য ছিল অসীম।

সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে সজনী কোন সময়ে বলেছিলেন, বাকযুদ্ধে ভাষাকে তো বেশ শানিয়ে ব্যবহার করতে পার, রচনায় ওই ধরনের কথা কাজে লাগাও না কেন? উত্তর দিতে হল, আমার বিদ্যার দৌড় ঘরোয়া শিক্ষায় আটক পড়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পারি নি। ঘরোয়া পুঁজিকে সম্বল করে লেখার চেষ্টা হাস্যকর হবে না কি?

সঙ্কোচের কারণ শুনে সজনী বললেন, ভাষা শেখার আগেই শিশু যখন আত্মপ্রকাশের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, যে কোন প্রকারে বক্তব্যকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য দৃঢ়পরিকর হয়, তখন কি কালিদাস ভবভূতি বা পাণিনির উপদেশের জন্য সে অপেক্ষা করে? কোন শিক্ষাপীঠের দাগী পণ্ডিত না হয়েও শিশু যা বলতে চায় তা জোর দিয়েই বলে এবং শ্রোতাকে মনের কথা বুঝিয়ে ছাড়ে। উত্তরে বলেছিলাম, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের প্রকাশভঙ্গী তো এক নয়। শিশুর অপটুতাকে কেউ হাস্যকর ভাবে না, বলার মধ্যে আন্তরিকতাই শ্রোতাকে অনুরাগী করে তোলে, বক্তব্যের অর্থকরণ তখন গৌণ হয়ে যায়, শিশুর মুখে আবোলতাবোলই শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিশুকে অনুকরণ করতে গেলে লোকে তাকে পাগল বলবে। সজনী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, পাগল বলার ইচ্ছা থাকলে সুস্থ মানুষকেও পাগল বলা যায়, ওটা ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থসিদ্ধির কৌশলও হতে পারে। দোষ ধরার আগে গুণকে যে ছেঁকে নিতে জানে সেই হল রসগ্রাহী। স্বীকার করি ভাবকে যথাসম্ভব পূর্ণ রূপ দিতে হলে উপযুক্ত ভাষার সহযোগিতা বাতিল করা চলে না, কিন্তু রসাত্মক ভাবোচ্ছ্বাসে পাণ্ডিত্য তেড়ে উঠলে জ্ঞানের সম্পদই প্রচার হয় বেশী, রসের কথা অসাড় হয়ে যায়। এই সূত্রে আরও অনেক কথা বলেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ উপস্থিত প্রয়োজন নেই।

আমাদের কথোপকথন থেকে বোঝা যাবে যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তীব্র সমালোচনায় ব্রতী হন নি, সাহিত্যের বৃহত্তর আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই কঠোর হতে হয়েছে। যেখানে আঘাত করার প্রয়োজন আসে সেখানে বলিষ্ঠ চপেটাঘাতের পরিবর্তে গায়ে হাত বোলালে আদর হয়ে যায়। যাকে বিরুদ্ধমত বা বিশৃঙ্খলার সমর্থন বা প্রশ্রয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

যেখানে সাহিত্যের কল্যাণার্থে শাসনের একান্ত প্রয়োজন সেখানে সমালোচনাকে লঘু ভাষার মুখোশ পরালে বলতে হয় বক্তব্য আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে অথবা দুর্বল। আত্ম-প্রবঞ্চনায় পারদর্শী না হলে কোন সমালোচক পাত্র হিসাবে পক্ষপাতিত্বের শর্তকে মানতে পারে না। সজনী এদিক দিয়ে নিজেকে কখনও ঠকান নি। বিচারে ত্রুটি হলে উপযুক্ত সময়ে সংশোধনের সৎসাহসও তিনি দেখিয়েছেন। হতে পারে, তাঁর বিচার সব সময় চলতি ধারা মেনে নিতে পারে নি, এই কারণে জনপ্রিয় হবার সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তবুও আপন বিশ্বাসকে চাহিদার তাগিদে নত হতে দেন নি। সূত্র প্রসঙ্গে বলা চলে, বারুদে আগুন লাগানোর পর দলবদ্ধ আততায়ী তোপের সামনে যদি দাঁড়ায় এবং ভাবে দলভারীর ভয়ে কামানের বিস্ফোরণে পুষ্পমাল্য বর্ষণ হবে তা হলে বুঝতে হবে, অস্ত্রটির উদ্দেশ্য ও শক্তির খবর তাঁরা রাখেন না। সজনীর সব মতের সঙ্গে আমার যে মিল ছিল না তা গোড়াতেই বলেছি, কিন্তু তাঁর নির্ভিকতা, সাহিত্য-সেবার পরম নিষ্ঠা ও রসগ্রাহীতা সম্বন্ধে ঔদার্যের কথা বিচার করলে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না। এইরূপ একটি আদর্শ চরিত্রের অভাব আজ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সজনী তাঁর বিরাট কীর্তিকে অমর করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

শনিবারের চিঠির সঙ্গে সজনীকান্ত যে নাড়ীর টানের মতই জড়িয়ে ছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। শনিবারের চিঠির গত সংখ্যায় তারাশঙ্কর এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

সজনী সম্বন্ধে লিখতে হলে বউদির কথাও মনে পড়ে। তিনি শুধু সজনীর সহধর্মিণী ছিলেন না, একাধারে মাতা, ভগিনী ও বন্ধু হয়ে স্বামীকে আগলিয়ে থাকতেন। সজনীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ যদি বউদির আশ্রয় না পেতেন। চলতে ফিরতে শুনেছি, সজনী ডাকছেন "সুধা"। অন্ধ যেভাবে যষ্টির সাহায্যে পথের নির্দেশ খোঁজে ঠিক সেই ভাবে বউদি ছিলেন সজনীর দৃষ্টি। দৃষ্টি আজও আছে, কিন্তু দেখার মানুষটি নেই। যে ডাকের অপেক্ষায় বউদি সদাই চঞ্চল হয়ে থাকতেন সে ডাকও বন্ধ হয়েছে। যে নেই তাকেই স্মৃতির গহ্বর থেকে ডেকে তোলার চেষ্টায় যে সাড়া পাওয়া যায় তা হাহাকার। আমি শুনছি ওই পাঁজরাভাঙা ধ্বনি।

—

যেটুকু জেনেছি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বহুদিন আগেকার কথা। কলকাতায় যাওয়া-আসা তখন আমার খুবই কম। সাহিত্যিক-মহলে সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই বললেই চলে। লেখা একমাত্র 'প্রবাসী'তেই কিছু কিছু বেরুচ্ছে মাঝে মাঝে। 'প্রবাসী' অফিসেই গেছি। লেখা উপলক্ষ্য করে যেটুকু পত্রাচার তা তখন চারুবাবুর পরে ব্রজেনবাবুর সঙ্গেই চলে, ইচ্ছেটা তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নিয়ে নেপথ্য থেকে একটু সদরে এসে ঠাঁই করে নেওয়া।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটু এগিয়েছি, আচম্বিতে পাশ থেকে প্রশ্ন—কাকে চান?

প্রশ্নকর্তা বোধ হয় পাশের ঘর থেকেই সেইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন, একটু থতমত খেয়ে গিয়েই উত্তর করলাম, ব্রজেনবাবুকে।

তিনি নেই।

নিতান্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর—আর ইংরেজীতে যাকে বলা যায় curt। অর্থাৎ কথা বাড়াবার ইচ্ছে না থাকলে যেমন হয়ে থাকে। প্রশস্ত ললাট, অত্যন্ত উজ্জ্বল চক্ষু এবং অতিরিক্ত গম্ভীর মুখের ভাব। ব্যস্তই ছিলেন, ওপরতলার দিকে এগিয়েই গেলেন, আমিও ফিরলাম—নিরাশ হয়েই।

বলার ভঙ্গি এবং চেহারা মিলিয়ে সেদিন এই ধারণা নিয়েই ফিরি যে এই মানুষটি 'প্রবাসী' অফিসে থাকলে আমার কাছে এখানকার পথ চিরতরে বন্ধ, এবং 'প্রবাসী'-গোষ্ঠীর মাধ্যমে বৃহত্তর সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ের যে আশা তারও পরিসমাপ্তি এইখানেই। ব্রজেনবাবু নিশ্চয়ই ছিলেন না, আর সজনীবাবুও বোধ হয় খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তার সঙ্গে এটুকুও নিশ্চয় যে যে-কারণেই হোক আমি এই ধারণা নিয়েই ফিরেছিলাম 'প্রবাসী' অফিস থেকে সেদিন।

এর পরের যা ইতিহাস তা ক্রমাগত এই ভুলটা ভেঙে যাওয়ারই ইতিহাস।

সজনীবাবু বদলান নি। সেই চেহারা, সুপুষ্ট ভ্রূ-যুগলের নীচে দৃষ্টির সেই তীক্ষ্ণতা, কথাবার্তার মধ্যে সেই সংক্ষিপ্ত বাক্য-প্রয়োগ, বলার ভঙ্গিতেও সেই দৃঢ়তা—সব মিলিয়ে প্রথম পরিচয়ে এই ধারণাই হবে যে লোকটি কাজের বাইরে এক-পা যাওয়ার নয়, কিন্তু পরিচয়টা গাঢ়তর হলে দেখা যাবে ভেতরে এমন একটি স্নিগ্ধ সরল অন্তঃকরণ রয়েছে যার সঙ্গে, চলিত অর্থে আমরা যাকে কাজ বলি তার যেন কোন সম্পর্কই নেই। ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে, প্রথম সাক্ষাতে যিনি আমার মনে ওই রকম একটা বিরূপ ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন উত্তর-জীবনে সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করে দিতে তিনিই আমার সবচেয়ে হয়েছেন সহায়ক; অন্ততঃ পরিচয়ের প্রথম দিকে তো বটেই। ওঁর একটা অদ্ভুত আকর্ষণীশক্তি ছিল, একটা personal magnetism—যার জন্য ওঁর সান্নিধ্যে এলে সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককেই পাওয়া যেত। এই গোষ্ঠীরচনার শক্তি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল তাঁর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে।

তখনও আমার কলকাতায় যাওয়া-আসা খুবই কম, প্রায় পূর্ববৎই। 'প্রবাসী' অফিসের পর আমি সজনীবাবুকে দেখলাম "বঙ্গশ্রী" অফিসে। ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে যে প্রতিষ্ঠা, যে পরিবেশ স্থায়ী রূপ নেবে, সেদিন পেলাম যেন তারই পূর্বাভাস। উনি একটি বড় টেবিলের সামনে ওঁর সম্পাদকীয় (সহকারী?) আসনে বসে,

টেবিলের চারিদিকে সাত-আটজন সে-সময়কার উদীয়মান সাহিত্যিক, অথবা সাহিত্য-পরিবেশের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন। মনে পড়ছে অশোক চট্টোপাধ্যায় আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জোর আড্ডা আর মজলিসী গল্পের মধ্যে সজনীবাবু কাজ করে যাচ্ছেন। একেবারে নিঃসম্পর্কিতও নয়। আমি প্রবেশ করে ওঁকেই নামটা বলতে বেশ একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই অভ্যর্থনা করে নিলেন। সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিরই আর-এক রূপ, অল্প কৌতুক-হাসির সঙ্গে ডান হাতটা টেবিলের ওদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, বিভূতি মুখার্জি, আর এই বিভূতি ব্যানার্জি—আসুন, আসুন!

এই রূপটি ওঁর আরও খুলল মোহনবাগান রোর ছোট্ট ঘরটিতে, যখন উনি স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠিত, শনিরঞ্জন প্রেস এবং 'শনিবারের চিঠি'র মালিক। স্বল্পায়তন ঘরটি, যখনই গেছি—বিশেষ করে বিকালের দিকে—যেন ভরে উপছে পড়ছে—বইয়ে-কাগজপত্রে, কাজে-অকাজে, আর সাহিত্যিক-অসাহিত্যিকে। চেয়ার টেবিল যা গাদাগাদি করে রাখা যায় সব ভর্তি, চেয়ারের হাতলও রেহাই পায় নি, দুটি দরজাও আবদ্ধ! অবশ্য মানুষ দিয়েই; শনিবারের চিঠির দরজা খিল এঁটে বন্ধ করবার নিয়ম ছিল না। কেন্দ্রে সজনীবাবু। সেই উন্নত ললাট, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; কাজের মধ্যে যদি আনত রইল তো কত গম্ভীর, মজলিসী গল্পের মধ্যে যদি উঠে এল তো কী কৌতুকদীপ্ত! পাশাপাশি একসঙ্গেই চলেছে।

এই মানুষটিই শনিবারের চিঠি।

'বঙ্গদর্শন' অনেক দূরে পড়ে গেছে এখন। সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ আমাদের সময়ের এমন মাসিকপত্রের যদি নাম করতে হয় যেগুলি স্বকীয়তায় অনন্যসাধারণ তো একসঙ্গে তিনটির নাম করতে হয়—প্রবাসী, সবুজপত্র আর শনিবারের চিঠি। তিনটি সৃষ্টিই তাদের স্রষ্টাদের সঙ্গে একাত্ম, তাঁদের ব্যক্তিত্বের আলেখ্য। শুধু চরিত্রের দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়ে নয়। চরিত্র, মন আর বাহ্যিক রূপ নিয়ে সম্পূর্ণ যে ব্যক্তিত্ব, তারই আলেখ্য।

সম্পাদক হতে হলে কি কি গুণ দরকার সে সম্বন্ধে রামানন্দবাবু তাঁর জীবিতকালে সুন্দর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নিরিখে সজনীবাবু একজন আদর্শ সম্পাদক তো ছিলেনই—সময়নিষ্ঠা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা, প্রবল আত্মপ্রত্যয়—এই সব দিক দিয়ে; এর অতিরিক্ত তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, স্যাটায়ারিস্ট, হাস্যরসিক। বাহ্য এবং অন্তঃপ্রকৃতির এ সবটুকুই শনিবারের চিঠিতে হয়েছে প্রতিফলিত।

তবুও একটা কথা যেন থেকেই যায়। একটা অনুতাপই। এই অন্তঃপ্রকৃতির সেই দিকটা নিয়ে, যেখানে তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, স্যাটায়ারিস্ট, হাস্যরসিক—এককথায় একজন সব্যসাচী সাহিত্যিক। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্রকে পূর্ণভাবেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, 'সাধনা'ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাকে কিছুমাত্র ব্যাহত করে নি, কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালনার মধ্যে কি ছিল জানি না, এই সব্যসাচী সাহিত্যিককে পূর্ণভাবে পেতে দেয় নি আমাদের। তাঁর প্রতিভার এক-একটা দিক-সংকেত দিয়ে থেমে থেমে গেছে।

কথাটা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে, তাই উল্লেখ করলাম এখানে। অন্যথা যা পাওয়া গেছে সর্বসাকুল্যে তা এত বিরাট, বিপুল এবং গভীর যে তার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। কি সম্ভাবনা ছিল তার কথা তবু ভোলা যায়, কিন্তু যা ছিল প্রত্যক্ষ, প্রতিদিনের উপলব্ধ সত্য, তাকে তো ভোলা যায় না। তারই অভাব আজ আমাদের দুঃখে-শোকে অভিভূত করে ফেলেছে।

—

সজনীকান্ত

মনোজ বসু

এগারোই ফেব্রুয়ারি রবিবার দুপুরবেলা টেলিফোনে দুঃসংবাদ এল। দেবব্রত ভৌমিক জানালেন সজনীদার বাড়ি থেকে। রিসিভার হাতে ধরে স্তম্ভিত হয়ে আছি। মন অসাড়। বজ্রাহত হলে বোধ করি এই রকমটা হয়। পরমুহূর্তেই আবার টেলিফোন। পুলিনবিহারী সেন করছেন। একই খবর।

সেই আচ্ছন্ন ভাবটা আজও বোধ হয় একেবারে কাটে নি। মানুষটিকে এত দেখেছি যে কোথা থেকে প্রসঙ্গ শুরু করি ভেবে পাচ্ছি না। ভাবনার পারম্পর্য থাকছে না।

পিছনে ফিরে চলে যাচ্ছি সেকালের যৌবন-দিনে। 'প্রবাসী'র তখন অতুল প্রতিষ্ঠা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায় নিজে সব দেখাশুনা করেন। প্রবাসীতে লেখা বের করা লেখকের সর্বোচ্চ কামনা। সেই কাগজে আমার প্রথম গল্প বেরুল 'বাঘ'। জানাশোনা ছিল না, ডাকে পাঠিয়েছিলাম—ধৈর্যের পরীক্ষাও তাই অনেক পরিমাণে দিতে হয়েছে।

কবি হেম বাগচী আমার বন্ধু। বললেন, চলুন ওঁদের অফিসে। টাকা দেবে।

দয়া করে কাগজে ছেপেছে—তার উপরে আবার টাকা! অন্য কেউ বললে হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু হেম বাগচীর আনাগোনা আছে ওখানে, কবিতা ছাপা হয়।

হেম বললেন, আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। চলুন।

অপরাহ্ণ বেলা। নীচের তলার আধো-অন্ধকার ঘরে অনেক মানুষের গুলতানি। সেই নাকি অফিস! কারা ছিলেন, সকলের নাম বলতে পারব না। তিনটি মানুষ শুধু মনের অন্দরমহলে ঢুকে বসে রয়েছেন। মরে পুড়ে ছাই হওয়ার আগে তাঁদের ভুলতে পারব না। সজনীকান্ত দাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সজনীকান্ত প্রবাসী-অফিসের ম্যানেজার। টাকাকড়ির ব্যাপারে তিনি কর্তা। হেম বললেন, বৈশাখের প্রবাসীতে এই ভদ্রলোকের গল্প বেরিয়েছে। দক্ষিণার জন্য এসেছেন।

গল্প! কোন্ গল্পটা বলুন দিকি?—বিভূতিদা প্রশ্ন করলেন।

গল্পের নাম শুনে কলরব উঠল। বিভূতিদা বললেন, সেই যে—এক্ষুনি যে গল্পের কথা হচ্ছিল।

অচেনা নতুন লেখকের লেখা পড়েছেন এঁরা, তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটা টেবিল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার। এবং বেঞ্চিও আছে। পাশাপাশি সবাই বসেছেন। এমন আসরে নবাগত আমি কুণ্ঠিত ভাবে দূরের দিকে বসতে যাচ্ছিলাম। হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে ওই ভিড়েরই ভিতর গুঁজে নিলেন আমায়। টানটা কে দিলেন, সঠিক আজ বলতে পারব না—ওই তিনেরই একজন। তেলে-ভাজা রয়েছে শালপাতার বিশাল ঠোঙায় এবং খবরের কাগজে ঢালা মুড়ি ও ছোলা-ভাজা। রাজসূয় আয়োজন—দেড়গণ্ডা দু-গণ্ডা হাত একসঙ্গে বেরিয়ে এসে মুড়ি গলাধঃকরণ করছে। আমিও তার মধ্যে। অর্থাৎ, পয়লা দিনেই সাহিত্য-রাজ্যে পুরোপুরি অভিষেক হয়ে গেল আমার। 'শনিবারের চিঠি' বেরুচ্ছে তখন, সাহিত্য-অঙ্গনে তোলপাড় পড়ে গেছে এঁদের এই দলটিকে নিয়ে। পদাঘাতে বড় বড় পালোয়ান ধরাশায়ী হচ্ছেন। সে আমলের সাহিত্য-দিক্‌পালেরা রীতিমত সন্ত্রস্ত। কিন্তু শুধুই আঘাত নয়—কোন্ অঙ্কুর কোথায় আকাশমুখো মাথা তুলতে চাইছে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতেন এঁরা। আজকের দিনে যত ভালই লিখুন, লেখকের ভাগ্যে বোধ করি এমন ধারা ঘটে না।

তিন যুগ আগেকার অপরাহ্ণের সেই পরিচয় এগারোই ফেব্রুয়ারি ছেদ পড়ে গেল। বিরোধ অনেকবার হয়েছে, মতান্তর প্রচুর। গালিও খেয়েছি, কিন্তু মনান্তর হয় নি। মানুষটিকে চিনলে রাগ করে থাকা অসম্ভব। গালিগালাজগুলো নিতান্তই কলমের, মনের নয়। দেখা

হলেই ভরাট গলায় অন্তরঙ্গ আহ্বান। দেখা না হলে টেলিফোনে বলেছেন, তোমায় গালি দিয়েছি দেখেছ? সাহিত্যের ভালবাসা আমাদের দূরবর্তী হয়ে থাকতে দিত না। ছাড়তে গিয়ে আরও নিকটতর হয়ে গেছি। আমার একার ব্যাপার নয়, সকলেরই এমনি।

অভাবের দিনের সঙ্গী আমরা। আজকের এই রকম অবস্থা দূরতম কল্পনায় আসত না তখন। কিন্তু দারিদ্র্য আমাদের বেদনার বস্তু নয়, উপভোগের সামগ্রী। বিভূতিদা তো যখন-তখন দারিদ্র্যব্রতী বলে দেমাক করতেন। ধ্রুবতারার মত সাহিত্যে ছিল অবিচল লক্ষ্য। লেখাটা কেমন উতরাল তাই নিয়ে কথা, অর্থমূল্য নিতান্ত অবান্তর। সাহিত্য আমাদের নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছিল। আমি থাকি ভবানীপুরে—নগণ্য এক ইস্কুলমাস্টার। শ্যামবাজার অবধি ট্রামভাড়ার কটা পয়সা খরচা করতে গায়ে লাগে। তবু যেতে হয় সেখানে, না গিয়ে উপায় নেই। রবিবারের সকালটা তো বটেই। ওই দিনটার জন্য সপ্তাহভোর লুব্ধ হয়ে থাকি। মোহনবাগান রো'র সঙ্কীর্ণ ঘরখানা—চেয়ার-টুল-টেবিলে সেখানে তিল-ধারণের জায়গা নেই। একজন বললেন, তাকের উপর না চড়ে তো উপায় দেখি নে। সত্যি সত্যি সেই অত্যুচ্চ আসনের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আড্ডা জমাচ্ছেন কেউ কেউ, এমনও ঘটেছে কোন কোন দিন।

সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' কাগজের সম্পাদক হলেন, সেই সময় খুব সুবিধা হল। ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণে বঙ্গশ্রী অফিস। আড্ডা শ্যামবাজার থেকে শহরের এই মাঝামাঝি জায়গায় সরে এল। ইস্কুল থেকে সকাল সকাল পালিয়ে আড্ডায় হাজিরা দিই। বড়-মেজ-সেজ যতসব সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকেরাও আসেন। বিভূতিদা ওই ধর্মতলারই খেলাতচন্দ্র ইস্কুলের মাস্টার, তিনিও যখন-তখন এসে পড়েন। এসপ্ল্যানেড অবধি সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে গিয়ে ওই পথটুকু স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যাই। দুপুরবেলা মধ্যদিনের সস্তা ভাড়া দু-পয়সা, দুটো পয়সায় রুটের শেষ অবধি যাওয়া চলে। আহা, কী সব সত্যযুগের দিন গেছে! সম্পাদক সজনীকান্ত আর সহ-সম্পাদক কিরণ রায়ের হয়েছে বিপদ—সর্বক্ষণ আড্ডা দিয়ে গভীর রাত্রি অবধি সম্পাদকীয় কাজকর্ম করতে হত।

কিন্তু বিপুল লেখকগোষ্ঠীর প্রীতি ও সহযোগিতায় বঙ্গশ্রী দেখতে দেখতে ঋদ্ধিবান হল। নানান রকম মতলব মাথায় আসত সজনীকান্তের। একটা মনে পড়ছে। একপাতা দেড়পাতা পরিমাণ গল্প চাই কতকগুলো—একই সংখ্যায় পর পর ছাপা হবে একটা বিশেষ বিভাগ হিসাবে। সময় দুটো তিনটে দিন, তারই মধ্যে দিতে হবে লেখাগুলো। তথাস্তু। সে বয়সে কলম শানিয়ে অহোরাত্র আমরা তৈরি, শুধুমাত্র আহ্বানের অপেক্ষা। কিন্তু একটা সমস্যা—কার লেখা আগে যাবে, কার পিছনে? প্রত্যেকেই আমরা সর্বাগ্রে থাকতে চাই। সমাধানও হয়ে গেল—গল্পের নামের অনুক্রমে। সাত-আটজনে আমরা লিখছি—আমার গল্পের নাম দিলাম 'অকস্মাৎ'। স্বরের সর্বপ্রথম বর্ণ 'অ' এবং তার পরেই ব্যঞ্জনের সর্বপ্রথম 'ক'। অতএব নির্ঘাৎ প্রথম স্থান আমার। কিন্তু ছাপা হলে দেখি, আমাকেও মেরে গিয়েছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গল্পের নাম 'অ'—শুধুমাত্র 'অ' অভিধানের সর্বপ্রথম শব্দ। অতএব অশোক চট্টোপাধ্যায় সর্বাগ্রে রইলেন, আমি দ্বিতীয়।

কিছু টাইপ কিনে জনকয়েক কম্পোজিটার নিয়ে ছাপাখানার পত্তন হল, তখনকার কথা মনে পড়ছে। মেশিন নেই, টাকা সংগ্রহ করে মেশিন কেনা হবে তার কোন সুদূর-সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু এরই উপর নির্ভর করে সজনীকান্ত বাঁধা মাইনের চাকরি ছেড়েছেন। কাছাকাছি এক দোকানে ডালপুরি ভাজত। কী চমৎকার যে লাগত সেই তেলে-ভাজা ডালপুরি! জিভে এখনো যেন স্বাদ জড়িত আছে। এই কিছুদিন আগে আমার এক উপন্যাস পড়লেন সজনীকান্ত। মাস্টারের জীবন নিয়ে লেখা। ছাত্রদের নজরের আড়াল করে দু-খানা তেলে-ভাজা খাওয়ারও উপায় নেই, এই খেদোক্তি এক জায়গায়। সজনীকান্ত সেই পুরনো দিনের কথা তুললেন। সত্যি, খ্যাতিপ্রাপ্ত হয়ে কী অসহ বন্দিত্ব ঘটেছে আমাদের! সেকালের মত কোন এক চাতালে উবু হয়ে বসে সর্বসমক্ষে তেলে-ভাজা খাওয়ার উপায় নেই, অমুক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এই কর্ম করেছেন—রটনা হয়ে যাবে। ডালপুরির সেই যে স্বাদ, সে কি শুধু ময়দা আর ডাল-বাটার গুণে? ভারি এক মজাদার মসলার মিশাল চলত

খাদকদের মুখে মুখে। খেতে খেতে সাহিত্য-কথা চলত যে আমাদের!

আমাদের সন্তানরা হয়তো ভাবে, চিরদিনই সহজ আরামে দিন কাটিয়ে এসেছি আজকের মত। সেই সময়টা ব্রতচারী-আন্দোলনের খুব প্রসার। গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে আমিও প্রাণপণ খাটি ব্রতচারী সংগঠনের জন্য। অনেকে বলতেন, আমি নাকি ডান-হাত দত্ত মশায়ের। 'বাংলার শক্তি' কাগজ বেরুচ্ছে আমার সম্পাদনায়। তখন সজনীকান্ত পুরো প্রেসই করেছেন। 'শনিবারের চিঠি' কাগজও চলছে। সজনীকান্ত এবং তাঁর সুহৃৎ-সহকর্মী সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস চালাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন, সেই বার্তা অন্তরঙ্গ কারও আমাদের অবিদিত নয়। চেষ্টাচরিত্র করে 'বাংলার শক্তি' শনিরঞ্জন প্রেসে ছাপবার ব্যবস্থা করলাম। টাকা-কড়ি প্রয়োজনমত অগ্রিম দেবারও বন্দোবস্ত হল। একটা দিনের কথা বলি। বৈশাখ মাসের খর দুপুর, বেলা বোধ হয় একটা। ভবানীপুর অভয় সরকার লেনে বাসা। খাওয়াদাওয়া সেরে সবে এসে বসেছি, সজনীকান্ত সেই সময় 'বাংলার শক্তি'র প্রুফ হাতে করে হাজির। দারুণ রৌদ্রে মুখ ঝলসে গিয়েছে যেন। বললেন, জল দাও এক গ্লাস।

ঘরে ডাব ছিল, কেটে দিলাম একটা। বললাম, প্রুফ একটা লোক দিয়ে পাঠাতে পারলেন না?

লোকের অসুবিধা আছে। এদিকে একটা কাজেও এসেছিলাম। ছেপে ফেলে টাইপ খালি হওয়ার দরকার তাড়াতাড়ি।

ধমক দিয়ে বলি, আর কখনও এমনি যদি এইরকম প্রুফ হাতে আসেন, 'বাংলার শক্তির' কাজ তুলে নেব প্রেস থেকে।

ব্রতচারী-সমিতির কাছে আমি একজন আলাদা বেয়ারা চাইলাম 'বাংলার শক্তির' জন্য। অতঃপর সেই-ই নিয়ে আসত প্রুফ। সজনীকান্তকে আর আসতে হয় নি।

এমনি টুকিটাকি কত স্মৃতি মনে আসছে। ঘরোয়া জীবন-কথা। লেখা ঠিক হবে কিনা, বুঝতে পারি নে। আজ বছর কয়েক ধরে আমাদের বউদিকে না নিয়ে কোথাও যেতে চাইতেন না সজনীকান্ত। সকল কাঠিন্য চলে গিয়ে কী মধুর স্বভাব হয়েছিল যে ইদানীং। খেলাশেষে ঘরে ফেরবার সময় সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ ভুলে গলাগলি হয়ে থাকি এস—লেখার মধ্যে এই কথা, মনেপ্রাণে, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যেও তাই।

এই ১৯৬২ অব্দে পরপর কয়েকটি রবিবার একসঙ্গে কাটিয়েছি। নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্মী কর্মকর্তা ও সভাপতিরা এবং আমার কিছু আত্মীয়বান্ধব নিয়ে ছোট একটি অনুষ্ঠান হল আমার বাড়ি। সজনীকান্ত একা এলেন, যা ইদানীং কালেভদ্রে কদাচিৎ ঘটে। পড়ে গিয়ে বউদি শয্যাশায়ী, উঠে আসবার অবস্থা নেই। বললেন, তাই বলে তো তোমার বাড়ি না এসে পারব না! দুটো ঘর আর একটা বারান্দা জুড়ে অতিথিদের বসবার জায়গা, সজনীকান্ত সর্বাগ্রে এসে ছোট ঘরটায় বসেছেন। যত ভিড় সেইখানে! অন্য ঘর ও বারান্দা প্রায় খালি পড়ে রইল, কেউ সেদিকে যাবেন না। ভীষণ ভিড় জমে গেছে, দু-দুবার ডাক এল, কেউ উঠতে চান না। ছাদে গিয়ে তারপর কত হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে খাওয়াদাওয়া। যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সজনীকান্ত বারংবার বলছেন, এতজনে একসঙ্গে আজ বড় আনন্দে কাটানো গেল। কে জানত, আমার বাড়ি সেই শেষবারের মতন কেন আসা! জানুয়ারির সাত তারিখের ব্যাপার, আর বিদায় নিলেন ফেব্রুয়ারির এগারোই।

আরও এক মজা সেদিন। আমাদের ডাক্তারবাবু (ডাক্তার যোগেশ মুখোপাধ্যায়, নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম সাধারণ-সম্পাদক) যাবার সময় জুতো খুঁজে পান না। জুতো কে নিয়ে নিয়েছে—পরিবর্তে পড়েও আছে বটে একজোড়া, ডাক্তারবাবুর পায়ে হয় না। খালি পায়ে তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, বাড়ির লোক আমরা বেকুব হলাম। পরের দিন সজনীকান্তের ফোন: চোখে ভাল দেখি নে, জুতো বদল করে এনেছি। এই নিয়ে কত রঙ্গ-রসিকতা। ডাক্তারবাবু বললেন, আমার জুতোর ভাগ্য। ও-জুতো ফেরত এনে আমি আর পরব না, যত্ন করে রেখে দেব। কিন্তু জুতো আর ফেরত আসে নি। পুনশ্চ এক মজা। আজ যাই কাল যাই করে ডাক্তারবাবু দেরি করেছেন, ইতিমধ্যে সেই জুতো পরে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সভা করতে গেছেন। আবার জুতো বদলাবদলি—ডাক্তারবাবুর জুতো নিয়ে আর এক-জোড়া কে রেখে গেছেন।

আমার বাড়ির অনুষ্ঠানের পর, মাঝের এক রবিবার বাদ দিয়ে তার পরের রবিবারে 'যুগবাণী'-সম্পাদক বন্ধুবর দেবজ্যোতি বর্মণ মধ্যমগ্রামের নতুন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। তিন অতিথি—বঙ্গবাসী কলেজের সহ-অধ্যক্ষ মশায়, সজনীকান্ত এবং আমি। ছবির মত জায়গাটা—চারিদিকে ফুল আর সতেজ সবুজ তরকারি-ক্ষেত, বড় পুকুর অদূরে, ঝকঝকে সুরম্য বাড়ি। বাড়ির অধিকাংশ জুড়ে দেবজ্যোতির বিপুল পুস্তক-সংগ্রহ। সজনীকান্ত উল্লাসে মেতে উঠলেন। ওখান থেকে বাড়িতে ফোন করছেন, বউদি যাতে চলে আসেন। গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। হাঁটবার পুরোপুরি সামর্থ্য হয় নি তখনও বউদির। সজনীকান্ত বলছেন, তা হোক, এইখানে এসে চুপটি করে বসে থাকবে, চলাফেরা করতে হবে না। মনের আনন্দ উপচে পড়ছে, বউদি ভাগিদার না হওয়া অবধি কোনক্রমে বুঝি সোয়াস্তি নেই। পাশাপাশি আসন পেতে সেই সর্বশেষ খাওয়া আমাদের। বারংবার বলছেন, নিরিবিলি এই গ্রামজীবন, অথচ শহরের যাবতীয় সুখসুবিধা; এমনি জায়গায় ছোট-খাটো একটু বাড়ি করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, নগরের হট্টগোল আর ভাল লাগছে না। দেবজ্যোতি কাছাকাছি একটা জমিরও খোঁজ দিলেন, সজনীকান্ত কথাবার্তা পাকা করতে বললেন সেই সম্পর্কে। অপরাহ্ণে চলে আসছি, দেবজ্যোতি সগৃহিণী সকন্যা উঠানে এলেন বিদায় দিতে। সজনীকান্ত বলছেন, দিনটা ভারি সুন্দর কাটল। আসব মাঝে মাঝে দেহমন তাজা করে নেবার জন্য। পোষা মুরগি চরে বেড়াচ্ছে, প্রচুর ডিম দেয়। বললেন, এবারে এলে ঘরের মুরগির ডিম খাওয়াতে হবে কিন্তু। গাড়িতে ওঠবার মুখেও জমির তাগাদা দিচ্ছেন: অচিরে পাকাপাকি করে ফেলা হয় যেন। সেখানে ছোট্ট মনোরম একটা বাড়ি উঠবে। সাহিত্য-সাধকের শান্তি নিভৃতি ও আরামের বাড়ি।

পরের রবিবার প্রিয়বন্ধু সুকমলকান্তি ঘোষের বারাসতের বাগানবাড়ি 'পরিমাল্যে' আনন্দ-সমারোহ। বিস্তর গুণীজন এসেছেন। গেল বছরও অনুষ্ঠান হয়েছিল। গিয়েই সজনীদা একটি লেখকের খোঁজ করছেন: আসেন নি এখনও? গল্পগুজব, হাসিমস্করা—উত্তম আহারাদি প্রচুর। শ্রীমতী বাণী রায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর তারাশঙ্করকে বসিয়ে ছবি তোলা হল। আরও কত রকমের কত ছবি উঠছে মুহুর্মুহু। এতগুলি প্রবীণ বিদগ্ধ কৃতীপুরুষ লহমার মধ্যে কী রকম ছেলেমানুষ হয়ে যান, চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেন না। আসন্ন সন্ধ্যা, চলে যাচ্ছেন এবারে সব। সুকমলকান্তি বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছেন। সজনীকান্তের শেষ কথাগুলো আমার কানে বাজছে: সুকমল, নানা গোত্রের এতজনকে একত্র করে বড় আনন্দ দিয়েছ তুমি।

সেই অনুপস্থিত লেখকটির নাম করে বললেন, কেবল অমুক নেই—তাঁকে যদি আনতে পারতে আজ! গেল-বছর এই বাগানবাড়ির উৎসবে সজনীকান্ত ভাব করবার জন্য উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে এগিয়েছিলেন, আহত হয়ে ফিরে আসেন। সেই দুঃখ বুঝি মনে খচখচ করছে। বললেন, সুকমল, অসাধ্যসাধন করেছ তুমি, কিন্তু সেই একজনকে আনতে পার নি।

সুকমলকান্তি বললেন, আচ্ছা, এই প্রতিশ্রুতি রইল সজনীদা, আগামী বছর নিশ্চয় তাঁকে নিয়ে আসব, পাশাপাশি সকলের ছবি তুলব। ক্ষোভ পুষে রাখতে দেব না কারও মনে।

সুকমলকান্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে না। আগামী বছর সেই লেখক 'পরিমাল্যে' হয়তো আসবেন, ছবিও তোলা হবে, কিন্তু সজনীকান্ত তার মধ্যে নেই।

পরের রবিবার শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রোৎসবে সজনীকান্ত অন্যতম সভানেতা।

এবং তার পরের রবিবার দুপুরবেলা টেলিফোনের সাংঘাতিক খবর…

—

সজনীকান্ত

অমলা দেবী

বাংলা দেশের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সজনীকান্ত আমাদের ছেড়ে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। এত শীঘ্র যে তাঁর ডাক পড়বে—কোনদিন ভাবতে পারি নি। মাঝে মাঝে খবর পেয়েছি—তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছে। শঙ্কিত হয়ে উঠে তাঁর খবর জানবার জন্য তাঁর ছেলেকে চিঠি লিখেছি। কিছুদিন পরে তিনি ভাল হয়ে উঠেছেন —খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। স্বাস্থ্য তাঁর ভাল ছিল না, একটু অনিয়ম অত্যাচার হলেই শরীর প্রতিবাদ করত। তবু বঙ্গবাণীর পূজায় পৌরোহিত্যের জন্য ডাক এলে সাড়া না দিয়ে পারতেন না। যিনি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ ভক্ত, অনন্যব্রতী হয়ে সারাজীবন সাহিত্য-ব্রতেই আত্মনিয়োগ করেছেন, কোন সাহিত্য-অনুষ্ঠানে সমব্রতীদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই আত্মীয়পরিজনদের নিষেধ ঠেলেও কলকাতার বাইরে, বাংলা দেশের বাইরেও যেতেন। এর ফলে গুরুতর অসুখে পড়েছেন মাঝে মাঝে; তবু না গিয়ে পারতেন না।

সজনীকান্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ছাত্রজীবন থেকে। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে সজনীকান্ত কলিকাতা-বিজ্ঞান-কলেজে পদার্থ-বিদ্যার ছাত্র হিসাবে এম. এস-সি. পড়তেন। আমিও ওই একই বিষয় নিয়ে পড়তাম। তবে ওঁর সহপাঠী ছিলাম না, এক ক্লাস নীচে পড়তাম। তবে একই মেসে থাকতাম। ৬নং বাদুড়বাগান লেনে বিজ্ঞান-কলেজের যে মেস ছিল সেখানে। প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র থাকত সেই মেসে। সকলের সঙ্গেই সজনীকান্তের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তবে আমরা কয়েকজন ছিলাম তাঁর পরম-প্রীতিভাজন। আমি তাঁকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতাম; তিনি আমাকে নাম ধরেই ডাকতেন—কখনও কখনও 'শিষ্য' বলে ডাকতেন। দোতলায় পাশাপাশি ঘরে থাকতাম। কোন কিছু প্রয়োজন হলে ডাক দিতেন—"শিষ্য"! শিষ্যও সঙ্গে সঙ্গে "গুরুদেব" বলে সাড়া দিত; তখনই হাতের কাজ ফেলে গুরুদেবের সকাশে উপস্থিত হত। কত স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। বিকেলে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। কোন সিনেমায় ভাল ইংরেজী ফিল্ম দেখানো হচ্ছে খবর জানতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই যেতেন—আমাকেও সঙ্গে নিতেন। কোন সভা-সমিতিতে কোন খ্যাতনামা বক্তার বক্তৃতা হবে জানতে পেরে সেখানে যাবার জন্য মনঃস্থির করলে আমাকে জানাতে ভুলতেন না। একবার তাঁরই সঙ্গে আমরা জনকয়েক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। সভায় খুব ভিড় হয়েছিল। কিন্তু সজনীকান্ত ভিড় ঠেলে কোনরকমে সামনের দিকের একটা বেঞ্চিতে নিজের ও আমাদের স্থানের ব্যবস্থা করলেন। সভাভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ ফুটপাথে নেমে তাঁর গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অনেক বিশিষ্ট সভ্য। শ্রোতাদেরও অনেকে ভিড় করল তাঁদের পিছনে। আমরাও পিছনে পিছনে আসছিলাম। সজনীকান্ত বলে উঠলেন, কবিকে প্রণাম করব—চল। বলেই দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। আমরাও পিছু পিছু চললাম। সজনীকান্ত ভিড় কাটিয়ে একেবারে কবির সামনে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। আমরাও রবীন্দ্রনাথের চরণ স্পর্শ করে ধন্য হলাম।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমাদের কলেজের কাছাকাছি একটি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করা হত। সভা বসত; সভায় শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হতেন। ছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা নিমন্ত্রিত হতেন। শহরের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন। সভায় ছাত্রীদের গান হত, আবৃত্তি হত। সভান্তে জলযোগের ব্যবস্থা থাকত। তবে অনিমন্ত্রিত কেউ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত না—কারণ স্কুলের ফটকে প্রবেশপত্র না দেখিয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারত না। আমাদের

বৎসরেও যথাসময়ে আয়োজন শুরু হল। সজনীকান্ত আগের বৎসর তাঁর এক বন্ধুর কাছে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করলেন। বিশেষ করে সভান্তে জলযোগ সম্বন্ধে। শুনে আমরা সভায় যোগদান করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। সজনীকান্ত জানালেন, তিনি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে সেবারও একটি প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। আমরা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলে উঠলাম, আমাদের কি হবে? তিনি আশ্বাস দিলেন, তোমাদেরও ব্যবস্থা হবে। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সজনীকান্ত ও আমরা জনকয়েক স্কুলের ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফটকের দু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন মেয়ে—উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। তাদের প্রবেশ-পত্র দেখিয়ে ভিতরে ঢুকতে হচ্ছিল। আমাদের একজন আগিয়ে যেতেই একজন ছাত্রী বলে উঠল, কার্ড কই? সজনীকান্ত সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নেড়ে জানাল ওঁর কাছে আছে, মেয়েটিও সজনীকান্তের দিকে তাকাতেই তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন কথাটা ঠিকই। এই ভাবে একে একে আমরা পার হয়ে গেলাম। এবং পার হয়েই লম্বা পা ফেলে সভা-গৃহের দ্বারের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বশেষে সজনীকান্ত প্রবেশ-পত্র দেখিয়ে পার হলেন। মেয়ে দুটি বলে উঠল, এ তো আপনার! ওঁদের কই? সজনীকান্ত ওদের কথায় কর্ণপাত করলেন না, ডবল মার্চ করে অবিলম্বে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মেয়ে দুটি কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, অদ্ভুত! তারপর নিজেদের কাজে মন দিল।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ছে। চৈত্র কি বৈশাখ মাসের কোন একটা দিন। পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যের পরই পূর্ণচন্দ্র পূর্বাকাশে আসর জমিয়েছে। সজনীকান্ত বললেন, চল বেড়িয়ে আসি। মেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অধ্যাপক চক্রবর্তী মশায় কলেজ থেকে রাত নটার আগে ফিরতেন না, পড়াশুনা ও কাজকর্ম করতেন। কাজেই আপত্তি করবার কোন কারণ ছিল না। জনকয়েক মিলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা বড় রাস্তা ধরে চললাম আমরা। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির বৈঠকখানায় গান হচ্ছিল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের সমবয়স্ক কয়েকজন যুবক গান শুনছিল। তাদের কাছেই জানা গেল, কাজী নজরুল গান গাইছেন। সজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, শুনবে নাকি? আমরা সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। সজনীকান্ত বললেন, এস। বলে বাড়ির সদর দরজায় ঢুকে পড়লেন, আমরাও পিছুপিছু চললাম। বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল একটা চৌকির উপরে বসে নজরুল গান গাইছেন, তাঁর সামনে জনকয়েক বসে আছেন—গৃহকর্তার সম্মানিত বন্ধুবান্ধব সম্ভবতঃ। বাকী সবাই নীচে মেঝেয় বসে আছেন। গান তখন জমে উঠেছে, আমাদের দিকে মন দিল না কেউ। সজনীকান্ত চৌকির উপরেই নিজের ও আমাদের স্থান করে নিলেন। সম্মানিত অতিথিদের কিছু অসুবিধা হল, তবে গানের দিকে সকলের মন ছিল বলে কোন প্রতিবাদ এল না। গান চলতে লাগল, 'দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী, আর বেয়ে কাজ নাই তরণী'। কাজী নজরুলকে সেদিন প্রথম দেখলাম, তাঁর গান প্রথম শুনলাম। আজ সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে, সেই সুর ভেসে আসছে কানে; আজ সজনীকান্ত আমাদের কাছে নেই, কিন্তু সেই সুরের সঙ্গে তাঁর স্নেহ-স্পর্শ পাচ্ছি সারা মনে।

কোন কোন দিন সন্ধ্যায় সাহিত্যের আসর বসত ছাদের উপরে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ হত, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা চলত, সজনীকান্ত কোন কোন দিন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। তখনই তাঁর রচনা ও আলোচনা দুইই আমাদের মনে তাঁর গৌরবময় ভবিষ্যতের আভাস জাগিয়ে তুলত।

এই সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলালের সঙ্গে সজনীকান্তের পরিচয় হয়। আমাদের মেসের কাছাকাছি আর একটা মেসে মোহিতলাল থাকতেন। কলকাতার কোন একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সজনীকান্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর কাছে যেতেন। আমিও দু-একদিন তাঁর সঙ্গ নিতাম। মোহিতলাল দোতলার একটা ঘরে থাকতেন। পাশেই কতকটা খোলা ছাদ। সেখানে মাদুর পেতে বসা হত।

মোহিতলাল স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মোহিতলালের পরম প্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন। ওদিকের টান যত বাড়তে লাগল, পদার্থ-বিদ্যার প্রতি টান সেই অনুপাতে কমতে লাগল। শেষে আমাদের মেস ছেড়ে দিয়ে সজনীকান্ত মোহিতলালের মেসে চলে গেলেন, মোহিতলালের পাশের ঘরেই স্থান পেলেন। তারপরই পড়াশুনায় ইতি করে দিয়ে সাহিত্যসাধনা শুরু করলেন।

সজনীকান্ত সারা জীবন অনন্যকর্মা, অনন্যমনা হয়ে সাহিত্যসাধনা করেছেন। বাংলা দেশের শীর্ষস্থানীয় কবি, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। তবু আমাদের তিনি ভুলে যান নি, আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নি। উচ্চতলের অধিবাসীদের নিম্নতলবাসীদের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক অবহেলা থাকে, তাঁর ব্যবহারে কোনদিন তা লক্ষ্য করি নি। যখনই দেখা হয়েছে আগের মতই সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। যখনই কারও জন্যে তাঁকে কোন অনুরোধ করেছি, সে অনুরোধ রক্ষা করতে কোনদিন কোন দ্বিধা করেন নি। যখনই কিছু চেয়েছি, আগের মতই সস্নেহে সাগ্রহে তা দিয়েছেন। না চেয়েও তাঁর কাছ থেকে অনেক-কিছু পেয়েছি। তাঁরই হাত ধরে বাংলার সাহিত্যরথীদের অনেকয়েকের সঙ্গে পরিচয় করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি; তাঁর বন্ধু হিসাবে তাঁদের কাছে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারই পেয়েছি। তাঁর উপর মনে মনে যে কতখানি নির্ভর করতাম, তিনি যতদিন কাছে ছিলেন বুঝতে পারি নি। আজ কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন—আজ সারা মন অসহায়-বেদনায় লুটিয়ে পড়তে চাইছে; আজ বুঝতে পারছি—তিনি আমার জীবনে কতখানি ছিলেন।

সাহিত্যসাধনার শুরু থেকে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে 'শনিবারের চিঠি' শীর্ণকায় সাপ্তাহিক থেকে ক্রমে পুষ্টিলাভ করে পূর্ণকায় মাসিকে পরিণত হয়েছে, বাংলাদেশের অগ্রগণ্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। সজনীকান্তের সারাজীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার ফলগুলি 'শনিবারের চিঠি'ই বুকে তুলে নিয়ে বাংলার সাহিত্যানুরাগীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এই 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমেই সজনীকান্ত কঠোর সমালোচনার সম্মার্জনী চালনে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্র আবর্জনামুক্ত করে রেখেছিলেন। এর জন্য বাংলার পাঠক ও লেখক-সমাজ তাঁর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

সজনীকান্তের মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি হল তা নির্ণয় করবেন, উপলব্ধি করবেন বাংলার সাহিত্যিকরা। কিন্তু তাঁর আত্মীয়পরিজনদের যা ক্ষতি হল তার পরিসীমা নেই। আমাদের মত যারা তাঁর স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিল, তাদের ক্ষতিই কি কম? সজনীকান্তকে কি তারা কোনদিন ভুলতে পারবে?

জীবনে অপরাহ্ণ শুরু হবার আগেই সজনীকান্ত অস্তমিত হয়েছেন। যদি থেকে যেতেন, তা হলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ ডাক এসে গেল, সব ফেলে চলে যেতে হল তাঁকে। যারা পিছনে পড়ে রইল, তাদের সান্ত্বনা এই—যে মহামূল্য রত্নরাজি তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে দান করে গেছেন, তাদের মধ্য দিয়ে তারা তাঁর সঙ্গ-সুখ লাভ করতে পারবে।

ইহলোকে আমাদেরও মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পরলোকের ডাক আসতে বেশী দেরি নেই। সেখানে গিয়ে আবার তাঁর দেখা পাব, তার স্নেহময় সাহচর্য আবার ফিরে পাব—এই আশাতেই বাকী দিনগুলি কোনমতে কেটে যাবে।

—

সজনী-স্মরণে

গোপাল হালদার

সংবাদপত্রের পাতা থেকে চোখ তুলে কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। এইতো সেদিন শান্তিনিকেতনে চিরদিনের মত অভ্যস্ত আনন্দে গল্প ও আড্ডা জমে উঠেছিল আমাদের। অপরাহ্নে আমার চায়ের পিপাসা নিবৃত্ত করার আমন্ত্রণ ছিল অধ্যাপক-বন্ধুর গৃহে। সজনীকান্ত ও তাঁর পত্নী সুধারাণীর আহ্বানে সেই বন্ধুদের ফেলে উঠে বসলাম তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে। 'রতন কুঠী'তে তিনজনে চায়ের অপেক্ষায় বসেছি। গল্প আরম্ভ হতে না হতেই সজনী সেই বন্ধুদের একজনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, ব্যবসা, বিদ্যা, বুদ্ধি সব পরিচয় দিতে পারছি; কিন্তু নামটি আমার স্মৃতিলোক থেকে এমনভাবে সেই মুহূর্তে আত্মগোপন করছে যে আমি তা উদ্ধার করতে পারছি না। স্মৃতি ও বিস্মৃতির এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন সজনী।

"এই রে! হয়েছে, হয়ে এসেছে—"

আমি হেসে বললাম, "হবে না? কম হল নাকি বয়স?"

সজনী সহাস্যে জানালেন, "তাই তো বলছি, হয়ে এসেছে। আর দেরি নেই।"

একটু পরিহাসের কণ্ঠেই বললাম:

"And we must endure our going hence,

E'en as our coming hither."

দু'জনেই একটু হাসলাম।

কে জানত কালের অপরাজেয় দূত আমাদেরই পিছনে পরোয়ানা নিয়ে তখনি অপেক্ষমান! এখনি কি জানি—বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন, আপন-আপন সত্তার যে সত্যটুকু সজনীকান্তের মধ্য দিয়ে আমরা অনুভব করেছি, এবার সে উপলব্ধির পথ বন্ধ হয়ে গেল। সজনীকান্তের সঙ্গে আমাদেরও এই জীবনের একটা অংশের মৃত্যু ঘটল।

সজনীকান্তের বন্ধুসংখ্যা সামান্য ছিল না। সেইখানেই তার অকৃপণ প্রকৃতির পরিচয়। এ প্রকৃতির দুটি ছিল সুপরিচিত রূপ, তার আকর্ষণ-শক্তি ও তার কৌতুকবোধ। স্বচ্ছন্দে বহু মানুষকে সজনীকান্ত আপনার করতে জানতেন। আর যে কোন পরিবেশকে কৌতুক-সরসতায় স্বচ্ছন্দ করে তুলতে পারতেন। এই ছিল তাঁর বিশেষ প্রাণধর্ম। অথচ প্রাণশক্তি ছিল তাঁর দুর্বার, ব্যক্তিত্ব প্রবল; আঘাত-সংঘাত মাঝে আত্মশক্তির পরীক্ষায় অকুণ্ঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ মানুষকে বারণ করা নয়, বরং স্বাগত করা, সজনীকান্ত তেমন ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী ছিলেন। এ কথা তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরে যে-কোন নব-পরিচিতেরও অনুভব করতে দেরি হত না। তারপর তাঁর স্বতস্ফূর্ত কৌতুক সেই মুক্তদ্বার চিত্তভূমিতে এক-মুহূর্তে সেই পরিচিতকে পৌঁছে দিত। সেই কৌতুক-সরসতায় সজনীকান্তের আত্মাভিমান মনে হত অলীক, অস্ত্রসজ্জা অবান্তর। সেখানে স্বচ্ছন্দ মনে আসন গ্রহণ করতে কারও সংকোচ থাকত না। দুদিনেই তিনি হতেন সুহৃদ, আর দু মাসেই হয়তো বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। এমনি করেই সজনীকান্তের বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রবল পুরুষকার সংসারের নব-নব ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। নব নব পরিচয়ে তার জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে, যে ক্ষেত্রে যেমন সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই লাভ করেছে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য। সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে, তাই বা কেন, ব্যবসায়-সম্পর্কে, বেতারে, চলচ্চিত্রে, কত বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ তাঁর আপনার

হয়ে উঠেছে। ত্রিশ বৎসরের মুদ্রণকর্মী সেদিন সবিষাদে বললেন, 'এত দিন বড় গাছের ছায়ায় ছিলাম ; এখন তো খোলা মাঠে পড়লাম।' ছায়াদানের মত শক্তি সজনীকান্তের ছিল, সেই ছায়ায় আকৃষ্ট করার মতই ছিল তাঁর প্রকৃতি। মানুষকে—এত মানুষকে—যে আপনার করতে পারে, এত মানুষের মনই সে কিছু না-কিছু আপনার সঙ্গে নিয়ে যায়। আবার এত মানুষের মনেই সে কিছু না কিছু নিজেও থেকে যায়।

সজনীকান্তের বন্ধুবর্গের মধ্যে আমি একজন ; প্রথম নই—সেহয়তো ছিলেন 'রতন', স্বর্গীয় নরেন্দ্রমোহন সেন। প্রধান ছিলাম না, শেষও নই। বন্ধুবর্গের মধ্যে আমি ও 'রতন' বরং ছিলাম বিপক্ষীয়, আর নিরপেক্ষতা সজনীর ধর্ম নয়। সেই মতান্তরের প্রমাণ শনিবারের চিঠির পাতায়ও সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু আরও যা সঞ্চিত হয়ে ছিল তা কোনও কাগজে নেই, ছিল আমাদের মনে। মানুষের মত এবেলা ওবেলা পাল্টায়—এ পত্রের পাতাতেই তার কত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মন বদলায় মানুষ বদলালে ; না হলে জন্মান্তরেও তা বদলায় না। এ জীবনের মধ্যে আমাদের জন্মজন্মান্তর না ঘটেছে তা নয়। মতের সঙ্গে সঙ্গে তাই এসেছে পথের দূরত্ব। কিন্তু দূর হলেও কেউ কারও কাছে পর হয়ে যেতে পারি নি, কারণ, মতান্তর আর মনান্তর এক কথা নয়।

সেদিন শান্তিনিকেতনে ঘণ্টা দেড়েক পরে অধ্যাপক বন্ধু সন্তোষ বসুর গৃহে গিয়ে পৌঁছলে তিনি হেসে বললেন, "যখনি সজনীবাবু ধরে ফেললেন তখনি বুঝেছি আপনি আর চা খেতে আসতে পারবেন না।"

অনেকে জানেন, আমিই বুঝি শনিবারের চিঠির 'গোপালদা'। মানুষ যা জানে, অনুমান তার চেয়েও বেশি। না হলে শনিবারের চিঠির উৎসাহী পাঠকদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হত না যে, আমার সঙ্গে ওই চরিত্রের মিলটা নামের মিল—যে নামটা বাংলা দেশের ইয়ার্কি-মিশ্রিত গল্পের চিরদিনকার বাহন। নিতান্তই দৈবক্রমে এ নামটার প্রথম প্রয়োগের কালে আমি ছিলাম এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ; আর 'টাইম্‌স লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে'র গ্রাহক। লটারারি সাপ্লিমেণ্টের আলোচনা ও সমালোচনা-পদ্ধতি শনিবারের চিঠির বেনামা লেখার পদ্ধতির পরিবর্তে কিছু কালের মত এ পত্রে গ্রাহ্য হয়েছিল। সে পক্ষে যুক্তিটা আমার ততটা নয় যতটা তখনকার বিদায়োন্মুখ সম্পাদক বন্ধুবর নীরদচন্দ্র চৌধুরীর : নাম অবান্তর, বক্তব্যই আসল কথা। আর সে বক্তব্য সকলকার, ব্যক্তিবিশেষের নয়। কার্যতঃ, এই 'কালেকৃটিব রেসপনসিবিলিটি'তে রেসপনসিবিলিটি গিয়ে বর্তায় সম্পাদকে আর বক্তব্যের সর্বাধিপত্য থাকে মোহিতলালের। কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়ায় এই—বক্তব্যের সেই ঘনঘটায় পাঠকের প্রাণ অস্থির না হলেও সম্পাদকের মন অস্থির হয়ে উঠত : ওই মেঘের কোলে একপাল কবিতার বলাকা উড়িয়ে দিলে হয় না? কিংবা ছড়িয়ে দেওয়া যায় না একটু বিদ্যুৎ চমক—একটু হাসির ঝলক? বেপরোয়া হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যাক্ খেয়ালখুশির ঝরা পাতা আর ঝরা ফুল যাতে বক্তব্যের গুরু গর্জনে কারও প্রাণ কাঁপবে না, কিন্তু অসংবৃত বেশবাস পথিকের বিড়ম্বনা দেখে দর্শকের পাবে হাসি,—'উটরামের টুপি'র মত নিছক যাতে খেয়ালের হাওয়া বইবে উদ্দেশ্যহীন খেলায়। এই মজা করবার অদম্য উৎসাহ সজনীকান্তকে পেয়ে বসত। সেই সঙ্গে মাসের পর মাস মাসিকপত্রের আসর জমাবার দায়ে লঘু গুরু সকল কথার দায়িত্ব বহনের জন্য প্রয়োজন হল একটা নামের। এমন নাম—যার কথায় গুরুত্ব আরোপ করা অনাবশ্যক, যার কথায় খোঁচা থাকলেও অভিসন্ধির সন্দেহ করা ভুল। নামটা একবার খাড়া করার পরে শনিবারের চিঠির সম্পাদক তার মুখপাত্র পেয়ে গেলেন। সজনীকান্ত তাঁর নিজের তূণে তাকে সাজিয়েছেন, নিজের মত করে বাজিয়েছেন, তাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়েছেন, ফিলজফি আউড়িয়েছেন, রাজনীতি কপচিয়েছেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়েছেন—মজা করবার মানুষকে প্রায় নীতি-বাগীশ ইস্কুলমাস্টার করে তুলেছেন। গোপালদা বয়স্য থেকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই পরিণাম যদি না ঘটত তা হলে বলা যেত সজনীকান্তই 'গোপালদা'। কিন্তু তা নয়। শনিবারের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে সজনীকান্ত বয়সে বড় হয়েছেন, কিন্তু তিনি নীতিবাগীশ হয়ে যান নি। শত অসঙ্গতি নিয়েই যে জীবন—ভালতে ভরা মন্দেতে ভরা, লোভে ভরা মোহে ভরা, প্রেমে ভরা

বিরোধে ভরা, আর হাসিতে ভরা পরিহাসে ভরা,—সেই জীবন তাকে সজীব মানুষ করে রেখেছে, ইস্কুলমাস্টার হতে দেয় নি। গোপালদা শনিবারের চিঠির মুখপাত্র থেকে গিয়েছেন, সজনীকান্তের মনের মানুষ হতে পারেন নি।

সজনীকান্তের মনের যথার্থ পরিচয় গোপালদার মতামতে অনুসন্ধান না করাই ভাল। গোপালদার মতের থেকে সজনীর মন ছিল অনেক বড়। মন দিয়েই মানুষ, মত দিয়ে নয়। সজনীকান্তের সেই পরিচয় কোথায় পাওয়া যায়?

মনে পড়ে প্রথম দিককার এক-একটি মাসের সদ্যমুদ্রিত শনিবারের চিঠির প্রথম সংখ্যাটি সজনী সাদরে তুলে রাখতেন 'সুধার জন্য'। গৃহে সুধাও প্রস্তুত থাকতেন, সহাস্যে সেই পত্রকে সম্ভাষণ জানাবার জন্য 'সতীন কাঁটা' বলে। ঘরে-বাইরে সজনীর মনকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন কি তাঁরা দুজনায়—সুধা ও 'শনিবারের চিঠি'? এ কথা বলা কঠিন। একটা কথা সত্য, সজনীকান্তের মন ছিল গৃহধর্মী; আর এই গৃহলক্ষ্মী তাঁর জীবনলক্ষ্মী ছিলেন। পত্নীর একান্ত দানেই সজনীকান্ত মুক্তি পেয়েছিলেন, আপনার কাছে সত্য হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। জীবনের ও যৌবনের যত বিস্তার ও বিক্ষেপ সব সেই সুধাস্নিগ্ধ গৃহাঙ্গনে মিলিয়ে যাবার জন্য। শনিবারের চিঠিও সজনীকান্তের প্রাণকে দিয়েছে উদ্দীপনার উপলক্ষ্য, উদ্যোগের ক্ষেত্র, সরস প্রকাশের অবকাশ। সেই উপল-বন্ধুর পথ অনুসরণ করতে করতে সজনীকান্তের মন এগিয়ে গিয়েছে ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে, কাঁটাবনের মধ্য দিয়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা আবর্ত পেরিয়ে, সাহিত্যের বন-উপবনের ছায়ায়। সেই পরিচয় 'চিঠি'র পদে পদে, বাঁকে বাঁকে।

কিন্তু মানব-চেষ্টাতে যেমন অসঙ্গতি থাকে এই পরিচয়ের মধ্যেও গোড়া থেকেই একটা অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিল। সজনীকান্ত পরিহাসপ্রবণ, কিন্তু নীতিবিশারদ নন। শনিবারের চিঠির আসর তাঁর প্রাণভরা পরিহাসে কৌতুকে যখন জমছে তখনি তাতে নীতিবায়ুর ভারটাও জমে উঠতে লাগল। মোহিতলাল কবিতা ছেড়ে সাহিত্য-শাস্ত্রকার হয়ে উঠছিলেন,—অব্যর্থসন্ধানী সজনীকান্ত হবেন শস্ত্রবীর। বিদ্রূপবাণে রথী-মহারথী কেউ নিস্তার পেল না। সে কি কম উন্মাদনা আত্মশক্তির এই পরীক্ষায়! বাঙালী পাঠক আর একজন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যঙ্গ-রসিকের আবির্ভাবে পুলকিত হতে পারেন। কিন্তু কৌতুকরসিক, সাহিত্যরসিক সজনীকান্তের চিত্তের কী স্ফূর্তি তাতে সম্ভব? অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অগ্রজতুল্য—সামাজিক রাজনৈতিক মতামতের চাবুকটা তাঁরই নিজস্ব, সজনীকান্ত তা চালিয়ে মজা পেতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু চাবুক চালানো ও কলম চালানো এক কথা নয়। মোহিতলালকে সজনীকান্ত গুরুপদে বরণ করেছিলেন—সে কাব্যসাধনার জন্য। কিন্তু মহাগুরুকে অস্বীকার করবার উত্তেজনা দিয়ে কত দিন নিজেকে ছলনা করা সম্ভব? অসঙ্গতিটা এইখানে—সজনীকান্ত মনেপ্রাণে কাব্যরসিক, কবিত্বও তাঁর জন্মায়ত্ত, কিন্তু শক্তির উন্মাদনায় সে এমন একটা ক্ষেত্রই নির্মাণ করলে যেখানে সুস্থ হয়ে বসে সৃষ্টিকর্ম করা প্রায় অসম্ভব। এই অসঙ্গতি থেকে 'চিঠি'কে সজনীকান্ত উদ্ধার করলেন প্রায় একার চেষ্টায়। সহায়ক একদিকে ছিলেন স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যরসের নামগন্ধও যাঁর চিত্তে নেই, কিন্তু আছে সাধনা ও সংকল্প। অন্যদিকে পরিমল গোস্বামী—যাঁর সাহচর্যে চিঠির আসরে এলেন সাহিত্যস্রষ্টা বন্ধুগণ। এই দুই পথের যোগে সজনীকান্তেরও সাহিত্যিক-মন স্থিতি ও গতির একটা সামঞ্জস্যের সুযোগ লাভ করল। বাঙালীত্বের নবজন্মের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য থেকে সজনীকান্ত খুঁজল মতের বনিয়াদ, আর রবীন্দ্র-অনুজ সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রকাশে পরিবেশে সজনী-কান্তের মন পেল সৃষ্টির বল। এই সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হোক বা না হোক, আত্মপ্রকাশের নতুন আকাশ সজনীকান্ত আবিষ্কার করল। বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় যে নতুন প্রদেশে সজনীকান্ত পদার্পণ করল সেখানে তার বৈজ্ঞানিক চেতনা সার্থক হয়েছে। সাহিত্যকীর্তি হিসাবেও তা অবিস্মরণীয়। অন্য দিকে সাহিত্যসৃষ্টির হাওয়া গায়ে লাগতেই তার কল্পনার রাজহংস আকাশের উদ্দেশে পাখা মেলে দিল, লক্ষ্য তার মানস-সরোবর। অবশ্য লক্ষ্যই যথেষ্ট নয়। উপলক্ষ্যের উত্তেজনায় যে পথ বিস্তৃত হতে

হতে এসেছিল বিক্ষেপের বিভ্রান্তি তাও কম রচিত করে না। জীবনের বহু ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগও এসে যায়। সাহিত্য-পরিষদ থেকে রাজদরবার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠার সকল ক্ষেত্র উন্মুক্ত—অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। তার মধ্যে সাহিত্যকীর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য নয়, সহজাত সাহিত্যানুরাগেই তা সম্ভব। নীতিশাসকের পদ ত্যাগ করে সহজাত সাহিত্য-সংস্কারের পথেও প্রত্যাবর্তন আবার দুঃসাধ্য। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই বিদ্রূপের বর্মচর্ম ত্যাগ করা যায় না; সেই নীতিশাস্ত্রের বচনকেই মেনে নিতে হয় ধ্রুব আশ্রয় বলে। অথচ জীবন সম্মুখে চলে পিছনে ফিরে যায় না। কাউকে সে নিষ্কৃতিও দেয় না। যুগধর্মের সেই জয়জয়কার পরিস্ফুট গৃহে-সংসারে-সমাজে-রাষ্ট্রে—এমন কি, সাহিত্যে রসসৃষ্টিতে নব নব উন্মেষের আয়োজনে। সজনীকান্ত যে মহাগুরুর নিকট আজন্ম দীক্ষিত, সেই রবীন্দ্রনাথেরই সাধনায় তখন পড়ছে কালান্তরের স্বাক্ষর—জীবনের জয়লেখা।

জন্মসূত্রে সৌরমণ্ডলের পথিক হয়েও কর্মসূত্রে শনি-মণ্ডলের আলো-আঁধারিতে সজনীকান্তকে বাঁধা পড়তে হয়েছে—এইটাই তার কবিচিত্তের দুর্দৈব।

শনির দৃষ্টিতে পৃথিবী দেখবার জন্ত তার জন্ম নয়।

> কারে কহি, কারে বা বুঝাই,
> মোর মূর্তি সত্য এ তো নহে—
> সে তো নহি আমি

মনের এই নিরালম্ব বিস্তার-বিক্ষেপ ছাড়িয়ে সজনীকান্তের পক্ষে যে একটি ধ্রুব আশ্রয় ছিল তা কোনও দিনই কিন্তু ব্যর্থ হয় নি—সে আশ্রয় তার গৃহাঙ্গন। কোনও সময়েই এ সম্বিৎ ফিরে পেতে তার দেরি হয় নি:

> প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
> স্নিগ্ধ শিখায় জলিতেছে ঘৃতদীপ।

এই গৃহদীপেই তাঁর মনের দীপ আপনার আলোক-জন্ম সার্থক করেছে। গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গেই কাব্যলক্ষ্মী তখন এক হয়ে উঠেছে। সমস্ত অসঙ্গতি-শুদ্ধ সজনীকান্তের মন তাই উত্তেজনাহীন এই সহজ বিস্ময়ে আপনাকে পুনঃস্থাপিত করতে পারল:

> বহুদিন ভুলেছিনু পৃথিবীতে এত আছে আলো—
> যত আলো এ আকাশে পৃথিবীতে তত ভালবাসা।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে সজনীকান্ত স্ত্রীকে তাই জিজ্ঞাসা করেন, দেখ, আমার চোখের দৃষ্টিটা আবার ফিরে পেলাম নাকি?

'পৃথিবীতে এত আছে আলো'—এ সত্যই শেষ পর্যন্ত এই সরসচিত্ত মানুষ পৃথিবীর কাছে জানিয়ে যেতে উন্মুখ হয়েছিলেন।

চায়ের আসরে সেদিন সজনীকান্ত হঠাৎ গল্পের ধারা একটু ছেদ করেই তাই বলেছিলেন, "জানেন, গোপাল আমাকে লেখায় প্রথম লাগিয়েছে"—

আমি কেমন বিস্মিত হলাম, বললাম, "বাজে কথা রাখ্।"

"বাজে কথা কি? তুই আমাকে প্রথম হোস্টেল-ম্যাগাজিনে কবিতা লিখিয়েছিস—'রবীন্দ্রনাথ' ও 'গান্ধীজী'র বিষয়ে। তুই ছিলি সম্পাদক। 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছি তা—দেখিস নি?"

কথাটা মনে পড়ল। কিন্তু তা স্মরণীয় ব্যাপার নয়। তার চেয়ে বরং স্মরণীয় এই কথা, সজনীকান্ত আমাকে শনিবারের চিঠি ও প্রবাসী আপিসে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকেই সাহিত্যের পথ ত্যাগ করতে দেন নি। গৃহের মতই সাহিত্য তাঁর স্বভাব-ধর্ম। সত্য কথাই বললাম আমি, "আমি না লেখালে কি লিখতিস না? না, লিখে চুপ করে থাকতে পারতিস?"

তবু যে সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথাটা সজনীর কাছে শুধু স্মরণীয় নয় উল্লেখযোগ্যও, তার মধ্যে সজনীরই পরিচয় রয়েছে—সজনীর মনের। আমি তার বন্ধুসমাজে প্রধান নই, শান্তিনিকেতনের পরিপ্রেক্ষিতে তো বিশেষ করেই 'বিপক্ষ দলের মানুষ'। দুজনের মাঝখানকার অস্বীকৃতিই সাধারণের জানা। কিন্তু স্বীকৃতি আছে গৃহে-সংসারে, ব্যক্তিজীবনে, হয়তো বা দুজনার কাব্যামৃত পিপাসায়। সজনীর যে প্রকৃতির সঙ্গে আমি পরিচিত সেখানে রাজনীতি-সমাজনীতির মতামত নিতান্তই বাহ্য ব্যাপার। এমন কি, যে বাঙালী প্রাণধর্মের তত্ত্ব মোহিতলাল আঁকড়ে ধরেছিলেন, এবং মৃত অ্যালবাট্রসের মত শনিবারের চিঠির গললগ্ন করে দিয়ে যান, সে ঐতিহ্য, সেই অতীতমুখী

সংস্কারও সজনীকান্তের স্বধর্ম নয়। তার জীবনধর্ম ছিল স্বচ্ছন্দ, তার কবিচিত্ত নীতি-বায়ু বর্জিত, তার বুদ্ধি বস্তুনিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন—obscurantism বা রহস্যমোহ সেই মৃত অ্যালবাট্রস, সজনীর প্রকৃতিগত নয়। শক্তির উন্মাদনায় একদিন কংগ্রেসকে ও দেশের নেতাদের সজনীকান্ত বাণবিদ্ধ করেছেন। আবার আর-একদিন সে বাণের লক্ষ্য হয়েছে কমিউনিস্টরা 'কামনিষ্ঠ' নামে। এই অস্ত্রখেলায় পূর্ব যুগেও আমার আপত্তি ছিল, কারণ সজনীকান্তের পক্ষে তা অব্যাপার। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি তার আপন ধর্ম নয়। এদিনেও আমার আপত্তি ছিল সেই একই কারণে,—'পৃথিবীতে এত আলো আছে' কমিউনিজম্ তো তারই প্রমাণ,—এ সত্য সে অস্বীকার করলে আপনাকেই বঞ্চিত করবে। তর্ক বাধলে নিশ্চয়ই সে হার মানত না। তর্কে হারমানা আমাদের কারও অভ্যাস নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিকষে যখন রতনের বা আমার মত বন্ধুর দর কষত তখন সহজভাবেই স্বীকার করতে পারত—'ভুল হয়েছে।' মানতে হত হয়তো ভুল কারও একার নয়। কিংবা আরও সহজ হাস্যে সে বলত, 'একটু মজা করলাম।' বিরক্তির কাঁটাটুকু খসে যেত দু পক্ষেরই মন থেকে।

তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই দু-একটি কথা বলছি—যা এ প্রসঙ্গে সময়োচিত ও অবান্তর নয়।

সেদিন প্রত্যূষেই আমি গ্রেফ্তার হয়ে লর্ড সিংহ রোডে আবদ্ধ হয়েছি। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিন—সারাদিনে কলের জল ভিন্ন কিছুই আমার জোটে নি। মধ্যাহ্নের শেষে একজন গোয়েন্দা কর্মচারী এলেন। বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র, সজনীর পরিচয়েই আমার সঙ্গে পরিচিত। জানালেন, সজনী আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে।

সজনী! আমি চমকিত হলাম।—সে এল কেন?

আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সে অনুমতি কি সে পাবে?

বোধ হয় না। তবে অনুমতির মালিক উপরওয়ালা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে আমি তাঁকে বললাম, সুশীলবাবু, একটা কথা রাখবেন। অনুগ্রহ করে সজনীকে বাড়ি চলে যেতে বলে দিন। আর আপনাদের ব্যাপার তো জানেন। তাকে আমার হয়ে বলবেন, যতদিন আমি জেলে আছি ততদিন আমার সঙ্গে পত্রালাপ যেন না করে। আমি তার ব্যবসায়ের সহযোগী—এ কথাও যেন কখনও না বলে।

আর একজন সুহৃদও সে সময়ে এই জেলে কারারুদ্ধ সন্দেহভাজনটির জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, তিনি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর যে পদপ্রতিষ্ঠা, সজনীর তখন তা ছিল না। অধিকন্তু আমার বন্ধু হিসাবে আমার সেদিনের কোন কোন প্রয়াসে সজনী ছিল আমার সহায়ক, বিশ্বাসভাজন বন্ধু। সে সূত্রেই প্রবাসী প্রেসে তল্লাশী হয়েছিল। গোয়েন্দাদের সন্দেহ ছিল চট্টগ্রামে নিহত বিপ্লবীদের যে অ্যালবাম মুদ্রিত হয় তা সজনীকান্তের সহযোগে আমি প্রবাসী প্রেস থেকেই মুদ্রিত করেছি। সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়—সজনীর সহযোগিতা ছিল। কিন্তু প্রবাসী প্রেসে তার মুদ্রণ ছিল মূঢ়ের কল্পনা। এরূপ আরও কিছু কিছু ব্যাপারে সজনীকান্ত আমার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—যদিও আমি জানতাম, তাঁকে বেশী জড়ানো অন্যায়। কারণ সে গৃহী মানুষ, অনেক তার দায়িত্ব। তার গৃহসংসার ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমার অনুশোচনার অন্ত থাকত না। আর জানতাম—দশজন প্রাণবান্ পুরুষের মত তার স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকলেও রাজনীতিতে উৎসাহ নেই। অকুণ্ঠিত ছিল স্বদেশপ্রীতি ও বন্ধুপ্রীতি।

আমাদের এ পর্বের সম্পর্কটা শান্তিনিকেতনের সেই অধ্যাপক বন্ধুটি জানতেন বলেই বলেছিলেন "সজনীবাবু যখন ধরে ফেলেছেন তখন আপনার আর আসা হবে না বুঝেছিলাম।"

বৎসর সাত পরের কথা বলি। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত স্বল্পজীবী যুগান্তরে আমার নামে একটি লেখা সজনীর ভাণ্ডার থেকে সজনী প্রকাশ করে দিয়েছেন। তখনও আমি কারারুদ্ধ, শীঘ্রই গৃহরুদ্ধ হব। লেখা বাইরে পাঠানো আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। কি করে আমার লেখা পত্রস্থ হল, এ প্রশ্নটা কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাস্য ছিল। গৃহে ফিরে সজনীকে খবর পাঠালাম—প্রশ্নাদির জন্য প্রস্তুত থাকতে। সে নিজে এসে উপস্থিত—কিন্তু কাজটা

বেআইনী। কারণ, বাইরের লোকের সঙ্গে তখনও আমার সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। বিপদটা জেনেও তার মন মেনে নিতে চায় নি—এতকাল পরে আমি বাইরে এসেছি।

বৎসরখানেক পরে যখন মুক্তি পেয়েছি—সে ১৯৩৮ সনের শেষভাগ হবে,—একদিন মোহনবাগান রো'র 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় জমে বসেছি। সদ্য প্রকাশিত 'ভারত' নামে একখানা অতি দরিদ্র সাপ্তাহিক সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। তার সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী সবই ছিলেন আমাদের জেলের সুহৃদ স্বর্গীয় অতীন্দ্রনাথ বসু। আমরা কজন মুক্ত রাজবন্দী মিলে তাতে কলম চালাব এই তাঁর ভরসা। আমারও আপত্তি করবার সাধ্য ছিল না। কথা হচ্ছিল—এ কাগজে আমাদের কি লভ্য হবে। আমি জানালাম, কিছু না। চললেই ঢের।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বললেন, তাই তো গোপাল, তুমি আবার রাজনীতিতে লাগলে,—তোমার চলবে কি করে এভাবে?

প্রশ্নটা সমীচীন। অবশ্য আমার প্রয়োজন তখন সামান্য, আর অবলম্বন সাংবাদিকতা। তা জানালাম। হরেকৃষ্ণদা দ্বিধান্বিত হলেন, বললেন, এতেই চলবে?

আমি সহাস্যে জানালাম, আপাততঃ। আর পরে না চলে—আমার নিজের কথা বলতে পারি—আত্মীয়দের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, আপনার জানাশোনার মধ্যেও এমন দু-একজন বন্ধু আছেন যাঁরা, আমি যদি বলি 'আমি কিছু করব না, তোমার উপর বসে খাব আর ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতার আয়োজনটায় কিছু কাঠ-খড় যোগাব'—তা হলে তাঁরা আপত্তি করবেন না।

হরেকৃষ্ণদা জিজ্ঞাসা করলেন, কে? বলো?

হরেকৃষ্ণদা তখন সুনীতিবাবুর কলকাতার গৃহে অতিথি। আমি নাম বললাম, প্রথম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তিনি স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তিনি তোমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। তা ঠিক, কিন্তু তারপর—

আমি বললাম, তার আগেই বলতে পারতাম, ঐ সজনীকান্ত দাস—

কিন্তু ওর তো বোঝা কম নয়।

কিন্তু আমি যদি এসে উঠি ওর বাড়িতে তা হলে ওর সাধ্য কি আমাকে না বলবে!

সেদিনের উপলক্ষ্যটা আজ এর বেশী স্মরণ করা নিষ্প্রয়োজন। 'ভারত' পাঁচ-ছয় সপ্তাহ পরে বন্ধ হয়, অতীন্দ্রনাথের ঘাড়ে পড়ে তার কিছু ঋণ। কিন্তু কথাটা স্মরণীয় এজন্য—সেদিনকার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা সজনীকান্ত দাস কেউ রাজনৈতিক কর্মে উৎসাহবোধ করতেন না। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিচরিত্রে ছিল প্রশস্ততা, আর ব্যক্তিগত ভাবে আমার প্রতি সুগভীর প্রীতি, এবং ব্যক্তিগতভাবেই প্রতি সুশিক্ষিত মানুষের মত দেশের প্রতিও ছিল তাঁদের মমতা। তখনও সজনীকান্ত অবশ্য সাধারণ আয়ের সচ্ছল গৃহী। তবু দৃঢ়রূপেই জানতাম আমার এ ধারণা ভুল নয়। পরবর্তীকালেও সে ধারণা ত্যাগ করতে পারি নি। আমার 'একদা' সজনী সোৎসাহে প্রকাশ করেছে। কোন সময়েই আমাদের দেনা-পাওনার হিসাব হত না, তখনও হয় নি। কিন্তু যুদ্ধারম্ভে রাজদণ্ডের খড়্গাঘাত যখন আবার দুরতিক্রম্য মনে হয়েছিল তখন তাকেই আমার বাড়ি-ঘর দেখবার কথা বলেছি, আর সেও তেমনি দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছে—কারাবাসকালে আমার বাড়িতে আমার অনুপস্থিতিজনিত আর্থিক অসঙ্গতি ঘটবে না। আমার দণ্ড হয় নি, তারও সহায়তার প্রয়োজন হয় নি, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তার মন ছিল প্রস্তুত, আমার মন ছিল নিঃসংশয়—সজনীর এরূপই স্বভাবধর্ম।

মহাযুদ্ধের রাজনীতির তাড়নায় তার পরে আমরা অবশ্য ক্রমে পরস্পরের থেকে দূরে চলে যেতে থাকি। তাও আকস্মিক নয়। মুসোলিনির মাহাত্ম্য শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ শনিচক্রে, আর সজনীকান্তেরও ওপর পূর্বেই সঞ্চিত ছিল। 'প্রবলের দৌরাত্ম্য' কখনো মাহাত্ম্য নয়, আর আসলে তা প্রবলও নয়—জাতীয়তাবাদী হলেও এ ধারণা আমার মজ্জাগত। মহাযুদ্ধ এল। আমার জাতীয়তাবোধ আমাকে নিয়ে যায় ভারতীয়-চেতনার প্রশস্ততর প্রাঙ্গণে, যেখানে "স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে সত্যভাবে অনুভব" না করলেই নয়। নীরদ চৌধুরীর ইতিহাস-বোধ তাঁকে দাঁড় করাল একালের স্পার্টার বিরুদ্ধে একালের

এথেন্সের অনুগামীরূপে। শনিবারের চিঠির নিজের নিয়মেই তা তখন স্বাজাত্যবোধের যে কক্ষে এসে পৌঁছেছে তাতে সে আসর ফ্যাসিজমের দুর্বারতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত। যদিও রবীন্দ্রভক্ত সজনীকান্তের মনে সে ধ্বনি যে বিকট না শোনাত তা নয়। স্বভাবতঃই তবু তাঁর হাত থেকে নীরদ চৌধুরীও নিস্তার পান নি, আমিও না। অথচ একটু দুঃখের হাসিই দেখতে পেলাম 'চিঠি'র এক সংখ্যার পাদপূরক পদ্যাংশে—"ভাগ্যের নদী বেয়ে

... ... যশী অধিকারী হল পার।

অধম গোপালদের এ অর্ণবে লগি ঠেলা সার।"

তবু এরই মধ্যে সিনেমার ফরমায়েশী কাজে সজনী যখন একবার বাইরে যাচ্ছেন তখন শনিবারের চিঠির লগিটাও আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন—সে মাসের সমস্তটা 'সংবাদ-সাহিত্য' আমাকে লিখতে হবে। ঠিক তারই মেজাজে সেবার শনিবারের চিঠির সে লেখা লিখতে আমিও চেষ্টা করেছি। তারপরে আর সে প্রয়োজন হয় নি। বিয়াল্লিশের আন্দোলন আরম্ভ হল, মন্বন্তর মহামারী দেখা দিল, কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ গড়ে উঠল; ক্রমে এল কলকাতা ও নোয়াখালির হত্যালীলা, শেষে ভারত-বিভাগ, শেষ পর্বে বঙ্গবিহার সংযুক্তি—এমনি আরও কত কি। দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কথাটা এই—সজনী-চরিত্রে এসবই বাহ্য,—মিথ্যা নয়, কিন্তু গৌণ। সাহিত্যই ছিল তাঁর স্বধর্ম, আর হৃদয়বৃত্তি গৃহ-সম্পর্কে ব্যক্তি-সম্পর্কে সবল ও স্বচ্ছন্দ। কবি মোহিতলাল তখনি তাঁর প্রতি বিরূপ হচ্ছিলেন। তবু একদিন আমরা দুজনে বাগনানে তাঁর বাড়ি গিয়ে বহুক্ষণ রাত্রি জেগে 'কাব্য-জাগর' যাপন করেছি। দেখেছি মোহিতলালের প্রতি সজনীর শ্রদ্ধা—সে শ্রদ্ধা মোহিতলালের মৃত্যুর পরেও কিছুমাত্র ম্লান হতে দেখি নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়তো তোলা নিরর্থক। ওই অ-কবি মানুষটিকে সজনী অগ্রজের মতই মান্য করতেন—মৃত্যুর পরেও। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তার সৌহার্দ্যের অন্ত ছিল না। বাংলা দেশের কোন্ সাহিত্যিক তার সৌহার্দ্য কামনা করে বঞ্চিত হয়েছেন? 'বিপক্ষীয়' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন তাঁর জন্য শুধু দীর্ঘশ্বাস নয়, তাঁর সাহিত্যিক স্বীকৃতির জন্যও অকপট চেষ্টা দেখেছি সজনীকান্তের। রাজনীতি, মতামত, কোন জিনিসই তো সজনীকান্তের পথে বাধা হয় নি। সেখানে সে সাহিত্যিক, সেখানে সে হৃদয়বান সুহৃদ। তার প্রকৃতিতে যা ছিল না তা হচ্ছে ক্ষুদ্রতা, 'পেটিনেস'।

শান্তিনিকেতনের সেই শেষ দুটি দিনের পরে কেবলই মনে হয়—শান্ত সরল যে কৌতুকবোধে জীবনের পরম পরিণতি, সজনীকান্ত এবার সেখানেই পৌঁছেছিলেন। আর এমনি সময়ে—কিন্তু তাই বা বলি কেন? তার পক্ষে কিছুরই আর প্রয়োজন ছিল না—এই পরিণতিতেই তো সার্থকতা—"Ripeness is all."

—

মর্ত্য হইতে বিদায়

শ্রীশান্তি পাল

মহাপ্রস্থানের পথে প্রাণ-তরী বেয়ে,
ওগো কবি, জীবনের 'সঞ্চারী' না গেয়ে,
এই রঙ্গমঞ্চ ছাড়ি অভিনয় শেষে,
কার ডাকে দিলে পাড়ি অজানার দেশে!
জানি বন্ধু, এ-জীবন বালুকার বেলা
মৃত্যু-পারাবার-তীরে ভাঙা-গড়া খেলা;
তুচ্ছ করি সংসারের ঝঞ্ঝাবাত যত,
শনি-সত্রে নিলে বেছে সাহিত্যের ব্রত।
মানীরে সম্মান দিলে, পথহারা জনে
বাণীর মণ্ডপে টানি বসালে আসনে।
ম্লান মূঢ় মূক-মুখে যোগাইলে ভাষা,
দুরুদুরু ভীরুবক্ষে জাগাইলে আশা।
স্তুতি-নিন্দা সুখ-দুঃখে নির্বিকার থাকি
মহাকাল-করে সখা বেঁধে দিলে রাখী।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীসহ রবীন্দ্র-সন্নিধানে সজনীকান্ত

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ প্রস্তাবনা ॥

১

সজনীকান্তের সারস্বত সাধনার দুই গুরু;—দেবগুরু বৃহস্পতি আর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। বৃহস্পতিগুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ আর শুক্রগুরু মোহিতলাল। এই দুই গুরুর মধ্যে সাহিত্যের আদর্শগত যে দ্বন্দ্ব তাই ছিল তরুণ সজনীকান্তের মানসলোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সারস্বত সাধনার প্রথম যুগে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সজনীকান্তের কবিমানসকে কখনো করেছে বিভ্রান্ত, কখনো পথভ্রষ্ট। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে আপন স্বরূপে কবি-সজনীকান্তের আত্মপ্রকাশ শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবনেরই ইতিহাস নয়, তা বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের ইতিহাসও বটে। তাই সে ইতিহাসকে অনুসরণ করা বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের অপরিহার্য কৃত্য বলেই মনে করি।

মোহিতলালকে একদিন সজনীকান্ত যে গুরুপদে বরণ করেছিলেন তার অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'মানস-সরোবরে'র উৎসর্গ-লিপিতে। 'মানস-সরোবর' শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-কাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯। উৎসর্গলিপির নীচে রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে বিধৃত হয়েছে—

"যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি ;
'কে যাবে সাথে ?'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"

গুরুর প্রতি শিষ্যের আনুগত্য এবং গুরুনির্দেশেই শিষ্যের নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার কথা এর চেয়ে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সজনীকান্ত মোহিতলালের প্রতি তাঁর গুরুভক্তির যোগ্য ভাষা খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিতার মধ্যে। সজনীকান্তের জীবনে কে অন্তরতর ছিলেন তার সংকেত এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

২

মোহিতলালের সঙ্গে সজনীকান্তের যখন পরিচয় হল তখন তাঁর বয়স তেইশ বৎসর। সজনীকান্ত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের এম. এস-সি. ক্লাসের ছাত্র। যদিও সদ্যবিবাহিত, তবু মেসেরই বাসিন্দা। একাসনী ঘরে পড়ার সুবিধা হবে বলে মেস বদল করে তিনি এলেন ২৭ বাদুড়বাগান লেনের একটি 'সাতমিশালী' মেসে। তেতলার একটি একাসনী প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিলেন ১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত এই মেসটিকে বলেছেন 'জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান।' তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতার ভাষাতে মেসটি সাহিত্যের প্রথম শিক্ষার্থীর "হেয়ার হিন্দুস্কুল" বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই মেসেই তাঁর পাশের আরেকটি একাসনী প্রকোষ্ঠে থাকতেন কবি-শিক্ষক মোহিতলাল মজুমদার। সেখানে নিয়মিতভাবে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি জীবনময় রায় আর 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম ত্রিমূর্তির অন্যতম যোগানন্দ দাস। সজনীকান্ত যে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কবিতা লেখেন সে সংবাদ জীবনময় এবং যোগানন্দের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ধীরে ধীরে মোহিতলালেরও তা কর্ণগোচর হল। তিনি বললেন, "শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে নাকি আপনি গুলে খেয়েছেন, এদিকে পড়েন তো এম. এস্-সি.! সামলান কি করে ?"

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখছেন, সত্যসত্যই আর তাঁর পক্ষে দুদিক সামলানো সম্ভব হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের

বকেয়া মাইনে এবং পরীক্ষার ফীর জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে পাঠালেন পিতৃদেবের কাছে। তাঁদের সংসারে তখন 'ডায়ার্কি' চলছে। পিতৃদেব পুত্রের আবেদন পাঠালেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে। সেখানেও দাক্ষিণ্যের অভাব হল। অর্থাৎ টাকা পাওয়া গেল না। পরীক্ষা না-দেওয়া সম্পর্কে সজনীকান্তের মন প্রস্তুত হয়েই ছিল। অভিভাবকগণের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে পিতৃদেবকে লিখলেন, টাকার অভাবে এম. এস-সি. পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হল না এবং এর পর থেকে তাঁর মাসিক খরচ পাঠাবার দায় থেকে তিনি অভিভাবকগণকে অব্যাহতি দিলেন।

জীবনের এই সংকটলগ্নে বিজ্ঞান-ভারতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সজনীকান্ত প্রবেশ করলেন কাব্যসরস্বতীর কমল-বনে। এই অবস্থাকে তিনি বিমানচালনার পরিভাষায় বলেছেন, তাঁর জীবনের 'নিরুপায় অবতরণ' বা Forced Landing। সজনীকান্ত বলছেন, "এই অসহায় অবস্থায় মনের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটিল জানি না, কলমের ডগায় ব্যঙ্গকবিতার বান ডাকিল।" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ ১৩৬]। কামস্কাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"কে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন 'ব্যাঙ' কবিতা। এবং প্রতিদিনই এই-জাতীয় কবিতা একটি করে লেখা হতে লাগল। এইভাবেই প্যারডি-পারংগম কবি সজনীকান্তের জন্ম হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে মোহিতলালের প্রথম কবিশিষ্য নজরুল। দ্বিতীয় সজনীকান্ত। সজনীকান্তের খাতাখানি যতই ব্যঙ্গকবিতায় বোঝাই হতে লাগল, মোহিতলালও ততই খাতা-বগলে এই নবাবিষ্কৃত কবিশিষ্যকে নিয়ে পরিচিত মহলে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সজনীকান্তের জীবনে তৎকালীন পরিবেশের প্রভাব বিচার করলে। সজনীকান্ত যখন ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় হাত পাকাচ্ছিলেন, তখন, ১৩৩১ সালের ১১ই শ্রাবণ [২৭ জুলাই ১৯২৪] 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হল। প্রথম সংখ্যাতেই কাজি নজরুল ইসলামকে ব্যঙ্গ করে "গাজী আব্বাস বিটকেল" নামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্টম সংখ্যায় সজনীকান্ত 'আবাহন' নামে একটি কবিতা লিখলেন। সাময়িক পত্রিকায় এটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। নজরুল-ব্যঙ্গই তার লক্ষ্য।—

ওরে ভাই গাজিরে
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!

ইত্যাদি। 'চিঠি'র একাদশ সংখ্যায় "কামস্কাটকীয় ছন্দে"র শেষ "অসম ছন্দ" ডেকে আনল প্রচণ্ড বিপর্যয়। "বিদ্রোহী"র প্যারডি "ব্যাঙ" প্রকাশিত হল। আবেদন পৌছল যথাস্থানে। হাবিলদার কবি নজরুল ইসলাম সম্মুখে কাউকে না পেয়ে ভাবলেন এর পেছনে রয়েছেন মোহিতলাল। গুরুকে লক্ষ্য করে শিষ্য প্রচণ্ড বিক্রমে গদা নিক্ষেপ করলেন। 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ অর্থাৎ আশ্বিন সংখ্যায় নজরুলের "সর্বনাশের নেশা" প্রকাশিত হল। গুরুসম্বোধনে মোহিতলালকে রণে আহ্বান করে তিনি শাসালেন, "ভূধরপ্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার।" নজরুলের এই মাত্রাতিরেকী অবিবেচনায় মোহিতলাল হলেন ক্ষিপ্ত। 'গুরু দ্রোণ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করলেন। 'শনিবারের চিঠি'র ক্রোড়পত্রে দ্বাদশ অর্থাৎ "বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যায়" তা প্রকাশিত হল। কবিতায় মোহিতলাল হলেন দ্রোণগুরু, সজনীকান্ত অর্জুন আর নজরুল কর্ণ। কর্ণকে অভিশাপ দিয়ে দ্রোণ লিখলেন—

আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর।
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,...

ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতঃপর দু-পক্ষের রণদামামা উঠল বেজে। 'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতলালও "চামার খায়-আম" বেনামীতে সরাসরি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন। সব্যসাচী সজনীকান্ত 'চিঠি'র পৃষ্ঠায় রঙ্গ-ব্যঙ্গের ফুলঝুরি ছড়াতে লাগলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠে গড়ে-ওঠা তাঁর শৈশব-কৈশোরের সাহিত্যসংস্কার হল ধূলিলুণ্ঠিত। প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী অস্ত্রে ধরাশায়ী করার প্রচণ্ড উত্তেজনায় তিনি 'দুষ্টা সরস্বতী'র সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথমে নজরুল, পরে কল্লোলগোষ্ঠী হলেন তাঁর আক্রমণের পাত্র, মোহিতলাল হলেন অনুক্ষণ উৎসাহদাতা

গুরু, 'শনিবারের চিঠি' হল তাঁর বাহন, ব্যঙ্গরচনাই হল মুখ্য সারস্বতকৃত্য। বৃহস্পতিশিষ্য হলেন প্রতিহিংসা-পরায়ণ শুক্রাচার্যের শাণিত হাতিয়ার।

৩

সংগ্রামে দক্ষ, ব্যঙ্গসুনিপুণ নির্মম সমালোচক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সজনীকান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। দাঠাকুরের ভাষায় তিনি হলেন 'নিপাতনে সিদ্ধ'। বড় বড় মহারথীদের নিপাতিত করতে তাঁর সমকালে সজনীকান্ত হলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু কি মূল্য দিয়ে তিনি এই কীর্তি বা অপকীর্তির অধিকারী হলেন তা বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। সারস্বত সত্রে মৌলিক সৃষ্টিকর্মই সর্বোত্তম। সমালোচকের কাজ যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, তা দ্বিতীয় শ্রেণীর। অথচ সজনীকান্ত প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সমকালীন পাঠকের রসনারোচন চাঞ্চল্য ও উত্তেজনাসৃষ্টির দ্বারা তিনি যতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে থাকুন না কেন, তাঁর সে প্রতিষ্ঠা ক্ষণকালের। কালান্তরের রুচি ও দৃষ্টি-বদলের দিনে সে প্রতিষ্ঠা অস্পষ্ট হয়ে আসবেই। কিন্তু শুধু যুগের নয়, যুগোত্তর কাব্য-রসিকের চিত্তকে বিস্ময়মুগ্ধ করবার মত শক্তিও তাঁর ছিল। যৌবনারম্ভে বিপথে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর সে শক্তির অনেকখানিই অপচিত হয়েছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, অনেক সংগ্রাম এবং অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ভোগ করে, বিলম্বিত হলেও, অবশেষে একদিন সজনীকান্তের কবি-স্বভাবেরই জয় হল। 'অঙ্গুষ্ঠ' 'মনোদর্পণে'র প্যারডি-পারংগম ব্যঙ্গরসিক হলেন 'রাজহংস', 'মানস-সরোবর', 'পঁচিশে বৈশাখ' ও 'পান্থপাদপে'র কবি। বাল্যকালে কুলুকুলু মহানন্দার কূলে এক বৃষ্টিথমথম বাদল-সন্ধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান' কবিতা পড়ে বালক সজনীকান্তের মনে যে আদি শিহরণ সঞ্চারিত হয়েছিল জীবনের ত্রিশ বৎসর পেরিয়ে তারই আনন্দ-স্পন্দন তিনি ফিরে পেলেন তাঁর কবিসত্তায়। ছেলেবেলা গুরুমন্ত্রের মত যে নাম তাঁর জপমন্ত্র ছিল সেই নামেরই জয় হল তাঁর জীবনে।

সজনীকান্তের সেই আত্মোপলব্ধির ইতিহাস ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। আমরা তাঁর প্রথম সিদ্ধির কথাই প্রথমে বলব। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্তের অপকীর্তির সবচেয়ে অমার্জনীয় দৃষ্টান্ত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী [১৯৩১] উপলক্ষে তাঁর দুর্বিনীত রবীন্দ্র-বিদূষণ। গুরু-হত্যার অপরাধের মত সজনীকান্তের জীবনের এই কলঙ্ক অনপনেয়। শনিবারের চিঠির সেই কুখ্যাত "জয়ন্তী-সংখ্যা" [মাঘ ১৩৩৮] সম্পর্কে সজনীকান্ত নিজেও তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে বলেছেন "আমাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল" [দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৬৪]।

কিন্তু এই 'ব্যাজস্তুতি'র ছদ্মবেশেই নেমে এল সজনীকান্তের জীবনে তাঁর গুরুর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। 'জয়ন্তী-সংখ্যা'র সর্বশেষে একটি কবিতা মুদ্রিত হল। নাম "রবীন্দ্রনাথ", রচয়িতা সজনীকান্ত স্বয়ং। এই কবিতাই কবিশিষ্যের প্রথম সার্থক গুরুবন্দনা। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের স্কন্ধ থেকে তখন দুষ্টা সরস্বতী বিদায় নিয়েছেন, দেখা দিয়েছে মহানন্দার কূলবর্তী সেই বিস্ময়মুগ্ধ বালকের আদি শিহরণের আনন্দ-স্পন্দ। সজনীকান্ত লিখলেন:

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে—
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই, তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

সজনীকান্ত লিখছেন, "এই বিচিত্র ছন্দের নির্মল ধারায় স্নান করিয়া যেন আমি পূত-পবিত্র নবজন্মান্তর লাভ করিলাম; সকল ক্ষোভ, সকল অভিমান, সকল বিদ্বেষ

সজনীকান্ত-সান্নিধ্যে

বাণী রায়

সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রাদেশিকতার গণ্ডি অতিক্রম সাহিত্য-জীবনে।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছি। মাতা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর সাহিত্যসৃষ্টি উপলক্ষ্যে বাড়িতে সর্বপ্রকার সাহিত্য-পত্রিকা আসত, সাহিত্যিক ব্যক্তিবৃন্দেরও পদক্ষেপ ঘটত। তা ছাড়া বাড়ি থেকেই 'অভ্যুদয়' নামক একখানি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এক বছর, আমার পিতা স্বর্গগত পূর্ণচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে ও কবি সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়।

বহুপূর্বেই সজনীকান্ত দাসের নাম শুনেছি। শনিবারের চিঠি'তে পরবর্তী যুগে লেখিকা হলেও 'শনিবারের চিঠি' আমি প্রথম পড়েছি টেবিলে বসে নয়, টেবিলের নীচে বসে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুশীলকুমারের কাছে দু-এক খণ্ড ছিল। তাঁদের পড়ার ঘরে বৃহৎ টেবিলের নীচে লুকিয়ে গোপনে পাতা উলটিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম, ভাল করে পড়ার নয়। সেই নিষিদ্ধ 'শনিবারের চিঠি' প্রায় আমার ছাত্রীজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমারই নামে আসতে শুরু হল ভাবতে বিস্ময় লাগে।

এম. এ.-র পরে বেকার জীবন। আমার মাতার দন্তচিকিৎসক স্বর্গগত সত্যেন্দ্র সরকার তখন সজনীকান্তেরও দন্তচিকিৎসক ছিলেন। তিনিই একদিন সজনীকান্তকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেন। আমাদের বসবার ঘরে বাড়ির সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিলেন।

তখন নিষ্প্রদীপ কলকাতা। বাইরে কিন্তু পূর্ণিমা রাত্রি। আমাদের অনুরোধে সজনীকান্ত তাঁর কয়েকটি কবিতা গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন। একটি মনে

ভাসিয়া গেল" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ১৬৬]। হিমালয়োপম "রবীন্দ্রনাথে"র শেষ স্তবকটিতে সজনীকান্তের মানসলোক নিঃশেষে নির্বারিত হয়েছে। তিনি বললেন :

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাকো, নদীরে ক'রো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সব্জি-ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাকো, নাহি থাকো—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো ;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও-নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

আমরা বলেছি, এই কবিতাই রবীন্দ্রশিষ্য সজনীকান্তের প্রথম সার্থক গুরুবন্দনা। কবি-সজনীকান্তের জীবনে চরম কলঙ্কিত মুহূর্তই পরম শুভমুহূর্ত হয়ে দেখা দিল। 'আত্মস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন, "শুভমুহূর্ত মানুষের জীবনে কখন কোন্‌দিক দিয়া আসে কেহ বলিতে পারে না। বঙ্গভারতীর বরপুত্রকে নির্মম আঘাত হানিবার জন্য যে ক্ষুরধার অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলাম, স্বয়ং বীণাপাণি সকৌতুকে তাহাতেই তন্ত্রী যোজনা করিয়া বিদ্রোহীকেই সুরের ঝঙ্কার তুলিবার আদেশ ও অবকাশ দিলেন, আমার কাব্য-জীবনের ইহাই বিচিত্রতম ইতিহাস" [দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ১৬৭]।

এই গুরুবন্দনা করেই 'রাজহংস' 'মানস-সরোবরে'র কবির জয়যাত্রা শুরু হল।

[ক্রমশঃ]

—

"রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত" 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

আছে। 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' বইখানি আমাদের বাড়ি ছিল শুনে বোধ হয় জ্যোৎস্নারাত্রির কবিতাটি বললেন।

বিভিন্ন পত্রিকায় আমার দু চারটি ভীরু রচনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে বহুদিন। এম এ. ছাত্রীর প্রথম স্ট্যাণ্ডার্ড রচনা 'পুনরাবৃত্তি'র 'লুক্রেশিয়া' গল্পটি লেখা হয়েছে। সজনীকান্ত আমার কিছু লেখা শুনতে চাইলেন। কেন জানি না, সেই 'লুক্রেশিয়া' গল্পটিই পড়লাম। নীরব সজনীকান্ত নিরুত্তরে হাত বাড়ালেন, 'লেখাটা আমাকে দাও।' বিনা প্রশ্নে খাতাখানি তাঁকে দিলাম। তখনই আমার সাহিত্যজীবন প্রাদেশিকতার গণ্ডি অতিক্রম করল।

যে রাজপথে সজনীকান্তের হস্ত আমাকে এনে দিয়েছিল, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমার পথ বহুদিনই পৃথক হয়ে গিয়েছিল। সভাসমিতি বা ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষ্য ভিন্ন সজনীকান্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত না, তবু তিনি আমার আপনার লোক ছিলেন। পৃথিবীতে আপনার লোক কমই আছে। কেউ হারিয়ে গেলে পরমাত্মীয়-বিয়োগব্যথা অনুভূত হয়। 'লুক্রেশিয়া' কয়েক মাস পরে ভাদ্র সংখ্যায় (১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। শ্রাবণে রবীন্দ্রবিয়োগ ও সারা দেশ রবীন্দ্রপ্রভাবে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

রবীন্দ্র-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে আমার কবিতা সজনীকান্ত চেয়েছিলেন। আমি বেশী স্থান যাতে না লাগে সেজন্য আট লাইনের ছোট কবিতা দিলাম। সজনীকান্তের শোকসভায় অনুরূপ আট লাইনেই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'শনিবারের চিঠি'তে কখনও বেশী স্থান আমি চাই নি।

সজনীকান্ত আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বল্পভাষী, আত্মমর্যাদায় অভিমানী, গুণগ্রাহী, তীক্ষ্ণধী, স্নেহশীল ব্যক্তিরূপেই চিরকাল আমার মনে জাগরূক থাকবেন। সজনীকান্তের সমস্ত দিকগুলি যদি কখনও লোকস্মরণে শূন্য হয়ে যায় তখনও তাঁর মধ্যে অন্ততঃ একটি দিক থাকবে, কেউ যা অস্বীকার করতে পারবে না—সে তাঁর করুণা। অমন সহানুভূতিশীল কোমল হৃদয় আমি কমই দেখেছি। কোন প্রার্থীকে বিমুখ করা সে মনের ধর্ম নয়।

এ কথা সত্য 'লুক্রেশিয়া'র 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের ঘটনাটি আমার পুরোপুরি সাহিত্য-জীবনের সূচনা। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র যেরূপ অভিনন্দন আমি পাঠকসমাজে পেয়েছিলাম, একটি ছোট মেয়ের পক্ষে তা কল্পনাতীত। 'পুনরাবৃত্তি'র বিক্রয়ও বিস্ময়কর। তার মূল সজনীকান্তের নূতন লেখকের গল্পটি প্রকাশের সাহস—সজনীকান্তের আবিষ্কার।

আমার প্রথম পুস্তক 'জুপিটার' রঞ্জন পাবলিশিং থেকে ১৩৫০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। ভীরু মনের সাহস ছিল না। সজনীকান্ত সাহস দিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে আমি প্রথম গ্রন্থকর্ত্রীও হলাম। বইখানির ভূমিকা লেখবার কথা ছিল সজনীকান্তের, কারণ তখন পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে আমি পুরুষ। কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রকাশক হয়ে ভূমিকা লিখতে আপত্তি জানান শেষে। তখন আমি আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের হাতে তাঁরই উৎসাহে অতুলচন্দ্র গুপ্তকে পাণ্ডুলিপি পাঠাই। অতুলচন্দ্র গুপ্ত নিজের নানা অসুবিধা ও শোকের মধ্যেও ভূমিকা লিখে আমাকে সম্মানিত করেন। সজনীকান্ত আদ্যন্ত প্রুফ্ দেখে দিয়েছিলেন আমার সামনে বসে। তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কে এতই শ্রদ্ধা ছিল যে কখনও আমার কোন রচনার একটি শব্দও প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হলে পূর্বে আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। দোর্দণ্ড-প্রতাপ-সম্পাদক, কুশাগ্রধী সমালোচক সজনীকান্তের নূতন লেখিকার সঙ্গে এমন ব্যবহার সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা এবং শালীনতাবোধ জানায়। অন্যের মতামত মেনে নেওয়ার মধ্যে বহুবার তাঁর সহজ কবিমনের পরিচয় পেয়েছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর যোগাযোগে জেনারেল প্রিন্টার্স থেকে আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পুনরাবৃত্তি' প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখলেন সজনীকান্ত (১৩৫১) আমারই অনুরোধে।

আমার প্রকৃত সাহিত্যজীবনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করবার একমাত্র কারণ সজনীকান্তের ঋণস্বীকার।

জানি না ব্যবসায়ী সজনীকান্ত কেমন। জানি না শত্রু সজনীকান্ত কেমন। কিন্তু আপনার মানুষ সজনীকান্ত কেমন, আমরা কয়েকজন তা ভাল করেই জানি।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে যৌবনে কবি সজনীকান্তের পদক্ষেপ ছিল অনিয়মিত কখনও কখনও। কিন্তু আমি তাঁর জীবন ও চরিত্রে মহত্ত্বের পদক্ষেপ দেখেছি। একটি গভীর অধ্যাত্মবোধ নিঃশব্দে তাঁর জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিল। জীবনের শেষভাগে সেই অধ্যাত্মবোধ তাঁকে গোধূলির শান্তি এনে দিয়েছিল।

একদিন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা, বলুন তো ঈশ্বর আছেন কি?

সজনীকান্ত আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, হাসিতে বিস্ময় ও ক্ষমা। যেন অজ্ঞান শিশুর নির্বুদ্ধিতা দেখে স্নেহময় গুরুজনের প্রশ্রয়মিশ্রিত মার্জনা। ঈশ্বর যে তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ সত্য।

কবির মনে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও, তীক্ষ্ণধী হলেও কবির সরল বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বহুবার তাঁর চরিত্রে দেখেছি। প্রকৃত ব্যক্তিটি ছিলেন কবি ও সমালোচকের সংমিশ্রণ।

সরল কবি জীবনের পথে আঘাত দিয়েছেন যত, তার চেয়ে অধিক আঘাত হয়তো পেয়েছেন। কারণ স্পর্শকাতরতা ও অভিমানবোধ প্রতিটি কবিচিত্তে থাকে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক তখনই ভুল বুঝেছেন মুহূর্তমধ্যে। কিন্তু যে আত্মপ্রত্যয় কখনও বা তাঁর চরিত্রে অহংরূপে আত্মপ্রকাশ করত, সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতা গোপনের আবরণ হিসাবে অন্যের দুর্বলতায় নিষ্করুণ আঘাত করে যেত। তিনি স্বভাবধর্মে নিষ্ঠুর ছিলেন না। হীনমন্যতাবোধ অতিক্রম করার প্রধান অস্ত্র উচ্চকে অবজ্ঞাপ্রদর্শন। তাই সজনীকান্তের সাময়িক নিষ্ঠুরতায় স্থায়ী বিদ্বেষ লেশমাত্র ছিল না।

যে ব্যক্তি যে শিল্পী নিজের ব্যথাকে গোপন করতে চায়, সে নিজেকে বিদ্রূপ করে, হেসে উড়িয়ে দেয় সর্বজনসমক্ষে দুর্বলতা। ক্রমে অন্যকেও বিদ্রূপ করা তার স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। হাস্যরসের মাধুর্য ক্রমে তিক্ত ব্যঙ্গরসের প্রলেপে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কবি তখন অদৃশ্য। বেপরোয়া ব্যঙ্গরসিককে সে পথ ছেড়ে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কলেজী লেখাপড়ায় যদি মন বা সুযোগ থাকত তাহলে হয়তো আজ সজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন বলে আখ্যাত হতেন। কারণ তাঁর ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। অত পরিষ্কার মস্তিষ্ক ও সর্ববস্তু বোঝবার ক্ষমতা কমই দেখা যায়। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বৈজ্ঞানিকসুলভ পর্যবেক্ষণ ও তরল ভাবপ্রবণতাকে তাচ্ছিল্য।

সজনীকান্তের সঙ্গে যখন আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়, তিনি তখন প্রৌঢ়। আমার সঙ্গে বয়সের দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু নানা উৎস থেকে আমি ও আমার বন্ধুরা তাঁর জীবনী পড়বার চেষ্টা করতাম। আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতি হিরো-ওয়ারশিপের মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়েছিল। অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক।

আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি মানে কৃতাঞ্জলি হয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান মানুষকে কাঁচের বাক্সে বন্ধ করে পাথরের বেদীর বুকে তুলে রেখে। যিনি মহৎ, তিনি যে নির্দোষ হবেন, এমন আশা দুরাশা মাত্র। চন্দ্রে কলঙ্ক থাকলেও চন্দ্র সুন্দরতম গ্রহ।

সজনীকান্ত যত্নশীল স্বামী, স্নেহশীল পিতা ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। রসপ্রবণ মনে শেষ জীবনেও মধ্যে মধ্যে অবশ্য লঘু খোঁচা দেওয়ার প্রবৃত্তি দেখা যেত। সে শিশুসুলভ কৌতুকপ্রবণতা, সঙ্গীর অস্বস্তি ঘটিয়ে মজা উপভোগ করা।

যৌবনের জ্বালা ও জ্বর বহু শিল্পীর মতই তাঁকে পীড়িত করেছিল।

করুণা সজনীকান্তের চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ দিক। বহুবার দুর্বল হয়েছেন করুণাশীল কবি। তৎক্ষণাৎ মনীষী সমালোচক নিজের দুর্বলতাকে তৎকালীন সবলতার ভ্রান্ত আদর্শে ঝেড়ে ফেলে নির্মম হয়ে উঠেছেন। তাঁর যুগ, তাঁর মানসিকতা ও তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সত্তার উপস্থিতি অতি স্বাভাবিক বলেই মনে হবে।

আমার ঋণস্বীকার ভাবজগতের বস্তু। পার্থিব বা বাস্তব লাভ সামান্য হলেও আমার জীবনে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের সুর সজনীকান্তই এনে দিলেন। গৃহগত সাহিত্যচর্চার প্রাদেশিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। পৃথিবী আমার কাছে বিস্তৃততর রূপে দেখা দিল। এক মুহূর্তে সাহিত্যের শৈশব অতিক্রম করে প্রৌঢ়ত্বে পা দিলাম। সাহিত্যপথের মায়া ছোট ঘরের মধ্যে আমাকে ধরে রাখতে পারল না। চিরউদাসীন জীবনে আরও একটু ঔদাস্যের রাগিণী লাগল।

সজনীকান্ত অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরীর অপরিণত রচনাগুলি ধৈর্যের সঙ্গে শুনে গেছেন। আমার লেখার তিনি কমই সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাঁর সেই নীরব ধৈর্যের জন্য আমি ঋণী। কেবলমাত্র শ্রোতার ভূমিকাতেই তিনি আমাকে পরম অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।

তাঁর সযত্নায়ত্ত 'রাজহংস' কাব্যসঞ্চয়ের ছন্দপাঠে বিভিন্ন ছন্দকৌশল আমরা শিক্ষা করেছি। তাঁর রচনার গাম্ভীর্য, শব্দগঠনের চাতুর্য আমরা অনুধাবন করেছি। রাগরাগিনীর বিস্তারের মত তাঁর কাব্যে ভাববিস্তার (যথা "ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর) সে সময়ে বহু কবিই অনুসরণ করেছিলেন। গবেষণা ও সমালোচনার ধারা আমরা তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি। রঙ্গ ও ব্যঙ্গের অনুশীলনে বারবার বাংলা সাহিত্য তাঁর পদাঙ্কানুসারী।

দীর্ঘদিনের আলাপ পরিচয়ে সজনীকান্তের সাহিত্য ও জীবনের বহু দিক আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছিল। আমি সুদূরে থাকলেও ভৌগোলিক অর্থে কেবল দূরে ছিলাম।

আমাকে, আমার মত অনেক নবীন লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিককে, যিনি স্নেহ দিয়েছিলেন, সেই 'বৃহদারণ্য বনস্পতির' স্নেহের স্মৃতিচারণে ধন্য হলাম।

দুর্ধর্ষ সজনীকান্ত

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

মৃত্যু মানুষের জীবনের স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তার মধ্যে কোন অভাবনীয়তা নেই কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ কথা স্বীকার্য নয়। আমাদের সাধারণ ধারণায় কালপ্রবাহের একটি সীমিত রেখার মধ্যে যদি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহলে তা নিয়ে দুঃখবোধ করলেও তাকে মেনে নিতে মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার হয় না, কিন্তু একটি বলিষ্ঠ জীবনের যদি আকস্মিক অন্তর্ধান ঘটে, তাহলে মরণের এই অপ্রত্যাশিত আগমন মনকে বিমূঢ় করে তোলে।

সজনীকান্তের সহসা মহাপ্রয়াণ তাই তাঁর বন্ধুদের বিহ্বল করে তুলেছে ও বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের মনেও এক অপূরণীয় অভাবের সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। বাংলা-সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে সজনীকান্ত ছিলেন অপরাজেয়, এখন থেকে সে আসন শূন্যই পড়ে থাকবে। তাঁর সমালোচনার প্রতিটি অক্ষর সকল পাঠক মেনে নিতেন এটা বলি না, তবে সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ সমালোচনার অঙ্কুশে বহু সাহিত্যিকের মত্ততা যে প্রশমিত হত সে কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

নির্বিচারে যা খুশি লিখে সাহিত্যিক হওয়ার বিরুদ্ধে সজনীকান্তের লেখনী সর্বদা উদ্যত হয়ে থাকত। যে জিনিস তাঁর ভাল বলে মনে হত না, ভদ্রতার খাতিরে সে বিষয়ে তিনি কিছু লিখবেন না, এমন অঘটন তাঁর জীবনে কখনও ঘটতে দেখি নি। তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর—'শনিবারের চিঠি'র প্রায় সৃষ্টিকাল থেকে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখেছি যে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বন্ধুত্বের খাতিরেও নীরব হয়ে থাকেন নি, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও সাহিত্য নিয়ে টীকা-টিপ্পনী কাটতে দ্বিধা করেন নি। তার জন্য অনেক সময় তাঁর জীবনে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তবু তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাস মতে তিনি যা সত্য বলে বুঝেছেন, তা লিখতে দ্বিধা করেন নি।

অথচ আশ্চর্য, সজনীকান্ত কলমের মুখে যে লোককে তীব্র আক্রমণ করেছেন, ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে আপ্যায়ন করতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নি। যে বন্ধুর মতবাদের সঙ্গে তাঁর সমূহ-বিরোধ, সেই বন্ধুরই কল্যাণের জন্য, তাঁর কোন আপদ-বিপদ ঘটলে, এগিয়ে যাবার জন্য কী আগ্রহই না তাঁর ছিল।

একটি উদাহরণ দিই। সজনীকান্তের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপাল হালদার। সজনীকান্তের রাজনৈতিক মতবাদ ও হালদার মহাশয়ের মতবাদ একেবারে বিপরীত। গোপালবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাঁকে আক্রমণ করতে সজনীকান্ত দ্বিধা করেন নি এবং সময় সময় 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় দুই বন্ধুর তর্ক-বিতর্ক যে উচ্চগ্রামে পৌঁছত তা শুনলে মনে হত, এঁদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল বুঝি। কিন্তু আশ্চর্য, তা কোনদিন ঘটে নি; গোপাল হালদার মহাশয়ের অসাক্ষাতে এই বন্ধুর প্রতি সজনীকান্তের প্রীতিপূর্ণ অনুরাগ দেখে বিস্মিত হয়েছি। গোপালবাবুও সজনীকান্তকে কোনদিন ভুলতে পারেন নি, রাজনৈতিক মতবাদ উভয়ের বন্ধু-প্রীতিকে কখনও ক্ষুণ্ণ করে নি।

বাংলা-সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বপ্রথম সজনীকান্ত চিনতে ভুল করেন নি, উভয়ের অসামান্য প্রীতির কথা কারুর জানতে বাকী নেই, কিন্তু এত প্রীতি থাকা সত্ত্বেও সজনীকান্ত একসময় তাঁকে ব্যঙ্গ করে 'শনিবারের চিঠি'তে কোনও মন্তব্য করেন। সে মন্তব্যে তারাশঙ্কর যেমন ক্ষুণ্ণ হন, আমরাও তেমনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম এবং আমি নিজে একদিন সজনীকান্তকে এই নিয়ে খুব বলেছিলাম। তার উত্তরে তিনি হেসে বললেন, "বড়বাবু খুব চটেছে বুঝি? আচ্ছা আমি তাকে বুঝিয়ে সব মিটিয়ে নেব; ও তো আমাদের ঘরের লোক হে! ও সব আমার ভালবাসার গাল, বড়বাবু ঠিক বুঝবে।"

আমার ধারণা হয়েছিল যে, বড়বাবুর সঙ্গে ছোটবাবুর অর্থাৎ সজনীকান্তের বিচ্ছেদ বোধ হয় পাকা হয়ে গেল; কিন্তু তা হয় নি। সজনীকান্ত স্বয়ং বন্ধুবরের বাড়ি গিয়ে

বিবাদ মিটিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের বন্ধুমহলে বয়স অনুসারে তারাশঙ্কর বড়বাবু, বনফুল মেজবাবু ও সজনীকান্ত ছোটবাবু বলে অভিহিত হয়ে এসেছেন। বড়বাবু অর্থাৎ তারাশঙ্করকে তিনি সত্যিই এত ভালবাসতেন যে, তারাশঙ্করের পক্ষেও তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করার উপায় ছিল না। আপন আত্মীয়ের মত তিনি তারাশঙ্করকে চিরদিন দেখে এসেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যই তিনি কামনা করেছিলেন। আমাদের কাছে তিনি বরাবরই বলতেন, "বড়বাবুর লেখার গুণই আলাদা, এ যুগে ওর মত কাহিনী রচনার কৌশল আর কারুর আছে বলে তো মনে হয় না। তবে কি জান? বড়বাবু ইদানীং একটু শরীর খারাপের জন্যে তিরিক্ষি মেজাজে থাকে, ওর সব মতামত আমি মানিও না, কিন্তু তোমায় সত্যি বলেছি, ওর সঙ্গে সত্যিকারের বিরোধ করতে আমার মন একটুও চায় না। বড়বাবু জাত-সাহিত্যিক। ওকে অস্বীকার করব কি করে?" এমনি ভালবাসতেন তিনি বনফুলকেও।

সজনীকান্ত প্রকৃত সাহিত্যিকদের আন্তরিক ভালবেসে এসেছেন বরাবর, তাঁদের চিনেছেনও তাড়াতাড়ি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ সে যুগে যাঁরা দিয়েছিলেন তার মধ্যে সজনীকান্ত অন্যতম। 'পথের পাঁচালী'কে সর্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রকাশ করার ভার সজনীকান্তই গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও সজনীকান্ত বিভূতিভূষণকে সর্বপ্রথম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নতুন কোনও লেখকের লেখা শোনার ধৈর্যও ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর মধ্যে কিছু বস্তু আছে জানতে পারলে তিনি নিজেই তাঁর রচনা প্রকাশ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। বাংলাদেশে কত লেখককে যে তিনি বড় করে তুলেছেন তা যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরাই জানেন।

সজনীকান্ত শুধু সমালোচকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আসলে কবি ও সাহিত্যের একজন মস্তবড় গবেষক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত মিলিতভাবে বাংলা-সাহিত্যের পুরাতন ইতিহাস ও নানা বিষয় সম্পর্কে যে অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে প্রায়-অবলুপ্ত জিনিসের পুনঃপ্রচার করবার জন্য কঠোর শ্রম করে গেছেন তা বিস্ময়কর বলে চিরদিন গণ্য হবে। সজনীকান্ত ডায়াবিটিস রোগে বহুদিন ধরে কষ্ট পেলেও অধ্যয়নে কখনও ক্লান্ত বোধ করেন নি, অসাধারণ পাঠনিষ্ঠা ছিল তাঁর।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় দেখেছি যে 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনা করতে করতেই সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত শ্রীরামপুর ও তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে অন্ততঃ ছ মাস ধরে পড়াশোনা করে নোট নিয়ে এসেছেন। তারিখে ভুল, তথ্যে ভুল তাঁর লেখায় তাই পাওয়া যায় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিস্মৃত লেখাকে পর্যন্ত আবিষ্কার করে সে লেখা তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকেও তিনি বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্য এত ভাল পড়া ছিল তাঁর যে, বিশ্বকবি এক সময় তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত অসীম স্নেহবর্ষণ না করে থাকতে পারেন নি।

সজনীকান্ত সম্বন্ধে এত ঘটনা রয়েছে এবং দীর্ঘকাল সুখে দুঃখে এতভাবে তাঁকে দেখেছি যে, সে ইতিহাস লিখতে গেলে একটি দীর্ঘ পুস্তক হয়ে যায়। একসময় রবি মৈত্র, সজনীকান্ত, যোগানন্দ দাস, ব্রজেনদা, মোহিতলাল মজুমদার, নীরদ চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যিক-দের সঙ্গে দিনের পর দিন কতরকম আলোচনায় না আমাদের কেটে গেছে। সে সমস্ত দিনের কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে আমার মনে। যদি কোনদিন স্মৃতির পাতায় নিজের জীবনের বহু ঘটনার কথা লিখে যেতে পারি তা হলে তা প্রকাশ করব। আজ সেই উদার, বন্ধুবৎসল, সুরসিক, কবি, দুর্ধর্ষ সমালোচক সজনীকান্ত দাসের স্মৃতির উদ্দেশে শুধু কয়েক বিন্দু অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে তর্পণ করে গেলাম।

সজনীকান্ত

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

সজনীকান্ত পরলোকগমন করেছেন—ভাবতেই কেমন লাগে। যাঁরা নিকটে ছিলেন, মহাযাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন, বহু বন্ধু শ্মশানবন্ধু হয়েছেন। আমি সহস্রাধিক মাইল দূরে বসে বেতারে এ দুঃসংবাদ শুনি, খবরের কাগজে পড়ি। মনের মধ্যে বারংবার প্রশ্ন জেগে ওঠে—সজনীকান্ত সত্যিই চলে গেলেন! বুঝি, বৃথা এ প্রশ্ন—জরামরণশীল মানুষের এ অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তবু প্রশ্ন জাগে—যারা পরে এল তারা আগে-আসা প্রতীক্ষমাণ পর্যটকদের পিছনে ফেলে চলে যায় কেন? বিধাতার এ কোন্ বিধান? না, তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ আধারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে? এ কি কালচক্রের আবর্তন, এ কি ক্রমবিকাশের ধারা, এ কি লীলাময়ের লীলা?

সজনীকান্ত আমার জীবনে এসেছিলেন প্রিয় বান্ধব রূপে, পরম আত্মীয় রূপে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। কবিবন্ধু মোহিতলাল মজুমদার বললেন, তাঁর মেসে একদিন হাসির গান গাইতে হবে। পাছে আপত্তি করি, এজন্য আমার সামনে একটি প্রলোভন তুলে ধরলেন। বললেন, তাঁদের মেসে পোস্টগ্রাজুয়েট শ্রেণীর একটি অসাধারণ ছাত্র আছেন, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে! প্রলুব্ধ হবার মতই সংবাদ। আমরা তখন সেকালের "ভারতীর আড্ডা"র নিয়মিত আড্ডাধারী—গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত। স্বতঃই কৌতূহল জাগল। যথানির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলাম মোহিতলালের মেসে—২৭ বাদুড়বাগান লেনে।

মেসের ছাদে গানের আসর বসল। শ্রোতারা সকলেই এলেন একে একে। মোহিতলাল তাঁদের ভিতর থেকে একজনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, এঁর কথাই বলেছিলাম—নাম সজনীকান্ত দাস। দেখলাম, বলিষ্ঠ দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল, অসঙ্কোচ দৃষ্টি।

শ্রোতাদের সবিনয়ে বললাম, হাসির গান গাইবার আগে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে আসর আরম্ভ করি।

সজনীকান্ত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

গাইলাম একটি বর্ষার গান:

"নয়ন-পাতে সজল মেঘের
কাজল বুলানো,
এস ভুবন-ভুলানো!"—ইত্যাদি

গান শেষ হওয়া মাত্র সজনীকান্ত সবিস্ময়ে বললেন, এ গান রবীন্দ্রনাথের!

বিস্ময়ের খুব বেশি কারণ ছিল না। ভাষার ভঙ্গী ও সুরশৈলী অবিকল রবীন্দ্রনাথের। বললাম, সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

সপ্রতিভ সজনীকান্ত বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, আমার তো মনে হয়, এ গান রবীন্দ্রনাথের নয়।

এই গানটি একাধিক আসরে গেয়ে আমি বহু রবীন্দ্র-ভক্তকে ঠকিয়েছি। আজ হার মানতে হল এই তরুণ ছাত্রটির কাছে। গানটি কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের রচনা, সুর-সংযোজনা আমারই।

এইদিনেই সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। অবশ্য তিনি আমাকে তার আগে থেকেই জানতেন, সে-কথা তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

কিছুদিন পরে 'শনিবারের চিঠি' বেরলো 'প্রবাসী' প্রেস থেকে। কয়েক সংখ্যা বেরনোর পর সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত হন। সে-সময় সজনীকান্ত তথা 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ঘটে নি। অন্তরায় ছিল নজরুলের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ—কটূক্তি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ; নজরুল-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস। শুনতাম এই আক্রমণ-অভিযানের প্রধান শিকারী সজনীকান্ত। নজরুল-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করার এই অবাঞ্ছিত অপকৃতি আমাকে 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দু-একদিন

'প্রবাসী' প্রেসের বাড়িতে শনিমণ্ডলে যোগদান করলেও সজনীকান্তের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ মনে তখন মিশতে পারি নি।

এ সুযোগ—সুযোগ কেন, সহযোগ ঘটল 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় পর্যায়ে বিডন স্ট্রীটের নতুন কার্যালয়ে। এইখানেই সজনীকান্তের সঙ্গে আমার সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সে সম্পর্ক কোনদিন কোন কারণেই বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই সময়েই সজনীকান্তকে সম্যক-রূপে চিনতে পারলাম। দেখলাম, সমালোচক সজনীকান্ত আর মানুষ সজনীকান্ত স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব। সমালোচক সজনীকান্ত সব্যসাচীর মত দাঁড়িয়ে আছেন ধনুতে জ্যা রোপণ করে; তাঁর তূণীর বিষাগ্রফলক রাশি রাশি সুতীক্ষ্ণ বাণে ভরা। মানুষ সজনীকান্ত সদানন্দ পুরুষ, আর্তের সহায়, দুঃখীর বন্ধু। সকল সময়েই হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত—দিলখোলা মানুষ। কোনকিছু গোপন করার অভ্যাস নেই। এই গুণগুলির জন্যে তাঁর মধ্যে একটা সহজ আকর্ষণীশক্তি ছিল। যার প্রভাবে নজরুলও ভুলে গেল শত আঘাতের মর্মবেদনা—প্রীতিভরে আলিঙ্গন করল সজনীকান্তকে। সে সময়, ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেডের আমলে, কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসে শনিমণ্ডলের একটি করে অধিবেশন হত। সজনীকান্ত তার পরিচালক। শনিমণ্ডলের প্রায় প্রতি অধিবেশনেই নজরুল যোগদান করত। নজরুলের গান ও আবৃত্তি এ অনুষ্ঠানের একটি চিত্তাকর্ষক সম্পদ ছিল।

কেবল নজরুল নন, আমার আর-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়কেও তিনি সমালোচনার কঠোর কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিলেন। সজনীকান্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর সেই দিলীপকুমারও ভুলে গেল তার অন্তর্দাহ। দিলীপকুমার তার বহু গানের আসরে সজনীকান্তকে সাদরে আহ্বান করেছে, সজনীকান্তও সে নিমন্ত্রণ সসম্মানে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু সজনীকান্ত—সজনীকান্ত। ব্যক্তিগত প্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাহিত্য-বিচার করতেন না। এই প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরবর্তী কালে নজরুল ও দিলীপকুমারের প্রতিবাদ্য রচনার বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

সাহিত্য-বিচারে তিনি অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতেন না। তাঁর একটা আত্মপ্রত্যয় ছিল। সেই সত্যের উপর ভিত্তি করেই তাঁর নিজস্ব অভিমত গড়ে উঠত। এখানে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপস-রফায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সুস্পষ্ট সুতীব্র ভাষায় স্বাধীন অভিমত প্রকাশে তিনি নিরঙ্কুশ, নির্ভয়। এ সাহসিকতা তিনি দেখিয়ে গেছেন 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যে ও বহুবিধ প্রবন্ধে।

আবার এই দুর্ধর্ষ সমালোচকের আর-এক রূপও দেখেছি, আর তাঁর আত্মসংযমের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। অনেকেই জানেন, কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগের সম্বন্ধ ছিল। এককালে মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'র মান উন্নত করে তুলেছিলেন। সজনীকান্তও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে মোহিতলালের সম্মান রক্ষা করতেন। কোনও একটি তুচ্ছ কারণে সেই মোহিতলাল সজনীকান্তের প্রতি বীতরাগ হলেন। এবং তাঁর সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় তিনি সজনীকান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। এ আক্রমণ প্রতিহত করবার শক্তি সজনীকান্তের যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। একটিবারের জন্যও মোহিতলালকে প্রত্যাঘাত করতে উদ্যত হন নি। প্রত্যুত, কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মোহিতলালের গৃহদ্বারে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে শুভকার্যে যোগদান করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। মোহিতলালের অন্তিম শয্যায় উপস্থিত হয়ে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বহু গুণের সমন্বয় দেখেছি সজনীকান্তের মধ্যে। কবি, ঔপন্যাসিক, রস-সাহিত্যিক, সমালোচক, বাংলা সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি গুণেরই পরিচয় পেয়েছিলাম এতদিন, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে তাঁর আর একটি পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ করেছি।

গত বৎসর জানুয়ারি মাসে সজনীকান্ত মাদ্রাজে আসায় অমৃতবাজার পত্রিকার মাদ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ তাঁর বাড়িতে সজনীকান্তের সম্বর্ধনার একটি আয়োজন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আমারও যোগদান করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে তেলেগু, তামিল, মালয়লম্, কানাড়ী ভাষার কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কোনও ভাষার সঙ্গে সজনীকান্তের পরিচয় নেই, এ কথা আমি নিশ্চিতরূপেই জানতাম। কিন্তু সেদিন দেখলাম—ভাষা না জানলেও দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অনেক খবর তিনি রাখেন। সে জ্ঞান স্বল্পজ্ঞান নয়, সেই সুধী ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি সমস্তক্ষণ সাহিত্যালোচনা করলেন।

মাদ্রাজ থেকে সজনীকান্ত সস্ত্রীক পণ্ডিচেরী এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়টুকুর স্মৃতি আজ অশ্রুসজল হয়ে উঠছে।

এবার তাঁর কাছে গিয়ে আমার আতিথ্যগ্রহণ করবার পালা!

সজনী

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

১৯৩৮ সনের কয়েক বছর পূর্ব থেকে ১৯৬২ সনের জানুয়ারীর প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত সজনীকে আমি 'প্রিয় সজনীবাবু' বলেই চিঠিতে সম্বোধন করতাম, সামনা-সামনি দেখা-সাক্ষাতের সময় সম্বোধন করতাম সজনীবাবু বলে। সজনীও আমাকে গোড়ায় গোড়ায় চিঠিতে লিখত 'প্রীতিপ্রদেষু' আর সুধাদা। তারপর হঠাৎ লিখতে আরম্ভ করল প্রীতিভাজনেষু আর 'প্রীতিপ্রদেষু'র বদলে 'শ্রদ্ধাস্পদ' সুধাদা। আমি কিন্তু ১৯৬২ সনের জানুয়ারি পর্যন্তই (পরিচয়ের গোড়া থেকেই) সজনীকে প্রীতিভাজনেষু— প্রিয় সজনীবাবুই চিঠিতে লিখতাম। সজনী সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাঠকবর্গকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে গোড়া থেকেই সজনী আমাকে তার অন্তরের যত কাছে টানবার চেষ্টা করেছিল আমি ততটা কাছে যাই নি, কাছে যাবার সাহস হয় নি, কারণ সে বিদ্বান, পণ্ডিত, উঁচু দরের সাহিত্যিক, আর তার তুলনায় আমি কিছুই না। এই সংকোচই ছিল আমার তরফ থেকে সত্যকার বাধা তার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ না করতে পারার। তাই তার বিরাট প্রীতিময় মনের বহিরঙ্গন থেকে সাক্ষাতে, চিঠিপত্রে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করেছিলাম। আমার তরফ থেকে তার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার মনের ভিতরে প্রবেশ করবার দ্বিধা লক্ষ্য করে সেও মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ ঘটলে দু-একটা কথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। তার ওইরকম ভাবে চলে যাওয়াতে আমি কখনও মনে বেদনা অনুভব করি নি কারণ তার প্রীতি ভালবাসা দাবি করবার যোগ্যতা আমার ছিল না। সে আমাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালবাসত। দুর্ভাগ্য আমার তার সেই অকৃত্রিম ভালবাসাকে আমি একজন সাহিত্যিকের সৌজন্য বলেই মনে করতাম। তবু সে যখনই আমার কাছে তার 'শনিবারের চিঠি'র জন্য, 'অলকা'র জন্য লেখা চেয়েছে আমি একটুও দ্বিধা না করে লেখা দিয়েছি। 'রবীন্দ্র-পরিচয়' শীর্ষক লেখা 'অলকা'য় পাঠাবার পর সে শুধু খুশী হয় নি, আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিল, সে চিঠি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, না হারালে তার কথাগুলো আনন্দের সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে এই লেখার মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিতাম।

তার সেই চিঠির কথাগুলি অবিকল ভাবে পাঠকবর্গের কাছে উপহার দেবার সুযোগ আমার না থাকলেও সজনী মাত্র কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনের সাহিত্য-সম্মেলনে এসে 'রতন কুঠী'তে একদিন সকালে চায়ের ছোট্ট একটি মজলিসে (যে মজলিসে স্বনামধন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, অশোকবিজয় রাহা প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন) অত্যন্ত সহজ সরলভাবে তার সেই কথাগুলোর ভাব নতুন ভাষায়, বাক্যে উচ্চারণ করবার সুযোগ দিল নিজেই। জোর করে বলল, 'আপনাকে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে স্মৃতিকথা লিখতেই হবে, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে।' তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'বুড়ো হয়েছি, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছি, দেহ চায় বিশ্রাম, উদর চায় অন্ন, উদরের দাবি মেটাবার জন্য যে চাকরি-কর্তব্য করি সেটাই এই বয়সের পক্ষে বেশী, বাকী যেটুকু সময় পাই সে সময়টুকু হালকা রসালাপে, হাস্য-পরিহাসে কাটাই। এই ভাবে ওই বাকী সময়টুকু কাটানোয় মনের বিশ্রাম পাই, মন তবু কিছুক্ষণ দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে।' আড়ালে ডেকেই সজনীকে এই মনের কথা সেদিন প্রাণ-খুলে বলেছিলাম; কেন প্রাণ খুলে মনের কথা বলতে পেরেছিলাম সেটা বলবার আগে ৫।২।৬২ তারিখে আমাকে লেখা সজনীর চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

শ্রীচরণেষু

সুধাদা, আপনার আশীর্বাদী চিঠি পেয়ে শ্রীমতী সুধা-রাণী ও আমি খুবই খুশী হলাম। আপনি যে এতকাল আমার দাদাত্বের অধিকার নিজে গ্রহণ করেন নি এতে আমি বঞ্চিত হয়েছি। মোমবাতির আর যতটুকু জ্বলতে বাকি আছে ততটুকুই আপনার স্নেহ-অক্সিজেনে প্রোজ্জল হবে।

রবীন্দ্র-স্মৃতিকথা লেখার অধিকার একমাত্র আপনারই। আপনি আবার গুছিয়ে সেদিনকার রবীন্দ্র-কথা লিখে আমাকে পাঠান, আমি ছেপে ধন্য হব।

আমাদের প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রণত শ্রীসজনীকান্ত।

পূর্বেই বলেছি সজনী আমাকে সুধাদা বলেই চিঠিতে ও মুখে সম্বোধন করত আর আমি সজনীবাবুই বলতাম। কিন্তু এবার শান্তিনিকেতনের সাহিত্য সম্মেলনে এসে সে তার শ্রদ্ধা-ভালবাসার এমন এক থাপ্পড় আমাকে মারলে যে আমি সম্পূর্ণ কাত হয়ে গেলাম। সাহিত্য-সম্মেলনে আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জোরজবরদস্তি করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, শ্রীমতী সুধারাণীও। প্রণামান্তে সজনী বলল, আর সজনীবাবু নয়, এখন থেকে আমি আপনার সজনী। আমার দাদা হবার অধিকার আপনার আছে। যে কদিন আছি প্রণাম করতে দিন। একেই বলে ভালবাসার থাপ্পড়। মনে মনে নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র বলে অনুভব করলাম এই ভেবে যে, এই ব্যক্তির হৃদয়ভরা ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাকে সৌজন্য মনে করে যথোচিত প্রেম দিয়ে সম্মান দিতে সাহস করি নি। তখুনি বললাম, বেশ, আজ থেকে তোমাকে সজনী বলব আর তোমার সহধর্মিণী সুধাকে বলব বউমা। চিঠিতে লিখব সজনী, মুখেও বলব সজনী। সজনী আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সুধাদা, কদিন আর আছি, আমার কাছে যার যা প্রাপ্য দিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। বড় খুশী হলাম, আপনি আমাকে আজ সজনী বলে ডাকলেন। সে এখান থেকে চলে যাবার পর তাকে চিঠি দিলাম সজনী সম্বোধন করে আর আমার অন্তরের ভালবাসা জানিয়ে। তারপর একটা চিঠি দিলাম প্রেমেন্দ্রকে (শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)। সে তার জবাবে সজনীর মৃত্যুর পরে লিখল :

১৩. ২. ৬২.

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সুধাদা, আপনার প্রথম চিঠি পাবার পরই উত্তর দিতাম। কেন যে উত্তর দিই নি বুঝতেই পারছেন। আপনার সে চিঠি পড়ে বুঝেছিলাম আপনি তখনও খবর পান নি। সজনী আর আমি দুজনেই আপনার স্নেহ পেয়েছি, দুজনেই আপনাকে এক অনুরোধ জানিয়েছি। প্রথম চিঠিতে আমাদের দুজনের কথা একসঙ্গে যেভাবে লিখেছেন তা পড়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল। সজনীর এমন করে চলে যাওয়ায় আপনি কতখানি আঘাত পেয়েছেন তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত নয়।...সমালোচক সজনী আর বন্ধু সজনী যেন দুই আলাদা মানুষ। তার বন্ধুত্বে ভেজাল ছিল না। সে বন্ধুত্বের উত্তাপ যারা পেয়েছে তাদের কাছে সজনীর চলে যাওয়া একটা অপূরণীয় ক্ষতি।......

আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা নেবেন।

স্নেহধন্য প্রেমেন্দ্র।"

সজনীর মৃত্যু-সংবাদ যখন প্রথম কানে এল, মোটেই তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। যখন সংবাদটি নিষ্ঠুর সত্যের মত এল তখনই মনের মধ্যে এমন একটা চোট লাগল যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বুকের মধ্যে বেজে উঠল তার সেই শেষ বিদায়ের প্রণাম—শেষ কথাগুলি, আর চিঠির কথা "মোমবাতির আর যতটুকু জ্বলতে বাকি আছে ততটুকুই আপনার স্নেহ-অক্সিজেনে প্রোজ্জ্বল হবে।"

সজনীকে এখান থেকে যাবার সময় বলেছিলাম, আজ থেকে তোমাকে সজনী বলব। তাই এই সজনী-স্মরণ লেখাতেও তাকে সজনী বলছি। সে তো আর নেই, অন্যলোকে গিয়েও মানুষ এই লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখে এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে সজনী জানুক তার সুধাদা তাকে সজনী বলেই স্মরণ করবে যে কদিন সুধাদা বেঁচে থাকবে।

সজনীর বড় ইচ্ছে ছিল ১৯৩৮ সনে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত আমার "বুড়োদের বিয়ে" নামক একটি কবিতার পালটা জবাব দেবার, অর্থাৎ আমার প্রতি কিছু বাক্যবাণ ছোঁড়বার। এই মতলবের পেছনে আমার প্রতি তার একটা অভিমান ছিল যে 'বঙ্গশ্রী'তে হয়তো আমি রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" নাটকটি যাতে না ছাপা হয় সেই চেষ্টা করছি। তার এই অভিমানের পেছনে কিছু সত্য যে ছিল না তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বুঝলেন সজনী তার স্নেহভালবাসাকে অন্তরে অকৃত্রিমভাবে গ্রহণ করেছে, সজনীর সব দাবি পূরণের জন্য চেষ্টা করতেন, আর সজনীও তার আরজি অনেক সময় আমার

মারফতেই কবির কাছে পেশ করত। "মুক্তির উপায়" তখন একমেটে হয়েছে। আমরা কয়েকজন মিলে "উত্তরায়নে" রিহার্সাল দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি, রঙ্গমঞ্চে "মুক্তির উপায়" কেমন হয় দেখবার জন্যে। এই সময় সজনী কবিকে জানায় যে ওটি তার কাগজে দিতেই হবে। কবি রাজী হলেন নিমরাজী রকমে, কারণ তখনও "মুক্তির উপায়" কিছু অদল-বদল করবার ইচ্ছে তাঁর। রবীন্দ্রনাথ আমাকে কাছে পেয়ে বললেন (সজনী চলে যাবার পর) তোমার মতটা সজনীকে লিখে জানাও: সে কিন্তু মুক্তির উপায় চাইছে তার কাগজের জন্য আর তুমি বলছ ওটা 'প্রবাসী'তে যাক। আমি রবীন্দ্রনাথকে বললাম, যে কাগজে পাঠক-সংখ্যা বেশী সেই কাগজে দিন। সজনীবাবুকে একটা প্রবন্ধ বা গল্প দিন। রবীন্দ্রনাথ বললেন সজনী তা মানবে না। ওকে দিতেই হবে। তারপর পরিহাস করে সজনীকে লিখলেন যে মুক্তির উপায় তোমাকে দেওয়া তোমার বন্ধুরই ইচ্ছা নয়, সুধাকান্তকে রাজী কর ইত্যাদি মর্মে। সেই চিঠি পেয়েই সজনী যা আমাকে লিখল তার কিয়দংশ এই—

"রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা ৭।৯।৩৮

প্রীতিভাজনেষু—

সুধাদা, আপনার চিঠি ও "বিদ্যাসাগর" কবিতার নকল এইমাত্র পেলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। রেজিষ্ট্রিটা সম্ভবত কাল পাব।

দোহাই আপনার, আমার 'মুক্তির উপায়' হয়েছে, আপনি বাদ সাধবেন না।·········আপনার "বুড়োদের বিয়ে"র একটা পালটা জবাব লিখব ভাবছি, দেখি যদি পেরে উঠি।

আশা করছি 'মুক্তির উপায়' শীগ্‌গির পাঠাবেন, দোহাই আপনার।

প্রীতি নমস্কার নেবেন।
ইতি আপনাদের
শ্রীসজনীকান্ত দাস"

বলা বাহুল্য, সজনীর সেই "মুক্তির উপায়"-পথে বাধা আমি হই নি। রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে, মনের সামনে তখন দেখা দিয়েছে সমালোচক সজনীকে আড়াল করে রবীন্দ্র-ভক্ত সজনী। সজনীর অনেক মতকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতেন না। একবার রবীন্দ্রনাথ সজনীকে বলেছিলেন যে নিজের কৃতিত্বে সকলের কাছে সম্মান-শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য তোমরা তার ছোটখাটো দোষ বার করে তাকে নীচে নামাতে চাও, যে উপরে উঠতে পারে তাকে উঠতে দিতে চাও না। এতে ক্ষতি হয় দেশের। রামানন্দবাবুর (স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) মত লোক বাংলায় কজন আছেন, তিনি যা দিচ্ছেন দেশকে তার ঋণ আগে শোধ কর। তাঁর সম্বন্ধেও তোমাদের বিদ্রূপ ভাব, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সজনীর মনের পরিবর্তন ঘটাল। সজনী এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমাকে চিঠি লিখল, সুধাদা কবিকে বলবেন তাঁর তিরস্কার আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। আর কখনও রামানন্দবাবু সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাকর কিছু লিখব না। আমি কবিকে সে চিঠি দিতেই তিনি খুশী হয়ে বললেন, দেখিস, সজনী আমার কথা রাখবে। এই প্রসঙ্গ-কথা এই স্মরণ-সংখ্যায় লিখতাম না যদি না সজনী তার দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বেই "রতন কুঠি"তে নিজেই সকলের সামনে না বলত যে, 'সুধাদা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহময় বকুনি খেয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি কিনা বলুন? তারপর আর রামানন্দবাবুর বিরুদ্ধে কিচ্ছু লিখি নি। সত্যি কিনা?'

আমি বললাম, সত্যি।

সজনীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব আমি এইজন্য যে আমাকে সে যে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত, সে কথা সে আমাকে খুশী করবার জন্য আমার কাছে বলত না,—বলত তার বন্ধুদের কাছে। এই সত্য টের পাচ্ছি খুবই ভাল করে সে যাবার পর। "বনফুল" আমাকে লিখেছেন—সে কথা তাঁর ১৮।২।৬২ তারিখের চিঠিতে। সজনীর সঙ্গে বনফুলের ভালবাসার সম্বন্ধ যে কী গভীর ছিল তাও তিনি লিখেছেন। সে সব কথা তিনিই নিজে কবিতার ছন্দে "দেশ" পত্রিকায় লিখেছেন। ওই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন—"আপনাকে ও ভালবাসত। আপনার কথা অনেকবার আমাকে বলেছে।······একটা মহৎ জীবনের অবসান হয়ে গেল। মেনে নিতে হবে, তা ছাড়া উপায় কি!

এই সজনী-স্মরণ-কথা শেষ করছি এই বলে যে আমাকে অন্তর থেকে মেনে নিতে হবে এই সত্য যে সজনী তার মহৎ অন্তঃকরণের যে পরিচয় দিয়ে গেল তার বন্ধুদের কাছে সে পরিচয়ের মর্মরূপ হচ্ছে বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠা। খুব কম লোকই পারে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নির্ভয়ে স্বীকার করে বলিষ্ঠভাবে বন্ধুর সঙ্গে মতান্তরের নীতি রক্ষা করেও মনান্তরের পঙ্কিলতায় না প্রবেশ করতে। সংসারী লোকের পক্ষে এই গুণ মহাগুণ। যাবার আগে বোধ হয় সে টের পেয়েছিল তার জীবন-প্রদীপের আয়ু শেষ হয়ে আসছে, নির্বাণের আগে তাই সে নিজের জীবন-প্রদীপের জ্যোতি সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিল তার বন্ধুদের কাছে।

—

সাহিত্যিক-বন্ধু সজনীকান্ত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দীর্ঘদিনের পরিচয় সজনীকান্তের সঙ্গে। বোধ হয় ১৯৩৬ সনে প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-সূত্রে পরিচয় হয়। সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল, ক্রমে পারিবারিক বন্ধুত্বেও—এই দীর্ঘদিনেও সে প্রীতির সম্পর্কে কোন অপ্রীতির ছায়া পড়ে নি। শেষ পর্যন্ত একটু আত্মীয়তার যোগও ঘটেছিল, তবে সেটা বড় কথা নয়। এমন কি আত্মীয়তা অনেক সময় যে বিরূপতা সঙ্গে আনে, তাও আনে নি। মধুর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় নি কোন দিনও। সজনীবাবু ও সুধাবউদির আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা, ছেলেমেয়েদের সহজ অন্তরঙ্গ ব্যবহার ও বাড়ি সম্বন্ধে চিরদিনই একটি কোমল স্মৃতি বহন করবে মনের মধ্যে, সেখানে একটি ছায়াস্নিগ্ধ আসন অধিকার করে থাকবেন তাঁরা।

সজনীবাবু পুরোপুরি জীবন্ত মানুষ ছিলেন। তাই হয়তো মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণের সঙ্গে কিছু কিছু স্বভাব-দোষও তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর চরিত্র বিচারের ক্ষেত্র এটা নয়, প্রয়োজনও নেই। সে বিচারের কোন অধিকার আমাদের আছে বলেও মনে করি না। তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণের কথা প্রমথবাবু বলেছেন—সেটা হল অকুতোভয়তা। সত্যিই ভয় জিনিসটা খুব কম ছিল তাঁর চরিত্রে। আর একটি গুণের কথা আমি আজ বলব, সেটা হল তাঁর সত্যকারের সাহিত্যিক প্রীতি। সাহিত্যিক কোন কারণে বিপন্ন হয়েছে বা অপদস্থ হয়েছে শুনলে তিনি সত্যি সত্যি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন এবং তাঁর যতটুকু সাধ্য তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন। এ আমি বহুবার দেখেছি—বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আমার নিজের ক্ষেত্রেও এ ধরনের দুটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই কথাটাই আজ মনে পড়ছে।

অবশ্য প্রথম ঘটনাটাকে বিপদ বা লাঞ্ছনা—কোনটাই বলা চলে না। বলবার মত কথাও এমন কিছু নয়, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ ব্যাপার। তবু তাঁর চরিত্রের ওই বিশেষ দিকটির একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলেই এই তুচ্ছ কথাটার অবতারণা করছি। আশা করি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ও পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন এবং এটাকে অকারণ আত্মপ্রচার বলে মনে করবেন না।

অনেকদিন আগেকার কথা। 'উৎসর্গ' বলে একটি গল্প লিখেছিলাম। কোন একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রের বিশেষ সংখ্যার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েই গল্পটি লেখা; সুতরাং যত্ন করেই লিখেছিলাম। অন্ততঃ আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মত। সংক্ষেপে গল্পটির বিষয়বস্তু ছিল এই: অভাবের তাড়নায় একটি তরুণী স্ত্রী তার বেকার স্বামীকে ত্যাগ করে যায় এবং ক্রমে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে। পরে স্বামী চাকরি পায় এবং কতকটা সময় কাটাবার জন্যই গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করে। তার প্রথম বই যখন ছাপা হয় তখন অনেক ভেবে দেখে সে কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে ক্ষমা করে তার নামেই বইটি উৎসর্গ করে। এরই মধ্যে দেখানো ছিল যে, প্রকাশক যে নবীন লেখকের প্রথম উপন্যাস টাকা দিয়ে ছাপতে রাজী হন (গত বিশ্বযুদ্ধের আগেকার ঘটনা—বলা বাহুল্য) তার মূলে ছিল তাঁর রক্ষিতার উৎসাহ ও অনুরোধ। সে রক্ষিতাই ওই কুলত্যাগিনী স্ত্রী। স্বামীর প্রতি ভালবাসা তার এতদিন পরে—ভিন্ন পরিবেশেও অটুট ছিল।

গল্পটি লিখে তৃপ্তি হয়েছিল। নিশ্চিন্ত হয়েই দিয়ে এসেছিলাম বিভাগীয় সম্পাদককে। সেই কাগজের পূজা ও বার্ষিক সংখ্যাতে নিয়মিত লিখি, রবিবাসরীয় সংখ্যাতেও। সুতরাং গল্প যে ছাপা হবে তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তিন-চারদিন পরে অন্য কী একটা দরকারে সেই অফিসে যেতেই বিভাগীয় সম্পাদক মশাই গম্ভীর মুখে জানালেন যে আমার গল্পটি তাঁদের ছাপা সম্ভব নয়। তার কারণ, প্রথমতঃ লেখাতে আমি আজকাল ফাঁকি দিচ্ছি এবং দ্বিতীয়তঃ—যেটা প্রধান কারণ—ওই গল্পে আমি immoralityকে সমর্থন করেছি।

ওখান থেকে গল্পটি ফিরিয়ে এনে এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দিলাম। এ মাসিকের মালিক

খুব বিখ্যাত এবং জবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, আমার প্রতি তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন। লেখা পাঠালেই ওখানে ছাপা হত। কিন্তু এই গল্পটির ভাগ্যই খারাপ। তিন-চারদিন পরে এক দুপুরে শ্রদ্ধেয় অগ্রজতুল্য সম্পাদকমশাই ঘর্মাক্ত কলেবরে আমাদের দোকানে এসে হাজির, হাতে প্রুফের গোছা। শুনলাম আমার লেখা না দেখেই তাঁরা কম্পোজ করতে দিয়েছিলেন, আজ প্রুফ আসতে হঠাৎ মালিকমশায়ের চোখে পড়ে যায়, তিনি গল্পটি পড়ে দেখেছেন। প্রকাশক রক্ষিতার সুপারিশে বই ছাপছে—এ গল্প তিনি তাঁর কাগজে ছাপতে রাজী নন। প্রকাশককে লৌহ-ব্যবসায়ী করা যায় না? সেই অনুমতিটুকু নিতেই দাদা ছুটে এসেছেন।

বলা বাহুল্য, অকারণে লৌহ-ব্যবসায়ীদের টেনে আনতে মন সরল না। গল্পটিই ফেরত চেয়ে নিলুম। না বুঝে তাঁদের বিব্রত করেছি বলে ক্ষমাও চাইলুম। কিন্তু সে যাই হোক, ক্ষুণ্ণও খুব হয়েছিলাম—সেটা আজ আর অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। এবং সে ক্ষোভের চিহ্ন নিশ্চয়ই মুখেচোখে ফুটে উঠেছিল। তা নইলে সজনীবাবু দেখেই বুঝতে পারবেন কেন?

সজনীবাবু এসেছিলেন পাশেই ইউসুফের দোকানে পুরনো বই কিনতে, প্রায়ই আসতেন। সেদিন কিছু অসময়ে অর্থাৎ আগে এসে পড়েছিলেন। তখন আর কেউ ছিল না, আমাকে একা বসে থাকতে দেখেই ঢুকেছিলেন সম্ভবতঃ কিন্তু ভেতরে এসে বসেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, কী হে, অমন গুম হয়ে বসে কেন? কী হয়েছে?

বলবারই লোক খুঁজছিলাম হয়তো। খুলে বললাম সব কথা। তিনি বেশী কথা বাড়ালেন না, শুধু বললেন, গল্পটা পড়ো তো, শুনি। পড়লাম। সবটা শুনে হাত বাড়িয়ে গল্পটা নিয়ে একেবারে পকেটে পুরলেন। বললেন, আমিই ছাপব তোমার ইম্মরালিটি সাপোর্ট-করা গল্প। যদি সম্ভব হয় এই সংখ্যাতেই দেব। ওদের কপালে নেই এমন ভাল গল্পটা, তুমি কি করবে।

সেই সংখ্যাতেই ছাপলেন তিনি। শুধু তাই নয়, গল্পটি যে তিনি ভোলেন নি সে পরিচয়ও পেলাম কিছুদিন পরেই। ওই গল্পটি পরে আমার 'ভাড়াটে বাড়ি' বইতে ছাপা হয়। আমার সুদুর্লভ সৌভাগ্যক্রমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'ভাড়াটে বাড়ি' বইটির সমালোচনা করেন স্বয়ং রাজশেখর বসু এবং তিনি ওই গল্পটি উল্লেখ করে একটু বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি যা বলেছিলেন তা সেদিন আমার কাছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য বলে বোধ হয়েছিল, আজও তা বললে আত্মপ্রশংসার বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। এই সমালোচনা বেরোবার পর প্রথম যেদিন দেখা হল সজনীবাবুর সঙ্গে, সেদিন দেখলাম তিনি যেন আমার চেয়েও খুশী হয়েছেন। বললেন, কী, তাহলে আমি গল্প বুঝি কিছু কিছু, কী বল?

দ্বিতীয় ঘটনাটি অবশ্য এর চেয়ে ঢের গুরুতর।

আমার 'কাছে আছে যারা' উপন্যাসটি অকস্মাৎ অশ্লীলতার অপরাধে রাজরোষে পড়ল। থানাপুলিসকে বরাবরই ভয় করি, সুতরাং মুখ শুকিয়ে উঠল। গেলাম অভিভাবক-স্থানীয়দের কাছে। অতুল গুপ্ত মশায়ের কাছে যেতেই তিনি দীর্ঘ একটি সমালোচনা লিখে দিলেন ইংরেজীতে, তাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা ছিল যে আলোচ্য বইটি আর যাই হোক অশ্লীলতার অপরাধে পড়ে না। বহু নজির দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে এর চাইতে অনেক নোংরা বই সুসাহিত্য বলে চলছে—এ বইয়ের তো সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট আছে এবং এর মধ্যে কোন অকারণ নোংরামি নেই।

ওঁর কাছ থেকে ওই মূল্যবান দলিলটি পাবার পর গেলাম সজনীবাবুর কাছে। সজনীবাবু আমাকে একটু মৃদু তিরস্কারও করলেন, বললেন, সত্যিই দু-একটা জায়গায় একটু আপত্তিকর লাইন আছে। আমারও পড়তে পড়তে মনে হয়েছে। তবে বই তোমার ভাল—এ বইকে চেপে দিতে দেওয়া হবে না। তুমি ওদের কাছে নীচু হয়ো না। মামলা হোক, আমাকে তুমি সাক্ষী মেনো। সজনীকান্ত দাসের এ বিষয়ে বলবার কিছু অধিকার আছে তা সব হাকিমই স্বীকার করবেন। আমি বলব, এ বই যদি অশ্লীলতার অপরাধে বন্ধ করতে হয় তা হলে অন্ততঃ আরও দেড়শো দুশো বই বন্ধ করা উচিত। আর ইউরোপের কোন উপন্যাসই এদেশে আসতে দেওয়া উচিত নয়। তুমি ভয় পেয়ো না, আমরা আছি।

মামলা অবশ্য আমি করি নি। মিটিয়েই নিয়েছিলুম। পুলিসের নির্দেশমত কোন কোন অংশ বাদ দিয়েছিলুম সে বই থেকে। কিন্তু সেদিন তিনি যে ভরসা দিয়েছিলেন, একান্ত দুর্দিনে মনে যে সাহস ও জোর এনে দিয়েছিলেন সে কথাটা কখনই ভুলব না। বিপদের দিনে আশ্বাস দেবার, সান্ত্বনা ভরসা দেবার লোক একে একে চলে যাচ্ছেন—এই কথাটা মনে হলে বড় অসহায় বোধ করি।

লোকে বলে সজনীকান্তের বুকের ছাতি ছিল বড়, তাই ঝগড়া কখনও বাড়তে দিতেন না। লোককে গাল দেবার পরও যেচে গিয়ে কথা কইতে পারতেন, অগ্রজ শ্রদ্ধেয়দের কাছে গিয়ে নিঃসংকোচে ক্ষমা চাইতে পারতেন। কিন্তু আমি জানি এটা শুধু বড় বুকের কথা নয়—অতি কোমল বুকের কথাও। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা সত্যিকারের টান ছিল, তাদের যথার্থ আপনজন মনে করতেন তিনি। সাহিত্যিকমাত্রেই পরস্পরের সঙ্গে একটি অদৃশ্য আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ থাকে—এ তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

—

সজনীকান্তের জীবন-দর্শন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

বাংলা সাহিত্যের বিচিত্রকর্মা পুরুষ সজনীকান্ত সংগ্রামময় জীবনের অবসানে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। কবি ও সমালোচক সজনীকান্ত, পরিহাস-রসিক সজনীকান্ত, শক্তিমান অখ্যাত লেখকদের উৎসাহ-দাতা ও বিভ্রান্ত লেখকদের প্রতি নির্মম সজনীকান্ত, ঐতিহাসিক ও গবেষক সজনীকান্ত নিতান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মর্তলোক হইতে তিনি এমন অকালে বিদায় গ্রহণ করিবেন, বহু আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি সহসা পরপারে যাত্রা করিবেন, এ কথা কেই বা জানিত! মৃত্যু জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইলেও রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি একটু পরিবর্তিত করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিব, 'জগন্নিয়ন্তার কোন্ নিয়মে মানুষ স্বকার্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্‌বুদের মত অন্তর্হিত হয়?' বাস্তবিক, ইহা এক দুজ্ঞেয়, দুরধিগম্য রহস্য। তথাপি নিয়তির বিধান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। সজনীকান্ত যে হোমানল প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, উহার শিখা যদি অম্লান থাকে, তবেই তাঁহার দিব্যধামবাসী আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

সাধারণতঃ, বাঙালীর জীবন বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক; কিন্তু সজনীকান্ত অনেকাংশে ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহার জীবন ছিল দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষময়;—শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা হয়তো তাঁহার অভিপ্রেতও ছিল না। টেনিসনের ইউলিসিসের মত তাঁহার মধ্যে ছিল একটা দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি, উহা কখনও কবিতা রচনায়, কখনও সাহিত্য-সমালোচনায়, কখনও গবেষণায়, কখনও বাংলা-সাহিত্যের অনাচার দূরীকরণের প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। সাহিত্যের বিশুদ্ধি-রক্ষায় সজনীকান্ত যেখানে নির্মম হইতেন, সেখানেও তাঁহার অন্তরে সহানুভূতির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গরচনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, সজনীকান্তের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। তাঁহার ব্যঙ্গে ঈর্ষা বা বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছিল না, এক্ষেত্রে তিনি পোপ, ড্রাইডেন, সুইফ্‌ট্‌, ভলটেয়ার বা হাইনের সমগোত্র ছিলেন না। তাঁহার হস্তে লেখনী অনেক সময়ে শাণিত তরবারি হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহা হননের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই, প্রযুক্ত হইয়াছে চৈতন্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে। তাঁহার ব্যঙ্গরচনায় আমরা অনেক সময়ে বুদ্ধির বিদ্যুদ্দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় তিনিও ভণ্ডামি, পরানুবাদ ও পরানুচিকীর্ষার শত্রু ছিলেন, কখনও কখনও তিনি আতিশয্যেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার মনের বিরূপতা ছিল না। যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে 'পরস্বাপহারী', অথবা যাঁহারা বিনা স্বীকৃতিতে বিদেশী সাহিত্যের ভাব গ্রহণ করিয়া গল্প কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই। কিন্তু যখনই কাহারও মধ্যে তিনি শক্তি বা প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই নানা ভাবে তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচনা প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে সাহিত্যিক-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাস্তবিক, সজনীকান্ত শুধু সাহিত্য-স্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক-স্রষ্টা, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছিলেন ব্যঙ্গকুশল, 'মজলিসী' মানুষ, কিন্তু আজ আমাদের দেশে এই শ্রেণীর মানুষের নিতান্ত অভাব হইয়াছে। কোন মানুষ একই সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক ও সামাজিক হইতে পারে না, তাই আমরা যতই অহংসর্বস্ব হইতেছি, ততই সমাজ-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছি। এই আত্মকেন্দ্রিকতা বা অহং-সর্বস্বতা আমাদের বর্তমান জীবনের একটি প্রধান অভিশাপ, যাহার ফলে আমরা প্রকৃতি হইতে, মানুষ হইতে ও ভূমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। এ অভিশাপ মেঘদূতের যক্ষের অভিশাপের চেয়েও মর্মান্তিক।

কিন্তু সামাজিক মানুষের জীবনেও একটা অভিশাপ

আছে। সামাজিক মানুষের মন বহির্মুখ, কাজেই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। বর্তমানের কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষের আত্ম-চিন্তা বা আত্ম-বিশ্লেষণের অবকাশ নাই। অবশ্য, যাহাদের জীবন-যাত্রা গতানুগতিক, তাহাদের পর-চর্চায়ও উৎসাহের অভাব নাই, আত্ম-সমীক্ষায়ও প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু জগতে যাহারা প্রতিভাবান, তাহারা চিরদিনই একা। অধ্যাত্ম উপলব্ধি যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকেও একাকী পথ চলিতে হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন,
যেও নাকো কারো ঘরে,
যা চাবে তা বসে পাবে,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষ একটি ব্যক্তি বা বিধাতার একটি বিশেষ প্রকাশ, সেইহেতু সে গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিতে পারে না। তবে, অনেকেরই হয়তো ব্যক্তি-সত্তা দৈহিক সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইঁহারা সুখী হইতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন এই—মানুষের জীবনে সুখ কতখানি কাম্য। জন্ স্টুয়ার্ট মিল বলেন, 'It is better to be a human being dis-satisfied than to be a pig satisfied, better to be a Socrates dis-satisfied than to be a human being satisfied.' তাই যাঁহারা প্রতিভাধর পুরুষ অথবা যাঁহারা চরিত্রবলে আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয়, তাঁহাদের মহত্তম দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু আবার দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করিবার কৌশলও ইঁহারাই জানেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার ফলেই মানুষের জীবনে দুঃখ আসিয়াছে, ইহা শুধু কাহিনী নয়, ইহার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাই যাহারা জ্ঞানের আলোক পায় নাই, তাহাদের দুঃখ স্বল্প, কারণ তাহারা 'পরিতাপ-জর্জর পরাণে নাহি চায় অতীতের পানে', আবার 'ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়', তাহারা বর্তমানকে লইয়াই প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। তাই চিত্ত তাহাদের ভয়-ভাবনা হইতে মুক্ত। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল যাহারা খাইয়াছে, তাহারা জানে—

'We look before and after,
And pine for what is not;
Our sincerest laughter
With some pain is fraught.'

কিন্তু তাহাদের জীবনের সীমাহীন বেদনা ও হাহাকারের মধ্যেও একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে, কারণ, তাহারা জানে—

'Our sweetest songs are those
that tell of saddest thoughts.'

সংসারে প্রতিভাবান মানুষ 'একা' কেন? কমলাকান্তের মুখে ইহার উত্তর শুনিতে পাই, সম্পাদক মহাশয়, বনিল না। বনিল না, ইহাই চিন্তাশীল মানুষের সকল বেদনার উৎস। সবচেয়ে মর্মান্তিক ক্রন্দন, আমার আপনার সঙ্গে আপনার বনিল না। এইখানেই মানুষের পরস্পর-বিরোধী দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব, এই split personalityর সমস্যাই এ যুগের একটা মস্ত সমস্যা। কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা, 'কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী, তাহার এত বন্ধন কেন?' মহৎ শিল্পের স্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহাদেরও ইহাই জিজ্ঞাসা। তাঁহারা অন্তরে নির্লিপ্ত হইয়াও সংসারের বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লন, তাই বৈদান্তিকের ন্যায় তাঁহারা জগৎটাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না, মানুষের জীবনের ভ্রম-প্রমাদ অসঙ্গতিকে অজ্ঞানসম্ভূত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন না, তাই তাঁহারা হন 'হিউমারিস্ট'।

মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুং মানুষকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, বহির্মুখ ও সামাজিক (extravert) মানুষ এবং অন্তর্মুখ ও আত্মকেন্দ্রিক (introvert) মানুষ। আবার কোন কোন মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক ও আত্মকেন্দ্রিক। (এখানে 'আত্মকেন্দ্রিক' কথাটির অর্থ 'স্বার্থপর' নহে।) সজনীকান্ত সম্ভবত এই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি সামাজিক, এমন কি, কর্মকুশল মানুষ ছিলেন, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত সজনীকান্তের মধ্যে কখনও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব হয় নাই, কিন্তু যেখানে তিনি কবি, সেখানে তিনি আত্মকেন্দ্রিক, আর সেইখানেই তাঁহার জীবনদর্শনের সন্ধান করিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি, পৃথিবীর অনেক মনস্বী পুরুষের ন্যায় সজনীকান্তের মধ্যেও একটা দ্বৈত-সত্তা ছিল।

পরিহাস-রসিক ও সংগ্রামী সজনীকান্ত ছিলেন সবার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কবি সজনীকান্তের মধ্যে ছিল একটা একাকীত্বের বেদনা। অবশ্য সজনীকান্তের বহু কবিতায় তাঁহার সমাজ-চেতনার পরিচয় আছে, স্বচ্ছ চোখে তিনি শুধু পৃথিবীর সৌন্দর্যই দেখেন নাই, নগ্নতা কুশ্রীতা বীভৎসতাও দেখিয়াছেন, কিন্তু ম্যাথ্যু আর্নল্ডের মত তাঁহার অন্তর কখনও নৈরাশ্যে পীড়িত হয় নাই। অন্ধকারের মধ্যেও তিনি অসংশয়কে সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখিয়াছেন, আশার দীপশিখাকে কখনও ম্লান হইতে দেন নাই। তাঁহার রসিকতা সর্বত্র সূক্ষ্ম না হইলেও উহাতে বিদ্যুতের ঝলক ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তরে এমন একটি নিভৃত স্থান ছিল, যেখানে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। 'শ্যামাপক্ষী' নামে একটি সনেটে মধুসূদন বলিয়াছেন, ধূপ আপনাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া চতুর্দিক আমোদিত করে, আর শ্যামাপক্ষীর অন্তরের বেদনা উহার কণ্ঠে সংগীতরূপে ঝঙ্কৃত হয়। কবিরাও দুঃখের অনলে দগ্ধ হইয়া জগতে আনন্দ পরিবেশন করেন। 'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'অলৌকিক আনন্দের ভার,
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার.
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান,
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

সজনীকান্তকে বিধাতা আনন্দ-পরিবেশনের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কর্মবন্ধনে জড়িত সজনীকান্তের কাব্যসাধনা পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। কবি সজনীকান্তের মধ্যে যতখানি সম্ভাবনা ছিল, ততখানি সার্থকতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি, তাঁহার অন্তর্জীবনের সন্ধান মেলে তাঁহার রচিত কবিতায়, যদিও সাহিত্য-সমালোচনা বা গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁহার দান সামান্য নয়।

সজনীকান্ত যেখানে কবি, সেখানে তিনি বাস্তবিকই সঙ্গিহীন। আপন অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলেন—

'কে আমি, কি মোর পরিচয়—
ভালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার,—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা রূপ, রস, রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব;
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল,
হবে না প্রকাশ কোনদিন।'

'সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল', ইহাই প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবি ও মহৎ শিল্পীর অন্তরের কথা।

সংসারের কদর্যতা ও বীভৎসতা সজনীকান্ত দেখিয়াছেন, কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই। তাই তিনি কোনদিন নৈরাশ্যবাদী হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন—

'জীবনের দুঃখশোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহতেরে বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।

* * *

বৃহতে বিরাটে নমস্কার,
নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো নমো নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।'

ভাব-কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে সজনীকান্তও একজন বিপ্লবী। দেবেন সেন, গোবিন্দ দাস বা মোহিতলালের ন্যায় বা স্কটল্যাণ্ডের কবি বার্নসের ন্যায় সজনীকান্তও দেহবাদী, গোবিন্দ দাসের ন্যায় তিনি বলিতে পারেন—

'কোথায় স্থাপিয়ে মূল,
ফোটে প্রেম পদ্মফুল
আকাশকুসুম সে যে, কল্পনা-কলহ।'

কিন্তু দেহবাদেই তাঁহার কাব্য শেষ হয় নাই, কারণ, তিনি জানেন, দেহকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ দেহকে অতিক্রম করে, কামই প্রেমে পরিণত হয়। 'পরিণাম' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

'হিরণবরণসন্ধ্যা দাবদগ্ধ মধ্যাহ্নের পর
নামে, তাই পারে লোকে এ সংসারে বাঁধিবারে ঘর।
পুড়ে যায়, খাক হয়, তবু প্রদোষের স্নিগ্ধ মায়া
পুনঃ সঞ্জীবিত করে, প্রেয়সীরে করে তোলে জায়া,
কামীরে ঋষিত্ব দেয়, লোভী হয় ত্যাগী সুমহান,
মধ্যাহ্নে করিয়া ভোগ, অপরাহ্ণে পূজা করে প্রাণ।'

সজনীকান্ত 'হিউম্যানিষ্ট', মানব-মহিমায় তিনি বিশ্বাস

করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের অগ্রগতিকে তিনি অভিনন্দন জানান, কিন্তু মানুষের আকাশ-চুম্বী স্পর্ধা ও সুদুর্মদ অহঙ্কারকে তিনি কশাঘাত করেন। তিনি বলেন—

'হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতাবিরোধী—
সুদুর্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু—এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।'

সজনীকান্ত জীবনকে ভালবাসিয়াছেন কিন্তু 'লোলুপ ছেলের মত' নয়। তিনি জীবনরস-রসিক ছিলেন কিন্তু জীবন-তৃষ্ণা তাঁহার ছিল না। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—

'পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলুষিত হয়েছে যাহারা,
লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা,
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়,
দু কথা তাদের কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।'

সজনীকান্ত জীবনকে সহজে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মৃত্যুকে সহজে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা একরূপ সহজ সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে জীবন ও মৃত্যু 'একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ', যে একটিকে স্বীকার করিয়া অপরটিকে অস্বীকার করে, সেই ভীরু কাপুরুষেরা সেক্সপীয়রের ভাষায় মৃত্যুর পূর্বে অনেক বার মরে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সজনীকান্ত 'মহান্ মৃত্যুর' সঙ্গে মুখোমুখি হইতে চাহিয়াছেন। 'মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে বজ্রের আলোতে।' সজনীকান্ত জীবনের কালকূট পান করিয়াই মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়,
শ্মশানের ভস্মস্তূপে যে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে
সে জীবনে বারবার জানাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কালকূট'।

মানুষ শুধু যে বৈরাগ্য সাধনার মধ্য দিয়াই মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে, তাহা নহে, জীবনকে সহজে বরণ করিয়া, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সহজে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং জীবনকে বহুর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াও মানুষ মৃত্যুকে জয় করিতে পারে,—'বিনোদ-মাত্র মেবেদং ইতি যস্যাবধারণা', আমি বহুরূপে লীলা করি, এই দৃঢ় প্রতীতি যাহার অন্তরে জাগে, অথচ মানুষকে যে ভালবাসে, মানবকল্যাণের প্রচেষ্টায় যে জীবনকে সার্থক করে, সেই-ই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। ইহাই সজনীকান্তের জীবন-দর্শন।

'কবিরা কালের সাক্ষী, কবিরা অমর।' সজনীকান্ত কবি, তাই তিনি চিরদিন তাঁহার কীর্তির মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। আর আমরা, যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইয়াছি, যাঁহাদিগকে তিনি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের অন্তরে তিনি চিরদিন অম্লান দীপশিখার মত বিরাজ করিবেন। আমরা সকলে আজ বৈদিক ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—

'যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥'

তোমার যে আত্মা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সুদূরে নিখিল ভুবনে, তাহাকে আহ্বান করি। শাশ্বত কালের জন্য সে বাস করুক আমাদের মধ্যে, জীবিত থাকুক আমাদের অন্তরে।

—

প্রথম বাঁকে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নদীতে বহু বাঁক। একটি বাঁকে পৌছিলে পরবর্তী বাঁক নজরে পড়ে। মানুষের জীবনেও নদীর মত বিস্তর বাঁক। একটির পর একটি বাঁক অতিক্রম করিয়া আমরা চরম দিনে উপস্থিত হই। আমার জীবনের প্রথম বাঁকে পৌছিয়াই সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়, ইহার গতি-পথও যেন কোন অদৃশ্য হস্তে তখনই নির্ণীত হইয়া গেল। সজনীকান্ত-স্মরণ দিনে এই বিষয়টিই বার-বার মনে উদিত হইতেছে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। পূজার কিছু পূর্বে জলপাইগুড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশের বাড়িতে যাই। লক্ষ্মীপূজার পরই আমাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। জলপাইগুড়িতে যে ছাত্রকে পড়াইবার জন্য গৃহশিক্ষক হইয়া যাই তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল এবং পড়াইবার ভার পুনরায় আমার উপর পড়িল। ছাত্রটি স্কুলের বোর্ডিঙে থাকে; আমি মেসের অধিবাসী হইলাম।

সেবারে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। আমি মাঝে মাঝে পূজনীয়া জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পার্কসার্কাসে কংগ্রেস-অধিবেশনের নির্দিষ্ট স্থলে যাইতাম। তখন এ স্থানটি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন এবং কোথাও কোথাও আগাছায় ভরপূর ছিল। আজিকার কংগ্রেস একজিবিসন্ পার্ক দেখিয়া সেদিনকার অবস্থা বুঝি কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। প্রত্যহ কিছুক্ষণ ছেলে পড়াই, মাঝে মাঝে গাঙ্গুলী মহোদয়ার সঙ্গে এখানে-সেখানে যাই। কিন্তু অবসর তো প্রচুর, সময় কাটে কি করিয়া! তথাকথিত ছাত্রজীবন তো শেষ হইয়াছে। ইহার পরবর্তী ধাপের কোন সন্ধান তো মিলিতেছে না।

লেখাপড়ার দিকে ছেলেবেলা হইতেই খুব ঝোঁক। পাঠ্যবই ব্যতিরেকে অপরাপর পুস্তকাদি পড়িতেও অধিক সময় নিবিষ্ট থাকিতাম। এ জন্য কেহ কেহ দয়া করিয়া গ্রন্থ-কীট বলিতেও ছাড়িতেন না। পড়াশুনায় লিপ্ত থাকি বটে, কিন্তু ইহাতেই তো মন আর সোয়াস্তি মানে না—এখন যে কিছু কাজ চাই। মেসে আমার রুম-মেট (একই প্রকোষ্ঠবাসী) সীতানাথ আচার্য প্রবাসী প্রেসের বাংলা কম্পোজিটর। মাঝে মাঝে প্রুফরীডিং শেখার ইচ্ছা হইত। একদিন সীতানাথকে বলিলাম, প্রবাসী প্রেসে কি প্রুফরীডিং শেখা যায় না? এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেও তাঁহাকে অনুরোধ করি। যতদূর মনে হয় দুই-একদিন পরে তিনি আমাকে প্রেসে লইয়া যান।

১৯২৮ সনের নবেম্বর মাস, ঠিক তারিখ মনে নাই। আমি সীতানাথের সঙ্গে প্রবাসী প্রেসে গেলাম। তখন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের মুদ্রাকর ছিলেন মাণিকচন্দ্র দাস। সীতানাথ তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দেন। মনে হইল আমার মনোগত বাসনার কথা তিনি পূর্বেই মাণিকবাবুকে বলিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া প্রেসের ম্যানেজারের নিকট আমাকে লইয়া গেলেন।

এই প্রেস-বাড়িটির একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাড়িটির মালিক কে তাহা তখনও জানিতাম না, এখনও জানি না। এখানে বেঙ্গল কেমিক্যাল দীর্ঘদিন অবস্থিত ছিল। ইহার দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থাকিতেন। তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের অনেকেরই তখন আবাসস্থল ছিল এই গৃহ। এখান হইতে বেঙ্গল কেমিক্যাল উঠিয়া গেলে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' অফিস এই বাড়িতে চলিয়া আসে এবং ইহার জন্য প্রবাসী প্রেস নামে একটি নূতন প্রেসও স্থাপিত হয়। পরবর্তী কথাও এখানে একটু বলি। প্রবাসী অফিস ও প্রেস স্থানান্তরিত হইলে মৌলানা আক্রাম খাঁর 'মোহম্মদী' নিজ প্রেসে মুদ্রিত হইয়া এখান হইতে বাহির হইতে থাকে। এখনও এখানে একটি প্রেস দেখিতে পাইবেন।

আমি যখন প্রবাসী প্রেসে যাই তখন এই বাড়ির পিছন দিকে দ্বিতলে ছিল ইংরেজী ও বাংলা কম্পোজিটর-

দের ঘর। ইহারই ভিতরে পশ্চিম দিকে প্রুফরীডারেরা বসিতেন। পূর্বদিকে অল্পপরিসর লম্বা একটি ঘরে বসিতেন প্রেসের ম্যানেজার। বাড়ির সম্মুখভাগে দ্বিতলে ছিল সম্পাদকীয় বিভাগ এবং নিম্নে অফিস। মুদ্রাকর মাণিকচন্দ্র ম্যানেজারের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। পূর্বেই সীতানাথের মুখে শুনিয়াছিলাম প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। প্রবাসীর পৃষ্ঠায় সজনীকান্তের বহু রচনা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। শনিবারের চিঠির অন্যতম কর্ণধার যে সজনীকান্ত তাহাও নানাজনের মুখে শুনিতাম। কলিকাতায় যখন বি. এ. পড়ি তখন এই পত্রিকাখানি সাপ্তাহিকরূপে ছোট আকারে বাহির হয়। সাপ্তাহিক এবং আকারে ছোট হইলেও বাহির হইবামাত্রই এখানি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে মনের গোপন কথা, যাহা এতদিন অ-বলা ছিল, বলা হইতেছে দেখিয়া অতি দ্রুত জনাদরও লাভ করিতে থাকে। পত্রিকার রচনায় লেখকদের নাম থাকিত না তবে সজনীকান্ত যে ইহার অন্যতম জোরালো লেখক তাহা তখনই জানাজানি হয়। অজ্ঞাতসারেই যেন আমরা কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ি।

মাণিকবাবু আমার বিষয়ে পরিচয়দান প্রসঙ্গে ম্যানেজার সজনীকান্তকে কি বলিয়াছিলেন তাহা এতদিন পরে আর স্মরণ নাই। সজনীবাবু আমাকে কি কি জিজ্ঞাসা করেন তাহাও এখন বিস্মৃতির অতলে। শুনিয়াছি, সজনীকান্ত আত্মজীবনীতে আমাদের এই প্রথম সাক্ষাতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি খাঁটি পল্লী-মায়ের সন্তান; পোশাকেআশাকে কখনও ফিটফাট হইতে পারি নাই, চলনে-বলনেও কেতাদুরস্ত ছিলাম না। কলিকাতায় কয়েক বৎসর কাটাইয়াও অমনটি হইতে পারি নাই। আমার এই পল্লীজনোচিত স্বাভাবিক সারল্যই মনে হয় আমার পক্ষে বর হইল। সজনীকান্ত কয়েকটি কথার পরেই আমাকে অভিপ্রেত বিষয় করিতে দিবার জন্য মাণিকবাবুকে নির্দেশ দিলেন।

সজনীকান্তকে এই প্রথম দেখিলাম। লম্বা দোহারা চেহারা, চোখেমুখে বিদ্যার দীপ্তি। তাই বলিয়া তিনি স্থির বসিয়া থাকিতে পারেন না, নিয়ত কর্মচঞ্চল। সমগ্র মানুষটির ভিতর হইতে নেতৃত্বের আভাস বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেখিয়া মনে হইল তিনি আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। পরে হিসাব করিয়া দেখিয়াছি আমাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুবই কম—মাত্র তিন বৎসর। প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে বয়সের এইরূপ তারতম্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু প্রথম জীবনে তিন-চার বৎসরের প্রভেদ খুবই বেশী বলিয়া মনে হয়। সজনীকান্তও আমার দৃষ্টিতে তখন এইরূপ মনে হইয়াছিলেন।

প্রুফরীডিং শিখিব এই বাসনা লইয়াই আমি প্রবাসী প্রেসে যাই। তবে মনের অন্তরালে এরূপ ইচ্ছাও যে ছিল না তাহা নহে যে, প্রুফ দেখা শিখিয়া আমি কিছু অর্থও রোজগার করিতে পারিব। সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী প্রেসের হেড্ প্রুফরীডার, তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সত্যবাবু দীর্ঘকাল এই কর্মে লিপ্ত থাকিয়া মারা গিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমার প্রুফ দেখার হাতেখড়ি। এইজন্য বরাবর তাঁহাকে আমি 'গুরুদেব' বলিয়া ডাকিতাম। নবেম্বর মাসের শেষ হইতে ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত রীতিমত প্রেসে যাই, সত্যবাবু কি তাঁহার সহকারী কাহারও সঙ্গে কপি ধরি, বাড়িতে সত্যবাবুর নির্দেশ মত প্রায় রোজই কাটা প্রুফ মেসে লইয়া আসি—কি রকম ভাবে প্রুফের উপরে ভুল সংশোধন করিতে হয় তাহা দেখিবার নিমিত্ত। সুবল মিত্রের বাংলা অভিধানের শেষ দিকে প্রুফ দেখার সঙ্কেত দেওয়া ছিল, ইংরেজি চেম্বার্স ডিকশ্যনারীর শেষেও এইরূপ দেওয়া আছে। যতদূর মনে হয় সত্যবাবু এগুলি দেখিয়া লইতেও আমাকে বলেন।

নবেম্বরের শেষ হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত মাসখানেক প্রতিদিনই প্রেসে যাই এবং প্রুফ দেখা অভ্যাস করিতে থাকি। ক্রমেই কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন হইতেছে এবং হৈ-হুল্লোড়ও বাড়িয়া চলে। কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিরাট শোভাযাত্রায় আমি যোগ দিই, হাওড়া স্টেশন হইতে গোলদীঘি পর্যন্ত যে কি ভাবে আসিয়াছিলাম, এখনও মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রেসে যাওয়া কিন্তু একদিনের জন্যও বন্ধ করি নাই। সঙ্গে সঙ্গে আবার টিউশনিও চলে। তবে প্রেসের পরিবেশ আমার মোটেই ভাল লাগিত না।

কংগ্রেসের অধিবেশন-স্থলে রোজই একবার করিয়া যাই, সব দেখিয়া শুনিয়া সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসি। অধিবেশন শেষ হইবার মুখেই বোধ হয় আমি প্রেসে যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম।

জানুয়ারি মাস শুরু হইয়াছে। মাসারম্ভেই টিউশনিও চলিয়া গেল। এখন আমি সম্পূর্ণ বেকার। জনৈক বন্ধুর সঙ্গে এ-অফিস সে-অফিস করিলাম, কিন্তু কাজ দিবে কে? সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। আমি আবার প্রবাসী প্রেসে গেলাম। এখন তো কিছু অর্থকরী কাজের প্রয়োজন, কেন না কলিকাতার খরচ আমাকেই যে সম্পূর্ণ চালাইতে হইবে। ম্যানেজার সজনীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রেসের পরিবেশের কথা বলিলাম। কোন কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর সজনীকান্ত আমার মনের অবস্থা বুঝিলেন। যতদূর মনে পড়ে, এই দিনই প্রথম প্রেসের স্বত্বাধিকারী, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের অধ্যক্ষ 'ওয়েলফেয়ার'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রকোষ্ঠে দেখিলাম। সজনীকান্ত অশোকবাবুকে আমার কথা বলিলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া আমাকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের সম্পাদকীয় বিভাগে স্থান করিয়া দিলেন। তারিখটি আমার মনে আছে, ১৯২৯ সনের ১৪ই জানুয়ারি। এই দিনটি আমার পক্ষে অতীব শুভ।

প্রথম দিনেই সম্পাদকীয় বিভাগে গিয়া দেখি, টেবিলের এক পার্শ্বে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁহার নাম পূর্ব হইতেই আমার জানা; আজ স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হইলাম। তিনি ইতিমধ্যেই লেখক ও গবেষকরূপে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। অনতিদূরে উপবিষ্ট শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি প্রত্যেকেরই নিকট সমাদৃত। দুজনেই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'য়ের ভারপ্রাপ্ত সহ-সম্পাদক। আমি আনকোরা গ্র্যাজুয়েট, এ ধরনের কাজে একেবারে অনভিজ্ঞ। তবে যতদূর সাধ্য উভয়কে সাহায্য করিবার জন্যই আমি এই বিভাগে স্থিত হইলাম। মনে হয় ওই প্রকোষ্ঠেই শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারও আলাদা টেবিলে বসিতেন। তাঁহার উপর ভার ছিল 'ওয়েলফেয়ার' সাপ্তাহিকখানি সম্পাদনা-কার্যে সহায়তা করা। প্রত্যেকেই বিদ্বজ্জন, আরও কত সুধী ব্যক্তির আনাগোনা হয় এখানে। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ'-সম্পাদক সৌম্যমূর্তি বয়োবৃদ্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও অতি নিকট হইতে প্রত্যহ দেখিতে থাকি। আমাদের ছুটির পর 'শনিবারের চিঠি'র বৈঠক বসিত নিয়মিত রূপে। আমি এক নতুন জগতে প্রবেশ করিলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুকাল পূর্বে আমাকে বিদ্যা-মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু ছাড়পত্র পাওয়াই তো সবকিছু নয়। বিদ্যা-মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ লাভ না ঘটিলে উহা যে বাতিল বা বানচাল হইবারও সম্ভাবনা। সজনীকান্ত আমাকে এই সুযোগ করিয়া দিলেন। জীবনের প্রথম বাঁকের প্রান্তে পৌঁছিয়া কেমন যেন দিশাহারা হইয়া উঠিতেছিলাম, সজনীকান্তের সহৃদয় সহায়তায় জীবনতরী নতুন পথে ভাসাইলাম। ইহার পর বহু বাঁক উত্তীর্ণ হইয়াছে, সজনীকান্তের মত সাগরে পৌঁছিতে আর হয়তো বেশী বিলম্ব নাই। জীবনের বিচিত্র গতিপথে সজনীকান্তের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা লিখিতে গেলে পুথি ঢের বাড়িয়া যায়, তাই প্রথম বাঁকের কথাই মাত্র এখানে কিছু লিখিয়া রাখিলাম।

সজনীদা

অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (সম্বুদ্ধ)

ঐটিই নাম। সজনী দাস নয়, সজনীদা। প্লুরাল নয়, সিঙ্গুলার, ও মানুষ প্লুরাল হবে না।

বিরাট দেহ, বিরাট কণ্ঠ, বিরাট মন। বিরাট পাণ্ডিত্য, বিরাট সংগ্রাম, বিরাট সাধনা, বিরাট সিদ্ধি। অনেক খ্যাতি, অনেক নিন্দা। তার মধ্যে ভালও ছিল, মন্দও ছিল হয়তো, কিন্তু ছোট কিছু ছিল না।

তাঁর জীবনের কৃতি খ্যাতি ইতিবৃত্ত অন্যেরা বলবেন, যাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী জেনেছেন, অনেক বেশী দেখেছেন তাঁকে। আমি ঘনিষ্ঠ সহচরদের মধ্যে পড়ি না। তাঁর কর্মরত জীবনের সঙ্গে আমার সান্নিধ্য লাভ অল্প, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে মোটেই নেই।

আমি শুধু একটি ছোট্ট গল্প বলছি।

ঠিক সাড়ে তেইশ বছর আগের কথা, ১৯৩৮ সনের জুলাই মাস। একটি ছেলে—তাকে ছেলেই বলব; সাতাশ বছর বয়স, তার নিজের মতে বাইশ, কারণ সরকারী জেলখানায় পাঁচ বছর কেটেছে, হিসেবের খাতা থেকে সেই পাঁচটা বছরকে সে বাদ দিয়ে চলতে চায়। জেলখানায় বসে কাজের অভাবে লেখা-লেখা খেলত। দু-একজন পড়তেন সেগুলো। সদ্য বাইরে এসেছে, কি করবে না করবে, হাতড়াচ্ছে মনে মনে। জেলখানার পরিচিত গোপাল হালদারের সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা। তিনি বললেন, শনিবারের চিঠিতে লিখবেন?

সে হেসে আঁতকে উঠল: শনিবারের চিঠিতে! খেপেছেন, তারা ছাপবে কেন আমার লেখা?

ছাপবে কি না-ছাপবে সে তারা বুঝুক। আপনার আপত্তি আছে?

আপত্তি আমার করতে হবে না, তারাই করবে।

বেশ তো, দেখতে ক্ষতি কি। আছে কিছু পকেটে?

দৈবাৎ পকেটেই ছিল একটি গল্প। এক পত্রিকা ফেরত দিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে।

গোপাল হালদার বললেন, চলুন।

মোহনবাগান রো। ছোট্ট ঘর, গাদাগাদি মানুষ। দুজনে ঢুকলেন, বসবার জায়গা নেই। তা হোক, তেঁতুল পাতায়ও নজন বসে, যদি রাজি থাকে বসতে। চারটি চেয়ারে সাতজন। গোপাল হালদার বললেন, সজনী, একটা গল্প নেবে? এঁর লেখা।

সজনী বললেন, কে এটি?

সে পরে বলব।

সজনীকান্ত মস্তবড় একটা হাত বাড়ালেন: কই, দিন।

সে ছেলে পকেট থেকে কপিটা বার করল, তাঁর হাতে দিল। কথা একটিও বলেছিল কিনা সেদিন সন্দেহ, শুধু চোখ মেলে মেলে দেখেছিল ঘরটিকে আর মানুষগুলোকে।

মিনিট পাঁচেক বসা, তার পরে প্রস্থান। সজনীকান্ত বললেন, দিন সাতেক পরে বলব।

ঠিক পরদিন বা তার পরের দিন। গোপাল হালদার বললেন, সজনী টেলিফোন করেছিল। আপনাকে যেতে বলেছে। চলে যান।

চলে গেল ছেলে। সজনীকান্ত বললেন, এস। তুমি কি কর?

পয়সা থাকলে বাসে চড়ি। না থাকলে হেঁটে যাই—কলকাতার রাস্তা মাপি।

গোপালদা বলেছে তোমার কথা। তোমার অনেক লেখা জমানো আছে?

আছে কতকগুলো।

সব আমাকে দিয়ে যাবে। আমি সব পড়ব। তোমার এ গল্পটা এই মাসে যাচ্ছে।

ছেলে উড়ে উড়ে বাড়ি চলে এল। সমস্ত খাতাপত্তরের বাণ্ডিল নিয়ে পরদিন পৌঁছে দিল।

কেন দিয়েছিল, তার তত্ত্ব সে একাই জানত। শনিবারের চিঠিতে ছাপা হবে বলে নয়। সজনীকান্ত দাসকে সে চিনত না। জানত। জানত, তাঁর সমালোচনার টোন অতি তীক্ষ্ণ। তাঁর চোখে খুঁত কি কি ধরা পড়ে, সেইটে জানবার ইচ্ছে ছিল।

সে ইচ্ছেরও তলায় ছিল একটা গোপন দুঃখের গল্প। সে গল্প আরও ন বছর আগের—১৯২৯ সনের। মফস্বলের ছেলে। সতের বছর বয়স। সদ্য কলকাতায় এসেছে পড়তে, বিদ্যাসাগর কলেজে থার্ড ইয়ার ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। লেখার শক্তি বা কল্পনা, কোনটাই নেই। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হল, পুরনো স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন থেকে এক গল্পের বাংলা করল। সেটা ডাকে পাঠিয়ে দিল প্রবাসীকে। ছেলেবেলা থেকে প্রবাসী পড়ত, বোধ হয় সেই মোহে। রদ্দি গল্প, আরও রদ্দি অনুবাদ। কিন্তু কার মাথা হঠাৎ খারাপ হয়েছিল কে জানে, সেই গল্প ছাপা হল প্রবাসীতে।

বাংলার প্রফেসর পূর্ণ বিশ্বাস কলেজে এসে হৈচৈ বাধালেন। ক্লাসে বললেন, ওর গল্প বেরিয়েছে প্রবাসীতে, পড়ে দেখ।

ক্লাসের বাইরে এসে বললেন, ওহে, শোন। ক্লাসে ভাল বলেছি, লেখা কিন্তু ভাল হয় নি।

ছেলেটা বলল, ভাল হয় নি সে তো আমিও জানি। আপনি ওরকম করে লজ্জা দিলেন কেন আমাকে?

পূর্ণ বিশ্বাস অম্লান মুখে বললেন, লজ্জা পেয়েছ! আমার তাই জানা ছিল, তুমি লজ্জা পাবে।

তারপর বললেন, শোন। গল্প বাংলাদেশে সবাই লেখে। সবাই যা লেখে তা লিখ না। লেখই যদি, এমন লিখবে যা কেউ লিখতে পারে নি।

অতবড় সঙ্কল্প মনে মনেও করা যায় না, মুখে বলতে পারে এক যাত্রাগানের সেনাপতি। ছেলেটা কিছুই বলল না, মনে মনে বলল, ঠিক আছে সার্। আপনি যদি দেখে কখনও বলেন ছাপার যোগ্য হয়েছে সেইদিনই ছাপব, তা নইলে ছাপব না।

তারপর ন বছর কেটেছে। কলেজে পড়তে পড়তে চার বছর। জেলে ঢুকে পাঁচ বছর। এই ন বছর সে লিখেছে—লিখেছে, কেটেছে মেজেছে, নির্মম হয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে অপছন্দ হলে, জেলে বসেও লিখেছে, তার কতক ছিঁড়ে ফেলেছে, কতক জমিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে ছিল শহরে এসে পূর্ণ বিশ্বাসকে পড়াবে। তিনি যদি পড়ে বলেন, ছাপতে পার, তবেই ছাপবে।

ভাগ্য ভাল ছিল। জেল থেকে বাইরে এল যখন তার ঠিক মাসখানেক আগে কলেরা হয়ে পূর্ণ বিশ্বাস মারা গেছেন। দেখাতে আর হল না। রাগ জমে উঠল মনে। আর কাকে দেখাবে? লেখা পড়ে হালকা হাতে পিঠ চাপড়ে তারিফ করে যাবে বা যুক্তি না দেখিয়ে শুধু ভাল হয় নি বলে ছেড়ে দেবে যে ক্ষণিক সমালোচক, তার মন্তব্য শোনবার তার আগ্রহ নেই। নিজের চোখে নিজের লেখার দোষত্রুটি ধরা পড়ে না সব সময়ে।

দৈবদুর্ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেল সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে। দৈব নিশ্চয়ই, কারণ গোপাল হালদারের সঙ্গে সেদিনের সাক্ষাৎটাই একেবারে হঠাৎ। মৌখিক পরিচয় মাত্র, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে কোনকালেই ছিল না, তিনি বলেছিলেন চলুন শনিবারের চিঠিতে, সেটাও হয়তো নেহাতই একটা মুহূর্তের খেয়ালে।

দেখা হল, খাতাপত্তর সমর্পণ করে দিয়ে ভাবল, দেখা যাক ইনি কি বলেন।

তা বললেন। এমন বলা তার স্বপ্নেও ছিল না।

এরই দিন পনেরো পরে টেলিগ্রামে চড়ে এক চাকরি এসে হাজির হল, কলকাতা ছেড়ে চলে গেল মফস্বলে, তার নিজের দেশের শহরের কলেজে। সেখানে গিয়ে চিঠি পেল, খাতাগুলো রইল, আমি বেছে বেছে ছাপব।

গল্প বেরুল, শনিবারের চিঠিতে একটা, প্রবাসীতে একটা, অলকায় একটা। অলকাতেও সজনীকান্তই সম্পাদক।

তার পরের মাসে চিঠি এল, সামনের মাসে অমুক গল্পটা ছাপছি।

ব্যঙ্গ গল্প, কিন্তু 'সেক্স' নিয়ে। লিখল, সর্বনাশ, ওটা যদি ছাপেন, অন্ততঃ নাম দিয়ে ছাপবেন না, ছেলেরা কোটেশন টুকে দেবে ক্লাসের বোর্ডে। গল্প ছেপে এল একটি ছদ্মনামে। সজনীকান্তের তৈরি সে ছদ্মনাম। তারপর থেকে সেই নামটাই জেনে গেল সবাই, বাপ-মার দেওয়া নিজের নামটা চাপা পড়ে গেল তার তলায়।

তার পরে? তার পরের গল্প দু কথায় শেষ। তারপর সজনীকান্ত দাস তার লেখা পড়েছেন, তাড়া দিয়ে তাগিদ দিয়ে লিখিয়েছেন, বলে বকে গালাগাল দিয়ে লিখিয়েছেন, মেরামত করিয়েছেন, নিজে লেখা ছেপেছেন, অন্য কাগজে ছাপিয়েছেন, সভাসমিতিতে টেনে নিয়ে

গেছেন, লোকের মধ্যে খাড়া করে তুলে ধরেছেন, গড়ে তুলতে চেয়েছেন তাকে। সজনীকান্ত চিনেছিলেন তাকে, লিখতে পারুক বা না পারুক লেখার নিষ্ঠা ও সংকল্প তার মধ্যে নেই। মোহিতলাল তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'সাহিত্যের ঝিলে-বিলে সৌখিন মৎস্যশিকারী'—তখনও মোহিতলাল তার চেহারা চিনতেন না। সজনীকান্ত বুঝেছিলেন, ল্যাজে মোড়া না খেলে এ গরু নড়বে না। কি কি করেছেন তাকে নিয়ে, তার দ্বিতীয় সাক্ষী নেই স্বয়ং সজনীকান্তের অবর্তমানে। টেলিফোন করে সন্ধ্যেবেলায় ডেকে নিয়েছেন মোহনবাগান রোর অফিসে, দোতলার ঘরে বন্ধ করে বসিয়ে দিয়ে বলেছেন, এইটে লিখে দিয়ে তবে ছুটি। সারারাত বসে লিখে দিয়ে ভোরবেলায় সে বাড়ি ফিরেছে। দূরে আছে, চিঠি লিখেছেন, শীগগির একটা লেখা পাঠাও, আমার হাতে এ মাসের কপি নেই (স্রেফ গুল)—সে ছেলে মরে বেঁচে চারঘণ্টা পরে নতুন কপি ডাকে দিয়েছে, এবং সেই ধারা ধরে আরও গল্প লিখিয়ে নিয়ে তা ছাপতে দিয়েছেন সজনীকান্ত অন্য কাগজে, যাতে সে কাগজের সম্পাদক-পাঠকরাও এই লেখককে চিনতে পারে। কোন্ কাগজে তাঁকে গালাগাল করা হয়েছে, বা কোন্ কাগজের সংস্রব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন—তিনিই একে যে কাগজে ঢুকিয়েছিলেন, জেনে বলেছে আমি ও-কাগজে আর লিখব না। ধমকে উঠেছেন, কেন লিখবে না? আমার সঙ্গে কি হল না হল তোমার তা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? কাগজ ছাড়তে দেন নি।

বহু বছর কাটল। সে লেখক বড় হল না, বুড়ো হয়ে এল। লেখক সত্যি করে হল না যদিও, কারণ তার মধ্যে নিষ্ঠা ছিল না, ধৈর্য ছিল না। ঠিকই বলেছিলেন মোহিতলাল—সৌখিন মৎস্যশিকারী সে। তবু তার পেছনে লেগে রইলেন সজনীকান্ত, তাকে দিয়ে লেখাবেন। লেখক-মহলের দিকপালদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পরিচিত করে দিলেন, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জাতেও লিখুক।

এবং সবচেয়ে বড় মজা, একসময়ে হঠাৎ বলে বসলেন, তোমার লেখা আমি ছাপব না। সে নিজে লিখুক না লিখুক, যা লিখল তাঁকেই দেখাতে নিয়ে যেত, তিনি শুনে মত দিলে ছাপতে দেবে। শনিবারের চিঠিতে ছাপা হবে জানলে অন্য কাগজে দিতে চাইত না। দেখা গেল, সজনীকান্ত লেখাটা শুনলেন, ভুলত্রুটি বলে দিলেন, তারপর বললেন, আমি ছাপব না, অন্য কাউকে দাও। অনেক সময়ে কাকে দিতে হবে তাও বলে দিলেন।

সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, রাগ করেছে। বলে নি, কিন্তু ভেবেছে কি আমি করলাম যার জন্যে আমাকে বর্জন করলেন! মনে করেছে, নিশ্চয় কোথাও অন্যায় হয়েছে আমার। অথচ অন্যায় করেছে বলে যদি তার লেখা ছাপতে আপত্তি, ব্যবসার সম্পর্ক বলতে আপত্তি, তবে সে বিতৃষ্ণা অন্য কারণে কেন প্রকাশ পাচ্ছে না? ডাকামাত্র 'এসো' বলে আহ্বান, তার পরেই আরও জোরে একটা হাঁক—সুধা, অ—এসেছে। তুমি খেয়ে যাবে তো?

এরও ব্যতিক্রম হয় নি কোনদিন। এ কি জাতের বিতৃষ্ণা!

বিতৃষ্ণা নয়। ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অভিমান করেছে। এর কারণ বুঝেছে অনেকদিন পরে, তাও তাঁর নিজের কথায় নয়। এই সময়ে তার অর্থকষ্ট ছিল, ছিল নগদ টাকা পাবার প্রয়োজন। শনিবারের চিঠি লেখককে টাকা দিত না বা দিতে পারত না, সেকালের লেখকরাও ছিলেন 'শনিচক্রের গোষ্ঠী', টাকা দিলেও সে নিতে চাইবে না এ আশঙ্কা ছিল। তাই তার লেখা তিনি ছাপেন নি, অন্য কাগজে পাঠাতে বাধ্য করেছেন—যেখানে সে নগদ টাকা পাবে। এবং সে টাকার পরিমাণ যাতে কম না হয় তা নিয়ে নিজে লড়েছেন, একে বলেছেন, এর কমে ছাড়বে না।

অনেকে উৎসাহী হয়েছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছেন শনিবারের চিঠির সঙ্গে, সজনী দাসের সঙ্গে আপনার ছাড়াছাড়ি হয়েছে বুঝি? কি নিয়ে ছাড়াছাড়ি, জানবার জন্যে অদম্য আগ্রহ। উত্তর পেয়েছেন—ছাড়াছাড়ি? না তো? শুনে মন খারাপ করেছেন, ভেবেছেন কথাটা মিথ্যে। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, ও-লোকটিই ওইরকম, কারও সঙ্গে সদ্ভাব রাখে না কোনদিন।

স্নেহই করতেন হয়তো, তার জন্যে নিজের দুর্নাম নিজে সৃষ্টি করেছেন, হজম করেছেন সজনীকান্ত; তাঁকে শোনাতে গেলে উল্টে বকে দিয়েছেন—বেশ তো বলেছে, তোমার কি। এত করেও চেয়েছেন—সে লিখুক, আরও লিখুক।

তবু তার লেখা এগোয় নি। তার আসল কারণ তার

প্রকৃতির মধ্যে সে অলস, উদাসীন, অস্থির-সংকল্প—তাড়া না খেলে নড়ে না। অন্য কারণ ছিল বাহ্যিক এবং বহুবিধ, যে মানসিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে লেখা অসম্ভব হয় তার অভাব ঘটেছে বারংবার এবং বহু প্রকারে। সে গল্প সে কখনও তাঁকে শোনায় নি, জানত তিনি অসুস্থ, মিথ্যে তাঁকে উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ণ করা অকর্তব্য। তিনি হয়তো তাকে শুধু নিষ্ঠাহীন বলেই জেনে গেলেন, এটা বুঝেও কিছু বলে নি। কিন্তু মজা এই, যাঁদের সঙ্গে তার যখন নিত্যসম্পর্ক, তাকে স্থির এবং সুস্থ থাকতে দিলে তার থেকে ফললাভ যাঁদের, তাঁরাই বারংবার তাকে অস্থির অসুস্থ করে রেখেছেন ; আর তাকে সুস্থ স্থির করে রাখতে চেয়েছেন এই ব্যক্তি, যাঁর কোন ফললাভ ছিল না, প্রত্যাশা ছিল না।

শুধু কি তাই। প্রকৃতিতে সামাজিক বা শহুরে সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাব, বেহিসেবী ভাল কথা বলে বা ভাল করতে গিয়ে অহেতুক লোককে চটিয়ে দেওয়া এবং নির্বিকার হয়ে শত্রুসৃষ্টি করা এর একটা স্পেশাল ন্যাক। এর ওপরে চটেছেন যাঁরা, সজনীকান্তের কাছে এসে নালিশ করেছেন, তাঁর ওপরে ঝাল ঝেড়েছেন। সজনীকান্ত বাঘের মত আগলে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের নিরস্ত এবং নিরস্ত্র করেছেন, তারপর একেও বকেছেন, 'বুদ্ধি কোনদিন হবে না ?'

এই লেখকের নাম ? 'সম্বুদ্ধ'। তাঁরই বানানো নাম। তার নিজের নামটাই অচল হয়ে গেছে। তার ছাত্ররাও অনেকে বলে সম্বুদ্ধবাবু, সম্বুদ্ধ-সার্। যার যা খুশি ভাবতে পারে ; আমি নিজে জানি, সম্বুদ্ধ সজনীকান্ত দাসের সৃষ্টি—শুধু নামটা নয়, লোকটাই। সজনীকান্তের পাল্লায় না পড়লে সম্বুদ্ধ জন্মগ্রহণই করত না, নেহাত জন্মালেও আঁতুড়ে মরে যেত—কারণ পেঁচোয় পাওয়াই তার ন্যাক।

হঠাৎ কলকাতায় গিয়েছিলাম, সরস্বতী পুজোর ছুটিতে। সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। পরদিন শনিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম না আলস্যে। তার পরদিন রবিবার, গেলাম শহরের বাইরে, স্রেফ আড্ডা এবং একেবারেই নিষ্ফল আড্ডা দিতে। ফেরবার পথে তাঁর ওখানে নামব এইরকম ইচ্ছে ; তাঁকে দেখাব নতুন গল্প, তিনি বিচার করে মত দিলে ছাপতে দেব, সে গল্পের কপি আমার থলের মধ্যে। বাইরে যাবার প্রয়োজন সত্যি করে কিছুই ছিল না। ভাগ্যই টেনে নিয়ে গেল, সেখানে অহেতুক আটকে রেখে দিল। আমার কোন আপনজনের মৃত্যু আমি চোখে দেখি নে—কোনদিন দেখি নি, ক্ষণকালের জন্যে হলেও যে ভাবেই হোক অনুপস্থিত হয়ে যাই। এ আমার চিরকালের অভিজ্ঞতা। তাই যে হল। সোমবার, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছি, কাগজে দেখলাম মৃত্যু সংবাদ। তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলাম, থলের মধ্যে সেই গল্প।

কাগজে খবরটা দেখলাম। কাছে যিনি ছিলেন, বললেন, আপনি চিনতেন ? বললাম, সামান্য। অন্যকে কি বলব চিনতাম কি চিনতাম না। আমি তাঁকে চিনি নি। তিনি আমাকে চিনিয়েছিলেন সকলের কাছে।

দুঃখ ? দুঃখ আমার হয় না। ভারি একটা স্বস্তি বোধ হল সেই মুহূর্তে। বাঁচা গেল, আর কেউ লিখছি নে কেন বলে তাড়া দেবে না। সত্যিই, সজনীকান্ত না থাকলে সম্বুদ্ধ থাকত কোথায় ? লিখি কালেভদ্রে। গত দশ বছরে শনিবারের চিঠিতে আমার পাঁচটাও লেখা বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। তবু দেখেছি আমার পরিচয় দিতে এখনও অনেকে বলেন, শনিবারের চিঠির সম্বুদ্ধ! তার কৃতিত্ব কুমড়ো-লতার নয়, বটগাছের—যে বটগাছ তাকে ছায়া দিয়ে আশ্রয় দিয়ে রক্ষে করেছে, ডাল নুইয়ে দিয়ে ঝুরি নামিয়ে দিয়ে বলেছে 'বেয়ে ওঠ'।

তারই লেখা একটি লাইন মনে পড়ল বারংবার।

'বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ ?'

তিনি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ বেশী বড়, নাগালের বাইরে। সজনী দাস হাতের কাছের মানুষ—আমার কাছে সেই ছোট বটগাছটাই সত্য।

বটগাছ মরে গেল। এর পরে ? কি হবে ? আমাকে নিয়ে চিন্তা নয়, আমার এমনিতেও কিছু হত না। কিন্তু শনিবারের চিঠির কি হবে ? সে তো 'সাহিত্য' নয়, একটা সংগ্রাম। কে লিখবে সংবাদ-সাহিত্য ?

সজনীকান্ত স্মরণে

আশাপূর্ণা দেবী

মাঘের 'শনিবারের চিঠি' এল।

এল নিরাভরণ শূন্য সাদা মূর্তিতে রিক্ততার বাণী বহন করে। ওর ওই স্তব্ধ শূন্যতার মধ্যেই যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে শুধু 'শনিবারের চিঠি'রই নয়, আজকের বাংলা সাহিত্যের হৃদয়েরও মৌন বেদনা। সজনীকান্তের আকস্মিক বিয়োগ বাংলা সাহিত্যের আসরের অনেকখানি খালি করে দিয়ে গিয়েছে, প্রস্তুত হবার অবকাশ না দিয়েই।

'শনিবারের চিঠি' রয়েছে—সজনীকান্ত নেই, এ যেন এক অনিয়মের বিস্ময়।

সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে পরিচয় আমার খুব দীর্ঘদিনের নয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে যাঁরা তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে এসেছেন রাগে আর অনুরাগে, লোভে আর ক্ষোভে, আগ্রহে আর কৌতূহলে, তাঁদের আসরে আমার মত স্বল্প-পরিচিতের নীরব থাকাই শোভন ছিল। কারণ 'শনিবারের চিঠি'র এই স্মৃতিতর্পণ-সংখ্যা সজনীকান্তের বিরাট অবদানের বিশ্লেষণ ক্ষেত্র নয়। এ শুধু নিকটজনের ভাব-নিবেদনের ক্ষেত্র।

তবু একেবারে নীরব থাকতেও মন সায় দিল না। বহু আলাপ আর বহু ঘটনায় সমৃদ্ধ সুদীর্ঘকালের পরিচয় না থাক, সামান্য দিনের পরিচয়েও সজনীকান্তের কাছে যে অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করেছি, সে সঞ্চয়টুকু 'সামান্য' নয়।

এই লাভটাও ছিল অপ্রত্যাশিত।

যেখানে আমরা প্রত্যাশার পাত্র নিয়ে দাঁড়াই, যেখানে মন ভরে উঠতে দেরি লাগে, যেখানে সে প্রত্যাশা নেই, সেখানে সহসা প্রাপ্তি ঘটলে, যোগ ঘটে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের, মন মুহূর্তে ভরে ওঠে। সেই বিস্ময় আর আনন্দ অনুভব করেছিলাম সজনীকান্তের সান্নিধ্যে আসতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

সজনীকান্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় বহুকালের নয়, কিন্তু 'সজনীকান্ত দাস' এই বহুকণ্ঠধ্বনিত নামটির সঙ্গে পরিচয় তো বহু কালের। দূর অতীতে যখন 'শনিবারের চিঠি' শনিগ্রহের বিভীষিকা নিয়েই বাংলা সাহিত্যের আকাশে উদিত হয়ে ভয়ানক একটা সোরগোল তুলেছে, তখন থেকেই আকৃষ্ট হয়ে চেয়ে থেকেছি এই নামের দিকে। যদিও ওই নামটি তখন নিজস্ব 'তোলপাড় করা' কর্মপন্থায় দেশের কাছে প্রীতিকর ততটা নয়, যতটা ভীতিকর।

যাঁরা ব্যক্তি-মানুষটির কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হয়তো প্রীতির বন্ধনে বন্দী হতে দ্বিধা করেন নি, কারণ পরবর্তী-

---

কার মুখ দিয়ে আমাদের সবার প্রাণের স্বপ্ন আর অন্যায়ের ধিক্কার একই বাক্যে উচ্চারণ করবেন গোপালদা?

ছিল সেই একজনই যে পেরেছে। বট নয়, বটের ছায়াই আছে—ফুলফল নেই। বিশালঃ শাল্মলীতরু—তার ফুল হয়, তুলোও হয়, কাঁটাও আছে তীক্ষ্ণধার। কিন্তু গল্পের সে চিরন্তন বিশাল শাল্মলীতরু তো অস্তি গোদাবরী তীরে।

এ যে আসীৎ হয়ে গেল। ছিল। নেই। আর হবে না। Singular। তার Plural হয় না।

এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলাম ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। দরজায় পা দিয়ে, অভ্যাসবশে চোখ তুলে তাকালাম। সামনে প্রেসরুমের দরজার মাথায় লেখা আছে—সজনীকান্ত দাস আছেন।

চমকে উঠলাম। সত্যি কি? আছেন এখনও এই প্রেসকে, এই পত্রিকাকে ঘিরে? থাকবেন?

—

কালে জেনেছি, অনেক উল্টোপাল্টা ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও সজনীকান্তের মধ্যে অনেক মানুষকে জায়গা দেবার মত একটি বিশাল হৃদয় ছিল। তা না হলে একদা যে ব্যক্তি সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ সমালোচনার শরাঘাতে আহত হয়ে সজনীকান্তকে শত্রু বলে গণ্য করেছে, সেই ব্যক্তিই পরে তাঁকে 'বন্ধু' বলে ভালবেসেছে কি করে!

কিন্তু দূরের জগতের বাসিন্দাদের কাছে ওই ভীতির রূপটাই ছিল স্পষ্ট।

যদিও আমার এই সামান্যতম সাহিত্যসেবার মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে সমালোচনার কোন সুতীক্ষ্ণ বাণ আমার ওপরে এসে পড়েছে বলে আমার জানা নেই, (সবগুলি সংখ্যা সব সময় চোখে না পড়লেও এমন ঘটনা ঘটলে বন্ধুজন সেটি চক্ষুগোচর করে দিতে বিলম্ব করেন না বলেই নিশ্চিন্ত আছি।) কিন্তু মিথ্যা বলব না, মনের মধ্যে ভয় আর সন্দেহে গড়া একটা ভাবই ছিল বদ্ধমূল।

তাই দূরে থেকে যদি কোথাও সেই সমালোচককে দেখেছি, আরও দূরে সরে গিয়েছি।

কিন্তু হঠাৎ যেদিন সেই দূরত্বের ব্যবধান দূর হয়ে গেল, ভেঙে গেল চিরদিনের বদ্ধমূল ধারণা। ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের সেই দোতলার ঘরটিতে ভাদ্রদুপুরের এক জন্মদিনের আসরে স্ত্রীপুত্রকন্যাপরিবৃত বন্ধুবৎসল স্নেহস্নিগ্ধ মানুষটির সত্য পরিচয় পেলাম।

জন্মদিনের সেই পরিচিত ঘরেই আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছি মৃত্যুদিনের শীতার্ত বিষণ্ণ সন্ধ্যায়! আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করেছি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি, তাঁর শোকাহত স্ত্রী-কন্যাকে সান্ত্বনা দেবার শক্তি খুঁজে পাই নি। শয্যায় শায়িত চিরস্তব্ধ হয়ে যাওয়া মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে সেই চিরপুরনো চিন্তাটা বারবার মনের মধ্যে ওঠাপড়া করেছে—

জানিনা কিসের তরে যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভালমন্দ শেষ করি, যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া?

বাংলা সাহিত্যে সজনীকান্তের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবার জায়গা এ নয়, পরিসরও অল্প; শুধু এইটুকুই বলতে পারা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সজনীকান্ত' এক বৃহৎ বিচিত্র অধ্যায়। এই বিচিত্রতার আঘাতে আর প্রতিঘাতে সে সাহিত্য একদা চঞ্চল হয়ে উঠে নতুন গতিপথ অন্বেষণ করেছে, নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

অনুসন্ধানী-পরবর্তীকাল হয়তো এই বিচিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে সজনীকান্তকে বারে বারে আবিষ্কার করবে নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে। আবিষ্কার করবে তাঁর ভিতরকার সাহিত্যিককে, কবিকে, সম্পাদককে, সমালোচককে আর চিন্তাশীল ব্যক্তিটিকে, কিন্তু সন্ধান পাবে কি সেই প্রবল ব্যক্তিত্বের? যে ব্যক্তিত্বের জোরে, সাহিত্যের অনাচারে উগ্র সেই ব্যক্তি-মানুষটি বহুজনের অপ্রিয়ভাজন হবার ভয়কে জয় করেও আপন লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন, আর হাত থেকে অস্ত্র নামিয়েই সহাস্যমুখে প্রতিপক্ষের সামনে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু শুধু কি দাঁড়াতেই সক্ষম হয়েছেন? সক্ষম হন নি সেখানে নিজের মস্ত একটা জায়গা করে নিতে? ভালবাসার জায়গা, সম্মানের জায়গা?

এই ব্যক্তিত্বের বিশালতার খবর পরবর্তীকাল পাবে না। যারা সে খবর পেয়েছে, তারাই শুধু জানল সেই জায়গাটা শূন্য হয়ে যাওয়া—কতখানি শূন্যতা।

—

ভুল বুঝেছিলাম

দক্ষিণারঞ্জন বসু

> পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে এল ম্লান হয়ে এল দিন,
> ভিতরে বাহিরে নামিছে অন্ধকার—
> কণ্টকময় সংসার-বুকে চরণের দৃঢ়ভার
> ক্ষয় ও ক্ষতিতে ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ।

সজনীকান্ত কি বুঝতে পেরেছিলেন পথ চলা তাঁর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে? মাত্র এক বছর আগে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'পান্থ-পাদপে'র একটি কবিতার উপরোক্ত উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যে এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুকে এত সন্নিকট জেনেও খুব অল্প লোকই বলিষ্ঠমনা সজনীকান্তের মত বলতে পারেন—

> ক্ষতি কিবা তায় যদি বা ঘনায় সমুখে গহন নিশা
> ভঙ্গ দিব না ক্লান্ত জীবন-রণে।

সংসারে যুগে যুগেই এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন জন্মাবধিই যাঁরা সংগ্রামী। সংগ্রাম-বিমুখতাকেই তাঁরা প্রকৃত মৃত্যু বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে জীবনের যথার্থ পরিচয় সংগ্রামে। সমাজকে আবর্জনামুক্ত ও সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব যুগে যুগে তাঁরাই গ্রহণ করে থাকেন। প্রতিদানে নানারকমের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের, কিন্তু সকল অবস্থাতেই তাঁরা থাকেন আত্মস্থ। কোনও রকম ভ্রূকুটিতেই তাঁরা ভীত হন না, সমস্ত আঘাত-অপমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ন্যায়নিষ্ঠায় অবিচল থাকেন। এমনি একজন চিরসংগ্রামী পুরুষ ছিলেন সজনীকান্ত, মৃত্যুর চরম আঘাতও যাঁর প্রসন্নতাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারে নি। এমন মানুষের যা স্বভাবধর্ম, স্বাভাবিক কামনা, 'পান্থ-পাদপে'র ওই কবিতাটির উপসংহারে তা যথার্থভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কবি সজনীকান্ত লিখেছেন—

> সুন্দর হোক ধরণী-সরণি গানে ও গন্ধে মিশা।

এমন মানুষ সম্পর্কেও একসময়ে আমি অশেষ বিরূপতা পোষণ করতাম, সে কথা স্বীকার করতে আজ কুণ্ঠা নেই। ত্রিশ দশকের সূচনা-কালের কথা। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। জানবার নেশা ও সাহিত্যের শখ দুই-ই প্রবল। তখনকার দিনের সুসম্পাদিত গুরু-গম্ভীর সাময়িক-পত্র প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতির জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী পাঠে সেই জানবার নেশা অনেকখানি চরিতার্থ হলেও তরুণদের যথার্থ আনন্দ-পরিবেষণে সে সময়ে শনিবারের চিঠির কোনও জুড়ি ছিল না, এ বলতেই হবে। ব্যঙ্গ-ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক গদ্য-পদ্যের বিবিধ রচনা এবং বিশেষ করে তার সংবাদ-সাহিত্যের জন্যেই শনিবারের চিঠির আকর্ষণ ছিল এত বেশী। সংবাদ-সাহিত্যের রণাঙ্গনে শক্তিশালী নবীন সম্পাদক সজনীকান্তের লেখনী-শরাঘাতে জর্জরিত হতে হয় নি উল্লেখযোগ্য এমন লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে বিরল। সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই চলেছে তাঁর অবাধ আক্রমণ। গোটা ত্রিশ দশক ধরেই (শ্রীযোগানন্দ দাস সম্পাদিত সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ১৯২৭-এর শেষ ভাগে নব পর্যায়ে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষেই সম্পাদক বদল ঘটে। সম্পাদক হন শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু সাত মাস পরে শ্রীচৌধুরীও বিদায় নিলে 'কর্মাধ্যক্ষ' সজনীকান্তই শনিবারের চিঠির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় বর্ষে কয়েক মাস আবার শনিবারের চিঠি বন্ধ থাকে এবং সজনীকান্ত বঙ্গশ্রীর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করায় শনিবারের চিঠির সম্পাদকীয় দায়িত্ব পঞ্চম বর্ষের পৌষ সংখ্যা থেকে প্রায় তিন বৎসর কাল শ্রীপরিমল গোস্বামীর উপর ন্যস্ত থাকে। তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সজনীকান্তই ছিলেন শনিবারের চিঠির সম্পাদক ও পরিচালক।) তিনি ফাঁকিবাজি ও ফাঁকা আওয়াজের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও অনাচার প্রতিরোধে ক্রমাগত যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছেন। যিনি যত বড়ই হোন না, যাঁর যে কাজ রচনা বা উক্তি সজনীকান্ত অকল্যাণকর ও অযৌক্তিক বলে মনে করতেন অকুতোভয়ে তিনি তার কঠোর সমালোচনায় নেমে পড়তেন। পরবর্তী সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে কার মাথা কাটা যাবে, কে কে হবেন

আক্রমণের লক্ষ্য, নবীন-প্রবীণ সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকেই সেই চিন্তায় আতঙ্কে দিন কাটাতে হত।

অন্য সকলের কথা থাক্। রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্রও সজনীকান্তের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। এঁদের এবং অন্যান্য মনীষী ও দেশনায়কদের আক্রমণে সংবাদ-সাহিত্যে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন সেই অননুকরণীয় মারাত্মক ভাষা রুচিশীল কোমলহৃদয় পাঠকদেরও সময় সময় আহত করত। আমার কলেজ-জীবনে এবং তার পরেও অনেককাল পর্যন্ত সজনীকান্তকে সাংবাদিক হিসেবে আমি একজন পরনিন্দা-মুখর কেচ্ছাবিলাসী সম্পাদক বলেই মনে করতাম। তাঁর বহু শ্রমসাধ্য সাহিত্য-গবেষণা ও সাহিত্য-সৃষ্টি সত্ত্বেও শুধু ওই কারণেই তাঁকে আমি অনেককাল শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারি নি।

হঠাৎ শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যে সুর পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষাঙ্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল। উনিশ শো বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর উত্তপ্ত আবহাওয়া। দেশ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। সেই পরিবেশে চিঠির পঞ্চদশ বর্ষ (১৩৩৪ সালে 'নবপর্যায়ে' মাসিক আকারে প্রকাশ আরম্ভের পর থেকে) পূর্তি উপলক্ষে ১৩৫০ সনের আশ্বিন সংখ্যায় সজনীকান্ত সংবাদ-সাহিত্যে লিখলেন, "সমধর্মীদের ভুলত্রুটি লইয়া সরস রহস্যাঘাত অথবা কঠিন লগুড় প্রহার যখন করা হইত, তখন কাজটা সহজ ছিল। আজ দেশ ও জাতির বৃহত্তর পটভূমিকায় এই সকল ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় তুচ্ছ ঠেকিতেছে। মৃত্যুর মহাগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নীর মত মনে হইতেছে, মৃত্যুকে যাহা রোধ করিতে পারে না, তাহার প্রয়োজন কি? যে বস্তু অসার, যাহা স্বভাবতঃই মরণশীল, তাহার উপর নিপুণ অথবা স্থূল অস্ত্রাঘাত করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহারে কোনই লাভ নাই; যাহা স্থায়ী, যাহা নিত্য, তাহার গৌরব প্রচারে ব্যক্তিগত লাভ না থাকিলেও আত্মপ্রসাদ আছে। অভ্যস্ত হাতের সামান্য কণ্ডুয়নবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া সেই আত্মপ্রসাদ হইতেই বা বঞ্চিত হই কেন?" অতএব সম্পাদক মহাশয় 'পদ্ধতি-বদলে'র সিদ্ধান্ত করে জানালেন, "লাঞ্ছনা ও অস্বীকৃতির দ্বারা ঘৃণ্য ও হেয়ের মহিমা বৃদ্ধি না করিয়া মহতের স্মরণীয় কীর্তি ও ভাষণ সাধারণের গোচরে আনিলে পুণ্য অর্জনের সম্ভাবনা আছে। মহত্ত্বের বিচারে কালের পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সংখ্যায় তাঁহারা কম নন। পৃথিবীর বহু পণ্ডিত এবং মনীষী ইঁহাদের সম্বন্ধে স্ব স্ব বিচারবুদ্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া ভুল করিবার অল্প অবকাশই আমাদের দিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায়-উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের রচনা লইয়া আমরা যদি মাসে মাসে আলোচনা করি, তাহা হইলে একদিকে যেমন মানসিক গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি বহু ভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে পথের সন্ধানও আমরা দিতে পারি। আমরা এবারে তাহাই করিব।"

সংবাদ-সাহিত্যে সজনীকান্তের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের পর অনেকেই যে খুশী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সত্যকারের শক্তিশালী মানুষ বলেই যে পথ ভুল সে পথকে এত সহজে পরিহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তা হলেও 'সব রকম বোগোসিটি বা ভেজাল নকল ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে যে স-চাবুক অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে' শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত শনিচক্রের উদ্যোগে শনিবারের চিঠির জন্ম এবং শনিচক্রের প্রথম যুগের সাহিত্য-নেতা স্বর্গত মোহিতলাল সাহিত্যের যে আদর্শ শনিবারের চিঠির সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সম্পাদক সজনীকান্ত কোনদিন ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তার জন্যে অনেক সময়ই তাঁর অনেক সতীর্থ সমধর্মী তাঁকে ভুল বুঝেছেন, বহুক্ষেত্রে সাময়িক-ভাবে বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটেছে। এমনি সব ঘটনায় বারবারই তাঁকে বলতে শুনেছি, 'ওরা বোঝে না বলেই ভুল করে। আমার লড়াই কোনদিনই ব্যক্তির লড়াই নয়, নীতির লড়াই।' ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিমুক্ত এমনি লড়াইয়ের অনেক দৃষ্টান্তই শনিবারের চিঠির বিভিন্ন সংখ্যায় ছড়ানো রয়েছে।

বিশেষ কতকগুলো কারণে একসময়ে কঠোর ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-বোদ্ধা সজনীকান্তের নির্মল ও নির্ভেজাল রবীন্দ্র ভক্তির পরিচয় আজ আর খুঁজে বেড়াতে হয় না। তাঁর 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতা-গ্রন্থের 'শ্রীচরণেষু' কবিতায় সজনীকান্ত যথার্থ ই লিখেছেন—

> অপরাধ করিতেছি—কহিতেছে জনে জনে
> হব গুরুহত্যা-পাপভাগী।
> হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জান মনে মনে,
> কেবা কত গুরু-অনুরাগী!

সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের চাপল্যকে সজনীকান্ত যতই নিন্দা করে থাকুন না কেন তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেমের প্রতি সজনীকান্তের শ্রদ্ধার কোনও সীমা ছিল না। তাই একদার 'খোকা সেনাপতি গরু' পরবর্তীকালের নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ভারত-পৌরুষের অম্লান প্রতীক হিসেবে এ যুগের বাঙালীর কাছে বারবার উপস্থিত করতে সজনীকান্তের একটুও বাধে নি। যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রবাসী' কার্যালয়ে তাঁর প্রথম চাকরি সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও সজনীকান্ত তাঁর যথেচ্ছ আক্রমণ থেকে রেহাই দেন নি। ত্রিশ দশক

থেকে শুরু করে চল্লিশ দশক পর্যন্ত সমানে তিনি তা চালিয়ে এসেছেন। সংবাদ-সাহিত্যের 'পদ্ধতি-বদলে'র আগের বছরেও সজনীকান্ত ওই বছরের শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসীর 'পুণ্যস্মৃতি' শীর্ষক 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বহু সম্মানভাজন প্রবাসী-সম্পাদককে বেশ এক হাত নিয়েছিলেন। ১৩৪৯-এর শ্রাবণ-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত লিখলেন, "...এতদিন নিজেদের সম্পাদিত পত্রিকায় কিছুতেই নিজেদের অথবা নিকট আত্মীয়দের রচিত পুস্তকের প্রশংসা ঢুকাইয়া দিবার মত কায়দা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এবারকার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সে কায়দা দেখাইয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কায়দাটি এই। নিজের অথবা নিজের পুত্র-কন্যার লিখিত কোনও পুস্তকের সম্পাদকীয় প্রশংসা করিতে হইলে সম্পাদক পুস্তকের নামমাত্র উল্লেখ করিবেন, লেখক বা লেখিকার নাম বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলেই আত্মপ্রশংসার পাপ তাঁহাকে লাগিবে না।" পদে পদে এমনি ভাবে ব্রাহ্ম-নায়ক রামানন্দবাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করলেও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরাট মনীষার প্রতি সজনীকান্তের শ্রদ্ধার কোন অভাব ছিল না। শনিবারের চিঠির চাবুক থেকে বিপিন পাল, শরৎচন্দ্র, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতিও অব্যাহতি পান নি। 'কল্লোল' যুগের সাহিত্য-বিপ্লবীরা ছিলেন সজনীকান্তের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু সে সবও অনেককাল আগের কথা। সেই পুরনো দিনের আলোচনা এখন আর থাক্।

আমার আসল বক্তব্য, শনিবারের চিঠির 'পদ্ধতি বদলে'র সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পাদকও যে কি ভাবে বদলে চলেছিলেন তা লক্ষ্য করার মত। বাংলা ১৩৫০ এবং ইংরেজী ১৯৪৩-এর পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমি সজনীকান্তের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। ক্রমে ক্রমে সেই আকর্ষণ নিবিড় ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয় বছর বারো আগে যখন আমি পাইকপাড়ায় এসে বেলগাছিয়ার সজনীকান্তের প্রতিবেশী হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝেই তিনি ডাকতেন, কখনও কখনও টালাপার্কে সকালে বেড়াতে বেরিয়ে নিজে থেকেই তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হতাম। সুধাবউদির দেওয়া চা আর খাবার সামনে রেখে আমাদের গল্প শুরু হয়ে যেত। অনেকদিন সজনীদা হয়তো তাঁর সদ্য-রচিত কোনও কবিতা বা প্রবন্ধ নয়তো আসন্ন-প্রকাশ সংবাদ-সাহিত্যের কপি আমার হাতে তুলে দিয়ে তা পড়তে বলতেন। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, পড়তে পড়তে আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, সজনীদার হাঁকে তখন সুধাবউদিকে নতুন করে গরম চা এনে দিতে হয়েছে। তেমনি এক সকালের নিরিবিলি আড্ডায় বছর এগারো আগে হঠাৎ যেদিন সজনীকান্ত আমায় বললেন, 'তুমি আমায় এড়িয়ে চলতে বটে, কিন্তু তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি আমি অনেকদিন থেকে দৃষ্টি রেখে আসছি' সেদিন আমি লজ্জাও পেয়েছিলাম যেমনি গর্ববোধও হয়েছিল ততখানি।

কখনও ফোনে কখনও সাক্ষাতে এক এক সময় আমার ওপর হুকুম হত আমার কোনও নতুন লেখা থাকলে তাঁর কাছে তা নিয়ে যেতে। যেতাম। কিন্তু আশ্চর্য হতাম দেখে যে কী গভীর অভিনিবেশ নিয়ে পরের লেখা শোনবার ধৈর্য ধারণ করতে পারেন তিনি। বহু খ্যাত-অখ্যাত লেখকের লেখাই তিনি পড়ে বা এমনি ভাবে শুনে লেখকদের উৎসাহিত করতে আনন্দ পেতেন। বর্তমান আত্মঘোষণা ও ব্যস্ততার যুগে একে মহৎ ঔদার্যেরই পরিচায়ক বলতে হবে। শুধু পড়া বা শোনাই নয়, অন্যের লেখার ভুল ক্রটি সংশোধন করে দিয়েও তিনি সত্যকারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। সে কি কম কথা! এদিক থেকে বলব, সজনীকান্ত শুধু সাহিত্য-স্রষ্টা ছিলেন না, সাহিত্যিক-স্রষ্টাও তাঁর একটা বড় পরিচয়।

নানা কথা ও কাজের ভেতর দিয়ে সজনীকান্তের বন্ধু-প্রীতির যেসব পরিচয় পেয়েছি তার বিস্তৃত বিবরণ দেবার অবকাশ এখানে নেই। তবু মানুষ সজনীকান্ত ও বন্ধু সজনীকান্তকে বোঝাবার জন্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সজনীকান্ত ও তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গতার কথা সর্বজন-বিদিত। তবু দুই বন্ধুর মধ্যে মতভেদ হওয়া এমন বিচিত্র কিছু নয়। তবে সেই মতানৈক্য যদি মনকষাকষিতে গিয়ে দাঁড়ায় তা হলে উভয়ের যাঁরা স্নেহভাজন প্রীতি-ভাজন বা শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের কাছে সে অবস্থাটা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। অমনি মনকষাকষিরই একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বছর দুই-তিন আগে দুই বন্ধুর মধ্যে। তার জন্যে তারাশঙ্করের মনের মধ্যে যে ব্যথা জমে উঠেছিল আমার কাছে তা একদিন স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা করতে বসে। দুদিন বাদে সজনীকান্তেরই ঘরে বসে কথায় কথায় অসঙ্কোচেই আমি তাঁকে বলে ফেললাম, 'সজনীদা, তারাশঙ্করের সঙ্গে আপনার কোন মতবিরোধকেই দীর্ঘস্থায়ী হতে দেওয়া চলে না। ও আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।' সজনীকান্ত হাসলেন। হেসে বললেন, 'ওসব নিয়ে ভেবো না। তোমরা শুধু জান বড়বাবু (তারাশঙ্করকে বড়বাবু বলেই ডাকতেন সজনীকান্ত এবং সাহিত্যিক-মহলে তারাশঙ্করের এ পরিচয়টিকে তিনিই চালু করে দিয়েছিলেন) আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা যে কতখানি গভীর তা অনুমান করাও অনেকের পক্ষে কঠিন। শনিবারের চিঠিতে ওর বিরুদ্ধে দু-একটা কড়া

কথা লিখলে বা আমার সম্বন্ধে কোথাও কোন বিষয়ে বড়বাবু একটু-আধটু গালমন্দ করলে তাতে আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে এ আমি বিশ্বাস করি না।' বলতে বলতে আবেগে জড়িয়ে আসছিল সজনীকান্তের কণ্ঠ। আমি বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম। একটু থেমেই তিনি আবার বললেন, 'জান দক্ষিণা, আমার সম্পর্কে বড়বাবুর মনে যত অভিমানই থাক না কেন, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি, আমার কোন বিপদের কথা শুনলে ও-ই ছুটে এসে সবার আগে আমার পাশে দাঁড়াবে, আর বড়বাবুরও এ কথা ভালই জানা আছে যে, তাঁর সমস্ত আনন্দ-নিরানন্দ আপদ-বিপদে আমিও তাঁর নিত্যসঙ্গী। বড়বাবুকে আমি কতখানি ভালবাসি কতটা শ্রদ্ধা করি ওর জন্মদিন উপলক্ষে আমার লেখা এই কবিতাটি শুনলে তার কিছুটা হয়তো বুঝতে পারবে।' বলেই সজনীকান্ত তাঁর ড্রয়ার থেকে একটি দীর্ঘ কবিতা বার করে আমায় পড়ে শোনালেন। অপূর্ব সে বন্ধুত্বের নিদর্শন। সেদিন আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর মুখে তাঁর ওই কবিতা শুনে। সে বৈঠকে তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব-প্রসঙ্গে সজনীকান্ত যে কথাগুলো আমায় বলেছিলেন তার অনেক প্রমাণ আগে থেকে জানা থাকলেও তার সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে মৃত্যুর সঙ্গে শেষ পাঞ্জা লড়তে বসে পাঞ্জাবিদ্ সংগ্রামী সজনীকান্ত হাসিমুখে কিভাবে শেষ লড়াইও করা যায় তা দেখাবার জন্যে বন্ধু তারাশঙ্করকেই সবার আগে পাশে ডেকে নিয়েছিলেন। সেই থেকে শেষ বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত সজনীকান্তের পাশে বসে থেকে তারাশঙ্করও পরম বন্ধুর কর্তব্যপালন করেছেন।

বেশ কিছুকাল আগের আর এক দিনের কথা মনে পড়ছে। শনিবারের চিঠি বাড়িতে এসেছে। যথারীতি সংবাদ-সাহিত্য বিভাগটিতেই প্রথমে চোখ বুলোতে গিয়ে দেখি সে-সংখ্যায় 'সাগর থেকে ফেরা'র কবি রবীন্দ্র ও আকাদামি পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রেমেনদা আক্রান্ত। পরদিনই সকালে সজনীদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রেমেনদা আকাদামি পুরস্কার পেয়েছেন সে তো আনন্দের কথা, ওঁকে অমন করে আঘাত করলেন কেন?' মুহূর্তেক ভেবে জবাব দিলেন সজনীকান্ত, 'বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান প্রেমেন। ওর সৌভাগ্যে আমরা নিশ্চয়ই খুশী। কিন্তু এত বেশী পেয়ে এত কম দিলে তা আমরা সহ্য করব কেন? যে পরিমাণ সম্মান ও পেয়েছে ঠিক সেই পরিমাণ প্রতিদান ওকে ওজন করে দিতে হবে। আমাদের যা পাওনা তা আদায় করব না? প্রেমেনের কাছে আমি আরও অনেক বেশি চাই।' এ কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই, কোন ঈর্ষা নেই। এ সম্পূর্ণ আত্মীয়তার দাবি, নিতান্ত আপনার জনের কাছে অন্তরের চাহিদা।

দুজন অনুজ সাহিত্যিককে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন সজনীকান্ত কয়েক বছর আগে। তাঁর পক্ষে তা শোভন হয় নি, এরূপ মত প্রকাশ করলে তিনি তার উত্তরে আমায় বলেছিলেন, 'এমনি দু-চারটে কড়া কথা বলার অধিকার যদি আমার না থাকে তা হলে আমি আবার কিসের অভিভাবক?' এখানেও সেই পরম আত্মীয়তারই সুর। একেবারে অভিভাবকশ্রেণীর আত্মীয়! সে অভিভাবক হয়তো একটু প্রাচীনপন্থী, তা হলেও নব্যকারের কল্যাণপন্থী। আর কল্যাণপন্থী বলেই ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না, সাহিত্য ও সমাজে যে কোন-রকম অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াতেন এবং বাঙালীর মর্মপীড়ার কারণ ঘটলেই তিনি অধীর হয়ে উঠতেন। বছর কয়েক আগে 'যুগান্তরে' আত্মসমাক্ষামূলক 'বাঙালী কোথায়' আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ করা হলে সজনীকান্ত মৌখিক ভাবে এবং শনিবারের চিঠির মাধ্যমে যে ভাষায় তাকে সাধুবাদ ও সমর্থন জানিয়েছিলেন তাতে আরেকবার তাঁর অকৃত্রিম বঙ্গ-প্রীতি ও বাঙালী-প্রীতির পরিচয় পেয়েছিলাম। এ সবই তো প্রকৃত আত্মজনের লক্ষণ।

এমন আত্মীয়কেও অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন। অকপটে স্বীকার করি, আমিও একসময়ে সজনীকান্তকে ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির গ্রন্থিমোচন করে যেতে, সমস্ত বিরোধ বিসম্বাদ মিটিয়ে যেতে। দুঃখের কথা, সে সময় তিনি পেলেন না। তাঁর সেই মহৎ ইচ্ছার কথা বিশেষভাবে জানতে পেরেছিলাম বলেই সজনীকান্তের মহত্ত্ব আমার কাছে এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে বিষয় নিয়ে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। সেই মহৎ মানুষকে প্রণাম জানিয়ে আজ এখানেই থামছি।

—

শনিমণ্ডলীর ছবি
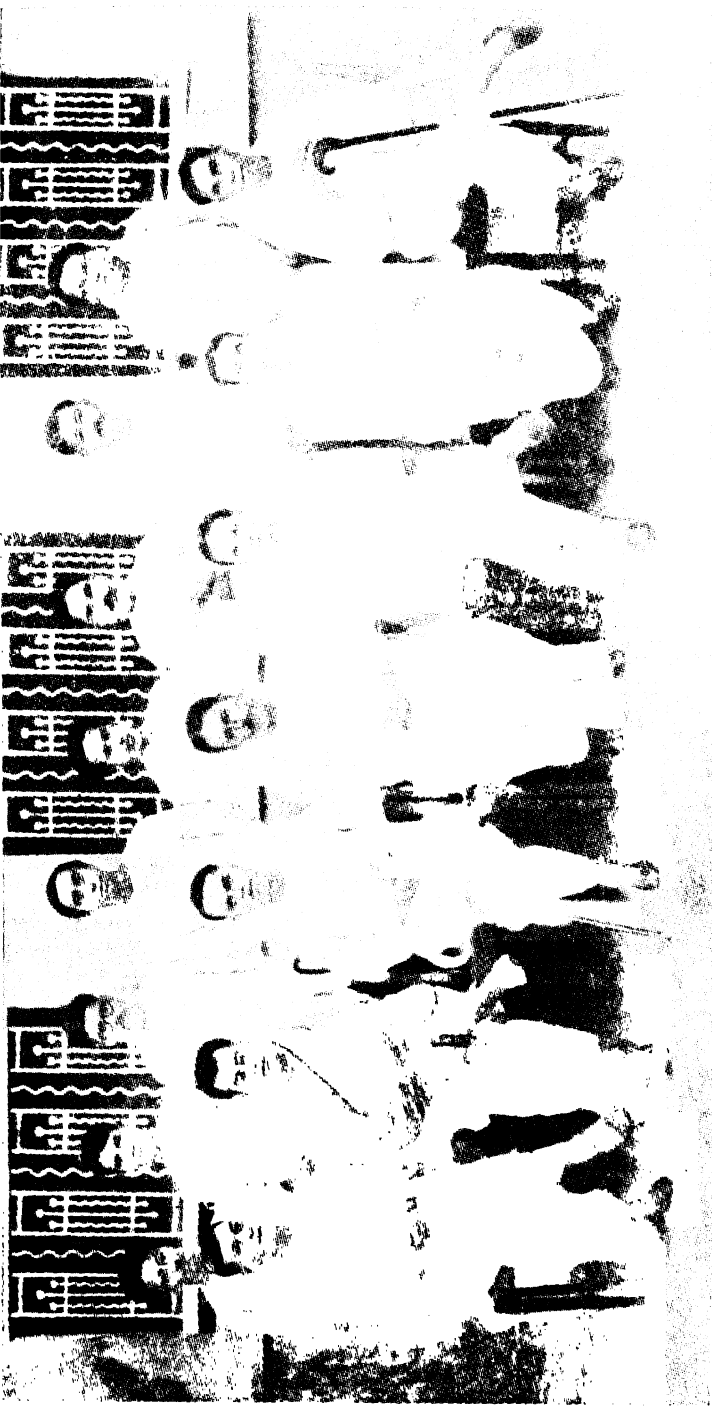
দণ্ডায়মান : নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, হরিপদ রায়, গিরিজাপতি চক্রবর্তী।

উপবিষ্ট : সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রঙীন হালদার, মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনকালী রায় (কবিরাজ)।
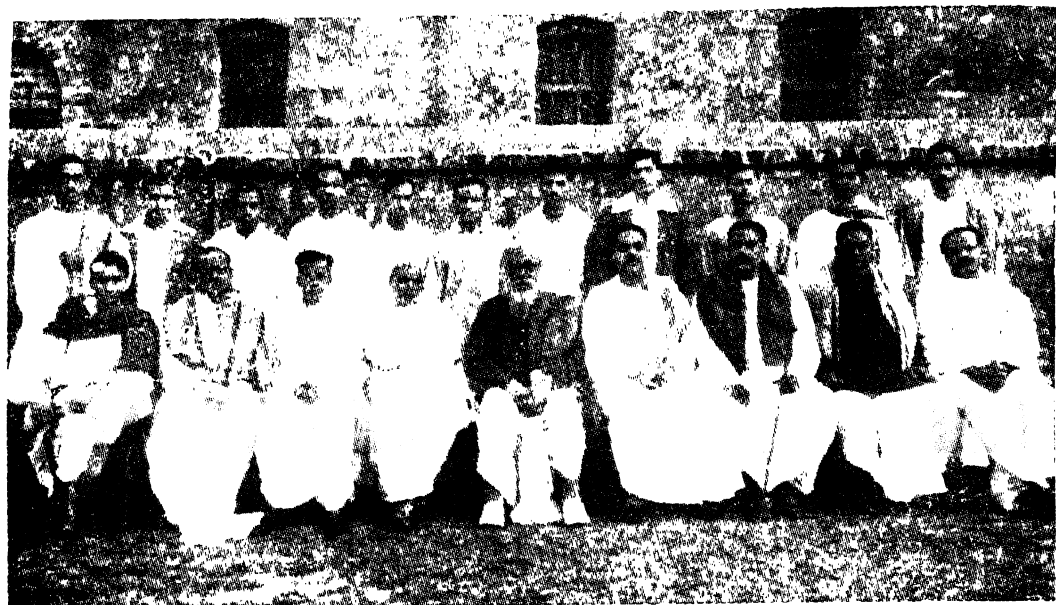
প্রবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাম হইতে ২য়) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য়) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (৫ম) সজনীকান্ত দাস (ষষ্ঠ) নরেন্দ্র দেব (৭ম) ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৮ম) । শিবপুর সাহিত্য পরিষদে ।
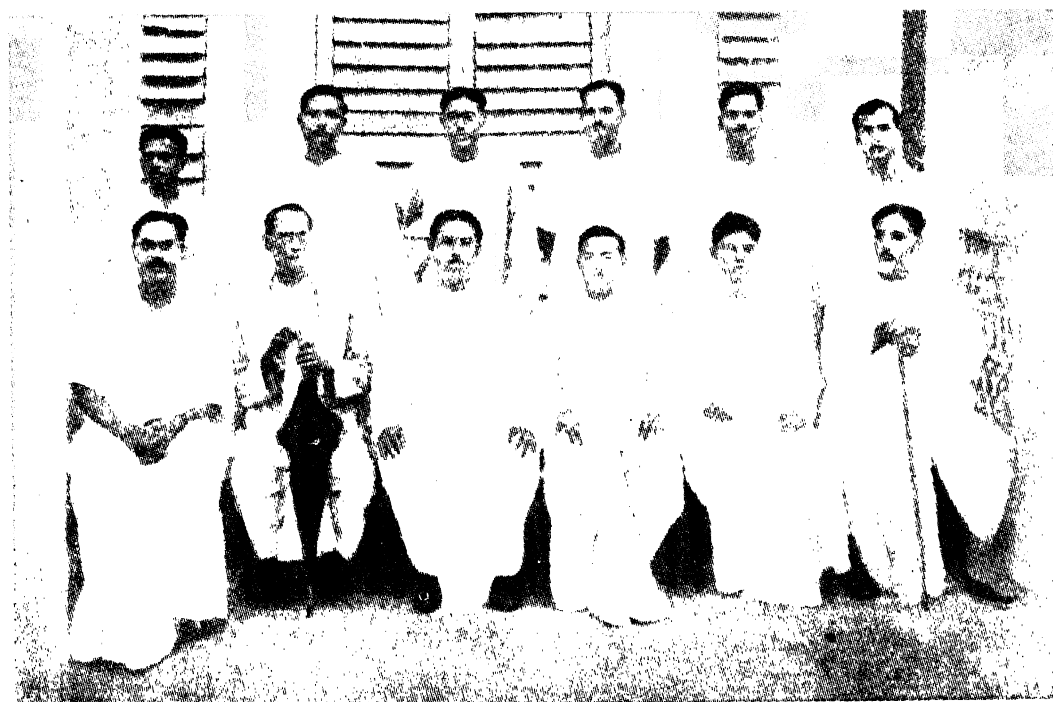
মোহিতলাল মজুমদার, সুকুমার সেন, পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি সাহিতিক বন্ধুজন সহ

[illegible]

সপরিবারে সজনীকান্ত

উপবিষ্ট বাম হইতে : ১ম কন্যা উমা, দৌহিত্রী মিতু সহ সজনীকান্ত, পৌত্র প্রভঞ্জন সহ পত্নী সুধারাণী, পুত্রবধূ রাণু।

দণ্ডায়মান বাম হইতে : ৮ম কন্যা সোমা, দৌহিত্র দীপু, পুত্র রঞ্জন, প্রথম জামাতা বিমলকুমার, দ্বিতীয় জামাতা শিশিরকুমার, ৩য় কন্যা মীরা, ৫ম কন্যা নীলা, দৌহিত্র খোকা, ২য় কন্যা রমা।

মনোজ বসু, সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী,
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামী।
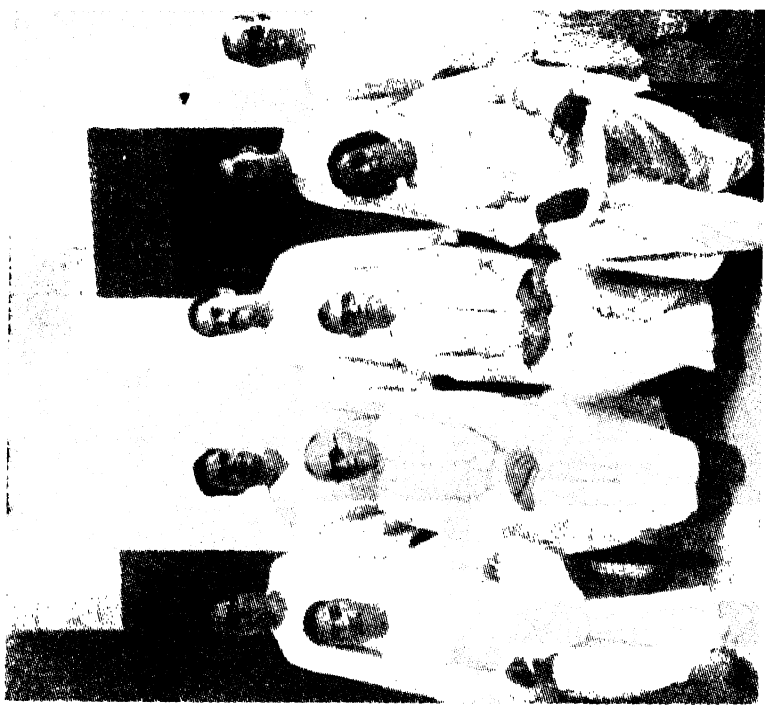
সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
রামকমল সিংহ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাদার দোঁতেন,
হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত সরকার।

(১) মোহিতলাল মজুমদার ও দাদা মশাই কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সহ সজনীকান্ত।

(২) তারাশঙ্কর, বনফুল, সজনীকান্ত ও শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়।

(৩) লালন ফকীরের ভিটাতে সজনীকান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জগদীশ ভট্টাচার্য।

(৪) 'সাহিত্য-তীর্থে' সজনীকান্ত।

(৫) করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সজনীকান্ত।

সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর ও বনফুল

সাহিত্যিক সমাবেশে সজনীকান্ত

সজনীকান্তের শেষ ছবি ফোটো শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
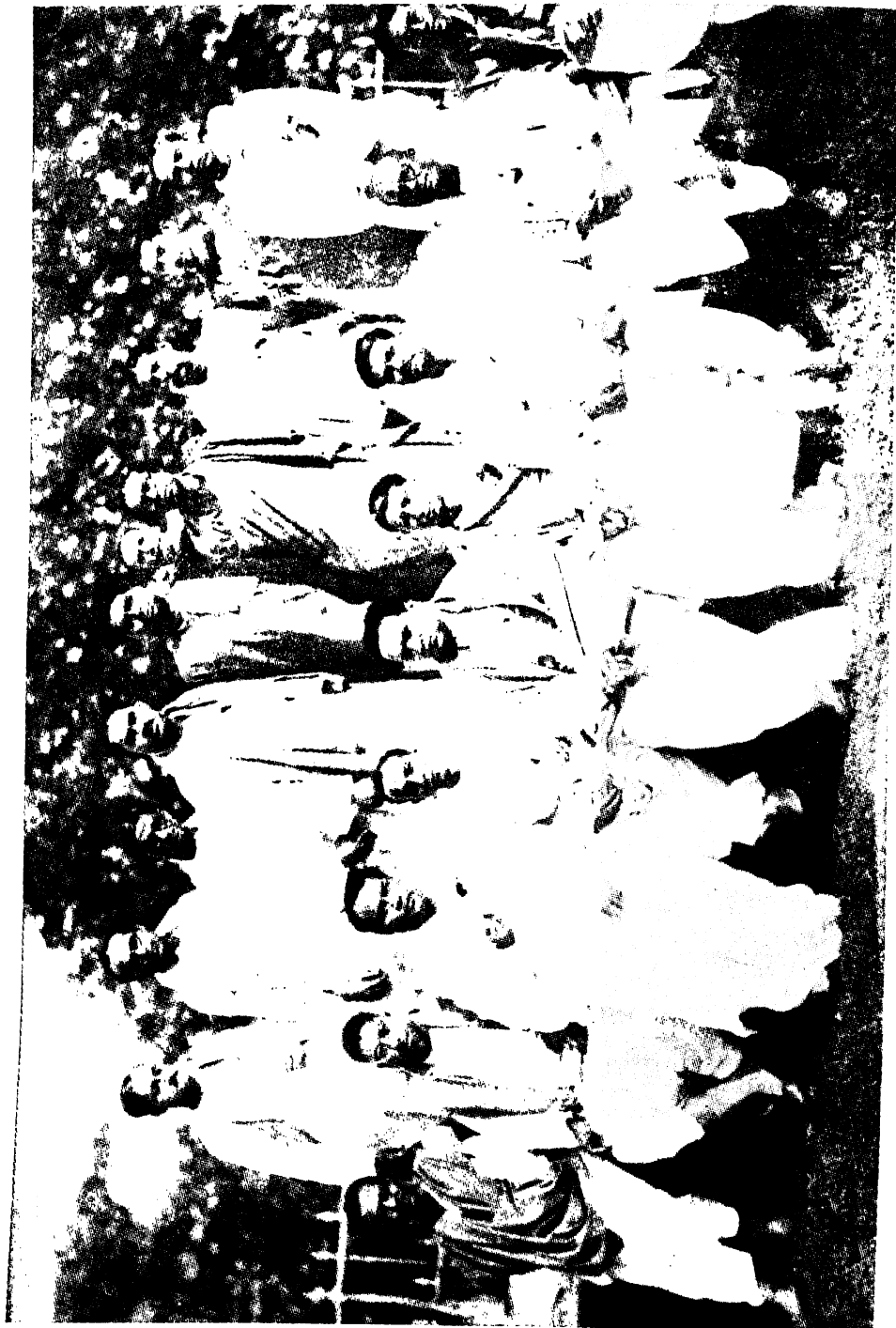
হরিহর শেঠ মহাশয়ের বাগানে বহু সাহিত্যিক পরিবৃত্ত সজনীকান্ত (দণ্ডায়মান বাম হইতে ৪র্থ)।
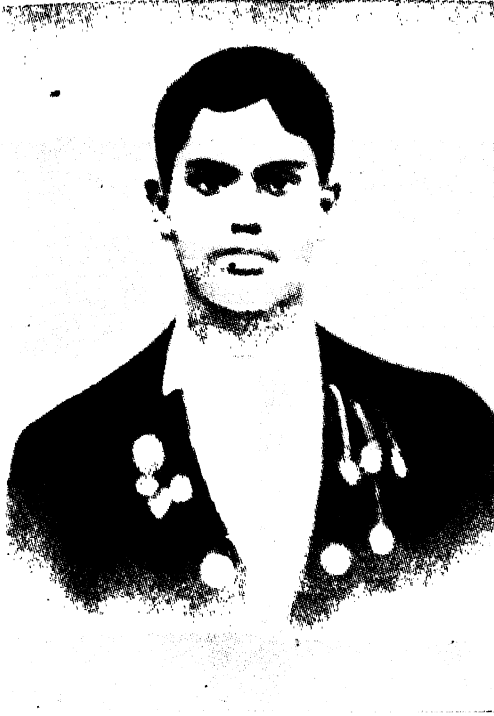
সজনীকান্তের বিভিন্ন বয়সের চারখানি চিত্র

সম্পাদক-সম্মেলনে জওহরলাল নেহরুর সহিত সজনীকান্ত (বাম হইতে ২য়) ১৩. ৭. ১৯৪৯

রাজ্যপাল সি. রাজাগোপালাচারী সন্নিধানে সম্পাদক ও সাংবাদিকগণের মধ্যে সজনীকান্ত (রাজাজীর দক্ষিণে)

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক সজনীকান্তের সম্বর্ধনা—১৬ই আগষ্ট ১৯৫৯।
সভাপতি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), উদ্বোধক যাদবেন্দ্রনাথ পাজা।
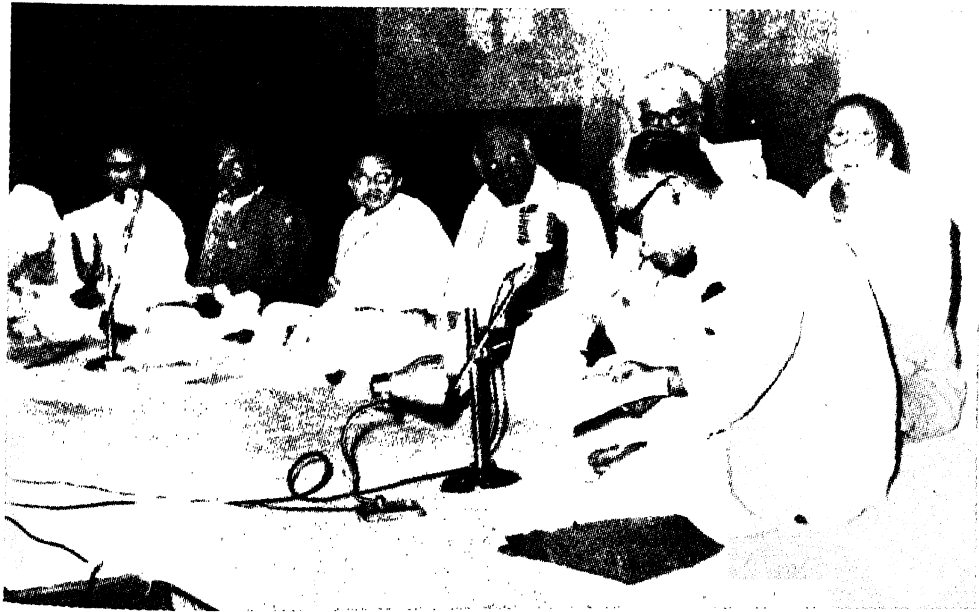
নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখার সভাপতিরূপে ভাষণদানরত
সজনীকান্ত (২৩শে ডিসেম্বর ১৯৬১)

শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত সভায় লালগোলাধিপতি ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় সজনীকান্তকে রৌপ্যনির্মিত দোয়াত-দানি উপহার দিয়া সংবর্ধিত করিতেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দক্ষিণারঞ্জন বসুর জন্মোৎসব সভায় সভাপতির ভাষণদানরত সজনীকান্ত।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬

সাহিত্যপ্রাণ সজনীকান্ত

নারায়ণ চৌধুরী

সাহিত্যেই হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই হোক, ওই ক্ষেত্রের কোন শক্তিশালী পুরুষ যখন বিগত হন, তখন তাঁর বিয়োগজনিত বেদনা যে শুধু ওই বিশেষ ক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল মানুষগুলির মনেই শূন্যতার সৃষ্টি করে তাই-ই নয়, সমগ্র জাতির মনে একটা বিশাল ক্ষতির সৃষ্টি করে। এ কথা সুবিদিত হলেও নূতন করে তার যথার্থতা ও কারুণ্য উপলব্ধি করলুম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাংগ্রামিক-বীর, কবি সমালোচক সম্পাদক গবেষক সাহিত্য ও সাহিত্যিক-সুহৃৎ সজনীকান্তের, আমাদের একান্ত আপনার জন সজনীদার তিরোধান-লগ্নে। সমগ্র দেশের মানুষ একটি জনে সংহত হয়ে যেন এই শক্তিমান পুরুষের মর্ত্যধাম থেকে আকস্মিক বিদায়ের মুহূর্তে পরস্পরের দুঃখের ভাগী হয়ে অশ্রুবিসর্জন করল। দলমত-নির্বিশেষে প্রতিটি সংবাদপত্র, প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ও সংগঠন, প্রতিটি সাহিত্য-শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা 'সামান্য' শোকের মিলিত ভূমিতে দাঁড়িয়ে একযোগে স্বীকার করলেন, চলমান বাংলা সাহিত্যের দরবার থেকে এমন একজন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময় পুরুষ চলে গেলেন, যাঁর অভাব আর সহসা পূরণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। কোন কালেই কি তা পূরণ হবে?

শেষের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন সম্বলিত বাক্যটি ব্যবহারের একটি কারণ আছে। সজনীকান্ত শুধুই তো ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুরুষ। এ রকম ব্যক্তিত্বের ছাঁচ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে পূর্বে কেউ আর আবির্ভূত হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। পরেও কেউ হবেন কিনা বলতে পারি না। কারও কারও স্মৃতিতে এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের নাম মনে আসতে পারে; কেউ কেউ সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নামোল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু এ সকল প্রতিতুলনা নির্ভরযোগ্য নয়। কেন না, এঁদের সঙ্গে সজনীকান্তের কিছু-কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সে সাদৃশ্য খুব গভীরতলশায়ী নয়। উল্লিখিত পাঁচজনের ভিতর শেষোক্ত চারজন কবি ছিলেন না, আর এ কথা তো খুবই স্পষ্ট যে, সজনীকান্তের কবি-পরিচয়টিই হল তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়। তিনি মূলতঃ কবি ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সেতুস্বরূপ ছিলেন এবং বহু নবীন লেখককে তাঁর সংবাদ-প্রভাকরের পত্রচ্ছায়ার নীচে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠাদানে সহায়তা করে গেছেন। সেই দিক থেকে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত অবশ্যই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের কবি-পরিচয়েও কিছু মিল আছে। কিন্তু সজনীকান্তের সাংগ্রামিকতা ও নির্ভীকতা? তার কি কোন তুলনা আছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে? এত বড় অকুতোভয় সমালোচক বাংলা সাহিত্যে আর কেউ হয়েছেন বলে তো আমি জানি না। অন্যায়ের প্রতিরোধের সূত্রে তিনি অতিবড় মহাজনকেও আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। অনেক মহারথীই তাঁর শরাঘাতে কোন-না-কোন সময় ঘায়েল হয়েছেন।

অনেকে সজনীকান্তের এই সমালোচনার ন্যায্যতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ রুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু আমি তো এই আচরণে অন্যায় কিছু দেখতে পাই নে। ন্যায়বুদ্ধি যদি মানুষের অবলম্বনীয় ধর্ম হয়; জাতিপ্রেম যদি ব্যক্তিপ্রেমের চেয়ে বড় হয়, দেশজ ঐতিহ্যের শুভ সংস্কার ও শ্রেষ্ঠ সনাতন মূল্যবোধগুলির সংরক্ষণ যদি কারও জীবনের প্রধান ব্রত হয় তবে তো এই রকমের আচরণ মাঝে মাঝে অপরিহার্য হয়ে পড়েই— বিশেষ, যে-মানুষ সমালোচনা ব্রতধারী তেমন মানুষের পক্ষে। সজনীকান্ত অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে চাইতেন না, সে কি তাঁর চরিত্রের ত্রুটি, না তাঁর চারিত্রিক ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ? যা-কিছু বিজাতীয়, উচ্ছৃঙ্খল, ও জাতীয় সম্ভ্রমের হানিকারক তার প্রতি তাঁর ক্ষমাহীন মনোভাব কোথায় আমাদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা

পাবে, তা নয়, ওই সূত্রেই তাঁকে জীবনে সমালোচনা সইতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। আমাদের এই পুতু-পুতু সমাজে পরস্পরের অন্যায়ের প্রতি চোখ বুজে থেকে পরস্পরকে পিঠচাপড়ানি আর বাহবার ঠেকো দিয়ে চাপিয়ে রাখাই হল রীতি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুরূহ পথটি বেশীর ভাগ মানুষই সযত্নে পরিহার করে থাকেন। লেখকদের ভিতর এই-জাতীয় পরিহার-প্রবণতা আরও বেশী প্রবল, কেন না লেখকদের অধিকাংশ অর্থে ও যশে নিবদ্ধদৃষ্টি, এবং পাছে তাঁদের এই মূল বাসনা চরিতার্থতার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় সেই কারণে যে-কোন মূল্যে এঁরা সমাজের স্থিতাবস্থা সংরক্ষণে তৎপর। সংগ্রামের একটি অর্থই তাঁদের জানা—তা হল 'জীবন-সংগ্রাম' অর্থাৎ পাকেচক্রে অর্থ ও খ্যাতিলাভের জন্য সংগ্রাম; সংগ্রামের অন্য পরিভাষা তাঁদের চোখে অস্পষ্ট, প্রায় অগোচর। এই সর্বব্যাপী নিঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয়তার পরিবেশের মধ্যে বসে সজনীকান্ত এককভাবে আপসহীন লেখনীতে দিনের পর দিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন—তা লোকের সহ্য হবে কেন?

তাই তো সজনীকান্তের ব্যক্তিত্বের এই দিকটি তাঁর জীবদ্দশায় স্বীকৃত হলেও সমাদৃত হয় নি। অথচ এই সমাদর তাঁর পাওনা ছিল বলে আমরা মনে করি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এককভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া দৃশ্য হিসাবে খুবই মনোহর সন্দেহ নেই, এবং ওই সংগ্রামকারী বিগত হওয়ার পর তাঁর ওই সাংগ্রামিকতাকে কেন্দ্র করে আমাদের চমৎকৃত মনোভাব প্রশংসায় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তা-ও জানি; কিন্তু হায়, ওই প্রশংসার খানিকটা যদি সংগ্রামকারী তাঁর জীবদ্দশায় পেতেন? সমধর্মীদের নৈতিক সমর্থনের মূল্য যে কত তা যাঁরাই আদর্শবাদী সংগ্রাম করেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, সজনীকান্ত তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে এই সমর্থন আশানুরূপ মাত্রায় পান নি। অনেকেই দূর থেকে তাঁর রচনাশক্তির তারিফ করেছেন, কিন্তু তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খুব কম লোকই। সমাজ-সংস্কার চেষ্টায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেমন ছিল একক সংগ্রাম, তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধে সজনীকান্তেরও ছিল একক সংগ্রাম। দুইয়েরই স্বভাবে বলিষ্ঠতা ছিল প্রচুর, এবং তাঁদের আত্মবিশ্বাসও ছিল তেমনি। তাঁদের শক্ত ধাতুতে গড়া ব্যক্তিত্বের জেদকে নোয়ানো অসম্ভব ছিল।

কিন্তু সজনীকান্ত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সাংগ্রামিকতার প্রকৃত মূল্য দেশবাসীর কাছ থেকে না পেলেও তাঁর পরলোকগমনের পর সকলেই অনুভব করছেন, বাংলা-দেশের জনজীবন থেকে একটা মানুষের মত মানুষের অন্তর্ধান ঘটল। শুধু সাহিত্যই যে তাঁর অভাবে দরিদ্রতর হল তা ই নয়, বাঙালী সমাজেরও একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির শূন্যতা ঘটল। আমাদের মধ্যে দেশবাসীর মানসিকতাকে সুস্থ খাতে চালিত করতে পারে এমন ক্ষমতার অধিকারী মানুষ তো খুব বেশী নেই। সবাই পথ চলতে গিয়ে খানা-খন্দের মধ্যে হোঁচট খেয়ে মরছে, কে কাকে নির্দেশ দেবে? এই রকম সর্বব্যাপী মাঝারিপনার মাঝখানে সজনীকান্তের মত দু-চারজন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী লোক জন্মান বলেই রক্ষা, নয় তো কবে দেশ ও সমাজ ছারেখারে যেত।

গত শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে মহান্ স্রষ্টার ভূমিকার পাশে পাশে সমাজের চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন; সজনীকান্ত তত বড় স্রষ্টা না হলেও সমাজচালকের দায়িত্বটি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ নিষ্ঠা ও অকুতোভয়তার সঙ্গেই পালন করে গেছেন বলে আমরা মনে করি। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর এই যোগ্যতা ও কৃতি অনেকে বাইরে স্বীকার না করলেও মনে মনে যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেটা তাঁর লোকান্তরগমনের পর বিভিন্ন মহল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা যায়।

বাস্তবিক, আমার একটা ভুল ভাঙল। দেশের অভ্যন্তরে নানা মহলের মানুষদের ভিতর সজনীকান্তের যে এত গুণগ্রাহী ছিলেন আমার তা জানা ছিল না। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বহু বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। বলিষ্ঠ, এবং কখনও কখনও অপ্রিয়, মতামত প্রচারের দ্বারা তিনি অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বিশেষতঃ, 'আধুনিক সাহিত্য' নামধেয় বিশেষ বর্গের সাহিত্যের যাঁরা প্রবক্তা ও প্রচারক, তাঁরা তাঁকে তাঁদের মতাদর্শের বিরোধীজ্ঞানে সর্বপ্রকারে তাঁর প্রতিকূলাচরণে সচেষ্ট ছিলেন। এমন

কি সজনীকান্ত যে সকল লেখকের আশ্রয় ও উৎসাহদাতা ছিলেন, সেই সকল লেখকদের শক্তিমত্তা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের খাটো প্রতিপন্ন করতে এঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। আধুনিক কবিতার নামে যাঁরা হিং-টিং-ছট রচনা করেন তাঁরা সজনীকান্তের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তাঁদের এই বৈরিতা অকারণ নয়। এই সেদিনও সজনীকান্ত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কাব্যশাখার সভাপতির ভাষণে ওইসব হিং-টিং-ছটওয়ালাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। সংবাদপত্রীয় লেখকদেরও তিনি নানা কারণে বিরাগ অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু দেখা গেল, সব প্রতিকূলতাই মৃত্যুর সঙ্গে ধুয়ে-মুছে যায়। সজনীকান্ত যে একজন শক্তিধর পুরুষ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন যথার্থ প্রেমিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও মর্যাদারক্ষাকারী ছিলেন, আজ তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন। স্বীকারকারীদের মধ্যে তাঁর গুণানুরক্ত মিত্র ও গুণদর্শনে উদাসীন বিরোধী সকল স্তরের সাহিত্যসেবীরাই রয়েছেন। সকলেই এই কথা আজ মনে-মনে উপলব্ধি করছেন যে, সাহিত্যকে এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসার ক্ষমতা নিয়ে খুব কম লেখকই সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। আমরা অন্য দশটা কাজের ফাঁকে সাহিত্যচর্চা করি, অবসর পাই তো লিখি, নয়তো বৈষয়িকতাতেই নিমগ্ন থাকি। কিন্তু সজনীকান্তের কাছে সাহিত্য এইরূপ অবসর-বিনোদনের ক্ষেত্র ছিল না। সাহিত্য তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-বায়ুর তুল্য ছিল। যদিও বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে তিনি তাঁর জীবনারম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিজ্ঞানাসক্তি সাহিত্যাসক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। (এইখানে প্রসঙ্গতঃ বলি, সজনীকান্তের গদ্যের পরিচ্ছন্ন, যথাযথ-অর্থবহ ভাবাতিরেকবর্জিত সমিত চালটি তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী থেকেই পেয়েছিলেন।)

তাঁর সমগ্র জীবনের অবলম্বন ছিল সাহিত্য। আর ওই সূত্রে সাহিত্যসেবীমাত্রকেই তিনি কী ভালই না বাসতেন! এই ক্ষেত্রে তাঁর চোখে শত্রু-মিত্র জ্ঞান ছিল না। যাঁরাই সাহিত্যের সেবা করেন তাঁরাই তাঁর প্রীতি ও শুভেচ্ছার পাত্র ছিলেন। তাঁদের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন এবং তাঁদের মঙ্গলসাধনের জন্য সতত চেষ্টা করতেন। অনেক লেখক দূর থেকে তাঁর দুর্ধর্ষ সাংগ্রামিক রূপের কিংবদন্তীতে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর কাছ ঘেঁষতে ভরসা পেত না। কিন্তু যাঁরাই একবার তাঁর সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরাই জানেন কী পরম অনুরাগে তিনি তাঁদের গ্রহণ করতেন। সজনীকান্তের আতিথেয়তার মধ্যে এমন একটা আত্মীয়তার আশ্বাস ছিল যাতে মনে বল পাওয়া যেত। বস্তুতঃ, সাহিত্যসেবীর এতবড় আত্মীয় কি আর মিলবে আমাদের সাহিত্যে?

কোন সাহিত্যসেবীর গুণগ্রহণে তিনি সেই সাহিত্য-সেবীর রাজনৈতিক মতবিশ্বাসকে আদৌ হিসাবের মধ্যে গণ্য করতেন না, তাঁর সাহিত্যগুণেরই তিনি অবিমিশ্র অনুরাগী ছিলেন। আমার সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রাজনীতি বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষভাবে লেখকের ভিতর এইরূপ গুণদর্শনের ক্ষমতা আজকের দিনে নিতান্ত বিরল হয়ে এসেছে এবং সজনীকান্তের এই দুর্লভ ক্ষমতাই একটা প্রমাণ যার বলে বলা যায়, সজনীকান্ত ছিলেন ষোল-আনা সাহিত্যপ্রাণ এবং সাহিত্যের মাপকাঠিতেই তিনি সাহিত্যিককে বিচার করতেন, ওই বিচার-ক্রিয়ার মধ্যে অন্য প্রসঙ্গ এনে বিচার গুলিয়ে ফেলতেন না। রাজনীতিতে নিজে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক, কিন্তু তাঁর ওই রাজনৈতিক বিশ্বাসের পক্ষপাত কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবযুক্ত লেখকদের শক্তিমত্তাকে স্বীকৃতিদানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরভুক্ত কবি বিমল ঘোষের কাব্যশক্তির তিনি একজন অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পরিজনদের সাহায্যের জন্য যা করেছিলেন তার স্মৃতি আশা করি এখনও সাহিত্য-মহলে ফিকে হয়ে যায় নি। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক কংগ্রেসী রীতিনীতির নিতান্ত বশংবদ অনুগামী নয়, অথচ এই দীন লেখকটিকে সজনীকান্ত কী প্রাণভরেই না গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে স্নেহদানে কার্পণ্য করেন নি। সাহিত্যিক প্রতিপক্ষীয়দের ভিতর যাঁরই মধ্যে তিনি শক্তি বা অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রেমের পরিচয় পেয়েছেন তাঁকেই তিনি অকুন্ঠিতচিত্তে প্রশংসা করে গেছেন। সাহিত্যের সেবকমাত্রেরই তিনি ছিলেন বন্ধু, তা সেই

সেবক স্বপক্ষীয়ই হোন আর বিপক্ষীয়ই হোন। এমন নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যপ্রাণতা অদ্যকার দিনে দুষ্প্রাপ্য।

সজনীকান্তের সত্যকথনের স্পষ্টতার জন্য অনেকে মনে মনে তাঁর উপর বিরূপ থাকলেও সকলেই যে তাঁর শক্তি সাহস ও ব্যক্তিত্বের সমঝদার ছিল সে কথা বোঝা গেল তাঁর লোকান্তরপ্রাপ্তির পর। বিপক্ষদলীয়েরাও এই সদ্যলোকান্তরিত বীরের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মিত্র এবং অমিত্র দুই পক্ষই মিলিত হয়েছেন শোকের পবিত্র বৈরাগ্য-ভূমিতে। অমিত্ররাও যে তাঁর প্রতি তাঁদের পূর্বতন প্রতিকূল মনোভাব ভুলে গিয়ে শ্রদ্ধাপ্রকাশে অবারিত হয়েছেন, তার কারণ তাঁরা মনে মনে জানতেন সজনীকান্ত ব্যক্তিগত অসূয়ার বশে তাঁদের আঘাত করেন নি, সাহিত্যের ও জাতির কল্যাণ চিন্তা করেই কখনও-কখনও তাঁদের প্রতি বাম হয়েছেন। সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁর ওই অপ্রিয়ংবদের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ।

সাহিত্যবিচারণায় তিনি যে অসূয়ালেশহীন ছিলেন তার প্রমাণ খোঁজবার জন্য আমাদের তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি অন্ধি-সন্ধি করে বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন নেই; পক্ষ-প্রতিপক্ষনির্বিশেষে সাহিত্যিকমাত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারেই সেটি স্বপ্রকাশ। দুদিন আগেও যে লেখকের তিনি সুতীব্র সমালোচনা করেছেন সেই লেখকের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়েছে, কী অমায়িক ভাবেই না তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছেন! যেন এই লেখকের সঙ্গে তাঁর কোন কালেই কোন অপ্রীতির উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয় নি এমনিভাবে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। এতে ভিতর ও বাহিরের অনৈক্য বোঝায় না; বোঝায় শুধু এই কথা যে, সাহিত্যের মূল্যাঙ্কন করতে বসে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যেত, সাহিত্যের আদর্শই হয়ে উঠত তাঁর চোখে সর্বেসর্বা। সাহিত্য ছিল তাঁর কাছে ব্রতস্বরূপ. সেই ব্রতের পবিত্রতায় অশুচিতার স্পর্শ লাগলে তিনি অনমনীয় হয়ে উঠতেন, তখন মিত্র-অমিত্র কাউকে রেয়াৎ করতেন না।

এমনিই ছিল তাঁর মনোভঙ্গী। এই মনোভঙ্গীর রহস্যটি যাঁরা জানতেন তাঁরা তাঁর আঘাতে সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ হলেও তাঁদের আঘাতের বেদনা দূর হতেও বেশী দেরি হত না। সজনীকান্তের অসাধারণ বন্ধুত্বের ক্ষমতার টানে সমালোচক এবং সমালোচিত পুনর্মিলিত হতেন। যে সব লেখকের সঙ্গে সজনীকান্তের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না অথচ যাঁদের তিনি সাহিত্যজীবনের কোন-না-কোন পর্বে সমালোচনা করেছেন, তাঁরাও তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অবগত ছিলেন বলেই সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি কখনও বিদ্বিষ্ট হতে পারেন নি। এ কথার প্রমাণের যদি প্রয়োজন হয়, সজনীকান্তের পরলোকগমনের পর নবীন-প্রবীণ মিত্র-অমিত্র সকল স্তরের সাহিত্যসেবীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক শোকানুভূতিতে সেই নিঃসংশয় প্রমাণ মিলল।

অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সজনীকান্তের চলে যাওয়াকে "the fall of a mighty tree-"র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাস্তবিক তাই-ই। সুবিশাল অরণ্যভূমিতে একক মহিমায় সমুচ্চভাবে দণ্ডায়মান সুবিশাল বনস্পতির পতনের মতই তাঁর দেহের এই আকস্মিক বিলয়। স্বভাববৈশিষ্ট্য বাদ দিলেও, তাঁর সমুন্নত দেহযষ্টি ওই বনস্পতির উপমাকেই শুধু মনে জাগিয়ে তোলে। কত কত মানুষকে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পত্রচ্ছায়ার নীচে আশ্রয় দান করেছেন—ওই দিক দিয়েও এই উপমা সার্থক। উপমাটিকে অন্য দিকেও সম্প্রসারিত করা চলে। যখন কোন মহাবনস্পতির পতন হয় তখন যেমন সমগ্র বনভূমি সেই পতনের আলোড়নে শিহরিত হয়ে ওঠে, বৃক্ষরাজির শাখাপ্রশাখায়িত পত্রগুচ্ছের মধ্যে একটা হুতাশের মর্মর বয়ে যায়, তেমনি সজনীকান্তের তিরোধানে বাংলাদেশের সাহিত্যসেবীমহলে অনুরূপ এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যের মনন অনুশীলন প্রচারণা আগেরই মত চলতে থাকবে তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু হায়, সেই grand old man of the opposition-কে তো আর দেখা যাবে না! সেই মানুষটি তো আর রইলেন না, যিনি ক্ষুরধার ব্যঙ্গের কশাঘাতে লেখকদের সর্বপ্রকার স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমকে শাসন করতে জানতেন এবং লেখকদের শক্তি ও উদ্যমকে সাহিত্যের সুস্থ প্রবণতার খাতে চালিত করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করতেন না। বয়সে হয়তো তিনি বৃদ্ধ হন নি, কিন্তু বিদ্যায় পরিপক্ক হয়েছিলেন, অভিজ্ঞতায় ততোধিক, সাহিত্য ও সমাজ-কল্যাণ কর্মে তাঁকে একজন বর্ষীয়ান প্রাজ্ঞেরই মর্যাদা দেওয়া যায়। তিনি ভূয়োদর্শী ছিলেন, তাই তিনি সম্যক্‌দর্শীও ছিলেন। আর এ কথা বিচক্ষণমাত্রই জানেন যে সম্যক্‌দর্শিতা ও সমদর্শিতা একই শব্দের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র।

বয়সের সঙ্গে সজনীকান্তের মন সমদর্শিতার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকেছিল। তাঁর চোখে উচ্চ-নীচের ভেদ ছিল না। জমিদার অভিজাত ধনী শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেমন তাঁর একাধিক বন্ধু ছিল, তেমনি অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও তাঁর সৌহার্দ্য বিস্তৃত ছিল। সকল স্তরের মানুষের জন্য তাঁর দরজা সদা-অবারিত ছিল। লেখকের মূল্যায়নে ও তাঁর শক্তিমত্তার স্বীকৃতি দানে তিনি ধনী নির্ধনের তফাত করতেন না, যা আজকাল পরিতাপের বিষয়, অনেকেই করে থাকেন। মোটর-বিহারী লেখককে যেমন তিনি সমাদরে গ্রহণ করতেন,

তেমনি আন্তরিক সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতেন সামাজিক ও আর্থিক কৌলীন্যের দিক দিয়ে অবজ্ঞাত নিতান্ত দীন অথচ শক্তির প্রতিশ্রুতিযুক্ত লেখককেও। তাঁর উৎসাহ ও আনুকূল্যপ্রার্থী হয়ে কোন লেখক, তা তিনি যতই সামান্য হোন তাঁর দুয়ার থেকে কখনও ফিরে গেছেন বলে শোনা যায় নি। আর কী অপরিসীম ধৈর্য ও সাহিত্যপ্রীতি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কত অখ্যাত-অজ্ঞাত নূতন লেখকের লেখা শুনে গেছেন, বারেকের জন্যও ক্লান্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ এক কঠিন পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যেমন-তেমন মানুষের কর্ম নয়। অথচ সজনীকান্ত কী অবলীলাক্রমেই না ওই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হয়ে যেতেন! বিচক্ষণমাত্রেই বুঝবেন যে, সজনীকান্তের ওই অক্লান্ত ধৈর্যের পিছনে ছিল একটি উদার-বিশাল প্রীতিময় অন্তর। শুধু সাহিত্যের প্রতি প্রীতি নয়, মানুষের প্রতি প্রীতি। সমদর্শিতার দ্বারা ওই প্রীতি মণ্ডিত ছিল। ক্ষমাগুণে তা হয়েছিল মহৎ। স্বীয় মূল্যবান সময়ের উপর অপরের অনুপ্রবেশ মাত্রই আক্রমণাত্মক। এই জুলুম যিনি সহ্য করতে পারেন, বুঝতে হবে তাঁর ভিতর দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—নিঃস্বার্থতা ও ক্ষমাপরায়ণতা। বলা বাহুল্য, স্বার্থবোধের অভাব থেকেই ওই ক্ষমার জন্ম। সজনীকান্তের ভিতর এ দুটি গুণ যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে এসে বারে বারেই সে কথার প্রমাণ পেয়েছি।

আসলে সজনীকান্ত ছিলেন understanding man। লোকের সুবিধা-অসুবিধা সুখ-অসুখ বুঝতেন। কে বিপন্ন কে দুর্বিপাকগ্রস্ত তা চকিতে বুঝে নিতে পারতেন এবং তা বুঝে নিয়ে তার সাহায্যে অগ্রসর হতেন। মূলতঃ, সাহিত্যপ্রেমিক এবং সাহিত্যালোচনায় প্রচণ্ড উৎসাহী হলেও, যে লেখক সাময়িক ভাবে ভীষণ দুর্দৈবের মধ্যে পড়েছেন তাঁর সঙ্গে বসে সাহিত্যালোচনা করে কালক্ষেপ করতেন না, কী হলে তাঁর দুর্দৈবের মোচন হতে পারে সেই প্রসঙ্গই তাঁর আলোচনার মুখ্য স্থান জুড়ে থাকত। তাঁর সেই কল্পনাশক্তি ও অনুমানপ্রবণতা ছিল, যার সাহায্যে তিনি তাঁর সম্মুখস্থ ব্যক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনের কথাটিই সব-আগে অনুমান করে নিতে পারতেন। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, সেইজন্যই সজনীকান্তের ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যটির উপর এতটা জোর দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য অভিভাবকস্থানীয় লেখকেরা যেখানে কতকটা আত্মরক্ষার কারণে কতকটা ঔদাসীন্যবশতঃ নৈর্ব্যক্তিক থেকেই খালাস; সেখানে সজনীকান্ত স্বার্থের বর্মটি মোচন করে আত্মীয়তার স্তরে নেমে আসতেন। এইখানেই তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব, এইখানেই তাঁর চরিত্রের বিশালতা। ইংরেজীতে বলে—The understanding man is the wise man। জ্ঞানী বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিরূপণের এই যদি মানদণ্ড হয় তা হলে সজনীকান্ত যে একজন উচ্চ-পর্যায়ের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

সজনীকান্তের বন্ধুবৎসলতা ছিল অসাধারণ। একবার যাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন, মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন, তাঁর জন্য প্রাণপণ করতেন। বন্ধুর কারণে নিজের স্বার্থ বিসর্জনের দৃষ্টান্ত সজনীকান্তের জীবনে ভূরি-ভূরি। আর প্রধানতঃ এই বন্ধুবৎসলতা ও বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগের কারণেই তিনি নিছক সমালোচকের ব্যক্তিত্ব নিয়েই সংসার থেকে অবসিত হয়ে যান নি, এক শক্তিশালী স্রষ্টা সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যমণির গৌরব নিয়ে তিনি জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'কে কেন্দ্র করে আজ থেকে দু'দশক আগে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন এক সৃষ্টিধর্মী লেখকদলের উদ্ভব হয়েছিল এ কথা আজ সর্বজনবিদিত ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গীভূত। যদিও 'কল্লোল' দলের প্রতিক্রিয়ায় এই দলের আবির্ভাব হয়েছিল, তা হলেও এ বিষয়ে আজ আর মতভেদ নেই যে, শক্তিমত্তায় ও সৃজনী প্রতিভায় শনিবারের চিঠির স্রষ্টা সাহিত্যিকগণ কল্লোলীয় লেখকগোষ্ঠীকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। শনিবারের চিঠির এই লেখক-গোষ্ঠীতে আছেন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, অমলা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমুদ্ধ প্রমুখ কথাকারগণ এবং মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণধন দে, শান্তি পাল, জগদীশ ভট্টাচার্য, উমা রায়, বাণী রায় প্রমুখ কবিগণ এবং আরও অনেকে।

তার অর্থ হল এই যে, সজনীকান্ত শুধুমাত্র স্বয়ং কবি বা সমালোচক ছিলেন না, তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা যথেষ্ট পরিমাণে গঠনাত্মকও ছিল। সৃষ্টিধর্মী নূতন শক্তি-সম্ভাবনাকে লালন ও পোষণ করে তাকে সুপরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত করাও তাঁর কৃত্যের অঙ্গস্বরূপ ছিল। তিনি সাহিত্যের সমালোচকও বটেন, সংগঠকও বটেন। স্টেট্সম্যান পত্রিকায় শনিবারের চিঠির ভূমিকাকে ইংরেজী Saturday Review পত্রিকার ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে এইরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সজনীকান্তের প্রতিভা ছিল মূলতঃ বিরোধধর্মী। কিন্তু এইরূপ প্রতিতুলনা যথার্থ বলে মনে হয় না। নামসাদৃশ্যে সমধর্মিতা অনুমান করা ছাড়া এই প্রতিতুলনাকে বেশীদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। উনিশ শতকীয় ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধাচরণে স্যাটারডে রিভিয়্যু পত্রিকার ভূমিকা অগ্রণী ছিল এবং ওই খাতেই তার সকল

চেষ্টার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু শনিবারের চিঠি সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। সে একই সঙ্গে ভাঙার কাজ এবং গড়ার কাজ দুই-ই করেছে। একদিকে তার শাসন ও নাশন; অন্যদিকে তার লালন ও বর্ধন। চিঠির এই দুই ভূমিকার মধ্যে কোন্ ভূমিকাটি মুখ্য সে বিচার সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকাররাই করবেন।

আরও যেটা তাঁদের করণীয় তা হল সজনীকান্তের কাব্যশক্তির ও সমালোচক-প্রতিভার পরিমাপ। সে চেষ্টা এখানে আমি করব না। শোকের পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক ও আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় কাতর মনে ওইরূপ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হওয়াই সঙ্গত। শোকের আবেশে বিচারের পারস্পেকটিভ নড়ে যেতে পারে। বিয়োগবিধুরতার আবহাওয়া কথঞ্চিৎ শান্ত ও শমিত হলে এইরূপ চেষ্টা করে দেখা যাবে। তবে সজনীকান্তের মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে পত্রান্তরে ('কালপুরুষ', পৌষ ১৩৬৮) তাঁর কাব্যশক্তি সম্বন্ধে সূত্রাকারে যা লিখেছিলাম সেটি এখানে উদ্ধার করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

> "বাংলা দেশের পাঠকসম্প্রদায় সজনীকান্তকে সম্পাদক, সমালোচক, গবেষক, সাংগ্রামিক রূপে জানেন। তাঁর সাময়িক সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গী আছে তার তীব্রতায় কেউ রুষ্ট কেউ তুষ্ট। কবি হিসাবে যাঁরা তাঁকে স্বীকার করেন তাঁরা তাঁকে মুখ্যতঃ ব্যঙ্গ-কবি বলেই মনে করেন। ব্যঙ্গ-কবিতায় সজনীকান্তের দক্ষতা অপরিসীম এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি তাঁর শত্রুমিত্র সকল স্তরের পাঠককর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু সীরিয়াস মনোভঙ্গীর কবিতায়ও যে তাঁর তুল্যরূপ শক্তি বর্তমান এ কথা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানেন বলে মনে হয় না। সজনীকান্ত যে একটি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল আবেগসমৃদ্ধ কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী তা তাঁর 'রাজহংস' ও 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থদ্বয় একটু নেড়েচেড়ে দেখলেই বোঝা যাবে। সজনীকান্তের কবি-মন চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি আস্থাশীল, মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবনত, দার্শনিক ভাবনায় তথা জীবনবোধে উদ্দীপ্ত, অথচ তাঁর কাব্যের ভাষা ভঙ্গী ও ছন্দ সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক কালোচিত। সেকেলে ভঙ্গীর কবি বলে তাঁকে উড়িয়ে দেবার যো নেই। এই মানুষটির মধ্যে যে কেবল সাংগ্রামিকতাই নয়, প্রভূত হৃদয়বত্তাও বর্তমান সেটি তাঁর কাব্যের এলাকায় প্রবেশ করলেই প্রথম আমরা সার্থক ভাবে অনুভব করতে পারি।"

আর একটি মাত্র প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার উপসংহার ঘটাব। সজনীকান্তের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁর কাছে লেখক নানাভাবে ঋণী। দীর্ঘকাল তাঁকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে এই লেখকের। সেই পরিচয়ের বৃত্তান্ত এখানে পরিবেশন করা যেত, কিন্তু সেই আলোচনা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে মনে করে তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকা গেল। পরে কোন উপলক্ষ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আপাততঃ এই বলেই ক্ষান্ত হই যে, ব্যক্তিজীবনে সজনীকান্ত ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ শৃঙ্খলাপরায়ণ ও কর্মিষ্ঠ পুরুষ। পরিশ্রমের প্রভূত ক্ষমতা ছিল তাঁর, তবে ইদানীং কিছুকাল থেকে তাঁর শরীর বারে বারেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তারের পরামর্শে শ্রমের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। অধ্যয়নে তাঁর গভীর মনোযোগ ছিল। গ্রন্থ ছিল তাঁর বুকের পাঁজরসদৃশ। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা, কর্তব্যশীল অভিভাবক ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধার প্রতি তীব্র মনোযোগপরায়ণ। এমন একটি প্রখর যোদ্ধ-হৃদয়ে সন্তানের প্রতি এত মমতা থাকতে পারে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। তিনি ছিলেন সামাজিক প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বসচেতন, যে কথা আগেই বলা হয়েছে, গভীর ভাবে বন্ধু-বৎসল। কিন্তু এই প্রবল বন্ধু-বৎসলতার মধ্যেও তাঁর মধ্যে সম্প্রতি এক ধরনের নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করেছি। সম্ভবতঃ এই নির্লিপ্ততা আত্মস্থ হবারই চেষ্টার ফল। সজনীকান্ত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর-অভিমুখী হবার জন্য বোধ হয় তাঁর মনের গোপন কোণে আকুতি ছিল। হাস্য-পরিহাস ও রসিকতার আবরণ ভেদ করে এই আকুতি সব সময় বাইরে প্রকাশ না পেলেও অন্তরে তিনি একটা গূঢ় পিপাসা লালন করছেন তা বোঝা যেত। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা প্রায়ই বলতেন। সজনীকান্তের ব্যক্তিত্বের এই গভীর গূঢ় রূপটি সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়—কাব্যই তাঁর ভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল।

—

সজনীকান্ত—প্রণাম

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

ব্যক্তিগত নির্মম বেদনাও অনেকের বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে তার অসহনীয়তা বোধ করি কিছু কমে। সেই আশাতেই কবি, সমালোচক, গবেষক এবং বাংলা সাহিত্যের অতন্দ্র অভিভাবক ও ধারক সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত দাসের স্মৃতি-প্রণামের এই অক্ষম প্রয়াস।

আমার প্রথম জীবনে যে যুগে শনিবারের চিঠি বাংলা সাহিত্যের ভাঙন-রোধ অথবা তার খাতপরিবর্তনের ঐতিহাসিক কার্যে ব্রতী ছিল তখন আমি শনিবারের চিঠির একজন অতি উন্মুখ পাঠক ছিলাম। এবং এত প্রভাবিত হয়েছিলাম যে ক্রমে আমার সাহিত্যিক-জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা হয়ে উঠল শনিবারের চিঠি। কয়েকটি অখ্যাত পত্রিকায় কিছু লেখা প্রকাশের পরে স্থির করলাম শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ না হলে লেখাই বন্ধ করব। ডাকে একটা গল্প পাঠালাম। হল না। কিছুদিন পরে আর একটা পাঠিয়ে সঙ্গে একটা চিঠি দিলাম। লিখলাম যে, গল্পটা যদি প্রকাশের যোগ্য নাও হয়, অন্ততঃ আমার আদৌ আর লেখা উচিত কিনা জানতে চাই। জবাব পেলাম না। কিন্তু লেখা বন্ধ করলাম।

প্রায় আট বৎসর পরে আবার লিখলাম এবং পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু ততদিনে বুদ্ধি আরও পেকেছে—কাজেই ভাবতে লাগলাম যে মফস্বল থেকে পাঠানো গল্প কলকাতায় কেউ পড়েন না এবং তিনিও পড়বেন না। কিন্তু পরের মাসের শনিবারের চিঠি পেয়ে শুধু চমৎকৃত নয়, যেন আঘাত পেলাম। গল্পটা ছাপা হয়েছে। আঘাত পেলাম এই ভেবে যে যদি না পড়তেন, তবে যত ক্ষুদ্র লেখকই আমি হই না কেন, যতটুকুই আমি লিখেছি তাও সম্ভবতঃ লিখতাম না।

এমন তালিকায় উত্তীর্ণ সাহিত্যিকও নিশ্চয়ই অনেক আছেন। তিনি শুধু কাব্য এবং সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভারই সৃষ্টি করেন নি—সাহিত্যিকও সৃষ্টি করেছেন।

শনিবারের চিঠি তাঁর সক্রিয় আত্মা। সম্পাদিত পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদকের এমন একাত্মতার দ্বিতীয় নজির আমার জানা নেই। সজনীকান্ত দাস নাম বললে যেমন শনিবারের চিঠি বোঝায়, শনিবারের চিঠি বললেও তেমনি সজনীকান্ত দাসকেই বোঝায়।

তাঁর আত্মার এই সক্রিয় অংশে সৃষ্টিকর্তার মতই তিনি ভেঙেছেন এবং গড়েছেন। ভগীরথের মত বাংলা-সাহিত্যের গঙ্গার স্রোতকে তিনি পথ দেখিয়েছেন। একটা মাসিকপত্রের পক্ষে এতবড় কাজ কখনও সম্ভব হত না যদি শনিবারের চিঠি তাঁর আত্মার মূর্ত তপস্যা না হত। বাংলা সাহিত্যের প্রাণগঙ্গা আহ্বানের শঙ্খধ্বনির কার্যে তিনি তপঃক্লিষ্ট ভগীরথ। রবীন্দ্র-শরৎ-উত্তর যুগের সাহিত্য সম্পর্কে একটি অনস্বীকার্য সত্য।

আত্মার যে অংশে তিনি নিষ্ক্রিয়, দর্শক, সেখানে তিনি কবি, দার্শনিক। কিন্তু এই অংশই তাঁর গভীরতম সত্তা, কবিসত্তা। তাঁর সমগ্র কাব্যের সম্যক্ বিচার ও আলোচনা আজও পর্যন্ত হয় নি। যাঁরা অধিকারী তাঁরা নিশ্চয়ই সে দায়িত্ব পালন করবেন।

—

সজনীকান্ত-স্মরণে

বীরেন্দ্র মল্লিক

জীবন কঠিন জানি ;
পথ তার আঁকাবাঁকা আলো-অন্ধকারে।
আজ এক আলো নিভে গেছে।
বয়েস বাড়ে না যার,
সেই এক চিরশিশু মাথা খোঁড়ে, করে হাহাকার
হৃদয়-গুহায়।
অতল সমুদ্রে যেন খুঁজি পথ, খুঁজি খেই ;
বারবার নিদারুণ নিষ্ঠুর উত্তর,—
তুমি নেই।

—

সজনীকান্ত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

'বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ—'

সজনীকান্তের নিজের এই কথাগুলিই হঠাৎ মনে এসেছিল তাঁর শেষ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে। মনে মনে ভেবেছিলাম এও আর এক ধরনের অরণ্যশোভা বনস্পতির মৃত্যুবাসর। নমস্কার জানিয়ে বলে এসেছিলাম হে সৌম্য, উত্তরায়ণের গম্ভীর পথ বেয়ে তোমার যাত্রা শুভ হোক—পূর্বিনেভিঃ পথিভিঃ—যে অমৃতলোকে তোমার পূর্বসূরীরা চলে গেছেন।

'প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।'

সত্যিই, বিশ্বপত্রে বৃদ্ধ মহাকাল জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস অহরহ লিখে চলেছেন। খণ্ডকালের খণ্ডদেশের খণ্ড পাত্রপাত্রীদের নিয়ে তাঁর নিত্যনূতন নর্তনলীলা। বিধাতা-পুরুষের নিজের ললাটে কী লিপিলেখা আছে জানি না, কিন্তু আমাদের কপালে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি লিখে যাচ্ছেন যোগ-বিয়োগের পালা আর সৃষ্টিদৃষ্টির খেলা। মানুষ মাতৃগর্ভে পিতৃ-বীর্যে জন্ম নিলে, বিপুল বিশ্বে চোখ মেলে চাইলে, হাসলে, কাঁদলে, গাইলে, আহারনিদ্রারতি-আরতিতে সময় কেটে গেল তার, কর্মের উন্মাদনায় সে প্রখর হয়ে উঠল, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তাকে নখর-মুখর হতে হল, তারপর একদিন তার সমস্ত জীবকোষ শিথিল হয়ে এল, শ্লথবৃন্ত ফলের মত সে টুপ করে ঝরে পড়ল। আন্দোলিত নিঃশ্বাসের একটি বহুবল্লভ দুর্লভ তরঙ্গ-কল্লোলে সে এক নিমেষে ইতিহাস হয়ে গেল। এই তো চিরকালের পরিক্রমা—দুদিনের জন্য যে ছিল ব্যক্ত ও বিশেষ, সে হল অব্যক্ত ও অবিশেষ; যার ছিল রূপ রস রঙ, সে হল অরূপ রূপাতীত রূপশূন্য ; যার ছিল নামসংজ্ঞা মান-অভিমান, সে হল সব সংস্কারের অতীত। এই যে যাওয়া-আসা, এই যে দেওয়া-নেওয়া, এই যে চাওয়া-পাওয়া—এই যে অনন্তের মাঝে সান্তের অভিনয়—একেই আমরা নামকরণ করলাম জীবন। সেই লীলাচপল সসীম খণ্ডটিকে নিয়ে আমাদের কত মাজাঘষা, কত আলাপবিলাপ, কত আবেদন-নিবেদন। মহাভারত-কার কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ বলে মৃদু তাড়না করলেও মানুষই একমাত্র জীব যে চেয়েছে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, মনন দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে অমৃতকে ছিনিয়ে নিতে। নরদেহের সীমায় সে হার মেনেছে বটে, কিন্তু মনের অবিনাশী সত্তায় সে বেঁচে অমর, অজর। কবি ও সাহিত্যিক তারই ছাড়পত্র পেয়েছেন। মহাযোগেশ্বর হরি তাঁদেরই তাঁর "পরম-রূপমৈশ্বম" দেখিয়েছেন। বিশ্বরূপের খেলাঘরে সেই খেলা। সত্যিকার কবি তাই মনীষী, মৃত্যুজয়ী, কালজয়ী। তবু আমাদের ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মন দেহাশ্রিত বুদ্ধি দেহের দ্বার দিয়েই বুঝতে ও অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। তাই প্রিয়জনের, বন্ধুজনের শ্রদ্ধেয়জনের বিরহে আমরা কাতর হয়ে পড়ি, কারণ মৃত্যু ওই দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে যায়।

বয়সের কোঠায় কাছাকাছি হলেও সজনীকান্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় পঞ্চাশোর্ধ্বে অর্থাৎ পরিণত বয়সে। সে পরিচয় অন্তরঙ্গ বান্ধবগোষ্ঠীর না হলেও প্রায় ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগে নি তাঁর ঔদার্যের দাক্ষিণ্যে, তাঁর মননশীল চেতনার গুণে, তাঁর সাহিত্যিক নিষ্ঠার আকর্ষণে। হয়তো রবিবারের সকাল—বৈঠকী গল্প জমবে শ্রদ্ধেয় উপেন গাঙ্গুলীর আসরে বা বন্ধুবর সুবোধ সেন-গুপ্তের দরাজ দরবারে, এমন সময় টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং সংবাদ—রসস্নিগ্ধ আন্তরিক আহ্বান—সুধাংশুবাবু, চলে আসুন না এখানে। কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সারা সহর মাড়িয়ে একটানে চলে যাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হত না, তবু যেদিন সে সুযোগ ঘটে উঠত সেদিনটা যে শুধু সাহিত্যিক আলোচনায় সরস বিতর্কে ঘননিবিড় হয়ে উঠত তা নয়, সমষ্টিগত সমস্যার ব্যূহ ভেদ করে যে মানুষ ব্যক্তিটি স্বয়ম্প্রভ অপ্রকটসত্তায় ব্যক্ত হতেন তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার ও জানবার থাকত—শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং। মুখভর্তি

খবরের সঙ্গে প্লেটভর্তি খাবারও আসত—সজ্জনসঙ্গমের প্রত্যক্ষ ফল, কাব্যামৃতরসাস্বাদ ছাড়াও। তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখেছি খাঁটি বাঙালী আড্ডার মধ্যে সামাজিক সজনীকান্ত সমাসীন। আবার দেখেছি কী ধৈর্য ধরে সজনীকান্ত শুনছেন একটির পর একটি লেখা, উৎসাহ দিচ্ছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন, সমালোচনা করছেন। দোষেগুণে মানুষ আমরা সবাই, তবু যেখানেই অন্তরের পরশ পাওয়া যায়, সেখানেই মানুষের সত্যিকার ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। সেই খোলস-ছাড়া মানুষই আসল, আর সব আবরণ এহ বাহ্য। এক টুকরো বাউলের গান কানে এসে লাগছে—

কাজলে আর করবে কতো,
যদি নয়নে নজর না মেলে
প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে সাধনভজন কদিন রাখে।

সজনীকান্তের ভিতরে দেখেছি এক অদ্ভুত সমন্বয়—সাহিত্যিক হিসাবে, সামাজিক জীব হিসাবে, সংস্কৃতি-পরায়ণ মানুষ হিসাবে একদিকে তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ নিকটতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও কশাঘাত করতে উদ্যত আবার আর একদিকে তিনি বহুকে আপন করে নিতে পারতেন। সংস্কারকের নির্মম চেতনা, বৈদান্তিক বেদনা আর নিষ্কাম সাহিত্যসাধনা তাঁকে ত্রিধারায় অভিষিক্ত করেছিল, একই আঙিনায়।

যৌবনে যখন তিনি একহাতে অসি আর একহাতে মসী নিয়ে কালের কালিকলমের কল্লোলকে ঠেকাতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল না, তবে পরিচয় ছিল তাঁর অব্যর্থশরসন্ধানের সঙ্গে, শব্দভেদী বাক্যবাণের সঙ্গে, তেজভরা শ্লেষের সঙ্গে, কণ্ঠভরা দার্ঢ্যের সঙ্গে, বঙ্গশ্রী, প্রবাসী, শনিবারের চিঠির মাধ্যমে। সাহিত্যের আকাশ-পথে শনিচক্রের উদয় সেদিন "বক্রী" বলেই গণ্য হয়ে অনেকস্থানেই সম্যক অভ্যর্থিত হয় নি এ কথা জানি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে সেদিন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভেজাল বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরবারও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। শ্রদ্ধেয় তারাশংকর যা বলেছেন—সজনীকান্তের মধ্যে হীনমন্যতা ছিল না—তেজীয়সাং ন দোষায়। ইংলণ্ডেও তো সেইসময় এলিয়টের পর স্পেণ্ডার, অয়ডেন, ডেলুইস প্রভৃতি ক্রুদ্ধ নবীন কবির দল একটা বৃহৎ 'cause' খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সজনীকান্ত ও তাঁর গোষ্ঠীও জাল ও ভেজালের বিরুদ্ধে একটা 'cause' খাড়া করেছিলেন। অবশ্য সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নির্বিচারে সজনীকান্তের সব কথাই যে সকলে মেনে নিয়েছেন তা নয়, মতভেদ হয়েছে, প্রবল প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাকে কেউ আঘাত করতে পারে নি। তাঁর 'রাজহংস', 'মানস-সরোবর', 'পান্থপাদপ', 'পঁচিশে বৈশাখ', তাঁর বহু গবেষণা ও গল্প সার্থক সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে জলজল করছে। সবচেয়ে বড় কথা যে গত ত্রিশ বছর ধরে 'শনিবারের চিঠি' ও বিশেষ করে তার সংবাদ-সাহিত্য ও সজনীকান্ত আমাদের মানসিক আবহাওয়ায় (mental climate) এমন ভাবে জড়িয়ে ছিলেন যে তাঁর তিরোধান শুধু ব্যক্তিগত ব্যথা বা বেদনার তীব্রতা নিয়েই আসে নি বৃহত্তর ক্ষেত্রেও একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। সেটা ভাল কি মন্দ, সেটার রূপরসসীমা বা সাহিত্যিক মহিমার কথা তুলব না, সে বিচারের সময় আজ নেই, তবে তাঁর কবিতা, তাঁর ব্যঙ্গোক্তি, তাঁর বিদগ্ধ চেতনা, তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধ্যানধারণা, তাঁর গবেষণা, বহু চিন্তানায়কদের মনকে জাগিয়ে তুলেছে, নূতন সমিধ্ জুগিয়েছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি শুধু দিকপাল নন, ক্ষেত্রপালও।

তাঁর রচনার অন্তরালে যে গভীর আত্মবিশ্লেষণ ছিল, যে মর্মবেদনা উৎসারিত হত, তার সঙ্গে পরিচয় যারই হয়েছে, তিনিই যেন তড়িতাহত হয়ে সন্ধানী আলোকের চমকিত শিখাকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্মে হয়তো গভীর রহস্যবাদের স্থান ছিল না, ছিল না মুগ্ধ জনতাকে শুদ্ধ স্তুতিবাদে তুষ্ট করবার সাময়িক উদ্যোগ, কিন্তু এই আশ্চর্য রকমের স্বার্থপর পরিবেশে যেখানেই বিবেকের ভিত্তি ধসে গেছে, সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা স্তিমিত হয়েছে, যুক্তিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্য-বিচারবোধ লুপ্ত হয়েছে, বা তাঁর মতে বাঙালীর সংস্কৃতি বা সমাজের উপর আঘাত পড়েছে, সেখানেই দেখেছি সজনীকান্তকে তাঁর শাসনদণ্ড তুলতে। তাই বার্নাড শ'র মত তাঁকে তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে, তাঁর

মতবাদকে বলতে হবে why not take it for what it is. সেই সজনীকান্তকে নমস্কার।

কতদিন দেখেছি যে তিনি অসুস্থ, ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন—তবু নিয়মমাফিক শুয়ে বসে থাকলেও তাঁর সতেজ মন সক্রিয়। I will not rest—বলেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত রোমা রোলাঁ, সজনীকান্তেরও বোধ হয় ছিল সেই পণ। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে নিরলস সারস্বত সাধনায় নিমগ্ন সজনীকান্তকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে আলোচনাকালে গদাচক্রধারী বাঙ্ময় এই মানুষটি যেন সোনার কাঠির পরশে বদলে গেছেন পদ্মাসনার এক চিন্ময় সেবকরূপে, আবিষ্কার করেছেন এক অপূর্ব জগৎ। সেই সজনীকান্তকে নমস্কার।

তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

'সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল
হবে না প্রকাশ কোনদিন।
জীবনের দুঃখশোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি
মহতেরে বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।'

জীবনের অসংখ্য দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভুলভ্রান্তি, স্খলন-পতন, লোভ-ক্ষুধা, ক্ষোভবেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়েও তিনি তলিয়ে যান নি, দেখেছেন সেই স্তব্ধ আকাশকে আর ডুব দিয়েছেন মানুষের হৃদয়তলের শতদলরহস্যে। বঞ্চিতের অসম্পূর্ণ গানে যাঁর পরিচয় তাঁর জীবনই তো একটি Unfinished Symphony.

মনে পড়ছে ব্লেকের একটি কবিতা—

Bring me my bow of gold
Bring me my arrows of desire
Bring me my spear and cloud unfold
Bring me my chariot of fire
I will not cease from mental fight
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we lit again the light
That shone in this benighted land.

সজনীকান্তেরও ছিল এই আদর্শ। তাই তিনি বজ্রকণ্ঠে যুদ্ধং দেহি বলে সকলের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে সাহস করতেন, সে দেবতা হোক, মহাপুরুষ হোক বা জনতামহারাজ হোক।

'দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতাবিরোধী—
তোমাদের করি না স্বীকার
বজ্র হান, বজ্র হান শিরে
বজ্র হান, হে বাসব'

এই সেদিনও তিনি কম্বুকণ্ঠে উদাত্তস্বরে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে এলেন "এ যুগের জীবনযাত্রার শতধাবিভক্ত পথে পদে পদে যে আঘাত ও বেদনা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সহিতে হইতেছে, তাহার অভিজ্ঞতা যেদিন উপযুক্ত প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইবে, যাহা একান্ত ইমোশন অথবা একান্ত যুক্তিই হইবে না, সেদিনই বাংলা কাব্যসাহিত্যে নব-অরুণোদয় হইবে।" তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে আমরা যেন একটা ভ্রান্ত সহজিয়া কাণ্ট খাড়া না করি, কারণ তিনি জানতেন মহাপঙ্ককের মহাক্রোটকের ছন্দে কারণপানমত্ত ভৈরবীচক্রে তান্ত্রিকের অকালবোধনে শুধু শবই নড়ে, শিব ময়োভব হে ভবেশ, হে শংকর জাগেন না।

রবীন্দ্রনাথ একদিন শরৎচন্দ্রের মত অপরাজেয় কথাশিল্পীকেও একটি রূঢ় সত্য বলেছিলেন—সাহিত্যে তুমি বড় সাধক—ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তা হলে সে লোকসান্ সাহিত্যের—তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে। পরিণত বয়সের স্থিতধী কবি তত্ত্বজ্ঞ সজনীকান্তের কাছে সাংবাদিক সমালোচক ও যৌবনের দুর্বার বেগে চাবুকধারী সজনীকান্তও বোধ হয় এই প্রশ্নই করেছিলেন।

আমি যখন "দুই কবি" বই লেখাকালে শ্রীঅরবিন্দের লেখা খুঁজতে সন্ধ্যা, যুগান্তর, কর্মযোগিন যুগের কিছু পত্রপত্রিকার সন্ধান করছিলাম তখন সজনীকান্তকে দেখেছিলাম এক নিরাসক্ত অপ্রমত্ত গবেষকরূপে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্বন্ধে তখন তিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন। যেদিন তিনি পরলোকগমন করেন সেইদিনই ব্রহ্মবান্ধবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ভাষণ দেবার কথা।

মারা যাবার চার-পাঁচদিন পূর্বে সজনীবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, তিনি বললেন—আগামী রবিবার ব্রহ্মবান্ধবের জন্মশতবার্ষিকী—আসবেন আপনি। সেই রবিবারই এল, ব্রহ্মবান্ধবের শতবার্ষিকীও হল, কিন্তু এল আরও বঙ্কিমরেখায় কালের কুটিল লিপি হাতে। মহাকালের একটি ফুৎকারে নিভে গেল একটি দীপশিখা। কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সে ধরায় এসেছিল।

নমস্তে অস্তু আয়তে নমো অস্তু পরায়তে
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতিচীনায় তে নমঃ
আমাদের শ্রদ্ধার হুতাগ্নি মধুমন্ত্রেরই রূপ নিক

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

আমার দেখা সজনীকান্ত

মন্মথ রায়

স্কুলের ছাত্ররা যখন খেলা নিয়ে মেতে থাকে, তখন যদি কোন স্কুলের ছাত্রকে দেখি যে, সে কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তারের পাশে বসে রোগীদের রোগ-বিবরণ শুনছে, মাঝে মাঝে অশ্রুসজল হয়ে উঠছে তার চোখ, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান লিখে নিয়ে রোগীদের ওষুধ দিচ্ছে, ছাত্রটিকে অসাধারণ বলেই মনে হয়। এমনি অসাধারণ ছাত্রই ছিলেন সজনীকান্ত তাঁর বাল্যকালে। ১৯১৫ সনের কথা বলছি। সজনীকান্ত তখন দিনাজপুর জিলা-স্কুলের ছাত্র। আমি দিনাজপুরের মহকুমা বালুরঘাট হাইস্কুলের ছাত্র। সজনীকান্তের চেয়ে আমি এক ক্লাস উপরে পড়ি। দিনাজপুর বালুবাড়িতে আমার এক মামার বাড়ি ছিল। আমাদের সমবয়স্ক দুই মামা ছিলেন সজনীকান্তের পরমপ্রিয় বন্ধু। সেই সূত্রেই সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। মহর্ষি ভুবনমোহন নামে আখ্যাত এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে লোক-সেবার ব্রত নিয়ে দিনাজপুর বালুবাড়িতে এক হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় চালাতেন। ঋষিকল্প লোক ছিলেন তিনি। আর্তসেবাই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম। দীনদুঃখীর ছিলেন তিনি বাপ-মা। বলা বাহুল্য, ভুবনমোহনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী। এত লোকের চিকিৎসা একা ভুবনমোহনের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল সজনীকান্ত প্রমুখ বালক-ব্রতীদের সাহায্যে। নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার বীজ বালক সজনীকান্তের মনে উপ্ত হয়েছিল ভুবনমোহনের এই সেবাশ্রমে।

ওই বয়সেই কাব্যচর্চা ছিল সজনীকান্তের আর একটি বিশেষত্ব। আমরা অবাক হয়ে শুনতাম সজনীকান্তের স্বরচিত কবিতা পাঠ, অবশ্য রুদ্ধদ্বার কক্ষে; কারণ সে কবিতাগুলির অধিকাংশই ছিল প্রেমের কবিতা। আমাদেরই এক বন্ধু অমন কবিতা লিখতে পারেন দেখে আমরা মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত হতাম। মনে মনে আওড়াতাম "তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।" ১৯১৭ সনে আমি ম্যাট্রিক পাস করে আই. এ. পড়তে চলে যাই রাজসাহী কলেজে। ১৯১৮ সনে সজনীকান্ত দিনাজপুর থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আই. এস-সি. পড়তে চলে যান নিজ বাসভূমি বাঁকুড়া জেলার মিশনারি কলেজে। ছেদ পড়ে যায় আমাদের দুজনের সাহচর্যে।

দুজনের যোগাযোগ হয় আবার ১৯২১ সনে যখন আমি বি. এ পড়ি স্কটিশচার্চ কলেজে, সে এসে ভর্তি হল বি. এস-সি. ক্লাসে ওই কলেজেই। আমি থাকতাম 'ডাওাস হোস্টেলে', সে থাকত 'অগিলভি হোস্টেলে'। সজনীকান্ত তখন যাকে বলে দামাল ছেলে। যেমন চেহারা, তেমনি কণ্ঠস্বর, তেমনি প্রকৃতি। একটা উদ্দাম প্রাণশক্তি। ১৯২১ সনের অসহযোগ বন্যায় আমি পড়লাম ঝাঁপিয়ে। সজনীকান্ত কিন্তু তখন নিমগ্ন রইলেন কঠোরতর সাধনায়। বিপ্লব আন্দোলনে তখন জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। শুধু তিনি নন—সজু এবং গজু দুই ভাই-ই।

কিন্তু সক্রিয় বিপ্লবের আবর্ত থেকে তাঁকে সরিয়ে আনে তাঁর সাহিত্যসত্তা—বৈপ্লবিক সাহিত্যসত্তা। বি.এস-সি. পাস করে বেনারসে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কিছুদিন পরেই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এলেন এবং লোহার হাতুড়ি না পিটে সাহিত্যিক হাতুড়ি হাতে নিলেন তুলে।

বাংলা সাহিত্যে তখন 'কল্লোল যুগ' নতুনের জয়যাত্রা ঘোষণা করেছে। বিরোধী সুর বেজে উঠল 'শনিবারের চিঠি'তে—যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ওই সজনীকান্ত তাঁর সাহিত্যিক হাতুড়ি নিয়ে। কল্লোল-লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আমিও ছিলাম একাঙ্ক নাটক রচয়িতারূপে। কিন্তু সজনীকান্তের হাতুড়ি তাঁর বাল্যবন্ধুটিকেও রেহাই দেয় নি। সে হাতুড়ি পড়েছিল আমারও পৃষ্ঠে। সজনীকান্তের ছিল মৌমাছির হুল। তাঁর দংশন ছিল মধুর যন্ত্রণা।

সজনীকান্তের পরবর্তী অভ্যুত্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুখ্যতঃ এই কবিটি সাহিত্যের প্রয়োজনে বিস্তৃততর খ্যাতি পেলেন গবেষক-রূপে, সমালোচকরূপে। গড়লেনও তিনি অনেক কিছু, ভাঙলেনও তিনি অনেক কিছু। কিন্তু এ ভাঙাগড়ার মধ্যে সবচেয়ে যে সত্যটি অমর হয়ে থাকবে সেটি হল তাঁর সাহিত্যপ্রীতি। এ প্রীতিতে কোন খাদ ছিল না কখনও। সাহিত্যিক সততা ও নিষ্ঠা ছিল তাঁর মজ্জাগত। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন অসাধুতা, কোন অসুস্থতাই তিনি মার্জনা করতে পারেন নি কোনদিন। এতে অবশ্য তাঁর শত্রুর সংখ্যা যেমন বেড়েছিল, তেমনি বেড়েছিল বন্ধুর সংখ্যা। কোন লেখকের মধ্যে প্রতিভার প্রতিশ্রুতি দেখতে পেলেই তিনি সাদরে তাঁকে বরণ করে নিতেন, বহু প্রতিভাশালী লেখককেও তিনি সাদরে টেনে এনেছিলেন তাঁর শনিবারের চিঠির আসরে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে'র কর্মকর্তারূপে এবং 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকরূপে সাহিত্যের যে বিরাট সেবা তিনি করে গেছেন তাঁর পরিচয় দেবার জন্য যোগ্যতর লেখনী রয়েছে, আমি শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত থাকব যে, সজনীকান্তের মূল্যনির্ণয়ের ভিন্নতর পন্থা হচ্ছে শুধু চিন্তা করা: সজনীকান্ত যদি না জন্মাতেন তবে আমরা কী হারাতাম!

সজনীকান্তের সঙ্গে আমার পরবর্তী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় ১৯৪৮ সনে। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী কাজে বাংলা ভাষার প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তাকল্পে শাসনকার্যে সচরাচর ব্যবহৃত শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য স্বর্গত রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে যে পরিভাষা সংসদ গঠিত হয় তার অন্যান্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস। শ্রীপতঞ্জলি ভট্টাচার্য এবং আমি ছিলাম এই সংসদের যুক্ত সম্পাদক। ১৯৬১ সনে ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুনর্গঠিত এই পরিভাষা সংসদের সদস্যভুক্ত তিনিও ছিলেন, আমিও রয়েছি। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকে লক্ষ্য করে দেখেছি দুরারোগ্য রোগ, শারীরিক অবসন্নতা, কোন কিছুই তাঁকে নিরস্ত রাখতে পারে নি ভাষা-জননীর নিরলস সেবায়। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন কিন্তু তৎপূর্বে ২০শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পরিভাষা সংসদের পঞ্চম সভায় তিনি যথারীতি তাঁর কর্তব্যরীতি সম্পাদন করে গেছেন।

সজনীকান্তের শুভ জন্মদিন ছিল ৯ই ভাদ্র। শেষ কয়েক বছর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে ঘরোয়া বৈঠক বসত তাতে তাঁর বাসনা অনুযায়ী আমাকে পাঠ করতে হত আমার স্বরচিত কোন একাঙ্কিকা। তাঁর গত পূর্ব জন্মদিনেও আমি পাঠ করেছিলাম আমার স্বরচিত নাটিকা 'জন্মদিনে'। আমার এই নাটিকা পাঠ তাঁর জন্মদিনের একটি উৎসবরূপে তিনি গণ্য করতেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে এক বছর ছোটই ছিলেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন আকস্মিকভাবে আগে। আবার যখন ৯ই ভাদ্র আসবে, সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি দিনটি আমার নিরর্থক বলে মনে হবে।

গত ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ছিলেন কাব্য-শাখার সভাপতি। নাট্য-শাখার সভাপতিরূপে তাঁর পাশেই পেয়েছিলাম আমি আমার বসবার আসন। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাবশতঃ হঠাৎ তিনি আমাকে তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করতে অনুরোধ জানালেন। অভিভাষণটি পাঠ করতে গিয়ে শুধু এই শংকাই অনুভব করছিলাম, না জানি কী অবিচার করছি আমি তাঁর ওপর। পাঠান্তে হঠাৎ অনুভব করলাম বজ্রমুষ্টিতে তিনি ঝাঁকুনি দিলেন আমার হাতে। তাকিয়ে দেখি দৃষ্টি তাঁর প্রসন্ন। বজ্রের মতই ছিল তাঁর ভালবাসা—আবেগে দুর্বার, বিদ্যুৎঝলকে উজ্জ্বল।

সজনীকান্ত : সজনীদা

কুমারেশ ঘোষ

শেষ পর্যন্ত সজনীকান্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মুখে পাইপ, পকেটে 'যম'। আমার রস-রচনা। ইচ্ছে—'শনিবারের চিঠি'তে ছাপানো।

মন কিন্তু ভয়ে দুরু-দুরু। কী জানি, শুনেছি ভদ্রলোক যেমন কড়া লেখেন, তেমনি নাকি কড়া মেজাজের। গলাটাও নাকি বাজখাঁই। হাঁকিয়ে না দেন।

পাছে দমে যাই, নিভে যাই, তাই বুঝি মুখে-ধরানো পাইপ নিয়েই ঢুকলাম অফিস-ঘরে। দেখলাম ফর্সা, ঢেঙা, বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক কি যেন লিখছেন। গায়ে ড্রেসিং-গাউন। আন্দাজে বুঝলাম, ইনিই সেই সজনীকান্ত।

বললাম, একটা লেখা এনেছি—'যম'।

যম! সজনীকান্ত হাসলেন : একেবারে যমকে সঙ্গে করে! বসুন।

বসলাম। অবাক হয়েই বসলাম, এ সম্পাদক হাসেন যে! বুঝি পাইপ টানতেও ভুলে গিয়েছিলাম। তাই কখন যেন নিভে গেছে। দেশলাই জ্বালিয়ে পাইপটা ধরিয়ে পোড়া কাঠিটা কোথায় ফেলব ভাববার আগেই সজনীকান্ত এগিয়ে দিলেন অ্যাশট্রেটা। একটু চমকেই উঠলাম, এ কেমনতর সম্পাদক!

এবার ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, আমার এ লেখাটি একটু পড়ে—

বলতে যাচ্ছিলাম, একটু পড়ে দেখবেন। কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই, আশ্চর্য, সম্পাদক সজনীকান্ত বললেন, আজ একটু ব্যস্ত আছি, কাল এসে পড়বেন, শুনব।

শুনে এবার রীতিমত অবাক হলাম। আনন্দের আতিশয্যে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল বুঝি। হাতের পাইপ আবার গেল নিভে, হয়তো লজ্জায়। ছিঃ, এসব লোকের সামনে—আমিও যেন নিভে গেলাম। তাড়াতাড়ি নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

পরদিন সসংকোচে গিয়ে সজনীকান্তকে পড়ে শোনালাম 'যম'। পাইপটা পকেটস্থ। তাঁর কাজঠাসা সময়ের বেশ খানিকটা আমাকে সমর্পণ করে পরম ধৈর্যসহকারে শুনলেন আমার লেখা—সিগারেট টানতে টানতে। পরে বললেন, ছাপা হবে। তারপর বললেন, আপনার পাইপ কোথায়?

হঠাৎ এসব প্রশ্নে ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, নেই। বোকা-বোকা মুখ করে বললাম, আপনি—আপনি গুরুজন।

সেই দিন থেকে এই গুরুজন হয়েছিলেন 'সজনীদা'। শেষদিন পর্যন্ত। কোনদিনই আর তাঁর সামনে পাইপ, সিগার, সিগারেট কিছুই ধরাই নি, এমন কি, তিনি অনুমতি দিলেও নয়। কতবার বলেছেন, কি হে, নেশা ছেড়ে দিলে নাকি? আমি উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করতাম, আমি না ছোটভাই?

জার্মান থেকে একটা স্প্রিংয়ের সিগারেট-হোল্ডার এনে বলেছিলাম, এটা আপনার জন্যে এনেছি।

হেসে বললেন, প্রথম দিনের প্রায়শ্চিত্ত নাকি?

বললাম, না। ভক্তি-উপহার। প্রায়শ্চিত্ত করব সে ধূমপান-কাহিনী লিপিবদ্ধ করে।

এ কাহিনী সেই প্রায়শ্চিত্ত।

এই গুরুজন কখন যে 'সজনীদা' হয়ে গিয়েছিলেন, তা নিজেও বুঝতে পারি নি। কখন যে তাঁর নীচের বাইরের ঘর থেকে দেড়তলায় লাইব্রেরি-ঘরে, সেখান থেকে তাঁর স্নেহের টানে সোজা তাঁর শোবার ঘরের সোফায় এবং বিছানার উপরে বসবার এবং শেষ পর্যন্ত অন্দরমহলের ভাঁড়ার-ঘরেও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। অবশ্য পরে দেখেছিলাম সম্পাদক সজনীকান্তের টেবিলের সামনে একবার দাঁড়াতে পারলে, তাঁর স্নেহের ক্রেনের প্রায় হ্যাঁচকা টানে সে

উপরে উঠে ধপাস করে বসত এসে মানুষ সজনীকান্তের শোবার ঘরের সোফায়। আর, ভাঁড়ার-ঘরে যাওয়া মানে, শুধু দাদা নয়, বউদির স্নেহের পাসপোর্টেরও অধিকারী সে।

সজনীদার সদ্য-লেখা সংবাদ-সাহিত্য বা তাঁর কবিতা পাঠ তাঁর শোবার ঘরে বসেই হত। কিন্তু আমার কোথাও বেড়িয়ে আসার গল্প বা নতুন কোন রচনা পড়তে গেলেই ঢুকতে হত দাদার সঙ্গে ভাঁড়ার-ঘরে। চল, ওখানে গিয়ে হবে। তোমার বউদিও শুনবে।—বলেই তাঁর বাজর্খাই গলার চিৎকার: সুধা, কুমারেশ এসেছে।

এসেছি তো অত জোরে চেঁচাচ্ছেন কেন?—কখন যেন তাঁকে সাবধান করবারও অধিকার পেয়েছি: ওতে হার্টে জোর পড়ে না?

হেসে বলতেন, কী করব বল, অনেক দিনের অভ্যেস।

নরেনদা (কবি নরেন্দ্র দেব) একবার আমাকে ভার দিলেন Pen-এ বাংলা সাহিত্যে আজগুবী রচনা পড়তে। সে প্রবন্ধ লেখবার সময় সজনীদাকে একদিন বললাম, আপনার কোন্ আজগুবী রচনাটি উল্লেখ করি বলুন তো? বললেন, "অন্তিম বাসনা"। প্রবন্ধ শেষ করে, একদিন যথারীতি ভাঁড়ার-ঘরে বসে পড়তে হল। বউদি তরকারি কুটতে লাগলেন, দাদা টানতে লাগলেন সিগারেট। পড়তে পড়তে এলাম তাঁর "অন্তিম বাসনা"য়:

'উলু দিয়ো নাকো আমি মরে গেলে
সুড়সুড়ি দিয়ো কানে,
পচারে বলিয়ো সে যেন তিনটে
লাল বাতি জেলে আনে।
পাড়া মাতাইয়া বিনিয়ে কেঁদো না,
রুমালে মুছিয়ো চোখ,
কাছে যেন মোর নাহি আসে সখি,
খোঁড়া মুলো হাবা লোক।
শিয়রে আমার অ্যাশট্রে রাখিও
চরণে আলতা দিও,
এক ঠ্যাঙে যেন দাঁড়াইয়া থাকে
মোর যত আত্মীয়।'

বউদি বলে উঠলেন, ও, দাদা ভাইতে মিলে বুঝি এই সব হচ্ছে!

দাদা মুচকি হেসে বললেন, পড়, পড়। আমি পড়তে লাগলাম—

'বিনুনি তোমার এলাইয়া দিও
'আঁচল' রাখিও এঁটে,
বাম হাতখানি যতনে রাখিও
আমার শীতল পেটে।'

আরও পড়লাম—

'কবিতার খাতা গল্প আমার
যেখানে যা কিছু আছে,
গভীর করিয়া রাখিও পুঁতিয়া
আস্তাকুড়ের কাছে;
দেখো প্রতিদিন প্রাতে—
রজনীগন্ধা ফুটেছে কি সেথা
আঁধিয়ার কোন রাতে।'

প্রবন্ধপাঠ শেষ হতেই দাদা শুরু করলেন তাঁর প্রথম বিবাহিত জীবনের সরস কাহিনী, বউদিকে রাগাবার জন্যেই। কিন্তু আশ্চর্য, বউদি হাসতে লাগলেন। বারণ করলেন ওঁর সব কথা বিশ্বাস না করতে।

আমি দাদাকে বললাম, যাই বলুন, বউদি পেছনে ছিলেন, তাই আজ আপনি--আপনি।

তা ঠিক।—হেসে স্বীকার করলেন তিনি।

অথচ— বললাম আমি: সাহিত্যের হাটে বউদির পরোক্ষ দান লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকবে।

শুনে সর্বংসহা সদাহাস্যময়ী মহিলা যেন বিশ্বনারী-সমাজের হয়ে বললেন, পুরুষের কাজ যেমন বাইরে, মেয়েদের কাজ তেমনি অন্তঃপুরে, আড়ালেই।

Pen-এ পাঠ করবার পর সজনীদা সে 'আজগুবী' প্রবন্ধ 'শনিবারের চিঠি'তে দু সংখ্যায় ছাপলেন, নিজে লিখলেন তার প্রস্তাবনা এবং উপসংহার।

কিন্তু কে জানত, ঈশ্বরের এক আজগুবী কাণ্ড শীঘ্রই ঘটবে ওই বাড়িতে, ঘটবে সাহিত্যের বাজারে!

এই তো সেদিন। এক রবিবারের দুপুরে বিশেষ কাজে সজনীদার কাছে গেছি (কয়েক রবিবারে নিয়মিতই যাচ্ছিলাম), যেতেই সজনীদা ম্লান মুখে বললেন, জান, সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ মারা গেছেন। আমাকে এই-

মাত্র ফোনে খবর দিয়েছেন। অথচ ড্রাইভার নেই, দেশে গিয়েছে। কি করি বল তো?

বললাম, বেশ তো, চলুন।

যাবে?—যেন কৃতার্থ হলেন তিনি।

বললেন, কোন বড়লোক হলে না গেলেও হয়তো চলত, কিন্তু এখানে না গেলে শুনব, বড়লোকী গন্ধ না থাকায় সজনী দাস যায় নি। তা ছাড়া উনি একজন পাকা সাহিত্যিকও।

মানে, আর একবার পেলাম তাঁর উদার হৃদয়ের পরিচয়।

সজনীদা বললেন, ওপরে চল, জামা-কাপড় পরে আসি। গেলাম। সজনীদা ধুতি পাঞ্জাবি পরলেন, বউদি পেছনে তাঁর কাছা গুঁজে দিলেন, মেয়ে মীরা দিল তাঁর চুল আঁচড়ে। মুগ্ধ নয়নে দেখলাম গার্হস্থ্য-জীবনের এক সুদুর্লভ মধুর দৃশ্য।

নামছিলাম দুজনে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বউদি বললেন, আপনার দাদাকে একটু দেখে নিয়ে যাবেন।

বললাম, আমি আছি, ভয় নেই। ধরলাম দাদার হাত: আস্তে আস্তে নামুন।

ইদানীং চোখের অসুখে দৃষ্টি কমে এসেছিল। নামতে নামতে বললেন, দাঁত তো আগেই নিয়েছেন ভগবান, এবার চোখটার দিকেও নজর দিয়েছেন। আমার সবই আগে আগে নিচ্ছেন। এবার আমাকে নিলেই হয়।

বললাম, কী যে বলেন! নিন, দেখে নামুন।

গাড়িতে পেছনের দরজা খুলতেই বললেন, না, তুমি চালাবে, তোমার পাশেই বসি। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

সারা পথ গল্প করতে করতেই গেলাম দুজনে। বেলগাছিয়া থেকে টালিগঞ্জে বক্তিয়ার শা রোডে। পথে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীটে দাঁড় করালেন গাড়ি: চল, মালা কিনে নিয়ে যাই। টালিগঞ্জে অনেক খুঁজে বার করলাম বাড়ি। দেখি, সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষের শায়িত মরদেহ পুষ্প-সজ্জায় সজ্জিত। দুজনে মাল্যদান করলাম।

একজন ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, আপনি এসেছেন, অমরেন্দ্রবাবুর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ হল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন সজনীদা।

ভদ্রলোক বললেন, রোগশয্যায় কিছুদিন আগেই কথায় কথায় বলেছিলেন, আমি মরলে অন্ততঃ তারাশঙ্করবাবু আর সজনীবাবুকে যেন খবরটা দেওয়া হয়!

গাড়িতে উঠেই বললেন, দেখলে তো, ভাগ্যিস এসেছিলাম!

এর দু সপ্তাহ পরে। আর এক রবিবার। দুজনে গেলাম অনিল ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে রবিবাসরে। যাবার সময় বউদি যথারীতি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর দেখবেন যেন মিষ্টি-টিষ্টি না খান! বলেছিলাম, ঠিক নজর রাখব এবং নিরাপদে পৌঁছে দেবো বউদি। সেদিন আসরে কবি-সম্মেলন হল। সবাই স্বরচিত কবিতা পাঠ করলাম। টেবিলল্যাম্পে হাই পাওয়ারের বাল্ব লাগাবার পরে সজনীদাও পড়লেন তাঁর স্বরচিত কবিতা। তাঁর কণ্ঠে শোনা সেই শেষ কবিতা। তারপর মনোমোহন ঘোষ পাঠ করলেন সজনীদারই কবিতা 'কে জাগে?' শুনে মুগ্ধ হলাম সবাই। কিন্তু কে জানত, এই 'কে জাগে'র কবি পক্ষকাল পরেই এমনি এক রবিবারেই চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হবেন! আর বি-ও-সি, সোকোনির মত ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে জেগে থাকব আমরা তাঁর স্মৃতি আর সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে!

রবিবাসরের আসরের শেষে অনিল ভট্টাচার্য বললেন সজনীদাকে, আমার 'সাগর-আকাশ' দিয়েছিলাম, পড়েছেন? সজনীদা বললেন, কই, দাও নি তো! অনিল ভট্টাচার্য অবাক হয়ে বললেন, কেন, মাসখানেক আগে দিয়ে এলাম আপনাকে? শুনে বললেন, আচ্ছা, দেখব খুঁজে।

অবাক হলাম আমিও। কারণ আমার দুখানা বই তাঁকে দিয়েছিলাম মাস দুয়েক আগে। পড়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করায় ওই ধরনের উত্তরই পেয়েছিলাম তাঁর কাছে। পরে আবার দিয়েছিলাম বই দুখানা। সজনীদার কথা শুনে বিস্মিত হয়েই বললাম, যিনি সাল তারিখ নিয়ে কথা বলেন, তাঁর তো এমন ভুল ভুল হবার কথা নয়। আপনার এ কি হল? বললেন, সত্যিই ভাববার কথা! এখন ভাবছি, হয়তো এ পার্থিব জগৎ

ছেড়ে যাবেন বলেই আর সাংসারিক লেনদেনের কথা মনে রাখবার কোন আগ্রহই ছিল না তাঁর।

বাড়িতে পৌঁছে সজনীদা বললেন, এবার আমি যেতে পারব। বললাম, না, বউদিকে বলেছিলাম, আপনাকে 'সেফ ডেলিভারি' করব, কাজেই বউদিকে জানিয়ে দিয়ে যাই।

বেশ, বেশ। তাই কর। খুব খুশী দাদা। তাঁর সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে হাঁক দিলাম, বউদি, দাদাকে দিয়ে গেলাম পৌঁছে।

বউদি সিঁড়ির মাথায় এসে হেসে বললেন, আচ্ছা।

তারপর সেই অভিশপ্ত রবিবার। সেদিন ল্যান্সডাউন রোডে অধ্যাপক সৌরীন্দ্র দের বাড়িতে রবিবাসর। আমার প্রবন্ধ পাঠের কথা—বাংলা সাহিত্যে আজগুবী রচনা। কিন্তু জমাট আসরে বিনামেঘে বজ্রপাত হল: সজনীকান্ত মারা গেছেন—বেলা তিনটের সময়। অথচ আজও তো আমার তাঁর কাছে যাবার কথা ছিল, শুধু কাজ থাকায় যেতে পারি নি। আর যেতে পারি নি বলেই হাত ফসকে চলে গেলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম বেলগাছিয়ায়। সঙ্গে ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), রমেন্দ্র মল্লিক, আমার স্ত্রী ও পুত্র। বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য। গাড়িতে গাড়িতে বাড়িখানা পরিবেষ্টিত। সবাই হতভম্ব, হতবাক, নতশির। সবাই পরিচিত, অথচ কারোর সঙ্গে কথা বলবার কিছু নেই যেন!

নিঃশব্দে উঠলাম আমরা ওপরে। সেই একতলায় অফিস-ঘর, প্রেস, দেড়তলায় লাইব্রেরি, দোতলায়—

থমকে দাঁড়ালাম একবার। আগে ঢোকবার সময় হাঁক দিতাম, দাদা আছেন? উনি ততোধিক জোরে সাড়া দিতেন, এই যে, এসো। আজ তিনি নেই, 'এসো' বলবেন কে এখন? তবু ঢুকতে হল। ভারি পায়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুরু দুরু বুকে (যেন, সর্বনাশের কিছু বাকি আছে!) ঘরে ঢুকে দেখি খাটে দাদা ঘুমুচ্ছেন যেন। আর তাঁর গায়ে হাত রেখে পাথর-প্রতিমার মত বসে বউদি দাদার দিকে চেয়ে। ঘরভর্তি আত্মীয় বন্ধু পরিবার।

হঠাৎ মনে পড়ল দাদার সেই অন্তিম বাসনার কথা। সুরসিক কবির আজগুবী বাসনা শেষে সত্যিই হল বাস্তবে পরিণত!

আমাকে দেখতে পেয়েই বউদি কেঁদে উঠলেন, এসেছেন, দেখুন, আপনার দাদাকে দেখুন, শেষ দেখা দেখুন।

দেখলাম, সুবিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক, সমালোচক, গবেষক এবং অনেকের বিভীষিকা সজনীকান্ত চিরনিদ্রায় শান্ত, সমাহিত। সজনীদা আর নেই। প্রচণ্ড বেগে একটা উল্কা ছোটবার পথে হঠাৎ যেন থমকে থেমে গেছে।

আমি যাই। নীচে যাই। আর দাঁড়াতে পারছিলাম না।

কি? এঁকে নিয়ে যাবেন বুঝি!—পেছনে শুনতে পেলাম বউদির রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, কতদিন যাঁকে এ বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেছি, সেদিন তাঁকে শেষবারের মত নিতেই গিয়েছিলাম।

—

সজনীবাবুর স্মরণে

পশুপতি ভট্টাচার্য

সজনীকান্তকে আমি যেমনভাবে জানবার ও চেনবার সুযোগ পেয়েছিলাম তা বোধ করি খুব কম ব্যক্তি পেয়েছেন। তাঁর ভক্ত ও বন্ধুর হয়তো সংখ্যা করা যাবে না, কিন্তু সকলেই তাঁকে দেখেছেন বাহির-মহলে, আর আমি মানুষটিকে দেখেছি তাঁর অন্দর-মহলে। কারণ সেখানেই ছিল আমার অবাধ গতিবিধি। আমি ছিলাম তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের চিকিৎসক, শেষজীবনে নয় কিন্তু, তার কিছুকাল আগে। তাই আমার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল মানুষটিকে চেনবার ও ভালোবাসবার।

এ কথা বলতে কোনও সঙ্কোচ নেই, তাঁকে আমি প্রকৃতপক্ষে একরকম ভালোই বেসেছিলাম। তার যোগাযোগ ঘটে নানা কারণ থেকে। প্রথমতঃ, খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার এই বাংলা ভাষার দিকে বড় ঝোঁক, বাংলা ভাষাকে আমি অত্যন্তই ভালবাসি—যেন মায়ের মত। বাংলা আমি শুনতে ভালবাসি, পড়তে ভালবাসি, যে ভাল বাংলা লিখতে জানে তার সঙ্গে যেচে গিয়ে বন্ধুত্ব করি। এমনি করেই আমি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও স্নেহ লাভ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর কথা এখানে নয়। আমি আরও এমন একটি লোকের সন্ধান পেলাম যিনি বাংলা ভাষাকে ওই রকম ভাবেই ভালবাসেন, আর শুধু তাই নয়, এই ভাষাকে নিয়ে যদি কেউ কিছু বেসুর কিংবা বেচাল করে তা হলে তিনি তা সইতে পারেন না, নির্দয়ভাবে তার পিঠে চাবুক মারেন। এমন দেখেছিলাম সুরেশ সমাজপতিকে, কিন্তু এঁর চাবুক তার চেয়েও তীব্র, তার চেয়েও নির্মম। ভাষাকে ভাল না বাসলে, ভাষার উপর আন্তরিক দরদ না থাকলে এমন তীক্ষ্ণবিচারী সমালোচক কেউ হতে পারে না। এই দেখেই আমি প্রথম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলাম।

কিন্তু কেমন করে আমি তাঁর সঙ্গে ভাব জমাই! আমি লেখক নই, কবি নই, কাঠখোট্টা একজন ডাক্তার। বাংলায় ডাক্তারি-বিষয়ক প্রবন্ধাদি কিছু কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। আমি হচ্ছি সেই গানপাগ্‌লাদের মত—যারা পরের গাওয়া গান শুনতেই ছোটে, কিন্তু নিজেরা গাইতে পারে না। তবুও যেচে গিয়ে আলাপ করলাম, আর যেই তিনি দেখলেন যে ভাষার দিকেই আমার টান আর সেই টানেই তাঁর কাছে গিয়ে জুটেছি, অমনি তিনি অন্তরঙ্গতা দেখাতে লাগলেন—সহজেই ভাব জমে গেল।

তখন তিনি ধর্মতলা স্ট্রীটে 'বঙ্গবাণী' কাগজের সম্পাদক হয়েছেন, আর আমি কাজ করছি পুলিস-হাসপাতালে—ভবানীপুরে। প্রত্যহই ওখান দিয়ে যাতায়ত করি, সন্ধ্যার সময় ওঁর ঘরে গিয়ে বসি। অনেক সাহিত্যিক সেখানে এসে জোটেন, সজনীবাবু তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। ভাল লাগে তাঁদের কথা শুনতে, আর কেবলই মনে হয় যে এঁরা সবাই তো দিব্যি বাংলা লেখেন, আমি কেন লিখতে পারব না!

একদিন সজনীবাবুকে বুক ঠুকে বলে ফেললাম, আমি যদি কোনও লেখা দিই, তা কি তিনি তাঁর কাগজে ছাপবেন? তিনি তখনই হেসে বললেন, কেন ছাপব না? ভাল লেখা হলে নিশ্চয় ছাপব, যদি ভাল লেখা না হয় তাহলে কোনও অনুরোধেই ছাপব না। আমি বললাম, ভাল লেখা কেমন করে লিখতে হয় তা তো জানি না, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে দেন। তিনি বললেন, কাউকে বোঝাতে হবে না, আপনি নিজেই বুঝবেন। লিখে সেটা কিছুদিন ফেলে রাখবেন, তারপর একদিন সেটা বের করে পড়ে দেখবেন যে কেমন হয়েছে। খুব পছন্দসই না হলেই তা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন, আবার নতুন করে লিখবেন। একই জিনিস নিয়ে বারে বারে লিখবেন—যতক্ষণ তা মনের মত না হয়। তারপর নিজে যখন খুশী হবেন তখন তা আনবেন আমার কাছে।

তাই করলাম। একই লেখা পাঁচ-ছবার লিখে তার নষ্ট করে শেষে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি লেখাটা

উল্টেপাল্টে দেখলেন, তিন-চার মিনিটের বেশী নয়। তারপর সেটা মুড়ে রেখে একটু হেসে বললেন, হয়েছে লেখা, নিচ্ছি আমি এটা। কিন্তু একটু-আধটু এডিট করতে হবে, তাতে আপনার আপত্তি নেই তো? আমি বললাম, নিশ্চয় না। সে লেখাটি যথাসময়ে তাঁর কাগজে স্থান পেল।

অতঃপর আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। কয়েক মাস ধরে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এক উপন্যাস লিখে ফেললাম। একদিন তাঁকে বললাম একটা উপন্যাস লিখেছি, আপনাকে আগে পড়ে শোনাতে চাই, শুনবেন কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত সময় লাগবে পড়তে? আমি বললাম, তা চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগতে পারে। তিনি বললেন, তা শুনতে পারি, কিন্তু তাহলে সেদিন আমার বাড়িতে আপনাকে খেতে হবে, একটা ছুটির দিনে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত তিনি মন দিয়ে শুনলেন। দু-এক জায়গাতে কিছু অদল-বদল করতে বলে তিনি বললেন, প্রথম প্রচেষ্টার পক্ষে ভালই বলতে হবে, এটি আপনি ছাপতে দিতে পারেন। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আপনার বাংলা লেখার হাত এসে গেছে।

খুব ভয়ে ভয়েই লেখাটা আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম কিনা তাঁকে! বাংলা ভাষা হল ফুলের মত নরম জিনিস। তাকে নিয়ে কলা-চটকানোর মত করে চটকাতে থাকলে যেমন জিনিসটা দাঁড়ায়, তা দেখলেই তিনি জ্বলে উঠতেন, তীব্র কশাঘাত না করে চুপ করে থাকতে পারতেন না। এ কথা আমি বিলক্ষণই জানতাম। তাই খুবই সতর্ক হয়ে সমস্ত লেখাটা লিখেছিলাম, বহুবার কাটাকুটি এবং অদল-বদল করে। সেই থেকে ওই রীতিটাই আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যা কিছুই লিখি, তা আমি কিছুকাল ফেলে রাখি। তারপরে সেটা পড়ে দেখি, মনঃপূত না হলে তা বাতিল করে আবার নতুন করে লিখি। এতেই দেখেছি নিজের দোষগুলো নিজেই বুঝতে পারি। তবে আমি তো পেশাদার নই, অ্যামেচার।

কিন্তু সজনীবাবু বরাবরই আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, যে-কোনও বিষয়েরই বাংলা রচনাতে। একবার 'আহার ও আহার্য' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কতকগুলি লিখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তা মংপুতে পাঠিয়ে দিতে, সেখানে তখন তিনি গমনোদ্যত। সজনীবাবু সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, ওগুলো আমার হাতে দিন, আমি তাঁকে দিয়ে আসব। তিনি স্বহস্তে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এলেন। পরে তা বিশ্বভারতী থেকে বই হয়ে ছেপে বেরিয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ, সেগুলি নিয়ে একটি পুস্তিকা তৈরি হয়। আমি সেই পুস্তিকার অনুবাদ করি। সজনীবাবু সানন্দে সেই অনুবাদ তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে দফায় দফায় প্রকাশ করলেন।

মাত্র কিছুকাল আগে তিনি গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে বললেন, পণ্ডিচেরীতে শুনে এলাম আপনি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কি কি বই লিখেছেন; কই, আমাকে পড়তে দিন। কিন্তু আমার কাছে সে বই একটিও ছিল না। তখন তিনি বললেন, তবে পণ্ডিচেরীতে লিখে পাঠান বইগুলি পাঠাতে, আমি পড়তে চাই। পণ্ডিচেরী থেকে সে বই আনিয়ে দিলাম।

কিন্তু মানুষটির অন্যদিকের কথা এখনও কিছু বলা হয় নি। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল, যাকে তিনি একবার বিশ্বাস করতেন তাকে পুরোপুরিই বিশ্বাস করতেন, আধাআধি নয়। আমার ডাক্তারিতে ছিল তাঁর সেই রকম বিশ্বাস—যাকে বলে ইম্‌প্লিসিট্ ফেথ। একবার তাঁর নিজের খুব রক্ত উঠতে শুরু করে। রক্ত-পিত্তের ব্যাপার। কিছুতে থামানো যায় না। দিনের পর দিন রক্ত উঠছে, আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত নির্বিকার। বন্ধুবান্ধব সকলেই পরামর্শ দিচ্ছে কোনও বড় ডাক্তারকে দেখাতে, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্যই করলেন না। বললেন, ওঁর হাতে যখন ছেড়ে দিয়েছি, উনিই সারিয়ে দেবেন। এমন বিশ্বাস ও নির্ভরতা খুব কম লোকেরই থাকে, আজকাল তো দেখাই যায় না।

আর এক গুণ ছিল তাঁর আশ্চর্য অমায়িকতা। যাঁর লেখনী অমন তীব্র তিনি আলাপে অত অমায়িক হতে

পারেন, এটা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অতি বিনীত-ভাবে তিনি কথা বলতেন, ইদানীং আমি গেলে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিতেন, আর আমি অপ্রস্তুত হয়ে উঠতাম। আর তার পরেই কিছু খাওয়ানো চাই। তিনি নিজেও যেমন খেতে ভালবাসতেন, অপরকেও তেমনি খাওয়াতে ভালবাসতেন। স্ত্রীকে ডেকে বলতেন, অমুক জায়গা থেকে মিষ্টি এসেছে, এনে দাও ওঁকে। আর তাঁর স্ত্রীও তেমনি—অনেকগুলি মিষ্টি এনে হাজির করতেন—যা একজনে খেতে পারে না। সেগুলি তিনি অবশেষে রুমালে ছাঁদা বেঁধে দিতেন, বলতেন, এগুলি বাড়ি নিয়ে যান, ধীরেসুস্থে খাবেন। দুজনেই সমান মিষ্টভাষী, অমায়িক।

কিন্তু এ সবই হল গৌণ কথা। আসল কথাটাই বলা দরকার। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মানুষ কতটা কি করতে পারলে তাই খুব বড় কথা নয়, কতটা কি হতে পারলে তাই হল বড় কথা। সজনীকান্ত করতে পেরেছেন অনেক কিছুই। তিনি অত বড় এক-খানা কাগজ করেছেন, নাম করেছেন, যশ করেছেন, বাড়ি করেছেন, ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন, আরও অনেক কিছু। কিন্তু তিনি কতটা কী হয়েছেন? তিনি হয়েছেন আমাদের ভাষামাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর সেই অবিচল নিষ্ঠার গুণে ভাষামাতৃকার বেদী হয়েছে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। তাঁর সেই বেদীর পাশে সজনীকান্তের বিশিষ্ট স্থানটুকু চিরদিন কায়েমী থাকবে। তাঁর সেই একাগ্র নিষ্ঠাই তাঁকে মহনীয় ও স্মরণীয় করেছে। জীবনে কত দুঃখ কষ্ট, ঝড় তুফান, অনাহার, অনিদ্রা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, সব কিছুরই তিনি সম্মুখীন হয়েছেন অদম্য সাহস নিয়ে, কিন্তু এই নিষ্ঠা থেকে তিনি একদিনের জন্যও বিচ্যুত হন নি। এই জীবনব্যাপী নিষ্ঠাই ছিল তাঁর অসাধারণত্ব।

সজনী-স্মরণে

যুবনাশ্ব

বেণীনন্দন স্ট্রীটের বাসায় ১৯৩২ সনে সজনী একদিন দেখা করতে এল। আমার দ্বিতীয় ছেলে অবলোকিতেশ তখন শিশু। একরাশ ফুলের মত ফুটফুটে ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছিল সজনী। ছেলেও ভালবেসে, অথবা আদরের আধিক্যে দিল সজনীর ধোপদস্ত জামাকাপড় ভিজিয়ে। বিব্রত হওয়া কি রাগ করা দূরে থাকুক, সজনীর সে কি হাসি। আমার আত্মীয়-পরিজনের কাছে ছেলে কোলে করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে মন্তব্য করে বেড়াতে লাগল—কবে তোর বাপকে গাল দিয়েছিলাম কাগজে, শোধ তুললি তুই আজ।

সাহিত্যকর্মের সমালোচনায় নিষ্করুণ, অথচ অন্তরে স্নেহপ্রবণ সেই অকৃত্রিম সুহৃদের কথা ভাবি। এই তো কদিন আগেও শান্তিনিকেতনে দেখা। পাটুদা, মুজতবা, সজনী মিলে একদিন অনেক রাত পর্যন্ত জমিয়ে আড্ডা দিল। মুখর মুজতবা ও প্রখর সজনীর টুকরো কথার আদান-প্রদানের পরম উপভোগ্য স্মৃতি এখনও মনে জাজ্জ্বল্যমান!

দু-এক বছরের আগে-পিছে পৃথিবীতে এসেছিলাম আমরা, আগে ওই-ই গেল। পরলোক বলে যদি কিছু থাকে তবে সেখানে গিয়ে বাসনা আছে আবার আমরা 'কল্লোল' বার করব। দীনেশদা, গোকুল, সুকুমার ভাদুড়ী, বিজয় সেন তো আছেনই সেখানে। বাকি আমরাও এলুম বলে। ব্রজেনদা, মোহিতলাল, সজনী 'শনিবারের চিঠি' বার করে আবার আমাদের ঝেড়ে ধোলাই দেবে, জমবে ভাল।

সান্নিধ্য

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম কৈশোরে যাঁকে না দেখেও মনে মনে নায়কের বেদীতে বসিয়েছি, যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই যাঁকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে দেখে এসেছি, আজ তাঁকেই স্মরণ করছি। কল্পনার দিন বিগত, প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যও আজ নেই, আজ থাকার মধ্যে আছে শুধু স্মরণ ও স্মৃতি।

স্কুলের উপরের ক্লাসে পড়বার সময় 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। সংবাদ-সাহিত্যের শ্লেষ-তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি মাথার মধ্যে ঘুরত কবিতার চরণের সঙ্গে। মুগ্ধ কিশোর-হৃদয় তখনই কল্পনা করেছিল সেই যোদ্ধাকে, যিনি অবলীলাক্রমে এমন রসোজ্জ্বল বাক্যের তীক্ষ্ণধার আয়ুধগুলিকে একের পর এক ক্ষেপণ করে চলেছেন। তাঁর হাতের এলোমেলো অথচ সুসংবদ্ধ, দ্রুতচারী অক্ষরগুলিকে পোস্টকার্ডের বুকে কতবার একান্ত কৌতূহলের সঙ্গে গোপনে লক্ষ্য করতাম। আর ভাবতাম যে মানুষটি চিঠিটি লিখেছেন তাঁর কথা।

সেই একান্ত কৌতূহল কিছুকালের মধ্যেই পরিতৃপ্ত হল। সজনীকান্তকে দেখলাম।

উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সন। সজনীকান্ত পাটনায় এলেন প্রভাতী সংঘের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করতে। মোটর থেকে নামলেন দীর্ঘকায়, শালপ্রাংশু, ফর্সা মানুষটি। মুখখানিতে নাক এবং বড় বড় চোখের উগ্র দৃষ্টিতে মানুষটির ব্যক্তিত্ব অন্য সকলের মধ্যেও একান্ত পৃথক ও প্রকট। ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণ ছিল, পরিচয় হল। স্নেহসিক্ত সহাস্য কয়েকটি কথা পেলাম তাঁর কাছ থেকে। কৃতজ্ঞ হলাম, কৃতার্থ হলাম।

তারপর সভায় তাঁকে দেখলাম সভাপতিরূপে। মনে হল বিধাতা যেন তাঁকে সভাপতিত্ব করবার সনদ দিয়েই পাঠিয়েছেন। সে সভায় ছিলেন বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর আর শরদিন্দুবাবু দুটি গল্প পড়েছিলেন সে সভায়। বনফুল আবৃত্তি করেছিলেন একটি ব্যঙ্গ কবিতা। শেষে সজনীকান্ত পড়লেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা—'কে জাগে'।

সজনীকান্তের তখন পরিপূর্ণ যৌবন। সবল, অকপট, প্রাণসার যুবক-কণ্ঠের আবৃত্তি আমি আজও আমার স্মৃতি মন্থন করে যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। তাঁর গদ্য-অভিভাষণ পাঠও আমার স্মরণে আছে। সে অভিভাষণের একটি কথা আজও স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন—বিদেশ-বাসিনী কন্যার কাছে মা যেমন তাঁর সংসারের প্রাচীনা ধাত্রীকে পাঠিয়ে কন্যার তত্ত্ব নেন এবং হৃদয়-বেদনাকে গোপনে সংগ্রহ করেন তেমনি ভাবেই তিনি প্রবাসী বাঙালীদের কাছে এসেছেন।

মনে আছে এই অংশটুকু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভায় বিপুল করতালিধ্বনি উঠেছিল।

সেবার সজনীকান্ত পাটনার প্রবাসী বাঙালী সমাজের চিত্তজয় করে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর হৃদ্য, প্রাণবান সবল, সরল, অকপট ব্যবহার দিয়ে মুগ্ধ করে এসেছিলেন পাটনার বিদগ্ধ বাঙালী-সমাজকে।

পাটনাতেই তাঁর আর এক রূপ দেখেছিলাম কয়েক বৎসর পর।

পাটনায় সেবার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হল মহাসমারোহে। সভাপতিত্ব করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পরদিন প্রাতঃকালে সাহিত্যশাখার অধিবেশন। সভাপতি মোহিতলাল। সজনীকান্তও বিশেষ আমন্ত্রণে সম্মেলনে এসেছেন। সম্মেলন আরম্ভের মুখেই সজনীকান্ত সভাপতি মোহিতলালের সঙ্গে সভাপতির আসনের পাশে এসে আসন গ্রহণ করলেন। সভা আরম্ভ হল। মোহিতলাল তাঁর ভাষণ পড়তে আরম্ভ করলেন। দীর্ঘ ভাষণের এক অংশে এক পণ্ডিত বৃদ্ধ গবেষক ও অধ্যাপক ও তাঁর পৌত্র, এক তৎকালিক আধুনিক কবি সম্পর্কে কিছু শ্লেষোক্তি, এবং হয়তো বা কিছু কটূক্তি ছিল। তাতে সভা কয়েক মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তারপর ভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে গিয়ে পড়তেই সভা আবার সহজ হয়ে এল।

কিন্তু বারুদ সঞ্চিত হয়ে ছিল। সজনীকান্ত সেটুকু

অব্যর্থভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন। সভা শেষ হবার পর মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সভা ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ আক্রমণ হল। চারপাশ থেকে কতকগুলি তরুণ মোহিতলালকে ঘিরে ধরেছে এবং উগ্রভাবে তাঁকে সেই কটূক্তি সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবি করছে। সজনীকান্ত একটু পিছনে ছিলেন। কথা বলছিলেন কার সঙ্গে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এগিয়ে গেলেন সেই ব্যূহের মধ্যে। প্রায় সপ্তদশ রথীর আক্রমণকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহত করলেন সজনীকান্ত। একান্ত উগ্র তেজের সঙ্গে বললেন—কি, কি হয়েছে কি? হ্যাঁ লিখেছেন, তাতে কি হয়েছে? ওঁর মত উনি ব্যক্ত করেছেন। কারও মানহানি না করেই তা করেছেন। এখন যেতে দিন।

কথাগুলির মধ্যেই হোক বা সে কণ্ঠস্বরেই হোক এমন কিছু ছিল যাতে আক্রমণ শান্ত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। বিচলিত মোহিতলালকে শত্রু-ব্যূহ থেকে বের করে নিয়ে সদর্পে বেরিয়ে চলে গেলেন সজনীকান্ত।

সেদিন হৃষ্ট, অকপট, প্রাণবান সজনীকান্তের মধ্যে আর এক মানুষকে দেখেছিলাম। এক ক্ষত্রিয় সেনানীকে। যার মধ্যে বিরূপ পরিবেশ ও ক্রুদ্ধ মনোভাবের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস ও অকুতোভয়তা আছে, যার মধ্যে বীর্যবত্তার প্রকাশ সুস্পষ্ট।

এ ধরনের সাহসী প্রকাশ আরও দু-একবার দেখেছি। দেখে বীর্যবান, সাহসী মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম গাঢ়তর হয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য।

সব মানুষের মধ্যেই নানান বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু অধিকাংশের জীবনেই এ প্রকাশ স্তিমিত।

এই স্তিমিত-প্রকাশ মানুষের সমাজে সজনীকান্ত এক ধরনের ব্যতিক্রম। অনেকখানি ব্যক্তিত্ব, অনেক সহৃদয়তা, অনেক উত্তাপ, অনেক বীর্যবত্তা, অনেক প্রাণোচ্ছলতা, অনেক উল্লাস—এই সজনীকান্তের পরিচয়। তার সঙ্গে ছিল বিপুল পাণ্ডিত্য, গভীর রসবোধ এবং সুগভীর গুণগ্রাহিতা। এই ধাতু ও সঞ্চয় দুইয়ে মিলে সজনীকান্তের পূর্ণ পরিচয়। সেই কারণেই সজনীকান্ত অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই 'শনিবারের চিঠি'র কেন্দ্রাধিপতি ছিলেন। তাঁকে অবলম্বন করে একটি রসিক সমাজের আস্তানা তৈরি হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে। সেই কারণেই আজ 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডার কথা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি। এ আড্ডায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য বা বয়স কোনটাই আমার ছিল না। তবু আমি সেই জমজমাট আড্ডা দেখেছি দূর থেকে। যখন কলকাতা শহরের মানুষ অফিসে অফিসে কর্মরত, কিংবা কাজের জন্য বাসে ট্রামে ভিড় জমিয়েছেন সেই সময়েই তো প্রতিদিন সকলের অগোচরে আকাশে মেঘ ভেসে গিয়েছে, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, পাখী ডেকেছে, সূর্যের আলোয় পৃথিবী প্লাবিত হয়েছে। প্রয়োজনের কাজের পাশাপাশিই এই অপ্রয়োজনের খেলার নিঃশব্দ সমারোহ তো চলেছেই। সেই অপ্রয়োজনের খেলার সমারোহের ছায়া পড়ত 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে। লেখক, কবি, রসিক মানুষরা সেই সময়ে এসে জুটতেন সেখানে, আড্ডা জমত, গল্প আরম্ভ হত, হাসির হর্‌রা ছুটত, উত্তপ্ত আলোচনা হত। সজনীকান্তের জন্য বার বার অন্দরমহল থেকে তাগিদ আসত। 'এই উঠছি' বলেও তিনি আবার অপ্রয়োজনের খেলায় মেতে উঠলেন। সেখানে এই অপ্রয়োজনের খেলার সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় ছিলেন তিনিই।

একদিনের কথা বলি।

বেলা এগারোটা হবে। টাকার প্রয়োজনে গিয়ে হাজির হলাম মোহনবাগান রো'র অফিসে। আমি পুত্রস্থানীয়। তাই আমি যেতেই সভার হাসি থেমে গেল সাময়িকভাবে। যে হাসির তখনই ভেঙে পড়ার কথা সে হাসি ভেঙে না পড়ে সবারই মুখে স্তম্ভিত হয়ে থমথম করতে লাগল। আমিও বিব্রত বোধ করলাম। পালাতে পারলেই যেন বাঁচি। সজনীকান্ত সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই বাবা?

বললাম, টাকা চাই।

কত?

তাও বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুলে তাড়াতাড়ি টাকা গুণে আমার হাতে দিয়ে তিনি যেন নিষ্কৃতি পেলেন। আমিও নোটগুলি হাতে নিয়ে পালাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছি সজনীকান্ত পিছন থেকে বললেন, গুনে নাও।

দাঁড়িয়ে গুনতে হল। গুনতে গিয়ে দেখি দশ টাকা বেশী। হেসে বললাম, দশ টাকার একখানা নোট বেশী দিয়ে দিয়েছেন।

নোটখানা বাড়িয়ে দিতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন গম্ভীরভাবে—তোমার সাধুতা পরীক্ষা করছিলাম। যাও।

তাঁর সদা-চেতন মনের কৌতুক-সরসতা সেদিন দেখেছিলাম ভাল করেই।

এ এক দিক, আর এক দিকের ছবি দেওয়া প্রয়োজন।

সজনীকান্ত বীরভূমের এক দুর্গম পল্লীগ্রামে এক কবি ও ভক্তের অনুরোধে ও আগ্রহে নির্জনবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই। ইচ্ছা ছিল বন্ধুদের তিনি একদিন তাঁর সম্পূর্ণ কীর্তি দেখিয়ে অবাক করে দেবেন। সেই উপলক্ষ্যেই একবার আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে তাঁর সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম মধ্যাহ্ন-ভোজের নিমন্ত্রণ নিয়ে। দু মাইল মাত্র রাস্তা। কিন্তু যাবার সে কি ক্লেশ! দুপুর এগারটার সময় এক মাইল কাঁকুরে পথ হেঁটে নদীর ঘাটে এসে তালের ডোঙার নৌকোয় আবার এক মাইল যাত্রা। আমাদের উৎসাহ রৌদ্রে ও ডোঙায় স্তিমিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সে কী উৎসাহ! কিন্তু সেখানে গিয়ে বাড়িখানি দেখে মুগ্ধ হতে হল। সজনীকান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মাটির ছোট্ট কোঠা ঘর। কিন্তু বাড়িটির সর্বাঙ্গে, সর্বত্র সশ্রদ্ধ অনুরাগ-রঞ্জিত রচনার চিহ্ন প্রত্যক্ষ ও প্রকট। কি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ছোট্ট বাড়িটি! এমন কি বাড়ির পাশে যেখান থেকে মাটি কেটে বাড়ির প্রয়োজনে তোলা হয়েছে সেখানে একটি ছোট্ট পুকুর তৈরি হয়েছে। সেটিও কি সুন্দর! সবটুকু দেখে বুঝলাম ভক্ত কবির অনুরাগ ও শ্রদ্ধা কত গভীর, কত অকপট। এ যেন দেবতার বাসের জন্য পরিপাটি করে রচনা করা হয়েছে। এ তো গৃহ নয়, দেবতার জন্য বেদী

দুপুরে সেই আমবাগানের ধারে বাড়ির একতলায় মাটির মেঝেতে কলাপাতা পাতা হল। আমরা খেতে বসলাম। সাধারণ আয়োজন। চালগুলি একটু মোটা। সঙ্কোচের সঙ্গে বলি—আমাদের খেতে একটু অসুবিধা হয়েছিল। সজনীকান্তেরও নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু কী আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে তিনি দুবার করে ভাত, ডাল, তরকারী চেয়ে খেয়ে যেন ধন্য হয়ে গেলেন। সে তৃপ্তি যে কী আন্তরিক, সে আগ্রহ ও আনন্দ যে কত সত্য তা আমি নিজে চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। নিজে চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। সেদিন বুঝেছিলাম তিনি যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ভক্ত-কবিটির কাছ থেকে আকর্ষণ করেছিলেন তার উৎস কোন্‌খানে!

সজনীকান্তের বাড়িতে যাঁরাই এসেছেন গিয়েছেন তাঁরাই তাঁর দুটি আবক্ষমূর্তি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন। একটি শিল্পী সুনীল পালের তৈরি, অন্যটি ভাস্কর দেবীপ্রসাদের রচনা। সুনীলবাবুর মূর্তিটির মধ্যে প্রতিদিনের বীর্যবান, হৃষ্ট সজনীকান্তকে সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু দেবীপ্রসাদের মূর্তিটি আমি বহুদিন বুঝি নি।

যখন অনেক ছোট ছিলাম তখনকার একদিনের কথা মনে পড়ছে।

সজনীকান্ত যেখানে বসেছিলেন তারই সামনে দেবীপ্রসাদের তৈরি করা মূর্তিটি রাখা ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলাম, এটার সঙ্গে আপনার কোন মিল নেই কিন্তু। দেখে মনে হয় আপনি যেন কাঁদছেন। কেমন কাঁদ-কাঁদ করে দিয়েছে আপনার মুখখানা।

আমার কথা শুনে সজনীকান্ত মুখে কিছু বলেন নি, শুধু একটু হেসেছিলেন। তাতে আমার বক্তব্যই আরও সত্য বলে মনে হয়েছিল আমার কাছে। তাঁর মুখের হাসি ও মূর্তির মুখের কান্নায় কোন মিল খুঁজে পাই নি।

কিন্তু অনেক দিন পর মিল খুঁজে পেয়েছিলাম।

বছর তিনেক আগের কথা।

বেলা দশটা সাড়ে দশটা হবে। অফিস যাবার পথে গিয়ে উপস্থিত হলাম সজনীকান্তের কাছে তিনি তখন

এক বন্ধুর সঙ্গে বসে সহাস্যে গল্প করছিলেন। যেতেই হাসিমুখে আহ্বান জানালেন—এস বাবা, কি খবর ?

বিনীত ভাবে জানালাম, আমার প্রথম বই বেরিয়েছে, আপনাকে দিতে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত বাড়ালেন। আমি বইখানি তাঁর হাতে দিলাম।

বইখানি নিয়ে তিনি একবার চাইলেন আমার মুখের দিকে। সবিস্ময়ে দেখলাম যে মুখ কিছুক্ষণ পূর্বে সরস হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল সেই মুখখানিতে বিখ্যাত ভাস্করের রচিত মূর্তির ছায়া পড়েছে। মুখখানিতে কেমন রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীর খানিকটাতে আকস্মিক শ্যাম ছায়া বিস্তারের মত আশ্চর্য বিষণ্ণতার স্পর্শ লাগল। বুঝলাম তাঁর অন্তর্লোকের মমতা এক মুহূর্তের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠে মুখে অনিবার্য প্রকাশে প্রকাশিত হল।

* * * *

অভিজ্ঞতাটুকু এইখানে শেষ হলেই ভাল ছিল। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি ছবি মনে আসছে।

শেষ দিনের ছবি, শেষ মুহূর্তগুলির ছবি। এগারোই ফেব্রুয়ারি, বেলা আড়াইটে। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে ক্লেশকর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য গৌরবর্ণ, ভরাট মুখখানি মুহুর্মুহু নীল হয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে তাঁর মুখে আবার তেমনি ধরনের বিষণ্ণতার ছায়া দেখেছিলাম। জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, অভিজ্ঞতা-যন্ত্রণা, আনন্দ-বেদনা থেকে ভারমুক্তির অন্তিম মুহূর্তগুলিতে জীবনের জন্য প্রেম ও মৃত্যুর তপস্যার মধ্যে যেন দ্বন্দ্ব বেধেছিল। এবং সমস্ত জীবন যেন গভীর ক্লিষ্টতার পথ বেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর ধ্যানে মগ্ন হতে চলেছিল।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কয়েকটি মুহূর্তের যন্ত্রণাকাতর বিষণ্ণতা মুখখানিতে লেগে রইল। তারপর মেঘ সরে গেল যেন, আকাশ আবার রৌদ্রকরোজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখের সব যন্ত্রণা সব বিষণ্ণতা মিলিয়ে গেল। তিনি নিমীলিত দৃষ্টিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। বিশেষ নির্বিশেষ হয়ে গেল। রইল শুধু স্নেহ ও প্রেমে জড়ানো নাম আর তার স্মৃতি।

সজনীকান্তকে যেমন দেখেছি

সঙ্কর্ষণ রায়

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর "বনস্পতির মৃত্যু" কবিতাটি লিখেছিলেন শ্রীসজনীকান্ত। বনস্পতি একদিকে যেমন তার অভ্রভেদী মহিমায় মহিমান্বিত, অন্যদিকে তেমনি তার শাখা-প্রশাখায় হাজার হাজার পাখির নীড়। বনস্পতির মতই রবীন্দ্র-প্রতিভা সবাইকে ছাপিয়ে উঠেও সকলকে কাছে টেনেছে। সজনীকান্ত কবিতাটির মধ্যে বলতে চেয়েছেন যে বড় প্রতিভার লক্ষণই হল এই শুভবুদ্ধি—যা সকলকে এক করে।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম সাহচর্যে এবং প্রভাবে কবির বনস্পতি-রূপ সজনীকান্তের মধ্যেও যে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি।

প্রায় দশ বছর আগে আমার একটি ছোটগল্প নিয়ে সজনীকান্তের কাছে গিয়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আমার কাছে ছিলেন তিনি সুদূর অভ্রভেদী মহিমা। অসংখ্য সাহিত্যযশপ্রার্থীদের মধ্যে আমার সাহিত্যপ্রয়াস তাঁর চোখে পড়বে না বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কাজেই 'শনিবারের চিঠি'র দপ্তরে প্রবেশ করতে সেদিন আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। সজনীকান্তের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন মনে হচ্ছিল বুঝি আমার পাণ্ডুলিপিটি হাত থেকে খসে পড়বে।

সাহস হয় নি মুখ তুলে তাকাবার। মুখ দিয়ে ফোটে নি কোন কথা। বরফ-ঠাণ্ডা একটা স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করছিল।

ঠিক এই সময় হঠাৎ বিস্ময়ের মত প্রসারিত হল একটি

বলিষ্ঠ হাত। আমি দিতে সাহস পাই নি, সজনীকান্ত নিজেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন আমার পাণ্ডুলিপিটি। আমার মনে হল শুধু একটি হাত নয়—যেন প্রসন্ন বরাভয় ফুটে উঠেছে আমার চোখের সামনে।

তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, বলিষ্ঠ মুখাবয়বকে প্রদীপ্ত করে রেখেছে ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি—কিন্তু প্রসন্ন প্রশ্রয়ের ছায়াসম্পাতে আশ্চর্যরকম স্নিগ্ধ।

পাণ্ডুলিপিটি নেড়েচেড়ে সজনীকান্ত বললেন, সাত দিন বাদে এসে গল্পটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জেনে যেতে।

অবাক হলাম। মাত্র সাতদিন! নতুন লেখকদের লেখা পড়াটা সম্পাদকদের কাছে বিড়ম্বনাদায়ক বলেই আমার ধারণা ছিল। আর ইনি কিনা বলছেন সাতদিন বাদে এসে খবর নিতে!

সাতদিন বাদে আবার গেলাম 'শনিবারের চিঠি'র দপ্তরে। আমাকে দেখেই সজনীকান্ত বললেন, তোমার গল্পটি এই সংখ্যাতেই যাচ্ছে।

নির্বাক বিস্ময়ে সজনীকান্তের মুখের দিকে তাকালাম। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমার ভেতরটা তিনি যেন মেপে নিলেন—তারপর বললেন, লেখো, লিখে যাও।

ঐ দিনটি আমার মনের চিরস্মরণীয়াগারে চিহ্নিত হয়ে আছে। মাসিকপত্রে গল্প ছাপা হওয়া ব্যাপারটা হয়তো খুবই নগণ্য—কিন্তু সেদিন আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার নিজের একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটখিনি খুলে অবারিত হল।

সাহিত্যচর্চা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কাছে গৌরবজনক, কিন্তু নবীন লেখকেরা সযত্নে তাকে আড়াল করে রাখতে চায়। তাদের কাছে তাদের লেখা যেন ভীরু লজ্জাবতী লতা, বাইরের আলোর স্পর্শমাত্রই যেন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতার বৃদ্ধ বরজলাল যেন তাদের বুকের মধ্যে মাথা নুয়ে আছে। 'গানভঙ্গে'র শেষ কটি ছত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাদের মর্মবেদনা—

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হ'বে দুই জনে—
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।

কিন্তু এই সব নতুন লেখকদের মধ্যে যারাই সজনীকান্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সপ্রেম গ্রহণশীল হৃদয়ের স্পর্শে কেটেছে তাদের দ্বিধা, তাদের স্পর্শকাতরতা। তাদের সাহিত্যপ্রয়াসে কণামাত্র প্রতিশ্রুতি থাকলেও পেয়েছে তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। বরজলালের লাঞ্ছনা ঘুচিয়ে দিতে এগিয়ে আসা রাজা প্রতাপ রায়ের মত সজনীকান্তের সহৃদয়তা তাদের টেনে এনেছে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে।

আমার নগণ্য সাহিত্যসৃষ্টিপ্রয়াস হয়তো সাদা কাগজে কিছু কালির আঁচড় টেনেই ক্ষান্ত হত, যদি না সজনীকান্তের সংস্পর্শে আসতাম। হাতে হাজার কাজ থাক, যখনই তাঁর কাছে কোনও নতুন লেখা নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তিনি বলেছেন, প'ড়ে শোনাও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লান্তিহীন ধৈর্যের সঙ্গে শুনে গেছেন তিনি আমার রচনাপাঠ। ভাল লাগলে স্বীকৃতি দিয়েছেন—ত্রুটি থাকলে শুধরে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণী সমালোচনা আমাকে সঠিক পথে চলবার নির্দেশ দিয়েছে—কিন্তু চলবার উৎসাহকে কখনও ম্রিয়মাণ করে দেয় নি। ভুলচুক যতই করি, সাহিত্যপ্রেরণার মূলটা সাহিত্যধর্মসম্মত হলে ওই মূলটাকে আঁকড়ে ধরে অগ্রসর হতে বলেছেন তিনি আমাকে।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি সজনীকান্তের কাছে গিয়েছিলাম—তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি সেদিন। অনেক বই ও সাময়িকপত্র ঘাঁটছিলেন তিনি প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করতে। বললেন যে প্রবন্ধটির জন্য দিনে প্রায় দশ ঘণ্টা খাটতে হচ্ছে তাঁকে; প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে খুব। আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, আমি এসে আপনার সময় নষ্ট করছি মনে হচ্ছে।

স্নিগ্ধ হেসে সজনীকান্ত বললেন, না না, সময় নষ্ট কী। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাও তো আমার কর্তব্য।

তাঁর কাছে আমার একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি ছিল। সেটা বের করে দিয়ে তিনি বললেন, পড়ে শোনাও।

সজনীকান্ত

সুশীল রায়

আমরা যখন লিখতে ঠিক আরম্ভ করি নি, আরম্ভ করব-করব করছি, তখন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে বিস্ময় ছিল সমান।

বর্তমানের প্রখ্যাত কয়েকজন সাহিত্যিক তখন খ্যাত হচ্ছেন। তাঁদের লেখা পাওয়ামাত্র তখন পড়ে ফেলি। পড়ার ফলে মনের উপর কি রকম ক্রিয়া হয়েছিল বা প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, সে কথা এখন মনে নেই। কিন্তু মনে আছে যে, তাঁদের সেসব লেখা পড়ে বিস্মিত হতাম।

সজনীকান্ত তখন ছিলেন যেন একজন টেরর। তাঁর কলম ছিল এমন ধারালো যে তিনি সেই কলমে সেসব লেখা কুচি কুচি করে যেন কেটে ফেলতেন। শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তের সেসব লেখা পড়েও বিস্ময় জাগত। কলম যে তরবারির চেয়েও ক্ষুরধার, এ কথাটা তখন বেশ ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

এই রকম একসময়ে সজনীকান্তের 'অজয়' বইটি হাতে এল। বইটা পড়ে ফেলা গেল। বই বন্ধ করে যেন ভাবনায় পড়লাম। যে ধরনের রচনাকে তিরস্কার করে তিনি লেখনী চালনা করেছেন, তাঁর এই বইটির ধরনও অবিকল সেই রকম মনে হল। যাকে আমরা আধুনিক রচনা বলি, 'অজয়' বইটিও তেমনি আধুনিক ভঙ্গিতেই লেখা।

তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে ভেবে মনে হয়েছে যে, সজনীকান্তের কলম আধুনিকতার বিরোধী ছিল না, আধুনিকতার ছদ্মবেশে উচ্ছৃঙ্খলতারই ছিল বিরোধী।

....

শোনালাম। শুনলেন তিনি মন দিয়ে।

তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন হালের কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে। বললেন যে আঙ্গিকসর্বস্বতা প্রাণহীনতার লক্ষণ—আঙ্গিকের দাসত্ব যে লেখক করতে শুরু করেছে, লেখক হিসেবে সে মরেছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি বললেন, লিখে যাও—কিন্তু মানুষের প্রতি সহানুভূতি হারিও না। লেখক যত শক্তিশালী হোক, তার মনে মানুষের ওপর ভালবাসা বা দরদ না থাকলে সে ব্যর্থ।

এর পর পাঁচ দিন বাদে সজনীকান্তকে দেখলাম তাঁর অন্তিম শয়নে। অগণিত ভক্ত, গুণগ্রাহী ও সুহৃদদের অশ্রুভরা মৌন বেদনা থমথম করছে সমস্ত বাড়ি জুড়ে। এই হঠাৎ বিচ্ছেদের আকস্মিকতায় সকলেই স্তম্ভিত ও মুহ্যমান। সকলের নির্বাক শোক হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠল পতিবিয়োগবিধুরা শ্রীযুক্তা দাসের কণ্ঠে, 'কেন এমন হল···অনেক কাজই তো তাঁর বাকি ছিল।' এই আর্ত প্রশ্নের জবাব কেউ জানে না। জীবনের সব পরিকল্পনা, হিসাব-নিকাশকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হঠাৎ আসে মৃত্যুর পরোয়ানা। আকস্মিক বিচ্ছেদের ক্ষতি যে শূন্যতা সৃষ্টি করে, তাকে ভরে তোলবার মত কিছুই খুঁজে পাই না আমরা সাময়িকভাবে।

অথচ আমাদের সকলের শোকার্ত শূন্যতাবোধের মাঝখানে আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাচ্ছিল সজনীকান্তকে। যেন জীবনের সীমানা পেরিয়ে অপার্থিব শান্তির স্বাদ পেয়েছেন তিনি। তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—আমাকে শেষ যে কথাগুলি বলেছিলেন তার প্রতিধ্বনি—মানুষের প্রতি সহানুভূতি হারিও না।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা সুনিশ্চিত প্রত্যয় অনুভব করলাম যে মরজীবনের গণ্ডী অতিক্রম করেও মানবদরদী সজনীকান্ত আমাদের ছেড়ে যান নি। সাহিত্যের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে ধারণ করে রেখেছিল যে মানুষের প্রতি সমবেদনা, তাতে অমর হয়ে রইলেন তিনি। আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েও আমাদেরই মাঝখানে শাশ্বত হয়ে রইল তাঁর দরদী হৃদয়।

—

এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন, সে আমলে সজনীকান্তের কলমের দ্বারা যাঁরা আক্রান্ত ও আহত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেও।

কিন্তু সজনীকান্ত যখন টেরর, যখন তাঁকে চোখে দেখি নি কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে নানারকম কথা শুনে একটা মনগড়া মূর্তি খাড়া করে নিয়েছি, তখন, আজ অকপটে স্বীকার করে নেব, তাঁকে মনে-মনে ভালবাসতাম না। মনে হত তিনি ভীষণ ও ভয়ংকর, মনে হত তাঁর মন বুঝি বড় নীরস ও বড় নিষ্ঠুর। তাই, তাঁকে দেখার ইচ্ছেও হয় নি।

তাঁকে দেখার ইচ্ছে হয় নি বটে, কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য দেখার জন্য লালায়িত থাকতে হত। শনিবারের চিঠিতে সে সব অভিমতের অনেকগুলিই আজও ভুলতে পারি নি, এখনো মুখস্থ বলা যায়।

তাঁকে টেরর বলে মনে যে হয়েছিল তার কারণ আছে। তখন নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার মত অভিজ্ঞতা হয় নি, অন্যের মুখের কথাকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করার মতই মনটা তখন বেকুব ছিল। কাঁচা মাটিতেই দাগ পড়ে; সজনীকান্ত সম্বন্ধে মনের উপর দাগ পড়েছিল অনেকটা সেইভাবেই। মাটি শুকিয়ে উঠলেই দাগটা মুছে যায় না। সজনীকান্ত সম্বন্ধে দাগটা সেইজন্যে অনেকদিনই টিকে ছিল।

সজনীকান্তকে তাই ভালবাসতাম না।

তারপর সজনীকান্তের কবিতা পড়ি। কবিতা পড়ে একটু অবাকই লাগল। নির্দয় ও নিষ্ঠুর বলে যারা তাঁকে প্রচার করেছে, তাদের কথা ভুল বলে সন্দেহ হতে লাগল। এখনও মনে পড়ে তাঁর সেই কাহিনী-কবিতাটির কয়েক ছত্র—

কেড্‌স্ একজোড়া একজোড়া স্যাণ্ডাল
কেড্‌স্ সে বাটার, স্যাণ্ডাল-জোড়া
ডেস্‌কো হইতে কেনা
সাদা চামড়ার উপরে সাচ্চা জরি।

অন্যের কথা শুনে কোন মানুষের বিচার করা যে ভুল, এ কথা এখন শিখেছি। এখন কাউকে চিনতে হলে তাই তার সঙ্গে পুরোপুরি চেনা-জানা করে নিই। এই প্রণালীতে চলাফেরা করে চোখও খুলে গিয়েছে। এমন কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বাইরে পাঁচজনের কাছে যাঁরা সজ্জন আর সুজন আর অমায়িক বলে পরিচিত, কিন্তু আসলে হীনতায়-নীচতায় কুচক্রে যাঁদের জুড়ি নেই। এটা প্রচারের যুগ। কৌশলের সঙ্গে প্রচার করে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করে দেওয়াও বুঝি আজকাল সম্ভব! যারা ঘৃণ্য হবারও বুঝি যোগ্য নয়, তাদের অনেকেও শ্রদ্ধা তাই পাচ্ছে এবং পাঁচজন পরম শ্রদ্ধেয় মানুষের সঙ্গে সমানে চলাফেরা করছে।

এর বিপরীত দিকও আছে অবশ্যই।

সজনীকান্ত সম্বন্ধেও বুঝি সুকৌশলে কিছু কিছু প্রচারকার্য চলেছিল, যার জন্যে তাঁকে টেরর বলে জানতাম। কিন্তু তাঁর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছবার সুযোগ যেদিন ঘটল সেদিন দেখলাম তিনি এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একজন মানুষ।

তিনি ভীষণ নন, ভয়ংকর নন, নির্দয় নন, নিষ্ঠুর নন। তিনি এর বিপরীত। তিনি একজন কবি।

সাহিত্যের প্রতি সজনীকান্তের নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা অনুকরণের ও অনুসরণের জিনিস। তিনি বিলাসী সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যের নিষ্ঠাবান পূজারী। পুরাতনের প্রতি ও পূর্বসূরীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দেখেছি যেমন গভীর, নবীনের প্রতি স্নেহের গভীরতাও ছিল সেই অনুপাতে।

সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি এর বেদী যাতে অপবিত্র না হয় তার জন্যে নিজেকে প্রহরীর মত বেদীর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। প্রহরীর প্রতি অপ্রসন্ন হওয়া স্বাভাবিক। যারা সজ্জন, সমাজের বা সাহিত্যের ঘরে সিঁদ দেওয়ার অভিপ্রায় যাদের নেই তারা প্রহরীকে দেখে ভয় পায় না। প্রহরীর প্রখর দৃষ্টি দেখে তারা ডরায় না। কিন্তু সর্বত্রই এমন কেউ কেউ থাকে যার জন্যে প্রহরী মোতায়েন রাখার দরকার আছে।

সজনীকান্ত কবি, সজনীকান্ত কথাকার, সজনীকান্ত গবেষক—এক কথায় বঙ্গসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সাধক সজনীকান্ত। তার উপরে তাঁর বাড়তি আর একটা পরিচয় এই যে, সজনীকান্ত ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের সজাগ প্রহরী।

তিনি প্রহরী ছিলেন, এই জন্যেই বুঝি তিনি টেরর। টাঁকশালেও প্রহরী থাকে, কত পথচারী সেই পথ দিয়ে নির্ভয়ে ও নির্ভাবনায় চলে যায়। কিন্তু ওই পথচারীদের মধ্যের দু-চারজনের কাছে নিশ্চয়ই সে টেরর।

অন্যত্র বলেছি। সেই কথা এখানে পুনরায় বলা যায় যে, প্রহরীর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনেক সময় কারও কোনও কাজে তাঁকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, অকপটে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তাঁর সেই অকপট ভাষণ অনেকের কাছে রূঢ় ভাষণ বলে মনে হয়ে থাকতে পারে। এই জন্যে সম্ভবতঃ তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন নি। তাতে ভালোই হয়েছে। জনপ্রিয় কথাটাও যেমন হালকা, জনপ্রিয়তা জিনিসটাও তেমনি ঠুনকো। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না হয়তো, কিন্তু তিনি ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের প্রিয়জন। সজনীকান্তের জীবনের এইটেই পরম পুরস্কার।

বর্তমান লেখকের পরিচয় তাঁর সঙ্গে বেশিদিনের নয়, বছর চার-পাচের। এই কয় বছরের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কখনও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাগৃহে, কখনও ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের তাঁর লাইব্রেরি-ঘরে। সব সময়েই দেখেছি তিনি একটা-না-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অনেকের কাছে যেমন, সাহিত্য তাঁর কাছে তেমন ছিল না—সাহিত্য তাঁর কাছে জীবিকা ছিল না, সাহিত্য ছিল তাঁর জীবন। যাঁকে টেরর বলে জেনে এসেছি, তাঁর কাছে এসে প্রত্যক্ষভাবে জানলাম, তিনি টেরর নন, তিনি টিচার। সাহিত্যকে কি ভাবে ভালবাসতে হয় তিনি তাঁর নিজের নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে তা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এজন্যে তাঁকে নমস্কার করি, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

যাঁরা তাঁকে টেরর বলেন তাঁদের জন্যে অন্ততঃ সজনীকান্তের দরকার। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটা আসে, একটা চলে যায়—ঢেউয়ের আনাগোনা বন্ধ থাকে না। কেউই চিরজীবী যখন নয়, মৃত্যু যখন অনিবার্যই তখন সজনীকান্তের মৃত্যুও আর পাঁচজনের মৃত্যুর মতই স্বাভাবিক। তাঁর স্থান পূরণের জন্যে আবার আসবেন নতুন কবি, নবীন কথাকার, এবং উৎসাহী গবেষক। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের প্রহরীর মূর্তি নিয়ে সহসা যদি কেউ না আসেন, তা হলে সাহিত্যের সমূহ বিপদ। এই কথা মনে করে মনে হচ্ছে আরও কিছুকাল অন্ততঃ তাঁর জীবিত থাকা দরকার ছিল। তাঁর অকালমৃত্যুটা এইজন্যে দ্বিগুণ শোকাবহ লাগে।

কিন্তু এ কথা ঠিক, এখনও আমাদের চোখে না পড়লেও নবীন সাহিত্যিকদের মধ্য থেকেই হয়তো সহসা আবির্ভূত হবেন অমনই একজন তেজস্বী পুরুষ। আমরা তাঁর আবির্ভাব-প্রত্যাশায় থাকলাম।

সজনীকান্ত যখন তাঁর শেষ গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' রচনা করছেন তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকবার তাঁর লাইব্রেরি-ঘরে আলোচনা হয়েছে। ওই বইয়ে তিনি এমন-সব তথ্য দিয়েছেন অনেকের কাছেই যা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। তাঁর কাছে তথ্যের ভাণ্ডার আছে, এ সত্ত্বেও সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখে মজা লাগছিল। এভাবে আলোচনা তিনি করতে নাকি চান তথ্য যাচাই করে নেবার জন্যে, যাতে কোনও ভুলচুক না থাকে। বইয়ের পুরো ভূমিকাটা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা তাঁর মৃত্যুর চার-পাচদিন আগে। সেদিন তিনি আমার কাছে তাঁর অনেকগুলি বই দিলেন। শান্তিনিকেতনে গেলে যেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে কয়েকটি এবং রবীন্দ্রসদনে কয়েকটি পৌছে দিই।

বললেন, সাহিত্য-সম্মেলনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বড় ভাল লেগেছে। প্রবোধবাবুকে আমার কবিতার বইগুলো দেব কথা দিয়ে এসেছি। ঋণ আর রাখতে চাই নে। ওঁদের দিয়ে দেবে তো?'

বললাম, 'দেব।'

সজনীকান্ত তাঁর ঋণ শোধ করে গেলেন। কিন্তু বইগুলি এখনও আমার কাছে, এখনও যথাস্থানে পৌছে দেওয়া হয় নি।

এখনও ঋণমুক্ত করতে পারি নি তাঁকে। এজন্যে নিজেও ঋণী আছি।

—

ভয়ত্রাতা পিতা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

মাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বরাবরই কেমন বাধো-বাধো ঠেকত, মনে হত যেন লোক-দেখানো একটা অনুষ্ঠানের লঘুতা স্পর্শ করছে আমার অন্তরের নম্রতাকে। যেখানে সমস্ত সত্তাই অর্পিত সেখানে শুধু পায়ে হাত ছোঁয়ানো যেন নেহাতই বাহ্যিক ব্যাপার। আজ সজনীকান্ত সম্পর্কে কিছু লিখতে বসেও সেই পুরনো বাধো-বাধো কুণ্ঠার সঙ্কোচ আমাকে কুঞ্চিত করছে। কি বলব? কোন্ কথাটা রেখে কোন্‌টাই বা বলি।

সজনীকান্তকে যে কখনও হারাব এমন আশঙ্কা সত্যিই আমার মন মেনে নিতে পারে নি। অথচ এর আগেও তো তাঁর জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছে। তখনও কাছে গিয়ে বসেছি, দেখেছি। তবু বিশ্বাস হয় নি যে তিনি আমাদের ফেলে রেখে চলে যেতে পারবেন। আর, যখন গেলেন তখন টেরও পেতে দিলেন না যে তিনি যাচ্ছেন। সত্য বড় নিষ্ঠুর, মৃত্যুর পরোয়ানা মানুষ রোধ করতে পারে না। তিনি নেই। যখন ছিলেন, তখন টের পাই নি তিনি আমার কতখানি জুড়ে ছিলেন। এখন তাঁর অভাবের মধ্য দিয়ে অনুভব করছি, যা হারালাম তার গুরুত্ব, তার ব্যাপ্তি।

সত্যি কথা বলতে গেলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি আমার জীবনে পিতার আসন দখল করেছিলেন। না, তিনি দখল করতে আসেন নি, আমিই কখন সেই আসনে তাঁকে বসিয়েছিলাম সে খবর নিজেও রাখি নি। হয়তো আমার এ উক্তিকে কেউ আতিশয্য বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু সে তাঁর ভুল, সে দোষ আমার নয়। জন্মদাতা পিতা ছাড়াও আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পিতার কথা আছে, সজনীকান্ত আমার সেই অপর পিতা, আমার সাহিত্য-জীবনে ভয়ত্রাতা পিতা। কেন? বলছি।

তখনও সাহিত্যের বাজারে আমাকে কাজের কাজী ছাড়া বেশি লোক চেনেন না; যাঁরা চেনেন তাঁদের মধ্যেও খুব অল্প কয়েকজনই কনিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে আমল দেন। এমন অবস্থায় আমি একখানি বই লিখে বসলাম। নিজের খুশিমত লেখা চুকিয়ে দুশ্চিন্তা হল—যা লিখেছি তা তো ঠিক ছক-মাফিক উপন্যাস হল না। তা হলে এটা কি হল? আদৌ কিছু হয়েছে; না 'কিস্যু' হয় নি?

একবার কাউকে দিয়ে যাচিয়ে নিতে পারলে হত। সেই সময়ে গজেনদা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে বললাম, তিনি পড়ে পরখ করতে রাজী হলেন। এদিকে সজনীকান্তের সঙ্গেও দেখা করে অনুরূপ আরজি দাখিল করেছি। তিনি হাসপাতালে গজেনদাকে দেখতে গিয়ে আমার পাণ্ডুলিপিটি টেবিলে পড়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে বসলেন—এটা কী? তোমার নতুন বই?

গজেনদা বললেন, না, গৌরীর উপন্যাস।

সজনীকান্তের পরবর্তী প্রশ্ন—তুমি পড়েছ?

হ্যাঁ।

কেমন?

যেমন হয় মডার্ণ উপন্যাস—গল্প নেই, কেবল বুদ্ধি-বৃদ্ধি কথা!

তাই নাকি! গৌরী বোধ হয় এই বইয়ের কথাই আমাকে বলেছে।

তারপরের ঘটনাও খুবই মামুলী। গজেনদা আমাকে বকলেন, তুমি যে সজনীবাবুকে এটা পড়তে দেবে বলেছ সেটা আমাকে জানাও নি কেন? তা হলে—

যাই হোক, সজনীবাবুর বাড়িতে গেলাম দেখা করতে। তিনি বললেন, গজেনের কাছে তোমার বইয়ের কথা শুনলাম। সে তো প্রশংসা করল না। তাতে অবিশ্যি ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি পড়ব।

পড়ার পালাটা আমার উপরই রইল; সজনীকান্ত শ্রোতা হলেন। খুব সম্ভব তিন দফায় ঘণ্টা পাঁচেক ধরে তিনি শুনলেন।

পরিশেষে সজনীকান্ত যা বলেছিলেন সেটা লিখতে কলমে আটকাচ্ছে। কিন্তু, যেহেতু সে উক্তি আমার নয় এবং তা গোপন করলে আজকের এই লেখার মধ্যে

মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে সেহেতু সত্যি কথাটা না লিখে পারছি না। তিনি বললেন, এতদিন যে গৌরীশঙ্করকে দেখেছি, এ লেখা শোনার পর তোমার পরিচয় পাল্টে গেল আমার কাছে। তোমার এ বই উপন্যাস হবার অপেক্ষা রাখে না, সার্থক শিল্প হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কি জান? তোমার লেখা আমার মনকে ইন্‌স্পায়ার্ড করেছে। যদি কোন সৃষ্টি অন্য কোন শিল্পীর মনে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা এনে দেয়, তা হলে বুঝতে হবে যে সে সৃষ্টি সামান্য নয়, স্রষ্টা সার্থক। যদি তোমার নিজের পত্রিকায় না ছাপ তা হলে আমাকে এ লেখা দাও— 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপব।

বইখানির নামকরণও সজনীকান্তের, তিনি বললেন, নাম দাও 'অ্যালবার্ট হল'।

এই প্রসঙ্গের অবতারণা করার পিছনে আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকলে আমি মার্জনা ভিক্ষা করব। কিন্তু একদিন রাত্রি এগারোটার সময় ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে আমাকে যে অপরিসীম ভরসা, যে আশ্চর্য আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধান তিনি দিলেন তা দুর্লভ। সেদিন সত্যিই তিনি ভয়ত্রাতা পিতার মত আমাকে সাহস যুগিয়েছিলেন।

আমার মনে যে প্রত্যয়ের বীজ তিনি রোপণ করলেন, কতকটা তার ওপর নির্ভর করেই 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' রচনায় হাত দিই। লেখা খানিক দূর এগোবার পর আবার আরজি পেশ করলাম, উনিও মঞ্জুর করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। এবারের পাঠ প্রাতঃকালে। শুনতে শুনতে বেলা গড়িয়ে যায়। সতীশের কণ্ঠে স্নানের পরোয়ানা। উনি তেল মাখতে মাখতেই শুনতে থাকেন লেখা। অসমাপ্ত লেখার ওপর ফতোয়া দিলেন—জানি না তোমার মনে কি আছে। তবে যতদূর বুঝছি এটা বিরাট উপন্যাসের ভূমিকা মাত্র। লিখে যাও, লেখ, লেখ।

'ইস্পাতের স্বাক্ষর' লিখতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল। এরই মধ্যে একদিন বাংলা দেশের একজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী নিজের অজ্ঞাতেই আমাকে প্রায় দমিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের দুপুর, হঠাৎ তিনি পায়ের ধুলো দিলেন আমাদের বাসা-বাড়িতে। তখন বাড়িতে একখানি মাত্র ফ্যান। সেই ঘরে গলদঘর্ম আমি লিখছিলাম। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, লিখছিলে?

কোনরকমে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওঁর সামনে আজও আমি নিজের সাহিত্য-প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে কোনও কথা তুলতে ভরসা পাই না; ওঁর নিষ্ঠা, ওঁর সাধনা, ওঁর শক্তি, শ্রদ্ধায় মূক করে দেয় আমাকে।

উনি পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি? উপন্যাস? কি নিয়ে লিখছ, কত বড় হবে?

বড় বই হবে। পাঁচ-ছ শো পৃষ্ঠা তো বটেই! শ্রমিক-মালিক সমস্যা নিয়ে লিখছি।

ওঁর মত শিল্পী আমার রচনা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, এতে আবেগে আমার অন্তর আপ্লুত। উৎসাহের বশে হয়তো বেশিই বলেছিলাম।

পাকা জহুরী ফতোয়া দিলেন—ওদের নিয়ে এত বড় বই লেখার কি আছে? জানি নে বাপু, বেশ করছ!

তাঁর এই উক্তির মধ্যে যে অননুমোদন ছিল তা আমাকে সাময়িকভাবে বিচলিত এবং নিরুদ্যম করেছিল। কিন্তু ধন্বন্তরি সজনীকান্তের স্বর্ণপট্টপটি আমার সহায়, অতএব, নিজের সঙ্কল্প আঁকড়ে ধরে 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' লিখে শেষ করলাম সাড়ে চার বছরে।

শিবের গীত গাইতে গিয়ে ধান ভানার গল্প জুড়ে বসেছি মনে হচ্ছে। আমার সাহিত্য-জীবনের ইতিকথা বলতে বসি নি। কিন্তু সজনীকান্তের প্রসঙ্গ মানেই তো সাহিত্য-সাহিত্যিক প্রসঙ্গ। শুধু তো আমার একার জীবনেই এ ঘটনা ঘটেছে, তা নয়, বাংলা দেশের বহু সার্থক স্রষ্টার সঙ্গেই তাঁর এই জাতের সম্পর্ক। আমার পূর্বসূরীদের আমলেও সজনীকান্তের সাহিত্যপাঠের আসর জমকালো ছিল; পরবর্তীকালেও তিনি নবাগত সাধকদের সঙ্গে এসে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন, এগিয়ে যাও। ভয় নেই। কোন ভয় নেই। কে কি বলল, না-বলল, তার দিকে তাকিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ো না।

এমন মানুষ যদি ভয়ত্রাতা পিতা না হন তবে কাকে ওই আসনে বরণ করে নেবো?

ছাড়া ছাড়া ভাবে কত ছোট বড় ঘটনার নুড়ি কল্পনার মুঠোতে উঠে আসছে,—তারা চরিত্রে প্রত্যেকেই বাণেশ্বরের প্রতীক, তাদের প্রতিটির মধ্যেই সজনীকান্তের

বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু গৌরীশঙ্কর-চূড়ার দিকে তাকালে যেমন মাদৃশ সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে তেমনটি আর কিসে! তেমন একটি নিদর্শন দিলেই তো মানুষটিকে বোঝা যাবে।

কবি মোহিতলালেরও শবদাহ হয়েছিল নিমতলার শ্মশানঘাটে। তবে সেটা ছিল দিবা-দ্বিপ্রহর, আর সজনীকান্তের চিতায় আগুন পড়ল রাত দুপুরে। মোহিতলালের মৃত্যুর দিনে সকাল থেকে অবিরাম ধারাবর্ষণ, আর সজনীকান্তের মৃত্যু হল শীতের শেষে। দুটি চিতারই আগুন দেখেছি।

গভীর রাত্রে বিরাট বীরের শায়িত দেহের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল মোহিতলালের শ্মশানের একটি দৃশ্যের ছবি। চিতা সাজানো হচ্ছে, সজনীকান্ত বিমর্ষ বসে রয়েছেন। নারায়ণ গাঙ্গুলী মশাই গঙ্গার স্রোতের দিকে তাকিয়ে আবেগ-থর-থর কণ্ঠে কবি মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন। হঠাৎ একটি পরুষ কণ্ঠ গর্জে উঠল: আপনি এখানে কি করতে এসেছেন। চলে যান, দূর হয়ে যান—

কে বলছে? কাকে?

মোহিতলালের অন্ধভক্ত একজন আক্রমণ করেছে সজনীকান্তকে। আক্রমণকারীর ভাষায়, ভাবে প্রচণ্ড বর্বরতা ফেটে পড়ছে।

কিন্তু সজনীকান্ত অবিচল।

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই আক্রমণকারীকে নিরস্ত করতে উদ্যত হলেন। আক্রমণকারীর দলে আরও দু চারজন সমর্থক রয়েছে। তারা যেন শ্মশানের মৌন গম্ভীর পরিবেশকে তছনছ করে দেবে!

কিন্তু সজনীকান্ত স্থিতচিত্ত, তিনি নিরুত্তপ্ত সুরে জবাব দিলেন, আপনার যা ইচ্ছে বলতে পারেন, আজ আমাকে তাড়াতে পারবেন না। বৃথা কেন উত্তেজিত হচ্ছেন। আজ আমাকে মারলেও প্রতিবাদ করব না, এখান থেকে একটুও নড়ব না। আপনি যা-ই ভাবুন, আজ আমার পিতৃবিয়োগের সমান বেদনা—অন্ততঃ আজকের দিনটা আমাকে ক্ষমা করুন।

আরও কি বলেছিলেন তিনি, ঠিক মনে নেই। যেটুকু মনে দাগ কেটে বসে রয়েছে তা হল তাঁর আশ্চর্য মনোবলের পরিচয়। এককালে যেমন সজনীকান্তের উপর স্নেহের অমিয় বর্ষণে অকৃপণ ছিলেন মোহিতলাল তেমনি শেষ জীবনে তিনি সজনীকান্তের নাম পর্যন্ত সইতে পারতেন না। পি. জি. হাসপাতালে তিনি যখন অন্তিম শয্যায় তখন সজনীকান্ত মোহিতলালের সামনে যেতেন না; হাসপাতালে যেতেন, বাইরে থেকে খবরাখবর নিতেন এবং তাঁর যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করতেন অন্যের মারফতে।

তাঁকে যতটুকু দেখেছি তাতে বার বারই মনে হয়েছে তাঁর বুকের প্রসারতা অসাধারণ।

একদিকে সাহিত্য-সমালোচকের ভূমিকা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা—জ্ঞাতসারে এই দুটো দিককে তিনি বোধ হয় কখনও মিশিয়ে ফেলতেন না। এবং ব্যক্তিগত জীবনে যাঁদের সঙ্গে তাঁর অতি নিকট-সম্পর্ক তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে স্পষ্ট সত্যটুকু ছাপা অক্ষরে উচ্চারণ করতে তাঁর আদৌ দ্বিধা ছিল না। এই নির্ভীকতার জন্য বিস্তর দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন। হয়তো বন্ধুরা তাঁকে ভুল বুঝেছেন। সেজন্য সজনীকান্তও দুঃখ পেয়েছেন, তবু তাঁর লেখনীকে খর্ব হতে দেন নি। তেমনি দূরে সরে যাওয়া বন্ধুকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। একবার যদি কেউ তাঁর হৃদয়ে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে তারপর আর তাকে তিনি দূরে চলে যেতে দেন নি।

তা যদি না হত তবে আজ আমার মনেই বা এত শ্রদ্ধা জমে উঠবে কেন তাঁর জন্য! আমি তো তাঁকে আঘাত দেবার চেষ্টা কিছু কম করি নি। একবার-দুবার নয়, বার বার তাঁর আচরণে রুষ্ট হয়ে অসংযত ভাষায় অপমান করতে গিয়েছি, তিনি হাসিমুখে প্রশান্তচিত্তে সহ্য করেছেন। পরে, নিভৃত আত্মসমালোচনার আয়নায় নিজের ভুল দেখতে পেয়ে কী লজ্জাই না পেয়েছি!

সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রথম যুগে সজনীকান্তের মত মানুষকে পেয়েছিলাম বলেই হয়তো পারিপার্শ্বিক অনাত্মীয়-সুলভ আবহাওয়া আমাদের হতোদ্যম করতে পারে নি। কিন্তু আগামী কালের ধূধূ মরুপ্রান্তরের দিকে নজর পড়লে দুশ্চিন্তা হয়, নবাগত আর অনাগত সাহিত্য-পথিকদের কে রয়েছে এমন সাহস দেবার ব্রত নিয়ে! কে বলবে—এগিয়ে যাও, এই তোমার পথ।

আমার ব্যক্তি-জীবনে সজনীকান্ত-বিয়োগ যে বেদনা দিয়েছে তার কতটুকুই বা পারব অক্ষম লেখনীতে প্রকাশ করতে! যতই লিখি না কেন তৃপ্তি হবে না। এক জায়গায় থামতেই হবে। কিন্তু মন থামবে না; অক্ষম এই মানুষটা তাঁর দেওয়া ভরসার পুঁজিটুকু বুকে পুষে রাখবে চিরকাল।

তিনি এক এক সময় বলতেন, জান, স্বভাবে আমি রাজহংস, কিন্তু প্রয়োজনে মোরগের কাজই করতে হয়।

এখন হয়তো তিনি সম্পূর্ণই সেই রাজহংস হতে পেরেছেন। মোরগের ডাক শুনতে পাব না আর কেউ!

সজনীকান্ত

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মানুষ আসে, আবার চলে যায়, রেখে যায় তার স্মৃতি। সজনীকান্তও এসেছিল, আবার একদিন অকস্মাৎ চলে গেল। সেও কি শুধু তার স্মৃতিটুকুই রেখে গিয়েছে ?

যুগে যুগে ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাব হয়, তাঁদের জীবনের সাধনা সমগ্র দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে, অনাগত ভবিষ্যতের কর্ণধার হয়ে তাঁরা শাশ্বত কালের পূজনীয় হয়ে থাকেন, তাঁদেরও স্মৃতিপূজা আমরা করে থাকি ; কিন্তু সেই স্মৃতিপূজার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের স্বীকারোক্তি। আজ সজনীকান্ত সম্বন্ধেও সর্বপ্রথমেই মনে হয়, তার কাছে আমাদের জাতীয় ঋণের সীমা নেই।

আমরা দুজন দুদিক থেকে এই কলকাতা মহানগরীতে মিলিত হয়েছিলাম। সজনীকান্ত তার 'পান্থপাদপ' কাব্যগ্রন্থখানি আমার হাতে তুলে দেবার সময় উৎসর্গপত্রে আমাদের সেই প্রথম পরিচয় অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছে :

কোথায় পদ্মা ভরাযৌবনা রূপসী কল্লোলিনী,
কোথা দামোদর রুক্ষ শীর্ণ রিক্ত সে যোগীবর,
প্রেম-বন্যায় দুই কূল-ভাঙা ক্ষণিক ক্ষ্যাপামি তার।

... ...

হঠাৎ একদা হ'ল শুভখনে আমাদের পরিচয়,
দু' নদীর স্মৃতি বহে নিয়ে আসে দুই জলচর পাখী।
খর উত্তাপে তাপিত দগ্ধ সৌধ-শোভনা নগরীর রাজপথে,
যৌবন-রসে দুটি কণ্ঠেই কাব্য-কূজন ফোটে—

সাহিত্যের প্ল্যাটফর্মেই আমাদের প্রথম দেখা। সেই প্রথম দিনটিতেই আমরা দুজন দুজনকে ভালবেসেছিলাম। সেই সময় মাঝে মাঝে আমি কলকাতায় এলে, সে প্রায় রোজই আমার সঙ্গে মিলিত হত। আরও অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন। হাসি গল্প ইত্যাদির সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনাও চলত। আর একটা খেলা ছিল আমাদের দুজনের—আমরা পরস্পর কবিতার চরণ তৈরি করে পাদপূরণের নেশায় মেতে উঠতাম।

সজনীকান্ত জাতিতে কবি, স্বভাবে কবি। প্রতিভার রঞ্জনরশ্মি দিয়ে মানুষকে সে খুঁজে বের করেছে। প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করে সে তার ভেতরের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছে, তাই তার কাব্যে প্রকৃতি ও মানুষ পেয়েছে পরম পুরস্কার।

সজনীকান্তের সাহিত্যিক-জীবন যেরূপ কর্মময়, তেমনি বিশাল। কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা, গবেষণা, সাহিত্য-সাংবাদিকতা এবং সর্বোপরি প্রকৃত আচার্যের দায়িত্ব নিয়ে সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে একটা সুনির্দিষ্ট গতি অর্পণ করার সুমহৎ ব্রত নিয়েই যেন সে এসেছিল। যৌবনের সজনীকান্তকে দেখেছি—তরুণ যুবক, চোখে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, কণ্ঠে দৃপ্ত সুর, লেখনীতে একদিকে অমৃতময়ী কাব্যধারা, অন্যদিকে শ্লেষ ও বিদ্রূপের অগ্নিবন্যা। সজনীকান্ত নিজেকে সাহিত্যের অবেক্ষকরূপে নিয়োজিত করেছিল—তার কবিধর্মী মনকে ঢেলে দিয়েছিল সংস্কারকের পুণ্য-ভূমিকায়। বিন্দুমাত্র অবহেলাও সে সহ্য করে নি—পরম-শ্রদ্ধাস্পদ বরণীয় সাহিত্যিক থেকে শিক্ষানবীস পর্যন্ত কাউকেই সে রেহাই দেয় নি। কিন্তু তার আক্রমণধারা ছিল নৈর্ব্যক্তিক, সাহিত্য-সমীক্ষাই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান ও কর্মের অভিজ্ঞান।

আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে কবি সজনীকান্ত বাংলা সাহিত্যের আসরে দেখা দেয়। বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু কবিতা লেখে। সাহিত্য আর বিজ্ঞানের এই অধিকার-প্রতিযোগিতায় সাহিত্যই জয়ী হয়েছিল। সজনীকান্ত তার কাব্যসম্পদ নিয়ে বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মসমর্পণ করল। 'শনিবারের চিঠি'তে "ভাবকুমার প্রধান" এই ছদ্মনামে কামস্কটীয় ছন্দে সে অজস্র কবিতা লিখতে থাকে। স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে আখ্যা দিয়েছিলেন "অ্যাগ্রেসিভ পোয়েট"। সেদিন এই পত্রিকার পাতায় পাতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে বঙ্গসাহিত্যের আসরে দেখা দিয়েছিল তুমুল আলোড়ন। কালিকলম ও কল্লোলযুগের নবধর্মী সাহিত্যিকবৃন্দ যখন

জীবনের নগ্নতাকেই পল্লবিত করে তোলার মহোৎসবে মেতে উঠেছেন, মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় মতবাদের ধ্বজাধারী হলেও, আদর্শের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি, গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে নতুন কিছু করার নেশা তাঁদের পেয়ে বসেছিল—তখন সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে সেই স্বৈরাচার ও আতিশয্যকে নির্মমভাবে আঘাত করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল।

সজনীকান্ত একাধারে কবি ও সমালোচক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক; তাই নিছক শিল্পীর মত পথকে উপেক্ষা করে নি—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, শিল্পশৈলীর মাধ্যমে রসোত্তীর্ণ পরিণতির দিকেও তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সাহিত্যে অসংযমকে নির্মমভাবে শাসনই শুধু সে করে নি, তার গতিকে সুসংহত করে সৌন্দর্যময় পরিণতির সন্ধানও সে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটি বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সজনীকান্তকে সজাগ করে রেখেছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্য তারই জলন্ত স্বাক্ষর এবং একান্তভাবে তারই নিজস্ব অপরূপ সৃষ্টি। ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। তার আদর্শ ছিল জাতীয়তাবোধ ও হিতবাদ—সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার সমস্ত রচনাই কল্যাণধর্মী হয়ে উঠেছে।

সজনীকান্ত আমাদের দিয়েছে তিনখানা উপন্যাস, একখানা গীতিকাব্য, চারখানা কাব্যগ্রন্থ, ছখানা ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনা, সাহিত্যসাধক চরিতমালার উইলিয়ম কেরী ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী, বাংলার কবিগান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আত্ম-স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য এবং অধুনা সে নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনী সম্পাদন ও রচনায় ব্যাপৃত ছিল। এই নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনার পথ নিরঙ্কুশ ছিল না, কারণ অভাব ও দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েই সাহিত্যিককে পথ চলতে হয়। কিন্তু কোন বিপর্যয়ই তাকে পরাস্ত করতে পারে নি, অবিচলিত আদর্শ নিয়ে বন্ধুর পথে বীরের মত সে এগিয়ে চলেছিল, এবং বাণীর বরমাল্য লাভ করে সে বিজয়ী হয়েছিল—এইটুকুই তার জীবনের সংক্ষিপ্তসার।

সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের আবেদন নিয়ে সজনীকান্ত শনিবারের চিঠি'র আসরে 'শনিচক্রে'র আয়োজন করেছিল এবং সেখানে প্রবীণ ও নবীন সমস্ত সাহিত্যিকই সমবেত হয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাস্থবির, গোপাল হালদার, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, পরিমল গোস্বামী, জগদীশ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্বুদ্ধ, লেখক স্বয়ং এবং নবাগত আরও বহু সাহিত্যিকের সমাগম 'শনিচক্র'কে একটি সাহিত্যনিকেতনরূপে গড়ে তুলেছিল। গোষ্ঠীপতি ছিল সজনীকান্ত এবং তারই পরিচালনায় 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় পরম উপাদেয় সাহিত্যিক ভোজ্য বাংলার সাহিত্য-রসিকজনের চিত্তবিনোদন করেছে।

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সজনীকান্ত অভিন্ন হলেও, শুধু তার মধ্যেই স্বীয় সাহিত্যসেবাকে আবদ্ধ করে রাখে নি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তার সংযোগ এবং দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে পরিষদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধানে সজনীকান্তের অবদান সামান্য নয়। আমার দাদামশায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে অভেদাত্মা ছিলেন এবং তাঁরই আজীবন পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। কৃতজ্ঞতার ঋণশোধস্বরূপ সজনীকান্ত প্রকাশবিমুখ রামেন্দ্রসুন্দরের বহু অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ রামেন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত করেছে। সাহিত্য-পরিষদে সজনীকান্ত ও স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমবেত চেষ্টায়, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বহু অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও গবেষণাক্ষেত্রে নতুন কর্মযুগের সৃষ্টি হয়।

সাহিত্যিক-জীবন ছাড়াও সজনীকান্তকে আমি মানুষ হিসেবে অনেক কাছে থেকে দেখতে পেয়েছি। ব্যক্তিগত জীবনে সে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাই তার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেরও অনেক কিছুর সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছে। এমন পত্নীগতপ্রাণ স্বামী, এমন স্নেহময় কর্তব্যপরায়ণ পিতা, এমন বন্ধুবৎসল সখা, কল্যাণকামী উপদেষ্টা আমি খুব কমই দেখেছি। সবচাইতে বড় জিনিস ছিল তার প্রাণখোলা ব্যবহার—তার উদারমধুর সম্বোধন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি

নিরভিমান মন, শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জলন্ত বিশ্বাস—তাই সে অসাধারণ। এই সব গুণের অধিকারী হয়েও সে ছিল নিরহঙ্কার, এইটিই আমাকে সবচাইতে বেশী আকর্ষণ করেছিল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখেছি তাকে হাস্য-পরিহাসে মেতে উঠতে, আবার আলাপ-আলোচনার মধ্যে আদর্শগত বিরুদ্ধমতের বিপক্ষে তার কণ্ঠই সর্বাপেক্ষা সোচ্চার হয়ে উঠত। আমার বাড়িতে প্রায়ই সে তাস খেলতে আসত, আমিও তার বাড়িতে যেতাম। তাস খেলাটা গৌণ—আমাদের সান্নিধ্যই প্রধান আকর্ষণ। যৌবনের সেই পুরনো খেলা এই পরিণত বয়সেও ফিরে এসেছিল। অন্যান্য কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের পরস্পরের সমিল কবিতার পংক্তি রচনাও চলতে থাকে। একদিন কথায় কথায় সজনীকান্ত বলল, সুনীতি চাটুজ্জে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ আর সজনীকান্ত এক বিষয়ে সমান।

আমার সবিস্ময় প্রশ্ন—হঠাৎ তিনটি নামই একনিঃশ্বাসে উচ্চারণ করলে যে বড় ?

সজনীর সহাস্য উত্তর—আমাদের তিনজনেরই পঞ্চকন্যা এক পুত্র।

আমি তাকে সংশোধন করে দিলাম—উঁহু, ঠিক হলো না, তোমার আরও একটি কন্যা আছে।

সে তো অবাক।

তখন বুঝিয়ে বলি—কেন, 'শনিবারের চিঠি' ? সেও তো তোমারই মেয়ে।

সজনীকান্ত স্বীকার করে নিল আমার কথা।

হ্যাঁ, তা বলতে পার বটে !

বন্ধুবর তারাশঙ্করও 'শনিবারের চিঠি'কে সজনীকান্তের মানসকন্যারূপে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'শনিবারের চিঠি'কে সর্বগুণান্বিতা তাপসী কন্যারূপেই সে গড়ে তুলেছে। স্নেহ ও যত্নের অভাব হয় নি কখনও, সত্য-বাদিতায়, সংযম ও আদর্শের অনুশীলনে দুঃখ ও দুর্যোগকে বরণ করে নেবার তপস্যায় সেই কন্যাকে সে অমরত্বের দীক্ষাই দিয়ে গিয়েছে। সাহিত্যের যজ্ঞশালায় আহিতাগ্নি সজনীকান্ত জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়ে গেল—তাপসী কন্যা 'শনিবারের চিঠি' সেই আগুন বুকে নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে।

তার সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কত খুঁটিনাটি ঘটনাই মনে আসে। এই তো সেদিনের কথা। মাস পাঁচেক আগে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে শয্যাশায়ী ছিলাম। সজনীকান্ত প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে, সর্বদাই টেলিফোনে খবর নেয়। এরই মধ্যে তার জন্মদিন ৯ই ভাদ্র এসে উপস্থিত। প্রতি বছর আমিই সর্বপ্রথম তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি, তার জন্মদিন উপলক্ষে স্বরচিত কবিতায় তাকে অভিনন্দিত করি। এবার তা হল না—আমি উত্থানশক্তিরহিত। প্রত্যূষে উঠেই এই কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ সজনীর কণ্ঠস্বর কানে এল। ঘরে প্রবেশ করল কবি ও কবিজায়া। আমি সজনীকান্তের চেয়ে বয়সে বড়, তাই অগ্রজের সম্মান সে বরাবরই আমাকে দিয়ে এসেছে। আমার পায়ে হাত দিয়ে সে প্রণাম করল।

তাকে আশীর্বাদ করার অধিকার আমার আছে কী ? তার হাত-দুখানা আমার দু হাতে চেপে বলি—আজ তোমার জন্মদিনে সবকিছু ফেলে তুমি ভোরেই সবার আগে আমার কাছে চলে এসেছ। এই আন্তরিকতা ভোলবার নয়—তোমার এই ভালবাসাই আমাকে তোমার কাছে চিরবন্দী করে রেখেছে।

আমার চোখে জল দেখে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কোনও রকম উচ্ছ্বাসই আমার পক্ষে ক্ষতিকর, তাই তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আমার জন্মতিথি। তখনও আমি সুস্থ হয়ে উঠি নি। একাদিক্রমে চার মাস শয্যাশায়ী থাকার পর সবে একটু উঠে বসি। সজনীকান্তের উদার আহ্বান কানে এল। একটি কবিতা সে আমাকে উপহার দিল। সেই শেষ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

রাজ্যহীন রাজা তুমি, পেতেছ প্রেমের সিংহাসন,
মোদের হৃদয়রাজ্যে তাই তুমি মহারাজা আজো ;
জীবনের যাত্রাপথে পুনঃ এল জন্মের লগন
রাখালিয়া সঙ্গীদলে আজিকে রাখাল রাজা সাজো।

তুমি কবি, মন তব ব্যাপ্ত করে নিখিল ভুবন,
সেখানে সম্রাট তুমি, ছন্দে সুরে আনন্দে বিরাজো
কোনো সংবিধান বন্ধু, কবির অবাধ বিচরণ
খণ্ডিতে নারিবে কভু, যতদিন ছন্দে সুরে বাজো।

একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

রথীন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যপ্রাণ সজনীকান্ত দাস আজ পরলোকে। যতবার এই কথা ভেবেছি, ততবারই শূন্যতার বেদনা তীব্রভাবে অনুভব করেছি। সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, তা আমাকে টেনেছিল, স্নেহপ্রীতির একটি বিশ্বস্ত আশ্রয় পেয়েছিলাম অনায়াসেই। নিতান্ত বাল্যবয়সেই শনিবারের চিঠির সম্পাদকের ক্ষুরধার লেখনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। কিছুকাল ক্ষুদ্রকলেবর পুস্তিকাকৃতি শনিবারের চিঠির মলাটে সম্পাদকের ছবিও আঁকা থাকত। মফস্বল কলেজের ছাত্রের কাছে তার মূল্য ছিল অনেকখানি। সজনীকান্তের সেই গম্ভীর ও পৌরুষদৃপ্ত মূর্তি কিশোরচিত্তে এক সসম্ভ্রম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। যেদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল সেদিনও সে বিস্ময় কাটে নি। শুধু সেদিন কেন, আজও সে বিস্ময় তেমনি আছে।

দূর থেকে শনিবারের চিঠির দুর্ধর্ষ সম্পাদকের পরিচয় পেয়েছিলাম। মাসের পর মাস 'সংবাদ-সাহিত্যে'র অম্লমধুর টিপ্পনী পড়ার জন্য বহু পাঠক উদগ্রীব হয়ে থাকত। তা ছাড়া নামে ও বিনা নামের অজস্র রচনা ছিল শনিবারের চিঠির অন্যতম ঐশ্বর্য। কিন্তু সজনীকান্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের পরে প্রথমেই মনে হল: এই মানুষটির কতটুকুই বা জানতাম। শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যক্ষেত্রে বহুবার তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন একদিকে সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে বাদানুবাদমূলক আলোচনা উক্ত পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে নূতন লেখকের বলিষ্ঠ সম্ভাবনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সজনীকান্ত শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি করেন নি, সাহিত্যিককেও সৃষ্টি করেছেন। সম্পাদক সজনীকান্তের এইখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধি।

সম্পাদক সজনীকান্তের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল, তাঁর সঙ্গে একটি যুগের অবসান হয়েছে। সাময়িক-

---

> আজি তব জন্মতিথি, অতিক্রমি দেহবিকলতা
> অনন্ত মানসাকাশে মেলে দাও কবিতার ডানা।
> সেই বার্তা বল যারে, ঢাকিবে না কভু নীরবতা
> তাহারে প্রকাশ করো হারাবে না যাহার ঠিকানা।
> মোদের মুখর করে, হে বন্ধু যে তব মুখরতা
> সুরের সুষমা লয়ে ছাড়াক তা কালের সীমানা।

কবিতার ডানা মেলেই সেই কবিবন্ধু কালের সীমানা পার হয়ে চলে গিয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সে এসেছিল সাহিত্যের আসরে, বিজ্ঞানে তার বিষয় ছিল 'উত্তাপ'—সেই উত্তাপকে সে চিরকাল বহন করে এসেছে, সাহিত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢেলে দিয়েছে তার প্রাণের উত্তাপ। জীবনের শেষ সংবাদ-সাহিত্য রচনার হেডিং সে দিয়েছিল "নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব"; সে সংবাদ-সাহিত্য লেখা অসম্পূর্ণই আছে, কিন্তু তার উত্তাপময় অঙ্গীকারকে সে রেখে গিয়েছে এই একটি কথার মধ্যেই—প্রদীপের শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না। সজনীকান্তের জীবন-শিখাও ঊর্ধ্বগামী এবং আমাদের সামগ্রিক ঊর্ধ্বায়ণের পথেই সে আমাদের ডাক দিয়েছে।

আজ সেই পরম সুহৃৎ, বন্ধু সজনীকান্তকে স্মরণ করে এই শুধু মনে হয়, কী বিরাট কর্মের পরিধি নিয়েই সে এসেছিল, আবার কী বিরাট শূন্যতার পরিধি রচনা করেই না সে চলে গেল! আজ যদিও তাকে আমাদের এই জৈব জগতে আর খুঁজে পাব না, কিন্তু সে বেঁচে আছে তার সাহিত্যকৃতির মধ্যে। যদিও তার লেখনী আজ স্তব্ধ, কিন্তু তার কাব্যকূজন কখনও ক্ষান্ত হবে না—স্মৃতি-বিস্মৃতি হাসি-অশ্রুর ছন্দিত ইতিহাস চিরকাল আমাদের প্রাণে গুঞ্জন তুলবে। তাই বলি—

> হারিয়ে তুমি যাও নি তবু আঁখির অগোচরে,
> হৃদয় জুড়ে তোমার আসন স্মৃতির খেলাঘরে।

—

পত্রের সম্পাদক বহুবার বাংলা সাহিত্যে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাংলা পত্র-পত্রিকার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার সর্বশেষ ধারক ছিলেন সজনীকান্ত। এই ধারার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও অবিচলিত প্রত্যয়। শুধু ব্যবসায়ী বুদ্ধির দ্বারা এই ব্যক্তিত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়, বলিষ্ঠ আদর্শের সুকঠিন বনিয়াদ থাকা চাই। কোন একটি বিশেষ আদর্শকে জোরালো ভাবে সমর্থন করতে গেলেই বহু বিরোধের সম্মুখে অবতীর্ণ হতে হয়। আদর্শনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে তাই সর্বজনপ্রিয় হওয়া সম্ভব নয়। সজনীকান্ত তাঁর বিশেষ আদর্শটি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তার জন্য তিনি শ্লেষবিদ্রূপের দ্বারা প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করেছেন, ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করে যাকে অন্যায় ও অসত্য মনে করেছেন তার উপর হেনেছেন নির্মম আঘাত। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকেই কম ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় নি। তিনি এইভাবে বহু বন্ধু হারিয়েছেন, অনেকে তাঁকে ভুলও বুঝেছেন। এখানেও সজনীকান্তের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুলভ জনপ্রিয়তার মোহে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর আদর্শ হারান নি। এই আদর্শবাদের সঙ্গে ছিল গুণগ্রহণের ক্ষমতা। নূতন লেখকের মধ্যে যেখানেই শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ষিত হয়েছে—নূতন লেখক তাঁর কাছে পেয়েছে সাদর সম্বর্ধনা। সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় তিনি যে কথা বলেছেন, তা শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের স্বরূপই নয়, সম্পাদকের আত্মকথাও বটে : "তিনি স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্পর্কে যাহা অনুভব করিয়াছেন, অকপটে তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কাহারও সহিত আপোস মীমাংসায়ও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ঋজু-মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ন্যাকামি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুক চালাইয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছে।"

বিদ্রূপাত্মক কাব্য ও গদ্যরচনার মধ্যে সজনীকান্তের সমগ্র পরিচয় নিঃশেষিত হয় নি। তাঁর আদর্শনিষ্ঠ চরিত্র হাস্যরসের লঘু-চপল মুহূর্তকে শিল্প-সমুজ্জ্বল করে তুললেও, কখনও তাকে চরম ও পরম বলে স্বীকার করে নি। তাই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি গবেষণার দিকে ঝুঁকেছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে তিনি প্রাণ-মন দিয়ে সেবা করেছেন। লুপ্তপ্রায় দুর্মূল্য গ্রন্থাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই গুরুতর কর্মভার তাঁকে একাই বহন করতে হয়েছিল। অসুস্থ দেহ নিয়েই তিনি নবীনচন্দ্র-গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসম্ভারে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ ছিল। তথ্যনিষ্ঠা ও অতন্দ্র গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবা করেছেন। তরুণতর গবেষকেরা তাঁর কাছে পেয়েছেন উৎসাহবাক্য ও সুগভীর প্রেরণা।

সজনীকান্তের একটি আক্ষেপ ছিল এই যে, কবি হিসেবে তাঁর যথার্থ স্বীকৃতি হল না। সম্পাদক ও গবেষক সজনীকান্তের আড়ালে কবি সজনীকান্ত হয়তো কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে কবি হিসাবেই তাঁর প্রথম পরিচিতি ঘটে। সাহিত্যক্ষেত্রে যারা বিচিত্র প্রতিভাধর তাঁদের প্রতিভার মূলসূত্র নির্ণয় করা দুরূহ। কবি সজনীকান্ত তাই সম্পাদক ও গবেষক সজনীকান্তের কীর্তির আড়ালে কিছু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। একদিকে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও স্যাটায়ার, অন্যদিকে সূক্ষ্ম লিরিসিজম্—এই আপাতবিরোধীক্ষেত্রে তিনি অবলীলাক্রমে পদচারণা করেছেন। "ওগো সুন্দর, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি" সঙ্গীতটিকে এককালে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভুল করেছিলেন। সজনীকান্তের মানসলোকে বিচিত্রের সমন্বয় ঘটেছিল। সম্পাদক, গবেষক, হাস্যরসিক ও গীতিকার—বিচিত্র পরিচয়সূত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের রহস্যরূপ উদ্ভাসিত। যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সেই বহু বিচিত্রকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল, তাকে নমস্কার জানাই। সজনীকান্ত একটি কবিতায় তাঁর অন্তর্লোকের কাহিনী শুনিয়েছেন :

> সমস্ত বেদনা-বিষ এ জীবনে করিয়া মন্থন
> মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিন করিয়াছি পান,
> সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
> নিজেরে প্রকাশ ক'র সকলেরে গড়িয়া তুলিতে ;
> মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের
> আর কোনও নাহি পরিচয়।

এই পরিচয়ই শিল্পী সজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয়!

—

নমস্কার তাঁকে নমস্কার

রণজিৎকুমার সেন

'এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, জানি জানি তাও আমি জানি,—
নিরাশার অন্ধকারে প'ড়ে থাকা চিরদিনমান,
ম'রে যাওয়া ভাল তার চেয়ে।'

চারদিকে যেখানে আশাহত জীবনের লাঞ্ছনা, যেখানে 'চলেছে চঞ্চলগতি নবযুগ ব্যাধির প্রকোপে, জরাগ্রস্ত পীড়িতের যন্ত্রণার বিকৃতি বিকারে বিকার-ব্যসন আনে অসংখ্য উন্মাদ উত্তেজনা', সেখানে 'বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক।' প্রথম প্রৌঢ়ত্বের গোড়া থেকেই সজনীকান্ত তাই মনে মনে মৃত্যুর শীতল আশ্রয় খুঁজছিলেন। এ সময় থেকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তিনি যত বেশী সচেতন হয়েছেন, যত বেশী প্রজ্ঞা এসে তাঁর মনে বাসা বেঁধেছে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তিনি তত বেশী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। লিখেছেন :

'বিষাক্ত হয়েছে বিশ্ব স্বর্ণ আর রৌপ্যের বিকারে,
শানিত লৌহের অস্ত্র দুলিতেছে মানুষের শিরে,
দিকে দিকে শোনা যায় যন্ত্র-দানবের আস্ফালন।
বহ্নির ইন্ধন আজ কুণ্ডে কুণ্ডে জ্বলে দাউদাউ,
সে আগুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়িয়া হল ছাই।
সম্মুখে পড়িয়া আছে দিগন্তপ্রসারী রাজপথ,
সে পথে চলে না কেহ, গতির ইন্ধন পোড়ে শুধু,
মানুষ ঘুরিয়া মরে আপনার চক্রব্যূহ পথে।'

এ শুধু কাব্যে নয়, শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যের নানা পংক্তি জুড়েও এমন কথা তিনি প্রায়শঃ লিখেছেন। পাঠক হয়তো সজনীকান্তের 'রাজহংস' কাব্যসঙ্কলনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর সংবাদ-সাহিত্যকে অন্তর্মুখিনক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারেন নি। সংবাদ-সাহিত্যের উইট এবং হিউমারেই তাঁরা বেশী মজেছেন, কাব্যের আলঙ্কারিক সত্য যথাযথ আবিষ্কার করতে পারেন নি। সন্দেহ নেই যে সেখানেও একটি ব্যঙ্গের স্থান আছে, কিন্তু কাব্যের ললিতবিভাসে তা মার্জিত। তবু এ কথা সত্য যে, নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কোন মহৎ শিল্পীই জীবনের বাঁচবার মূল্যে প্রচলিত যুগের অপকৃষ্টতাকে স্বীকার করে নিতে পারেন না ; সজনীকান্তও পারেন নি। আমার মত যারা তাঁর কাছের মানুষ ছিল, এ কথার সত্যতা তারা অনায়াসে উপলব্ধি করবে।

সজনীকান্তের লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটা আজ আরও গভীরভাবে মনে জাগে। মৃত্যুই যে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা, মৃত্যুর কষ্টিপাথরেই যে মানুষের পূর্ণ সত্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে জীবনের নতুন পথ পরিব্যাপ্ত, এক একটি মহৎ জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের কাছে নব নব উপলব্ধির সামগ্রী হয়ে দেখা দেয়। সজনীকান্ত জীবনে বারবার মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছেন, সন্দেহ নেই ; কিন্তু যতই এই আহ্বান মহারুদ্রের দ্বারে গিয়ে আঘাত করেছে, ততই তিনি জীবন সম্পর্কে আরও বেশী সতর্ক, আরও বেশী সত্য ও নিষ্ঠাশীল হয়ে উঠেছেন। তিনি জানতেন— 'ম্যান ইজ মরট্যাল, বাট ওয়ার্ক ইজ এটারন্যাল', তাই কোনও কাজ যাতে জীবনে অসম্পূর্ণ না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য ছিল তাঁর পুরোমাত্রায়। কর্মবহুল জীবন ছিল তাঁর, আর সেই জীবনের সঙ্গে মিশে ছিল দারিদ্র্য, সংঘাত, বিক্ষোভ, ভর্ৎসনা ও ব্যাধি। কিন্তু সবকিছুর সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনে তিনি কর্মকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কর্মই ছিল তাঁর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের পাথেয়। এক জীবনে বহু কাজ করেছেন তিনি, এবং সে কাজ বিশেষভাবে তাঁর সমাজ ও সাহিত্যের কাজ। রসরচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েও বাংলা ভাষায় বলিষ্ঠতম প্রয়োগ তাঁর লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গে তিনি আবর্জনার জীর্ণবাস সহ্য করতে পারতেন না ; সাহিত্য-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধও ছিল এই সূত্রে। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কতদিন আমার কত কথা হয়েছে, সে সব কথা প্রকাশের স্থান অন্যত্র। 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালনা ও সম্পাদনা ছাড়াও মাসিক 'বঙ্গশ্রী' পত্রের তিনি ছিলেন

প্রথম সম্পাদক। পুরোপুরি দু বছরেরও বেশী তিনি 'বঙ্গশ্রী' নিয়ে ছিলেন, আর আমি ছিলাম শেষ এগারো বছর। এদিক থেকে সম্পাদনাসূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার যেমন একটি মধুর ও আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক ছিল, তেমনি তাঁর কর্মধারা আমাকে অনুপ্রেরণাও দিয়েছিল যথেষ্ট। তাঁর মত ধৈর্যশীল পাঠকও তেমনি কম দেখেছি। বহু নবীন অথচ শক্তিমান লেখককে বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সাড়ম্বরে তুলে ধরেছেন। তিনি গোষ্ঠীসংগঠনে যত বড় জহুরী ছিলেন, তার চাইতেও বড় জহুরী ছিলেন জহর-সন্ধানে।

অনেকেই সজনীকান্তকে বড় সমালোচক বলে আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কবি-হৃদয় যে কত বড় ছিল— সেদিকে অনেকেই লক্ষ্য করেন নি। সাহিত্যে তিনি যাঁদের নির্মম কশাঘাত করেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের সকলকেই অপরিসীম ভালবেসেছেন সজনীকান্ত। মানুষের প্রতি এই যে মমত্ববোধ, এটা ছিল আসলে তাঁর কবিধর্ম। তাই তিনি অত্যন্ত সহজে বলতে পেরেছিলেন—

'যতই ক্ষুদ্রতা থাক্, যত আমি ব্যর্থ হই,
বৃহতে বিরাটে নমস্কার,
নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো নমো নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।'

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি দ্বৈতপুরুষ ছিলেন। তাঁর সংবাদ-সাহিত্যের 'গোপালদা' চরিত্রটি সজনীকান্তের এই দ্বৈতসত্তার অন্যতম উদাহরণ। তিনি এই চরিত্রটিকে ভিত্তি করে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটি মধুর অথচ ক্ষুরধার পথ রচনা করতে চেয়েছিলেন। এই নিয়ে একাধিক দিন তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় সে কাজ তিনি সমাধা করে যেতে পারেন নি। তার আগেই মৃত্যু এসে তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

মনে পড়ে, একবার কিছুকালের জন্য শনিবারের চিঠির পাতায় সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠীর পদবী বাদ দিয়ে শুধু নাম ছাপা হতে লাগল। বর্ণভেদ ভাঙবার এ একটা নতুন পন্থা—এ নিউ ডেমোক্রেসি। যদিও শেষপর্যন্ত তা টেকে নি, কিন্তু এরকম পরীক্ষামূলক কাজেও সজনীকান্তকে মাথা দিতে হয়েছে। কারণ সংসারে কোন্‌টা টেকে, আর কোন্‌টা টেকে না, তা অনিশ্চিত। সুতরাং পরীক্ষা করে দেখতে বাধা কি! পরীক্ষা করতে করতেই তো সত্য আবিষ্কৃত হয়ে একসময় তার নিজের স্থান করে নেয়। সেই সত্য আবিষ্কারের জন্য এরকম নানা পরীক্ষার জটিল পথে বহুবার পা বাড়িয়েছেন সজনীকান্ত। তাতে অনেক ক্ষেত্রে সত্য আবিষ্কৃত না হলেও তাঁর অমর্যাদা হয় নি। তিনি নতুন উদ্যমে আবার নতুন পরীক্ষায় নেমেছেন। হার স্বীকার করতে যেমন তাঁর দুঃখ ছিল না, তেমনি মৃত্যুতেও তাঁর ভয় ছিল না; বলেছেন—

'পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলুষিত হয়েছে যাহারা,
লোভে ক্ষোভে জিহ্বামুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
দূর হতে লালাস্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
দু'কথা তাদের কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।'

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে চিরকাল এমনি অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন সজনীকান্ত। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।

—

একটা আতঙ্ক,—একটা বিস্ময়

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অনেক বছর হয়ে গেছে।

এম. এ ক্লাসে পড়ি। কানে ঝঙ্কার দিচ্ছে—কিচ্ছু জানে না। ও একটা গণ্ডমূর্খ। রামানন্দবাবুর প্রেসে চাকরি করে। তোমাদের ওই সুনীতি চাটুজ্জে আর সুশীল দে ওকে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে আমাদের গালাগাল দিচ্ছে।

ঘৃণা ও বিরক্তির সুর ফুটে উঠত রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের কণ্ঠে।

'শনিবারের চিঠি'তে তখন দীনেশবাবুর গবেষণার ছলচুতো ধরে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হত। শুধু দীনেশবাবু কেন, নামকরা অনেকেরই রচনাসম্ভারের উপর তখন চলত তীব্র আক্রমণ। কবি, গল্প-লেখক কিংবা ইতিহাস-লেখক সকলেই তখন 'শনিবারের চিঠি'র জন্য সন্ত্রস্ত।

'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্য পড়বার জন্য তখন আমরা প্রবল আগ্রহে পরের মাসের 'চিঠি' কখন বের হবে এই জন্য অপেক্ষা করতাম।

আমরা মফস্বলের ছাত্র। সজনীকান্তের প্রকৃত পরিচয় আমরা জানতাম না। কোন কোন অধ্যাপক বলতেন, ওটা কিছুই নয়। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা শত্রু, তারাই এই নামের আড়ালে থেকে অযথা কুৎসা রটাচ্ছে।

বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ আবার সজনীকান্ত সম্বন্ধে নানা আজগুবী গল্পও বানিয়ে বলত, বড় সাংঘাতিক লোক এই সজনী দাস। রাস্তায় যখন চলে দু পাশে দুটি ভদ্রবেশী গুণ্ডা থাকে। ওরা নাকি পুলিন দাসের কাছে লাঠিখেলা আর অসিখেলা শিখেছে। তা না হলে এতবড় বুকের পাটা!

একদিন দূর থেকে দেখেছিলাম, পুষ্ট দীর্ঘ দেহ, বড় নাক, চোখের এক পাশে কালো আঁচিল। মুখে গোঁফ। বড় বড় চোখ। দেখলে ভয়ই হবার কথা।

যে লোক নির্বিচারে সবাইকে গালাগাল দিতে পারে, তার নিশ্চয়ই সাহস আছে। মনে মনে সজনীকান্ত সম্বন্ধে কত কথা ভাবতাম। লোকটা এত লোকের ভুল ধরে কি করে? আর যে যাই বলুক, সকলেই যে 'শনিবারের চিঠি'র জন্য বেশ আতঙ্কগ্রস্ত, তা বুঝতে পারতাম।

কার্যকারণে স্বর্গত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামীয় কোষগ্রন্থ রচনায় সহকারী হলাম। পণ্ডিতমহলে তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অসাধারণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি। তিনিও বলতেন, যা কিছু লিখবেন, সাবধানে লিখবেন মশাই! 'শনিবারের চিঠি' রয়েছে। সজনীকান্ত বড় সাংঘাতিক লোক। খুঁত ধরতে ওস্তাদ। শুধু আমাদের খুঁত ধরবার জন্যেই আরও বেশী করে পড়াশোনা করে। ওকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

দূর থেকেই দেখা।

তারপর সত্যিই একদিন সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর মোহনবাগান রোর বাড়িতে দেখা করলাম। সে এক বিচিত্র ঘটনা। এর কিছুদিন আগে 'মহাকোষে'র ব্যাপার নিয়েই 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যে আমার উপর কয়েক ঘা পড়েছে।

আমার বড় ছেলের টাইফয়েড। টাকাকড়ি হাতে নেই। যেখানে লেখার বদলে টাকা পাই, সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। তিন মাস মাইনে পাই নি।

ভেবেছিলাম, সজনীকান্তকে সবাই ভয় করে, তাই তাঁর কাছে নালিশ করতেই গিয়েছিলাম। আমার ছেলের

টাইফয়েড। কাল থেকে অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। 'অমুক' আমাকে খাটিয়ে টাকা দিচ্ছেন না।

সজনীকান্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বললেন, এই নিয়ে যান। টাকার জন্যে ভাববেন না। ছেলের ভাল চিকিৎসা করান।

প্রথম পরিচয়! আতঙ্কের পর বিস্ময়! সজল চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বললেন, আপনার কথা আমি জানি। আগে ছেলে ভাল হয়ে উঠুক। যখন যা দরকার নিয়ে যাবেন। পরে কথা হবে।

হ্যাঁ, পরে কথা হয়েছিল। পুরনো বই থেকে কিছু কিছু নকল করে দিতে হয়েছিল। আর তাঁর ছেলে মেয়ে দুজনের (রঞ্জন ও উমা) ভার দিয়েছিলেন আমার উপর।

তারপর অনেক ইতিহাস। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। সুবলবাবু (সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়) আর গণেশবাবুর (প্রবোধ নান) সঙ্গে আমিও শনিবারের চিঠি' তথা সজনীকান্তের সহকারী হলাম।

১৯৩৬ সনের শেষাংশ থেকে একটানা প্রায় চোদ্দ বছর ছবির পর ছবি, দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে। মোহনবাগান রোর সেই ছোট্ট অফিস-ঘরের হৈ-হুল্লোড়, আলোচনা, আবৃত্তি, গল্প পড়া, আর রাজনৈতিক সলা-পরামর্শের মধ্যে যে বিচিত্র ছবি দেখেছি, সে-যে বাংলা সাহিত্যের এক যুগের ইতিহাস, আজ তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।

শুনেছিলাম সজনীকান্ত খুব হিসাবী লোক। নিত্য তিনি টাকাকড়ির হিসাব রাখেন। এক পয়সার গরমিল হলে যতক্ষণ না তার হদিস মেলে ততক্ষণ তাঁর রাত্রেও ঘুম আসে না। তাঁর সে স্বভাব কোনদিন শোধরায় নি। তিনি নিজেও আমাদের কাছে তা বলতেন।

কিন্তু প্রায় চোদ্দ বছর সুবলবাবুদের সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' আর 'রঞ্জন পাবলিশিং'য়ের হিসাবপত্র আমি রেখেছি। নগদ বিক্রী আর আদায়-উসুলের সমস্ত টাকাকড়িই আমাদের কাছে জমা পড়ত।

সজনীকান্ত বিকেলে অফিস বন্ধ করবার সময় এসে বলতেন, দিন তো মশাই, টাকাকড়ি কি আছে?

ক্যাশবাক্স খুলে যা হাতে তুলে দিয়েছি, তাই-ই নিয়েছেন। কোনদিন হিসাব-পত্র দেখেন নি। শুধু আমাদের বলতেন, নিজেদের যখন দরকার পড়বে, টাকা নেবেন। বোঝেন তো একদিনে সকলে মাইনের টাকা নিতে চাইলে তা সম্ভব হবে না।

হিসাবী সজনীকান্ত অফিসের হিসাবপত্র কোনদিন দেখতেন না। আমরা সত্যি বেশী নিচ্ছি না কম নিচ্ছি, তাও কোনদিন জিজ্ঞেস করতেন না। এই তো হিসাবী সজনীকান্ত!

'শনিবারের চিঠি' তখন আয়বৃদ্ধির দিকে ধাপে ধাপে উঠছে। সচ্ছলতা তখন মোটেই ছিল না। ঝড়-ঝাপটাও তখন যাচ্ছে।

কোন কোন দুস্থ সাহিত্যিকের ছেলেমেয়ে প্রায়ই সাহায্যের জন্য আসত। সজনীকান্ত বলতেন, এরা এলে কখনও কার্পণ্য করবেন না। আমি না থাকলেও পাঁচ টাকার কম কাউকে দেবেন না।

বিস্মিত হতাম। হয়তো প্রার্থীদের বাবা কোনদিন কোথাও দু-একটি কবিতা লিখেছেন। আর 'শনিবারের চিঠি'তেই তাঁর উপর কশাঘাত পড়েছে। এ ছাড়া দুস্থ সাহিত্যিকদের অনেকেই যে সাহায্য পেতেন, তাও জানি।

কাজী নজরুলের অসুখের প্রথম অবস্থায় সজনীকান্তের সে কি ব্যাকুলতা! টাকা তুলে নানাভাবে সজনীকান্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুপ্রীতির তুলনা নেই। অনেকেই সে কথা বলছেন, এ আর নতুন কথা নয়।

আমি যখন গেছি তখন শনিমণ্ডল ভেঙে গেছে। সজনীকান্ত একাই কর্ণধার। কিন্তু শনিমণ্ডলের সেই মণ্ডল তখন নতুন রূপ নিয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন যুগের অভ্যুদয় হচ্ছে—তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণ, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, বিভূতি মুখোপাধ্যায় তখন সাহিত্যের আকাশে দীপ্যমান হয়ে উঠছেন।

আসছেন তরুণ যুবক জগদীশ ভট্টাচার্য, গজেন্দ্রকুমার মিত্র আর সুমথনাথ ঘোষ। তারপর দেখেছি আরও তরুণ নারায়ণ গাঙ্গুলীকে, আরও পরে প্রাণতোষ ঘটক।

দেখেছি, ইংরেজ শাসনের শেষ অধ্যায়ে কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের সেই প্রদীপ্ত 'অভ্যুদয়' নাটকের কেন্দ্রে

অনেককে। শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর—সবারই কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন সজনীকান্ত।

এখানেই দেখেছি শিল্পাচার্য দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীকে। কবি মোহিতলাল, আচার্য সুনীতিকুমার, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর সুকুমার সেন, আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু—কতজনকে দেখেছি তাঁর অন্তরঙ্গরূপে।

আলোচনার পর আলোচনা, রস-উচ্ছল হাসির তরঙ্গ। নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের সেই রস-রাগিণী। মহাস্থবিরের (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) আত্মকাহিনী মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম একদিন রায়বাহাদুর দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখে। দীনেশবাবু 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন আর সজনীকান্তের সঙ্গে হেসে হেসে আলোচনা করছেন। তাঁর ফিটন গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পরে দীনেশবাবুকে বলেছিলাম, স্যর্, আপনিও—

দীনেশবাবু হেসে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, এতদিন জানতাম না হে। সত্যি সজনী বড় ভাল ছেলে। নতুন গবেষণা করছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখছে। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী আর দুষ্প্রাপ্য অনেক প্রাচীন বাংলা বই বের করছে। আমি খুব খুশী হয়েছি।

বিস্মিত হলাম তাঁর উত্তর শুনে।

দীনেশবাবু বললেন, যারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে, তারা যে আমার ছেলে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এরাই আমার সাধ পূরণ করবে।

আত্মতৃপ্তির হাসি বৃদ্ধ অধ্যাপকের মুখে।

১৯৪২ সনের সেই স্মরণীয় বিপ্লব। সেই সময়ে যা দেখেছি তা ভোলবার নয়। ঘন ঘন আলোচনা চলছে। আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আসছেন, আরও আসছেন অনেকে। তারপর দেখেছি অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে (পরে রাজ্যপাল)। তিনিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'শনিবারের চিঠি'র অফিস ঘরে বসে রাজনীতির আলোচনা করছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে একাধিক প্রবন্ধও সেই সময়ে তিনি লিখেছেন। আমি সেই সময়ে এই সূত্রে কয়েকবার তাঁর ডিহি-শ্রীরামপুরের বাড়িতেও গিয়েছি।

নীরব দর্শক ছিলাম আমি।

দীর্ঘকাল যা দেখেছি, সে যে এক বিরাট ইতিহাস। আমি তখন বিশেষ কিছুই লিখতাম না। সজনীকান্তের উৎসাহও আমাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে নি। তারপর 'শনিবারের চিঠি' ছাড়লাম। কিন্তু সজনীকান্ত আমাকে ছাড়েন নি।

ব্যক্তিগত সে সম্পর্কের কথা নাই বা বললাম। তারপর আমার 'ভৃগুজাতকে'র মুদ্রিত কপি নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিলাম,—সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা।

হাসিমুখে বইখানি তিনি হাতে তুলে নিলেন। তিন দিন পরে যেতে বললেন।

তিন দিন পরে গেলাম। আমাকে দেখেই উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন সজনীকান্ত: আপনি একি করেছেন মশাই! এতদিন লুকিয়ে কোথায় ছিলেন? সত্যিই আপনার ভৃগুজাতক এক নবজাতকের জন্ম দিয়েছে!

সে কি আনন্দ! এতদিন সত্যিই তাঁকে প্রণাম করি নি। ব্রাহ্মণ বলে আমাকেই প্রণাম করতেন তিনি। সেদিন তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলাম। বাধা দিলেন তিনি।

দুজনে চুক্তি হল, কেউ কারও পায়ে হাত দিতে পারব না কোনদিন।

চুক্তিভঙ্গ হয় নি। কিন্তু আতঙ্ক বহুদিন কেটে গেছে, বিস্ময় কাটে নি। এ যে এক প্রচণ্ড আকর্ষক-শক্তি! বিভিন্নধর্মী বিচিত্র চরিত্রের এত লোককে আকর্ষণ করে কি করে?

সজনীবাবু

সুমথনাথ ঘোষ

বললুম, ওঃ, এ সংখ্যায় আপনি খুব একহাত নিয়েছেন অমুককে!

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে সজনীবাবু জবাব দিলেন, উনি নিজেকে কি ভাবেন, যা খুশি লিখে যাবেন, আর সবাই তা মুখ বুজে মেনে নেবে? উনি তো ছেলেমানুষ। আমার গুরুজন কেউ লিখলেও ছেড়ে কথা কইতুম না। এ আমার ধর্ম। সারাজীবন যার সাধনা করেছি, সে থেকে বিচ্যুত হওয়াকে আমি পাপ মনে করি।

বাস্তবিক ওই একটা জায়গায় দেখেছি সজনীবাবুর নিদারুণ কঠোরতা। সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে যে বিশেষ একটা ধারণা ছিল, তার এতটুকু অসম্মান কোথাও দেখলে, আর চুপ করে থাকতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে বীর সৈনিকের মত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত অপরিচিত কাউকে ক্ষমা করতেন না কখনও।

এর জন্যে হয়তো বহু বন্ধুর তিনি অপ্রিয়ভাজন হয়েছেন, অনেকের সঙ্গে বিচ্ছেদও ঘটে গেছে। তবু তা নিয়ে কখনও অনুশোচনা করেন নি। তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ; সেই-জন্যে দূর থেকে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝত। তাঁকে নির্মম, হৃদয়হীন বলে মনে করত। মানুষমাত্রেই ভুলভ্রান্তি, ন্যায়-অন্যায় করে থাকে এবং তিনিও যে তার ব্যতিক্রম ছিলেন, এ কথা বলতে চাই না। তবে সজনীকান্তের মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ হৃদয়াবেগ ছিল, যার সঙ্গে খেলার মাঠের তুলনা দিলে বোধ করি ভুল হয় না। হ্যাঁ, খেলোয়াড়ের দৃষ্টিতেই তিনি দেখতেন জীবনটাকে। তিনি ছিলেন খেলোয়াড়-মনোভাবাপন্ন পুরুষ! খেলতে নেমে যেমন কেবলমাত্র গোল করার জন্যে মেতে উঠতেন আর কোনদিকে দৃষ্টি থাকত না, তেমনি মাঠ থেকে যখন ঘরে ফিরতেন তখন খেলার কথাও সব ভুলে যেতেন।

এর বহু দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। যে লেখক চিরদিন তাঁর বৈরী—হয়তো বহুবার তাঁর হাতে সমালোচনার তীব্র কশাঘাত সহ্য করেছেন, তাঁকেও দেখেছি কাছে পেলে সজনীবাবু আগেই তাঁর কুশল প্রশ্নাদি করতেন। আবার একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করতেও দেখেছি এমন কাউকে কাউকে। অপর পক্ষ হয়তো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছেন, কারণ তাঁর কাছে সেটা অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সজনীকান্তের আলিঙ্গন এত নিবিড়, এত সৌহার্দ্যপূর্ণ যে মনে করা কঠিন কোনদিন তাঁদের উভয়ের মনে এতটুকু মালিন্য ছিল! যেন কতকাল পরে, পরমবন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল, 'কেমন আছিস ভাই' বলে সম্বোধন করে নিজের দামী সিগারেটের টিনটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেন।

সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবীমাত্রকেই তিনি পরমাত্মীয় মনে করতেন এবং তাঁদের সুখসুবিধার জন্যে অনেকরকম ত্যাগস্বীকার করতেও দেখেছি যা একালে অনেকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

তিনি ছিলেন মজলিসী, আড্ডাধারী মানুষ। আড্ডা পেলে যেমন সব ভুলে যেতেন তেমনি আবার ওরকম গৃহী ও সংসারসুখ-অভিলাষী মানুষও দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল, এরকম বহু দৃষ্টান্ত চোখে দেখেছি। এখানে তার একটি দুটি উল্লেখ করলে, আমি যা বলতে চাই তা হয়তো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একদিন ফরেনে যাওয়া নিয়ে কথা উঠল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, রামো! কি হবে ফরেনে গিয়ে? তার চেয়ে একজোড়া গঙ্গার ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে তোমার বৌদি ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসে খেলে অনেক বেশী সুখ বলে আমি মনে করি।

আর একদিন হঠাৎ এসে দোকানে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, গজেনকে দেখছি না যে!

বললুম, ঘাটশিলায় গেছে।

কি, সপরিবারে?

না, একা।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ সরস হয়ে উঠল, আচ্ছা, গজেন, প্রবোধ, সুনীতিবাবু, কালিদাস নাগ এঁরা বিয়ে করেছিলেন কেন বলতে পার? এঁরা জন্মেছেন বিশ্বভবঘুরে হয়ে।

হাসির সঙ্গে কথাটা বললেও, সেদিন যে সত্য তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছিল তা আজও ভুলি নি।

প্রথম অনুরোধ, শেষ শ্রদ্ধা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

সজনীদার সঙ্গে আমার পরিচয় অত্যন্ত স্বল্পকালের। কিন্তু এই পরিচয় এত অল্প সময়ে এমন নিবিড় ও অন্তরঙ্গ কী করে হয়েছিল, সেই কথা ভেবে আজ আশ্চর্য হই। অপরিণত বয়সে যা লিখেছি, তা নিতান্তই অবসর যাপনের জন্য। তা নিয়ে শনিবারের চিঠির দপ্তরে কোনদিন আসি নি। তারপরে প্রচুর নিষ্ঠায় যা লিখলাম তা কোন প্রতিষ্ঠিত কাগজে প্রকাশের ইচ্ছা হয়েছিল। এ অভিপ্রায় যাঁদের জানিয়েছিলাম তাঁদের অনেকে উত্তর দিলেন না। কেউ বললেন, স্থানাভাব। শুধু শনিবারের চিঠির দপ্তর থেকে উত্তর এল, প্রস্তাবিত রচনার কিয়দংশ পাঠালে তাঁরা সাদরে বিচার করে দেখবেন। বিদেশ থেকে আমি লেখা পাঠিয়েছিলাম, শনিবারের চিঠি তা সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। সে বেশী দিনের কথা নয়।

সজনীদার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : শনিবারের চিঠিতে আগে কেন লেখেন নি?

বোধ হয় বলেছিলাম : ইচ্ছা হয় নি।

সজনীদা রাগ করেন নি, বলেছিলেন : খুব দুর্নাম শুনেছেন, তাই না?

আমি সত্যি কথা বলতে পারতাম যে আগের লেখা প্রকাশের যোগ্য ভাবিনি। কিন্তু তাঁকে আঘাত দেবার জন্যই বলেছিলাম : হ্যাঁ।

এটা মিথ্যা কথা। তার কারণ, আমি বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে বাস করেছি, আর কোন সাহিত্যিক বা সাময়িকপত্রের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে যা জেনেছি, সে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। কারও মুখে তাঁর সম্বন্ধে কখনও কিছু শুনি নি। কারও সম্বন্ধেই শুনি নি।

আমার উত্তর শুনে সজনীদা ব্যথা পেয়েছিলেন কিনা জানি না, বলেছিলেন : আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

একটু থেমে বলেছিলেন : শনিবারের চিঠির সঙ্গে তো আপনার পরিচয় হয়েছে, এবারে আপনার নিজের মত গড়বেন।

এ বড় কঠিন দায়িত্ব। ফাঁকি দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু নিজের মত গড়া যায় না। তার জন্য অনেক পরিশ্রমের দরকার। অনেক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে যে অভিজ্ঞতা জন্মে তারই ফল নিজস্ব অভিমত। নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করা চলে, অন্যের লেখা প্রবন্ধ পড়ে বক্তৃতাও দেওয়া যায়। কিন্তু নিজের মত প্রকাশ করতে হলে নিজেরই অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। সজনীদা একটি ছোট অনুরোধ করে একটি বিরাট সত্যকে সম্মান করতে শেখালেন।

আমি তাঁর সঙ্গে যত সময় যাপন করেছি, তার চেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছি তাঁর সংবাদ-সাহিত্য পড়ে। ক্রমে ক্রমে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে তিনি তাঁর নিজের জীবনের ধর্মকে প্রথম দিনেই আমার মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যে অন্যের মত কোন মত নয়। ধার করা মত নিয়ে সাহিত্যের বাজারে বেসাতি হয় না। যার নিজের মত আছে, তারই অধিকার আছে বেঁচে থাকার। পাঠকের মত সাহিত্যিককে বড় করে না, সমালোচকের মতও না। সাহিত্যিক বড় হন তাঁর নিজের সাহিত্যকর্মে, একান্ত ভাবে তাঁর নিজেরই বৈশিষ্ট্যে ও বলিষ্ঠতায়। শক্তির উৎস অনুকরণে নয়, জগৎতুষ্টির চেষ্টাতেও নয়, শক্তি লেখকের স্বাধীন চিন্তার দুঃসাহসী প্রকাশে উৎসারিত হয়। সজনীদার আদর্শে কোন দুর্বলতা ছিল না। ব্যক্তিগত লাভক্ষতির সঙ্গে সাহিত্যের ধর্মের কোন জোড়াতালি দেবার চেষ্টা তিনি করেন নি। তাই তাঁকে একই কাজের জন্য একই সঙ্গে নিন্দা ও প্রশংসা দুইয়েরই ভাগী হতে হয়েছে।

কবি সজনীকান্তের পরিচয় সমালোচক লিখবেন, সাহিত্যে তাঁর সামগ্রিক দানের বিচার করবেন সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা। আমি লিখছি মানুষ সজনীদার কথা। কলকাতার বাইরে আমি, তাঁর অসুখের সংবাদ পাই নি, বেতারেও শুনি নি তাঁর প্রয়াণের ঘোষণা। সংবাদপত্র দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনে হল, আমার সবচেয়ে আপনজন একজন চলে গেলেন। না বলে গেলেন, না জানিয়ে গেলেন, এ অভিমান আজ কার কাছে জানাব!

চুপিচুপি একদিন তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম। অনেক মহিলা বউদিকে ঘিরে ছিলেন। আমাকে দেখে তাঁর দৃষ্টি সজল হল। তাঁদের বললেন : উনি এঁকে কত ভালবাসতেন!

আমার দৃঢ়তা ভেঙে গেল, আমি পালিয়ে এলাম।

সজনীদার সম্বন্ধে কী লিখব! সে যে নিজের সম্বন্ধেই লেখা হবে। সজনীদার প্রথম অনুরোধ আমি রাখব। তাঁর সম্বন্ধে আমার নিজের মত নিজেরই থাক। সেই হবে আমার শেষ শ্রদ্ধা।

স্মৃতি-তর্পণ

অজিতকৃষ্ণ বসু

শনিবারের চিঠিতে আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সংখ্যায়। তখন আমার স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়ার প্রথম বছর চলছে। আমার জীবনের ইতিহাসে এ ঘটনার মূল্য অসামান্য।

লেখাটি বত্রিশ লাইনের একটি খাপছাড়া কবিতা, নাম 'মানসাঙ্ক'। যেমন খেয়ালের মাথায় কবিতাটি লেখা, তেমনি—কি ছিল বিধাতার মনে—খেয়ালের মাথায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম শনিবারের চিঠিতে। পরের মাসেই দেখলাম কবিতাটি ছাপা হয়েছে, যদিও আমার নামটি ছাপা হয় নি।

শনিবারের চিঠিকে ভালবেসেছিলাম তার বিশিষ্ট কৌতুক-ব্যঙ্গ-প্রধান সুর এবং অগতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য; এবং না দেখেই ভালবেসেছিলাম এমন পত্রিকার কর্ণধার সজনীকান্ত দাসকে। তাঁর ছবি তখনও দেখি নি, মনে মনে এই অসাধারণ মানুষটির চেহারা কল্পনা করবার চেষ্টা করেছি।

যে সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল কবি সজনীকান্তের "কে জাগে?" কবিতা। অসাধারণ কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, ভাবলাম কার লেখা এই আশ্চর্য কবিতা? অনেক কবিতা পড়েছি এ জীবনে, কিন্তু এই কবিতাটি মনকে যেমনভাবে নাড়া দিয়েছিল তেমনভাবে আর কোনও কবিতা আজ পর্যন্ত দেয় নি। কবির নাম কবিতাটির সঙ্গে ছাপা হয় নি; পরে জেনেছিলাম কবিতাটির লেখক সজনীকান্ত। ১৩৩৯-এর অগ্রহায়ণ মাসে কবিতাটি পড়ে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজও সে কবিতাটি পড়ে আমি তেমনি মুগ্ধ হই; শুধু আজকের মুগ্ধতার সঙ্গে মিশে আছে একটি গভীর বেদনা—কবি আজ বেঁচে নেই।

তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে একদিন তাঁর ঘরে বসে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি, অ-সাধারণ কবি, কিন্তু তিনি অন্যরূপে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং সমালোচনার হুল এত বেশী ফুটিয়েছেন যে অন্য রূপের তলায় তাঁর কবি-রূপটি চাপা পড়ে গেছে। তা ছাড়া অনেক মহলের মানুষকে তিনি সমালোচনার আঘাতে বিরূপ করে রেখেছেন; তাঁরা তাঁর হুলের কথাটা ভুলতে পারেন নি বলেই তাঁর মধুর দিকটা ভুলে গেছেন। এজন্য খানিকটা দুঃখবোধ বোধ হয় তাঁর মনেও ছিল।

এখন তিনি চলে গেছেন ব্যক্তিগত দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের অতীত তীরে। আশা করি এখন ধীরে ধীরে সজনীকান্তের কবি-প্রতিভা তার প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং সমাদর পাবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকেই তাঁর কাছে ঋণী, আমি সেই অনেকেরই একজন। তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলাম, এ সৌভাগ্যে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি। তাঁর "আমি" কবিতায় তিনি লিখেছেন:

> "কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
> কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
> তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ, রস, রঙ
> আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব;
> সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল,
> হবে না প্রকাশ কোনদিন।"

এ তাঁর শুধু মুখের কথা নয়, অন্তরের কথা। এই বেদনা নিয়েই তিনি চলে গেলেন।

হয়তো মানুষের এই চিরন্তন ট্রাজেডি, তার সত্য পরিচয়ের পূর্ণ প্রকাশ কোনদিনই হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু আমার মনে হয় সজনীদার সত্য পরিচয়ের কিছুটা আভাস আমি পেয়েছিলাম। তাঁকে হারাবার দুঃখে সেইটুকুই আমার আনন্দ।

—

মানসযাত্রী সজনীকান্ত

শ্রীদেবব্রত রেজ

প্রায় চার দশক বিস্তৃত এক বলাকাশ্রেণীর সম্মুখে সজনীকান্ত বাংলা সাহিত্য তথা জীবনের মানস সন্ধানে বেরিয়ে সহসা দুনিরীক্ষ্য কোন্ আকাশে অন্তর্হিত হয়েছেন।

সেই বলাকার ঘনিষ্ঠতম আমি যখন তাঁর খুব কাছাকাছি এলাম তখন সেই বলাকার অগ্রদূত রাজহংস মানসপার হয়ে কৈলাসের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন।

একদিন বললেন "তুমি আমাকে তোমার লেখা শোনালে এবার আমার লেখা তোমাকে শোনাব।" আমিই তাঁর লেখা তাঁকেই পড়ে শোনালাম। তাঁর কবিতা-সঙ্কলন 'কৈলাস' থেকে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম তাঁর পক্ষবিধূনন শুরু হয়েছে। অশরীরী সেই বিস্তৃত দুই পক্ষের ছায়া পড়েছে তাঁর চোখে। সেই পক্ষসঞ্চালনের ছন্দ লেগেছে তাঁর রক্তে। সেই রক্তের আলো ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সারা মুখমণ্ডলে। আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম সেই চির অচেনার যাত্রীকে। আর, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। আমাদের এই দ্বিধা-সংশয়-দুঃখ-বিধ্বস্ত কালো কালের ওপর দুই পক্ষ মেলে চলেছেন বলাকাপতি। সন্ধানে। সন্ধান! সন্ধান!

কৈলাসের যাত্রা বুঝি কৈলাস পৌঁছেছেন। কয়েক দিনের সহযাত্রী আমি আজ সেই দুর্নিরীক্ষ্য কৈলাসের দিকে শোকাহত হয়ে চেয়ে রয়েছি। জীবনকে দর্শন তাঁর শেষ হয়েছে। আমি যখন তাঁর স্নেহের পরিমণ্ডলে প্রবেশাধিকার পেলাম তখন তিনি জীবনকে আর তাঁর জীবনসাধনা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে শৈলশিখর থেকে দেখছেন।

মানসযাত্রী না হলে মানসধারার খোঁজ মেলে না। যাঁরা এই আপাতঃ-কালের সমতলে লাভক্ষতির বাজারে আত্মার আর আত্মের দর-কষাকষি করতে করতে চলতি কড়ি কুড়িয়ে নিতে মহাকলরবে কাড়াকাড়ি করছেন তাঁদের দৃষ্টি এই সাম্প্রতিকের ছিটেবেড়ার গায়ে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসছে। এই ছিটেবেড়াটার বাইরে যে দূর-প্রসারী পথে বিশ্বমানবের আত্মা নতুন তীর্থ আবিষ্কারের প্রেরণায় ধাবমান সেখানে চোখ পৌঁছবে না তাঁদের। এই দশকের দশজনের কোলাহলের পরেই বিস্মৃতির যে দারুণ নিস্তব্ধতা নেমে আসছে তার কোন আভাসই তাঁরা পাচ্ছেন না।

বলাকাপতি সজনীকান্ত অদূরকালের দিকচক্রবালে নতুনের অরুণাভা দেখতে পেয়েছিলেন। অখ্যাত কয়েকজনের সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যে অশিক্ষিতপটুত্বের যুগ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হচ্ছে। বুদ্ধির সঙ্গে অনুভবের বিচিত্র রাসায়নিক মিলনে বিশ্বে যে নতুন সাহিত্যের জন্ম হচ্ছে সেটাই আধুনিক সাহিত্য। বুদ্ধি আর অনুভবে দ্বিধাবিভক্ত মানস নতুন সাহিত্য শিল্পে একাকার হতে চলেছে। বলতেন, আধুনিক সাহিত্য বলে বাংলাদেশে যা কীর্তিত হচ্ছে তা চেতনার পশ্চাদপসরণের কোলাহল মাত্র। বাংলায় বিশ্বধারার এই নতুন সাহিত্যকে আমাদের অজ্ঞাতসারে হয়তো তিনিই ভূমিষ্ঠ করে গেছেন। একদিন যা বললেন তার সারমর্ম এই যে বাংলা সাহিত্যের বহু নতুন ধারাকে তিনি তুলে ধরেছেন। শেষজীবনে আরও একটা ধারা—যা যথার্থ ই আধুনিক—সেই ধারার সাহিত্যের ধাত্রীকর্ম তিনি করে যাবেন।

মানসযাত্রী ঊর্ধ্বলোক থেকে দূরে বাংলা সাহিত্যের নবায়ণের প্রথম অরুণাভা দেখে বলেছিলেন, তিনি দেখেছেন বাংলা সাহিত্যে আবার নতুন যুগ আসছে, বাংলা সাহিত্য বিশ্বপথে আধুনিক জীবনসত্যের সন্ধানে বেরিয়েছে আবার নতুন করে।

যে আলো অন্যদের মাথার ওপর ঊর্ধ্বলোকে এখনও সঞ্চরমাণ সেই আলো তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল এই কথাটা যেন আজ থেকে বিশ বছর পরে আমরা মনে রাখি।

কৈলাসের যাত্রী দিশারীর কাজ করে নিজের আকাশে বিলীন হয়ে গেছেন।

তোমার কীর্তির চেয়ে

দেবব্রত ভৌমিক

মৃত্যুমাত্রের মধ্যেই এমন-একটা আঘাত আছে যা নিমেষেই আমাদের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গণ্ডি থেকে ছিন্ন করে নিয়ে যায়। প্রাত্যহিক তুচ্ছ শত কাজে শত কথায় ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বরূপের উপরে যে মিথ্যা পরিচয়ের আবরণ পড়ে, মহাকালের অমোঘ হাত মৃত্যুর নির্মম আঘাতে নিমেষে তার সমস্ত কুজ্ঝটিকাকে বিদীর্ণ করে দেয়। তখন সহস্র তুচ্ছ তুচ্ছ হয়ে যায়, প্রতিদিনের বহু মিথ্যার অন্তরাল থেকে উদ্‌ঘাটিত হয় সত্য, ব্যক্তিকে চেনা যায় তার যথার্থ ব্যক্তি-স্বরূপে। সেই স্বরূপের কথাই মনে থাকে, মনে পড়ে।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছি, আমাদের পরিত্যাগ করে সজনীকান্ত যখন অমৃতলোকপথে যাত্রা করেছেন, তখন তাঁর কোন কীর্তির কথা আমার মনে আসে নি, কোন গৌরবের কথাও নয়। শুধু বারবার মনে এসেছে অনেক দিনের অনেক ছোট কথা, ছোট কাজ. আপাতদৃষ্টিতে যা নিতান্তই তুচ্ছ। আমি জানি, সজনীকান্তের কীর্তি সামান্য নয়, অনেক কর্মের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত। ইতিহাসের দ্বন্দ্বসমন্বয়ী অগ্রগতির বিশেষ নিয়মে বিশ শতকের গোড়া থেকে য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয়ের শুরু এবং তিরিশের দশকে যার ঢেউ এসে লেগেছে আমাদের সাহিত্যে, শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্ফ-কথিত যে 'leaning tower sensation'এর আঘাতে আমাদের মধ্যবিত্ত তরুণ লেখক-চিত্ত উন্মার্গগামী হয়েছে, ইতিহাসের ওই বিশেষ নিয়মেই তাকে প্রতিরোধ করার জন্য নূতন বিরোধী শক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। সজনীকান্ত সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেরই বাহক হয়ে বঙ্গসাহিত্যসমরাঙ্গনে দেখা দিয়েছেন বিরোধী শক্তি হিসাবে। তাঁর হাতে বাংলা ভাষা গদ্যে ও পদ্যে চাবুকের মত খেলেছে; এবং সে-চাবুকের নির্মম আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন ছোট-বড় অনেকেই। প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত শিখরে যাঁরা যশের নিরাপদ আশ্রয়ে বসেছিলেন, সে-চাবুক তাঁদের ভ্রষ্টতাকেও ক্ষমা করে নি, তাঁদের অনাচারকে আঘাত করতেও কখনও ভীত হয় নি। সজনীকান্ত তাঁর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে দেশ এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যা প্রতিকূল তার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সে-সংগ্রামে বাংলার স্বভাব-শান্ত নিরুত্তেজ নিরুত্তাপ অঙ্গনে যে তুমুল প্রাণোচ্ছল কোলাহল উঠেছিল, তার কথা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। জানা আছে, কেবল দুঃসহ তারুণ্যের অহঙ্কারে তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যে সেদিন পরানুকরণে যে ঠুনকো দুর্গ রচিত হয়েছিল, সজনীকান্ত কেমনভাবে তাকে বারবার চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু কেবল এই ভাঙার কাজেই তাঁর শক্তি অবসিত হয় নি। গড়ার কাজেও তাঁর কৃতিত্ব এ-যুগে তুলনারহিত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, কেবল নামটি পরিবর্তিত করে নিলে সে-কথা সজনীকান্ত সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়: "সব্যসাচী সজনীকান্ত এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।...তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনো দিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করতে হয় নাই।" ঠিক তাই, রথবেগ তাঁকে কোনদিন খর্ব করতে হয় নি। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এক হাতে ভেঙেছেন এবং এক হাতে গড়েছেন। উত্তেজনার অবসানে সে ভাঙার কথা সাহিত্য-পাঠক যদি ভুলে যায়, তবুও সে গড়ার কথা বহু প্রয়োজনে তাকে বারবার মনে করতেই হবে। বাংলা গদ্যের আদি যুগের চর্চায় সজনীকান্তের গ্রন্থের শরণ তাকে নিতেই হবে। বাংলার যুগস্রষ্টা বহু লেখকের রচনার স্বাদ নিতে গেলে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর দ্বারস্থ হতেই হবে।

তা ছাড়া, রয়েছে তাঁর অনেক কবিতা, অনেক গল্প, অনেক প্রবন্ধ। আর, সবার উপরে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে রচিত তাঁর 'সংবাদ সাহিত্য'—বলিষ্ঠ পৌরুষে, সহজ প্রকাশে, গথিক গাঁথুনিতে এবং স্বতোৎসারিত রস-রসিকতায় সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে যার তুলনা নেই আর, সাধু গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবেও এ-যুগে যার স্থান সবার শীর্ষে। শুধু এই নয়; সজনীকান্তের সবচেয়ে বড় গৌরব সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয়, সাহিত্যিক সৃষ্টিতে। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র মারফত এই কাজ করে এসেছেন। আদর্শ সম্পাদকের দায়িত্ব এমনভাবে পালন করেন নি একালে আর কেউই। তাঁর মত এত লেখকের এত লেখা পড়া-শোনা, এত লেখককে এতভাবে উৎসাহ দেওয়া, সাহায্য করা এ-যুগে আর-কেউই করেন নি। তাঁর বিয়োগে বাংলাদেশ তাই তার সত্যিকারের শেষ সম্পাদককে হারিয়েছে।

এ সবই আমার জানা। সজনীকান্তের কীর্তির গৌরবের সব কথাই আমি জানি। তবু তাঁর বিয়োগ-বেদনার মধ্যে এ-সব কথা আমার মনে আসে নি, আমাকে আকুল করে নি। আমি আবিষ্ট হয়েছি অনেক দিনের অনেক তুচ্ছ কথার স্মৃতিতে, অনেক দিনের অনেক সামান্য কাজের স্মরণে।

কিন্তু কেন? বারবার মনে মনে ভেবেছি—কেন? প্রথমে মনে হয়েছে, হয়তো-বা এ আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার বিশিষ্ট আবেশের পরিণাম। সজনীকান্ত সম্বন্ধে আমার মানসক্রিয়ার এ-দশা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। আমি তাঁর অনেক স্নেহ পেয়েছি, আমি তাঁকে ভালবেসেছি। সাহিত্যে তিনিই আমার রণগুরু; ব্যঙ্গের মহাস্ত্রে দীক্ষা আমার তাঁরই কাছে। ব্যঙ্গরচনায় আমার ছদ্মনামের বর্মটিও তাঁরই দান। স্বহস্তে জীবনের শেষ সম্পাদনার কাজও তিনি করেছেন আমারই ব্যঙ্গ-রচনার উপরে। আর, তাঁর পুত্র, আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ রঞ্জনকুমার দাসের কাছে শুনলাম, সাহিত্য এবং 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গে জীবনের শেষ নির্দেশও তিনি যা দিয়ে গেছেন, তা-ও আমারই সম্বন্ধে। কাজেই, তাঁর সম্বন্ধে সেন্টিমেন্টাল হওয়ার আমার যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রথমে ভেবেছি হয়তো আমি তাই-ই হয়েছি, ব্যক্তিগত ভাবালুতায় ব্যক্তিসম্পর্কের নিতান্ত ছোট কথাই আমার চোখে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি, তা নয়। ও-সব সামান্য কথা আসলে সামান্য নয়, ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে সজনীকান্তের ব্যক্তি-চরিত্রের চাবিকাঠি। ওতেই তাঁর যথার্থ ব্যক্তি-স্বরূপকে চেনা যায় সবচেয়ে ভাল করে।

দু-একটা স্মৃতির কথাই বলি তাহলে।

সজনীকান্ত আধুনিক বাংলা কাব্যধারার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমি তা নই। আমার মতে, ক্ষেতে অবাঞ্ছিত যেনোজল ঢুকলেও গর্ব করার মত ফসলও এখানে ফলেছে কিছুকিছু। বিশেষ করে একজন আধুনিক কবিকে আমি খুবই বড় কবি বলে মনে করি। কিন্তু সজনীকান্ত তা মানতেন না। এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু কেউই আমরা হার মানি নি। শেষ পর্যন্ত সজনীকান্ত বলেছেন, '...' জাত-কবি তা মানি। কিন্তু তোমরা ওঁকে খুব বড় কবি বল কেন, তা বুঝি না।

এ-কথার পরে আর কথা চলে না। তাই আমি চুপ করেছি। কিন্তু মনে মনে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি, এমনভাবে মুখের সামনে মত উড়িয়ে দিলে আর-কেউ এমন প্রসন্ন চিত্তে আমাকে মেনে নিতে পারতেন না। এ পারেন একমাত্র সজনীকান্ত—যাঁর হৃদয় ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে।

মনে আছে, একদিন জনৈক সাহিত্যিক-সুহৃৎ সজনী-কান্তের বিরোধী দলের একজন লেখকের অসুস্থতার খবর নিয়ে এলেন—তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং সরকারী সাহায্যও তাঁর বন্ধ হয়ে রয়েছে। সজনীকান্ত সব শুনলেন। তারপর ডাক দিলেন: সতীশ, বটকেষ্টকে গাড়ি বার করতে বল।

তখনই সজনীকান্ত ছুটলেন সেই অসুস্থ লেখকের সাহায্যে—যে-লেখক সাহিত্যান্দোলনে আজীবন তাঁর বিরোধী এবং ব্যক্তিগতভাবেও যিনি তাঁর সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করেছেন। আমি দেখলাম—আমি সজনীকান্তকে চিনলাম।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। তার কয়েকদিন আগেই জনৈক বিখ্যাত লেখকের কুম্ভিলক-বৃত্তির একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করে সজনীকান্ত 'সংবাদ-সাহিত্যে' তাঁর চাবুক চালিয়েছেন। দেখা হতেই তুললেন সেই কথা। বললেন, লোকে কি বলছে বল তো?

আমি বললাম, অনেকেই তো খুব খুশী দেখলাম।

সজনীকান্ত একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না; আমি ও-খুশী চাই না। ও তো ঈর্ষার খুশী। আমি একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি। এতে লোকে খুশী হয় তো হোক। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণের প্রশংসা আমি চাই না।

দেখলাম, বলতে বলতে তাঁর মুখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। বুঝলাম, তাঁর বেদনা কোথায়।

আর-একদিনের কথা সবচেয়ে বেশী করে বারবার মনে আসছে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে। বিকেলে তাঁর লাইব্রেরিতে বসে আছি। কাজ সারা হয়েছে সবে। চা এসেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, সজনীদা, আপনার তো এত লেখা পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো রয়েছে। বই করেন না কেন?

শেষ তিন দিন

বিশ্বনাথ রায়

চিকিৎসক-জীবনে বহু মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি, একটুও বিচলিত হই নি। সদ্য-বিবাহিত স্বামীকে নববধূর কোলে মাথা রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছি। মায়ের বুকে শিশুসন্তানের জীবনদীপশিখা নিভে যেতে দেখেছি। কোন-কিছুতেই বিচলিত হই নি, ভেবেছি চিকিৎসক মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না।

কিন্তু রোগী মৃত্যুকে আগে থেকে দেখতে পায়, এ ধারণা আমার ছিল না। চিকিৎসকের ব্যর্থ চিকিৎসাকে ব্যঙ্গ করে রোগী যখন হাসিমুখে মৃত্যুর পরপারে চলে যায়, তখনই চিকিৎসকের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। চিকিৎসকের নিজের ওপর ধিক্কার আসে। নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২। সরস্বতী পূজোর দিন। রাত বারোটা। সারাদিন রোগী দেখে সবে বাড়ি ফিরেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম তারাশঙ্করবাবু আমার নাম ধরে ডাকছেন। বিস্মিত হলাম। আতঙ্কিতও হলাম একটু। এত রাতে এসেছেন কেন ডাকতে! নিশ্চয়ই কোন জরুরী বিপদ ঘটেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, রঞ্জন ফোন করেছে। সজনীর শরীর খারাপ। একবার যেতে হবে।

প্রস্তুত হয়ে সজনীবাবুর বাড়িতে গেলাম। তিনি হাসিমুখে বসে। মনে হল আমারই প্রতীক্ষায়। পরীক্ষা করলাম। একমাত্র বুকের আনাচেকানাচে সর্দির ভাব ছাড়া আর কোথাও কোন রোগের লক্ষণ পেলাম না। পেটে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বেশী।

ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন?—আমার প্রশ্ন।

তা লাগিয়েছি। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। তখন ঠাণ্ডা লেগেছিল।

খাওয়ার গোলমাল কিছু হয়েছে?

খুব। কয়েকদিন খুব অনিয়ম করেছি।

কেন এত অত্যাচার করেন?—ওষুধ দিয়ে বললাম।

সজনীকান্ত বললেন, কী হবে করে? আমার বন্ধুরা দেখছি বাজার-খরচের খাতাও ছাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওতে আমার আর-কোন উৎসাহ নেই।

আমি বললাম, বাজার-খরচের খাতা না হয় নাই ছাপলেন। কিন্তু আপনার ছাপার উপযুক্ত লেখাও তো রয়েছে অনেক।

একটু চুপ করে রইলেন সজনীকান্ত। তারপর বললেন, তা আছে। কিন্তু তাতেই বা কী হবে? তুমি যদি সংকলন করতে চাও করতে পার—আমি অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু এ-সবে আমার আর-কোন আগ্রহ নেই। নতুন করে কামনা করার কিছু আর নেই আমার।

আমি অবাক হলাম। এমন কথা তো শুনি না আর-কারো কাছে! কামনার সমাপ্তি হয়েছে, জগতের চাওয়া-পাওয়ায় নির্লিপ্ত হয়েছেন—এমন মানুষ তো বড়-একটা দেখি না! লেখকেরা তো আর-কেউই এমন নয়।

আমি অবাক হয়ে সজনীকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সজনীকান্ত আবার বললেন, দেখ, একটা সত্যি কথা বলছি। সাধারণভাবে সাহিত্য আর ভাল লাগে না, গল্প-উপন্যাসে আর কোন রস পাই না। দেখ, সাহিত্যের মূল হল জীবন; আর জীবনের মূল হল ধর্ম আর ভালবাসা। এটা আমি নিশ্চিত বুঝেছি। তাই, ও ছাড়া এখন আর কিছুতেই মন ভরে না।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলাম। শুনছিলাম তাঁর কথা। মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূর থেকে, সজনীকান্তের আত্মার গভীর থেকে, সত্তার কেন্দ্র থেকে, উপলব্ধির মর্মমূল থেকে ভেসে আসছিল সেই শব্দ—উৎসারিত হয়ে আসছিল সেই কথা।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম, এতদিনে এতক্ষণে সজনীকান্তকে চেনা আমার সম্পূর্ণ হল। এতদিনে তাঁকে যথার্থ চিনলাম। এতদিনে তাঁর স্বরূপের সত্যিকারের পরিচয় পেলাম। সে-পরিচয় তাঁর কীর্তির চেয়েও অনেক বড়, অনেক মহৎ!

সেই কথাই এখন আবার মনে পড়ছে আমার। আর তাই বারবার মনে মনে বলছি:

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

—

হেসে জবাব দিলেন, তা নইলে মৃত্যু আসবে কী করে? তারপর একটু থেমে বললেন, সত্যি করে বল তো, আমার মৃত্যু আসছে কি না?

ভাবলাম মানসিক দুর্বলতা। আশ্বাস দিয়ে বলি, ভয়ের কিছু নেই। দু-এক দিনেই সেরে যাবেন।

একটু হেসে উত্তর দিলেন, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, আমার দিন শেষ হয়ে আসছে।

হাসলাম। ভাবলাম মানুষ কি তার নিজের মৃত্যুর কথা আগে থেকে বলতে পারে?

বড়বাবু, কতদিন হয়ে গেল আমাদের বন্ধুত্ব?—কথাগুলো তারাশঙ্করবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন। তারাশঙ্করবাবু আশ্বাস দিলেন, ভয় কি? সেরে যাবে।

বাষট্টি বছর পার হব না হে।—নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন সজনীবাবু। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির শেষ যেন। তারপরেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার, লুকিয়ো না কিছু। যদি সত্যিই কিছু পেয়ে থাক, বল। ভয় পাব না। তবে অনেক কাজ আছে শেষ করার। সেগুলো করতে পারব।

আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। বিশ্রাম করুন তো এখন।—সে রাতে ফিরে এলাম।

পরদিন শনিবার। শহরের এক খ্যাতিমান চিকিৎসককে ডেকে আনা হল। তিনি পরীক্ষা করলেন, ভরসা দিলেন এবং যাবতীয় চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তাঁর আদেশমত আমরা চিকিৎসা করে যেতে লাগলাম।

দুপুরের দিকে অবস্থার একটু উন্নতি হল। বাড়ির অন্যান্য সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কিছু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের সমাগম হল দেখা করার জন্য। রোগী নিজে সকলের কুশল সংবাদ নিতে লাগলেন। কেউ যদি কথা বলতে নিষেধ করেন, রোগী হেসে জবাব দেন, আর জিজ্ঞেস করতে সময় পাব না।

রাতে আবার কষ্ট বাড়ল। ঘুমের ওষুধ দিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। কষ্টের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে চলল। মুখের ওপর যন্ত্রণার একটুও ছাপ নেই। এর পূর্বে অনেক আসন্নমৃত্যু যন্ত্রণাকাতর রোগীর মুখ দেখেছি। এঁর মুখে সে ছাপ নেই। একটি হাসিভরা মুখ ছাড়া আর কোথাও কোন উপসর্গ নেই। মৃত্যু যে আসছে, এ কথা কেউ বুঝতে পারে নি—না চিকিৎসক, না গৃহস্থ। কেবল রোগী নিজে মৃত্যু সম্বন্ধে এক অটল বিশ্বাস নিয়ে বসে আছেন। তৃতীয়দিন সকালেও বলেছেন, দেখ, তোমরা বিশ্বাস করছ না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি মৃত্যু আসছে। তোমরা আমার শেষ কাজগুলো করতে দিলে না।

অক্সিজেনের সিলিণ্ডার এল। নল লাগিয়ে দেওয়া হল নাকে। ভরসা দিয়ে বললাম, এটা ভয়ের কিছু নয়।

জানি।—হাসতে হাসতে জবাব দিলেন সজনীবাবু, যাবার পথে যাতে হোঁচট না খাই, তারই ব্যবস্থা।

কোন উত্তর দিতে পারি নি। যে রোগী এমন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, তাঁকে কি জবাব দেব? কি ভরসা দেব?

বাড়ি এলাম। বলে এলাম, কোন দরকার থাকলে খবর দেবেন।

খবর এল। দুপুরের খাওয়া সবে শেষ করেছি, খবর এল, সজনীবাবুর কষ্ট ভীষণ বেড়েছে। ছুটলাম। এসে অন্য এক সজনীকান্তকে দেখলাম—যিনি পরপারে যাত্রার সব আয়োজন শেষ করে ফেলেছেন। শুনেছি, এই সজনীকান্ত বর্তমানকালের সাহিত্যিকগোষ্ঠী সৃষ্টির অন্যতম কর্তা। শুনেছি 'শনিবারের চিঠি' নামে একটি যুগপ্রবর্তনকারী পত্রিকার স্রষ্টা। তাঁকে এর আগে কখনও দেখি নি। লোকের মুখে নাম শুনে ভেবেছি প্রবলপরাক্রান্ত এক পুরুষ।

সেই লোকটিকে এক সম্পূর্ণ আলাদা রূপে দেখলাম। শিশুর মত ছটফট করছেন। কখনও বসছেন, কখনও শোবার চেষ্টা করছেন। অক্সিজেনের নল টেনে ফেলে দিয়েছেন। আকুল দৃষ্টিতে সহধর্মিণীর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটা কিছু বলবার চেষ্টা, কিন্তু তখন ভাষা রুদ্ধ। কোন শব্দ নেই মুখে—কেবল চাউনি।

ওঁর স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে একটা মৌন কাকুতি: ভাল করে দাও বাবা।

কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এলেন। দেখলেন। ভরসা দিয়ে পাশের ঘরে গেলেন চিকিৎসার জন্য পরামর্শ করতে। এমন সময় রোগীর ঘর থেকে সবাই ছুটে এসে বললেন, দেখুন না, কেমন করছেন উনি।

সবাই রোগীর ঘরে ছুটলাম। রোগী কয়েকটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা, জ্ঞানকে ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত পরপারে যাত্রা করলেন।

নীরবে নেমে এলাম। বাইরে সরস্বতীপূজোর প্রতিমা বিসর্জনের বাজনা বাজছে, শোভাযাত্রা চলেছে।

পরবর্তী সংবাদ সবাই জানেন, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

—

শেষ বৈঠক

সন্তোষকুমার দে

কবি সজনীকান্ত, সম্পাদক সজনীকান্ত, সমালোচক সজনীকান্ত জীবনে শতসহস্র সাহিত্যসভায় যোগদান করেছেন; কোথাও সভাপতিরূপে, কোথাও প্রধান অতিথিরূপে, কোথাও পাঠকরূপে, কোথাও শ্রোতারূপে। তাঁর তিরোধানের অত্যল্পকাল পূর্বেও তিনি শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত সাহিত্যসভার বিভাগীয় সভাপতির ভাষণ দিয়ে এসেছিলেন। মাঘ মাস দুয়েক আগে কলকাতায় ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেও তিনি বিভাগীয় সভাপতিরূপে অতি মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সব শেষদিকের সভাগুলি তাঁর জীবনের অজস্র সাহিত্যসভার তালিকার মধ্যেই মিশে আছে। তাঁর জীবনের শেষ সাহিত্যসভা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ১৪ই মাঘ ১৩৬৮ তারিখে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের অধিবেশনটি। এই অধিবেশনটির কথা তাই সজনীকান্তের অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরম আগ্রহের বিষয় বলে বিবেচিত হবে।

সজনীকান্তের জীবনে শেষ বৈঠক

১৪ই মাঘ রবিবাসরের বত্রিশ বর্ষের চতুর্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। অধিবেশন বসেছিল হগ মার্কেটের দ্বিতলে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের কোয়ার্টার্সে। সজনীকান্তের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানসূচী মুদ্রিত হয়।

আহ্বানকারী—কবি শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

বিষয়—'কবি-সম্মেলন'

উদ্বোধক—**শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস**

পাঠক—শ্রীসন্তোষকুমার দে—একটি গাথা কবিতা। অন্য সকল কবি-সদস্য স্বরচিত কবিতা পাঠ করিবেন।

এই আমন্ত্রণপত্র সদস্যদের কাছে পাঠাবার পর জানা গেল, সজনীকান্ত শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন সাহিত্যসভার একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে। রবিবাসরের অধিবেশনের পূর্বে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরবেন কিনা জানবার জন্য ফোন করলে তিনি উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করে বললেন, শান্তিনিকেতন থেকে তিনি যথাসময়ে ফিরে আসবেন এবং রবিবাসরে অবশ্যই যোগদান করবেন।

তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে রবিবাসরের অন্যতম সদস্য 'ষষ্টিমধু'-সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ কবিকে তাঁর বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠবার সময়ে ভারী পায়ের শব্দ শুনে এগিয়ে গেলাম, তিনি হাসিমুখে বললেন, এসে পড়েছি। কিছুক্ষণ খোলা ছাদে আকাশের নীচে বসলেন, গল্প গুজব করলেন, তারপর সভায় এলেন। মুহূর্তে সভা জমে উঠল।

সেদিন কবি-সম্মেলনে রবিবাসরের কবি-সদস্যগণ ছাড়া আরও অনেক কবি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে কবি কাব্যের চিরন্তন ও শাশ্বত আবেদনের বিষয় বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। তাঁর দ্রুত ভাষণে বহু মূল্যবান উক্তি আহৃত হয়েছিল, সে ভাষণটি লিখে রাখা সম্ভব হলে এক পরিণত মনের সুচিন্তিত অভিমতে কাব্যের মহিমময় পরিচয় পাওয়া যেত। সেদিন কি জানতাম, সাধারণের সমক্ষে সেই তাঁর সর্বশেষ ভাষণ।

সেদিন কবি-সম্মেলনে সজনীকান্তের উদ্বোধনী ভাষণের পর অনেকেই কবিতা পড়লেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত থেকে তাঁর সরস টীকা-টিপ্পনি দিয়ে কবিকুল-সহ স্বয়ং সজনীকান্তকেও মাতিয়ে তুলেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে নিজেকেই কবিতা পড়বার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছিল। দু-তিনবার অনুরুদ্ধ হয়ে বললেন, স, স, স—(বাংলায় তিন স,—শ ষ স?) তিন স হবে শেষ দিকে: সুধাংশু, সন্তোষ, সজনী।

সেদিন আমি 'বান্ধবী' নামে যে দীর্ঘ গাথাটি পড়েছিলাম সেই কবিতাটির বিষয়ে সজনীকান্তের সঙ্গে প্রায় বাইশ বছর পূর্বে আমার একবার যোগাযোগ ঘটেছিল। তাঁকে যখন আমি কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম তিনি আমাকে পত্র লিখে তাঁর মোহনবাগান রোর বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। সেখানে গেলে কবিতাটি আমাকে পড়ে শোনাতে বলেছিলেন। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও সে কথা তাঁর মনে ছিল। আমার কবিতাপাঠ শুনে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ গাথা পড়ে শোনাতে উৎসাহিত হলেন। আমার শ্রম সার্থক হল। কবি সভার কোণে কৌচে গিয়ে বসলেন এবং তাঁর জলদমন্দ্র স্বরে কবিতা পাঠ করতে লাগলেন। তাঁর কবিতাটির বেদনামিশ্রিত মধুর রস সকলকে অভিভূত করে ফেলল।

রবিবাসরের পরবর্তী অধিবেশন বসেছিল আটাশে মাঘ। সেই চিরস্মরণীয় দিনটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে গেল—যেদিন সজনীকান্ত এ পারের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই মহাপ্রয়াণ করলেন। রবিবাসরের অধিবেশন চলছিল, এমন সময় ফোনে সংবাদ গেল। সাধারণ অধিবেশন তখনই বন্ধ রাখা হল। যে আনন্দময় পরিবেশে সভা চলছিল সেখানে বসল শোকসভা। একদল সদস্য গেলেন সজনীকান্তকে শেষ দর্শন-আকাঙ্ক্ষায়, আর সবাই বসে সজল নয়নে তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে লাগলেন।

স্মৃতি-তর্পণ

শিবদাস চক্রবর্তী

কবে কার সঙ্গে শেষ দেখা হচ্ছে, কখন কার সঙ্গে শেষ কথা বলছি, আগে থেকে যদি জানা যেত! তা হলে দু চোখ ভরে শেষ দেখা দেখে নেওয়া যেত, মনের সাধ মিটিয়ে শেষ কথা বলে নেওয়া চলত। কিন্তু তা হয় না। তাই শেষ-দেখা শেষ-কথা মনের মধ্যে অ-শেষ হয়ে থাকে।

সজনীদার কথা লিখতে বসে আজ অনেক দিনের অনেক কথা এসে মনের মধ্যে ভিড় করছে; বিশেষতঃ প্রথম পরিচয়ের সেই ভয় ও ভরসার অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর মুহূর্তের কথা। সে হল ১৩৫২ সালের শ্রাবণ মাস।

থাকি মফস্বল শহরে। তখন কবিতা লেখার প্রথম উদ্যম। কবিতা লিখে লিখে খাতা ভরে ফেলি, সুযোগ পেলে সভা-সমিতিতে দু-একটি পাঠ করি। সবে কলকাতার একটি মাসিকে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লোকের মুখে মুখে কবি হয়ে গেছি। এ পরিচয় পাকা করতে হলে একখানি কবিতার বই প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্যের প্রতিশ্রুতি যখন মিলল, তখন একখানি ছাড়পত্র সংগ্রহের আশায় ঘুরতে লাগলাম। ছাড়পত্র এমন একজনের কাছ থেকে পাওয়া চাই, যিনি হবেন একাধারে কবি ও সমালোচক। তা হলে আত্মপ্রকাশের পথ নিষ্কণ্টক হয়। 'শনিবারের চিঠি'র তখন তরুণ মনে একচ্ছত্র আধিপত্য। এই পত্রিকার পাঠকরূপে 'রাজহংস', 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল' এবং 'পঁচিশে বৈশাখে'র কবির কথা মনে উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না তাঁর কাছে উপস্থিত হবার। এমন সময় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে মনের অভিপ্রায় অকপটে প্রকাশ করলাম। তিনি ভরসা দিয়ে বললেন, যাও না সজনীর কাছে। ভাল লাগলে ও নিশ্চয় তোমাকে উৎসাহ দেবে।

এই আশ্বাসে উৎসাহিত হয়ে একদিন পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে যশোহর থেকে কলকাতায় চলে এলাম। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকীয় দপ্তরখানা তখন মোহন-বাগান রোয়ে। দুরু দুরু বক্ষে হাজির হলাম সেখানে। এগিয়ে যাব কি পিছিয়ে আসব বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন এল, কাকে চাই?

আমি বললাম, কবি সজনীকান্ত দাসকে।

প্রশ্নকর্তা আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনিই সজনীকান্ত দাস।

তখন নমস্কার জানিয়ে মরিয়া হয়ে ব্যক্ত করলাম আমার অভিপ্রায়। তিনি একবার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা, পাণ্ডুলিপি রেখে যাও, দেখব।

সসঙ্কোচে বললাম, কবে আসব?

এসো দিন পনের পরে।

সতের দিন পরে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। মনের মধ্যে তখন আতঙ্ক ও আনন্দের প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। তিনি বসতে বলে টেবিলের দেরাজ খুলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে একখণ্ড কাগজ হাতে নিয়ে বললেন, এই নাও, ভূমিকা লিখে দিয়েছি। বইয়ের নামটিও আমার ভাল লেগেছে।

সেদিনকার সেই আনন্দময় মুহূর্তের স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে অম্লান রয়েছে।

১৩৫৩ সালের বৈশাখে 'কলকল্লোল' প্রকাশিত হলে একখণ্ড তাঁকে কলকাতায় এসে দিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আড়াই বছর যাবৎ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। এই সময়ের মধ্যে বাংলা দেশের ভাগ্যাকাশে রাজনৈতিক দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে। কলকাতায় আর আসা হয় নি। যশোহর থেকে চিঠি লিখে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেছি। কিন্তু চিঠি লিখে উত্তর পাই নি। পরে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে তাঁর মুখে শুনেছি যে চিঠি লেখার অভ্যাস তাঁর একেবারেই ছিল না। তিনি হেসে বলতেন, চিঠির জবাব দেওয়ার চেয়ে চিঠি-লেখকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসা আমার কাছে সহজ মনে হয়েছে। এই জন্য বন্ধুবান্ধব অনেকে আমাকে ভুল বুঝেছেন। বলতেন, আমি জবাব না দিলেও, অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। আমার ভাণ্ডারে সেগুলি জমা আছে। বাছাই করে প্রকাশ করতে পারলে সমকালীন সাহিত্যিক-গোষ্ঠী-পরিচয়ের একখানি আকর গ্রন্থ হতে পারে।

১৩৫৫ সালের মাঘ থেকে ১৩৬৮ সালের মাঘ—এই সুদীর্ঘ তের বছরের মধ্যে কত দিন কত প্রসঙ্গে আলাপ হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে সজনীকান্ত কারও কারও বিরাগভাজন হলেও কোনদিন তাঁকে তাঁর নিন্দুকেরও নিন্দা করতে শুনি নি। বরং দলমতনির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যসেবীকে হৃদয়ের আতিথ্য দান করতে দেখেছি। সাহিত্যকে ভালবাসার চেয়ে সাহিত্যিককে ভালবাসা নিঃসন্দেহে কঠিনতর কাজ। কারণ, এতে অনেক সময় সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনের দায় নিজের মাথায় তুলে নিতে হয়। অথচ এ কাজে সজনীকান্তের অগ্রণী ভূমিকা আজ বাংলার সাহিত্যিকসমাজে সুবিদিত। তাই সাহিত্য-স্রষ্টার চেয়েও হয়তো সাহিত্যিক-স্রষ্টারূপে তাঁর বৃহত্তর পরিচয় বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তাঁর অকালপ্রয়াণের আকস্মিক সংবাদে যাঁদের দু চোখ অশ্রুসজল হতে দেখেছি, তাঁদের অশ্রুর সঙ্গে আমার অশ্রু মিলিয়ে আমার স্মৃতি-তর্পণ এখানেই শেষ করছি।

একটি তরুণ লেখক : একজন প্রবীণ সম্পাদক

মানবেন্দ্র পাল

সজনীদা নেই। তিনি চলে গিয়েছেন। কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যান নি। পিছনে তাঁর অনেক কীর্তি, অনেক ইতিহাস রেখে গেছেন। 'শনিবারের চিঠি'র এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলার কৃতী মনীষীদের বহু আলোচনা থাকবে তাঁর জীবনীর উপর। তারই মধ্যে আমার সামান্য জীবনের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। আমার সেই বিশেষ দু-একটি দিনের কথা আমার পুরনো ডাইরির পাতা থেকে তুলে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি।

১১ই মার্চ ১৯৫৪। ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটল আজ। জীবনের স্মরণীয় দিন। তাই ডায়ারিতে না লিখে পারলাম না।

'শনিবারের চিঠি'তে গল্প লেখার মোহ আমার যে কত দিনের তার ঠিক নেই। কিন্তু সাহস করে এগোতে পারি নি। সজনী দাস সম্বন্ধে যা শুনেছি, ওঁর আক্রমণের ভাষা যা দেখেছি, তাতে প্রাণ কাঁপে। শেষ পর্যন্ত বুক ঠুকে দুটি গল্প দিয়ে এসেছিলাম—'দেনা' আর 'গ্লানি'।

তারপর সেই পরমাশ্চর্য দিনটির কথা মনে আছে যেদিন টেলিফোনে প্রথম সজনীকান্ত দাস মশায়ের সঙ্গে কথা বলে জানলাম আমার দুটো গল্পই মনোনীত হয়েছে।

তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে। 'শনিবারের চিঠি'তে আরও দুটো গল্প দিয়ে রেখেছিলাম—'সঞ্চয়' আর 'সুখ'।

কিছুদিন পর টেলিফোনে সজনীবাবুর কাছে গল্প দুটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি সাগ্রহে বললেন, আপনি একদিন আমার বাড়িতে আসুন। নিজে গল্প পড়ে শোনান।

সানন্দে রাজি হলাম। এ কি কম ভাগ্য আমার! সজনীবাবুর সাক্ষাতে গল্প পড়ব! দিন ঠিক হল এই ১১ই মার্চ। অর্থাৎ আজ। সময়, সন্ধ্যের পর।

আজ সকাল থেকেই মন খুব প্রফুল্ল। তার সঙ্গে বুকটা একটু কাঁপছেও। আমার এই প্রায় সাতাশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন দিন খুব কমই এসেছে। অত বড় সম্পাদক, অত বড় সমালোচকের সামনে বসে আজ আমার গল্প আমি নিজে পড়তে পারব!

দুপুরে আপিসে (বিশ্বভারতী) কাজ করছিলাম একমনে। হঠাৎ পুলিনবাবু (পুলিনবিহারী সেন) নিজেই একটু যেন ব্যস্তভাবে এলেন আমার টেবিলের কাছে: মানবেন্দ্র, আমার ঘরে একবার এসো। সজনীবাবু ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি পুলিনবাবুর সঙ্গে গেলাম। আশ্চর্য হলাম। তাই তো!

আমাকে দেখেই সজনীবাবু বললেন, আজ আপনার আমার ওখানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু আজ আমায় বিশেষ জরুরী একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হবে। যদি আপনি আর একদিন আসেন—

আমি বললাম, বেশ। তাই হবে।

সজনীবাবু তখনই ডায়ারিতে লিখে রাখলেন তারিখটি। বললেন, আমি আপনাকে এই খবরটুকু দেবার জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, এও কি সম্ভব? আমার মত তুচ্ছ একজন লেখকের জন্যে তাঁর এ কী কর্তব্যজ্ঞান! না হয় গিয়ে ফিরেই আসতাম। তাই বলে নিজে এসে এই ভাবে—

১৭ই মার্চ ১৯৫৪। আজ সন্ধ্যায় কথামত সজনীবাবুর বাড়ি গেলাম। সজনীবাবু খুব যত্ন করে গল্প শুনতে বসলেন। আমি এমন আগ্রহশীল শ্রোতা খুব কমই পেয়েছি।

দুটি গল্পই শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু কোনটাই তেমন ভাল লাগল না। বললেন, লেখা খুবই ভাল, কিন্তু শুধু একজনের চিন্তার আশ্রয় করে এত বড় গল্প পাঠককে পীড়া দেবে। এর ভেতরে গল্প চাই।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তিনি আমায় বোঝালেন। বললেন, এত সূক্ষ্ম জিনিস সাধারণ পাঠকের জন্যে নয়।

একসময় তিনি বললেন, একটা কথা বলছি, মনে রাখবেন। যদি বড় সাহিত্যিক হতে চান তো ইনোসেন্ট হলে চলবে না, ক্রুয়েল হতে হবে। এর অর্থ যদি বুঝতে পারেন তো ভাল, এর চেয়ে পরিষ্কার করে বলতে পারব না। মনটা দমে গেল। তখন অতি সংকোচে ভয়ে ভয়ে সঙ্গে-আনা 'পসারী' নামক আর একটি গল্পের কথা বললাম। দুটো বড় গল্প শোনার পরও তিনি সাগ্রহে শুনতে রাজি হলেন।

রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে গেলাম। পড়া শেষ করে তাঁর দিকে তাকালাম। দেখি পুরু লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দুই চোখ ঝকঝক করছে।

চমৎকার হয়েছে এটি। গল্পটি রেখে যান। পরে গল্পটি 'স্বপ্নাঞ্জন' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

কত বড় বড় কাগজই না আজ রয়েছে কলকাতা শহরে। কত নামী সম্পাদক! আর তরুণ লেখকের তো সংখ্যাই নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে বলছি, একদিন অমনি একটি যশলিপ্সু তরুণ লেখক ভাগ্যক্রমে যে সম্পাদকটির সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিল, আজকের অনেক তরুণ লেখকের কাছে কি সে ভাগ্যবান ঈর্ষার পাত্র নয়?

প্রণাম

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। জুন কি জুলাই মাস, ঠিক মনে নেই। অফিসে যেতেই উপরওয়ালার হুকুম হল—মোহন-বাগান রোর এক বাড়ির টেলিফোন খারাপ হয়ে গেছে, সেটা ঠিক করে আসতে হবে। বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। গেলাম নির্দিষ্ট বাড়িতে। দেখলাম, বাইরের ঘরে ফরসা বলিষ্ঠদেহ এক ভদ্রলোক টেলিফোনের সামনে বসে আছেন। তাঁর পাশে শীর্ণকায় শ্যামবর্ণের আর-একজন, নিজেদের মধ্যে তাঁরা হাসি-গল্পে মশগুল।

ঘরে ঢুকতেই প্রথম ভদ্রলোক বললেন, কি চাই?

আইডেনটিটি কার্ড বার করে বললাম, টেলিফোন অফিস থেকে আসছি। টেলিফোনটা একবার দেখব।

আপনি আসতে পারেন।—উত্তরে দরজা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

কাজের ব্যাপারে বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসতে হয় আমাদের। সেই অভিজ্ঞতায় তাঁর অপমানজনক ব্যবহারকে উপেক্ষা করেই আবার বললাম, তা অবশ্যই পারি। কিন্তু সরকারী চাকুরে আমি। আপনার টেলিফোনটা না দেখে আমি যেতে পারি না।

টেলিফোন দেখার দরকার নেই।

টেলিফোন দেখার দরকার আমার, চাকরির প্রয়োজনে। দেখানোর দরকার আপনার, নিজের প্রয়োজনে।

আমার কোনও প্রয়োজন নেই। একদিন যখন বিনা টেলিফোনে দিন কেটেছে, তখন আর একদিনও আমি টেলিফোন রাখব না। আপনি এখন আসুন।

কিন্তু—

কোনও কিন্তু আমি শুনতে চাই না। আপনি যান। গেট আউট!·· গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।

আগেই বলেছি বিভিন্ন লোকের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এ যে একেবারে গলাধাক্কা! এমন অভিজ্ঞতা তো অতীতে কখনও হয় নি! রীতিমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গুটিগুটি পশ্চাদপসরণ করছি, আর ভাবছি—অফিসে ফিরেই দেব এঁর নামে একখানা কড়া কমপ্লেন লিখে।

পাশে উপবিষ্ট সেই শীর্ণকায় ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্বিকার ছিলেন। আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে তিনি বললেন, ওহে ভায়া, সত্যিসত্যিই যে চলে যাচ্ছেন!

কি করব বলুন।—একটু রেগেই বললাম, উনি যে মিথ্যে মিথ্যে আমায় কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক আমাকে একটু ঠাণ্ডা করার জন্যেই যেন বললেন, কয়েকদিন টেলিফোন খারাপ থাকায় উনি একটু চটে গেছেন। তবে বাইরে উনি যত কড়া মানুষ, ভেতরে তত নরম মন। পরিচয় হোক, তখন বুঝবেন। এখন টেলিফোনটা ঠিক করে দিন। টেলিফোন ঠিক করলাম। তার কাজ শুরু হল। আর শুরু হল সেই সাবস্‌ক্রাইবারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের। তিনিই বাংলা-সাহিত্য-গগনে অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সজনীকান্ত দাস; এবং সেই শীর্ণকায় ব্যক্তিটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সজনীদার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ বাঁধনে বাঁধা পড়েছি যখন থেকে উনি এসেছেন বেলগাছিয়ার বাড়িতে। পরিচয়ের পর্যায় কখন অজানতে অতিক্রম করে গেছি, কখন প্রবেশ করেছি আত্মীয়তার প্রকোষ্ঠে তা জানতে পারি নি। শুধু জেনেছিলাম সজনীকান্ত দাস আমার দাদা; আমি তাঁর ছোট ভাই।

সাহিত্যে সজনীদা যে কত বড়, কত বিরাট—সে কথা লিখবেন তাঁর সতীর্থরা, তাঁর সাহিত্যিক সহকর্মীরা। আমি সামান্য টেলিফোন-কর্মী—সাহিত্যের ব্যাপারে কথা বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। আমি শুধু বলতে পারি—হৃদয়বান সজনীকান্তের কথা। বলতে পারি এইজন্যেই যে তাঁর মত বিরাট পুরুষের অপরূপ হৃদয়ের সুধা আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকেও অযাচিতভাবে অভিষিক্ত করেছিল। সে আমার কোন গুণ নয়, সে তাঁরই মহত্ত্বের পরিচয়। তাই আজ অমৃতলোকপথযাত্রী সজনীকান্তের উদ্দেশে আমার অন্তরের অন্তরতম লোকের প্রণাম জানাই।

স্মরণে

সুনীলময় ঘোষ

পেয়ে যখন হারাই, হারিয়ে যখন স্মরণ করি তখন মাধুর্য অনুভব করি—সেই অনুভবে শুধু বিস্ময়, শুধু একটা মুগ্ধতা, আর প্রকাশে কান্না, আর কান্না।

আজ সর্বত্র একটা বেদনা অনুভব করছি; একটা শূন্যতা ছড়িয়ে আছে কয়েকটি আশা-আকাঙ্ক্ষায়। এত কাছের মানুষটি, সেই আনন্দ-উজ্জ্বল উদাত্ত কণ্ঠস্বরের একমাত্র অধিকারী সজনীদা আজ আর নেই। শেষ-যাত্রা সমাপ্ত—অপরিচিত অদেখা আনন্দ-নিকেতনে তাঁর যাত্রা।

শুধু আমাদের সান্ত্বনা, সজনীকান্ত দাস তাঁর সাহিত্যে কাব্যে সমালোচনায় আমাদের কাছে রইলেন চিরদিনের জন্য। কিন্তু সজনীদার সেই হাসি, সেই উদাত্ত কণ্ঠ, সেই সকলকে একাকার করে জড়িয়ে ভাবার প্রশস্ত বক্ষ, সকল বিরোধ বাইরে রেখে অন্তর খুলে কথা বলার আকাঙ্ক্ষা, সেই বন্ধুবৎসল প্রীতি আত্মীয়তা উদারতা, মহৎ শত্রুতা—তা হারিয়ে গেল; মানুষটা মুছে গেল।

এইতো সেদিন

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

এইতো সেদিন। গত ২৮শে জানুয়ারি (১৯৬২) রবিবারের কথা বলছি। শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষের বারাসতের নিকটস্থ উদ্যানভবনে সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের এক আনন্দময় প্রীতি-সম্মিলনী হয়ে গেল। সেখানে সকাল থেকেই সজনীদা গল্পে-কথায়-রসিকতায় সকলকে নিয়ে আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন। তখন কে জানত, আর কদিন বাদেই মৃত্যু তার পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়ে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে একাধারে আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সজনীদাকে! বিশ্বাসই করা শক্ত। কিন্তু মন বিশ্বাস করতে প্রস্তুত না হলেও বাস্তবকে তো অস্বীকার করা যায় না।

সেদিনের কথাই আজ বারবার মনে আসছে। সেদিন সকালে যেখানে সজনীদা আসর জমিয়ে বসেছিলেন, সেখানে ছিলেন মনোজ বসু, জরাসন্ধ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। যাঁরা পরে এক-একজন করে আসছিলেন, তাঁদের এক-একজনকে এক-এক রকম ভাষায় ও ভাবে তিনি অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন সেই আসরে। কেউ কেউ আসরে ভিড়ে যাচ্ছিলেন, আবার কেউ কেউ আশপাশে অন্য আসরে যোগ দিচ্ছিলেন। একটু দেরিতে এলেন 'যুগান্তরে'র বার্তা-সম্পাদক শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন বসু। তাঁকে ঢুকেই সজনীদার ঠাট্টার সম্মুখীন হতে হল। তিনি অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছিলেন। সজনীদা অভিযোগ করলেন যে সেদিনের 'যুগান্তরে' তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" সনেট কবিতাটির আগের অংশটি পরে ছাপা হয়েছে। সেই কথা শুনে দক্ষিণাদা প্রথমে একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সজনীদা বললেন যে, তাতে দক্ষিণার দাক্ষিণ্যগুণে মানে আরও ভাল হয়েছে এই রক্ষা।—বলেই তিনি হেসে উঠলেন। এই রকম আরও নানা ব্যক্তিকে নিয়ে নানা রকম হাসি-ঠাট্টা চলছিল।

বেলা বেড়ে গিয়েছিল। অতিথিরা প্রায় সকলেই এসে গেছেন দেখে নিমন্ত্রণকারী সুকমলবাবু 'অমৃতবাজার' পত্রিকার আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীতারক দাসকে সকলকার একসঙ্গে একটি গ্রুপ-ফোটো তুলতে অনুরোধ করলেন। সকলকে ডেকে ডেকে এক জায়গায় জমা করা হল। সুকমলবাবু নিজে অনেকক্ষণ থেকেই তাঁর সিনে-ক্যামেরায় অনেক ফোটো তুলছিলেন। গ্রুপ-ফোটো তোলার সময় তিনিও রেডি হলেন। আমিও দেখলাম যে একসঙ্গে এতজন সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের এক জায়গায় সহজে পাওয়া যায় না; তাই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না মনে করে আমিও ফোটো তুলতে লেগে গেলাম। বড় গ্রুপের পর কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপ-ফোটোও তুলে-ছিলাম। এক ফাঁকে সজনীদাকে বললাম যে তাঁর একটি আলাদা ফোটো আমি তুলতে চাই। তিনি রাজী হলেন এবং তাঁর একটি আলাদা ফোটোও তুললাম।

ছবি তোলার পালা শেষ হতেই খাবার ডাক পড়ল। সজনীদাও বেশ খাচ্ছিলেন। খাওয়া প্রায় শেষ করে এনে রাধারাণী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে সজনীদা জিজ্ঞাসা করলেন, মিষ্টি খাবার লোভ হচ্ছে, বউদি। একটা খাব নাকি? বউদি তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, খবরদার। সুধা সঙ্গে নেই বলে তুমি মিষ্টি খেতে চাইছ। তা হবে না।

অতিথিদের খাওয়া হয়ে গেল। তারপর হল ড্রাইভারদের খাওয়ার ব্যবস্থা। সজনীদাকে এই সময় খুব উৎসাহের সঙ্গে তদারক করতে দেখা গেল। তিনি হেসে বললেন, এদের হাতেই আমাদের প্রাণ। এদের ভাল করে না খাওয়ালে আমরা ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছব কি করে? বেলা তিনটের পর সজনীদা হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

সেদিন মানুষ সজনীকান্তের সরল, আন্তরিক ও আনন্দোচ্ছল রূপ সকলের চোখেই ধরা পড়েছিল এবং তাঁর সঙ্গলাভে সকলেই যে আনন্দ উপভোগ করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

ফোটো তোলার পর আমাকে তিনি বলেছিলেন, ছবি দিও কিন্তু। তাঁকে কথা দিয়েছিলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যে ফোটো পাঠিয়েও দিয়েছিলাম। গত ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখে ফোটোগুলির প্রশংসা করে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত কপির ফরমাশ দিয়েছিলেন। আমি ফোটোগুলি তৈরি করালাম। যেদিন তাঁকে পাঠাব, সেদিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মত তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ পেলাম। স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে-ছিলাম।

বারবার মনে পড়ছে—এইতো সেদিন। কিন্তু এরই মধ্যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

—

বাবা

রমা মিত্র

বাবা নেই, এ কথাটি এমন নির্মম সত্য যে তাকে অস্বীকার করতে পারব না; কিন্তু বিশ্বাস করতে গেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মত জোরও পাচ্ছি না। ছোট থেকে কোনও দিন তাঁকে ছেড়ে থাকি নি। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছু ভাবতেও শিখি নি আমরা। আমাদের শান্তিপূর্ণ সংসারের ছোট চাকাটি তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এতদিন। দিনের কাজ আরম্ভ হওয়া থেকে শুরু করে রাতের বিশ্রাম অবধি সব কাজেই বাবা।

নিতান্ত শরীর অপারগ না হলে খুব ভোরে উঠতে অভ্যস্ত ছিলেন। উঠেই এক পেয়ালা চা। আর সেটা যদি মা নিজের হাতে দিতেন তবে বড় খুশী হতেন। ১৯৫৭ সনে চোখ অপারেশনের পর থেকে প্রতিদিন কাজে বসবার আগে চোখ মুছিয়ে দিতেন মা। তার পর কাজ আরম্ভ হত। সকাল থেকে রাত অবধি কত লোক যে আসতেন! একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, সব রকম মানুষই তাঁর কাছ থেকে সমান মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পেতেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে তিনি অত্যন্ত বিনম্র থাকতেন। নিজস্ব বন্ধুমহলকে পেলে বাবা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতা আর প্রাণভরা খোলা হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন তাঁদের। মানুষকে তিনি সত্যিই বড় ভালবাসতেন। হয়তো নিজের ভীষণ কাজের চাপ, তবু যখনই যিনি এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন, মন দিয়ে তাঁর কথা শুনেছেন। কখনও তার জন্যে বিরক্ত হতে দেখি নি শরীর খারাপ থাকলে, অনুযোগ করলে বলতেন, উনি কত দূর থেকে এসেছিলেন জানিস। এর পর কিছু বলা চলত না।

কোনও কিছু লিখতে আরম্ভ করলে সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অস্থির থাকতেন। অন্য কোন দিকে মন দিতে পারতেন না।

বই ছিল বাবার একটা নেশা। কোন্ জায়গায় কোন্ বই পাওয়া যাবে বা কোথায় গেলে কোন্ বই শুধু চোখে দেখা যাবে, তাঁর কাছে এ সংবাদ এত আকর্ষণীয় ছিল যে, কোন বাধাই তাঁকে আটকাতে পারত না। বাবার বইয়ের সংগ্রহশালা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে একটি মানুষের জীবনে কতটা অধ্যবসায় আর ধৈর্য থাকলে এমন বিপুল সংগ্রহ করা সম্ভব। সবচেয়ে আশ্চর্য, সমস্ত লাইব্রেরি তাঁর নখদর্পণে ছিল। বহু প্রাচীন জীর্ণ বই এমন যত্নে ব্যবহার করতেন যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কোন কিছু লেখার আগে প্রস্তুতি চলত বহুদিন ধরে। সমালোচনার জন্যে প্রতিটি বই পড়তেন প্রতি ছত্র ধরে। এতে চোখের কষ্ট হত খুব, সময়ও যেত। কয়েক বছর ধরে কবিতা, বিভিন্ন সভাসমিতির ভাষণ ও সাময়িক পত্রিকার লেখা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু লিখতেন না। অনুযোগ করলে বলতেন, সবাই যদি লেখে, তবে পড়বে কে, আর শুনবেই বা কে?

মাঝে মাঝে মাকে বলতেন যে, জীবনে আর কিছু দরকার নেই। হরিদ্বারে লছমনঝোলার পাশে শুধু তুমি আর আমি একটি ছোট্ট চালায় থাকব। তুমি ভেজে চলবে পুরি, আর আমি বিক্রি করব।

আবার কখনও বলতেন, আর ভাল লাগে না এত হৈচৈ; এবার আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দেব। হাতের কাছে থাকবে গীতা, উপনিষদ। কোন কাজ নয়, শুধু যখন ইচ্ছে হবে তখন দু-একটি কবিতা লিখব খালি।

নতুন বছরের ক্যালেণ্ডার আর ডায়েরীর জন্যে অস্থির হয়ে থাকতেন। অনুরাগী বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর আসতও। তারপর চলত দেবার পালা। প্রত্যেককে নিজের হাতে দিতে ভালবাসতেন। একবার মনে পড়ে কোন জায়গা থেকে ফেরার পথে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন ক্যালেণ্ডারের জন্যে। গরম লাগছে, কষ্টও হচ্ছে খুব। জিজ্ঞেস করলাম, মিছিমিছি এত কষ্ট করার কি দরকার। হেসে জবাব দিয়েছিলেন, জানিস না, প্রত্যেক মানুষের ভেতরে একটা করে ছেলেমানুষ থাকে, বড় হয়ে যাওয়ার পরও তাকে মাঝে মাঝে খুশী করতে হয়। সেদিন চুপ করে গিয়েছিলাম। আজ পেছনের জীবনের শেষ হয়ে যাওয়া অধ্যায়খানি খুলে বার বার সেই বড় হয়ে যাওয়া ছেলেমানুষটির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ে যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের জন্যে মুখে মুখে কত গল্প, কত কবিতা বলতেন। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে রাত কাটানোর থমথমে অভিজ্ঞতা, মামের গল্প বড় হয়েও ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারব না। সে দিনগুলো এখন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

বাবার নিজস্ব সঞ্চয়ের একটা আলাদা রাজ্য ছিল। সে সঞ্চয় না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে কতটা মমতা, কতটা ছেলেমানুষী থাকলে মানুষ অত তুচ্ছ জিনিসকে আঁকড়ে রাখতে পারে। বাঁশী, পুতুল, বিচিত্র কৌটো, পুঁতি, কাঠের টুকরো, রঙীন পাথর, কত রকমের পেন্সিল, চকখড়ি—কি নেই তাতে তার হিসাব করাই কঠিন। মাঝে মাঝে খেয়াল হলে সেই সব পুরনো রাজত্ব খুলে বসতেন, সাহায্য করত সতীশ; পরম যত্নে নেড়েচেড়ে দেখে আবার রেখে দিতেন ঠিক তেমনি ভাবে।

সব জিনিস ঠিক তেমনি ভাবেই রইল পড়ে, শুধু বাবাই হারিয়ে গেলেন।

সজনীকান্ত স্মরণে

শ্রীমনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)

বাংলাদেশের সাহিত্যেতে, একদা এক দুর্দিনেতে
নতুন হাওয়ার সঙ্গে কিছু আবিলতার ঘূর্ণী মেতে—
আদর্শভ্রম ঘটিয়ে দিতে হয়েছিল সমুদ্যত
তরুণ কতক সাহিত্যিকের,—নবীন শক্তিমদোদ্ধত।
যে দিক্‌ভ্রান্ত তারুণ্যবেগ উড়িয়েছিল ধূলির আঁধি
শঙ্কা ছিল তাতেই যাবে সব তরুণের চক্ষু ধাঁধি।
সে দুর্দিনে ঈশান কোণে রসশ্যামল আবির্ভাবে
কাটিয়ে দিলে সেই ধূলিজাল, কল্যাণশ্রী দাবির দাবে।
তোমার শনিবারের চিঠির অশনিশ্লেষ বর্ষণেতে
সে মালিন্য ধৌত হল, কাঁপল আকাশ হর্ষণেতে।
তুমি ছাড়া কে আর সেদিন বঙ্গশ্রীরে নিস্তারিত?
ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুড়ে থাকবে সেসব বিস্তারিত।
দিশাহারায় সেদিন তুমি দেখালে পথ অভীপ্সিত
তুমি ছাড়া কে আর তাদের আসল পথের হদিশ দিত?
সেই সেদিনে বানিয়ে রাখী পূর্ণ প্রীতির স্বর্ণতারে
পরস্পরের হস্তে বেঁধে পৌঁছে গেলেম মর্মদ্বারে।
নতুন আবিষ্কারের চমক ছিল সেথায় প্রতীক্ষিয়া
পরিপূর্ণ কাব্যরসসুধানিধির প্রতীক হিয়া
নিরীক্ষিয়া অবাক হলেম; কাব্যগ্রন্থ অর্ঘ্য দিয়া
বাণীর কুঞ্জে পৌঁছে গেলে রথচক্র ঘর্ঘরিয়া।
বাকি ছিল তবুও বুঝি বাণীর পূজায় সমর্পিতে
উপন্যাসের পরেও কিছু গদ্যরচন অতর্কিতে।
তাই করিলে অর্ঘ্য যোজন বাণীর সাধক চরিতমালায়
বাংলা গদ্য ইতিহাসও চলে নতুন মালমসালায়।
এহ বাহ্য; জেনেছিলেম ইহার চেয়েও তত্ত্ব গভীর
লুকিয়েছিল তোমার মনে, যে জন্যে এই ভক্ত কবির
মুগ্ধ চিত্ত লুটিয়েছিল নম্র শিরে প্রণাম ক'রে,
সবার সেরা সে গুণ তোমার বন্ধুপ্রীতির নামটি ধরে।
তিরিশ বছর অতিক্রান্ত সেই পুরাতন প্রীতির রাখী
দৃঢ়ই আছে অদ্যাবধি, জীর্ণ হতে পারে তা কি?
জড়িয়ে আছে বুকের শিরায়, জড়িয়ে আছে সকল স্নায়ু
তোমার প্রীতি জড়িয়ে স্মৃতি থাকবে বাকি পরমায়ু॥

স্মরণাঞ্জলি

রাণু দাস

মৃত্যু খুলে দিল দ্বার
মর থেকে অ-মরলোকের
যেখানে হোমার, বাল্মিকী, দান্তে, রবীন্দ্রনাথ—
আর একটি আসন পূর্ণ হল।

'মানুষের স্বার্থ তার বহু উর্ধ্বে মানুষের প্রেম'
স্বার্থের বেড়া ভেঙে গেছে
এখন শুধু প্রেম
মধু, মধু, মধু
আকাশে বাতাসে, তোমার চারপাশে
শুধু মধু ঝরছে
মৌমাছির হুলের বিষ
পরিণত হয়েছে মধুতে
তবু…
তবু, সান্ত্বনা পাই না
তোমার মরণ-ঘেরা মহিমার চেয়ে
অনেক প্রিয়তর
কাদা, মাটি, ধুলোভরা মানুষটি
তাই…
তোমারি কথায় বলি…
'মৃত্যু, মরণ, সমাপ্তি, শেষ, বিদায় চিরন্তন—
কাব্যের ভাষা যাহাই বলুক, নিঃশেষে শেষ হওয়া
সকল দেহীর মত
অমর কবির চরম সে পরিণাম';

মাঘের অপরাহ্ণে দেখলাম সেই পরিণতি
চোখের জলে পৃথিবী ভেসে গেল…

তারপর…
কি?…
জানি না…
নতুন কিছু জন্ম নেবে কি সেই সিক্ততায়।

সজনীকান্ত স্মরণে

গোপাল ভৌমিক

কেবল মেধা মনন নয়
দরাজ দিল্ সব সময়
একটি গোটা মানুষ ছিলে তুমি :
ভালবাসার বেসাত করে
নিজের থলি নাও নি ভরে
তাই তো সেলাম করো নি আভূমি।

কোদালটাকে কোদাল বলা
সরল পথে সহজ চলা
উচিত হলেও কজনে তা পারে ?
বন্ধুবিচ্ছেদ গৃহবিবাদ
আনত ডেকে যে পরমাদ
জানি তাতে দূর্বা গজায় হাড়ে।

ঝুটা যা সব তোমার মতে
বলতে ভীত দেখি নি হতে
বরং কিছু দেখেছি ন্যায় রোষ :
মতের অমিল হলে পরে
দাও নি খিল মনের ঘরে,
ভালবাসার আছে কি গুণ দোষ ?

অনেক জনের সজনীদা
হারিয়ে যাবার অসুবিধা
ভুগবে যারা আমি তাদের দলে :
জানি তোমার স্নেহের ঋণ
শোধ হবে না কোনও দিন
ডুবি ভাসি যতই চোখের জলে।

সজনীকান্তের প্রতি

কালীকি র সেনগুপ্ত

সজনীকান্ত ছিলে একান্ত সতীর্থ বৎসল
কর্ণের মত জন্মের সাথী কবচ ও কুণ্ডল।
সব্যসাচীর মত হাতে ধরি কলম এবং কশা
এলে তুমি বীর হেরি ভারতীর শোচনীয় দুর্দশা।
হানি কটাক্ষে, হে বিরূপাক্ষ! শনির দৃষ্টিপাত
প্রবল পক্ষ কত বিপক্ষে করেছো ভস্মসাৎ।
সরস্বতীর বরপুত্রেরা পরলোক হতে বসি
দেখেন হরষে তোমার পরশে চন্দন হল মসি।
তাঁদের চরণে শ্রদ্ধালু মনে তুমি দিলে কত ফুল
জনতা তাঁদের ভুলিতে চেয়েছে তুমি ভাঙায়েছ ভুল।
তুমি কবি, তুমি কথাকৌতুকী, তুমি ছিলে দিক্‌পাল
শক্তি দেখিয়া ভক্তি কর নি ছিলে উন্নতভাল।
বঙ্গ-রঙ্গভূমিতে আজিও যুদ্ধ হয় নি শেষ
সজনীকান্তে স্মরে একান্তে স্মরিবেই এই দেশ।

সজনীকান্ত দাস

জ্যোতির্ময়ী দেবী

বাণীর মন্দিরতলে ভক্ত অগণন
কত দ্বার কত পথ কত বাতায়ন
খুলে দেয় আসে তারা হাতে উপচার
ধূপ দীপ শঙ্খ মাল্য পূজার সম্ভার।
গাঁথে মালা। জ্বালে দীপ। দেয় বীণে তান।
মহাকাল(ও) ক্ষণকাল থামিয়া দাঁড়ান
মুগ্ধ সেই পথে।
অকস্মাৎ অভিনব
এক বাতায়ন পথে বাজিল ভৈরব
মহাশঙ্খ এক,—করে একাকী ঘোষণ
কে করে অশুচি দেবী মন্দির প্রাঙ্গণ।
অমেধ্য আনিল কারা।
তব বজ্রবাণী
'মধু হল' 'মণিমুক্তা' এনেছিল টানি
কত গুণী বন্ধুপাশে। হে কবি-সাধক
বাণী-সেবাঙ্গনে নব রীতি প্রবর্তক।

সজনীকান্ত

কুমুদ ভট্টাচার্য

সবাই এখানে আসে একদিন চলে যাবে বলে।
তুমিও যে চলে গেলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।
কে কাকে আটকে রাখে দিন তার সমাগত হলে ?
আমরা বৃথাই কাঁদি। গিয়েছ তো যথানিয়মেই!

নিয়ম কি যাটে যাওয়া ? সত্তরে আশিতে যদি যেতে
হয়তো সান্ত্বনা পেত আত্মীয় ও অনুরাগী জন।
আমাদের লোভী মন চায় সবই বেশী করে পেতে
অল্পে যে খুশী নই তারই দুঃখ বহি অনুক্ষণ।

তোমার সাহিত্যজন্ম দেখলাম চোখের সামনেই।
দেখলাম—ধাপে ধাপে উঠে গেলে পর্বতচূড়ায়।
আজ দেখি অকস্মাৎ—সেই তুমি কোনখানে নেই!
কতটুকু আয়ুকাল! কী ত্বরিত সকলই ফুরায়!

যে যায় সে বেঁচে যায় যারা থাকে তারাই তো মরে,
তাদেরই তো অন্ধকার তারাই তো কাঁদে শূন্য ঘরে।

মধু আর হুল

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

নকল মজুরী নয় হৃদয়ের সত্যমূল্য প্রার্থিত জীবনে
বৃহৎ কর্মের যজ্ঞে মহৎ আনন্দটুকু প্রস্ফুটিত রূপ,
অনেক কল্পনা আর আশ্চর্য আকুতিভরা ভাবনার কোণে
আমাদের যত কিছু অনুভূতি ক্রিয়াশীল চেতনাস্বরূপ;
প্রকাশ চেয়েছে এক দেব কিংবা মানবের জগৎ-জাগ্রতে,
জীবন শুধুই যেন জটিল জালের মধ্যে ঘূর্ণিপাক খায়,—
অথচ কোথায় দিন যেখানে সহজ মন কান্তার সুমতে ?
সেখানে সুন্দর কিছু আছে তবু তার রূপ কে আজ দেখায় ?

নতুন কিছুই যদি সৃষ্টি আর নাই হলো তাই বলে রুচি
নিজের শুচিতা ছেড়ে কামান্ধ কুশ্রীতা নিয়ে পাতাই ভরাবে
না, না, সে কথাই কেন স্বীকার করবে বল, কোনদিন নয়!
জীবনকে আর এই সাহিত্যপথের মাঝে চাওয়া তাই শুচি
শুভ্র-শোভনতা আর আনন্দস্বরূপ যায় জীবন জড়াবে
মধুর বোধের মাঝে হুল যে হয়তো তাই রাখে পরিচয়।

ঠিকানা

রামপ্রসাদ সেন

ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরা একটা লোক
দেখলাম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমার
দোরগোড়ায়।—হাতে একগাদা পাণ্ডুলিপি।
ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে দেরি হল না।
পেশাদার হাসি হেসে বললাম,
নতুন লেখকের লেখা আমরা ছাপি না।
হতাশায় বুঝি ভেঙে পড়ল লোকটা ?
বললাম, দুঃখ কোরো না ভাই।
সাহিত্য একটা ব্যবসা!
আমরা নাচার। হাত পা আমাদের বাঁধা।
একবার যে নাম করে নিয়েছে,
তার জঘন্যতম লেখাও আমরা প্রকাশ করব।
কিন্তু রবিঠাকুর যদি আজ নতুন লেখক
সেজে আসেন,—তাঁর লেখাও পারব না
ভাই ছাপাতে!
লোকটা বলল, দাদা, আমি লেখা ছাপানোর
জন্যে আসি নি। নামের জন্যে নয়, টাকার
জন্যেও নয়;—শুধু একটু শোনাতে চাই কাউকে।
কেঁদে উঠে বলল, আছে কি কেউ
বাংলা দেশে, যে নামহীনের লেখাও শুনবে ?
তার বেদনা স্পর্শ করল আমাকে।
বললাম, একজনের ঠিকানা তোমাকে আমি
দিতে পারতাম,—তাঁর নাম সজনীকান্ত দাস।
কিন্তু তিনি তো আর নেই!
বড্ড দেরি করে ফেলেছ ভাই।

ঝড়ের মেঘ

কৃতান্তনাথ বাগচী

সে ছিল ঝড়ের মেঘ দিগন্তের ভয়াল ভ্রূকুটি
যখন শিথিল সন্ধ্যা অবসন্ন অহল্যা প্রান্তরে,
নিরক্ত পত্রের পুঞ্জে উঠিছে বিষণ্ণ পীত ফুটি,
নিরাশার রুদ্ধশ্বাসে ঝিল্লী শুধু হাহাকার করে।
বিদ্যুতের কশাঘাতে শতছিন্ন জীর্ণ অন্ধকার,
ভীষ্মের ভীষণ পণ, দুর্বাসার নিদারুণ রোষ,
ফাল্গুনীর লক্ষ্যভেদ সহজাত ছিল বুঝি তার
অসত্যের তিরস্কারে অকুণ্ঠিত অশনি নির্ঘোষ।
তবু আজ দেখি সে যে কখন হৃদয় গেছে ঢেলে
তৃণের কোমল শ্যামে মৃত্যুহীন পৃথিবীর কবি,
নবীন পল্লব দিল স্নিগ্ধ ছায়ে পুষ্প আঁখি মেলে,
ভৈরবের জটা হতে প্রবাহিতা প্রভাত-ভৈরবী।
সে ছিল ঝড়ের মেঘ, পৌরুষের বলিষ্ঠ বিস্ময়,
ইন্দ্রধনু স্পর্শ তার চিত্তের নিভৃতে শুধু রয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্কিম ঘোষ

বেদনার অশ্রু নিয়ে যখন হে কবি
ভাবি, তব পরিচয়—
চোখ বলে তুমি নাই, হৃদয় তবুও বলে—
সত্য সে তো নয়।
তুমি আজো বেঁচে আছ,—
নিভৃত প্রাণের কাছে কাছে,
তোমার সৃষ্টি আজো বঙ্গবাণীর বুকে
বসন্তের পুষ্প হয়ে আছে।
সাহিত্যে যে অনাচার পার নি সহিতে তুমি
করেছিল যারা অপরাধ,
সত্য শিব সুন্দরের সার্থক পূজারী তুমি
জানায়েছ তীব্র প্রতিবাদ।
প্রতিভার পারাবার যে লেখক এসেছিল—
অন্ধকার নিয়ে ভবিষ্যৎ
তাদের সূর্য তুমি,—হৃদয়ের আলো দিয়ে
দেখালে তাদের তুমি পথ।
তোমার বন্ধু-প্রেম, হৃদয়ের অনুভূতি,
কোনদিন ভুলিবে না কেহ,
তরুণ লেখকদল কোনদিন ভুলিবে না
তোমার প্রেরণা আর স্নেহ।
তুমি চির আয়ুষ্মান, নাই তব মৃত্যু নাই—
কোনদিন এ ক্ষুদ্র মরণে,
অমৃতের পুত্র তুমি জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি
দূর হতে তোমার স্মরণে।

সজনীকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[সংযোজন : শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত]

জন্ম : বংশ-পরিচয় : সজনীকান্ত দাসের পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের অনতিদূরে রাইপুর গ্রামে। তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজভুক্ত। পিতা হরেন্দ্রলাল (মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮) যৌবনে উত্তর-বিহার, পরে মালদহে কানুনগো ছিলেন ; ১৯১২ সনে সাব-ডেপুটি কালেক্টর হইয়া পাবনায় বদলি হন। ১৯১৪ সনে তিনি দিনাজপুরে আসেন এবং সেখান হইতে ১৯২৬ সনে পার্টিশন-ডেপুটি-কালেক্টররূপে অবসর গ্রহণ করেন। মাতা তুঙ্গলতা (মৃত্যু : ১৭ জুলাই ১৯৩০) বর্ধমান জেলার মানকরের অনতিদূরে বেতালবন গ্রামের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের কন্যা। বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ উকীল ৺স্বর্ণলাল দত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। ১৩০৭ সালে ৯ই ভাদ্র শনিবার (২৫ আগস্ট ১৯০০) বেতালবনে মাতুলালয়ে সজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহারা পাঁচ ভ্রাতা ও চার ভগ্নী ; বর্তমানে দুই ভ্রাতা জীবিত আছেন।

শিক্ষা : রাইপুরে লর্ড সিংহের পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে সজনীকান্তের হাতেখড়ি হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় মালদহে স্বনামধন্য অধ্যাপক ৺বিনয়কুমার সরকারের নিকট। পরে তিনি মালদহের প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু চৌধুরীর বা দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর স্থানীয় সরকারী জেলা-স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১২ সনে সেখান হইতে বাঁকুড়ায় গিয়া মাতুলালয়ে ছয় মাস কাল গৃহেই অধ্যয়ন করেন। পর-বৎসর পাবনা জেলা-স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে দেড় বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯১৪, জুলাই মাসে দিনাজপুর জেলা-স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯১৮ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশাধিকার পান। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কলিকাতায় অবস্থান সমীচীন বিবেচনা না করিয়া পিতা তাঁহাকে বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়ান মিশনরি কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। সেখানে কলেজ-হস্টেলে অবস্থান করিয়া তিনি আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ডাফ হস্টেল ও অগিল্‌ভি হস্টেলে থাকিয়া স্কটিশ চার্চেস কলেজ হইতে ১৯২২ সনে বি. এস-সি. পাস করেন। ইহার পর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মাত্র দেড় মাস কাল অধ্যয়ন করিয়া এঞ্জিনিয়ারিং পড়া ভাল না লাগায় কলিকাতায় আসিয়া সায়েন্স কলেজে ফিজিক্সে (হীট) এম. এস-সি. পড়িতে আরম্ভ করেন। শেষ পরীক্ষার অব্যবহিত কাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র তদানীন্তন সম্পাদকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, এবং তখন হইতে 'শনিবারের চিঠি'তে যোগদান করেন। ইহার ফলে তিনি 'কোর্স' সমাপ্ত করিয়াও এম. এস-সি. পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, এবং সেইখানেই তাঁহার কালেজী বিদ্যার পরিসমাপ্তি ঘটে।

অন্নসংস্থান : 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিকরূপে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও শ্রীযোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় প্রবাসী প্রেস হইতে ১০ই শ্রাবণ ১৩৩১, শনিবার (২৬ জুলাই ১৯২৪) প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম সাত সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সজনীকান্তের কোন যোগ ছিল না ; অষ্টম সংখ্যা হইতে "ভাবকুমার প্রধান" নামে তিনি ইহাতে লেখকরূপে অবতীর্ণ হন। সম্পাদক হিসাবে যোগানন্দ দাসের নাম মুদ্রিত হইলেও একাদশ সংখ্যা হইতে সম্পাদনা ও পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব সজনীকান্ত গ্রহণ করেন। সে দায়িত্ব মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মধ্যে মধ্যে বিশেষ কারণে সম্পাদনের ভার বিভিন্ন কৃতী ব্যক্তির উপর অর্পিত হইলেও 'শনিবারের চিঠি' প্রকৃত পক্ষে সজনীকান্তেরই পরিচালনায় প্রকাশিত হইতে থাকে। 'শনিবারের চিঠি'র মধ্যস্থতায় এবং শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 'প্রবাসী'-কার্যালয়ের সহিত সজনীকান্তের যোগাযোগ হয়। তিনি পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' পুস্তকাকারে প্রকাশে সহায়তার জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে 'প্রবাসী' কার্যালয়ে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সন হইতে প্রায় ছয় বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রুফ-রীডার, 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' ও 'ওয়েলফেয়ারে'র সহ-সম্পাদক এবং পরে প্রবাসী প্রেসের মুদ্রাকর ও কার্যাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন, 'প্রবাসী'তে পাকাপাকিরূপে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি কিছুদিন বাসস্থানের বিনিময়ে বিশ্বভারতীতে (১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) রবীন্দ্রনাথের পুস্তক-প্রকাশে সাহায্য করিয়া ছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র নব পর্যায় মাসিক আকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসে ; ইহা ১৩৩৬ সালের কার্তিক পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৯৩১, সেপ্টেম্বর) হইতে পুনরাবির্ভূত হইয়া ইহা ৩২।৫।

বিডন স্ট্রীট নিজস্ব ছাপাখানা 'শনিরঞ্জন প্রেস' হইতে সজনীকান্তের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্বে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতে থাকে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ-বিরতির এই প্রায় দুই বৎসর কাল সজনীকান্ত তিনখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা—'বিজলী', 'যুগবাণী' ও 'চিত্রলেখা' পরিচালনা করিয়া তাহাদের সাহায্যেই সাহিত্য-কণ্ডূয়ন নিবারণ করিতেন। 'যুগবাণী'র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং গোড়ায় তাঁহারই অর্থসাহায্যে ইহা প্রকাশিত হইতে থাকে।

৭ই অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে প্রবাসী-কার্যালয় ত্যাগ করিবার পর হইতে ২৪এ নবেম্বর ১৯৩২ মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ-এর কার্যাধ্যক্ষ ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত সজনীকান্ত 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভ "সাময়িক প্রসঙ্গ" নিয়মিত লিখিয়া, গ্রামোফোন কোং ও সেনোলা কোং-তে রেকর্ডের জন্য গান রচনা করিয়া এবং রেডিওর প্রোগ্রামের সাহায্যে কায়ক্লেশে সংসারের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত রঞ্জন প্রকাশালয় (পরে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস), ১৯৩১ সেপ্টেম্বরে স্থাপিত শনিরঞ্জন প্রেস ও 'শনিবারের চিঠি' তাঁহার অন্নসংস্থানের পক্ষে পর্যাপ্ত সাহায্য দিতে পারে নাই, সেগুলি অতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতে থাকে।

দুই বৎসর দুই মাস চাকুরি করিয়া সজনীকান্ত ১৯৩৫ সনের ১৫ই জানুয়ারি ইস্তফা দেন। চাকুরির সর্তানুযায়ী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনার ভার এই কালে শ্রীপরিমল গোস্বামীর উপর ন্যস্ত ছিল। ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি পুনরায় সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। 'অলকা' সম্পাদন ও নিয়মিত 'সচিত্র ভারতে'র "খাপছাড়া" লেখা, চলচ্চিত্র-নাট্য রচনা, সঙ্গীত রচনা ও বেতারে বক্তৃতা ইত্যাদি পরবর্তী কালের অর্থকরী কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহ: ১৩৩০ সালের ৪ঠা আষাঢ় (১৯ জুন ১৯২৩) স্বগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী ৺পশুপতিনাথ চৌধুরীর (মৃত্যু: ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৪) জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধারাণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা।

মাতৃভাষায় অনুরাগ: সজনীকান্ত যখন সাত-আট বৎসরের বালক, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ (মৃত্যু: ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) তাঁহাকে কলিকাতা হইতে যোগীন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক খণ্ড উপহার দেন এবং প্রলোভন দেখান যে, উহা আয়ত্ত করিতে পারিলে কাশীরাম দাসের মহাভারতও উপহার পাইবেন। সজনীকান্ত অত্যল্প কাল মধ্যেই শুধু আয়ত্ত নয়, প্রায় সমগ্র রামায়ণখানি মুখস্থ করিয়া দ্বিতীয় উপহারও লাভ করেন। এই রামায়ণের মাধ্যমে বাংলা-সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ও প্রীতি হয়; তিনি তখন হইতেই কবিতা লেখায় হাত পাকাইতে থাকেন। পরে রবীন্দ্রনাথের "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি কবিতা তাঁহাকে এক নূতন জগতের সন্ধান দেয়। সজনীকান্তের নিজের ভাষাতেই বলি—

"আমি আবাল্য সময় পাইলেই পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই পড়িতাম, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্বেই বাংলা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা এবং সাময়িক-পত্রিকা যে কত পড়িয়াছিলাম, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দামোদর কেহই আমার অনধীত ছিলেন না; একাধিক সহস্র রজনী, ইহার উহার গুপ্তকথা, বটতলার চটকদার প্রেমের ও রহস্যের উপন্যাস, রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং অসংখ্য তথাকথিত উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া মনে মনে এক অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেখানে অনন্ত কৌতূহল এবং অনন্ত বৈচিত্র্য, আমার উচ্চতর বিজ্ঞানবুদ্ধিও সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। নির্বিচারে এই সকল কুপাঠ্য অপাঠ্য পড়িবার ফলে ভাষা ও শব্দ সম্পদে আমি বাল্যকাল হইতেই সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলাম।"

উপরে উদ্ধৃত তালিকা ছাড়াও সজনীকান্তের কৈশোর-জীবনের অতি প্রিয় লেখক ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ('সোনার কণ্ঠী,' 'মিলন মন্দির,' 'জন্মান্তর রহস্য' প্রভৃতি), হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ('শীশমহল,' 'রংমহল' প্রভৃতি), পাঁচকড়ি দে ('মনোরমা,' 'পরিমল') এবং কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ('ঋণপরিশোধ,' 'ছোট বড়')।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুরে নবম শ্রেণীতে (2nd Class) পড়িবার সময় সহপাঠী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রধান কর্মসচিব) সহযোগিতায় স্কুলের হস্তলিখিত পত্রিকায় সজনীকান্ত সর্বপ্রথম বাহিরে আত্মপ্রকাশ করেন। "স্বপ্নভঙ্গ" নামে তাঁহার প্রথম ব্যঙ্গরচনা ইহাতেই প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে সাহিত্য কর্ম—প্রীতি-উপহার, বিদায়-অভিনন্দন প্রভৃতিতেই আব[illegible] থাকে। দিনাজপুরে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সনের মধ্যে অসংখ

জাতীয়তামূলক বিপ্লবাত্মক কবিতা লিখিয়া শেষ পর্যন্ত পুলিসের ভয়ে অগ্নিদগ্ধ করিতে বাধ্য হন। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র অষ্টম সংখ্যায় "ভাবকুমার প্রধান" এই বেনামে "আবাহন" এবং ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'প্রবাসী'তে স্বনামে "স্বপ্ন-জাগরণ" নামক কবিতা দুইটি তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা। সেই হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিবিধ পত্রিকা পুস্তক ভাষণ ইত্যাদির সাহায্যে সজনীকান্ত নানা ভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-জীবন অতিশয় বিচিত্র এবং বহুধাবিস্তৃত। ডক্টর সুনীতিকুমার দে তাঁহার 'লীলায়িতা' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে সজনীকান্তকে যে "বিচিত্র-লীলাময়" বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ অত্যুক্তি হয় নাই। বিস্তৃতভাবে সজনীকান্তের জীবনী লিখিত হইলে বিংশ শতাব্দীর বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের একটা সজীব চিত্র তাহাতে প্রকাশ পাইবে।* রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম সাহিত্যিক পর্যন্ত প্রায় সকলের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, তাঁহার শত্রু মিত্র উভয় দলই ওজনে ভারী। বাংলা দেশের বর্তমান কালের শিল্পীদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আর কোন সাহিত্যিক যুক্ত হন নাই। চলচ্চিত্র, বেতার, গ্রামোফোন, রাজনীতি, স্বদেশী গান—এই সকলের সঙ্গেও সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল। সাহিত্য-সভার সভাপতিরূপে তিনি বাংলা দেশের সর্বত্র এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতেরও বহু স্থানে বাঙালীদের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। পরিভাষা-সংসদের, অ্যাডাল্ট্ এডুকেশন কমিটির ও ফিল্ম-সেন্‌সর-বোর্ডের সদস্যরূপে তিনি নানা ভাবে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারেরও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ, নিখিল-বঙ্গ-সাময়িক-পত্র-সংঘ, সাহিত্য-সেবক-সমিতি, পশ্চিম-বঙ্গ-রাষ্ট্র-ভাষা-প্রচার-সমিতি প্রভৃতিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক বা সদস্যরূপে তিনি সর্বদাই সাহিত্য ব্যাপারে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকারে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া বহু প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিককে সাহিত্য-পথে পরিচালনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহায়তায় বহু সাহিত্যিক যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহারাই দিবেন। বহু সাহিত্যিক সুহৃদের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের গৌরবও সজনীকান্তের। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, "বনফুল", শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীআর্যকুমার সেন, 'সম্বুদ্ধ", শ্রীঅমলা দেবী, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকদের নাম করা যাইতে পারে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই-একখানি পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার জয়যাত্রা শুরু হয় সজনীকান্ত-প্রকাশিত 'রাইকমল' হইতে। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীও সজনীকান্তেরই আগ্রহে "মহাস্থবির"-রূপে বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হন।

সজনীকান্তের সাধনা একক সাধনা নহে, বহুকে সঙ্গে লইয়া সাহিত্যের দুরূহ দুর্গম পথে তিনি অভিযান করিয়াছেন। তিনি এক বৃহৎ সাহিত্য-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি ছিলেন। সাহিত্যিকদের প্রীতির নিদর্শন তিনি অনেক পাইয়াছেন। তাহা কেবল মানপত্র, সংবর্ধনা, উৎসর্গীকৃত পুস্তক প্রভৃতির মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। সজনীকান্ত বহু সাহিত্যিকের ঘনিষ্ঠ অন্তরের বন্ধু এবং সুখ-দুঃখের ভাগী। তাঁহার জীবনের কৃতিত্ব সাহিত্য-সাধনার মধ্যে যেমন, সাহিত্যিকের সেবায়ও তেমনই,—দুই-ই তুল্যমূল্য। বঙ্গ-বীণাপাণির সাধনায় যিনি যেখানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই অযাচিতভাবে সজনীকান্তের সাহায্য লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ ধৈর্য ও সহানুভূতিশীল শ্রোতা ও উপদেষ্টা দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথই যে শুধু স্নেহের বশে তাঁহাকে স্বীয় গাত্রাবরণ, শিরস্ত্রাণ ও তাঁহারই জন্য বিশেষভাবে অঙ্কিত একখানি চিত্র দিয়া (১১ নবেম্বর, ১৯৩৯) সম্মানিত করিয়াছেন এমন নয়, সজনীকান্ত তাঁহার সতীর্থ শিল্পী সাহিত্যিকগণের নিকট হইতেও বহু প্রীতির নিদর্শন পাইয়াছেন।

নীচে সজনীকান্তের সাহিত্য-কীর্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।—

রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ

১। **অজয়** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৬ সাল (১৭-৮-১৯২৯)। পৃ. ১৮২।

২। **পথ চলতে ঘাসের ফুল** (গীতিকাব্য)। ভাদ্র ১৩৩৬ (২৪-৯-১৯২৯)। পৃ. ৬২।

৩। **বঙ্গরণভূমে** (জাতীয়তামূলক ব্যঙ্গকবিতা)। ? [অক্টোবর ১৯৩১*]। পৃ. ১৭২।

৪। **মনোদর্পণ** (ব্যঙ্গকবিতা)। ? [অক্টোবর ১৯৩১*]। পৃ. ১৩৫।

৫। **মধু ও হুল** (ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প নিবন্ধ)। ১৩৩৮ সাল (১৫-১০-১৯৩১)। পৃ. ১৫৭।
ইহার ২য় সংস্করণটি (নবেম্বর ১৯৪৬) পরিবর্ধিত।

৬। **অঙ্গুষ্ঠ** (ব্যঙ্গ কবিতা)। ? (২০ অক্টোবর ১৯৩১) পৃ. ২০২।

৭। **রাজহংস** (কাব্য)। চৈত্র ১৩৪২ (৭-৪-১৯৩৬)। পৃ. ৮৭।
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণটি (আশ্বিন ১৩৫০) পরিবর্ধিত।

৮। **আলো-আঁধারি** (কাব্য)। বৈশাখ ১৩৪৩ (২০-৫-১৯৩৬)। পৃ. ১৩৯।

---

* সজনীকান্তের "আত্মস্মৃতি" দুই খণ্ড এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে।

* 'বঙ্গরণভূমে', 'মনোদর্পণ', 'মধু ও হুল' ও 'অঙ্গুষ্ঠ' একসঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত হয়।—১৩৩৮ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৯। **কলিকাল** (সচিত্র হাসির গল্প) ৯ ভাদ্র ১৩৪৭ (২৫-৮-১৯৪০)। পৃ. ১৫৫।

১০। **কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল** (সচিত্র হাসির কবিতা)। ভাদ্র ১৩৪৭ (১-৯-১৯৪০)। পৃ. ১৩২।

১১। **উইলিয়ম কেরী** (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫)। বৈশাখ ১৩৪৯ (৭-৫-১৯৪২)। পৃ. ৫৬।

১২। **পঁচিশে বৈশাখ** (রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কীয় কাব্য)। বৈশাখ ১৩৪৯ (১১-৫-১৯৪২)। পৃ. ৬১।

১৩। **মানস-সরোবর** (কাব্য)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ (২০-৫-১৯৪২)। পৃ. ৭৫।

১৪। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২২)। মাঘ ১৩৪৯ (২৭-৫-১৯৪৩)। পৃ. ১০২।

ইহা ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্মিলিত রচনা।

১৫। **বাংলার কবিগান** (সাহিত্য গ্রন্থিকা: প্রবন্ধমালা—১)। ? | আষাঢ় ১৩৫১ |। পৃ. ১৬।

১৬। **মৃত্যুদূত** (উপন্যাস)। ৯ ভাদ্র ১৩৫১ (৭-৯-১৯৪৪)। পৃ. ১৩৮।

সেল্‌মা লাগর্‌লফ-রচিত *The Soul shall bear Witness* (ইংরেজী অনুবাদ) উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।

১৭। **রাজমোহনের স্ত্রী** (উপন্যাস)। ৯ ভাদ্র ১৩৫১ (২০-৯-১৯৪৪)। পৃ. ১৩৯।

"বঙ্কিমচন্দ্রের *Rajmohan's Wife*-এর সংস্কৃত অনুবাদ (চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে)...এই পুস্তকে 'বারিবাহিনী'র সহায়তায় প্রথম তিন পরিচ্ছেদও যুক্ত হইয়াছে। এই তিন পরিচ্ছেদে কোটেশন-মার্কা-দেওয়া অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে সপ্তম পরিচ্ছেদের অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই পুস্তকে তাহা ব্যবহার করি নাই, কারণ আমরা মূল ইংরেজীরই যথাযথ অনুসরণ করিয়াছি।"

১৮। **আকাশ-বাসর** (গল্প-সংগ্রহ)। কার্তিক ১৩৫১ (২৬-১০-১৯৪৪) পৃ. ২৬৭।

১৯। **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস** (গল্পের প্রথম যুগ)। আষাঢ় ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬)। পৃ. ১৮১।

২০। **পথের সন্ধান** (সন্দর্ভ)। ১৩৫৩ সাল (ইং ১৯৪৬)। পৃ. ৪৮।

১৩৫৩ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত "শক্তি-পূজা" ও "আমাদের সমস্যা" নামক প্রবন্ধ দুইটি এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ধন্যকুমার জৈন কর্তৃক ইহা 'রাহকী খোজ' নামে হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

২১। **ক্যাপ্টেন জেমস্ ষ্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী** (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮৮) চৈত্র ১৩৫৮। পৃ. ৪৮।

২২। **ভাব ও ছন্দ (গীতিকাব্য)**। মাঘ ১৩৫৯। পৃ. ৯৬।

২৩। **আত্মস্মৃতি:** প্রথম খণ্ড ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬১। পৃ. ২৮৮। দ্বিতীয় খণ্ড ৯ ভাদ্র ১৩৬৩। পৃ. ২৮২।

২৪। **স্ব-নির্বাচিত গল্প** ২৮ চৈত্র ১৩৬৬। পৃ. ২৩২।

২৫। **রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য** (প্রবন্ধ) রথযাত্রা ১৩৬৭। পৃ. ২৪৯।

২৬। **পান্থ-পাদপ** (কাব্য) ১১ কার্তিক ১৩৬৭। পৃ. ১৪৪।

* * *

এরূপ অনেক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে, যেগুলির কোন কোন অংশ রচনাদ্বারা সজনীকান্ত সহায়তা করিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শ্রেণীর কতকগুলি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি:—

(১) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'বীরভূম বিবরণ', ৩য় খণ্ড (শ্রাবণ ১৩৩৪)..."শান্তিনিকেতন কথা"।

(২) যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সঙ্কলিত 'বনে জঙ্গলে' (ইং ১৯২৮) ও 'জানোয়ারের কাণ্ড' (২৪-৮-১৯২৯)। অন্যত্র হইতে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি বাদে যাবতীয় নামহীন রচনা সজনীকান্তের।

(৩) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'আরব্য উপন্যাস' (৪র্থ সং, ১৩৩৭ সাল)...শেষ গল্প—"দুই আব্দাল্লার কাহিনী"।

(৪) 'কো-এডুকেশন,' বারোয়ারি উপন্যাস (কার্তিক ১৩৪৭)...১-১৪ পৃষ্ঠা।

(৫) 'পঞ্চদশী,' বারোয়ারি উপন্যাস (রাসপূর্ণিমা ১৩৪৮)...১৩৭-১৪৯ পৃষ্ঠা।

(৬) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র-সঙ্কলিত 'খনার বচন' (চৈত্র ১৩৫২)...সংগ্রহ ও অর্থনির্ণয়।

(৭) 'অভ্যুদয়,' (গীতিনাট্য)। (শ্রাবণ ১৩৫৩)... অধিকাংশ গান, দ্র° শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা।

এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে সজনীকান্তের সহযোগিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে; উহা বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'রাজর্ষি'র (ইং ১৯২৫) পাঠনির্ণয়, ডক্টর সুকুমার সেনের *Brajabuli Literature* (ইং ১৯৩৫) পুস্তক-রচনায় দুষ্প্রাপ্য পুথিদান ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'র (ইং ১৯৩৯) জন্য বিভিন্ন প্রকার ছন্দের উদাহরণ রচনা।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত কাশীরাম দাসের সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত — ১৩৩৪, আশ্বিন

২। রজত-জয়ন্তী: ভারত-সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১-৩৫) — জুন ১৯৩৫

অন্যতর সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, ১-৩ খণ্ড — ১৩৪৪ ফাল্গুন-১৩৪৬ চৈত্র

অন্যতম সম্পাদক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা :

নং ১২—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' ১৩৪৬, শ্রাবণ
নং ১৩—'কথোপকথন' ১৩৪৯, বৈশাখ

আমাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় যে-সকল গ্রন্থের সুষ্ঠু সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ('রবীন্দ্র-রচনাবলী,' অচলিত সংগ্রহ ছাড়া) প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির তালিকা :—

৫। বঙ্কিম-রচনাবলী, ১-৯ খণ্ড ১৩৪৫, আষাঢ়-১৩৪৮, পৌষ
৬। আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাঁদ মিত্র ১৩৪৭, জ্যৈষ্ঠ
৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ১-২ খণ্ড ১৩৪৭ আশ্বিন-১৩৪৮, অগ্রহায়ণ
৮। মধুসূদন-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড ১৩৪৭, অগ্রহায়ণ-১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠ
৯। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড ১৩৪৯, মাঘ-১৩৫০, ভাদ্র
১০। বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা :
১। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ২। বলদেব পালিত, ৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৯ চৈত্র ১৩৫১, ভাদ্র
১১। দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড ১৩৫০, আষাঢ়-১৩৫১, ভাদ্র
১২। পালামৌ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৫১, বৈশাখ
১৩। রামমোহন-গ্রন্থাবলী। ১৩৫১, অগ্রহায়ণ-১৩৫২, ফাল্গুন
১৪। শকুন্তলা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৩৫২, অগ্রহায়ণ
১৫। দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী (কবিতা ও গান) ১৩৫৩, ভাদ্র
১৬। হুতোম প্যাঁচার নকশা ও অন্যান্য সমাজচিত্র ১৩৫৫,বৈশাখ
১৭। সীতার বনবাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৩৫৫, আশ্বিন
১৮। রামেন্দ্র-রচনাবলী, ১-৫ খণ্ড ১৩৫৬, আষাঢ়-১৩৫৭, মাঘ
১৯। সারদামঙ্গল : বিহারিলাল চক্রবর্তী ১৩৫৬, ফাল্গুন
২০। মহিলা : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩৫৭, বৈশাখ
২১। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী ··· ১৩৫৭, শ্রাবণ
২২। পাচকড়ি-রচনাবলী, ১-২ খণ্ড ··· ১৩৫৭, ফাল্গুন-১৩৫৮, আষাঢ়
২৩। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

[১৭ই আশ্বিন ১৩৫৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গত হইলে, সজনীকান্ত দাস মহাশয় একাকী গ্রন্থাবলী সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করেন।]

২৪। হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১-২ খণ্ড ··· ১৩৬০, আষাঢ়-১৩৬১, অগ্রহায়ণ
২৫। অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী ··· ১৩৬২, ফাল্গুন-১৩৬৩ শ্রাবণ
২৬। রামেন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ··· ১৩৬৩, চৈত্র
২৭। নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ১-৪ খণ্ড ··· ১৩৬৬, বৈশাখ-ফাল্গুন

সাময়িকপত্র-সম্পাদন : সজনীকান্ত দীর্ঘকাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সাময়িক-পত্র সম্পাদন করিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি' পরিচালন ও সম্পাদন তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীর্তি বলিয়া গণ্য হইবে। নূতন লেখক-গোষ্ঠী সৃজনে 'শনিবারের চিঠি'র প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমরা তাঁহার সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলির পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি :—

১। **'শনিবারের চিঠি' :** ইহা প্রথমে শ্রীযোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়—১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ। ১১শ সংখ্যা (১৮ আশ্বিন) হইতে প্রকৃতপক্ষে সজনীকান্তই ইহার পরিচালন-ভার এবং সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯শ সংখ্যা (২৮ অগ্রহায়ণ) হইতে তাঁহার নাম পত্রিকায় "সহকারী সম্পাদক"-রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে। ২৭শ সংখ্যা (৯ ফাল্গুন) পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রচার রহিত হয়।

পরবর্তী ১৩৩৩ সালে ইহার তিনটি বিশেষ সংখ্যা—"জুবিলী" (১৫ জ্যৈষ্ঠ), "বিরহ" (আষাঢ়) ও "ভোট" সংখ্যা (কার্তিক) প্রকাশিত হয়। ইহাতেও তাঁহার নাম "সহকারী সম্পাদক"-রূপে মুদ্রিত ছিল।

১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসে মাসিক আকারে 'শনিবারের চিঠি'র "নব পর্যায়" প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ সংখ্যা (মাঘ ১৩৩৪) হইতে তাঁহার নাম "সহকারী সম্পাদক" স্থলে "কর্মাধ্যক্ষ," এবং শ্রীযোগানন্দ দাসের নামের স্থলে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর নাম "সম্পাদক"-রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহার ৭ মাস পরে তিনি প্রকাশ্যে 'শনিবারের চিঠি'র "সম্পাদক"-রূপে অবতীর্ণ হন। নব পর্যায়ের "সম্পাদক"-রূপে তাঁহার কার্যকালের হিসাব—

২য় বর্ষ, ২য়-১২শ সংখ্যা···আশ্বিন ১৩৩৫-শ্রাবণ ১৩৩৬
৩য় বর্ষ, ১ম-৩য়···ভাদ্র-কার্তিক ১৩৩৬ (অতঃপর পত্রিকা বন্ধ)
৪র্থ বর্ষ, ১ম-১২শ সংখ্যা···আশ্বিন ১৩৩৮-ভাদ্র ১৩৩৯
৫ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা···আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।
'বঙ্গশ্রী'র ভার গ্রহণ করায় অতঃপর তিনি পরিচালক থাকিয়া শ্রীপরিমল গোস্বামীর উপর সম্পাদন-ভার ন্যস্ত করেন।
৮ম বর্ষ, ১০ম-১২শ সংখ্যা···শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৪৩
৯ম—৩৪শ বর্ষ···কার্তিক ১৩৪৩—মাঘ ১৩৬৮

২। 'বঙ্গশ্রী' (মাসিক) : ১ম-২য় বর্ষ···মাঘ ১৩৩৯-পৌষ ১৩৪১
৩। 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪।
৪। 'অলকা' (মাসিক) : ১ম বর্ষ, ১ম—৯ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪৫-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬)

৫। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ত্রৈমাসিক): ৪৭ বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা (১৩৪৭ সাল)

সজনীকান্ত আরও তিনখানি পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন, যদিও "সম্পাদক"-রূপে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইত না; এগুলি—

৬। 'চিত্রলেখা' (চলচ্চিত্র-বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক): সম্পাদক—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ১৮ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ নবেম্বর ১৯৩০।

৭। 'নূতন পত্রিকা' (সচিত্র সাপ্তাহিক): সম্পাদক—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। ইহার ৫ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৪ জানুয়ারি ১৯৩৬।

৮। 'যুগান্তর' (সাপ্তাহিক): সম্পাদক—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইহার মাত্র ৪ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১১ ভাদ্র ১৩৪৪।

চিত্রনাট্য: সজনীকান্ত সঙ্গীত ও চিত্রনাট্য-রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এই বিভাগে তাঁহার কৃতকর্মের তালিকা:—

১। ১৯৩৭: 'মুক্তি' (গল্প, চিত্রনাট্য ও সাতটি সঙ্গীত)
২। ১৯৩৮: 'হাল-বাংলা' (চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত)
৩। ১৯৪৬: রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' (চিত্রনাট্য)
৪। ১৯৪৭: রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' (চিত্রনাট্য)
৫। ১৯৪৮: বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' অবলম্বনে 'সমর' (চিত্রনাট্য ও দুইখানি সঙ্গীত)
৬। ১৯৪৯: বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' (চিত্রনাট্য ও দুইটি সঙ্গীত)
৭। ১৯৫০: শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' (সংলাপ ও সঙ্গীত)
৮। ১৯৫০: শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত)
৯। ১৯৫০: 'পরিত্রাণ' (সঙ্গীত)

ভূমিকা ও প্রীতির নিদর্শন: সজনীকান্ত ভূমিকা বা গ্রন্থ-পরিচয় লিখিয়া দিয়া বহু সাহিত্যিককে পাঠকের সহিত যোগ-স্থাপনে সহায়তা করিয়াছেন। বহু লেখকও প্রীতিবশে সজনীকান্তকে তাঁহাদের গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। স্থানাভাবে সেগুলির তালিকা দেওয়া হইল না।

কয়েকজন শিল্পীও প্রীতিবশতঃ সজনীকান্তের মূর্তি ও চিত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এই: ১। শ্রীঅতুল বসু—তৈলচিত্র, ২। শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—মূর্তি, ৩। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর—প্যাস্টেল ড্রয়িং, ৪। শ্রীসুনীল পাল—মূর্তি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ: পরিষদের সক্রিয় সেবায় আমিই বোধ হয় সজনীকান্তকে প্রথম অনুপ্রাণিত করি। আমারই অনুরোধে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন (১৬ আষাঢ় ১৩৪১)। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার হিসাব—

১৩৪০-৪৪, ১৩৪৮-৫১:	কার্যনির্বাহক সভার সভ্য
১৩৪৪-৪৬:	গ্রন্থাধ্যক্ষ
১৩৪৭:	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩৫২-৫৫:	সম্পাদক
১৩৫৬-৫৮:	সহকারী সভাপতি
১৩৫৮-৬৩:	সভাপতি
১৩৬৩-৬৮:	সহকারী সভাপতি
১৩৬৮	কোষাধ্যক্ষ

সভাপতিত্ব ও সংবর্ধনা: সজনীকান্ত তাঁহার সাহিত্য-জীবনে বহু সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন, বহুবার বহুভাবে জীবনে সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন, সেগুলির তালিকা এই অল্প পরিসরে দিবার চেষ্টা করা বৃথা। সজনীকান্তের শেষ জীবনে উল্লেখযোগ্য দুইটি সভা—গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে কাব্যশাখার সভাপতিত্ব এবং এই বৎসর জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। সজনীকান্তের জীবনে শেষ উল্লেখযোগ্য সংবর্ধনা—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৫৯ আগস্টে অনুষ্ঠিত সভায় মানপত্র ও উপহার লাভ।

মৃত্যু: জীবনের সূত্রপাতে তরুণ বয়সে নানা কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিয়া সজনীকান্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে যৌবনেই তাঁহার শরীর ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত হয় এবং ভিতরে ভিতরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া বৎসর চারেক পূর্ব হইতেই তাঁহার হৃদরোগের সূত্রপাত হয়। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে পুনরায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ (২৮শে মাঘ ১৩৬৮) বেলা তিনটায় তাঁহার জীবনাবসান হয়।

সম্পাদকের নিবেদন

শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত স্মরণে উৎসর্গীকৃত সংখ্যা। শনিবারের চিঠিকে শোকার্ত অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হচ্ছে এই সংখ্যায়। সামাজিক রীতি অনুসারে সজনীকান্তের পুত্র এবং কন্যারা তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। শনিবারের চিঠি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এই বিশেষ সংখ্যার মধ্য দিয়ে। এবং এই কর্মে পৌরোহিত্য করতে হচ্ছে আমাকে। এ সম্পর্কে যা বলবার তা গত সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে নিবেদন করেছি। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর অনুরাগী বন্ধু—অগ্রজ অনুজ বহুজনের লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশিত করবার চেষ্টা করেছি। যাঁরা লেখা দিয়েছেন—তাঁদের প্রত্যেককে শনিবারের চিঠি প্রণতি জানাচ্ছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাকে তাঁরা এই পবিত্রকর্মে সাহায্য করেছেন। আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু প্রীতি ও হৃদয়ধর্মে আমি কারুর থেকে কম নই—এই দাবিতেই এ ভার গ্রহণ করেছি। যতটুকু পেরেছি আমার বিশ্বাস সজনীকান্তের আত্মা তাতেই তৃপ্ত হবেন।

শনিবারের চিঠি অতঃপর আগামী সংখ্যা থেকে তার নূতন যাত্রা আরম্ভ করবে। আমি সেই যাত্রায় সজনীকান্তের আত্মার কাছে শনিবারের চিঠির জন্য আশীর্বাদ কামনা করি এবং ব্যক্তিগতভাবে শুভকামনা জানাই। সর্বশেষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কামনা ও প্রার্থনা জানাই শনিবারের চিঠির হিতৈষীদের কাছে—সজনীকান্তের বন্ধুজনের কাছে; তাঁদের স্নেহ, তাঁদের সহযোগিতা ও দাক্ষিণ্য থেকে শনিবারের চিঠি যেন বঞ্চিত না হয়।

—

- প্রচ্ছদপটে ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকৃত সজনীকান্তের মূর্তির চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে।
- এই সংখ্যার যাবতীয় ব্লক ও ছবির মুদ্রণ ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও করিয়াছেন।
- 'সপরিবারে সজনীকান্ত' ফোটোখানি Studio-de-Philladeloea কর্তৃক গৃহীত।
  অন্যান্য ছবির মধ্যে সম্মুখচিত্রটি শ্রীপরিমল গোস্বামীর ফটো এবং "তারাশঙ্কর বনফুল সহ সজনীকান্ত" চিত্রটি শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের ফটো হইতে গৃহীত।

শনিবারের চিঠি (বাংলা মাসিক পত্রিকা) সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭-এর অধিবাসী (ভারতীয় নাগরিক) শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক উক্ত ঠিকানা হইতে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

মালিকগণ: শ্রীমতী সুধারাণী দাস ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭ ও শ্রীরঞ্জনকুমার দাস ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭।

আমি শ্রীরঞ্জনকুমার দাস, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমত সত্য।

২৬।৩।৬২ (স্বাঃ) শ্রীরঞ্জনকুমার দাস।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৪শ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৮

সম্পাদক ঃ
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

প্রাক্‌কথন

সজনীকান্তের জন্ম বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে। পৃথিবীর পটভূমিতে তখন হিংসার উৎসবে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের ভয়ংকরী উন্মাদ রাগিণী বেজে উঠেছে। বাংলার মাটিতে বসে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের সেই সর্বনাশা রূপটিকে ধ্যান করে পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন :

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি', প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি ;
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

সারা পৃথিবী-জোড়া এই হিংসার উৎসব ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসনের কলুষস্পর্শে বীভৎসতর হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা পঙ্কশয্যা হতে জেগে উঠে ভারতের জীবনকে করেছে বিষজর্জর। কিন্তু তার আঘাত-সংঘাত মুখ্যত মহানগরীর বুকেই প্রত্যাহত পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। পল্লীগ্রাম এবং মফস্বল শহরে তখন শেষরাত্রির তন্দ্রাচ্ছন্নতা। উনবিংশ শতাব্দীর এই রাত্রিশেষের তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেই সজনীকান্ত চোখ মেললেন বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে মাতুলালয়ে। জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৫এ আগস্ট। সজনীকান্তের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল বর্ধমানের বহরান গ্রামে। তাঁরা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই-একজন পদকর্তা ও কবিও ছিলেন। সজনীকান্তের কোন-এক পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে বর্ধমান ছেড়ে আসেন বীরভূমের

রাইপুর গ্রামে। পিতা হরেন্দ্রলাল ছিলেন কানুনগো। পরে পাবনায় সাব-ডেপুটি কালেক্টর হন। অবসরগ্রহণ-কালে হয়েছিলেন দিনাজপুরে পার্টিশন-ডেপুটি কালেক্টর। সজনীকান্তের পিতৃকুল ঘোর শাক্ত, মাতৃকুল ঘোরতর বৈষ্ণব। প্রত্যহ ভোরবেলা মাতৃকণ্ঠোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামে সজনীকান্তের ঘুম ভাঙত। নয় ভাই-বোনের মধ্যে সজনীকান্ত ছিলেন পঞ্চম। তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ অমরেন্দ্রনাথ যৌবনে স্বদেশী আমলে কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। পিতা সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন স্বদেশী যুগের কবি। শৈশবে ও কৈশোরে অগ্রজের দৃষ্টান্ত সজনীকান্তকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করেছিল।

সজনীকান্তের হাতেখড়ি হয়েছিল স্বগ্রাম রাইপুরে লর্ড সিংহের পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে। চার-পাঁচ বৎসর বয়সে যখন জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হল তখন সজনীকান্তের পিতা উত্তরবঙ্গে মালদহের বাসিন্দা। মালদহের দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হল। নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই দীনু পণ্ডিতকে সজনীকান্ত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুপ্রণাম জানিয়েছেন। শৈশবে তিনি আর একজন আদর্শ শিক্ষা-গুরুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি হলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার। তরুণ বিনয়কুমার ছিলেন সজনীকান্তের গৃহশিক্ষক। আঠারো বৎসর বয়সে দিনাজপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সজনীকান্ত বৃত্তিলাভ করলেন। প্রবেশিকার দেউড়ি পেরিয়ে কলিকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরে থাকতেই সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক কলঙ্কের ছাপ পড়েছিল। সুতরাং সকল বিপ্লব-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ হল। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাঁকুড়ার শান্ত পরিবেশে ওয়েসলিয়ান মিশনারি কলেজে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং কলেজ-সংলগ্ন হস্টেলে খাস বিলাতি সাহেবদের তত্ত্বাবধানে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা হল। এই বাধ্যতামূলক পরিবর্তনের ফলে সজনীকান্তের কবিমন হল বিক্ষুব্ধ। পড়াশোনার পাঠ শিকেয় উঠল, সহপাঠী ও সহবাসী বন্ধুদের মোড়লির কাজ গ্রহণ করলেন তিনি। বুনিয়াদ ছিল পাকা, তাই আই. এস-সি. পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করেই উত্তীর্ণ হলেন। বাঁকুড়ায় দু বৎসর নির্বাসনের পর তখন কলিকাতার বাধা অপসারিত হয়েছে। সজনীকান্ত ভরতি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এস-সি.তে রসায়নে অনার্স নিয়ে। স্থান হল প্রধানতঃ খ্রীশ্চিয়ান-ছাত্র-অধ্যুষিত মুসলমান-বাবুর্চী-বয়-সেবিত ডাফ হস্টেলে। সেখানে আহার্য ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব করে তিনি স্থানান্তরিত হলেন অগিল্‌ভি হস্টেলে। সজনীকান্ত বলছেন, "আমার সাহিত্যজীবন গঠনে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেল ও অগিলভি হস্টেলের স্থান বিস্তৃততরভাবে স্মরণীয়" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৮]।

বি. এস-সি. পাস করে সজনীকান্ত মেডিক্যাল কলেজে পড়ার জন্যে প্রার্থী হয়েছিলেন। মনোনীতও হয়েছিলেন, কিন্তু এক মামাতো ভাইকে স্থান করে দেবার জন্যে নিজের নাম প্রত্যাহার করে গেলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। সেখানকার অধ্যক্ষ কিং সাহেবের বাঙালী-প্রীতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সমর্থন পায় নি। এই কলহের যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি হলেন সজনীকান্ত। ছাত্রাবাসে মাছ মাংস ও ডিম রান্না ও খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী ছেলেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বলাই বাহুল্য, স্বভাবনেতা সজনীকান্তই গ্রহণ করলেন তাদের নেতৃত্ব; এবং সেই অপরাধে মালব্যজীর আদেশে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হলেন বিতাড়িত। দু মাসের কাশীবাস সমাপ্ত করে তিনি ফিরে এলেন কলিকাতায়। ভরতি হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে। পদার্থ-বিদ্যায় [তাপ] এম. এস-সি. পড়া শুরু হল।

বিজ্ঞানের ছাত্র বটে, কিন্তু কলা ও বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলালক্ষ্মীই হলেন বিজয়িনী। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত বলছেন, "রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা এবং রবীন্দ্র-সংগীত উপভোগের সঙ্গে পাল্লা করিয়া কয়েকটি কঠিন রোগীর সেবাই মুখ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখানে সেখানে সংকটত্রাণের কাজে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া পড়ি" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৯]।

এই সময় কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবকবন্ধুর সাহচর্যে সজনীকান্ত ব্রাহ্মসমাজের সান্নিধ্যে এলেন। বাঁকুড়ায় এবং কলিকাতার ডাফ ও অগিল্‌ভি হস্টেলে খ্রীশ্চিয়ান জীবনচর্যায় অভ্যস্ত তরুণ সজনীকান্তের জীবনে নৈষ্ঠিক হিন্দুসংস্কার শিথিল হয়ে এসেছিল। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে গোঁড়ামির কোন সূত্রই আর অবশিষ্ট রইল না। সামাজিক ও ধর্মনৈতিক আচার-আচরণে সজনীকান্ত হলেন সংস্কারমুক্ত তরুণ বিদ্রোহী।

দুই

বয়স নয় কি দশ বৎসরে শিশু সজনীকান্তের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তখন সজনীকান্ত মালদহ জিলা-স্কুলের ছাত্র। গ্রীষ্মাবকাশ কি ভাবে কাটবে তাই ছিল সমস্যা। ছাত্রজীবনে এই গ্রীষ্মাবকাশ মধুরতম কাল। এই সময়টা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের অতিবাহিত হয় অ-পাঠ্য বই পড়ার আনন্দে। তখন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ছিল কৃপণের দানসত্রের মত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-গৃহে পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানি হত কচিৎ-কদাচিৎ। শিশুসাহিত্যের বলতে গেলে একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সজনীকান্ত এবং তাঁর আড়াই বছরের বড় অগ্রজ সৌরীন্দ্রনাথ এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বেরোতেন। সজনীকান্ত লিখছেন,

"যোগীন্দ্রনাথ সরকারেরই সংকলিত একখানি বই সংগৃহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। সামান্য একটি কবিতা, ধরণ-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়—কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল। সেই দিন সেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে উঠানের ডালিম-গাছতলায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম—

'দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।
ওপারেতে বৃষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা।
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥'

"একসঙ্গে দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সুগভীর ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম। তেমনটি আর কখনও করি নাই। প্রখর রৌদ্রালোকে নিখিল ভুবন পুড়িয়া যাইতেছে, একটা অলস রুক্ষ ঔদাসীন্যে চারিদিক থম্‌থম্ করিতেছে। বিরলপথিক পথের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিলে মরীচিকাও যেন দেখা যায়। শুধু গৃহপারাবতের উদাস কূজন আর দূরে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা ডাক প্রকৃতির সজীবতার করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে অবোধ বালকের মনে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেই নিদাঘ-দিবাবসানের রমণীয়তা নামিয়া আসিল, মেদুর মেঘে যেন সারা আকাশটা ছাইয়া গেল, বুঝি এখনি বৃষ্টি নামিবে। পড়া আর অগ্রসর হইল না, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ১৩-১৪]।

হঠাৎ দাদা এসে ছোঁ মেরে বইখানি কেড়ে নিয়ে গেলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে দাদার হেপাজত থেকে বইখানি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে গেল। কোলাহল শান্ত হলে খেলতে যাবার ছল করে বালক সজনীকান্ত উপস্থিত হলেন মহানন্দার তীরবর্তী একটি কাঠের গোলার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির উপর। অসমাপ্ত কবিতাপাঠ সমাপ্ত হল। সজনীকান্ত লিখছেন, "এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। তলায় নাম দেখিলাম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল" [তদেব, পৃ° ১৬]।

সজনীকান্ত বলেছেন, তাঁর জীবনের বাণীসাধনার এখানেই সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"ই সজনীকান্তকে সারস্বত-মন্ত্রে দীক্ষিত করল। এই কবিতা-পাঠের আনন্দই তাঁর জীবনের প্রথম ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর রসাস্বাদ। তিনি বলেছেন, "এই আদি শিহরণই আমার জীবনকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে।"

তিন

ছেলেবেলা সজনীকান্ত বড়দার কাছে উপহার পেয়েছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত একখণ্ড 'সরল কৃত্তিবাস'। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'সরল কৃত্তিবাসে'র মধ্যেই এই নামটির সঙ্গে সজনীকান্ত দ্বিতীয়বারের মত পরিচিত হলেন। মেজদা বলেছিলেন, ইনিই স্বদেশী গান লেখেন—এঁরই লেখা "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্"; রাখীবন্ধনের গান "বাংলার মাটি বাংলার জল"এর রচয়িতাও ইনিই। বালকের বিস্মিত মন বিমুগ্ধ হতে বিলম্ব হল না, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাতে পেলেন 'কথা ও কাহিনী'। এই 'কথা ও কাহিনী'কে সজনীকান্ত বলেছেন "বাল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার।" ছেলেবেলা বালক সজনীকান্তের কল্পনার নিত্যসঙ্গী ছিল রামায়ণ ও মহাভারত। আর ছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' আর 'শিশু'।

বাল্যদশা উত্তীর্ণ হতে না হতেই গ্রন্থপাঠে সজনীকান্ত হলেন সর্বভুক। পাঠ্য-অপাঠ্য নির্বিচারে হাতের নাগালে যে বই পেতেন তাই গলাধঃকরণ করতেন। শৈশবের সেই অভ্যাস তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮, প্রথম মহাযুদ্ধের এই দিনগুলি কিশোর সজনীকান্তের কেটেছিল দিনাজপুরে। তখন তাঁর মনে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন রক্তাক্ত ও বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সজনীকান্ত সেই আন্দোলনের বহির্বৃত্তে স্থান পেলেন। ভোর রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিকটস্থ জঙ্গলের এক পোড়ো বাড়িতে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলার মহড়া হত। চরিত্রগঠন ও ব্রহ্মচর্য পালনে প্রেরণা আসত স্বামী বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীকুমার দত্তের রচনাবলী থেকে। এমনি করে নিষিদ্ধ ও গোপনীয় পথে অজ্ঞেয় "দাদা"রা তাঁকে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। সুতরাং "দাদা"দের প্রেরণায় স্বদেশ-প্রেমাত্মক কবিতায় তাঁর খাতার পর খাতা পূর্ণ হতে লাগল। কিন্তু সরকারী চাকুরে পিতার পুত্রের পক্ষে স্বদেশপ্রেমের কবিতা লেখা অমার্জনীয় অপরাধের এলাকাভুক্ত। একদিন পিতৃব্যস্থানীয় উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারীর গৃহে তাঁদেরই বাগানের নিভৃত অংশে সজনীকান্তকে বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলির সঙ্গে নিজের কবিতার খাতাগুলিও নিঃশেষে ভস্মীভূত করে আসতে হল। বলাই বাহুল্য, পিতার ইঙ্গিতেই এই অগ্নিশুদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সজনীকান্ত এই ব্যবস্থাকে শান্তমনে গ্রহণ করতে পারলেন না। খাতায় নিবদ্ধ মতবাদের জন্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েও বাঁকুড়ায় নির্বাসিত হলেন। বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা দেওয়া, মোড়লি করা এবং সুর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়াই হল তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচী। সাহিত্যচর্চায় পিতার সমর্থন ছিল না; সুতরাং বই কেনারও সঙ্গতি ছিল না। চেয়ে-চিন্তে কিছু কিছু বই সংগৃহীত হত। গ্রন্থচৌর্যেও বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাতেও তরুণ গরুড়ের মহাবুভুক্ষা পরিনিবৃত্ত হত না। বাধ্য হয়ে সজনীকান্ত এক অভিনব পথ আবিষ্কার করলেন। সরকারী কাগজের খাতা বাঁধিয়ে গোটা গোটা বই নিজের হাতে নকল করতে লাগলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই বই। 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজি ও বাংলা, 'গোরা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' সম্পূর্ণ নকল করে নিয়েছিলেন। এই ভাবে সবশুদ্ধ সতেরোখানি বই নকল করা হয়েছিল। শুধু নকলই নয়, বইগুলি সজনীকান্তের কণ্ঠস্থও হয়ে গিয়েছিল। কাব্য-কবিতা তো বটেই, 'গোরা'র মত বিপুলায়তন উপন্যাসেরও বহু অংশ পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারতেন। একলব্য-শিষ্যের এই গুরুভক্তি একদিন রবীন্দ্রনাথের চিত্ত জয় করেছিল। ১৯২৪ সনে দৈবযোগে যখন সজনীকান্ত কিছুদিনের জন্যে গুরুদেবের অনুক্ষণ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন তখন সজনীকান্তের মুখে সতেরোখানা বই-নকলের কথা শুনে কবি কৌতুক ও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেন নি। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখছেন, "নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে

পারিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল" [আত্মস্মৃতি-১ পৃ° ১৭৫]।

এই প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত যে, সজনীকান্ত যে-সতেরোখানি গ্রন্থ নিজের হাতে নকল করে নিয়েছিলেন তার প্রত্যেকখানিই রবীন্দ্রনাথের। এ-জাতীয় অনুরক্তির নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে আর আছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রথম-দর্শনে মোহিতলাল সজনীকান্তকে বলেছিলেন, "শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে আপনি নাকি গুলে খেয়েছেন।" 'গুলে খাওয়া' ক্রিয়াটি বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ—উভয় অর্থেই সজনীকান্তের জীবনে ছিল একান্ত সত্য ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চার

বাঁকুড়া-কলেজ-হস্টেলে যে কাব্যগ্রন্থখানি সজনীকান্তের মনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল তা হল রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' [প্রথম প্রকাশ মে ১৯১৬]। শুধু সজনীকান্তই নয়, সেযুগের তরুণ কবিমানসে 'বলাকা'র কবির প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে নজরুল ইসলাম যে দুরন্ত যৌবনের জয়ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে বিদ্রোহী-কবিরূপে বাংলা-সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন, ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল 'বলাকা'।

'বলাকা'র প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিশ্বজীবন। সেই যুগকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোর।' দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন:

পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,...

এ ঘোষণা যে কত বড় ভাববিপ্লবের দ্যোতক তা গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। পুরানো সঞ্চয় যখন দেউলে হয়ে গেছে, সত্যের সমস্ত পুঁজি ফুরিয়েছে এবং বঞ্চনাই শুধু বেড়ে চলেছে, তখন জীবনের নূতন আদর্শের সন্ধানে, নূতন মূল্যবোধ আবিষ্কারের জন্যে মানুষকে বিপ্লবী পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। মহাযুদ্ধের মধ্যে সেই অগ্রগতির ইঙ্গিত পেয়ে কবি বলছেন:

এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,

কিন্তু যখন ভূতল-গগন-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন, তখন সেই মহামৃত্যু ভেদ করে নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছতে পারে একমাত্র বিপ্লবী যৌবন। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের যৌবন-শক্তিকে আহ্বান করে বললেন:

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত, প্রমুক্ত ও অমর যৌবনকে। তিনি পরম বিশ্বাসে বললেন:

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

কবিগুরুর এই আহ্বানেরই প্রত্যুত্তর প্রতিধ্বনিত হল নজরুল ইসলামের কণ্ঠে:

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই
শিখর হিমাদ্রির!

রবীন্দ্রনাথ বললেন:

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে
বজ্র বাজে গহন পারে,
কোন্ পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো!
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
* * *
কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না?

নজরুল যেন এরই প্রতিধ্বনি করে বললেন :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবোশেখী 'পর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।

কালবোশেখী ঝড়ে নূতনের কেতন উড়তে দেখার দৃষ্টি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই আনলেন 'বলাকা'র কবিতায়। সারস্বত ক্ষেত্রে নবযুগের বোধনমন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করলেন। বাংলা-সাহিত্যে বেপরোয়া দুরন্ত যৌবনের প্রাণবিহঙ্গকে উদ্বুদ্ধ করে তিনিই বললেন পুচ্ছটি তার উচ্চে তুলে নাচাতে।

'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের সেই যৌবনমূর্তি তরুণ কবিচিত্তকে যে উদ্দীপিত ও উদ্বেলিত করবে তা বলাই বাহুল্য। 'বলাকা'-কাব্য-পাঠে সজনীকান্তের দীপ্ত প্রাণের হর্ষদীপক তানে ধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত নরনারীর কণ্ঠে আর্তনাদ উঠেছে। দুর্গত মানুষের দুঃখহরণের ব্যবস্থা করা চাই। সমগ্র ওয়েস্‌লিয়ান মিশনারি কলেজ ভিক্ষায় বেরোবে। গান বেঁধে দিতে হবে। সজনীকান্ত লিখলেন :

ওঠ জাগো ভাই, শোন হাহাকার
ফাটিছে গগন পুব-বাংলার—
ঘরদোর গেছে জোটে না আহার,
ডুবিল তাহারা ডুবিল।
এল কি ঝঞ্ঝা করাল ভীষণ
গৃহহারা হল কত গৃহীজন···

এই গান কণ্ঠে নিয়ে বাঁকুড়া শহরে আর্তত্রাণের জন্যে ভিক্ষায় বেরোল কলেজের ছাত্রবৃন্দ। তাদের পুরোভাগে অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব। বাংলা ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনিও গানের সুরে কণ্ঠ মেলালেন। সদ্য-কলেজ-প্রবিষ্ট সজনীকান্তের তরুণচিত্তের উত্তেজনা সহজেই অনুমেয়। আত্মবিশ্বাসই শুধু তিনি ফিরে পেলেন না, যুগমানসের সঙ্গেও তাঁর কবিমানসের রাখীবন্ধন হল। কবিগুরু যোগালেন ভাষা :

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন—
মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন···"

ছন্দের এই বন্ধনমুক্তি সজনীকান্তকে আবিষ্ট করল। সজনীকান্ত লিখছেন, "সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবগাহন-স্নানান্তে আমি যেন সহসা ছন্দবোধের বরলাভ করিলাম। আমার কাছে—

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

"অর্থের বা ভাবের দিক দিয়া এই সুবিখ্যাত পংক্তিগুলি সেদিন ততখানি পুলকের সৃষ্টি করিতে পারিল না যতখানি করিল ছন্দের দিক দিয়া। আমি এক পরম রহস্যের সম্মুখীন হইলাম। অবিলম্বে রহস্য গভীরতর হইল 'পলাতকা'য়—যখন পড়িলাম :

বয়স ছিল আট
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্জেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি পড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মত।

এই আকস্মিক আবিষ্কারই আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত বরলাভের সামিল হইল যাহার পূর্ণ প্রকাশ 'রাজহংসে' ও 'মানস-সরোবরে'" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ° ৭৮-৭৯]। বস্তুতঃ 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র মুক্তবন্ধ ছন্দই হল নবযুগের কবিভাষার মুখ্য বাহন। সজনীকান্তও যেদিন তাঁর সত্যকার কবিসত্তাকে খুঁজে পেলেন সেদিন মুক্তপক্ষ বলাকার মুক্তকছন্দই হয়েছিল তাঁর 'মানস-সরোবরা'ভিমুখী 'রাজহংসে'র স্বচ্ছন্দগতি নভোবিহারের বাণী-বাহন।

[ক্রমশঃ]

—

সজনীকান্তের একটি কবিতা

কবিবন্ধু, লহ উপহার।
বিপুল সংসারপথে চলিতে চলিতে একদিন
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে ক্ষণিকের বিশ্রামশালায়
দুজনে হইল দেখা। পরস্পর পরিচয়হীন
তবু মনে হ'ল চেনা, পান করি এক পেয়ালায়
রসের অমৃত-সুরা উভয়েই ধন্য মানিলাম।
এই উপহার বন্ধু, সে পরিচয়ের নহে দাম।
সৃজন-মদিরা-ভরা অপরূপ এই সংসার—
অনুক্ষণ চলিতেছে তাই ঘটে নব পরিচয়।
যে রসে বিধৃত মোরা অজ্ঞানের অন্ধকারে
বারে বারে
তারি গাহি জয়।

বাণীহীন মূক খাতা আনি
ব্যাকুল আগ্রহ-ভরে দেখ তব মুখপানে চায়,
মিনতি করিয়া কহে, "ওগো বন্ধু কর সম্ভাষণ।
অজানার যাত্রী মোরা, কাল অতি দ্রুত বয়ে যায়।
যাহা ভাল লাগে বল, কেটে যাবে এই শুভক্ষণ।
অনন্ত কালের বুকে ক্ষণিকের ছন্দোময় ভাষা
শাশ্বত করিয়া দিক পথিকের পথের পিপাসা;
মোর বুকে মসীমুখে ঢাল তব হৃদয়ের বাণী।
লেখনী তুলিয়া নাও, সাদারে করিয়া দাও কালো
পথ-পরিচয়-স্মৃতি রাখ বন্ধু, বাণী মুখে
মোর বুকে
কালো হোক আলো।

মেনো বন্ধু, এই আবাহন।
সামান্যে স্মরিয়া তব খুলে দাও মনের ভাণ্ডার।
এ অনিত্য পৃথিবীতে নিত্য যাহা রহে ধ্বনিময়
উপহার-বিনিময়ে তাই হোক তব উপহার—
সংশয়ের দ্বিধা কেটে সত্য হোক ক্ষণ পরিচয়।
একা আমি দিনু বটে, তুমি দিবে সবার উদ্দেশে
কে শুনিবে নাহি ভেবো, ভেবো না কে নেবে ভালবেসে—
মোরা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য তব এ বিশ্বভুবন।
ছন্দে সুরে যদি কভু সার্থকতা লভে তব বাণী
দেখা যদি নাও হয় সুবিপুল এই ভবে
ধন্য হবে
মোর খাতাখানি।

[কবি উমা দেবীকে প্রদত্ত একটি ডায়েরী হইতে সজনীকান্ত রচিত এই কবিতাটি মুদ্রিত হইল]

দেওঘরে সজনীকান্ত

শ্রীজটাভূষণ মিত্র

ওই নীল আকাশ, নীল আকাশের নীচে ছোট ছোট পাহাড়গুলি, পাহাড়ের চারিদিকে ঘন বনানী ও ভোরের কুয়াশা। 'চল যাই সেখানে'—পদব্রজেই চলেছেন তপোবন পাহাড়ের দিকে সজনীকান্ত। ছোট ছোট নালা, নদী ও বন্ধুর পথগুলি বেশ দৃঢ়ভাবেই পেরিয়ে যাচ্ছেন। পেছিয়ে পড়ছি আমরা। একসময় থমকে দাঁড়ান পথের ধারে, কোন কোন গাছের ডাল দেখিয়ে সঙ্গী শান্তিবাবুকে উদ্দেশ করে বলেন, দেখছ শান্তি—এইটা মহুয়া গাছ, রবিবাবু এই গাছটিকে অবলম্বন করে কত না কাব্য রচনা করেছেন। দেখ তুমি চেষ্টা করে, এইখান থেকে শুরু হয়ে যাক তোমার কাব্যরচনা।

আমের বাগান, ধানের ক্ষেত, শালের বন, অশ্বত্থ ও বট প্রভৃতি মহীরুহকে পেছনে ফেলে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছি। হঠাৎ সজনীবাবু বলে উঠলেন, ওই দেখ, পাহাড়ের পাশ দিয়ে সূর্য উঠছে, কী সুন্দর! একে উদয়াচল বলতে পার।

ক্রমে পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছলাম, সিঁড়ি ভেঙে সকলে ওপরে উঠলেন, এ-পাহাড় ও-পাহাড়ে আনন্দের সঙ্গে ওঠানামা করে বেড়াতে লাগলেন, আমরা মন্দিরে দেবস্থানগুলিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করলাম, কেবল তিনিই লাঠিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সোজা হয়ে। কবি সাহিত্যিক ভাব—পূজার্থীর ভাব নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কই, আপনি তো কোথাও প্রণাম বা পূজা করলেন না? যখন কষ্ট করে এতদূরে এসেছেন—

যিনি এই মনোরম স্থানটিকে রচনা করে আমাদের আনন্দদান করছেন, তাঁকেই আমি অন্তরে পূজা করি ও শ্রদ্ধা জানাই।—উত্তর দিলেন সজনীকান্ত।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে, কলকাতায় জাপানীরা বোমা ফেলতে আরম্ভ করেছে, কলকাতার লোক মহানগরী পরিত্যাগ করে ধনপ্রাণ নিয়ে পশ্চিমের দিকে পাড়ি দিচ্ছে, হাওড়া স্টেশনে তিলধারণের স্থান নেই, গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। সজনীকান্ত তাঁর ভাই ও বন্ধুবান্ধব সপরিবারে প্রায় পনেরো কুড়িজন সদস্যের দলবল নিয়ে এই বিপদের সময় দেওঘরের দিকে যাত্রা করলেন। এই সময় ছিল জীবনমরণের সমস্যা—তিনি কেবল নিজের নয়, অপরের কথা ভেবে এক বৃহৎ দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে এগিয়েছিলেন। দেওঘরে উপস্থিত হলেন ভোরে—উইলিয়মস্-টাউন পল্লীতে। যে বাড়িটি তাঁর জন্য ভাড়া করা হয়েছিল সেটি ছিল আয়তনে অতি ক্ষুদ্র—এতবড় পরিবারের পক্ষে সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। হঠাৎ আমার কাছে তাঁর পাণ্ডাজী এসে তাঁর বিপদের কথা আমাকে জানালেন। ছুটলাম। গিয়ে দেখি হুলুস্থূল ব্যাপার, দশ বারোটি ঘোড়ার গাড়ি লোক ও মালবোঝাই অবস্থায় একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। সজনীকান্ত লাঠিটি নিয়ে এধার ওধার করছেন, হয়তো আমারই জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন, মধ্যে মধ্যে সুরসিক ভাষায় বাড়িওয়ালাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করছেন—মানে বড় বাড়ি দেব বলে ছোট বাড়ি দেবার মতলবের জন্যে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে কাউকেই নামতে দিচ্ছেন না, অপছন্দ ঘরে কাউকেই পা দিতে দেবেন না। এ সময় অন্য বাড়ি টাকা দিলেও পাওয়া যাবে না—জামতাড়া থেকে বেনারস পর্যন্ত সকল স্থানই ভরপুর—কোথাও ঠাঁই নেই।

আমাকে দেখে সজনীবাবু আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—এই যে ভাগনে। এর আগে বহুবার সজনীবাবু দেওঘরে এসেছেন—তিনি সম্পর্কে আমার মামাবাবু হন, ভাগনের বারংবার অনুরোধ উপেক্ষা করে বাড়ি ভাড়া করেই থাকতেন, ভাগনের বাড়িতে উঠতেন না। এইবার বিশেষ ভাবে জব্দ হওয়ায় পুলকিত হলাম। বললাম, পড়েছেন মোগলের হাতে। উত্তেজনার ভাব শান্ত হল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়ি বম্পাস-টাউন 'গৌরভবনে' এলাম।

* * *

তারপর চলল বেড়ানো আর খাওয়া। তাঁর সবচেয়ে পছন্দসই জিনিস ছিল পেঁড়া, মন্দিরের পূর্বদুয়ারের ছালি (সর) আতা, সুগন্ধি কলম্বিয়া নেবু। এগুলি ছাড়া মাছ, মাংস আর অন্যান্য খাবারের প্রাচুর্য ছিল। তিনি বলতেন, কলকাতায় দম বন্ধ হয়ে আসে, খিদেও হয় না—বেড়াবার খোলা মাঠ নেই, এমনি আকাশে চাঁদও নেই, তারাও ওঠে না। অতএব কদিন এখানে এসে শরীরটা সারাও, যতটুকু গায়ে লাগে লাগুক।

১৯৫৫ সনে ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে তাঁর বাড়িতে এসেছিলাম, দূর থেকে আমাকে দেখেই চিৎকার করে মামীমাকে বলে উঠলেন, দেখ, ভাগনে আসছে—আর হাতে দেখছ পেঁড়ার সাজিটি! বাস্তবিক, তাঁর আন্তরিকতা, স্নেহ ও ভালবাসা ভোলবার নয়। কঠোর সমালোচকের অন্তরে এত ভালবাসা, এত আনন্দ! যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন নি তাঁরা তাঁর আসল রূপটি কী ছিল জানতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ

নির্মলকুমার বসু
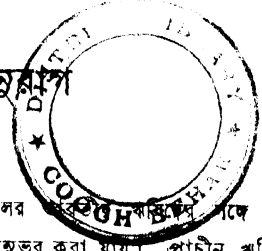
আমাদের দেশে প্রচলিত পুরাণগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়, প্রথমে উৎপত্তিখণ্ড অথবা ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডের অবতারণ থাকে। সমস্ত জগতের উৎপত্তি বিষয়ে প্রস্তাবনার পর ইতিহাস ও পরে বিশেষ বিষয়ে দেবদেবীর মহিমাকীর্তন এবং ভক্তিপ্রদর্শনের যুক্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। দেবতার মূর্তির পিছনে যেমন চালচিত্র আঁকা হয়, বিশেষ বিশেষ ধর্মের পিছনেও তেমনই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বিশেষ চিত্র বিরাজমান থাকে।

ভগবান বুদ্ধ যখন ক্রমে মূর্তির আকারে ভারতে পূজিত হতে লাগলেন তখন তাঁর মূর্তির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে একটি লিপি উৎকীর্ণ হত : 'যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহবদৎ। তেষাঞ্চ নিরোধো এবংবাদী-মহাশ্রমণঃ'। অর্থাৎ 'মূল হেতুকে আশ্রয় করে পরিদৃশ্যমান জগতে যে সকল ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে, তাদের সেই মূলগত হেতুর বিষয়ে তথাগত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই সকল ধর্মের নিরোধ বা নিবৃত্তি কি করে হবে সে বিষয়েও তিনি বলেছিলেন। এমন যে মহাশ্রমণ, (এটি তাঁরই মূর্তি)'।

অপূর্ব কথা, সমগ্র জগতের বিষয়ে যখন ধারণা স্পষ্ট হয় তখনই মানুষের কর্তব্যের সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে, তার পূর্বে নয়। এ কথা যেমন প্রাচীনকালে সত্য ছিল, আজও তেমনই সত্য আছে। পূর্বকালে ঋষিগণ যেমন উৎপত্তিখণ্ড দিয়ে পুরাণের প্রস্তাবনা করতেন, আজও মানুষের ধর্ম নির্ধারণের প্রয়োজনে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বারংবার ইতিহাস ও বিবর্তনের গতিকে বোঝবার চেষ্টা করেন এবং গ্রহনক্ষত্র ও অণুপরমাণু হতে জড় ও জীবের ধর্ম নির্ধারণ করার চেষ্টা করে থাকেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুরাকালের ঋষি বা কবিদের সমতুল ছিলেন। তিনিও প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্থান কোথায়, বারংবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সেই জ্ঞানকে চালচিত্রের মত পশ্চাতে রেখে মানুষের ধর্ম নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন।

কিন্তু প্রাচীনকালের [illegible] এক বিষয়ে তাঁর পার্থক্য অনুভব করা যায়। প্রাচীন ঋষিগণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি আমাদিগকে যে সংবাদ দেয় সেগুলি অলীক বলেই তাঁদের প্রত্যয় হয়েছিল। সেইজন্য তাঁরা ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রমাণের সন্ধানে অগ্রসর হতেন। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিকেই তাঁরা সত্যের নিশ্চল প্রমাণ বলে মনে করেছিলেন।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আচার্যগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথাবলম্বী ছিলেন। তিনি বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের সত্যসন্ধানের তপস্যার প্রতি পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। বিজ্ঞানসেবীগণ যন্ত্রের সহায়তায় নক্ষত্রলোকের যে-সকল সংবাদ আহরণ করেন, পরীক্ষাগারে অথবা প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ মন্দিরে জীবলোক সম্পর্কে বা জড়বস্তুর আদি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে বিচিত্র সত্যের ভাণ্ডার উন্মেষিত করেন তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইন্দ্রিয়গণকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। রূপরসগন্ধে আমোদিত পৃথিবীর ধূলিকে ও সৌন্দর্যকে তিনি যেমন পরমানন্দভরে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই সেই সকল ইন্দ্রিয় যে সত্যের সন্ধানে তাঁকে প্রবঞ্চিত করবে, এ অভিযোগ তিনি কখনও করেন নি।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করলেও তিনি হৃদয় এবং তার অনুভূতিকে সত্যলাভের অপর এক সাধনা বলে গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো কাব্যসাধনার সর্বোত্তম মুহূর্তে অতীন্দ্রিয় লোকের দুয়ার তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়ে যেত। কিন্তু সেই পথকে তিনি ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের বিরোধী বলে মনে করতেন না, পরিপূরক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ মূলতঃ এই কারণেই উদ্ভূত হয়েছিল। এবং ঋষিগণের সমগোত্র হলেও তিনি এ-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছিলেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টের সুপরিচিত সেই কাহিনী আমাকে চিরকাল চমৎকৃত করে: আদম-ঈভের স্বর্গচ্যুতির সেই রূপক কাহিনীটি। মৃত্যুর জন্মকাহিনী।

যতদিন জ্ঞানের ফল আস্বাদ করে নি মানুষ, ততদিন সে অনেক কিছুরই আস্বাদ পায় নি: শ্রমের মূল্য, নৈষ্কর্ম্যের নরক, সৃষ্টির বেদনা, জন্মের যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর পরিপূর্ণতা অজ্ঞাত ছিল মানুষের; কেন না নির্জ্ঞান নিশ্চেষ্ট নিস্তরঙ্গ প্রাচুর্যের ক্লীব নন্দনকাননে ছিল তার নির্জীব জীবন। প্রথম প্রলোভন, প্রথম পাপ, প্রথম জ্ঞান তাকে নিয়ে এল কঠিন মাটিতে। ঈশ্বরের অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ ঝরল তার মাথায়: কপালের ঘাম পায়ে ঝরিয়ে সংগ্রহ করতে হবে খাদ্য, দুঃখ পেতে হবে অজস্র, জন্ম এবং মৃত্যুর বিচিত্র জোয়ারভাঁটা তাকে অনিঃশেষ চলিষ্ণুতায় ব্যথিত ও ধন্য করবে। স্বর্গ থেকে যাও মানুষ মর্ত্যে, সেখানে চরৈবেতির মন্ত্র উচ্চারণ করো যুগ-যুগান্ত। কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে এই চলিষ্ণুতা? সে কি অপহৃত সেই নন্দন-কানন? তা যদি হয় তবে নিষেধকণ্টকিত নন্দন নয়, জ্ঞানের দুঃখ-পানে বলীয়ান মানুষ যদি পুনরর্জন করে অপহৃত স্বর্গ তাহলে সে একাধারে হবে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়েরই অধিকারী। কাহিনীটি এই রূপক অর্থে প্রতিভাত হয় আমার কাছে।

এইজন্য মৃত্যু আমাকে অবিমিশ্র বেদনা দেয় না। সমুদ্রের ওপারে দিগন্তরেখার মত অসীম এক করুণ প্রসন্নতা দিয়ে আমার চিত্তকে মৃত্যু উজ্জীবিত করে। জ্ঞানের কটুনির্যাস জীর্ণ হলে তবেই তো আবির্ভূত হবে ঈশ্বরের চরম অভিশাপ, আসলে যা পরম আশীর্বাদ—মৃত্যু।

মৃত্যুকে স্বীকার করার মধ্যে তাই রয়েছে শুধু পৌরুষ নয়, জ্ঞানফলাস্বাদনের সগৌরব উত্তরাধিকার। এই বোধ যাদের হয় নি, এককালের সেই সভ্যতায় অসভ্য মিশরীয়রা মৃতদেহকে শুকিয়ে জারিয়ে ন্যাকড়ার ফালি জড়িয়ে জড়িয়ে সিক-কাবাবের মত বীভৎস মমি তৈরি করত, খোদাই করা শবাধারে তাকে ভরতি করে জীবনের পৈশাচিক ক্যারিকেচার তৈরি করত পিরামিডের গর্ভে, আর সেই পিরামিডের যক্ষপুরীতে মৃতদেহের সঙ্গে পুঁতে রাখত মধু আর মদ আর জীবন্ত বিলাসসঙ্গিনীর অক্ষৌহিণী। বিপরীতপক্ষে জীবন ও মৃত্যুর পূর্ণতম দার্শনিক উপলব্ধি জেগেছিল সর্বপ্রথম যে ভারতীয়দের উপনিষদে, সেই ভারত শিখিয়েছে মৃত্যুর পর মরদেহকে অবিলম্বে পাবকের পবিত্র স্পর্শে পঞ্চভূতে বিলীন করে দিতে। নিষ্প্রাণ দেহ ভস্মীভূত করার মধ্যে যে জীবনের জয়গান উদ্গীত তাতে মৃত্যু অস্বীকৃত নয়, কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেখানে অনন্ত জীবনস্রোত বিঘোষিত।

শনিবারের চিঠি নামক প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ যদি কল্পনা করা যায় সজনীকান্ত দাসকে—এবং সে কল্পনা না করা মিথ্যাচরণ হবে—তবে এ প্রতিষ্ঠান তো আজ বিগতপ্রাণ দেহমাত্র। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে এর ক্ষয় শুরু হতে বাধ্য অবিলম্বে। সেই ক্ষয় রোধ করে এর বাহ্য আকার অবিকৃত রাখা যায় যদিও বা, তবু সেই মমি রচনার সার্থকতা কী? তার চেয়ে গতায়ু এই পত্রিকাকে উৎসর্গ করা হোক একটি বৃহৎ মৃত্যুর তীব্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখায়।

ভূমিকায় উল্লিখিত তর্কবাক্যের পক্ষসমর্থনে এই আমার মোটামুটি বক্তব্য।

॥ দ্বিতীয় প্রকল্প ॥

বিরুদ্ধপক্ষীয় বক্তব্যও উপস্থাপিত করব এখন। কারণ আগেই বলেছি এ প্রবন্ধ কোন সমস্যা-সমাধানের জন্য রচিত নয়, একটি অ্যাকাডেমিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত করা পর্যন্তই এর ঘোষিত উদ্দেশ্য।

ভারতীয় দর্শন দৈহিক মৃত্যুকে ধ্রুব জেনে নিয়েই বিরত হয় নি, আত্মার অবিনশ্বরত্বও নিশ্চিত জেনেছে। অক্লেদ্য, অশোষ্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য আত্মাকে চিনেছে বলেই মৃতদেহকে অগ্নিতে সমর্পণ করেছে ভারতবর্ষ। ওল্ড টেস্টামেন্টের যে কাহিনীটি ওখানে উল্লিখিত হয়েছে মামুলী সেই গল্পেও আত্মার স্থলভেদনের প্রসঙ্গ রয়েছে অবিলম্বে; যদিও আত্মা সম্পর্কে কোন দার্শনিক ধারণার অবকাশ পাওয়া যায় না সেখানে।

তাই যদি হয় তবে শনিবারের চিঠিও অবিনশ্বর—অন্ততঃ অবিনশ্বর হওয়া উচিত তার; কারণ সজনীকান্তের আত্মা অংশতঃ এ-পত্রিকায় প্রমূর্ত। প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান স্থূলদেহ একটি

'শনিবারের চিঠি'র আগামী বৈশাখ সংখ্যাটি বর্ধিত পৃষ্ঠাসংখ্যায় প্রবীণ ও নবীন কথাশিল্পী, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক, শক্তিমান কবি এবং সুরসিক ব্যঙ্গলেখকদের বিবিধ রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া "সাহিত্য সংখ্যা"রূপে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। এই বিশেষ সংখ্যার দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র। রেজেস্ট্রি ডাকে আরও পঞ্চাশ নয়া পয়সা বেশী লাগিবে। গ্রাহকগণের কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগিবে না। এজেণ্টগণ তাঁহাদের চাহিদা পত্রপাঠ আমাদের জানাইয়া দিলে ভাল হয়। ১০ই মের মধ্যে অর্ডার না পাইলে পত্রিকা পাঠানোর বিষয়ে অসুবিধা হইবে।

....

চৈত্র ১৩৬৮ সংখ্যায় বহু গ্রাহকের চাঁদার মেয়াদ শেষ হইল। পুনরায় এক বৎসর অথবা ছয় মাসের টাকা অনুগ্রহ করিয়া ১২ই মে তারিখের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র কার্যালয়ে মনিঅর্ডারে বা চেকে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা পুনরায় আর গ্রাহক থাকিতে চান না তাঁহারাও পত্রযোগে জানাইয়া দিবেন। চিঠি অথবা নূতন চাঁদা না পাইলে আমরা যথারীতি ভি. পি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠাইয়া দিব। ভি. পি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ ইহা স্মরণে রাখিবেন।

চাঁদার হার : বার্ষিক বারো টাকা, ষাণ্মাসিক ছয় টাকা।
ভি. পি. পি. যোগে অতিরিক্ত ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা।

কর্মাধ্যক্ষ
শনিবারের চিঠি
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

বস্তু নয়, তা এক আইডিয়া। আর আইডিয়া তো তাকেই বলে যা আইডিয়ালিস্টের মৃত্যুর পরও শাখার পর প্রশাখা বিস্তার করে যায় নব নব অন্তরে, ছোঁয়ায় নব নব স্ফুলিঙ্গ, মৃত্যুকে অতিক্রম করে শোনায় অপরাজেয় প্রাণের জয়গান।

পূর্ব পরিচ্ছেদে উক্ত আমার সমস্ত বক্তব্যকে সংক্ষেপে নস্যাৎ করে দিয়ে অতঃপর আমার বিরুদ্ধবাদীর দল নিজস্ব প্রকল্প উত্থাপন করেন: সজনীকান্তের মৃত্যুর পর শনিবারের চিঠি দ্বিগুণ উদ্যমে তার যাত্রা শুরু করবে; পূর্বসূরী পথ দেখিয়েছেন—শুধু পথ নয় পন্থাও দেখিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন সেই পন্থার অভ্রান্ত যাথার্থ্য—উত্তরসূরী সেই পথ অবলম্বন করে নির্ভীক যাত্রায় অভি-যাত্রী হবে; এবং যেহেতু পূর্বসূরীর বাধা-বিঘ্ন ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা তার করায়ত্ত মূলধন, অতএব তার যাত্রা হবে নিরাপত্তর, ফলবত্তর।

অসংখ্য, সংখ্যাতীত দৃষ্টান্ত উৎকীর্ণ আছে ইতিহাসের শিলালিপিতে। রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দিগ্বিজয়ে উচ্চকণ্ঠ। খ্রীষ্ট থেকে ক্রিশ্চিয়ানিটি, মহম্মদ থেকে ইস্‌লাম, রামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সুবিশাল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

এবং তার চেয়েও বড় কথা, একদিন যে প্রয়োজনে এই পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল আজকে সেই একই প্রয়োজন তীব্রতর নিনাদে আদেশ দিয়েছে একে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। তিন দশক আগে বাংলা সাহিত্যে ক্লেদের জয়ধ্বনি শুনিয়েছিল তারুণ্যের মদস্ফীত মেকী প্রগতিবাদীরা; সেদিনের শনিবারের চিঠি আবির্ভূত হয়েছিল জীবন ও সাহিত্যের সেই মিথ্যা মূল্যায়ন-প্রয়াসের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে। তিন দশক পর আজ বাংলা সাহিত্যের কী চিত্র দেখছি? আজকের তরুণ সাহিত্যিক ক্লেদের বেসাতিকে জীবনের একমাত্র উপজীব্য মনে করে না আর এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বা তারও চেয়ে সত্য হচ্ছে কদর্যতার স্থলে ভণ্ডামি হয়েছে তাদের জীবনবেদ। বাংলা কবিতা প্রাণহীন ভঙ্গিসর্বস্ব প্রয়োগ-চাতুর্যে পর্যবসিত, বাংলা গল্প নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে পুরনো থোড়বড়িখাড়ার রিজেক্টেড বস্তুকে আধুনিকতার অশালীন ছদ্মবেশ পরিয়ে হাজির করছে, বাংলা প্রবন্ধ রম্যরচনার নিশ্চিন্ত খাতে বইতে গিয়ে আবর্জনাস্তূপে ভরিয়ে ফেলছে তার গভীরতাকে, আর বাংলা উপন্যাসের কথা না বলাই ভাল। একদিকে তরুণ সাহিত্যিকের অক্ষমতা-প্রসূত ভণ্ডামি আর অন্যদিকে প্রবীণ সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ দেউলে দশা; তার সঙ্গে মিলেছে জঘন্যতম রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদেরও স্বপ্নের অতীত সাহিত্যিক দলাদলি, পুস্তক-প্রকাশক ও পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের পাপচক্র, যার ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোন প্রতিভার পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্র সম্পর্কে তিক্ত ঘৃণা ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি জাগা অসম্ভব, এবং চলচ্চিত্র ও সরকারী পুরস্কারের পাপক্লিন্ন প্রলোভন।

বাংলা সাহিত্যের আজকের পটভূমির সঙ্গে ত্রিশ বছর আগেকার পটভূমি তুলনা করলে আমাদের উৎফুল্ল হবার তেমন কারণ দেখি না। অজাতমিত্র শনিবারের চিঠির প্রথম আক্রমণে প্রাপ্যের অধিক প্রশংসিত যে কল্লোলযুগ, যা আসলে যুগ নয় হুজুগ মাত্র, সেখানে তবু হয়তো সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল, সকলের না হোক কয়েকজন তরুণের; আজকে বঙ্গদেশে সাহিত্যনিষ্ঠার চাইতে বেশ্যালয়ে সতীত্ব অনেক সুলভ। সেদিন চরিত্রচ্যুতির প্রলোভন সৃষ্টি করেছিল বোধ হয় একমাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটি অন্ধকার যুগের অসুস্থ প্রভাব; আজকে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস-রচনার প্রেরণা হয় চলচ্চিত্র-প্রযোজকের মেদগন্ধক্লিন্ন অর্থভাণ্ডার আর না হয় সরকারী অ্যাকাডেমির তদ্বির-স্বেদ-সিক্ত প্রশংসাপত্র (এবং বহু ক্ষেত্রে একই গ্রন্থ এই দ্বৈত উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে রচিত)। সেদিন সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার কলঙ্ক বিদূরিত করে অমৃত-রশ্মি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যোতির্ময় সান্ত্বনা; আজ রবি অস্তমিত হলে বেরিয়ে এসেছে ভীরুতায় হিংস্র পশুর দল গুপ্ত গহ্বর থেকে।

তাই তো আজ নতুন করে প্রয়োজন এক কালাপাহাড়ের, ত্রিশ বছর আগেকার সেই কর্তব্যে নিষ্ঠুর শনিবারের চিঠির, যে আবাহন করবে ভৈরব রুদ্রকে; তাণ্ডবের প্রচণ্ডতায় হৃদ্‌কম্প জাগাবে মিথ্যা আর ভণ্ডামি, লোভ আর স্বার্থ দিয়ে তৈরী সাহিত্যের ছদ্মবেশী সুবিধাবাদকে—সুন্দরের মন্দিরে যার অন্যায় ব্যভিপ্রবেশ।

ঐতিহাসিক এই প্রয়োজন কার দিকে আশার উদ্বেল চোখে তাকিয়ে আছে, কী জানি। শুধু জানি এ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে নির্লোভ নির্মোহ নির্ভয়তা। আর ঐতিহ্য যে নির্ভয় করে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত।

এবং ঐতিহ্যের অহঙ্কার শনিবারের চিঠি করতে পারে সত্যের অপলাপ না করে, সবিনয়ে।

॥ তৃতীয় চিন্তা ॥

দুই বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কথিত উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত যুক্তিজাল আমি প্রণিধান করেছি। দুই পক্ষীয় বক্তব্যের মধ্যে উত্থাপিত তথ্যগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমার মতানৈক্য নেই। অথচ দুটি সিদ্ধান্তই সত্য হওয়া অসম্ভব।

এর মধ্য থেকে সত্য-নির্ণয় অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু আগেই বলেছি কেবলমাত্র যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধ সত্যকে অন্বেষণ করার মধ্যে ঝুঁকি আছে। সেই কারণে, এবং এ-বিষয়ে বিশুদ্ধ সত্য অনতিবিলম্বে ঘটনাস্রোত থেকেই প্রতিভাত হবে সেই কারণেও, আমি বৃথা বিতণ্ডায় কালহরণ করতে উৎসুক নই।

তার পরিবর্তে আমি বরং কিঞ্চিৎ ভিন্নতর কিন্তু প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের উত্থাপন করে এই আলোচনা শেষ করব।

কুশ্রীতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুটি পৃথক কিন্তু অঙ্গাঙ্গি পন্থা। একটি বিনাশের, অপরটি নতুন সৃষ্টির। বিশুষ্ক জীর্ণ পাতা ঝরিয়ে দেওয়া একটি; নতুন কিশলয় জাগানো তারই পরিপূরক অন্যটি।

এবং পরিপূরক বলেই বিনাশ ও সৃষ্টি এই দুই কর্তব্যের মধ্যে গুরুত্বের ন্যূনাধিক্য কল্পনা করা অসঙ্গত। কিন্তু ন্যূনাধিক্য না হোক পূর্বাপর্য বিচারের প্রয়োজন আছে দুই কর্তব্যে। ভাঙার ভূমিকা প্রথমে কিংবা গড়ার ভূমিকা প্রথমে, অথবা দুই যুগপৎ? নতুন যাত্রাপথে শনিবারের চিঠিকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অবিলম্বে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভাঙা দিয়েই শুরু হয়েছিল তার দুর্ধর্ষ অভিযান—তিন দশক আগে। কিন্তু ভাঙা শুরু হতেই দেখা গেল গড়াও শুরু হয়ে গেছে অলক্ষ্যে। শুধু nature নয়, মানুষও abhors vacuum। তাই সুন্দরের মন্দিরে অনধিকারপ্রবেশকারীকে বিতাড়িত করলে সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠাবান ভক্ত এসে দাঁড়াবে সেখানে। তারা রয়েছে সকলের অলক্ষ্যে সর্বত্র, বসন্তের ছোঁয়ায় কিশলয়ের মত লগ্ন এলেই আবির্ভূত হবে তারা; সুন্দরের জয়ধ্বনি জাগবে উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে, কুশ্রীতার তিক্ত আর্তনাদকে বিস্মৃতিতে নিমগ্ন করে।

সৃষ্টি প্রকৃতির চিরন্তন কৌতুক, আমরা শুধু তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেই ধন্য।

যে শুধু সারাজীবন ভাঙার মন্ত্র উচ্চারণ করে যায় নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তিহীনতায়, সমকালের ইতিহাস তাকে প্রাপ্য মূল্য দেয় না সত্য, কিন্তু মূল্যের প্রত্যাশী হলে সে তো আসবেই না ইতিহাসের ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমে; তার স্থান সাময়িকতার শৌখিন বিপণিতে।

বিদ্রোহীর অন্তরের অন্তস্তলে যে করুণ বেদনার সৃষ্টিধর্মী ফল্গু, তার খোঁজ রাখে শুধু বিদ্রোহীরাই, আর কেউ নয়। যারা বিদ্রোহের অন্তরালে সৃষ্টি করছে অদৃশ্য নবজীবন, কিংবা যারা সম্যক সৃষ্টির অন্তরালে ঘোষণা করেছে জীর্ণতার বিরুদ্ধে আপসহীন বিদ্রোহ, সেই শিল্পীরা ছাড়া অপর কেউ সন্ধান রাখে না বিশ্বামিত্রের সৃজন-তৃষ্ণার, পরশুরামের মর্মবাণীর।

সজনীকান্ত দাস ভাগ্যবান, তিনি অসিচালনার কচিৎ অবসরে বাঁশি ধরার সুযোগও পেয়েছিলেন। আজ মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে যাঁরা সৌজন্যের স্বীকারোক্তি জানাতে চান, সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের; শুনতে পাচ্ছি এমনি ধরনের বিজ্ঞবাণী যে সংগ্রামী সজনীকান্ত, সংবাদ-সাহিত্যের মার্জনাহীন ক্ষুরধার সজনীকান্ত শুধু ছদ্মবেশ ছিল হয়তো, তাঁর মূল পরিচয় কবি। মূল পরিচয় কবি, কারণ তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যদি সেই সকল কাব্যগ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত না হত, যদি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের যোদ্ধবেশ খুলে একটি স্মৃতি, একটি অশ্রু, একটি আইডিয়ার উদ্দেশ্যে বীণাঝঙ্কারের অবসর নাই-ই পেতেন তিনি, তবে কি তাঁর

সৃষ্টিধর্মী শিল্পীপরিচয় তবু ফুটে উঠত না সংবাদ-সাহিত্যের সংহত ভাষার শিরায় শিরায় জড়ানো সেই এক অসহিষ্ণু রণহুঙ্কারে: সাহিত্যে অসত্য, অসুন্দর, অন্যায়ের স্থান নেই?

আমি জানি না এ কথাগুলো আমার অলীক কল্পনা কিনা। এ বিষয়ে দৃঢ় কোন মত প্রকাশ করার আগে যে প্রচুর পরিমাণে অনলস অধ্যবসায়ী অধ্যয়ন প্রয়োজন, তা আমার নেই। ভবিষ্যতে যদি তা অর্জন করি, এ প্রসঙ্গ হয়তো আবার উত্থাপন করব দৃঢ়তর প্রত্যয়ে।

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে না হোক, সাধারণ ভাবে এ কথা আমি আজই ঘোষণা করতে প্রস্তুত যে নির্মোহ সমালোচনার পক্ষে আজ অত্যন্ত দুর্দিন। সমালোচক আর ফুটবল ফ্যানের মধ্যে তারতম্য সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে ক্রমশ:; সাহিত্যের মোহনবাগান অথবা সাহিত্যের ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থক হয়ে নিজের দলকে যত উচ্ছ্বসিত বাহবা ও অপর দলকে যত দুয়ো দিতে পারা যায়, সমালোচক ততই নিজের আখের গুছিয়ে নিতে সমর্থ হন এখন। জাত-সমালোচকের সাক্ষাৎ মেলে কচিৎ, বজ্জাত সমালোচকের প্রাচুর্যে দেশ ছেয়ে গেছে।

এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে শনিবারের চিঠির ভূমিকা-গ্রহণ অবশ্যই সম্ভব। প্রকৃত সমালোচনা—নির্মম ক্ষুরধার ভাষায় সাহিত্য-সম্রাট থেকে শুরু করে সাহিত্যের স্বনিয়োজিত মোড়ল পর্যন্ত প্রত্যেকের ত্রুটিবিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধরা যে সমালোচনার অপরিহার্য অঙ্গ—যে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যেরই অবিভাজ্য অংশ, এই কথা ঘোষণা করার, এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব একদিন কাউকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

শনিবারের চিঠি যদি সেই আংশিক সম্পন্ন কর্তব্যকে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে—অন্য সকল প্রশ্ন স্থগিত রেখেও—সে সার্থক।

উচ্চাভিলাষে কলুষিত নয় যাদের চরিত্র, সুবিধাবাদের কাছে, ভণ্ডামির কাছে আত্মবিক্রয় করে নি যে সাগ্নিক সাহিত্যসেবীরা, তারা এসে নিশ্চয় দাঁড়াবে এমন যে কোন প্রতিষ্ঠানের ধ্বজামূলে। কেন না চিরকাল এমনই দাঁড়িয়েছে।

এই কথা স্মরণ করে আজ যে কর্ণধারকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে তরণী ভাসাতে বলছি প্রত্যাবর্তনহীন চিরন্তন যাত্রার চরৈবেতি মন্ত্রে, সে কর্ণধার আমাদের মর্মে মর্মে পরিচিত। সকল যাত্রার তিনিই তো কর্ণধার। তিনি পেশলদেহ উন্নতাশর উদাত্তকণ্ঠ বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত মৃদু ইতিহাসপুরুষ।

আমি তাঁকে প্রণাম করি॥

বিস্মিত কাব্য

বনফুল

মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। পাশে বসিয়া আছে বেণী দোলানো মেয়েটি। আমি তাহাকে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেছি। আমার হাতে কবিতার খাতা।

> ধরার অন্তর হতে যে অশ্রুত স্বর
> মনোহর মূর্তি ধরে শ্যামলে শাদ্বলে
> অনন্ত শোভায়, নর-নারী হিয়াতলে
> লক্ষ রূপে যাহার স্বাক্ষর ; যে বাণী ভাস্বর—

থামুন।

মেয়েটি তাহার স্বপ্নময় নীলচক্ষু তুলিয়া আদেশ করিতেই থামিয়া গেলাম।

ভাল লাগছে না—

আচ্ছা, আর একটা পড়ি তা হলে।

> একদা এই পথের বাঁকে
> এসেছিলাম তোমার ডাকে,
> আজকে দেখি
> পথও নেই, বাঁকও নেই, তুমিও নেই।
> আছে কেবল স্মৃতি-শ্রুতি
> মনে রাখার প্রতিশ্রুতি
> আজকে দেখি
> সত্য সেই, সত্য সেই, সত্য সেই।

মেয়েটি ম্লান হেসে চাইল আমার দিকে।

ভাল লাগছে না ?

ঘাড় নেড়ে জানাল—লাগছে না।

আচ্ছা, এইটে শোন তবে।

> তোমারি লাগিয়া কুসুম কুড়াব
> বসন্ত বনে বনে
> স্বপন আনিব চুনিয়া চুনিয়া
> পরীর দেশেতে গিয়া :
> মৃদুল গুঞ্জরণে
> ফুটায়ে তুলিব তোমারি রূপটি প্রিয়া,
> যে কথা বলিতে পারি নি তাহাই
> কহিব, কহিব গো—

মেয়েটি ঘাড় নীচু করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল।

বুঝিলাম এ কবিতাটাও ভাল লাগিতেছে না।

আর একটা পড়ব ?

কোন উত্তর দিল না। সহসা লক্ষ্য করিলাম চক্রবাল-রেখায় একটি নৌকার পাল দেখা দিয়াছে। কবিতার খাতা হইতে আর একটি কবিতা বাছিয়া পড়িতে শুরু করিলাম।

> আর তো সময় নাই :
> নিশাচরী বিহগীর ক্লান্ত কণ্ঠে
> ধ্বনিতেছে অন্তিম প্রহর।
>
> পূর্বাশার অগ্নিকুণ্ডে আসন্ন আগুন।
> জহর-ব্রতের লাগি
> সমাগত স্বপ্ন-সখী দল।
>
> শোন শোন
> আর তো সময় নাই।

চুপ করুন, ভাল লাগছে না ওসব।

দেখিলাম মেয়েটির দৃষ্টি দিগন্তে নিবদ্ধ। পাল-তোলা নৌকাটি নিকটতর হইয়াছে। দেখিলাম নৌকার পাল রঙীন। আবার খাতা খুলিয়া আর একটি কবিতা পড়িতে শুরু করিলাম।

চশমা পাই তো খাপ পাই না।
খাপ যখন পাওয়া গেল
মন তখনও বেখাপ্পা,
মসলার কৌটোটা কোথায়!

এই এলোমেলো কাণ্ডের মধ্যে
তুমি কিন্তু ঠিক আছ।
রঙীন সুতো দিয়ে
বেঁধে রেখেছ খাপছাড়াকে
অদ্ভুত স্বপ্ন-বন্ধনে।
তুমি—

আড়চোখে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার মুখভাব দেখিয়া মনে হইল সে কিছুই শুনিতেছে না। নৌকাটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। নৌকা দেখিয়া আমিও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। একটা পাল নয়, সাতটা পাল। সাতটা পালে সাত রকম রঙ। হঠাৎ মনে হইল পলিটিক্যাল কবিতা শুনাইলে হয়তো ভাল লাগিবে। সোৎসাহে শুরু করিলাম।

সিরিয়া আর আলজিরিয়া
লড়তে লড়তে থেমে গেল।
আসলে কিন্তু থামে নি
মনে মনে লড়ছে।
রুশ-মাকিন নাটকটা কি জমবে?
আসল নাটক শুরু হয় নি এখনও,
নিরস্ত্রীকরণের প্রহসনটা শুরু হয়েছে কেবল।
নাটক পরে হবে,
প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের ভিড় খুব।
হিন্দুস্থান পাকিস্তান
চীন তিব্বত
আফ্রিকা দূরপ্রাচ্য
দুনিয়ার জঙ্গলে
নানা পশুর চীৎকার
রোজই শুনছি।
পাগল হয়ে যাই নি
তুমি আছ বলে।
তবু—

থামবেন?

ঘাড় ফিরাইয়া দেখি মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে মিনতি। কিন্তু থামিতে পারিলাম না। বলিলাম, আচ্ছা, অন্য আর একটা পড়ছি।

তোমার যেটুকু কুড়ায়ে পেলাম
জীবন-সিন্ধু তীরে
সেটুকু আমার চির সম্বল
রহিব তাহারে ঘিরে
সেটুকু তোমার হারাইয়া গেল
আমার অতল তলে
আর তা ফিরিয়া পাবে না তো, সখি
কোনও ছলে-কৌশলে।

নৌকা আমাদের তীরে আসিয়া ভিড়িল। দেখিলাম নৌকা নয়, ময়ূরপঙ্খি। মেয়েটি নিঃশব্দে গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। বলিলাম, চললে? তোমার জন্যে মন কেমন করবে কিন্তু।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল। অধরে একটু যেন কম্পন দেখা দিল। কোন কথা সে বলিল না। ময়ূরপঙ্খি ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। আমি একটি সিগারেট ধরাইয়া সেই অপস্রিয়মাণ মহিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

—

কাল্লুড়ী মঙ্গন

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

বন্দরের এইখানটায় এসে দাঁড়ালেই আমার কাল্লুড়ী মঙ্গনের কথা মনে পড়ে। এই পুরনো কাঠের জেটিটার সারা দেহটা জুড়ে যেন কাল্লুড়ী মঙ্গন অদৃশ্য হয়ে বিরাজ করে। আমি এই জেটিটার ওপর এসে দাঁড়ালেই কাল্লুড়ী এসে দাঁড়ায় আমার পাশে। সেই রোগা প্যাকাটির মত হাড়-জিরজিরে চেহারা। সারা গায়ে ধুলো আর কাদা জমে এক পুরু চিরস্থায়ী পলস্তারা লেপে দিয়েছে। মনে হয় সেটা যেন তার গায়ের চামড়ারই একটা অংশ। হেঁড়ে মাথাটা জুড়ে পাতলা রুক্ষ চুলের ঝাড়। সমস্ত শরীরটা একেবারে দিগম্বর। কোমরে একটা দড়ি বাঁধা. সেই দড়িতে এপার ওপার টেনে দেওয়া এক টুকরো ময়লা চিরকুট ট্যানা। এইটাই তার শরীরে একমাত্র আবরণ। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কাল্লুড়ী মঙ্গনের ওই একই পোশাক, কোনদিন তার হেরফের নেই। কতই বা বয়স ছিল তার, হদ্দ এগারো কি বারো। এরই মধ্যে তার মুখে এসেছিল জীর্ণ বার্ধক্যের ছাপ। চোখ দুটোতে সব সময়েই লেগে থাকত কেমন যেন একটা পীড়িত দৃষ্টি, তাতে সব সময়ে তার চাউনিটাকে ভয়ানক করুণ করে রাখত। কিন্তু সেটা ছিল ওর বাইরের রূপ। ভিতরে তার বাস করত সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি। আমি সে কথাটা জানার পরই কাল্লুড়ীর ওপরে ভীষণভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম।

কাল্লুড়ীর সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম আলাপ, সে দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বোশেখ মাসে দুপুরের রোদে সারা বন্দরটা যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। বন্দরের টিনের শেডগুলোর চূড়োতে মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে। সেই আগুনের ফুলকিগুলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে এসে ট্রলি লাইনগুলোর ওপরে, স্তূপীকৃত নুনের আর শুঁটকি মাছের বস্তাগুলোর ওপরে। সরু মোটা পিচে-বাঁধানো রাস্তাগুলোয় গলা আগুনের স্রোত বইছে। সামনে বিছানো নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র। সেখানেও যেন আগুন জ্বলছে—নীল আগুন। সে আগুনের ঝলকানি এত তীব্র যে সেদিকে বেশীক্ষণ চাওয়া যায় না। চোখ যেন ধেঁধে যায়, পুড়ে যায়।

বন্দরের কাজে এ সময়টা পুরো ভাঁটার টান নামে। গরুর গাড়ির ভিড় খুব বেশী থাকে না। যে গাড়িগুলো যাচ্ছে তাদের চাকায় উঠছে লম্বা টানা করুণ শব্দ, যেন দীর্ঘদিন জ্বরগ্রস্ত রুগীর ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ। সমস্ত বন্দরটা জুড়ে এখন নেমে এসেছে একটা ঝিমুনির ভাব। বেশীর ভাগ কুলিকামিনরা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে যে যেখানে একটু ছায়া পেয়েছে তারই কোলে। এটা তাদের জিরোবার সময়। মাঝিমাল্লারাও দুপুরের খাওয়া সেরে ঢুকেছে নৌকোর গর্তে। একটা প্রাণীও দেখা যাচ্ছে না এ সময়ে বাইরে।

শুধু আমি আর পোর্ট অফিসের কেরানী সদাশিবন দাঁড়িয়ে আছি কাঠের জেটিটার ওপরে। আমি অপেক্ষা করছি আমার জাহাজের, সমুদ্রের ওপরে কিছু দূরে সেটাকে একটা ঝকঝকে বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে। সদাশিবনও অপেক্ষা করছেন জাহাজ আসার, তাঁর কাজ হল জাহাজ ভেড়বার জায়গা বেছে দেওয়া। এমন সময় পিছন থেকে করুণ কণ্ঠে আবেদন এল : সার্, চারটে পয়সা দেবেন? খাই নি সারাদিন। খিদেয় পেটটা জ্বলে যাচ্ছে।

পিছন ফিরে দেখি একটা হাড়-জিরজিরে বেহদ্দ নোংরা ট্যানা-পরা একটা ছেলে। বয়স হবে বছর এগারো-বারো। বাঁ হাতটা সামনে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ডান হাতটা একটু নেকড়া দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো। চোখে তার অদ্ভুত করুণ চাউনি।

কেউ ভিক্ষা চাইলে চট্ করে পয়সা ফেলে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, এই দারুণ গরমে মাথার ভিতর জ্বলে যাচ্ছে, এখন ভাগ্।

ছেলেটা কিন্তু গেল না। পরিষ্কার মৃদুস্বরে বলল, আমার পেটটাও যে খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে। তোমরা পয়সা না দিলে খাব কোথা থেকে?

সদাশিবন এবার তাকে একটু তাড়া লাগালেন : দূর হ্‌ এখান থেকে হতভাগা ছেলে। তোর পয়সার অভাব ? ভিক্ষে চাইতে এসেছিস কেন ? যা না, যা করে রোজগার করিস তাই করগে না।

ছেলেটা কিন্তু অদ্ভুত। সদাশিবনের কথার পিঠেই জবাব দিল, কি করে করব ? ডান হাতটা ভেঙে গেছে দেখছ না ?—গলার আওয়াজটা তার বেশ জোরাল, কিন্তু চোখে তার সেই গোবেচারার মত চাউনি।

এবার আমি কথা বললাম, হাতটা ভাঙল কি করে ? মারামারি করেছিলি ?

ও বলল, না, পুলিসে মেরে ভেঙে দিয়েছে।

এবার আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। বললাম, কেন রে ? চুরি করেছিলি ?

ও অবিচলিতভাবে জবাব দিল, না, চুরি করব কেন ? কাষ্টমস্‌ ফাঁকি দিয়ে মাল পাচার করে দিচ্ছিলুম বাইরে, তাই পুলিস ধরে সেদিন হাতটা ভেঙে দিয়েছে। সাংঘাতিক মেরেছিল আমায় সেদিন। পাঁচ-দিন হাসপাতালে ছিলুম। কাল ছাড়া পেয়েছি। হাতটা ভেঙে গেছে বলে তেমন জুত করতে পারছি না। দাও না চারটে পয়সা।

এবার আর করুণ আবেদন নয়, এবার দাবি। কিন্তু আশ্চর্য, মুখেচোখে তার এতটুকু ভাবের বৈলক্ষণ্য নেই, সেই একই রকম গোবেচারা ভাব।

এমন সময় হৈ হৈ করে আমার জাহাজ জেটির কাছে এসে পড়ল। জাহাজের ডেক থেকে একজন মাল্লা লম্বা নারকেল দড়ির মোটা কাছিটা তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল জেটির দিকে। আর সেই হাতভাঙা ভিখিরী ছেলেটা অবলীলায় তার বাঁ হাত দিয়ে সেই তালটি লুফে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার শেষের দিকের খানিকটা অংশ কোমরে জড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল ক্যাপস্টানের দিকে। বাঁ আর ভাঙা ডান হাতটা কোন রকমে এদিক সেদিক করে সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ক্যাপস্টানের সঙ্গে দড়িটা জড়িয়ে এঁটে দিল ছুটো জাহাজী ফাঁস। ব্যাপারটা ঘটে গেল দু মিনিটের মধ্যেই। জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে জেটিতে ভিড়ল।

আমি এবার ছেলেটিকে ডাকলাম : এই, শুনে যা।

ছেলেটি কাছে আসতেই তাকে বললাম, আয় আমার সঙ্গে জাহাজে, সেখানে তোকে খেতে দেব।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, না। পয়সা দেবে তো দাও, আমি মুরুক্কু কিনে খাব।

পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম ওকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোর নাম কি রে ?

কাল্লুড়ী মঙ্গন—বলেই একছুটে সে উধাও হল।

সদাশিবনের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, অদ্ভুত নাম তো! কাল্লুড়ী মঙ্গন! তামিলনাদে এ ধরনের নাম তো কক্ষনো শুনি নি!

সদাশিবন হেসে জবাব দিলেন, নামটা অদ্ভুত বটে। কিন্তু নামে আর স্বভাবে এমন মিল আপনি সচরাচর কোথাও খুঁজে পাবেন না। নামটি সেদিক দিয়ে পুরোপুরি সার্থক। যে বুড়ীটা ওর নাম রেখেছিল, তাকে এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

সদাশিবন জবাব দিলেন, কাল্লুড়ী মঙ্গন হল তামিল-নাদের একজাতের ভিখিরী। তারা হাতে একটি পাথরের হাতুড়ি নিয়ে লোককে ভয় দেখায়—হয় ভিক্ষে দাও, না হলে মুখে মাথায় হাতুড়ি মেরে রক্তারক্তি করব। লোকে ঝামেলা এড়াতে বাধ্য হয়ে পয়সা দেয়। কিন্তু কাল্লুড়ী মঙ্গন কথাটা আসলে বেশী চালু হল ঘাগী চোর কি ডাকাতদের সম্বন্ধে, যাদের মুখ দেখে এতটুকু বোঝার উপায় নেই যে তারা আসলে কি চীজ! এই ছোকরার মুখচোখ দেখেছেন—যেন কত দুঃখী। কিন্তু ওর মত শয়তান এ তল্লাটে খুবই কম দেখবেন। কথায় বলে—

কাল্লুড়ী মঙ্গন পোন বড়ি
কাদবু হল্‌ এন্নম তবিড়ি পোড়ি॥*

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, চুরি ডাকাতি করে নাকি ওই ছোকরা ?

সদাশিবন বললেন, না, চুরি ডাকাতি করে না। তবে কাষ্টমস্‌ ফাঁকি দিয়ে মাল পাচার করতে কি কি ফন্দী বাতলানো যায় তা ও আমাদের ধরে শেখাতে পারে।

বললাম, না না, কি বলছেন! ওই অতটুকু ছেলে—

* কাল্লুড়ী মঙ্গন চলে দুম্দাড়
দুপাশে বাড়ীর দোর ভেঙে চুরমার।

সদাশিবন বললেন, আমার কথা বিশ্বাস করছেন না সার্। আমি আপনাকে একদিন এর প্রমাণ দেখাব।

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, আমি এই পোর্টে কাজ করছি গত ত্রিশ বছর ধরে। এখন বুড়ো হয়েছি, রিটায়ার করবার সময় এসে গেল। আমি এই পোর্টের হাড়-হদ্দ সব জানি। এর প্রত্যেকটি কুলিকামিন থেকে আরম্ভ করে, মাঝিমাল্লা মায় অফিসারদের পর্যন্ত কাউকে জানতে আমার বাকি নেই। আমি সার্ কাল্লুড়ীকে জন্ম থেকেই জানি। ওর—

বলেই চট্ করে কথার রাশ টানলেন সদাশিবন যেন কি একটা মনে করে। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, যাকগে সে সব কথা, কিন্তু আমি দেখাব কাল্লুড়ী কী চীজ।

এই ঘটনার পর থেকে কাল্লুড়ী মঙ্গন এই পোর্টে আমার আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। পোর্ট এলাকায় ঢুকলেই আমার চোখ দুটো অজ্ঞানতেই খোঁজ করত কাল্লুড়ী মঙ্গনের। ডান দিকের ডকগুলোতে মাল বোঝাইয়ের কাজ চলত। সেখানে আঁতিপাতি করে খুঁজেও কাল্লুড়ীর সন্ধান পেতাম না। বাঁ দিকের কয়লার ডকে নৌকো থেকে নামানো হত রাশিরাশি কয়লা। ডকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত রেল ওয়াগন। অগুনতি কুলিকামিন সেই কয়লা খালাস আর বোঝাইয়ের কাজ করত। কয়লার ধুলোতে তাদের দেখাত যেন ভূত-পেত্নীর দল। সেই দলে থাকত কমবয়সী ছেলেমেয়েরাও। তাদের ভিতর থেকে আমি কাল্লুড়ীকে কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারতাম না। তখন আমি ঈষৎ হতাশ হয়ে এসে দাঁড়াতাম কাঠের জেটিটার শেষ প্রান্তে। জাহাজের কাজ না থাকলে তাকিয়ে থাকতাম শুধু সমুদ্রের দিকে অলস দৃষ্টি মেলে। অনন্তবিস্তার সমুদ্র দুপুরের রোদে ঝকঝক করত নীলকান্তমণির মত।

একদিন এই রকম আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কাছেই জলেতে ঝপাং করে একটা শব্দ হল। একটা উলঙ্গ ছেলে তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। নির্মল সমুদ্রের মধ্যে তাকে দেখা যাচ্ছে মাছের মত সাঁতার কেটে চলেছে পাঁচ-ছ হাত গভীর জলে। কিছু দূরে গিয়েই সে ভুস করে ভেসে উঠল। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম ছেলেটা কাল্লুড়ী। একটু দম নিয়ে সে আবার মারল ডুব। এবার আর তাকে দেখতে পেলাম না। জলের কোন অতল গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে চলে গেছে। যেখানটায় ডুব দিয়েছিল তার ওপরকার জলের তরঙ্গগুলো স্থির হয়ে এসেছে। সেখানে ভাসছে শুধু কতকগুলো কয়লার গুঁড়ো। মিনিট্ দেড়েক কোন সাড়াশব্দ নেই—কোন চাঞ্চল্য নেই জলে। এই দেড় মিনিটেই কিন্তু আমার বুকের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু তক্ষুনি দেখলাম অনেক—অনেক দূরে গিয়ে আবার ভুস করে মাথা তুলেছে কাল্লুড়ী—যেন একটা বাচ্চা সিন্ধু-শুশুক। এমনি ডুবতে ডুবতে আর ভাসতে ভাসতে সে চলে গেল অনেক দূরে।

সমুদ্রের মধ্যে এই এলাকাটা ঈষৎ অগভীর। তাই বড় জাহাজ এদিকে আসতে পারে না। তারা নোঙর করে প্রায় ছ মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে। এই এলাকাটায় জলের নীচে একটা কাটা খাল আছে—ছোট ছোট জাহাজ চলাচল করবার পথ সেটা। জেটির কোল থেকে সে খালটা সোজা গিয়ে পড়েছে গভীর সমুদ্রে। এই খালটার গতিপথ ঠিক করবার জন্যে খালটার দু পাশে পোর্টের লোকেরা কিছুদূর অন্তর অন্তর লাইট-বয়া বসিয়ে খালটার সীমা চিহ্নিত করে রেখেছে। কাল্লুড়ী ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠল একটা বয়ার ওপর। সমুদ্রে যাবার সময় দেখেছি বয়াগুলোর ওপর যতটুকু সমতল অংশ থাকে তার ওপর বাস করে সিন্ধু শকুনেরা। জায়গার পরিধি হিসাবে তাদের পরিবারের সংখ্যা। যেটাতে সমতল অংশ বেশী তাতে পাঁচ-ছটি শকুন-পরিবার বাস করে। বয়াগুলোর রঙ-করা লোহার অংশটা মোটেই নজরে পড়ে না। সিন্ধু-শকুনদের গাদা গাদা পুরীষে জায়গাটায় মনে হয় যেন কেউ পুরু করে চুন লেপে দিয়েছে।

জেটির ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কাল্লুড়ী সেই পুরীষের মধ্যে কী যেন খুঁজছে। নিশ্চয়ই পাখির ডিম। ওইসব জায়গা থেকে ডিম খুঁজে আনা এখানকার ছেলেদের একটা মস্তবড় অ্যাডভেঞ্চার। তা ছাড়া ওই ডিমের নাকি কি কি সব গুণ আছে। তাই বাজারে ওগুলো বেশ চড়া দামেই বিক্রি হয়।

ভরদুপুরে পাখিগুলো যখন বাসায় থাকে না তখনই হল ডিম চুরির উপযুক্ত সময়। কাল্লুড়ী একটা বয়া থেকে আর একটা বয়ায় ডিমের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। আমি দেখে অবাক হলাম। অতদূরে সাঁতার কেটে যেতে কোন ছেলেকে কেন কোন বড়লোককেও আমি দেখি নি এযাবৎ। ছেলেরা সাধারণতঃ ডিম কুড়োতে যায় নৌকোয় চেপে। বড়রা সাঁতার কাটে কিন্তু কাল্লুড়ীর মত নয়। কাল্লুড়ী যেন জলের পোকা।

এমন সময় দূরে আমার জাহাজ দেখা গেল। কাল্লুড়ী একটা বয়ার উপর দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল। জাহাজটা একটু কাছে আসতেই সে আবার ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, কিলবিল করে সাঁতরে উঠল জাহাজে। দূর থেকে মনে হল সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। জাহাজটা জেটির কাছাকাছি আসতেই কাল্লুড়ী নারকেলের দড়ির কাছিটা কোমরে জড়িয়ে আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চটপট সাঁতরে এসে উঠল জেটির ওপর। দৌড়ে চলে গেল ক্যাপস্টানটার দিকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চটপট কাছিটা ক্যাপস্টানে জড়িয়ে বেঁধে দিল কয়েকটা জাহাজী ফাঁস। জাহাজ জেটিতে ভিড়ল। কাল্লুড়ী জাহাজে উঠে তার সম্পত্তি নামিয়ে নিয়ে এল। একটা দড়ির থলিতে গোটাআষ্টেক সিন্ধু-শকুনের ডিম। জাহাজের বমুন (ছোট জাহাজের ক্যাপ্টেন) বলল, এই কাল্লুড়ী, ডিমগুলো বেচবি ?

কাল্লুড়ী সেই রকম গোবেচারার মত মুখের ভাব করে বলল, না। আমার দরকার আছে।

বমুন বলল, তোর আবার দরকার কি রে ? তোর কি চালচুলো আছে যে রান্না করে খাবি ?

কাল্লুড়ী সেসব কথার জবাব না দিয়ে আমার মুখের দিকে করুণ চোখে চাইল : সাব্, আমাকে জাহাজের একটা কাজ দিন না।

বললাম, সেকি রে! জাহাজের কাজের তুই কি জানিস ?

কাল্লুড়ী বলল, আমি সব জানি সাব্। জাহাজের কাছি বাঁধা, সুকান ঘোরানো, জাল ফেলা মাছ ধরা এ সবই আমি করতে পারি সাব্।

বমুন তার কথায় সায় দিল। বলল, হ্যাঁ সাব্, ওসব তো ও জানেই, চমৎকার জালও বুনতে পারে। তা ছাড়া আমাদের জাহাজের প্রপেলারে যদি কখনও জালের দড়ি আটকে যায় তো ওই-ই ডুব দিয়ে সেই দড়ি খুলে দেয়।

বললাম, তুই তো বেশ আছিস কাল্লুড়ী। কয়লার ডকে কাজ করে তো বেশ দু পয়সা পাস, তাতে কি চলে না ? তা ছাড়া তোর বাপ-মাও তো কাজ করে—

কাল্লুড়ী আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাল যে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে। তার মুখেচোখে সেই গোবেচারার ভাবের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল। সেটা সন্দেহ কি অবজ্ঞা তা আমি ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু সেই ভাবটা দেখে আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কাল্লুড়ী পরিণত বৃদ্ধের গলায় বলল, বাপ-মা ? বাপ-মা আমার কোথায় ? আমার কি বাড়ি-ঘর আছে যে বাপ-মা থাকবে ?

সে কি! তোর বাপ-মা নেই ?

না, ঘর-বাড়ি যাদের থাকে তাদেরই তো বাপ-মা থাকে। আমার কেউ নেই।

তাহলে তুই থাকিস কার কাছে ?

কারুর কাছে নয়। এই পোর্টে থাকি।

কেন জানি না, আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়ে বেরল না, যদিও তখন হাজার প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল আমার মনে। বললাম, আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

জাহাজের কাজ সেরে আমি চটপট এলাম পোর্ট-অফিসে। সেখানে এসে দেখি সদাশিবনের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাল্লুড়ী। বলছে—সাব্, আমাকে পোর্টের একটা চাকরি দিন।

সদাশিবন বললেন, দেবো দেবো, একটা দড়িটানার লোকের কাজ খালি আছে, সেটা আমি তোকেই দেব।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সদাশিবন। আমাকে চোখের ইঙ্গিতে পাশের ঘরে যেতে বলেন তিনি। সেই-মত আমিও গেলাম পাশের ঘরটায়। ঘরটায় কতকগুলো মাল ঠাসা রয়েছে আর এক পাশে রাতের ডিউটি দেবার সময় ঘুমোবার জন্যে একটা চৌকী পাতা আছে। আমি এ ঘরে আসতেই সদাশিবন আমার পিছু পিছু এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে বললেন, সেদিন আপনাকে বলেছিলাম না কাল্লুড়ী কী চীজ!

বললাম, হ্যাঁ।

আজ আপনাকে দেখাব সার্,—কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে কাউকে এ কথা জানাবেন না। জানাজানি হলে আমার বিপদ আছে।

খানিকটা কৌতূহলী হয়েই বললাম, না, কাউকে বলব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সদাশিবন বললেন, চলুন তাহলে আমার বাড়ি। বেশীদূর নয়—এই দু ফার্লং দূরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। পরক্ষণেই সদাশিবন আর আমি পোর্টের বড় গেটটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাষ্টম্‌সের নতুন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসার পর থেকে গেটের ওয়াচম্যানদের ওপর জোর চাপ এসেছে পোর্ট-এলাকা থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের ওপর কড়া নজর রাখতে। তাই ওয়াচম্যানেরা তৎপর হয়েছে দশগুণ। প্রয়োজনবোধে তারা কোন কোন লোকের জামার পকেট হাতড়াচ্ছে, শরীরে খানাতল্লাশী করছে। কাল্লুড়ী বোট পার হবার সময় একটা ওয়াচম্যান তাকে ধরল। কিন্তু তার শরীরে তো শুধু একটা ট্যানা। সেটা একবার টেনে দেখে সে কাল্লুড়ীকে ছেড়ে দিল।

বাইরে এসে সদাশিবন কাল্লুড়ীকে ডাকল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সে এল সদাশিবনের বাড়িতে। সদাশিবন তাঁর বাইরের ঘরটায় আমাকে আর কাল্লুড়ীকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন। ঘরের দরজা ভেজিয়ে তাতে খিল লাগিয়ে দিলেন। দেখলাম উত্তেজনায় সদাশিবনের কপালের শিরাটা ফুলে উঠেছে। হাতটা একটু একটু কাঁপছে। কাঁপা গলায় তিনি বললেন, কাল্লুড়ী, কি এনেছিস বার কর্।

আমি অবাক হয়ে বসে কাল্লুড়ীর কাণ্ড দেখতে লাগলাম। সে তখুনি উবু হয়ে বসে পড়ে তার শরীরের ভিতর থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগল কতকগুলো পদার্থ। সদাশিবন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তার ওপর। আমিও দেখলাম সেগুলি জানলা দিয়ে আসা আলো লেগে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। বহুমূল্য পাথর নিঃসন্দেহে।

সদাশিবন আমার মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত হাসি হাসতে হাসতে বললেন, হীরে সার্—হীরে!

আমার মুখে কথা আসছে না। জিভ যেন জড়িয়ে আসছে। মনে খালি প্রশ্ন আসছে কি করে ওই অতটুকু একটা ছেলে তার শরীরের মধ্যে এতগুলো পাথর লুকিয়ে রাখতে পারে, যন্ত্রণা হয় না? আর শুধু লুকিয়ে রাখাই নয় সেই সব জিনিসগুলো নিয়ে সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই ঘোরাফেরা করে এল এতক্ষণ।

সদাশিবন হাত দিয়ে সেগুলোকে ছুঁলেন না। বললেন, গোন তো দেখি বাবা।

কাল্লুড়ী গুনে দিল কুড়িখানা হীরে। সদাশিবন অনুরোধ করলেন, একটু দাঁড়া বাবা, ভিতর থেকে জল আনি, ওগুলো ভালো করে ধুয়ে দে।

জলে ধুতেই হীরেগুলো আরও পরিষ্কার আরও ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল। কাল্লুড়ী বলল, টাকা দাও।

সদাশিবন তাঁর পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দিলেন কাল্লুড়ীর হাতে। কাল্লুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এক টাকার কথা ছিল না, দশ টাকা দেবার কথা। তুমি আমাকে দশ টাকা দেবে বলেছ, চাকরি করে দেবে বলেছ। সদাশিবন হাসিমুখে বললেন, বলেছি তা একশোবার স্বীকার করি কিন্তু আমার হাতে এখন একটা পয়সাও নেই বাবা কাল্লুড়ী। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি ঝামেলার ব্যাপার তা তো জানলি না কোনদিন।

তারপর একটু থেমে বললেন, তা ওই একটা টাকা নিয়ে এখন যা। আমি ওই দড়ি টানার চাকরিটা তোকে নির্ঘাত করে দেবো।

এবার কাল্লুড়ীর স্বরে আগ্রহ ভেঙে পড়ল: দেবে তো ঠিক।

সদাশিবন মুখখানাকে যথাসম্ভব নিরাসক্ত করে জবাব দিলেন, হ্যাঁ রে বাবা, দেবো দেবো।

কাল্লুড়ী তক্ষুনি বড় একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসল, ওই চাকরিটা হলে আমি একটা ঘর নিতে পারব?

সদাশিবন হেসে বললেন, অনায়াসে। তা তুই ঘর নিয়ে করবিটা কি?

আমার দরকার আছে।—বলে কাল্লুড়ী সদাশিবনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে এক ছুট দিল পোর্টের দিকে।

সদাশিবন এবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, গরিব কেরানী সার্। এদিকে ঘরে আমার পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে। তামিলনাদে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কী সমস্যা তা তো জানেন না। পৈতৃক ভিটে ভদ্রাসন যা

ছিল, জমানো টাকাকড়ি সব খরচ করে চার মেয়ে পার করেছি। এখন এই শেষেরটির জন্যে পাত্র খুঁজছিলাম। পেয়েও গেলাম ত্রিচেন্দুরে। ছেলেটি পোস্টঅফিসের কেরানী। বাপের অবস্থা মোটামুটি। কিন্তু ছেলের বাপ-মায়ের প্রচণ্ড খাঁই। রীতিমত জিদ ধরে বসল তারা মেয়েকে হীরের নেকলেস দিতে হবে। ছেলেটি আমার আর গিন্নীর খুব পছন্দ, তাই আর না করতে পারলাম না। ছেলের বাপ-মায়ের হাতেপায়ে ধরে অনুনয় করলাম, আমি গরিব মানুষ, হীরে পাব কোথায় বলুন?—তা বলে কি, পোর্টের কেরানীর কাঁচা পয়সা আমদানি। ওসব কথায় ভুলছি না।—আমি বারণই করে দিচ্ছিলাম, গিন্নী দুদিন উপোস করে ধরাশয্যা নিলেন। অগত্যা উপায় দেখতে হল। সিলভা মাঝি তোনী নৌকো নিয়ে সিলোনে যায়। নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যায় শুঁটকি মাছ। আসবার সময় সিলোন থেকে অন্য কোন মাল বোঝাই করে নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে আনে নানান জিনিসপত্র—থার্মোফ্লাস্ক, ছাতা, কাপড়, রেডিও, ঘড়ি—এই সব। কখনও কখনও সোনার তালও যে না আনে এমন নয়। বুঝতেই পারছেন এসব কাষ্টমস্ ফাঁকি দিয়ে আনা মাল। ওরকম করে তাকাচ্ছেন কেন সার্? এ কাজ এখানকার সব তোনীওয়ালারাই করে থাকে। এই সব মাল কিনতে পয়সা দেয় তোনীর বড় বড় পেটমোটা পয়সা-ওয়ালা মালিকরা। তাদের অন্য ব্যবসার সঙ্গে চোরাই মালের কারবার—একটা মস্তবড় কারবার সার্।

একটু চুপ করে সদাশিবন আবার আরম্ভ করলেন, তা সিলভাকে আমি অনেক সময় অনেক উপকার করেছি, এখনও করে থাকি। লোকটাও মাঝে মাঝে আমাকে সিলোন থেকে সস্তায় হরলিক্স, কাপড়চোপড় এইসব এনে দেয়। আমার মেয়েদের বিয়ের সময় কলম্বো থেকে সস্তায় সোনা আর যখন যা দরকার ওই-ই এনে দিয়েছিল। তাই ওকেই বললাম হীরের কথা। শুনে সিলভা বলল, হাজারখানেক টাকা খরচ করলে বিশখানা হীরে এনে দেবে সে সিলোন থেকে—আসল হীরে। সুতরাং আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু মুশকিল হল এই যে কাষ্টমসের নতুন সুপারসাহেব ভয়ানক দুঁদে লোক সার্! ওর চোখ এড়িয়ে কি করে মাল আনানো যায়? সিলভা বলল, আমি মাল পোর্টে নিয়ে আসব না, সমুদ্রের মাঝখানে রেখে আসব। কাষ্টমসের বড্ড কড়াকড়ি। আপনি আনাবার ব্যবস্থা করবেন মালগুলো। তখন কাল্লুড়ীকে ধরলাম। কদিন ধরে ছোকরা চাকরি চাকরি করে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। সেই চাকরির ধোঁকাই দিলাম ওকে। বলেছিলাম অবিশ্যি দশটা টাকা দেব ওকে। তা ও ছেলেমানুষ, ঘর নেই বাড়ি নেই টাকা পেলেই বা রাখবে কোথায়?

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাহলে টাকাও দিলেন না, চাকরিটাও এর করে দিচ্ছেন না?

সদাশিবন বললেন, খেপেছেন সার্? চাকরি পাব কোথায় বলুন?—বলে হি-হি করে কুৎসিত হাসি হাসতে লাগলেন। হঠাৎ আমার সারা মন বিদ্রোহ করে উঠল। মনে হল সামনের দেওয়ালে লোকটার মাথাটা ধরে গায়ের জোরে ঠুকে চুরমার করে দিই।

মুখে বললাম, কিন্তু এতবড় মিথ্যে কথা বলে ওকে স্তোক দিলেন—ধর্মে সইবে?

সদাশিবনের মুখের হাসি চট্ করে মিলিয়ে গেল। প্রকাণ্ড বিস্ময়ে একটা হাঁ করে বললেন, বলেন কি সার্! ওই একটা রাস্তায়-পড়া জারজকে ফাঁকি দিলে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান আমার ধর্মে হানি হবে! আপনি এত লেখাপড়া শিখে এ কী বললেন সার্!

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, জারজ!

হ্যাঁ, জারজ নয় তো কি?—বললেন সদাশিবন: পোর্টের আর কেউ না জানুক এই তিন কালের বুড়ো সদাশিবন তো সব জানে। ওর মা ওকে জন্ম দিয়েছিল কয়লার ওয়াগনের মধ্যে। তখন রাত প্রায় তিনটে। ধারেকাছে কোন জনমনিষ্যি ছিল না। আমি ডিউটি করতে করতে ওর কান্নার আওয়াজ প্রথম শুনেছিলাম। কিন্তু সার্, রাতের আঁধারে সেখানে যেতে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। আমি গেলাম সকালের আলো ফুটলে। এর মধ্যেই ওর মা হতভাগী ওকে ফেলে চম্পট দিয়েছিল। আর না দিয়েও তার অন্য উপায় ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সদাশিবন বললেন, তাহলে আপনাকে গোড়া থেকে সব ব্যাপারটাই বলতে হয়।

বললাম, বলুন শুনি, আমার বিন্দুমাত্রও তাড়া নেই।

কিন্তু এ সব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ব্যাপার। আমতা-আমতা করে বলে সদাশিবন মাথা চুলকোতে লাগলেন।

বললাম, কোন ভয় নেই। এ কথা মনে করুন আপনি দেওয়ালকে শোনাচ্ছেন।

সদাশিবন ভয়-ভয় মুখ করে বললেন, দোহাই সার্, এ কথা বাইরে যেন না যায়। ধনরাজের কানে উঠলে সে আমাকে জ্যান্ত রাখবে না।

বিস্ময়ের সঙ্গে শুধালাম, কে, ধনরাজ নাড়ার?

সদাশিবন উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ধনরাজ হল ওই কাল্লুড়ীর বাপ।

ধনরাজ এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী লোক। মস্ত বড় বড় অনেকগুলো কারবারের মালিক। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবেই চিনি। তাই ধনরাজের মুখটা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কাল্লুড়ীর মুখটা। সত্যিই তো মুখের আদলে অদ্ভুত সাদৃশ্য দুজনের। শুধু ধনরাজের মেদবহুল পরিপুষ্টতার জন্যে একটু অন্যরকম দেখায়। কিন্তু তার চোখ দুটোতে ঠিক ওই রকম গোবেচারার ভাব সব সময়ে লেগে থাকে। মনে পড়ল সেকথা।

সদাশিবন বলতে লাগলেন, জানেন তো সার্, দক্ষিণে কয়লা পাওয়া যায় না। কয়লা আসে এদেশে উত্তর থেকে। কলকাতা হয়ে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসে এই বন্দরে। এখান থেকে সমস্ত সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে কয়লা চলে যায় ট্রেন চালাবার জন্যে। এই কয়লা নামানো আর ওঠানোর কাজ করার জন্য রেলওয়ে থেকে প্রতি বছর একজন করে স্টিভেডোর কন্ট্রাক্টর ঠিক করে। এ কাজে লাভ অনেক, তাই অনেকেরই লোভ এর ওপরে। মিরাণ্ডাদের বংশ অনেককাল ধরে এই কাজ করে বেশ বড়লোক হয়ে উঠেছিল। সেবার তার সঙ্গে লড়তে নামল উঠতি-বড়লোক ধনরাজ নাড়ার। রেল-অফিসের নীচের থেকে ওপর পর্যন্ত ঢেলে ঘুষ দিয়ে কন্ট্রাক্ট বার করে নিয়ে এল নিজের নামে। আর কুলিদের মধ্যে রীতিমত হাহাকার পড়ে গেল। ধনরাজ বড় বদমেজাজী লোক। সে যখন কুলি খাটায় তখন তার হাতে থাকে একটা মোটা লাঠি। কাজে কেউ ঢিল দিলে সেই লাঠিখানা তার পিঠের ওপর ছাতু হয়ে যায়। তা ছাড়া লেশমাত্র যৌবন আছে এমন কোন নারীদেহ তার খপ্পর এড়িয়ে যেতে পারে না। এইজন্যে এ অঞ্চলের লোক তাকে নেকড়ে বলে। কুলিদের এখানকার নিয়ম হল তারা মেয়েমদ্দে খাটে, দেখেছেন তো? ধনরাজের কন্ট্রাক্ট পাওয়ার খবর শুনে কেউ আর যুবতী মেয়েদের কাজে পাঠাল না। কেবল বুড়ীরা আর পুরুষরা কাজে যেতে লাগল। কিন্তু লোক কম আর কাজ বেশী হলে যা হয়। কাজে অনবরত ঢিলে পড়তে লাগল। আর ধনরাজ খেপে গিয়ে প্রত্যেকদিন কুলি ঠেঙিয়ে রক্তারক্তি করতে লাগল।

একটু চুপ করে দম নিয়ে সদাশিবন আবার বলতে লাগলেন, তা মার খেতে খেতে মানুষ আর কত সহ্য করতে পারে বলুন? হাজার হোক মানুষ তো? একদিন একটা জোয়ান কুলিকে ধরে ধনরাজ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এমন পিটল যে তার সারা শরীরের চামড়া কেটে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হল। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে লোকটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ধনরাজের হাত থেকে লাঠিটা আচমকায় এক হেঁচকা টানে কেড়ে নিল। তারপর সজোরে একটা ঘা কষিয়ে দিল ধনরাজের মাথার ওপর। বেচারার শরীরটা প্রচণ্ড মার খেয়ে টলছিল, তাই তার হাতটা কেঁপে গেল। তাই লাঠির ঘা-টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধনরাজের কাঁধে গিয়ে পড়ল। মোষের কাঁধের মত মাংসল কাঁধ ধনরাজের, তাই আঘাতটা খুব বড় হয়ে লাগল না। নইলে মাথায় লাগলে কী হত বলা যায় না। ধনরাজকে তো তখুনি পোর্টের লোকেরা ধরাধরি করে দিয়ে এল তার বাড়িতে। তারপর ডাক্তার বদ্যি এসব করে কদিনের মধ্যেই সে ভাল হয়ে উঠল। কিন্তু সেরে উঠে সে সাংঘাতিক শোধ নিল।

এত সাংঘাতিক সে শোধ নেওয়া যে ভাবতেও আপনি শিউরে উঠবেন।—বলে সদাশিবন নিজেই শিউরে ওঠার ভান করে একটু চুপ করলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী করল ধনরাজ?

সদাশিবন চোখ গোল গোল করে জবাব দিলেন, কী না করল তাই বলুন। সমস্ত কুলি ধাওড়াতে এক সন্ধ্যাবেলায় সে আগুন লাগিয়ে দিল। কুলির দল হৈ-হৈ করতে করতে যে যার ঘরের জিনিসপত্তর রাস্তায়

জড়ো করতে লাগল। শুকনো নারকেলপাতার ছাউনি হু-হু করে জলতে লাগল। দেখতে দেখতে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে আগুন লেগে গেল ফুলকিগুলো উড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল একেবারে। কুলি মেয়েরা তো সবাই বুক চাপড়ে কান্না শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে বাচ্চারাও গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল। বুড়োবুড়ীরা কিছু করতে না পেরে শুধু কোলাহল বাড়াতে লাগল নিদারুণ ভয়ে। সেই ভিড়ের মধ্যে ধাওড়ার সবাই ছিল। ছিল না শুধু তঙ্গপ্পড়ম—সেই কুলিটা যে সেদিন ঠেঙিয়েছিল ধনরাজকে। দেখা গেল তাকে কারা তার ঘরের খুঁটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে গিয়েছিল, তাই আগুন লাগার পর সে আর পালাতে পারে নি। ধাওড়ার অন্য লোকেদের চিৎকারে তার চিৎকারটুকু বোধ হয় কারুর কানে যায় নি। আগুন নেভাবার পর ছাইয়ের গাদা থেকে যখন তাকে বার করে আনল তখন তার সারাটা শরীর পুড়ে একেবারে খাক হয়ে গেছে। তার বউয়ের নাম ছিল আরমুখম্। যেন একটা কচি বাঁশের কোঁড়ার মত ঢলঢলে আর সবুজ ছিল তার চেহারাখানা। তঙ্গপ্পড়ম মাত্র মাসখানেক আগে তাকে তিনেভেলী থেকে বিয়ে করে এনেছিল। সে ছিল ওই কুলি ধাওড়ার সেরা মেয়ে। সেই গণ্ডগোলের পর তাকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সে রাতে নাইট ডিউটিতে ছিলাম আমি। তঙ্গপ্পড়মের সেই বীভৎস ঝলসানো দেহটা বারবার মনে পড়ছিল আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না দু চোখে। রাত প্রায় দুটো নাগাদ বার্টের ওয়াচম্যান এসে খবর দিল, সার্, খালি ওয়াগনের ভেতর থেকে কী রকম একটা বিশ্রী আওয়াজ আসছে।

চট্ করে উঠে বসে বললাম, চল তো দেখে আসি গে। বলে আরও জনদুই জমাদারকে ডেকে নিয়ে আলো হাতে করে সেই ওয়াগনের মধ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে পড়ে আছে আরমুখমের দেহটা, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তার পরনের কাপড়টা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। সারা শরীরটা তার যেন একটা রাক্ষসে চিবিয়ে দিয়ে গেছে, মুখ থেকে তার বেরুচ্ছে একটা অস্ফুট আর্তনাদ। লোকগুলোকে দিয়ে তক্ষুনি তাকে এনে ফেললাম পোর্ট-অফিসের ঘরে। সেখানে মুখে মাথায় জল দিয়ে তো তার জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—পাষণ্ড।

জিজ্ঞাসা করলাম, কে পাষণ্ড রে?

সে চোখ বুজেই জবাব দিল, ধনরাজ সব্বনেশে।

সকাল হতেই তাকে আমি তার বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। কি দরকার সার্ ও সব ঝামেলা রেখে? তারই প্রায় দিন পনেরো পরে দেখি অবাক কাণ্ড। মেয়েটা সটান এসেছে কয়লা তোলার কাজে। তারপর ক্রমশঃ দেখতে লাগলাম দিন দিন মেয়েটা কী ভীষণ স্বৈরিণী হয়ে উঠতে লাগল। একেবারে বদলে গেল সে। লাজলজ্জার মাথা যে একদম খেয়ে বসল। বলতাম, আরমুখম্, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয় রে, শরীরটা একটু সামলেসুমলে চলিস।

বলত কি, শরীর আছে টাকা রোজগারের জন্যে। যতদিন থাকবে পাঁচজনকে দেখাব।

কিন্তু খুব বেশীদিন গেল না। এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল মেয়েটি আসন্নপ্রসবা।

এক রাত্রে ডিউটি করতে করতে পোর্টের জমাদার বললে, জানেন সার্, ধনরাজ কত্তা আরমুখম্কে শহরের বাইরে চলে যেতে হুকুম দিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন রে?

জমাদার জবাব দিলে, দেখছেন না ও তো ওই এখন-তখন হয়ে আছে। পাঁচজনকে বলে বেড়াচ্ছে ধনরাজের ব্যাটা ধনরাজকে দিয়ে যাবে।

* * *

আরমুখম্ যা বলেছিল ঠিক সে তাই করল। শহর ছাড়ল বটে, কিন্তু বাচ্চাটাকে এই পোর্টে কয়লার ওয়াগনে রেখে গেল। অবশ্য এই বদনামের জন্যে ধনরাজের কন্ট্রাক্টও তার পরের বছর খতম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো সার্ মাথায় হাত দিয়ে পড়লুম বাচ্চাটাকে কোথায় রাখব ভেবে। তা পোর্টের বুড়ী মেথরানীটা বললে, হুজুর, আমার তো ছেলেপিলে নেই, ওটা আমায় দিন। ভালই হল। কিন্তু হতভাগার এমন বরাত দেখুন ওর বছর দুই বয়স হতে না হতেই সেই বুড়ীটাও মরে গেল। তখন থেকে একরকম এই পোর্টেই ধুলো-কাদা মেখে গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষ হয়েছে কালুড়ী।

কথা শেষ করেই সদাশিবন উঠে দাঁড়ালেন: সার্,

অনেক দেরি হয়ে গেল আপনার লাঞ্চের। আমারও সার্ খিদেটা বেশ জোর পেয়েছে। তাহলে—

বললাম, বিলক্ষণ, আমি এই উঠলাম। যান, আপনি ভিতরে খেতে যান।

বলে রাস্তায় নেমে এলাম। খাওয়ার কোন ইচ্ছেই বোধ করছিলাম না কাল্লুড়ীর জন্মবৃত্তান্ত শোনার পর। মনে পড়ল ওকে কিছুদিন আগে ওর মা-বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম অজ্ঞানতেই। কি জানি কি ভেবেছে তখন ছেলেটা। মনে পড়ল, ও বলেছিল, ঘরবাড়ি যাদের থাকে তাদেরই তো বাপ-মা থাকে, আমার কেউ নেই।

বুকের ভিতরটা কি জানি কেন একবার মুচড়ে উঠল। মনে পড়ল কদিন থেকে কাল্লুড়ী চাকরির জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। একটু আগেই সদাশিবনকে জিজ্ঞাসা করছিল চাকরির টাকায় একটা ঘর ভাড়া করা যাবে কি না। তাহলে কি ওর মা-বাবার কথা মনে পড়েছে? অনুভব করছে বাপ-মায়ের চাহিদাটা?

কাল্লুড়ী সম্বন্ধে সেদিন থেকে আমার মনে নানান প্রশ্ন ভিড় করে আসতে লাগল।

* * *

সেদিন যথারীতি আমার জাহাজ ঘাটে ভিড়ল না। সমুদ্রের চক্রবালে দৃষ্টি অনেকক্ষণ রেখেও কোন সন্ধান পেলাম না জাহাজের। ওদিকে সমুদ্রের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। আকাশ মেঘলা হতে শুরু করেছে। সমুদ্রও সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত হতে আরম্ভ করেছে। নীল জলের ওপর এখানে-ওখানে খেপা নেকড়ের দাঁতখিচুনির মত দেখা যাচ্ছে রাঙা ফেনার রাশ এখন-তখন। গতিক খুব সুবিধের নয়। আমি আর দেরি না করে পোর্টের লঞ্চটা নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিলাম জাহাজটাকে খুঁজতে। কাটা খাল পার হয়ে এসে দেখি সমুদ্র তোলপাড় হচ্ছে। তারই মধ্যে দারুণ ঝাঁকানি খেতে খেতে লঞ্চ নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। তারপর ঘণ্টা পাঁচ-সাত খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় দেখি জাহাজটা নোঙর করে দাঁড়িয়ে ঝাঁকানি খাচ্ছে। তক্ষুনি কাছে গিয়ে খবর নিয়ে জানলাম ইঞ্জিনের একটা যন্ত্র হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটেছে। সুতরাং তাকে লঞ্চের পিছনে বেঁধে টানতে টানতে সেই প্রচণ্ড অশান্ত ঢেউয়ের মধ্যে নিদারুণ ঝাঁকানি আর নাকানিচোবানি খেতে খেতে সেই জাহাজটাকে যখন পোর্টে নিয়ে এলাম তখন রাত আড়াইটে। শরীর তখন অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জাহাজ থেকে নেমে টলতে টলতে পোর্টের এলাকাটুকু পার হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললাম। এখন সমস্ত ডকটা ঘুমে নিঝুম হয়ে পড়েছে। একটি প্রাণীও আর ডক এলাকার নজরে পড়ছে না। অদ্ভুত লাগছে ডকটাকে। ভাবলাম আসল রাস্তা দিয়ে না ঘুরে সর্টকাট করি। দু দিকে পাঁচিলের মত ডাঁই করা তুলোর গাঁটরির মাঝখানে সরু গলিটা দিয়ে যেতে গিয়ে আমায় দাঁড়িয়ে পড়তে হল। উলটো দিকের একটা ল্যাম্প-পোস্টের আলো লম্বালম্বি এসে পড়েছে গলিটার মধ্যে। তাতে দেখলাম একটা ছোট্ট ছেলে পথের ওপর কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর তার পাশে বসে আছে একটা মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষটা জেগে বসে আছে তুলোর গাঁটরিতে ঠেস দিয়ে। তার সারা গাটা আদুড়। কাপড়ের সেই অংশটা দিয়ে সে ঢাকা দিয়েছে ছোট ছেলেটার শরীরটা। সে একটা হাত ছেলেটার গায়ে দিয়ে বসে আছে। শুধু বসে আছে বললে ভুল হবে, সে বসে বসে নিঃশ্বাস টানছে বীভৎসভাবে। একটু দাঁড়িয়ে দেখলাম, তার সেই শ্বাসের টানে তার বুকের চামড়ায় ঢাকা হাড়ের পাঁজরাটা একবার ওপরে উঠে যাচ্ছে আবার নীচে নেমে আসছে কামারের হাপরের মত।

এই দৃশ্যটা দেখেই আমার মনে পড়ল কাল্লুড়ীর কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কাল্লুড়ী ছাড়া অন্য কোন ছোট ছেলে তো এই ডকের এলাকার মধ্যে রাতে থাকে না। তবে এ মেয়েটা কে? আরমুথম্ কি আবার ফিরে এল তার সন্তানের টানে? কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা আমার নয়। আমি একটু পরেই আমার বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পরের দিন যথারীতি পোর্টে ঢুকছি, দেখা হল সদাশিবনের সঙ্গে। বললেন, খবর শুনেছেন সার্?

বললাম, কি খবর?

সদাশিবন মুখখানা গোমড়া করে গলা নামিয়ে বললেন, কাল রাত্তে খবর এসেছে নেকড়েটা এ বছর

জে. এম. মিরাণ্ডাকে কলা দেখিয়ে কয়লার কন্‌ট্রাক্ট আদায় করে এনেছে। শুনতে পেলাম রেল-অফিসের পিওন থেকে বড়কর্তা অবধি টাকা খেয়ে মোটা হয়ে গেছে এবার। এবার ধনরাজ প্রতিজ্ঞা করেছিল কিনা কন্‌ট্রাক্ট যাতে পারোয়া সমাজের লোকের হাতে কিছুতেই না যায়। নাড়ারদের হাতে ব্যবসা রাখতেই হবে তা যত টাকা লাগে লাগুক। এ তো আর মানুষে মানুষে রেষারেষি নয়, এ হল জাতে জাতে রেষারেষি। তারই ফলে পারোয়ারা এবার কয়লার কন্‌ট্রাক্ট থেকে বিদেয় হল, এল নাড়ার।

বললাম, তাতে কি খুব বেশী ইতরবিশেষ হল ?

সদাশিবন তক্ষুনি জবাব দিলেন, আদবেই নয়। ও যে পারোয়া সেই নাড়ার। ও দুটো জাতের ভেতরেই মানুষের আদিম বৃত্তিগুলো একটু বেশীরকমে জোরাল। অবশ্য আজকাল ওদের মধ্যে কেউ কেউ লেখাপড়া শিখছে কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই বড় বেশী স্থূল। তাই নাড়াররা পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় অন্য কিছু চেনে না। তার জন্যে তারা খুন রাহাজানি অনায়াসেই করতে পারে। আর পারোয়া সমাজও প্রায় তাই কিন্তু তাদের আবার আছে ভুয়ো অহংকার—উঁচু জাত আর খ্রীষ্টান বলে।

বুঝলাম, তামিল ব্রাহ্মণের দৃষ্টি দিয়ে জাতের বিচার করছেন সদাশিবন।

একটু চুপ করে থেকে সদাশিবন বললেন, কিন্তু আমি বলছি হাঙ্গামও বাধবে আজকালের মধ্যেই। লেবার ইউনিয়নের পাণ্ডা এখন থেকেই বলে বেড়াচ্ছে মিরাণ্ডা কন্‌ট্রাক্ট না পেলে কোন কুলিই কাজে হাত দেবে না। কয়লা যেমন তেমনি নৌকোতে থাকবে। ধনরাজ কি আর তাই সহ্য করবার লোক মশাই ? বারো বছর আগে যা দেখেছি—এখন তো শুনতে পাই তার টাকাও অনেক বেড়েছে, গরমও যথেষ্ট বেড়েছে।

বললাম, যেতে দিন না মশাই। আমরা আদার ব্যাপারী, ওসব কথায় আমাদের দরকারটা কী ?—বলতে বলতে কাঠের জেটিটার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখে বললাম বটে আমাদের দরকারটা কী, মনটা কিন্তু বড় অস্থির হল। গত রাতের দৃশ্যটা মনে পড়তে লাগল বার-বার। যদি আরমুখম্ আবার এসে থাকে এই পোর্টে তাহলে তার আর কাল্লুড়ীর কী অবস্থা করবে ধনরাজ! চোখ আমার খোলাই ছিল সামনে কিন্তু কিছু দেখছিলাম না। মনের মধ্যে নানান ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ে-ছিলাম। হঠাৎ পিছনে ডাক শুনে চমকে উঠলাম।

সার্‌—

দেখি কাল্লুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সেই আগের মতই ভীষণ করুণ গোবেচারা ভাব—চোখেমুখে, সারা শরীরে।

ফিরে তাকালাম। বললাম, কি রে ? কি চাস ?

সে তেমনি ভাবে করুণ গলায় বলল, সার্‌, একটা চাকরি দিন।

বললাম, চাকরি আমি তোকে দিতে পারি, যদি সত্যি করে বলিস চাকরি নিয়ে কি করবি ?

সে পরিষ্কার গলায় বলল, চাকরি পেলে মাসকাবারি মাইনে পাব তো। তাতে একটা ঘরভাড়া নেব মাস-কাবারি ভাড়ায়।

এবার আমি তাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ঘরে কি তোর মাকে রাখবি ?

কাল্লুড়ী এবার আমার মুখের দিকে সোজা তাকাল। স্পষ্ট দেখলাম, সে চোখে তখন আর করুণ ভাব খেলা করছে না। সে চোখে যে ভাব ফুটে উঠেছে তা গভীর বিস্ময়ের। বলল, মা ? আমার মা বাপ কেউ তো নেই।

আমি তার কথার পিঠেই শুধালাম, গত রাতে যে মেয়েটি তোর কাছে বসেছিল সে তোর মা নয় ?

কাল্লুড়ীর চোখ দুটো আবার করুণ বেদনার্ত হয়ে এল। সেই গোবেচারা ভাবটা আবার ফিরে এল তার ভঙ্গিতে। বলল, না, মা এখনও হয় নি। ঘর নিলে বলেছে সে আমার মা হবে। আমায় রান্না করে খাওয়াবে। রাস্তায় থাকতে তার বড্ড কষ্ট। বড্ড অসুখ করেছে তার।

জিজ্ঞাসা করলাম, সেই জন্যেই তুই চাকরি খুঁজছিস ?

কাল্লুড়ী করুণ বিনয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ সার্‌। দেবেন একটা চাকরি ?

বললাম, দিতে পারি। কিন্তু তুই তোর নিজের কারবার ছেড়ে দিয়ে চাকরি করতে পারবি ?

কাল্লুড়ী আমার কথা বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তখন তাকে পরিষ্কার করে

বললাম, তুই ওই কাষ্টমস্ ফাঁকি দিয়ে মাল পাচারের কাজ ছাড়তে পারবি ?

কাল্লুড়ী বলল, যতদিন ধরা পড়ি নি ততদিন ভাল লাগত ও কাজ করতে। এখন পুলিস প্রায় রোজই সন্দেহ করে। মারধোর করে প্রায়ই। সেদিন তো হাতটা ভেঙে দিয়েছিল। তা ছাড়া লোকেরা যা পয়সা বলে তাও দেয় না—ফাঁকি দেয়। তা ছাড়া সার্, পয়সা পেলে আমি রাখব কোথায়? ঘরবাড়ি নেই তো। কাজেই ভেবেছি ও কাজ আর করব না। একটা চাকরি দিন না সার্।

বললাম, দেব। আজ শুক্রবার, আসছে সোমবার থেকে তোর চাকরি হবে।

আনন্দের চোটে কাল্লুড়ী শূন্যে একটা ডিগবাজী খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে। তারপর তার অভ্যাসমত সাঁতরে চলতে লাগল ডুবতে ডুবতে আর ভাসতে ভাসতে। গিয়ে উঠল সেই দূরের বয়াতে।

কাল্লুড়ী বোধ হয় সেখান থেকে সিন্ধু-শকুনের ডিম যোগাড় করবে। এবার স্পষ্ট বুঝলাম, তার সিন্ধু-শকুনের ডিমের প্রয়োজনটা কী। তার মায়ের অসুখ সারাবার জন্যে সে ওইগুলো যোগাড় করে নিয়ে আসে।

কাল্লুড়ীকে কথা দিয়ে আমি খুবই বিপদে পড়লাম। সরকারী আইনে তো কোথাও বারো বছরের ছেলেকে চাকরি দেবার পথ রাখে নি। তারা আণ্ডার-এজ। আমি ভাবতে লাগলাম, অন্য কী উপায়ে কাল্লুড়ীকে একটা কাজ দেওয়া যায়। কিন্তু আমার ভাবনার নিরসন করে দিল কাল্লুড়ী নিজেই—একদিনের মধ্যেই।

একদিন আমার জাহাজের ভাঙা এঞ্জিন মেরামতের কাজ চলছে। এঞ্জিন-ড্রাইভার আর মেকানিক বলেছে, ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌টের গণ্ডগোল সার্, বেশ ক'দিন সময় লাগবে ঠিক করতে। কাজেই সকাল থেকে রাত অবধি ওদের কাজের তদারক করছি জাহাজে। পোর্টের মধ্যেই আমার কাটছে বেশির ভাগ সময়। দেখছি পোর্টের মধ্যে ধনরাজ খুব ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে তার লোকজন সঙ্গে নিয়ে। মাঝখানে সদাশিবন এসে খবর দিয়ে গেল আজ রাতে একটা দাঙ্গা বাধবে বলে মনে হচ্ছে। ধনরাজ যাতে কুলিদের জুলুম করতে না পারে তাই কুলিরা তাদের আগেকার কথা বলে পুলিসের আশ্রয় চেয়েছে। আর সার্, শুনে অবাক হলাম এই এতদিন পরে তঙ্গপ্পড়মের বউ আরমুখম্ পুলিসে গিয়ে নিজে থেকে ধনরাজের কুকীর্তির কথা বলে এসেছে। এতদিন জানতুম সে শহর ছেড়ে চলে গেছে, তা তো নয়। সে মাস কতক হল এই শহরে ফিরে এসেছে। ভিক্ষে করে এখন রাস্তায় রাস্তায়, সে শরীর আর নেই। রোগে নাকি তাকে অর্ধেক শেষ করে ফেলেছে। তার জবানবন্দী পেয়ে পুলিস ধনরাজকে হুমকি দিয়েছে যেন কুলিদের ওপর কোন রকম জুলুম করা না হয়। ধনরাজ প্রথমে গিয়েছিল পুলিসকে টাকা খাওয়াতে। কিন্তু এ. এস-পি.র কানে সেকথা যেতেই তিনি ধনরাজকে টেলিফোনে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল করেছেন, ভয়ও দেখিয়েছেন। তারপর একদিন নিজের চোখে দেখেছি আর কানে শুনেছি সার্, আরমুখম্ ওই অতটুকু ছেলে কাল্লুড়ীটাকে ধনরাজের বিপক্ষে তাতাচ্ছে। শ্বাস টানছে আর বলছে—যেমন করে পারিস ওটাকে খতম কর্ বাপ আমার। তা ব্যাপার কতদূর গড়ায় এখন দেখুন। এদিকে ধনরাজ তো ডকের ভেতর চষে বেড়াচ্ছে—কী করা যায়। কী করে কুলিগুলোর ওপর জুলুম চালানো যায়।

কিন্তু জাহাজের কাজে সারাদিন ডুবে থেকে আমি ধনরাজের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। মেকানিক ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌টটা কিছুতেই এঞ্জিনে ফিট করতে পারছে না। একবার নামাচ্ছে, ইস্পাত চেঁচে ফেলছে, আবার চেষ্টা করছে। এই করতে করতেই রাত দশটা বাজল। আমার জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে কাঠের জেটিটার পাশে। এদিকটায় আলো নেই বলে আবছা অন্ধকারে ভরা। সন্ধ্যারাতের পর পোর্টের এদিকটা একদম নির্জন হয়ে যায়। কেবল জেটির পাশে দাঁড়ানো জাহাজগুলোতে যে আলো জ্বলে তাইতেই একটু-আধটু দেখা যায়।

রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করে জাহাজের লোকেরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আর ক্লান্ত হবারই কথা। কী নিদারুণ গরম যে পড়েছে তা বলা যাচ্ছে না। সমুদ্রে একটু হাওয়া নেই। মেঘের পাঁচিল দিগন্তে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। চটচটে ঘামে সবার শরীর ভেপ্‌সে উঠছে। মেকানিক একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। আবার

এখুনি কাজ শুরু করবে। জাহাজে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে কাজ চলছে। আমি একটু টাটকা হাওয়ার লোভে জাহাজের মস্তি ব্রীজের ওপরটায় (জাহাজের সবচেয়ে উঁচু অংশ) এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম কাঠের জেটিটার শেষ প্রান্তে দুজন লোক দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী পরামর্শ করছে। তাদের দুজনকেই স্বল্প আলোয় চিনতে কষ্ট হল না—একজন হল ধনরাজ, আর একজন মিরাণ্ডাদের এক ছেলে। ছেলেটা মদ-ভাঙ খেয়ে বাপের পয়সায় ফুর্তি করে ঘুরে বেড়ায়।

ব্যাপারটা আঁচ করতে দেরি হল না। ধনরাজ আর কোন পথ না পেয়ে মিরাণ্ডাদের এই ছেলেটাকে ধরেছে কুলিদের বোঝাবার জন্যে। মিরাণ্ডারা কুলিদের সঙ্গে কাজ করেছে দীর্ঘদিন ধরে, তাদের কথা ওরা খুব শোনে। তাই এই বখা ছেলেটাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে হাত করেছে ধনরাজ। ধনরাজ দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কী সব বোঝাচ্ছে ছেলেটাকে। সেও ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছে।

কিন্তু আমার ভাবনা আর বেশীদূর যাবার পথ পেল না। দেখলাম একটা ছোট ছেলে, ছিটেগুলির মত কোথা থেকে ছুটে এসে ধনরাজের ফাঁক-করা পা দুটোর মধ্যে দিয়ে গলে গেল। ধনরাজ দাঁড়িয়ে ছিল জেটিটার ঠিক একেবারে শেষপ্রান্তে। টাল সামলাতে না পেরে সে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে সমুদ্রে পড়ে গেল। ছেলেটাও তার সঙ্গে গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। সমুদ্রে একটা জল আছড়ানির শব্দ উঠল। বাস্, তারপর সব নিস্তব্ধ। একমুহূর্তে ঘটে গেল ব্যাপারটা। মিরাণ্ডাদের ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল। আমিও মস্তি ব্রীজের ওপর থেকে চটপট নেমে এলাম। তারপর আলো আর লোকজন নিয়ে জেটির নীচেতে দেখতে লাগলাম। কিন্তু জলের ওপরে বড় বড় কতকগুলো ঢেউ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না। লোক ছুটল পোর্ট-অফিসে খবর দিতে। এর পর হৈ-হৈ কাণ্ড বাধল জায়গাটায়। দলে দলে লোক এসে জড়ো হল। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় জায়গাটা দিনের মত হয়ে উঠল। পুলিসের লোক এল। শেষে ঠিক হল নৌকো নিয়ে সমুদ্রে জাল টেনে দেখতে হবে তারা গেল কোথায়।

প্রায় ঘণ্টা চারেক জেটির কাছেপিঠে খোঁজাখুঁজি করে সবাই হয়রান হয়ে উঠেছিল। চারজন লোক একটা ছোট লাইফবোট নিয়ে দূরে চলে গেল অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে খোঁজ করতে। আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরও ঘণ্টা দুই পরে তারা ফিরল। লাইফবোট থেকে ধরাধরি করে নামাল ধনরাজ আর সেই ছেলেটার শরীর। একে অপরকে সাপটে ধরে আছে। তাদের মুখে আলো পড়তেই দেখলাম, ছেলেটা কাল্লুড়ী। ধনরাজের দুটো হাত চেপে বসে আছে তার গলায়। কাল্লুড়ীর চোখ দুটো গর্ত থেকে ঠেলে বার হয়ে এসেছে আর ধনরাজের মুখটা দম নেবার জন্যে হাঁ হয়ে আছে। বীভৎস দৃশ্য। সদাশিবন আস্তে আস্তে বললেন, যাক, বাপ-বেটায় শেষটায় বোঝাবুঝি হয়ে গেল। ভালই হল।

আজও আমার এই কাঠের জেটিটার ওপরে এলেই কাল্লুড়ীর কথা মনে হয়। মনে হয় ওই একটা করুণ চাউনি আর গোবেচারা ভাবের মধ্যে কী ভয়ানক সজাগ প্রতিহিংসালিপ্সা একটা মন লুকিয়ে ছিল। পোর্টের এলাকার বড় গেটটা পার হয়ে বাইরে এলেই বাঁ দিকে চোখে পড়ে সেই মেয়ে ভিখিরীটাকে। শরীরের ওপরের অংশ আদুড় করে আঁচল বিছিয়ে বসে থাকে। পয়সা চায় না, কিচ্ছু চায় না। শুধু বসে বসে শ্বাস টানে। তার বুকের চামড়ায় ঢাকা পাঁজরকটা কাঠের জেটির পুরনো পাটাগুলোর মত নড়াচড়া করে। দারুণ রোদে সব যেন জ্বলে যেতে থাকে। আকাশ জ্বলতে থাকে, মাটি জ্বলতে থাকে, বাতাসে হলহল করে অদৃশ্য আগুনের হল্কা বয়। তখন পথে একটি লোকও থাকে না। সেই সময়ে সেই নির্জন শ্মশানে একলা সেই মেয়েটি বসে বসে শ্বাস টানে আর তার বুকের খাঁচাখানা ওঠা-নামা করতে থাকে হাপরের মত। সেই ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় কাল্লুড়ীর মুখটাও ওঠা-নামা করে ওই বুকটার মধ্যে।

—

দ্বিতীয় খণ্ড : কাব্যভাষ্য

॥ প্রেমচেতনা ॥

কঠোর ব্রত সাধনা স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে; পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্‌ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাহিবেন,

> পিরীতি নগরে বসতি করিব,
> পিরীতে বাঁধিব ঘর,
> পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
> তা বিনু সকলি পর।

[চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, ফাল্গুন ১২৮৮

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে প্রেমচিন্তা ॥

১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুলে' কবি চোদ্দ বৎসর বয়সে প্রেমের মন্দিরে এক ষোড়শী প্রতিমা রচনা করেছিলেন। বনবালা কমলা। হিমালয়ের অরণ্যশিখর থেকে এই পিতৃমাতৃহীনা বনবালিকাকে বিজয় মানুষের সংসারের তীরে নিয়ে এসেছিল। কমলা একাধারে রবীন্দ্রনাথের মিরাণ্ডা, শকুন্তলা ও কপালকুণ্ডলা। বিজয় তাকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু বিজয়ের বন্ধু কবি নীরদ ভালবাসল কমলাকে। কমলাও ভালবাসল নীরদকে। অবশ্য উভয়তই সে ভালবাসা নীরব। কিন্তু সেই অপরাধে বিজয় বন্ধুকে চিরদিনের মত তার গৃহত্যাগ করে চলে যেতে বলল। বন্ধুকর্তৃক তিরস্কৃত নীরদ যখন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প নিয়ে কমলার কাছে শেষ-বিদায় নিচ্ছে তখন কমলা দলিতা ফণিনীর মত উদ্যতফণা হয়ে বলছে, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে নিষ্ঠুর বিজয় তোমাকে দূর করে দিয়েছে। এ প্রেম এ হৃদয় আমি বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জন দেব। কিন্তু তবু কি বিজয় আমার ভালবাসা পাবে?—

> পদতলে পড়ি মোর দেহ কর ক্ষয়—
> তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?[১]

তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সের বালকের রচনা এটি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নারীকণ্ঠে উচ্চারিত বলিষ্ঠতম উক্তি কমলার মুখে শোনা গেল। 'বনফুলে'র কাহিনীতে আছে, সন্ন্যাসব্রতধারী নীরদ একটু অগ্রসর হতে না হতেই বিজয়ের প্রতিহিংসাপ্রমত্ত ছোরার গুপ্ত আঘাতে সে নিহত হল। শ্মশানে নীরদের মৃত্যুশিয়রে দাঁড়িয়ে কমলা নিজেকে বলছে 'বিধবা'।—"আজিকে কমলা যে রে হয়েছে বিধবা।" অর্থাৎ, চোদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের মিলনকেই বলছেন বিবাহ। প্রেমহীন সামাজিক দাম্পত্য-বন্ধনকে তিনি স্বীকার করেন নি। বলাই বাহুল্য, এটি নিতান্তই একটি বালকের কল্পনা, কিন্তু কল্পনাটি যে বিস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের যাত্রারম্ভে তাঁর কবিমানসের এই পরিচয়ও কম বিস্ময়কর নয়!

২

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা আজীবন মুক্তত্রিবেণীতে প্রবহমাণ। বস্তু বা বিষয়নিষ্ঠ প্রেম, আত্মনিষ্ঠ প্রেম এবং প্রেমনিষ্ঠ প্রেম। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের ভাষায় বিষয়-রতি [object-love], স্বরতি বা আত্মরতি [Narcissism] এবং স্বতঃরতি [Auto-eroticism]। রবীন্দ্রকবিমানসে মন্দাকিনী ভাগীরথী ও ভোগবতীর মত এই ত্রিপথগা প্রেমপ্রবাহিণীর গতিপথ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। আমাদের আলোচনা মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ও গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গঙ্গোত্রীমুখে স্বর্গ ও মর্তের সংগমস্থলে সে প্রেমের স্বরূপ কি ছিল তা জানবার জন্যে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তার সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, কিন্তু পদ্যবন্ধে নয়, গদ্যবন্ধেই তাঁর প্রথম সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতারচনায় যখন 'কপিবুক যুগের চৌকাঠ' পেরোনো সম্ভব হয় নি তখনকার গদ্যরচনায় কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই সে যুগের গদ্যরচনার মধ্যেই কবিমানসের অস্খলিত পদচারণা পরিলক্ষণীয়।

সতেরো থেকে একুশ বৎসরের মধ্যে কবিচিত্তে প্রেমচেতনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাহন হিসাবে নিম্নলিখিত রচনাগুলি অনুধাবনযোগ্য: 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ' যথাক্রমে ১২৮৫ সালের 'ভারতী'র আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' তাঁর অষ্টাদশ বৎসর বয়সের রচনা। 'অকারণ কষ্ট' বেরোয় ১২৮৭ সালের আশ্বিন মাসের ভারতীতে। 'যথার্থ দোসর' এবং 'গোলাম চোর' যথাক্রমে ১২৮৮ সালের 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ থেকে পরবর্তী [১২৮৯] বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কাব্যসুরভিত নিবন্ধগুলি। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি'র প্রকাশ ১২৮৮ সালের ফাল্গুনে। এই রচনাপঞ্জী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর আদিতে রয়েছে দান্তের আর অন্তিমে চণ্ডীদাসের প্রেম। অর্থাৎ শুধু প্রেম নয়, আদর্শ প্রেমের অনুধ্যানেই অতিবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্ন।

বলাই বাহুল্য, দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম ক্রবাদুর-প্রেমেরই পরাকাষ্ঠা। দান্তের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "ইতালির এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রীচে। বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা; বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা।...

"দান্তে তাঁহার নয় বৎসর হইতেই বিয়াত্রীচেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ—দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতিদূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রীচেকে দেখিতেন; অতিদূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন।...

"ভিটামুওভা কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোন বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন—মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রীচে,

সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই—কেবল বিয়াত্রীচের আরাধনা!"[৭]

বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের এই স্বপ্নোপম প্রেম, এই দেহাতীত মনোবৃত্তিময়ী রতিকে রবীন্দ্রনাথের এত ভাল লেগেছিল তার কারণ এই যে, রবীন্দ্রমানসের কৈশোরানুরাগও ছিল তারই সহোদর। শুধু কৈশোর-লগ্নেই নয়, অপ্রাপণীয় মানসসুন্দরীর জাগর-স্বপ্নেই তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

দান্তের সঙ্গে একই নিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কার নাম করেছেন। তিনি বলেছেন, "দান্তের যেমন বিয়াত্রীচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য অনধিগম্য। দান্তের ন্যায় তিনি দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভাল কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনও যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের বিন্দুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। * * * লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেন না এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসংকোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসংকোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।"[৮]

ইতালীয় রেনেসাঁসের অব্যবহিত পূর্বে খ্রীস্টভক্ত দান্তে 'ডিভাইন কমেডি'তে প্রেমের দিব্য-সংগীত রচনা করে গেছেন, আর ইতালীয় রেনেসাঁসের কবিপুরুষ পেত্রার্কা তাঁর মানসসুন্দরী লরার প্রেমে অভিষিক্ত সনেটরাজিকে উপহার দিয়েছেন নবজন্মোত্তর য়ুরোপকে। পেত্রার্কার সনেট-কলাকৃতির মধ্যে বিধৃত মর্ত্যপ্রেমই আধুনিক য়ুরোপীয় প্রেমমন্দাকিনীর আদি-গঙ্গোত্রী। রবীন্দ্র-মানসে দান্তে ও পেত্রার্কার এই মণিকাঞ্চনযোগে তাঁর প্রেমচেতনা স্বর্গমর্তের রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

জার্মানির মহাকবি গেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল অন্য জগতের। উভয়ের মধ্যে আছে আত্মার আত্মীয়তা; পূর্ণমানবতার ধ্যানে উভয় কবিই সমপ্রাণ। একজন বিদগ্ধ সমালোচকের ভাষায় "Both he and Tagore worship at the shrine of the Universal Man,..."[৬] কিন্তু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে রবীন্দ্রনাথ গেটের প্রেম-চেতনার প্রতি তেমন ভাবে আকৃষ্ট হন নি। দান্তে ও পেত্রার্কার তুলনায় গেটের নিষ্ঠাহীন চলচ্চিত্ততা কিশোর রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। তিনি বলেছেন, "দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আরেক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না।...

"গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপে সজ্জিত আছে, পাখীর পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপরে কিরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন এবং প্রেম-কাহিনী সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎপরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই।"[৫]

গেটে-মানসে বিলসিত প্রেমচেতনা সম্পর্কে কবি-কিশোর এখানে সুবিচার করেছেন বলে মনে হয় না। 'ব্রাদার্স কারামাঝভে' ডস্টয়েভস্কি বলেছিলেন, "Beauty is the battlefield where God and the Devil contend with one another for the heart of man."[৬] গেটের মানসলোকে দেবতা ও শয়তানের এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। শেলিকে বলা হয় 'আধুনিক প্রমিথিউস', গেটেকেও বলা যেতে পারে 'আধুনিক ফাউস্ট'। দুজনেই আজন্ম বিপ্লবী। গেটের ফাউস্টের মত তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব

কম বিস্ময়কর নয়। দেহ-কারাগারে বন্দী মানবাত্মা 'কত ছোট' অথচ 'কত বড়';—মানবজীবনের এই রহস্য শুধু ফাউস্টেরই আবিষ্কার নয়, গেটের ব্যক্তি-জীবনেরও উপলব্ধি। গেটের দৃষ্টিতে মানবজীবনের এই রহস্য বিশ্লেষণ করে একজন সমালোচক বলেছেন :

"Man is a rebel...because, made in the likeness of God, he has godlike potentialities always at war with the confining body.... Man's spirit and intellect have consequently to be curtailed in the match-box standard, except in those few experiences of ecstasy that are possible in a life-time—for some, through a mystical religious illumination; for others, through physical love in its very rare moments of perfect communion. That man should be at once so great and so small is the root of the human tragedy."[৭]

রবীন্দ্রনাথের কিশোর-মানসে দেহ ও আত্মার এই অনিঃশেষ সংগ্রামের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত ছিল। তাই তিনি গেটের বিচিত্র প্রেমের কাহিনীগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। অথবা প্রেমচেতনায় রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই 'দেহের ক্ষুদ্রতা'র দ্বারা উৎপীড়িত হন নি বলেই গেটের মানসলোকে সৌন্দর্য ও প্রেমকে নিয়ে দেবতা ও শয়তানের সংগ্রাম তাঁর কাছে চিরদিনই অজ্ঞাত রয়েছে।

৩

কবিকিশোরের প্রেমচেতনার আলোচনায় "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা কবি-মানসীর প্রথম খণ্ডে ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সংকলন করেছি। প্রেমের ক্ষেত্রে এই দোসরতত্ত্ব প্লেটোর 'ফিড্রাস' শীর্ষক 'ডায়লগে'র এরিস্টোফেনিস-প্রোক্ত দোসরতত্ত্বেরই সহোদর। "যথার্থ দোসর" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।...একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শতক্রোশ ব্যবধানে, এমন কি, জগৎ হইতে জগতান্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হউক বা না হউক, জানাশুনা থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোন দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোন দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য।...দুই একটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে, সেই নির্দিষ্ট হৃদয়।"[৮]

এই 'নির্দিষ্ট হৃদয়', এই 'যথার্থ দোসরে'র সন্ধান মানুষকে করতেই হবে। যতক্ষণ না সেই দোসরের সন্ধান পাওয়া গেছে ততক্ষণ তার সঙ্গে যার কোন বিষয়ে মিল আছে, তার প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই। এই ভাবেই পাত্র থেকে পাত্রান্তরে চলে সেই সন্ধান। অবশেষে একদিন তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কেন না, "এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা।" তাই যথার্থ দোসরের সঙ্গে একদিন মিলন হবেই। আমাদের হৃদয়কে শুধু তার জন্যে প্রস্তুত রাখতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালবাস, তাহার সহিত কথোপকথন কর। তাহাকে বল, হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি, তবে তাহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।"[৯]

যথার্থ দোসরের জন্যে হৃদয়ে সিংহাসন প্রস্তুত করে রাখার রূপকল্পটি বিশদীভূত হয়েছে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র রচনামালায়। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শুরুতেই "মনের বাগান-বাড়ি"তে কবি তাঁর একুশ বৎসর বয়সের প্রেমচেতনাকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই

সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।"[১০]

তরুণ কবির এই কথা তাঁর মানসবিশ্লেষণের সময় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়, হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা চাই। তিনি "মনের বাগান-বাড়ি"র কল্পনাটিকে স্ফুটতর করে বলেছেন, "এমন এক একজনকে আমার চোখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে; তাহার মনের যতটুকু আদর্শ ভাব সেইটুকুই সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে।...আমি তাহার নিকট আদর্শ, সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগানবাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি, সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে।"[১১]

বাস্তব জগতে হয়তো সত্যকার আদর্শ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রেম আদর্শ মানুষকে সৃষ্টি করে। প্রেমের দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথ অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের মত অনুরাগবীক্ষণ বলে একটি নূতন শব্দ রচনা করেছেন। অনুরাগের চোখে দেখার নামই অনুরাগবীক্ষণ। এই অনুরাগবীক্ষণে সামান্যও অসামান্য হয়ে ওঠে। সহজিয়া বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে যেমন রূপের মধ্যেই স্বরূপের আরোপ হয় তেমনি অনুরাগের দৃষ্টিতে বাস্তব আদর্শান্বিত হয়ে দেখা দেয়। এই ভাবেই সংসারে প্রেমের রাজ্যে 'আদর্শ ভাবের চর্চা' হয়ে থাকে। ভালবাসা যে আদর্শ জীবনচর্যারই নামান্তর 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখক তাই প্রতিষ্ঠা করলেন। এইভাবে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে আদর্শ প্রেমের উচ্চগ্রামেই রবীন্দ্রহৃদয়ের সুর বাঁধা হয়েছে। সমকালীন কাব্য-কবিতায় তার প্রতিফলন কতখানি সার্থক হয়েছে এবার তা বিচার করে দেখতে হবে।

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ-১, পৃ° ৯৪।

২ কবিমানসী-১, পৃ° ১০২।

৩ তদেব, পৃ° ১০৩।

৪ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: এ সেন্টিনারি ভল্যুম' গ্রন্থে অধ্যাপক তারকনাথ সেন, পৃ° ২৭৪।

৫ কবিমানসী-১, পৃ° ১০৫।

৬ জ্যাক্ মারিতাঁ লিখিত Creative Intuition in Art and Poetry গ্রন্থে উদ্ধৃত। দ্র° উক্ত গ্রন্থ [মেরিডিয়ান বুকস স°], পৃ° ৩১৪।

৭ A. C. Ward, Landmarks in Western Literature, পৃ° ১৩৭।

৮ কবিমানসী-১, পৃ° ১৮১।

৯ তদেব, পৃ° ১৮২।

১০ তদেব, পৃ° ১৮৪।

১১ তদেব, পৃ° ১৮৫।

[ক্রমশঃ]

জতুগৃহ

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

ঘটনাগুলো একই ভাবে ঘটে গেল। ঠিক একরকম ভাবে। ইতিহাসেও এমন পুনরাবৃত্তি হয় না। চার বছর আগেকার দিনগুলো যেন নির্মোক পালটে একই সাজ নিয়ে ফিরে এসেছে। পাটনা থেকে ইন্দিরাদি, ধানবাদ থেকে রেণুমাসি এবারেও এসেছেন। তবে আজকের দিনগুলোর সঙ্গে আগেকার দিনগুলোর একটু তফাত আছে। সেদিন ছিল বিজয়া সৈন্যদলের বিজয়োল্লাস, আর আজ শুধু গুপ্তচরের ফিসফিসানি।

সেদিনও শোভনের বিয়েতে সবাই এসেছিল। এবারেও সবাই এসেছে। যে ভবেশমামা সেদিন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে বাড়িময় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন আজ তিনি নির্বাক দর্শকমাত্র। একেবারে নিষ্প্রাণ। কোথায় যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন সকাল থেকে। বরযাত্রার আগে শুধু একবার বলেছিলেন, শুভ, জুতোজোড়াটা একটু বেমানান হল না ;—তারপর হয়তো নিজের অতীত জীবনের একটা নজির টানতে গিয়েছিলেন কিন্তু শোভনের সংযত গাম্ভীর্য দেখে থেমে গেলেন, নিজের অজ্ঞাতে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, না, ওতেই হবে।

বউভাতের উৎসব-শেষেও আজ রাতে এ বাড়িতে কোন সোরগোল নেই। একটা অদ্ভুত নিশ্চলতা চারদিকে। সব নিস্তব্ধ।

খাটে বসে শোভন ভাবছিল এমনি একটি দিনের কথা। ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে দিল টেবিলটার পাশে, আলনায়। একটা নেটের গেঞ্জি গায়ে। শান্তিপুরী ধুতির কোঁচার অনেকটা অংশ কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃদু পা দোলাতে লাগল। একটা সিগারেট ধরাল। শোভন ভাবতে লাগল চার বছর আগের এমনি একটা দিনের কথা—করবীর কথা। সেদিনও এমনি সারা ঘরে ফুলের বন্যা এসেছিল। চারদিকে রাশিরাশি ফুল, আজকের তুলনায় তার আয়োজন অনেক বড় ছিল। ইন্দিরাদি অনেক রাত পর্যন্ত ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছিল, ভবেশমামা ওদের নেতৃত্ব করেছিল। আজ সন্ধ্যে হতে না হতেই কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। চারদিকে শুধু একটা ফিসফিসানি। কাল সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে তারই একটা চাপা আয়োজন, নিঃশব্দ প্রস্তুতি।

সেদিন ছিল করবী। ভীরু সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছিল। শোভন দেখেছিল করবীকে। ভরা ভরা দেহ, আঁটসাঁট গড়ন। একটা চাঁপা হলুদ রঙের শাড়ি ছিল পরনে। ইন্দিরাদি শাড়িটাকে বেছে দিয়েছিলেন, করবীকে সাজিয়ে শোভনের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন, বলেছিলেন, নাও গো তোমার চাঁপা ফুল, আজ থেকে আমরা তোমার পর হয়ে গেলুম।

আধ-ফোটা চাঁপার লাবণ্য নিয়ে করবী মাথা নীচু করেছিল। খাটের একপাশে গিয়ে বাজু ধরে দাঁড়িয়েছিল। আলো থেকে চুরি-করা সামান্য একটু আবছা অন্ধকারের মধ্যে যেন নিজেকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেছিল। শোভন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে আলতো ভাবে পা দোলাচ্ছিল। এটা ওর অনেক কালের অভ্যেস।

চাঁপা ফুল! আজ ভাবতে শোভনের আশ্চর্য লাগে। চাঁপা ফুলই বটে! যেন একটা জলন্ত অগ্নিশিখা নিস্তেজ হয়ে চাঁপা রঙের অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিল—সুযোগ পেয়ে জলে উঠল, জালিয়ে দিয়ে গেল শোভনের ঘর বাড়ি সংসারকে। এই চার বছরে কতই না ওলট-পালট হয়ে গেল। বাবা মারা গেলেন। মাও যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। শোভনের বিয়েতে এবার শুধু আশীর্বাদের সময় তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

সেদিন এমনি খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়েছিল করবী। করবীকে সবার পছন্দ হয়েছিল। মা স্বপ্ন দেখেছিলেন লক্ষ্মীর, বাবা সেবার। সেদিনও এমনি ছিল ফুলের সমারোহ, মরসুমী ফুল হাস্নুহানার সুরভি এনে দিয়েছিল। বাদামী রঙের চামড়ার বেল্টের নতুন ঘড়িটা শোভন খুলে

রেখেছিল টেবিলের ওপর। করবীর দিকে চোখ পড়েছিল। একদৃষ্টে কি যেন দেখছিল করবী। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল—একগোছা রজনীগন্ধার কুঁড়ির মত মাথাটাকে নুইয়ে দিয়েছিল করবী। ভাবছিল হয়তো নিজের অতীতের কথা কিংবা শোভনের কথা। এই লোকটাকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে তার কথা, অথবা অন্য কিছু।

বিয়ের পর মাত্র তিন দিন করবী ছিল এ বাড়িতে। গ্রন্থির বাঁধন শোভনের হাত থেকে খোলবার আগেই করবী শোভনের বাঁধন খুলে চলে গিয়েছিল। সে বাঁধন আর জোড়া লাগে নি। বাবা লাগতে দেন নি।

বউভাতের পরদিনই রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে শাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল করবী। এত লোকের সোরগোল নজর এড়িয়ে কি করে সময়মত কাজটা করেছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। প্রথমে আকস্মিক বিপদ ভেবে বাড়ির লোকেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বন্ধ দরজা দেখে সবাই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। উপায়হীন হয়ে জ্যোতিকাকা দরজা ভেঙে ফেলেছিলেন। শুকনো কাপড়ের আগুন বেশী ক্ষতি করতে পারে নি, শুধু মুখে গায়ে পিঠে কয়েকটা জলন্ত স্বাক্ষর রেখে আত্মগোপন করেছিল। বাড়ির সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কারও মুখে কোন কথা সরে নি। অপমানে লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিকাকা শুধু বলেছিলেন, এ কী করলে বউমা, আমাদের একমাত্র ছেলের বউ তুমি, এ তুমি কী করলে?

ছোবলমারা সাপের মত উদ্ধত গ্রীবা, কপালে গালে কালো পলায়িত আগুনের দাগ নিয়ে করবী বলেছিল, আমাকে আপনারা মরতে দিন।

কেন?

আমার অমতে এ বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সে তুমি বিয়ের আগে তোমার বাবাকে বললেই পারতে।

বলেছিলাম, বাবা শোনেন নি।

কিন্তু এ বাড়ির লোকের মুখে কলঙ্ক দেবার কোন অধিকার তোমার আর তোমার বাবার নেই, জেনে রেখ। জানি, এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

জ্যোতিকাকা রাগটাকে সামলে নিয়েছিলেন, আরও কিছু বলবার আগে বাড়ির মেয়েরা করবীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেবা-শুশ্রূষার জন্য। বাবার মুখটা নীচু হয়ে গিয়েছিল, কোন কথা বলতে পারেন নি। ফৌজদারী কোর্টের উকিল ছিলেন তিনি—নামকরা। এর পরিণাম কী জানতেন। একটা বিশ্রী অপমানের লজ্জায় বাইরে চলে গিয়েছিলেন। থানা পুলিস হল না। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিসে ছুঁলে আটান্ন। দুর্ঘটনার মোড়কে ঘটনাকে চাপা দেওয়া হল। এর মধ্যে বাড়ির সম্মান অনেকখানি নির্ভর করছিল।

করবীর বাবাকে খবর দেওয়া হল। বিকেলে এসে তিনি করবীকে নিয়ে গেলেন। বাবা তাঁকে কতকগুলো রূঢ় কথা বলেছিলেন, শোভন বাইরে থেকে সব শুনেছিল। অনেকদিন পরে বাবাকে রাগতে দেখেছিল শোভন। করবীর বাবা করবীকে নিয়ে চলে গেলেন।

জানাজানি হয়ে গেল ব্যাপারটা চারিদিকে। বাবা নামকরা উকিল ছিলেন, নামটা খারাপ হয়ে গেল। তারপর প্রায় দিনই বাবা কোর্টে যেতেন না। বাইরের ইজিচেয়ারটায় বসে বসে কী যেন ভাবতেন। শেষের দিকে বাবা যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ খুব বুড়ো হয়ে গেলেন যেন। করবীর বাবাকেও একটা চিঠি দিয়েছিলেন—করবী নিজে এসে তার দোষ স্বীকার করে গেলে তাকে গ্রহণ করবার স্বীকৃতি। সে চিঠির কোন জবাব আসে নি।

বাবা মরে যাবার পর করবীকে নিয়ে অনেকেই অনেক মনগড়া কাহিনী বিবৃত করল। কিন্তু এতে শোভনদের সংসারে কারও মনে কিছু রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয় না। বাবা মরে যাবার পর শোভন বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। সকালে খেয়েদেয়ে অফিস চলে যেত। রাতে এসে সকালের খবরের কাগজের পাতা ওলটানো নয় বা ইংরেজী উপন্যাস পড়ত। জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে গেল। মাও যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকতেন সব সময়। মাসির ওখানে ঘুরে এলেন ধানবাদে, তবু তার জের টিকল না। অর্জিত মানসিক স্ফূর্তিটা আবার সেই একঘেঁয়েমির অন্ধকারে মিশে গেল।

জ্যোতিকাকা মাঝে মাঝে এসে কথা কইতেন। বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে মা আর পিসিমা। জ্যোতিকাকা বিয়ে করেন নি। জ্যোতিকাকা একদিন মার সামনেই কথাটাকে পাড়লেন। শোভন ঘরে বসে অফিসের অসমাপ্ত কাজের জের টানছিল। জ্যোতিকাকা সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন। এর আগে হয়তো মার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছিল। জ্যোতিকাকা বললেন, আমরা আবার তোমার বিয়ে দিতে চাই শুভ।

কেন, বিয়ে তো আপনারা দিয়েছিলেন।—কাজের ফাঁকে শোভন উত্তর দিল।

জ্যোতিকাকা বললেন, যার সঙ্গে তুমি ঘর করলে না, যাকে চিনলে না, তার সঙ্গে কি বিয়ে বলে? শুধু অনুষ্ঠানটাকে তুমি বিয়ে বলতে চাও?

শোভন বলল, আবার নতুন করে অপমানিত হতে চান?

জ্যোতিকাকা বললেন, সব মেয়েই যে করবী তা তুমি কি করে জানলে?

শোভন বলল, আমার পক্ষে এ আর সম্ভব নয়।

জ্যোতিকাকা বললেন, কিন্তু দাদার প্রতি তোমার একটা দায়িত্ব রয়েছে, তাঁর একমাত্র ছেলে তুমি, তাঁর লাইনেজ তোমাকেই রাখতে হবে।

কথাটা বেশীদূর এগোল না, কাজটা অনেক দূর এগিয়ে গেল। পিসিমা, মা, জ্যোতিকাকা শোভনকে অনেক করে বোঝালেন। জ্যোতিকাকা শোভনকে দিয়ে ডিভোর্সের স্থট করালেন আদালতে। বিশেষ অসুবিধে হল না। বাবার কয়েকজন বন্ধু ছিলেন তাঁরাই সব ঠিক করে দিলেন। তারপর আদালত শোভনকে বিয়ে করবার ছাড়পত্র দিল।

তারপর…

তারপর সেই পাটনা থেকে ইন্দিরাদি, ধানবাদ থেকে রেণুমাসি এবারেও এলেন। ভবেশমামাও এলেন। সবাই এলেন। সবাই যেন কেমন একটা গাম্ভীর্য নিয়ে এলেন।

বউভাতের আয়োজন মিটে গেছে। শোভন খাটে বসে পা দোলাতে লাগল। চশমাটা খুলে পরিষ্কার করে নিয়ে আবার পরল। একটা সিগারেট ধরাল। খাটের একপাশে বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে লতা। পরনে লাল শাড়ি। চোখের পাতায় ভীরু চাউনি। অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তা চোখেমুখে জড়ানো। রোগা ছিপছিপে গড়ন, নতুন বাঁশের মত পেলব। সিগারেটটা শেষ করল শোভন। শোভনের মনে হল লতা যেন তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে চোরা অন্ধকারে আশ্রয় খুঁজছে—যেমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল করবী খাটের একপ্রান্তে বাজু ধরে। মনে হল, যে অগ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল চাঁপা শাড়ির অন্তরালে তাই যেন আজ লেলিহান হয়ে এসেছে লাল শাড়ির ছদ্মবেশে। তিনদিন ছিল করবী, লতার মেয়াদ হয়তো আরও কম। আজ রাতেই লতা শোভনকে তার মনের কথা জানিয়ে কাল সকালেই হয়তো বিদায় চাইবে। চশমার কাঁচটা যেন ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে ওঠে। হয়তো শোভন কাল সকালেই দেখবে মুখে-চোখে বিষের কালিমা মেখে বাসী খোঁপাটাকে কোলের মধ্যে বুকের কাছে নিয়ে অকাতরে ঘুমুবে লতা। নতুন বাঁশের মত পেলব নির্মোকটা পড়ে থাকবে খাটের এক প্রান্তে। শোভনের মনে হল যেন কোন বিশ্বছলনাময়ী নারীর ছদ্মবেশ ধরে তাকে বারেবারে পরীক্ষা করতে আসছে। বিদ্রূপ করে যাচ্ছে বারেবারে। কিন্তু এসব সহ্য করবে না সে। মেনে নিতে পারবে না ছলনাময়ীর অনুশাসন। হঠাৎ যেন আদিম পৌরুষ দৃপ্তকণ্ঠে বেরুতে চায়। মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের পরশ। মনে হয় যেন বলে ওঠে, ওভাবে ছাড়া কি তোমরা দাঁড়াতে পার না? আলোর কাছে এসে দাঁড়াও—ঠিক সামনাসামনি যেমন করে দাঁড়িয়েছিল গুহামানবী মানবের সম্মুখে। সমস্ত মনটাকে বিদ্রোহ করে একরাশ কথা বুক থেকে বেরিয়ে গলায় আটকে যায়। ভয়ানক অস্থির লাগছে শরীরটা। যেন একটা অগস্ত্য পিপাসায় সারা দেহ শুকিয়ে আসছে, একটা তেজময় বিষ ক্রিয়া করে চলেছে সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায়, ধমনীতে। সমস্ত প্রাণ মন মরুভূমির উত্তাপ নিয়ে তৃষিত হয়ে ওঠে। তবু যেন আত্মসমর্পিত পরাজিত সেনানীর অধ্যক্ষের মত নিস্তেজ হয়ে পড়ে; বলে ওঠে, জলের গ্লাসটা দাও, বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, অস্থির লাগছে বড়।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্নীতি শব্দটি আজকাল দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে থাকলেও সংক্ষেপে এককথায় দুর্নীতির ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। লৌকিক অর্থে মনে হবে যে সজ্ঞানে অন্যায়ের অনুষ্ঠান বা তার প্রশ্রয় দেওয়াই দুর্নীতি। কিন্তু অন্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গেলেই আবার সেই একই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। দেশকালপাত্র অনুসারে অন্যান্য ক্ষেত্রের মূল্যবোধের সঙ্গে অন্যায়ের সংজ্ঞার্থও পরিবর্তিত হয়। বৈবাহিক ক্ষেত্রের উদাহরণ গ্রাহ্য হলে বলা চলে যে এই ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যেই কোথাও কোথাও ভাগ্নীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া পরম কৌলীন্য বিবেচিত হলেও অন্য অনেক জায়গায় তা আবার দুর্নীতি। উত্তর-ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে এখনও মহাভারতের যুগের মত সতীর পঞ্চ পতির প্রথা থাকলেও অধিকাংশ ভারতীয় নরনারীর কাছে এ প্রথা দুর্নীতিমূলক। মার্কসবাদের অনুসারী কোন কোন রাজনৈতিক দর্শনে শাশ্বত সত্য বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং মানুষের আচরণকে সেই শাশ্বত সত্যের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দুর্নীতি বা সুনীতির আখ্যা দেবার উপায় এখন আর নেই। ন্যায়-অন্যায়বোধও এখন রিলেটিভ বা সাপেক্ষ। ভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধের জন্য দুগ্ধপানেচ্ছু মার্জার কমলাকান্তের চক্ষে চোর প্রতীয়মান হলেও বিড়াল সে কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং বর্তমান ভারতবর্ষে দুর্নীতির প্রাচুর্য আছে মেনে নিলেও দেখা যাচ্ছে যে শাস্ত্রীয় ভাষা বা পদ্ধতিতে দুর্নীতির ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি প্রাথমিক ধারণা না থাকলে চলবে না। সুতরাং দুর্নীতির শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বা সংজ্ঞার্থের পিছনে না পড়ে বর্তমানে আমরা প্রাকৃত জনের বিচারে যাকে দুর্নীতি মনে হয়, তার কথাই আলোচনা করব।

এর সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা-বৃত্তের পরিধিও সীমিত করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ ব্রহ্মের মত দুর্নীতি এমনই সর্বব্যাপী যে কোথায় এর আদি ও কোথায় অন্ত তা স্থির করা যায় না। ধর্মের দুর্নীতি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যুগ যুগ ধরে সত্য বা কাল্পনিক ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে যে কায়েমী স্বার্থ বাসা বেঁধেছে এবং মঠে মসজিদে ও গির্জায় পরম সুখে বিরাজিত হয়ে যাঁরা মেহনতি মানুষের ক্ষুধার অন্নে ভাগ বসিয়ে তাদের বুদ্ধিভ্রংশ করে আসছেন, তাঁদের কথা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি না। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে যে নির্বিচার স্বজনতোষণ ও অপর দলের সাহিত্যিকদের নস্যাৎ করার প্রথা আরম্ভ হয়েছে অথবা ছোটগল্পের কাহিনীকে অনাবশ্যকভাবে (সাহিত্য-দৃষ্টিতে অনাবশ্যক, আর্থিক দৃষ্টিতে পরমাবশ্যক) ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ও প্রতিটি বাক্যকে একটি স্বতন্ত্র প্যারাগ্রাফ-রূপে ছেপে স্থূলকায় উপন্যাসের রূপ দিয়ে ক্রেতা বধ করার যে বেনিয়াবৃত্তি আজ পরিদৃশ্যমান, সে সবও আমরা বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি না। অথবা যৌন বিকার, বিকৃতি ও তৎসঞ্জাত দুর্নীতিও বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়। সামাজিক দুর্নীতির—তাও এক সঙ্কুচিত অর্থে সামাজিক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, স্বরূপ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। ঘুষ, চোরাকারবার, ভেজাল ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত এবং সুস্থ নাগরিক জীবনের পরিপন্থী দুর্নীতিসমূহই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতের জনজীবনে যে দুর্নীতিরূপী দৈত্যটির ব্যাপক অস্তিত্ব আছে, এ কথা কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত দেশশাসনের ভারপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ উটপাখির মত বালিতে মুখ গুঁজে অস্বীকার করতেন। তবে কিছুদিন হল তাঁরা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন যে দুর্নীতির অস্তিত্ব কেবল বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় নেই, ভারতের সাধারণ নাগরিক এর পীড়নে পর্যুদস্ত। এ বিষয়ে বোধ হয়

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখই সবচেয়ে বেশী সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দল বা মান্যগণ্য ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হবার আশঙ্কার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই তিনি শাসনযন্ত্রের উচ্চস্তরের দুর্নীতির প্রত্যক্ষ নিদর্শনের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথার্থ রাষ্ট্রসেবকের কর্তব্য পালন করেছেন। বছর আড়াই পূর্বে মাদ্রাজে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে যেসব দুর্নীতি আছে, তার কারণ ভারত সরকার কর্তৃক উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয়িত অর্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বরবাদ হচ্ছে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে লোকসভায় পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটীর যে রিপোর্ট পেশ করা হয়, তাতেও বহুবিধ চাঞ্চল্যকর অপব্যয় এবং "অ্যাভয়ডেবল লসে"র দৃষ্টান্ত থাকে। কিন্তু পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটীর পক্ষে সরকারের যাবতীয় ব্যয়ের কতটুকু অংশেরই বা ময়না-তদন্ত করা সম্ভব হয়! এ ছাড়া রয়েছে প্রাদেশিক সরকার এবং বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত করপোরেশন ইত্যাদির অপব্যয়। সুতরাং শ্রীযুক্ত দেশমুখের অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। সৌভাগ্যের কথা, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়করা তাঁর কথা একেবারে নস্যাৎ করে দিতে সাহস করেন নি। ভারতের রাষ্ট্রপতি কিছুদিন পূর্বে এ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী শাসনযন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য তৎপর হচ্ছেন—এই মর্মে মাঝে মাঝে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া শাসকদল অর্থাৎ কংগ্রেসও নিজ সদস্যদের দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কিছুদিন হল একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট কমিটী গঠন করেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও দেশে দুর্নীতি নিবারণের ব্যাপক প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে—এর সপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণ মানুষ এখনও পায় নি। তাদের এখনও পদে পদে ঘুষ চোরাবাজারী ও ভেজাল ইত্যাদির সঙ্গে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপোস করে জীবনধারণ করতে হচ্ছে।

দুই

ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দুর্নীতির অস্তিত্ব আছে, এ কথা ধরে নিয়ে এবার আমরা এগোতে পারি। কোনদিনই বোধ হয় কোন সমাজ থেকে দুর্নীতিকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করা যাবে না বা যায়ও নি। স্বজনপোষণ বা অন্যবিধ দুর্নীতি সেই পৌরাণিক যুগেও ছিল। বর্তমান পৃথিবীতে কেবল ভারতবর্ষেই যে প্রশাসনিক দুর্নীতির প্রবল প্লাবন—তা নয়। প্রতিবেশী পাকিস্তানে তিন বৎসর পূর্বে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষপুটের আশ্রয়ে যেসব বিরাট দুর্নীতিচক্র চলত, তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। ওয়াকিবহাল মহলের কাছ থেকে জানা যায় যে দুর্নীতির ব্যাপারে তুরস্ক রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে প্রথম স্থান দাবি করতে পারে। ব্রহ্মদেশে প্রায় চার বৎসর পূর্বে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শাসনযন্ত্রের দুর্নীতির প্রকোপের কারণে প্রায় সর্ববিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। কারণ তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে উন্নয়ন-খাতে সরকার যত ব্যয় করছেন তার এক ভগ্নাংশও জনসাধারণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। তাই প্রথমের কাজ প্রথমে করার জন্য তাঁরা শাসনযন্ত্রের সংস্কারের কাজে হাত দেন। ব্রহ্মদেশকে সাময়িকভাবে সৈনিক-শাসনের হাতে তুলে দেবার পিছনে কেবল রাজনৈতিক দলাদলিই নয়, প্রশাসনিক দুর্নীতিও একটা বড় কারণস্বরূপ ক্রিয়াশীল ছিল। কেবল এশিয়াই এই দোষে দোষী নয়, দুর্নীতিতে ইটালিও কারও চেয়ে কম যায় না।

কেবল অভাবেই যদি স্বভাব নষ্ট হত, তবে আমেরিকার সমাজ-জীবনে দুর্নীতি থাকত না। কিন্তু আমেরিকার রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন 'প্রেসার গ্রুপে'র অস্তিত্বের কথা সরকারীভাবে স্বীকৃত। এই প্রেসার গ্রুপের প্রভাবের একটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। সংবাদপত্রের পাঠকদের হয়তো মনে পড়বে যে বছর ছয়েক পূর্বে সিংহলের তদানীন্তন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আমেরিকার একটি সিনেট কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে নিজ পদে নিযুক্ত হবার পূর্বে তিনি পৃথিবীর মানচিত্রে সিংহলের অস্তিত্ব যে কোথায় তাই জানতেন না। তবে কোন্ যোগ্যতায় তিনি রাষ্ট্রদূতের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে আমেরিকার

তদানীন্তন শাসকদলের প্রেসার গ্রুপের ধনভাণ্ডারে একটা মোটা রকম চাঁদা দেবার ফলেই এই অসাধ্য সাধন হয়। যাবতীয় দুঃখদুর্দশার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদ এবং একবার যেনতেনপ্রকারেণ সমাজবাদ কায়েম হলেই সব দুর্নীতির অবসান হয়ে প্রায় রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বিশ্বাস করতে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের কাছে খোদ রাশিয়া বা চীনের দুর্নীতির উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। 'দি গড ছাট ফেলড'-এর লেখকবৃন্দ অথবা সাম্প্রতিক কালের মিলোভান জিলাস্ (দি নিউ ক্লাস) কিংবা হাওয়ার্ড ফাস্টের (দি নেকেড গড) জবানবন্দীর কথা বলে লাভ নেই। কারণ একদা সাম্যবাদীদের হিরো ওই সব লেখক আজ গোঁড়া কমিউনিস্টদের কাছে 'রেনিগেড' বা দলত্যাগী বিধায়ে অন্ত্যজ। কিন্তু সংবাদপত্রের পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে বছরে অন্ততঃ দু-চার বার আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলিতে এই খবর প্রকাশিত হয় যে রাশিয়া ও চীনের সরকারী কর্তৃপক্ষ দুর্নীতির দায়ে নিজ নিজ দেশের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিদের পদচ্যুত বা চিরদিনের জন্য নীরব করে দিচ্ছেন। এই মাস কয়েক পূর্বে ফাটকাবাজী করার অপরাধে রুশ সরকার যে দুটি যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, সে ঘটনা তো দুর্নীতির একেবারে সাম্প্রতিক নজির। এ সব খবরের সূত্র টাস অথবা নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি বলে নৈষ্ঠিক কমিউনিস্টরাও এর সত্যতা উড়িয়ে দিতে পারবেন না। এর পরও যদি কারও মনে সন্দেহ থাকে তবে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য পার্টির কাছে প্রস্তাব পেশ করার সময় ক্রুশ্চেভ যে বক্তৃতা দেন, তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সোবিয়েৎ সরকারের ভারতস্থ দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত পূর্বোক্ত বক্তৃতাটির অনুলিপি পাঠে জানা যায় যে রাশিয়াতেও দুর্নীতির সবিশেষ অস্তিত্ব আছে। স্বয়ং ক্রুশ্চেভ সক্ষোভে বলছেন যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী কলেজগুলিতে ভরতি হতে পারে না। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অযোগ্য সন্তানরা মুরুব্বী ও অর্থের জোরে সে সুবিধা পাচ্ছে। স্কুল-কলেজে ভরতি হবার ব্যাপারে যে দেশে আমাদেরই মত 'চাঁদা' ইত্যাদি নেওয়ার রেওয়াজ, সেখানকার আমলাতন্ত্র অন্য বিভাগে এবং বিশেষতঃ যেখানে দু-চার পয়সার সম্বন্ধ আছে, ধোয়া তুলসীপাতার মত আচরণ করবেন এ নিশ্চয় অতি বড় কমিউনিস্টও স্বীকার করবেন না।

মানুষ কেন দুর্নীতির শরণ নেয় বা কিসের জন্য দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়, কারণ এর জবাব একটি মাত্র নয়। দুর্নীতির একটি মূল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে অর্থশাস্ত্রের এক পুরাতন সূত্র demand and supply অর্থাৎ সরবরাহ ও চাহিদার সামঞ্জস্যের অভাবের ভিতর। একটি মাত্র খালি পদের জন্য যদি একাধিক মোটামুটি সমান যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের দরখাস্ত পড়ে তবে দরখাস্তকারীরা সবাই পেটের দায়ে নিয়োগকর্তাকে প্রভাবিত করতে চাইবে। এ পৃথিবীতে জর্জ ওয়াশিংটনের মত মহাপুরুষ অল্পই পাওয়া যাবে যাঁরা সমান যোগ্যতাসম্পন্ন দুজন প্রার্থীর ভিতর থেকে বন্ধুকে নিয়োগ না করে এইজন্য বিরোধীকে নিয়োগ করেন যে তা না হলে জনজীবনে এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। সবারই বেবিফুডের প্রয়োজন, অথচ বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান কম। এ অবস্থায় দোকানদারও যথাসম্ভব অধিক দাম আদায় করতে প্রলুব্ধ হবে এবং গ্রাহকও পারলে একটু বেশি দাম দিয়েও নিজের ভাগ সুরক্ষিত করতে চাইবেন। সরবরাহ ও চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করা বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশের সম্মুখেই এক জীবনমরণের প্রশ্ন। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সমাজ-জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য রকমের বিরাট ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি দূর করা যাবে না।

একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর ও তৎপরবর্তীকালের ঠিকাদারী পারমিট ও লাইসেন্স ইত্যাদি এবং অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রয়শক্তির ক্রমাপহ্নব ভারতীয় সমাজজীবনে দুর্নীতির প্রসারের পক্ষে একটা বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশবিভাগরূপী রাষ্ট্রবিপ্লব। এর পরিণামে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল কেন্দ্রাতিগ শক্তির দ্যোতক উদ্বাস্তু যদৃচ্ছ সঞ্চরণ করছে। এদের সমাজ ভেঙে গেছে, ফলে সামাজিক সংহতির বন্ধনও শিথিল। যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজদেহে দূষিত ক্ষত সৃষ্টি করার এক অদ্বিতীয় আয়ুধ।

এবার সমস্যাটির নৈতিক দিকের কথা আসে। কেবল অভাবেই যে স্বভাব নষ্ট হয় না, এ কথা জাতির মত ব্যক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য। ওষুধ অথবা চাল-কেরোসিনের মত অপরিহার্য জিনিসের অভাবের কারণে ওই সব জিনিস চোরাবাজারে কেনার অর্থ হয়তো বোঝা যায়। কিন্তু সিনেমা বা ফুটবল খেলার টিকিটের চোরাকারবার হয় কেন? টিকিট-বিক্রেতারা যদি পেশা হিসাবেও ওই কাজ করেন তবু প্রমোদাভিলাষী দর্শকদের চোরাবাজারে টিকিট কেনা কোনমতে সমর্থন করা যায় কি? এ হচ্ছে আমাদের নৈতিক অধোগতির নমুনা।

এ শতাব্দীর উপাস্য জড়বাদ-আশ্রিত ভোগবাদী জীবনদর্শন দুর্নীতির এক অন্যতম কারণ। একদিকে ভোগবাদী জীবনদর্শন ও অন্যদিকে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের উন্নতির কারণ উপভোগ্য উপকরণের প্রাচুর্য মানুষকে অতৃপ্ত আশার মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবনকারীতে পর্যবসিত করেছে। জীবনমান উন্নত করার মোহে ক্রমাগত আর্থিক পরিমাণে বিবিধ রকমের ভৌতিক পণ্য পাবার জন্য আমরা লালায়িত হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি যে মানুষের পক্ষে সৎভাবে পরিশ্রম করে কোনক্রমে হয়তো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করা যায়, কিন্তু অমিত ভোগ্যোপকরণ সংগ্রহ করা যায় না। তা যদি যেত তাহলে সমাজতান্ত্রিকনির্বিশেষে (কুড়ি বৎসর পর বিনামূল্যে রুটি দেবার সাম্প্রতিক ইউটোপিয়ার ঘোষণা সত্ত্বেও এ কথা বলতে হবে) প্রতিটি দেশের সম্পদ উৎপাদনকারী কৃষক ও মজুররা খেয়ে না-খেয়ে কোনমতে টিকে থাকতে বাধ্য হত না। সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী যে কোন রকমের শাসনব্যবস্থার আওতাভুক্ত দেশই হোক না কেন, সে দেশে যারা যদৃচ্ছ ঐহিক ভোগ-বিলাসের সুযোগ পাচ্ছে, তারা চাষী মজুর নয়—চাষী মজুরদের শ্রমে পুষ্ট মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ যন্ত্রবিদ্, রাজনৈতিক নেতা অথবা পুঁজিনিয়োগকারী। ইংলণ্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ এবং এদিকে জাপানের আপাতসমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকা অথবা ওই জাতীয় কোন না কোন দেশের ঔদ্যোগিক (industrial) অনগ্রসরতা ও তজ্জনিত অসহায়তার ফলে শোষণ। আধুনিক যুগের এই প্রচণ্ড কুসংস্কার 'প্রগতি'র সম্মোহনপাশ মুক্ত হতে না পারলে অনায়াসে বা বিনা প্রয়াসে প্রচুর ভোগ্যোপকরণ পাবার মরীচিকার টানে মানুষ সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবেকবোধ বিসর্জন দিয়ে যে কোন উপায়ে লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য দুর্নীতির শরণ নেবেই। কারণ চোখের সামনে কিছুসংখ্যক লোককে ভোগবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে দেখার পর এবং জড়বাদী দর্শন ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতিনিয়ত কানের কাছে আরও বেশি উপকরণ প্রাপ্তিই একমাত্র মোক্ষ বলে শোনার পর কতক্ষণ সাধারণ মানুষ মস্তিষ্ক স্থির রেখে চলতে পারে?

একটু বিস্ময়কর শোনালেও এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রসারের এক বিশিষ্ট কারণ বলে পরিগণিত হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনাবিহীন দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে জন-প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। বিধানসভার জন্য মোটামুটি এক লক্ষ জনসংখ্যা-বিশিষ্ট এলাকা এবং লোকসভার জন্য দশ লক্ষ জনসংখ্যার ভিতর প্রার্থীদের প্রচার ও সংগঠন করতে হয়। এ ব্যাপার বহু ব্যয়সাধ্য এবং ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কবিশিষ্ট সবাই জানেন যে সরকার নির্বাচনের যে উচ্চতম ব্যয়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন কোন প্রার্থীই তা মানেন না এবং প্রায় সবাই মিথ্যা হিসাব দাখিল করেন। গড়পড়তা হিসাবে বলা যায় যে বিধানসভার সদস্যপদপ্রার্থী হলে যে কোন সিরিয়াস প্রার্থীকে কমপক্ষে পনেরো হাজার টাকা এবং লোকসভার সদস্যপদপ্রার্থী হলে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। সব কটি রাজনৈতিক দল পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এইভাবে যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, তার কটি পয়সা জনসাধারণ দেয়? জনসাধারণ দেবেই বা কেন আর ইচ্ছা থাকলেও তাদের সে সঙ্গতি আছে কি? সুতরাং এ অর্থের অধিকাংশই সরবরাহ করেন ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী ও ধনিক সম্প্রদায়। তাঁরা যে সবাই স্বেচ্ছায় এ অর্থ দেন তা নয়। অনেক সময় চাপে পড়ে দেন। ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থ পরোপকারবৃত্তি চালিত হয়ে এভাবে দান করেন না। কোন রাজনৈতিক দলকে পাঁচ হাজার টাকা 'চাঁদা' দিলে অনেক পাঁচ হাজার পরে ওই

রাজনৈতিক দলের সহায়তায় রোজগার করে নেন। লাইসেন্স পারমিটের অনেক গণ্ডগোল, বিক্রয়কর আয়কর ইত্যাদির অনেক গোপন রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ব্যবসায়ীদের এই 'চাঁদা'র ভিতর। বছর তিনেক পূর্বে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাজনৈতিক দলের তহবিলে চাঁদা দেওয়া সম্বন্ধে বোম্বাই হাইকোর্টের বিরূপ মন্তব্য এবং কোম্পানি আইনের সংশোধন সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট, বিশেষ করে অধিকাংশের সঙ্গে যে দুজন সদস্যের মত মেলে নি, তাঁদের মন্তব্য পূর্বোক্ত অভিমতের সমর্থনে নজির হিসাবে দাখিল করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে কেবল শাসকদলই নয়, এ দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এ দোষে দোষী।

ভারতবর্ষের গণতন্ত্র অপরিণত বলেই যে আমরা এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তা নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থল ইংলণ্ডের অবস্থাও এর চেয়ে বিশেষ সুবিধার নয়। নচেৎ প্রায় বছর দেড়েক পূর্বে (১৯শে জুন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের নেতা শ্রীযুক্ত হিউ গেটস্কেলকে এক প্রকাশ্য জনসভায় সে দেশের বিগত সাধারণ নির্বাচনে টোরীদল কি ভাবে অর্থের বলে জয়ী হয়েছে সে সম্বন্ধে অভিযোগ করতে হত না। রক্ষণশীল দল শ্রমিক নেতার এই প্রকাশ্য অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা যায় নি। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা এই যে সংসদীয় নির্বাচনে অর্থের বিপজ্জনক প্রভাব দূর করার কোন ক্ষমতা বিকশিত গণতন্ত্রের দেশ ইংলণ্ডে সম্ভবপর হয় নি, গেটস্কেল নিরুপায়ের মত কেবল অনুযোগই করেছেন।

নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক চেতনাবিহীন বলেই যে কেবল দুর্নীতির প্রসার ঘটছে তা নয়। রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্নেরা অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজও নির্বাচনের সময় দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়ে দেশের রাজনীতির এই রোগকে কায়েম রাখছেন। নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা টাকার যে হরির লুট দেন, তার বড় একটা প্রাপক শিক্ষিত সমাজ। ঠিক নির্বাচনের মুখে প্রতি শহর ও জনপদে কত যে নূতন নূতন ক্লাব ও সঙ্ঘ গজিয়ে ওঠে তার ইয়ত্তা নেই। এই সব ক্লাব ও সঙ্ঘের নেতারা এবং এমন কি অনেক সময় জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার কেন্দ্র স্কুল-কলেজের মুরুব্বীরা ব্যক্তিগত ভাবে নয়, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা রকমের 'চাঁদা' নিয়ে তার বিনিময়ে তাঁদের জন্য ভোট ক্যানভাস করেন। এই ভোট ক্যানভাস করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলির নীতিবোধের কোন বালাই থাকে না। যুগপৎ একাধিক পরস্পর-বিরোধী দলের প্রার্থীর কাছ থেকে 'চাঁদা' নিয়ে তাঁদের সবাইয়ের কাছে একমাত্র তাঁদেরই হয়ে ক্যানভাস করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক পরিচালিত এই সব ক্লাব বা বিদ্যায়তনের বিবেকে বাধে না। প্রার্থীরা চাঁদার টাকা কোথা থেকে দেন, কেন দেন তা জানা বা বোঝার কোন প্রয়াস নেই আমাদের শিক্ষিত সমাজের ভিতর। ফলে গণতান্ত্রিক অধিকারের মত এমন মহান ও পবিত্র জিনিস সমাজদেহে পচন ধরিয়ে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অধিকাংশ সৎ গৃহস্থের পক্ষে বর্তমান কালের জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার জন্য ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার ফুরসত নেই। অথচ ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে বহুসংখ্যক ক্যানভাসার চাই। স্বাধীনতার পর নেতৃবৃন্দের ভিতর আদর্শবাদের অভাব দেখা দিয়েছে এবং যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও দেশ-বিভাগরূপী রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিণাম-স্বরূপ দেশের সাধারণ যুবক-যুবতীদের ভিতরও আদর্শ-বাদের ধারা অদৃশ্যপ্রায়। এ অবস্থায় নির্বাচনের সময় ভোটসংগ্রহকারী রাজনৈতিক দলের কর্মী জুটবে কোথা থেকে? সুতরাং সব রাজনৈতিক দলের 'দাদা'দেরই আজ টেডি বয় বা ক্ষুদে গুণ্ডা পুষতে হয়। অন্য সময়ে যারা রোয়াক আলোকিত করে বসে থাকে বা সিনেমার টিকিট কিংবা কণ্ট্রোলের চিনি কয়লা হাত বদল করিয়ে রেস্টুরেণ্ট ও খেলার মাঠের খরচ তোলে, নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'দাদা'দের কাছে তারাই অধমতারণ হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ ওই সব টেডি বয় পাড়ার মুরুব্বীর পদে উন্নীত হয় এবং তাদের পক্ষপুটের আশ্রয়ে যে কত রকম দুর্নীতি চলে তা নাগরিক জীবনের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধিত প্রত্যেকেই জানেন, এঁদের গড়া 'মধুচক্র' ভাঙার ক্ষমতা সৎ পুলিস-অফিসারেরও নেই, এর বহু প্রমাণ দেখা গেছে। কারণ ভোট সংগ্রহে

অপরিহার্য হবার জন্য এঁরা বিভিন্ন দলের দাদাদের আশ্রিত। সময়ে কাজ দেয় বলে দাদারা ভাইদের দোষ-ত্রুটি দেখেও দেখেন না।

তিন

দেশের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই বলে থাকেন যে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় বলেই সমাজে দুর্নীতি রয়েছে। কেউ ঘুষ না দিলে তো আর কেউ ঘুষ নিতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা অর্ধসত্য। সাধারণ মানুষকে খুব একটা আদর্শবাদী বলে মনে করা ভুল। পরিবেশ যদি নিতান্ত প্রতিকূল না হয়, তাহলে সচরাচর অধিকাংশ মানুষ সৎপথে চলে থাকে। কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে যাঁরা চরম অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করে নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শবাদের ধ্বজা ওড়াতে পারেন, সেই সব নমস্য ব্যক্তিদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ ত্যাগ আদর্শবাদ ও কৃচ্ছ্র সাধনার প্রবল প্রেরণা এলেও সেই প্রবর্তনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এই জন্যই সাধারণ মানুষ আত্মীয়স্বজনের অসুখের সময় বেশী দাম দিচ্ছি জেনেও প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে কুণ্ঠিত হয় না, অথবা রেলের টিকিটের কোন গোলমাল থাকলে আইনতঃ যদি দশ টাকা দণ্ড দেবার নিয়ম থাকে তাহলে চেকারকে পাঁচ টাকা দিয়ে রসিদের দাবি না করেই গা বাঁচায়। বাস্তবপন্থী সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রকে দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য সবাইকে প্রচণ্ড রকমের আদর্শবাদীতে রূপান্তরিত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না। সমাজ থেকে দুর্নীতি নিবারণের জন্য মানুষকে অবশ্যই সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কাঠামোকেও এর অনুকূল করে রূপান্তরিত করতে হবে। নচেৎ ক্ষমতাধীশদের চাপের সামনে সাধারণ মানুষের সাধারণ নৈতিক স্তর আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

অনুকূল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামোর জন্য অনেকে দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আদর্শ দণ্ড দেবার প্রস্তাব করেন। অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে দোষীকে মৃত্যুদণ্ড, প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং দীর্ঘ কারাদণ্ড ইত্যাদির প্রস্তাব করা হয়ে থাকে। লেখক ব্যক্তিগতভাবে প্রথমোক্ত দুটি দণ্ডব্যবস্থার বিপক্ষে। কারণ আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞান আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে যে সামাজিক অপরাধসমূহ মূলতঃ মানসিক ব্যাধি এবং প্রতিকূল পরিবেশের কারণ ব্যক্তি-মানবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অপরাধীর দৈহিক পীড়নের পরিবর্তে তার মানসিক চিকিৎসাই অপরাধ নিরাকরণের জন্য আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত প্রথা হিসাবে সর্বদেশে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এ ছাড়া শাস্তির এই বীভৎস পন্থা গ্রহণ করায় মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। একটা ব্যাধি দূর করার জন্য সমাজদেহে অপর একটি ব্যাধি সৃষ্টি করা নিশ্চয় বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। রোমান সভ্যতার প্রথম যুগে বালক-বৃদ্ধ-নরনারীনির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক-দের একত্র করে এম্ফিথিয়েটারের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান 'অপরাধী'দের দিকে নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিম্নমুখী করে তাদের ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে পাশব উল্লাসে চিৎকার করে ওঠার মত প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করায় মানুষের এতদিনের শিক্ষা সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরই অবমাননা হবে।

চূড়ান্ত দণ্ড বিধানের প্রথার কার্যকারীতার কথাও বিচার্য। এই পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে কিছুটা প্রতিকার হলেও সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হয় না। রাশিয়াতে গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত কঠোর একনায়কত্ববাদী শাসন চলার পরও দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় নি। তাও রাজনৈতিক ছাড়া অপরাপর অপরাধের কারণ শাস্তিপ্রাপ্তদের জন্য রাশিয়াতে যে দণ্ডব্যবস্থা চলে তা বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে আদর্শস্থানীয়। কারণ এই ক্ষেত্রে রুশ কর্তৃপক্ষ আদর্শ বিজ্ঞানীর মত দৈহিক পীড়ন নয়, অপরাধীর সংশোধন প্রচেষ্টাই কারাব্যবস্থার মূল নীতিরূপে স্বীকার করেছেন। অন্যান্য ডিক্টেটর-শাসিত দেশ থেকেও যে দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে না হলেও কাজ-চলাগোছের মাত্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে এ দাবি করা যায় না। পাকিস্তানে আয়ুব-শাসনের প্রথম বছর ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহু কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কিন্তু সেখানকার সর্বাধুনিক খবর হচ্ছে এই যে অসামরিক শাসনের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্তৃপক্ষের

ভিতরও ক্রমশঃ অসামরিক শাসনের দুর্নীতির বীজ সঞ্চারিত হচ্ছে এবং তাই সে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনেকে মনে করেন যে অনতিবিলম্বে সামরিক কর্তৃপক্ষকে দৈনন্দিন শাসনের দায়িত্বমুক্ত করা বিধেয়। এ ছাড়া সৈন্যবাহিনীর লোকেদের পক্ষপাতহীন দেবতা মনে করাও উচিত নয়। ভারত কেন, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের সমাজ-জীবনে যত দুর্নীতি ঘটে, তার একটা মোটা অংশের নায়ক সামরিক বিভাগের লোকজন। সামরিক বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই জানেন যে ঠিকাদারী বা অন্যান্য ব্যাপারে সেখানে পঞ্চ ম-কারের কী দারুণ প্রতিপত্তি। এমতাবস্থায় সামরিক শাসনের কথা চিন্তা করলে দুর্নীতিরূপী সমস্যার সমাধান তো হবেই না, পক্ষান্তরে মানুষের যে যৎসামান্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতারূপী সম্পদ আছে, তাও হারাতে হবে।

এইখানে বিকেন্দ্রীকরণের কথা আসে। গণতন্ত্রের একটা মূল সূত্র হল এই যে আইনকানুন তাঁরাই রচনা করবেন যাঁদের সেই বিধি-বিধান পালন করতে হবে—সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবস্থাপক এবং ওই ব্যবস্থাপনার অধীন জনসাধারণের ভিতর কোন রকম অধিকারগত পার্থক্য থাকবে না। প্রচলিত গণতন্ত্র অত্যন্ত কেন্দ্রিত বলে পূর্বোক্ত সূত্রের বাচ্যার্থই আজ কেবল সত্য, এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব (spirit) আজ পৃথিবীর তাবৎ গণতান্ত্রিক দেশেই অদৃশ্য। লোকসভায় তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের জন্য নিয়মকানুন তৈরি হয়; কিন্তু লোকসভার সদস্যরা কেউ তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন না। সুতরাং শত সদিচ্ছা থাকলেও ওই আইন যাদের পালন করতে হবে, তাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে লোক-সভার সদস্যদের সম্যক্ ধারণা থাকা সম্ভব নয়। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা চাল চিনি বা ওই জাতীয় কোন জিনিসের কণ্ট্রোলের বিধিবিধান রচনা করলেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে অজগরের মত লম্বা 'কিউ'য়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়াতে হয় না, প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব অনুভূত হবার পূর্বেই তা তাঁদের ঘরে পৌঁছে যায়। বৃহত্তর ক্ষেত্রের উদাহরণ দিতে হলে বলা যায় যে দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের যেসব উচ্চপদস্থ কর্মচারী কৃষককে সেচের জল দেবার নিয়মকানুন রচনা করেন, তাঁরা স্বয়ং কেউ কৃষক নন বলে ওই নিয়মের ফলে কৃষকদের কি অসুবিধা ও তার জন্য কোথায় কোথায় কি ভাবে দুর্নীতি সৃষ্টি হচ্ছে—এ কথা উপলব্ধি করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং নিয়মপালনকারীরা যদি নিয়মরচনাকারী হয়, তা হলেই কেবল যথাসম্ভব দুর্নীতির সম্পর্করহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাবলী গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং অর্থ ও শাসন-ব্যবস্থার যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণ কাম্য।

উপভোক্তাদের কোন সমবায় সমিতিকে যদি সরষের তেল বা আটা উৎপাদন করতে হয়, তা হলে স্বভাবতঃই সেই সমিতি তেলে শিয়ালকাঁটা বা আটায় তেঁতুলবীজের ভেজাল মেশাবে না। কারণ এই সব উৎপাদন 'একমে'র (unit) লক্ষ্য হবে উপভোগের জন্য উৎপাদন, ব্যবসায় বা মুনাফার জন্য নয়। এ ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যে 'একম্'গুলি যেন এত বড় না হয়ে পড়ে যে যার ফলে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। আর এই সব প্রতিষ্ঠানে সদস্যবহির্ভূত কর্মচারী নিয়োগ করাও যথাসম্ভব সীমিত করতে হবে। এইভাবে যদি উপভোক্তাদের স্বার্থে উৎপাদন ব্যবস্থা চালিত হয়, তা হলে নিজেদের মঙ্গলের জন্যই এর সদস্যরা তেলকলের পরিবর্তে ঘানি, চাল ও আটার কলের পরিবর্তে উন্নত ঢেঁকি বা জাঁতার প্রবর্তন করবেন। মানুষের স্বাস্থ্যের চেয়ে দু পয়সা বেশী মুনাফা বড় জিনিস হবে না। এখানে একটি আইডিয়াকে কেবল সূত্রাকারে উপস্থাপিত করা হল। বিভিন্ন শিল্প-উদ্যোগে কি ভাবে এই নীতিকে কার্যান্বিত করা যায়, তার জন্য আরও গভীর চিন্তা ও বিশদ পরিকল্পনার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের মত বড় বড় জনকল্যাণকর পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে প্রথমতঃ একে একের পরিবর্তে একাধিক করপোরেশনে বিভাজিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতের ওই সব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় করপোরেশনের যাবতীয় সদস্য সরকার-মনোনীত হবেন না। করপো-রেশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ সেচের জল যাদের নিতে হবে সেই সব কৃষক, বিদ্যুৎ যে সব শিল্প ব্যবহার করবে তাদের প্রতিনিধি, করপোরেশনের

কর্মচারীদের প্রতিনিধি ও সরকার-মনোনীত দুই-এক-জন নিয়ে ভবিষ্যতের এই সব করপোরেশন গঠিত হতে পারে এবং এর ফলে দুর্নীতি ন্যূনতম হবে।

দেশ-শাসনের ক্ষেত্রে এই নীতিকে প্রয়োগ করলে গ্রাম-পঞ্চায়েতকে সর্বাধিক ক্ষমতা দিতে হবে এবং অঞ্চল-পঞ্চায়েত বা ব্লক কমিটী তার তুলনায় কম ক্ষমতা পাবে ও জেলা-পরিষদ বা প্রাদেশিক সরকারের আরও কম ক্ষমতা থাকবে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা মুদ্রা-ব্যবস্থা যোগাযোগ এবং পররাষ্ট্র বিভাগ ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগ ছাড়া অপর কোন দায়িত্ব না দিলেও চলবে। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ শাসনকার্যের সঙ্গে সর্বস্তরে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকে বলে আদর্শ গণতন্ত্রের বিকাশ হয়—এ কথা ছেড়ে দিলেও দুর্নীতি-বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবেও এই কাঠামো আদর্শ। আর্থিক বা প্রশাসনিক যে কোন ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বৃহত্তর একমের তুলনায় ক্ষুদ্রতর একম্ অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা। আর অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে দুর্নীতির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বলে নিঃসন্দেহে সর্বদা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর একম্-ই কাম্য। প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জেলার সাধারণ শাসন ও বিচার বিভাগ ছাড়াও যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের অন্তিম দায়িত্ব জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। কোন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ব্যক্তিগতভাবে যতই সৎ ও দক্ষ হোন না কেন এতগুলি বিভাগের সব ফাইল তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁকে প্রত্যেকটি ফাইলে অধস্তন সহকারী লিখিত মন্তব্যের উপর একরকম চোখ বুজে সই করতে হয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী অথবা অফিসের বড়বাবু কিংবা পরিদর্শক কর্মচারীদেরও এত অধিক-সংখ্যক ফাইল "ডিসপোজ" করতে হয় যে ফাইল দস্তখতের জন্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে দেবার পূর্বে কদাচিৎ তাঁরা নিম্নতম সহকর্মীর নোট খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় বা সুযোগ পান। উচ্চতর পর্যায়ে মন্ত্রীবৃন্দ এবং সেক্রেটারিয়েটের উচ্চ অধিকারীদেরও ওই একই অবস্থা। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থার অতি-কেন্দ্রীকরণের কারণ উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসকরা ইচ্ছা করলেও শাসনযন্ত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারেন না। হুঁকো আড়াল দিয়ে তামাক খাবার মত অধস্তন কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন অফিসারদের শিখণ্ডী খাড়া করে নিজেদের কাজ করে যান এবং দৈবাৎ কোন দুর্নীতির ঘটনা লোকচক্ষের সামনে এলেও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার জন্য ওই সব মামলা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন। কারণ প্রশাসনিক নিয়মানুযায়ী কণ্ট্রোলিং অফিসার হিসাবে সর্বপ্রথম ওই উচ্চপদস্থ কর্মচারীকেই দায়ী করা হবে। এই ভাবে সাধারণতঃ দুর্নীতিগ্রস্ত অধস্তন কর্মচারীরাও রক্ষা পেয়ে যান।

এ ছাড়া কেন্দ্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বিবেচ্য। কেন্দ্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে এবং এর জন্য লাল ফিতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাঁকে তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধি করতে হবে তাঁকে ওই যন্ত্রকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিছু দক্ষিণা দিতেই হয়। মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা বাড়ির নকশা মঞ্জুর করানো অথবা হাইকোর্টে আপিল করার জন্য, নিম্ন আদালতের রায়ের নকল পাবার জন্য প্রার্থীরা যে নানা স্থানে প্রণামী দিতে বাধ্য হন তার কারণ শাসনযন্ত্রের শম্বুক গতি। আজকে গ্রামে কোন বাঁধ বা রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা মঞ্জুর ও কাজের পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাদেশিক সরকারের কর্মচারী এবং কাজ করার দায়িত্ব ঠিকাদারদের হাতে। অর্থাৎ এঁরা কেউ সংশ্লিষ্ট গ্রামের অধিবাসী নন বলে বাঁধ বা রাস্তা খারাপ হলেও এঁদের কিছু যায়-আসে না। অতএব পরিকল্পনার রূপায়ণের পথে পার্সেন্টেজ দাবি করতে বা দিতে নিতে এঁদের কারও গায়ে লাগে না। দেশের মঙ্গল বা জনসাধারণের স্বার্থ ইত্যাদি কথা অধিকাংশ মানুষের কাছেই একটা বিমূর্ত (abstract) কল্পনা। অথচ সংশ্লিষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েতকে যদি ওই জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হয়, তাহলে তার প্রতিটি পর্যায়ে গ্রামবাসীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে এবং তাই এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প।

বিকেন্দ্রীকরণের দুর্নীতি-বিরোধী স্বরূপের আর একটি দিকের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বিকেন্দ্রিত একমের কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ দুর্নীতির শরণ নিলেও তাঁদের কর্তৃত্বের এলাকা সীমাবদ্ধ বলে তাঁদের দুষ্কৃতির ফলভোগী এলাকাও ছোট হবে। হীরাকুদ বাঁধের মাল খরিদ

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দুর্নীতির পরিমাণ এবং ওই বাঁধের কোন স্থানীয় এককের পঞ্চায়েতের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানের কুকীর্তির পরিমাণে স্বভাবতঃই আকাশপাতালের তফাত হবে।

চার

তবে কেবল সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কাঠামো বদলানো এবং আইনে দুর্নীতিকারীকে কঠোর শাস্তি দেবার বিধান থাকাই যথেষ্ট নয়। ঢেউ গণনা করে বা রাস্তার পাশে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকেও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ রূপে উপার্জন করার কূটবুদ্ধিবিশিষ্ট লোককে কোন আইন-কানুন বা বিধিব্যবস্থা নিবৃত্ত করতে পারবে না। আইন কেবল সমাজকর্তৃক স্বীকৃত মূল্যবোধের উপর রাষ্ট্রের পাঞ্জার নিশান দিতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি বা আইনকে ইদানীন্তন কালে সর্বশক্তিমান করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে এদের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে প্রথমেই সতর্ক থাকা উচিত।

আমাদের সমস্যা আরও গভীর, ব্যাধি আরও দৃঢ়-মূল। কারণ মানুষের মন যদি পরিবর্তিত না হয় অর্থাৎ মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যদি বিপ্লব সংসাধিত না হয় তবে শ্রেষ্ঠ সামাজিক কাঠামোও ভ্রষ্ট চালকের কারণে কলুষিত হতে পারে। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাও অপরিহার্য।

বিংশ শতাব্দীর এই বৃহৎ যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য আধারিত আর্থিক ব্যবস্থার কারণ কেবল শহরই নয়, এক একটি শহরকে কেন্দ্র করে তার বিশ পঞ্চাশ মাইল ব্যাসের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সর্বতোভাবে আজ শহরের মুখাপেক্ষী। আর এই সমস্ত এলাকায় অতি দ্রুত পুরাতন সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে। এমন কি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে কলকাতার মত বড় শহরের বিভিন্ন পাড়াতেও একটা সমাজ ছিল, ছিল সমাজের শাসন। আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। আমরা আজকাল একে অপরের পাশাপাশি হয়তো থাকতে পারি; কিন্তু সে থাকা ট্রেনে বা ট্রামে বাসে সহযাত্রী হবার মত। সুতরাং প্রতিবেশী-দের সম্মিলিত প্রভাব অর্থাৎ সামাজিক চাপের কারণ অনৈতিক পন্থা থেকে দূরে থাকা বা আকস্মিকভাবে পদস্খলন হলে ওই সামাজিক চাপ প্রয়োগ করে দুষ্কৃতিকারীকে সংশোধন করা আর সম্ভব নয়। আমার প্রতিবেশী মণ্ডপ উৎকোচগ্রহণকারী বা অন্যবিধ দুর্নীতির নায়ক হলেও আমার কিছু বলার বা করার অধিকার নেই। চোখের সামনে স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের রোয়াকচারী তরুণরা উত্ত্যক্ত করছে দেখলেও পাড়ার বয়োবৃদ্ধদের হাতে প্রতিকারের কোন উপায় নেই। আধুনিক সমাজের এই যে ভাঙন, সময়ে যদি এর গতিরোধ করা না যায় তাহলে আমাদের যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে তা ভাবলেও শিহরিত হয়ে উঠতে হয়। কৃষিমূলক অর্থব্যবস্থা নির্ভরিত সামাজিক কাঠামোর দিন হয়তো আর নেই; কিন্তু শূন্যতাও কাম্য নয় বলে শ্রমশিল্প-আধারিত সামাজিক কাঠামো ও তার উপযুক্ত আচার-সংহিতা (code of conduct) রচনা করার দিন এসে গেছে।

এই শতাব্দীর আর এক বিপদ হচ্ছে ধর্মের প্রভাব হ্রাস। ধর্ম বলতে এখানে কালী দুর্গা বা যীশু মহম্মদকে উপাসনাকারী কোন লৌকিক ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে না। কিন্তু ধর্মের কালপ্রভাবে জরাগ্রস্ত বহিরঙ্গ বর্জন করতে গিয়ে এই যুগ নৈতিক ধর্মকেও বিস্মৃত হতে বসেছে। এ যেন অনেকটা শিশুকে যে জলে স্নান করানো হয়েছে সেই ময়লা জলের সঙ্গে শিশুটিকেও ফেলে দেবার মত ব্যাপার। ইচ্ছা হলে কেউ মানব-প্রকল্প ঈশ্বর ও তাঁর বিধিবিধানে বিশ্বাস করতে বা না করতে পারেন। কিন্তু ধর্মের প্রভাবে সত্য পথে চলা, অপরকে প্রতারণা ও শোষণ না করা ইত্যাদি যে নৈতিক আচার-সংহিতা সমাজ গ্রহণ করেছিল, তার প্রভাব এখন অত্যন্ত ক্ষীণ। ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদির ভয়ে বা স্বর্গের লোভে সৎপথে চলা অবশ্য সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। কিন্তু ঈশ্বর ও ধর্মভয় ছেড়ে দুর্নীতির পথে চলতে দ্বিধাবোধ না করা আরও অসুস্থতার লক্ষণ। সে যুগে মানুষ ধর্মের ভয়ে দুর্নীতিপরায়ণ হত না; কিন্তু আজ আমরা সমাজ বা রাষ্ট্রচেতনাকে মানুষের মনে এমন শক্তিশালী করতে পারি নি যার দ্বারা সে পথভ্রান্ত না হয়। আমরা আপেক্ষিকবাদের এমন বিকৃতি ঘটিয়েছি যে সত্য ন্যায় নীতি ইত্যাদির আর কোন শাশ্বত বা অন্তনিরপেক্ষ

অস্তিত্ব নেই। অথচ আমরা ভুলে গেছি যে আপেক্ষিক-বাদের আবিষ্কারক আইনস্টাইন পর্যন্ত নৈতিক ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। নৈতিক ধর্মের পুনরভ্যুদয় ছাড়া সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও তজ্জনিত সংঘর্ষ সমাজের সংহতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে এবং আজ যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই দুর্নীতিরূপী উপসর্গ দেখা দিয়েছে তা নৈতিক ধর্মের অভাবজনিত ব্যাধির অন্যতম প্রতিক্রিয়া। সুতরাং সর্বতোভাবে আবার মানুষের মহামূল্য সম্পদের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। বাল্যকাল থেকে নৈতিক ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা এই লক্ষ্যাভিমুখী এক সমীচীন পদক্ষেপ।

ধর্মের প্রভাব হ্রাসের কারণই আবার জড়বাদের উপাসনা অর্থাৎ অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করার প্রবণতা আধুনিককালে প্রকট হচ্ছে। মানুষের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সেবাবৃত্তি বা চারিত্রবল এখন আমাদের বিবেচ্য নয়। যেনতেনপ্রকারেণ কেউ যদি কিছু টাকার মালিক হয়ে থাকে আমরা তাহলে তাকে সমাজে (এর যেটুকু অবশিষ্ট আছে) শীর্ষস্থানীয়ের মর্যাদা দিয়ে থাকি। বারোয়ারী অথবা পাড়ার ক্লাবে মোটা চাঁদার বিনিময়ে এঁদেরই আমরা উৎসব অনুষ্ঠানে মঞ্চের সম্মুখভাগে আসন দিয়ে সভাপতি, প্রধান অতিথি অথবা উদ্বোধকের পদে বরণ করে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করি। এমন কি আমাদের মধ্যে বহু 'সমাজসচেতন' ব্যক্তি কন্যা বা ভগ্নীর বিবাহের সম্বন্ধ করতে গেলে পাত্রের উপরি আয় কত জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা বোধ করেন না এবং উপরি বেশ দু পয়সা হলে নিজের আত্মীয়া যে 'সুপাত্রে' পড়ছে জেনে প্রসন্ন হন। এ যুগের তরুণ-তরুণীরা আধুনিকতা ও প্রগতির কথা আওড়ালেও এ রোগমুক্ত নন। অর্থই একমাত্র উপাস্য হওয়ায় তরুণদের উপরি নিতে বা দিতে সঙ্কোচ নেই এবং তরুণীদেরও ওই রকম পাত্রের গলায় বরমাল্য দিতে আপত্তি নেই। এক নৈতিক বিপ্লব অর্থাৎ মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই ভয়ঙ্কর অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। অর্থ ও অমিত ভৌতিক সম্পদই যে মানুষের একমাত্র কাম্য নয়, মনুষ্যত্ব এর চেয়েও অনেক মূল্যবান ও প্রেয়—এই সত্য বোঝার ও এতদনুযায়ী আচরণ করার দিন এসেছে। এইভাবে মানুষের নব মূল্যায়ন হলে আমরা আর চোরাবাজারী অথবা দরিদ্রের রক্তশোষক ধনী অথবা ভ্রষ্টাচারী রাজ-পুরুষদের তোয়াজ করব না, পক্ষান্তরে আমরা তাঁদের সামাজিক বয়কট করব। দরিদ্র অথচ চরিত্রবান ব্যক্তি মানুষ হিসাবে সন্দেহজনক ভাবে অর্থোপার্জনকারীর চেয়ে অধিকতর শ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবেন। সমাজ এইভাবে সচেতন হয়ে উঠলে অনেকে পাপপথে ধনার্জন করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবেন। কারণ কেবল ধনের জন্য কেউ ধন উপার্জন করেন না। ধনী হলে মানী হওয়া যায় এই বিশ্বাস অর্থোপার্জনের পিছনে কাজ করছে। কাল টাকা যখন অসম্মানের কারণ হবে অনেকেই তখন অন্যায় পন্থায় অর্থসঞ্চয়কে প্রার্থনীয় লক্ষ্য বলে বিবেচনা করবে না। আইনকানুন দিয়ে এ হবার নয়, আমাদের মনোজগতে, জীবনদর্শনে আজ বিপ্লব সংসাধন করতে হবে।

সমাজে চিরকালই হয়তো অল্পাধিক দুর্নীতি থাকবে। মনোবৈজ্ঞানিক কারণে সব মানুষ সুস্থ মানসিকতার হয় না, সকলে সমাজমুখীও হয় না। কিন্তু সমাজের প্রধান প্রেরক-শক্তি (driving force) যদি সুনীতি-পরায়ণতা না হয়, দুর্নীতি সমাজ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম না হয়ে যদি সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত হয়, তাহলে সমাজের সংহতি চূর্ণীত হতে আর দেরি নেই বুঝতে হবে। এ কথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে ভারতীয় জনজীবন আজ প্রায় এই অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। দুর্নীতি আজ আমাদের এত গা-সওয়া হয়ে উঠেছে যে চোখের সামনে দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হতে দেখলেও আমরা তার প্রতিকার করার চেষ্টা করি না। অসহায়কে প্রতারিত হতে দেখলেও আমাদের রক্ত আর গরম হয় না, পূর্বাপর বিবেচনা, নিজের সুবিধা-অসুবিধার চিন্তা ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে আমরা প্রতিবাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি না। জাতি হিসাবে আমরা যে নির্বীর্য হয়ে পড়ছি, এটা তারই লক্ষণ। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমরা যতই যুক্তিজাল রচনা করি না কেন, অথবা 'দোষী আমরা নই—ওই ওরা' বলে যতই আত্মদোষ ক্ষালন করার প্রয়াস করি না কেন, ভারতীয় সমাজ-জীবনে বর্তমানে দুর্নীতির যে প্রবল প্রবাহ চলেছে এবং তার সামনে দেশের বুদ্ধিজীবী ও তরুণ সম্প্রদায় যে রকম অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছেন, তার দ্বারা জাতির সামাজিক ও আত্মিক মৃত্যুর পূর্বলক্ষণই সূচিত হচ্ছে। বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত বাঁধ ও কারখানা বহু আয়াসে অধিগত শিল্প-সাহিত্যের জ্ঞান বা বহু যুগের সাংস্কৃতিক সম্পদ প্রাচীন গ্রীস রোম অথবা এই ভারতেরই মোগল সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে নি, আমাদেরও পারবে না।

—

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

(ঘ)

অনুপমের নতুন শুভানুধ্যায়ীরা তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেই তুষ্ট হন না, যাঁর যা ভাল লাগে তাও দেখাতে চান তাকে। অধ্যাপক ঘোষ তাকে দেব-মন্দির দেখিয়েছেন, সাধুসঙ্গ করিয়েছেন। কৃষ্ণনগরে খ্রীষ্টীয় মিশন দেখতে যাবার জন্য ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করছেন ডাঃ সুলোচনা বটব্যাল। তরুলতা সেন জেদ ধরলেন, তিনি অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বঙ্গবাণী দেখাবেন।

অনেক দিন আগেই তিনি বলেছিলেন যে তাঁর নিজের সন্তানের প্রতি যেমন, বঙ্গবাণীর প্রতিও তেমনি অপত্য-স্নেহ তাঁর। থাকা অসম্ভব নয়, কেন না গোড়া থেকেই সঙ্গীতের শিক্ষিকা হিসাবে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি, সেই থেকে বড় করেছেন বঙ্গবাণীকে।

তিন মাসের মধ্যে চতুর্থবার অনুপমকে নিজের বাড়িতে চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করে এনে সেদিন কথাটা পাকা করলেন তিনি।

প্রথমে চায়ের টেবিলে বাইরের কোন লোককে না দেখে অনুপম খুশীই হয়েছিল। কিন্তু তারপর চমকে উঠল সে।

তরুলতা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, এস না অরু, অত লজ্জা কেন তোমার?

পাশের ঘর থেকে এসে অরুন্ধতী তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে বসবার পর তরুলতা অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ও এসেছিল ওর নিয়মমত আমার কাছে গান শিখতে। তা ক্লাশ তো আজ আমি নিতে পারলাম না, তাই এক কাপ চা খাইয়ে ওর ক্ষতিটা পূরণ করে দিচ্ছি।

অনুপমের চমকটা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি বলে হাসতেও পারল না সে। অরুন্ধতী কিন্তু তরুলতার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বলল, আমার কোন ক্ষতিই হয় নি মাসীমা, তা পূরণ করবেন কী?

যা বলেছ,—তরুলতা স্মিতমুখে উত্তর দিলেন। অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে কথাটার ব্যাখ্যা করলেন তিনি, অরু কিন্তু তেমন বাড়িয়ে বলে নি অনুপমবাবু। ওর গানের ক্লাশ একটিও যদি না হয় তবু ওর কোন ক্ষতি হবে না, কেন না গান ওর মোটে আসেই না—তা ওর বাবা যতই ওর ভজন গানের তারিফ করুন না কেন।

শুনে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, একটু যেন গর্বভরেই অরুন্ধতী বলল, আমার জীবনে কেবল ওই একটা ফাঁক নাকি মাসীমা? আরও কত কিছুই তো পারি নে আমি,—যেমন গাইতে অপটু আমি, তেমনই তো রাঁধতেও। সে সব বলছেন না যে ডাক্তারবাবুকে?

উত্তরে তরুলতা বললেন, তোমাকে একটু স্নেহ করি বলে ভদ্রলোকের কাছে আমাকে দিয়ে তুমি মিছে কথা বলাতে চাও নাকি? আর বলে পার পাবার উপায়ও তো তুমি রাখ নি।

আবার অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে ও কথাটারও ব্যাখ্যা করলেন তিনি, গান ভাল জানে না বলে আমাদের মেয়েকে নির্গুণ মনে করবেন না যেন অনুপমবাবু। পড়াশোনায় অরু বেশ ভাল। আর সেদিন ওদের বাড়িতে খেয়ে আপনিও যে রান্নার অত তারিফ করলেন তার সবই তো রেঁধেছিল এই অরু। ঠাকুরকে সেদিন ও উনুনের ধারেও ঘেঁষতে দেয় নি।

কিন্তু মাসীমা,—কথার পিঠেই উত্তর দিল অরুন্ধতী, আপনাকে তিনবার সেখানে আমিই ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা বলছেন না যে?

মিছামিছি তরুলতা ওকে লাজুক বলেছিলেন—অনুপম

দেখল যে দিব্যি সপ্রতিভ মেয়েটি। তরুলতা বলতেই অরুন্ধতী অনুপমের পেয়ালাতে দ্বিতীয়বার চা ঢেলে দিল।

কিন্তু চিনি নয়। চিনির মধ্যে চামচ ডুবিয়ে বাটিটা অনুপমের দিকে এগিয়ে দিয়ে অরুন্ধতী বলল, আপনি নিজের মাপমত চিনি নিন ডাক্তারবাবু—আমি দিলে বেশী যদি হয়ে যায়!

মাত্র চারজন লোকের নিতান্তই ঘরোয়া চায়ের আসরে এরকম মেয়ের সঙ্গে একেবারে কথা না বলে ঘণ্টাখানেক কাটানো যায় না। সুতরাং অরুন্ধতীর সঙ্গে অনুপম ভাঙা ভাঙা রকমের দু চারটি কথাও বলেছিল সেদিন।

তবু রবিবারে অরুন্ধতীও যে তাদের সঙ্গে যাবে এমন কোন আভাস সেদিন পায় নি অনুপম।

সেইজন্যই সেদিন জগন্ময়বাবুর ডাক শুনে নিজের বাড়ি থেকে বাইরে এসে দ্বিতীয় রিকশাখানিতে তরুলতার পাশে অরুন্ধতীকে দেখে চমকে উঠল অনুপম। পুলকের গা-ছোঁওয়া চমক তা, দুটি মেয়েরই চোখে পড়েছিল হয়তো।

অরুন্ধতী মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু তরুলতা যেন উৎফুল্ল হয়ে বললেন, ঘরকুনো মেয়েটা নিজের কলেজ ছাড়া আর কোথাও যায় না। তাই আমিই ওকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম।

আহা হা!

অরুন্ধতীর উত্তরই কেবল শুনতে পেল অনুপম, বেড়াতে যাবার কত জায়গা যেন আছে এই নবদ্বীপে! বঙ্গবাণীও তো পুরনো হয়ে পচে আসছে এখন।

অনুপমের কাছে তা অবশ্য নয়। প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না বঙ্গবাণী। সরকার থেকে অনেক টাকা পেয়েছে প্রতিষ্ঠান। তাই দিয়ে দালান-কোঠা হয়েছে, হচ্ছেও। হাঁ করে তাকিয়ে দেখবার মত কিছু অবশ্য নয়। তবু নতুন দালান তো—দেখতে ভালই। বিন্যাসে শৃঙ্খলা ও প্রতিসাম্য আছে। শহর থেকে দূরে নতুন একটি উপনগরীর মত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিতে যে জীবন লালিত হচ্ছে তাতে প্রথম যৌবনের জোয়ার। নবদ্বীপ "ধাম", বঙ্গবাণী শিক্ষাছত্র; নবদ্বীপ জরা, বঙ্গবাণী যৌবন; নবদ্বীপ অতীত, বঙ্গবাণী ভবিষ্যতের ইশারা। নিদয়াঘাটের পথে শ্রীঅরবিন্দের পূতাস্থি এনে ওখানে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করবার দিন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যাবর্তন বলে ব্যাখ্যা করে থাকলেও বঙ্গবাণীর অঘোষিত বাণী যেন শ্রীগৌরাঙ্গযুগের অবসানই নিরন্তর ঘোষণা করছে।

কলকাতার মানুষ অনুপম প্রথম দিন যদি স্টেশন থেকে সোজা এই বঙ্গবাণীতে এসে উপস্থিত হত তাহলে হয়তো কিছুই তার মনে হত না। কিন্তু খাস নবদ্বীপে একাদিক্রমে মাসতিনেক বাস করবার পর হঠাৎ বঙ্গবাণীর নতুন জীবনের সংস্পর্শে এসে সে যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

মেয়েদের প্রতিষ্ঠান বঙ্গবাণী। শিশু বিভাগ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বিশেষ সঙ্গীত বিভাগ আছে, শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ আছে, শরীর চর্চা ও সমাজ-সেবাও শেখানো হয় ওখানে। পড়তে হলে ওখানেই থাকতে হয়। সুতরাং একসঙ্গে অনেক মেয়ে দেখা গেল। বালিকার সংখ্যা কম নয়, কিন্তু বৃদ্ধা, এমন কি প্রৌঢ়াও অনুপমের চোখে পড়ছে না। একেবারে যেন বিপরীত নবদ্বীপের। অরুন্ধতীর বয়সী মেয়েরাই সংখ্যায় বেশী। প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার পরেই দলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল সে। তবুও—অথবা বোধ করি সেইজন্যই—বার বার তাকেই অনুপমের মনে পড়ছিল।

সেজে আছে প্রত্যেকটি মেয়েই; অগোছাল বেশবাসও তো এক রকমের সাজ—পিঠের উপর ছড়িয়ে দেওয়া এলোচুলের মত। স্কুলঘরের সামনে অথবা মাঠে দলে দলে যুবতী মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—সরোবরে ঝাঁকে ঝাঁকে মরালীর মত। তাদের মধ্যে একা অরুন্ধতীই অনুপমের চেনা মেয়ে। দূর থেকে একটি দলের মধ্যে একবার তাকে দেখেই ভাবনাটা দানা বাঁধল তার মনে। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভাবতে ভালও লাগছে।

প্রতিষ্ঠানে খুব খাতির অনুপমের। সরকারী ডাক্তারের নিজস্ব প্রতিপত্তি তো তার আছেই, তাতে আবার তরুলতা সেন তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা শশব্যস্ত সকলেই। অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে তাঁরা তাকে দেখালেন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগ, মন্দিরও। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা শুনল অনুপম, তার কিছু কিছু

গুরুগম্ভীর। তবে সমাপ্তি মধুরেণ এবং তা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই। প্রথমে চা ও মিষ্টান্ন, পরে সঙ্গীত।

সারা দিনে একটিও রুগী দেখতে হয় নি, কানে পশে নি ভিক্ষুকের কাতরোক্তি। যে মুখগুলি চোখে পড়েছে তার প্রত্যেকটিই কাঁচা না হলেও সবগুলিই তাজা। তারযন্ত্রের মধুর বাজনার সঙ্গে সুললিত নারীকণ্ঠের সঙ্গীত কানে আর শোনা না গেলেও মনে যেন তখনও ঝঙ্কার তুলে চলেছে। অনুপম পরিতৃপ্ত, উৎফুল্ল। মনের খুশী তার মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বেশ কাজ করছেন আপনারা,—বলেছিল অনুপম দোরগোড়ায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা তাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে। মেঠো পথ দিয়ে পাকা সড়কের দিকে হেঁটে যেতে যেতে আবার সেই কথাই বলল সে।

এবার তরুলতার মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, বেশ কাজ হচ্ছে এখানে।

তরুলতা প্রীত হয়ে হাসলেন, জগন্ময়বাবু ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলেন; কিন্তু অরুন্ধতী বলল, খুব বুঝি ভাল লাগল আপনার?

নির্দোষ প্রশ্ন, কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

চমকে অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল অনুপম যে তার অনুমান মিথ্যা নয়—চাপা বিদ্রূপ রয়েছে মেয়েটির মুখটেপা হাসিতেও।

তাকে একটা খোঁচা দিয়েছে অরুন্ধতী, কিন্তু কি মিষ্টি সেই খোঁচা! বেশ একটু পুলকিত হয়েই উত্তর দিল অনুপম, আপনারও নিশ্চয়ই খুব মন্দ লাগে নি।

কি করে জানলেন?

খুব তো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখলাম।

ওমা!—একটু যেন লাল হয়ে উঠে প্রতিবাদ করল অরুন্ধতী: ঘুরে বেড়াব আবার কোথায়? ওইটুকু তো মোটে জায়গা!

তা হলে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন।—বলে সশব্দে হেসে উঠল অনুপম।

হাসলেন জগন্ময়বাবুও; সায় দিয়ে বললেন, ঠিকই বলেছেন ডাক্তারবাবু। আমিও দেখেছি—দল পেয়ে খুশীই হয়েছিলে তুমি।

খুশী না ছাই!

বলতে বলতে মুখে একটা ভেংচি কাটল অরুন্ধতী: এক একটা ঘণ্টা বাজছিল, আর আমি জ্বলে মরছিলাম। দিনটাই মাটি হল আমার, লেখাপড়া কিচ্ছু হল না।

অনুপম বলল, তাতে আর কি হয়েছে—একটা দিন না পড়লে কি হয়?

শুনেই থমকে দাঁড়াল অরুন্ধতী; ওই পথের মাঝেই সোজাসুজি অনুপমের চোখের দিকে চেয়ে সে বলল, তা তো বলবেনই—নিজে পাস করে বেরিয়েছেন কিনা!

ছেলেমানুষি কথা, কিন্তু কটাক্ষ নারীর এবং তা বিদ্যুৎগর্ভ। অনুপম আরও পুলকিত হয়ে বলল, পাস করে বেরিয়েছি বলেই তো জানি যে পড়াকে মাঝে মাঝে ফাঁকি দিলে ফল ভাল হয়।

অরুন্ধতী বলল, তাই নাকি! কিন্তু আমি যে ভাল জিনিসও ফাঁকি দিয়ে নিতে চাই নে।

তা হলে ফাঁকিটা পুষিয়ে নেবেন, দিনের ক্ষতিটা আজ বরং রাত জেগে পূরণ করবেন।

রাত আমি মোটেই জাগতে পারি নে—আজ তো এক্ষুণি আমার ঘুম পাচ্ছে।

অনুপমের কিন্তু বিপরীত। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না তার। এলোমেলো নানা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে অরুন্ধতীর মুখখানিই বারবার তার মনের দোরগোড়ায় উঁকি দিচ্ছিল। অন্ধকার ঘরে একা শুয়েও একবার হেসেই ফেলল অনুপম—তার জন্য দিনের পড়া নষ্ট হয়েছে বলে মুখরা মেয়েটি রাত্রে বেশ তো শোধ নিচ্ছে তার।

সেইজন্যই অত বেশী লজ্জা পেল অনুপম।

দিন দুই পর ডাক্তার সুলোচনা বটব্যাল আবার তাকে 'কল' দিয়েছিলেন। রুগী দেখা শেষ হবার পর অনুপমকে তিনি নিয়ে গেলেন "ভবন"সংলগ্ন তাঁর নিজের বাড়িতে; বললেন, বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

চা খাবার সময় সেটা নয়—সন্ধ্যা হয়ে আসছে তখন। সেইজন্যই আবার অসময়ও নয়। সুতরাং অজুহাত দেখিয়েও রেহাই পাওয়া গেল না।

যত সব আজে-বাজে কথা চা খেতে খেতে—মন

দিয়ে শোনবার মত কোনটাই নয়, মনে রাখবার মত তো নয়ই। গল্প করতে করতে অনুপম সতর্ক হবার প্রয়োজন একবারও বোধ করে নি। বিদায় নেবার সময়ে স্বভাবতঃই আরও উদার হয়ে উঠেছিল সে—সুলোচনার শেষের কথাটাই যে তাঁর আসল কথা হতে পারে তা সে ভাবতেই পারে নি।

তরুদির সঙ্গে বঙ্গবাণী দেখতে গিয়েছিলেন নাকি ডাক্তার বোস?

সুলোচনার প্রশ্ন শুনেই হাসি-হাসি মুখে ঘাড় নাড়ল অনুপম; তারপর নিজেই সে প্রশ্ন করল, আপনি কি করে জানলেন?

উত্তর হল: আমার গতি তো সর্বত্র। আর ওটা যখন কেবলই মেয়েদের ইস্কুল তখন বারবার আমাকে না ডেকে কি উপায় আছে ওদের?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, অরুও আপনাদের সঙ্গে গিয়েছিল নাকি?

কে অরু?

ওই ঘোষ মশায়ের মেয়ে—আপনার গুরুদেবেরও বলা যায়। আমি অরুন্ধতীর কথা বলছি।

রীতিমত উপভোগ্যই হয়েছে সুলোচনার মুখে অধ্যাপক ঘোষের বর্ণনা; অনুপম হেসে উত্তর দিল, হ্যাঁ, তিনিও গিয়েছিলেন।

কেমন দেখলেন তাকে?

বেশ।

বেশ মেয়ে—না?—বলে মুখ টিপে হাসলেন সুলোচনা।

ওই হাসিটুকুর জন্যই। ছিল অন্ধকার, হঠাৎ যেন আলোয় একেবারে আলোময়। অকস্মাৎ সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অনুপম—তরুলতা সেনকে, অরুন্ধতীকে, সুলোচনা বটব্যালকে—একটি যেন চক্রান্তকেও। ছাড়া ছাড়া, খাপছাড়া কয়েকদিনের কয়েকটি ঘটনা হঠাৎ যেন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে একটি গল্প হয়ে উঠল। আর কেবল অপরকে দেখাই তো নয়, হঠাৎ-জ্বলা অত উজ্জ্বল আলোকে নিজেকেও যেন নতুন করে দেখল অনুপম।

সুলোচনার মুখটেপা হাসি দেখে প্রথমে সে অপ্রতিভ বোধ করেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই মৃদু একটা রোমাঞ্চ জাগল কেবল তার মনে নয়, দেহেও।

মনের অগোচরে পাপ নেই ঠিকই। কিন্তু যা পাপ নয়, তার তো থাকতে বাধা নেই! নিজের মুখ নিজে কেউ দেখতে পায় না। আয়নার ভেতর দিয়ে যা দেখা যায় তা তো প্রতিবিম্ব মাত্র—হয় আয়নার দোষে, নয় চোখের দোষে, নয়তো উভয়ের দোষেই সে দেখা নিখুঁত নাও হতে পারে। নিজের মুখখানার মত মনটাকেও আর একজনের চোখ দিয়ে দেখলে দেখাটা ভাল হয়। সেদিন তাই হল অনুপমের—সুলোচনার চোখ দিয়ে নিজেকে একটিবার দেখেই সে বুঝতে পারল যে অরুন্ধতী ঘোষের দিকে তার মনটা ইতিমধ্যেই বেশ অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে।

প্রেমপ্রীতির ব্যাপারে ধরা পড়বার একটা লজ্জা আছেই। সে লজ্জা মধুর। কিন্তু তার নিজের ক্ষেত্রে রোমাঞ্চের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই একটা জ্বালাও অনুভব করল অনুপম।

প্রেমে পড়াতে মানা না হয় নেই, কিন্তু বাধা আছে যে! সেই বাধাটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ বড় হয়ে চোখে পড়ল তার।

মনে পড়ল অনুপমের যে অনেকদিন যাবৎ তার বিয়ের কথা চলছে তার নিজের বাড়িতে। অনেক জায়গাতেই পাত্রী দেখা হয়েছে, দেখেছে সে নিজেও। একটি জায়গায় তো কথাবার্তা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে আছে। বড় ঘরের ডাগর মেয়ে সেটি—বি. এ. পাস করে বিয়ের প্রতীক্ষায় ঘরে বসে আছে। সে মেয়েটির বাবা ভাল দেবে-থোবে বলে অনুপমের মা-বাবার ঝোঁক সেই মেয়েটির দিকেই। আনুষ্ঠানিকভাবে অনুপম নিজেও একদিন তাকে দেখেছিল, দেখে অপছন্দ করে নি; নবদ্বীপে চাকরি নিয়ে আসবার আগে সে তার নিজের মাকে সম্পূর্ণ সম্মতি না জানালেও সহাস্য মৌনতার ভাষায় ওই সম্বন্ধটিই পাকা করতে উৎসাহ দিয়ে এসেছিল। নতুন করে প্রেমে পড়বার পথে সেই ঘটনাটিই যে মস্ত একটি বাধা।

তাই ভেবেই অন্যমনস্ক হয়েছিল অনুপম। সুলোচনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার পর কোন্ দিকে যে সে এগিয়ে চলেছিল সে সম্বন্ধে তার খেয়ালই ছিল না।

পাড়ার মধ্যে গলিগুলো ফাঁকা ফাঁকা—দ্রুতপদে হাঁটতে

বাধা নেই। কোলাহলও তেমন নেই যা তার মনের চিন্তাকে প্রবলভাবে বাধা দেবে। মন্দিরে মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা তখন থেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে গৃহস্থবাড়ি থেকে টুকরো টুকরো দু-চারটি কথা বা ছেলেমেয়ের সুর করে পাঠ্যবই পড়ার যেটুকু আওয়াজ থেকে থেকে বাতাসে ভেসে আসছিল তা শুনেও শোনে নি অনুপম। কিন্তু হঠাৎ একটি নতুন রকমের সুর কানে এল তার।

তেমন মধুর না হলেও মেয়েলী গলা। একটি নয়, অনেকগুলি। তাল-লয়ের তেমন সঙ্গতি না থাকলেও ঐকতান আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। গলা ছেড়ে গান গাইছে বুঝি অনেকগুলি মেয়ে। অনুপম থমকে দাঁড়াতেই গানের ভাষাও বুঝতে পারল সে :

মধুর বে-ণু—বা-জা-ই-য়া
মিলনকুঞ্জে কানু এল গো···

তারপরেই সমবেত কণ্ঠের উলুধ্বনি।

কোথায় এসেছে অনুপম? জায়গাটা ঠিক ঠিক চিনতে পারছিল না সে। দোকানপাট ওখানে নেই। সামনে, বেশ একটু দূরে, মিউনিসিপ্যালিটির থামে কেরোসিনের প্রদীপ একটি মিটমিট করে জলছিল বলেই ও জায়গা-টাকেও শহরের এলাকা বলে মানতে হয়, নইলে শহরের আর কোন ঐশ্বর্য ওখানে নেই। পায়ের নীচে সড়ক ওখানে কাঁচা, কাছাকাছি পাকা বাড়ি একখানাও চোখে পড়ে না। পথের গা ঘেঁষেই বাঁ দিকে একটি ডোবা—যা কোন এককালে পুকুর ছিল। ডান দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে, তারপর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি বড় বড় গাছ। গাছের নীচে পাশাপাশি কখানা বুঝি কুঁড়েঘর। তারই একটিতে আলো জলছে বোঝা যায় এবং বোধ করি সেই ঘরের মধ্যেই আধা-কীর্তন সুরে ওই গান চলছে মেয়েদের। মধুর না হয়েও বড় মিষ্টি সেই গান, অনুপমকে টানল তা।

পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্পষ্ট শুনতে পেল সে :

আমি ঘষিয়া চুয়া আর চন্দন
নেব কটোরা ভরিয়া
আর শ্যাম অঙ্গে চন্দন দিব গো
দিব আমি ছিটাইয়া ছিটাইয়া।—

ঠিকই অনুমান করেছিল অনুপম, যে কুটিরে আলো জলছে, কীর্তনও হচ্ছে সেই ঘরেই। খুপরির মত একটি মাত্র জানলা দিয়েও যতটুকু তার চোখে পড়ল তা দেখে প্রথমে বিস্মিত এবং পরে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল সে।

আলো মানে কেরাসিনের কুপো একটি। তবুও সেই আলোকেই দেখা যায় জীর্ণ ও বিবর্ণ দোলনার মত একটি আসনে ধাতুনির্মিত সুন্দর ঝকঝকে যুগলমূর্তি। আর তাঁর সামনে মেঝেতে পাচ-ছটি নারী প্রত্যেকেই দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে সারি বেঁধে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে আর গাইছে ওই গান। মাথায় কারও কাপড় নেই, বুকে আঁচল অসংবৃত; যে চুল নৃত্যের তালে তালে উড়ছে তা সম্পূর্ণ সাদা না হলেও অধিকাংশই শনের নুড়োর মত। প্রথমেই যে কটি মুখ অনুপমের চোখে পড়ল তা কুৎসিত, শীর্ণ, আমসির মত শুকনো, কিন্তু ভাবে বিহ্বল। সেই ভাবই ফোয়ারার জলের মত উৎসারিত হচ্ছে গানের সুরে, অমার্জিত ভাষা আর ছন্দহীন পদকে সরস করছে এক একটি সুমিষ্ট পাকা ফলের মত।

অনুপম খোলা জানলার কাছে গিয়ে যখন স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে গায়িকারা তখন তাদের গানের প্রথম পদটিতে ফিরে গিয়েছে। সুতরাং যে কথাগুলি আগে শুনতে পায় নি অনুপম এখন সেগুলিও কানে এল তার :

মিলন কুঞ্জে কানু এল গো
মধুর বে-ণু—বা-জা-ই-য়া
সব সখীরা নৃত্য করে গো
করে দুবাহু তুলিয়া
মিলন কুঞ্জে কানু এল গো—

বৃন্দাবনলীলার গান। তার ভাষা ও সুরে লীলার সখীদের ভাব স্মরণ করতে করতে বৃদ্ধা বৈষ্ণবী কজন নিজেরাও যেন ষোড়শী সখী হয়ে গিয়েছে। তাই কি দু বাহু তুলে নৃত্য ওদের অত উদ্দাম হয়ে উঠল? সুর গিয়ে উঠল তারায়?

চোখের দৃষ্টিকে আরও একটু তীক্ষ্ণ করতেই তুলনায় অনেক কাঁচা মুখখানিও এখন দেখতে পেল অনুপম, চেনা মুখ।

দুই গালে সেই দুটি গোলাপ ফুল আরও যেন লাল, আরও যেন বড় হয়ে ফুটেছে ; ঝকঝকে চোখ দুটিতে বুঝি খরতর বিদ্যুদ্দীপ্তি। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে অনুপমের পরিচিত সেই বাঁকামতন হাসিটুকু আজ আর ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ নয়। ভাববিহ্বল মুখের হাসি এখন কোমল, মধুর। নাচের তালে তালে হেলছে দুলছে যে মাথাটি তা আজ আর সাপের ফণা বলে ভ্রম হয় না, মনে হয় যে কোন রসিকা সহচরীই বুঝি বাসরঘরের দোরের ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে বর-বধূর মধুর মিলনের দৃশ্য।

তবু ভুল হবার জো নেই, মেয়েটি সেই মঞ্জরী বৈষ্ণবীই।

ঘরের মধ্যে কানাবাবাজীও রয়েছেন যে! বিগ্রহের দক্ষিণ দিকে জোড়াসনে বসে চোখ বুজে ধ্যান করছেন তিনি।

গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল অনুপম, নাচ দেখে লুব্ধ; অপ্রত্যাশিতভাবে মঞ্জরীকে চিনতে পারবার পর সে হল উত্তেজিত। বাইরে পায়ের অঙ্গুলি কটির উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল বেড়ার বাতা ধরে। চাপ একটু বেশী হতেই ঢিবির মত জায়গাটার মাটি খানিকটা ধসে পড়ল, মাথাটা তার ঠুকে গেল বেড়ার গায়ে আর সেইটুকু ধাক্কাতেই ঘরের মধ্যে বাসন-কোসনের মত কি যেন কতকগুলি জিনিস স্থানচ্যুত হয়ে ঝনঝন শব্দে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

আয়ান ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কুটিলার আকস্মিক আবির্ভাব যেন, কুঞ্জভঙ্গ হল অকালে। ঘরের মধ্যে নাচগান সমে আসবার আগেই থেমে গেল, ধ্যান ভেঙে চমকে চোখ মেললেন কানাবাবাজী; একাধিক সন্ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন হল, কে গা?

লজ্জা পেয়ে বিব্রত হয়ে অনুপম বলল, আমি।

আমি কে?

আমি অনুপম বোস, এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা!

তা বেড়াতে ধাক্কা দাও কেন? চোর না ছ্যাচড়? দেখ তো কুপোটা নিয়ে, কে না কে মিনসে, বলি ও লবঙ্গদি?

ঝাঁপ খুলে আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল ওরা, একজনের পেছনে সকলেই। ধরা পড়বার চেয়ে ছুটে পালানোতে লজ্জা বেশী মনে করেই অনুপম তার অপ্রতিভ মুখে শুকনো মতন একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে এগিয়েই গেল ওদের দিকে। আর আলো তার মুখে পড়তে না পড়তেই মঞ্জরী তাকে চিনল, ওমা, এ যে ছোট গোঁসাই!

বিশ্বাস হয় না কানাবাবাজীর; ঘরের ভেতর থেকে সন্দেহের স্বরেই বলে উঠলেন তিনি, কি বলছিস তুই, কে?

ছোট গোঁসাই গো বাবা, আমাদের ডাক্তার গোঁসাই।

ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তখন তার বিহ্বলতাও কেটে গিয়েছে। সুতরাং মন্দিরার ঝঙ্কারের মতই পরিচিত কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণের সুর।

সন্দেহ কেটে যাবার পর কানাবাবাজীও উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তখন আর অকালে কুঞ্জভঙ্গের ক্ষোভ তাঁর নেই। উঠে দোর পর্যন্ত এগিয়ে এলেন তিনি, গদগদ স্বরে বললেন, তাহলে তো কানুই কুঞ্জে এলেন দেখছি। আসন দে মঞ্জরী, আসন পেতে দে। চন্দনের ফোঁটা দে ডাক্তার বাবার কপালে। ও কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

অনুপমকে নিয়ে আবার একটু উৎসব হয়েছিল, তবে তা চলতে চলতেই বাইরের বুড়ীরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তখন মনে পড়ল অনুপমের। মঞ্জরীর মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ছেলেটি কোথায় দিদি, আপনার নিমাই?

ঘরের একটা কোণ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মঞ্জরী সলজ্জ ভাবে বলল, ওই তো ঘুমোচ্ছে।

ফাঁকা ঘরেও এতক্ষণ যে অনুপমের চোখে পড়ে নি তার কারণ বিগ্রহের সিংহাসনের পেছনে ওই কোণটিতে আলো যায় না। নির্দেশ পাবার পর চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ করতে এখন চোখে পড়ল অনুপমের—মেঝেতে একগাদা খড়; তার উপর কালো কম্বল না কাঁথায় আধখানা শরীর ঢেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ছেলেটি। আশ্চর্য, এত যে নাচগান ঘরের মধ্যে তবু ওর ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি!

বেশ তো ঘুমোচ্ছে!—অনুপম বিস্মিত হয়ে বলল।

মায়ের হাসি হেসে উত্তর দিল মঞ্জরী, ঘুমোবে না? সারাটা দিনই তো টো-টো করে বেড়ায়। ঘরে ফিরে আসে সন্ধ্যার একটু আগে। তখন প্রসাদ চারটি মুখে দিতে না দিতেই ঘুমে চোখ বুজে আসে ওর—বিছানায় পড়লেই পাথর।

হাসল অনুপমও; বলল, তা এত টো-টো করতে দেন কেন ওকে? আজও তো দেখছিলাম—

বলতে বলতে থেমে গেল অনুপম—যে আচরণ সে দেখেছে ছেলেটির তা ভদ্র মোটেই নয়; পুরস্কার যা সে পেয়েছে তা আবার ওই যাকে বলে ইটটি মেরে পাটকেল খাওয়া। সেই প্রথম দিন যেমন দেখেছিল অনুপম তেমনই আর একটি ঘটনা—ঘটেছিল চাকীপাড়ার আধকাঁচা সড়কটি যেখানে রাণীরোডের সঙ্গে মিশেছে তারই কাছাকাছি একটা জায়গায়। ডিসপেন্সারিতে যাবার পথে হঠাৎ তার চোখে পড়তেই ভুরু কুঁচকে থমকে দাঁড়িয়েছিল অনুপম।

বৃদ্ধা বিধবা মহিলা। সঙ্গে তাঁর বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার লাঠিধারী দরোয়ানটি না থাকলেও এক নজরেই তাঁকে খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী বলে চিনতে পারত অনুপমও এমনই আভিজাত্যের ছাপ তাঁর মুখে। আর সেই মুখখানি কেমন যেন চেনা-চেনাও মনে হয়েছিল অনুপমের। গঙ্গাস্নান সেরে গরদ পরে শহরের দিকে ফিরছিলেন মহিলা—লক্ষ্য হয়তো মহাপ্রভুর মন্দির। সেই মহিলাকেই পেছন থেকে ছুটে এসে জাপটে ধরেছিল ওই নিমাই; স্পষ্টই তাকে বলতে শুনেছিল অনুপম, চলে যাচ্ছ যে বুড়ী—আমার পুজো না করেই?

সুন্দর সুদর্শন বালক, নিষ্পাপ মুখশ্রী। কিন্তু খালি গা,খালি পা; গায়ে কাদা, ধুলোয় ধুলোয় জট হয়ে আসছে লম্বা লম্বা মাথার চুল। বৃদ্ধার চোখে সে তো মূর্তিমান অশুচি। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন তিনি, ঠেলে সরিয়ে দিলেন নিমাইকে; তবুও দশাসই চেহারার তাঁর ওই দরোয়ান ছুটে এসে ঠাস করে একটি চড় তার গালে বসিয়ে দিল।

কিন্তু নিমাইয়ের না আসে কান্না, না অনুশোচনা। একটু দূরে সরে গিয়েও বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে কচি কচি দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে লাগল সে।

এতদিনে বেশ চিনেছে অনুপম নিমাইয়ের মুখের ওই হাসি। তাকেও বেশ চিনে রেখেছে ছেলেটি। দু-একবার পথের মাঝে তাকেও অমনই করে জড়িয়ে ধরেছে নিমাই, আবদার করে মিষ্টি কোন জিনিস আদায় করে নিয়েছে অনুপমের কাছ থেকে। মন্দ লাগে না তার সুদর্শন ওই খামখেয়ালী ছেলেটির এ রকম দৌরাত্ম্য। সেদিন তো ওই মহিলার অমন জোয়ান দরোয়ানের বড় এবং কড়া হাতের চড়টা কচি ছেলেটির গালে গিয়ে পড়তেই আঘাতটা অনুপম নিজেও কিছু কিছু যেন অনুভব করেছিল। তবু সেই সঙ্গেই এও মনে হয়েছিল তার যে নিমাইয়ের দুরন্তপনা সত্যই উপভোগ্যতা, এমন কি মার্জনীয়তারও সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

তবে সব ভাবনাই মুখে প্রকাশ করে বলা যায় না—ছেলের সম্বন্ধে বিরূপ ভাবনা ছেলের মাকে তো নিশ্চয়ই নয়। মনের কথাটা ঠোঁটের পেছনেই চাপতে গিয়ে একেবারে চুপ করে গেল অনুপম।

কিন্তু মঞ্জরীর মনে ততক্ষণে কৌতূহল জেগেছে; অনুপম হঠাৎ থেমে গিয়েছে বুঝে একটু বেশী আগ্রহের সঙ্গেই সে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখেছিলেন ছোট গোঁসাই?

অগত্যা অনুপম ঘুরিয়ে বলল কথাটাকে, স্নানের ঘাটে আপনার ছেলে, দিদি, অনেকের কাছে অনেক রকম আবদার করে। সকল মানুষই তো একরকম নয়, সকলের সব সয় না।

বেশ একটু পরে উত্তর দিল মঞ্জরী, তা আমি জানি গোঁসাই—বড্ডই দুষ্ট হয়েছে ছেলেটা। সকলকেই জালিয়ে মারে ও, নিজেও জলে—কত জনের হাতে যে মার খায় ও—

তা তো নিজের চোখেই দেখেছে অনুপম। এখন যেন সাহস পেয়ে বলল, ওকে একটু শাসন করা উচিত।

তা কি পারি? যে পারত সে তো নেই!

চমকে উঠল অনুপম—কে যেন অনেক দূর থেকে বলল ও কথাটা। মঞ্জরীর মুখখানা তার মনে হল যেন থমথম করছে—ইতিমধ্যেই তার চোখ দুটি নিমাইয়ের উপর গিয়ে পড়লেও সে চোখের দৃষ্টি যেন তাকে ছাড়িয়ে ঘরের বেড়া ভেদ করে না জানি কোথায় গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

অনুপম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বললেন ?

তারপর ক্রমাগত বেড়েই চলল তার সেই বিস্ময়।

মঞ্জরী প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু তার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বলল, আমি কি শাসন করতে পারি ছোট গোঁসাই—বাধা দেন ওই আমার বাবা। আদর করে করে উনিই তো ওর মাথা খেয়েছেন। গোল্লায় গেল ছেলেটা।

প্রতিবাদ করলেন কানাবাবাজী, কিন্তু তাঁরও হাসি-হাসি মুখ। বললেন, না রে বেটী, না। দোষ আমার দাদুকে ছুঁতেও পারে না। জানিস নে তুই ? আমাদের মহাপ্রভুও তো ছেলেবেলায় এমনই ছিলেন। এই সুরধুনীর তীরেই মেয়েছেলেদের ত্যক্ত করে কত লীলা করে গিয়েছেন তিনি—চেয়ে চেয়ে পূজো নিয়েছেন, ভোগ খেয়েছেন। তখনও লীলাময়ের দয়া বুঝতেই পারে নি মাগীরা।

মঞ্জরী বলল, শুনলেন তো ছোট গোঁসাই ? এই হল আমার বাবার ধারা। প্রভুর বাল্যলীলা ছেলেটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উনিই ওকে উসকে দিয়েছেন ঘাটে ঘাটে গিয়ে ওইরকম করতে। দাদুর আশকারা যে ছেলে পায় সে কি তার মায়ের কথা শোনে !

হো হো করে হেসে উঠে কানাবাবাজী বললেন, নিমাই কারও কথাই শোনে না রে বেটী, কারও কথাই না। নিজের মনে, নিজের রসে লীলা করে সে। তুই কি বুঝবি তার ? বুঝেছিলেন শ্রীল বৃন্দাবন দাসজী। সেইজন্যই তো বলে গিয়েছেন তিনি—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

আবার হা হা হাসি কানাবাবাজীর। হাসছে মঞ্জরীও, আর যেন কোন ক্ষোভ তার নেই।

উদ্গত একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে গেল অনুপম। ভাবল, কি হবে এদের উপদেশ দিয়ে ? এদের নিজস্ব এক জগতে বাস করে এরা। বেশ আছে সেখানে, সুখে আছে। থাকুক। কবজিতে ঘড়ি দেখল অনুপম, প্রায় দশটা বাজে। এখন তার ওঠা উচিত।

মঞ্জরীও তার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল দেখে অনুপম তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, ছেলেটি তো এখন বেশ ভালই আছে মনে হয়। কিন্তু আপনি—আপনি কেমন আছেন দিদি ?

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল মঞ্জরী : আমি ভালই আছি। খু—ব ভাল।

আমার কিন্তু মনে হয় না তা।

কেন গো ছোট গোঁসাই ?

আমার মনে হচ্ছে যে এখনও জ্বর রয়েছে আপনার গায়ে।

মঞ্জরী কিন্তু হেসে উত্তর দিল : জ্বর এলেই আমি আরও ভাল থাকি ছোট গোঁসাই, আমার ঠাকুর তখন আমার চোখে আরও জলজলে হয়ে ওঠেন।

আর নয়। আর ওখানে দাঁড়াল না অনুপম ; বাইরে যেতে যেতে সে বলল, বেশ আছেন আপনারা।

খু—ব।

মঞ্জরী সায় দিল একেবারে যেন অনুপমের কানের কাছে। সুতরাং ঘরের বাইরে এসেও চমকে ফিরে তাকাল অনুপম। যা সে ভেবেছিল তাই, মঞ্জরীও তার পেছনে পেছনে এসেছে, আর একটু হলেই গায়ে গায়ে লেগে যেত দুজনের।

সেটা ছিল পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা তিথি। চারিদিকে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। তাতে শীতের কুয়াশার মিশাল আছে বলেই আরও মোহময় তা। কানাবাবাজীর কুটিরের সামনে সেই জ্যোৎস্না গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ভেঙে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একফালি তার মঞ্জরীর আধখানা মুখের উপর।

অনুপম বিব্রত হয়ে বলল, আচ্ছা দিদি, আমি এখন চলি।

উত্তর অপ্রত্যাশিত : বা রে, একটা প্রণাম করতে দিন ডাক্তারদাদা, দয়া করে আমার কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো যখন দিলেন।

যেমন কথা তেমনি কাজ, অনুপম বাধা দেবার আগেই প্রণাম সেরে নিয়েছে মঞ্জরী। অনুপম আরও বিব্রত হয়ে বলল, আপনাকে তো দিদি বলে ডাকি আমি। তবে বারবার এত প্রণাম করা কেন ?

বারবার এত দয়া করছেন আপনি, না করে কি পারি !

মুখরা বৈষ্ণবীর উপযুক্ত উত্তরই বটে। কিন্তু গলাটা যে ধরা-ধরা। সচকিত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল অনুপম যে শুনতে ভুল হয় নি তার, মঞ্জরীর মুখে হাসি আর নেই।

তেমনি ধরা গলাতেই সে আবার বলল, দয়া করেছেন বলেই সাহস পাই আমি, সময় থাকতে থাকতে আপনার চরণে একটা নিবেদন রাখতে চাই। রাখব?

আর এক দিনের ঘটনা মনে পড়ল অনুপমের, সেই সোনার গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের সামনে পথে, যা ঘটেছিল। তাহলে সেদিন যা সে অনুমান করেছিল তাই ঠিক নাকি! অত যে হাসি মঞ্জরীর, অত যে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তার নীচে ফল্গুধারার মত কান্না লুকিয়ে আছে না কি!

কথাটা কান্নার মতই করুণ মনে হল অনুপমের; সেদিনের মতই দুলেও উঠল তার বুকের ভেতরটা। মঞ্জরীর দিকে একটু ঝুঁকে সে বলল, বলুন দিদি, নিঃসঙ্কোচে বলুন। যা আমার সাধ্য তা নিশ্চয়ই করব আমি।

একটু দেরি হল বলতে; তবে স্পষ্ট করেই বলল মঞ্জরী: ছেলেটাকে আমি মানুষ করতে পারলাম না গোঁসাইদাদা। আর প্রাণ থাকতে ওকে আমি ছাড়তেও পারব না। তবে বুঝতে পারছি যে, দিন আমার শেষ হয়ে আসছে। সেই জন্যই আপনাকে বলি, আমি চোখ বুজলে আমার নিমাইয়ের একটা গতি যদি করতে পারেন তবে নরকভোগেও সুখ পাব আমি।

মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল অনুপম; তবু অনুরোধটি শোনবার পর থমকে দাঁড়াতে হল তাকে; এ তো সোজা দায়িত্ব নয়!

কিন্তু মঞ্জরী বড় আশায় বুক বেঁধেছে; অনুপমের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এসে সে আবার বলল, চুপ করে রইলেন যে গোঁসাই? একটা আশ্রম, একটা আশ্রয় জুটবে না আমার খোকাটার?

ঢোক গিলল অনুপম, একবার নয়, দুবার। তারপর সে বলল, আমি চেষ্টা করব দিদি, খুবই চেষ্টা করব।

(৬)

তাহলে নিজস্ব এক মধুময় জগতে বাস করে না মঞ্জরী, বেশ নেই সে, সত্যিই সুখে নেই! যতই নাচগান করুক, যতই রসের কথা, ভাবের কথা বলুক না কেন সে, তারও মনের তলায় তাহলে দুঃখ ও দুর্ভাবনার অন্ত নেই! পেটের ছেলেটার ভবিষ্যতের ভাবনা যক্ষ্মারোগের বীজাণুগুলির চেয়েও অধিকতর নিষ্ঠুর দংশনে তার বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে।

সে রাত্রে বাসায় ফেরবার পর বারবার তাই ভেবেছিল অনুপম।

যাকে সোনার মনে করেছিল সে তাহলে তা গিলটি-করা গয়না? আর সে গিলটিও ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে।

অথবা দোষ তার নিজের চোখেরই, বিজ্ঞানের ছাত্র এবং পেশাদার ডাক্তার হয়েও এতদিন বুঝি কল্পনার অঞ্জন সে ঘন করে মাখিয়ে রেখেছিল তার চোখ দুটিতে। সে অঞ্জন ওই মঞ্জরীর চোখের জলেই ধুয়ে গিয়েছে।

সব মঞ্জরীরই ওই এক দশা। সাদা চোখে দেখলে বোষ্টম-বোষ্টমীদের দারিদ্র্য আর দুঃখই বেশী করে চোখে পড়ে। মাধুকরীতে মধু আর তেমন জোটে না আজকাল; রোগে তাদের চিকিৎসা হয় না। হাড়জিরজিরে দেহ, কোটরগত চোখ, তোবড়ানো গাল, পোড়া কাঠের মত হাত-পা অতঃপর বড় বেশী চোখে পড়ছিল অনুপমের। অমন যে নারীর যৌবন তাও বোষ্টমীর দেহে স্থূল মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। মূর্তিমান দারিদ্র্য যেন এক-একজন, আত্মবঞ্চনার প্রতিমূর্তি। ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ ওদের নিরবচ্ছিন্ন বলেই বুঝি ধর্মানুশীলনে অত সহজে চোখে জল আসে ওদের।

ব্যতিক্রম অনুপম দেখেছিল একা কৃষ্ণদাস বাবাজীর মধ্যে—যেন একেবারে না-চাওয়া ও অনেক-পাওয়ার হরগৌরী মিলন তাঁর কৌপীনবন্ত শক্ত দেহ ও প্রসন্ন মুখের অনির্বাণ হাসির মধ্যে। অথচ সেই কৃষ্ণদাস বাবাজীরও এ কী দুঃখ তাকে দেখতে হল!

প্রকৃতির প্রতিশোধ, না পরিহাস? নিষ্ঠুর, না উদার?

খবর পেয়েই ওই প্রশ্ন মনে জাগল অনুপমের, যে তাকে খবর ও 'কল' দিতে এসেছে সে যে মঞ্জরী বৈষ্ণবী!

প্রকৃতি দর্শন ও প্রকৃতি সম্ভাষণ সর্বথা পরিত্যাজ্য যে কঠোরপ্রকৃতি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর, দূত না হয়ে একজন দূতী কেন বাণী বহন করছে তাঁর?

মঞ্জরীর উত্তর শুনে আরও বিহ্বল হল অনুপম।

আমার মুখ তো দেখবেন না বাবাজীমশায়, আমি যে মেয়েছেলে। একবার আমি তাঁকে ছুঁয়েছি বলে বারবার ছুঁয়ে তাঁর ধর্ম কেন নষ্ট করব? তাই বাবাকেই তাঁর কাছে বসিয়ে রেখে আমি ছুটে এসেছি আপনাকে নিয়ে যাব বলে।

কিন্তু হয়েছে কি কৃষ্ণদাসবাবাজীর?

তা তো আমরা বুঝি নে ছোট গোঁসাই। দেখছি যে জ্ঞান নেই, আবার আছেও; ভাল করে কথা বলতে পারেন না, আবার মার-মার কাট-কাটও করেন; নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকেন কিছুক্ষণ; আবার দাঁত বের করে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়েও ওঠেন।

তা নিজের আশ্রম ছেড়ে আপনাদের কুটিরে গেলেন কেন তিনি?

আমার ঘরে তো তিনি যান নি গোঁসাই।

তবে?

আমার আখড়ার সামনেই পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন বাবাজী। রোজই তো শেষরাতে উঠে টহল দিয়ে ফেরেন তিনি, আজও ঘুরে ঘুরে তাই করছিলেন বুঝি। তারপর ঠাকুরের কি যে ইচ্ছা হল, বাবাজী আমাদের ওই আখড়ার কাছে এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে উঠে বাইরে গিয়েছিলাম আমি। তারপর চোখে দেখে হাত-পা গুটিয়ে থাকি কেমন করে?

অত কথা শোনবার পরেও অনুপমের কাছে ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছে সব, কৃষ্ণদাসবাবাজীর রোগটা আন্দাজ করতে পারছে না সে। তা ছাড়া ওই ভোরবেলায় রুগী দেখতে যেতে তার নিজের দেহটাই কেমন যেন আপত্তি করছিল। সুতরাং চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মঞ্জরীকে আবার সে জিজ্ঞাসা করল, কাছাকাছি আরও তো ডাক্তার রয়েছেন। তা সত্ত্বেও এত দূরে আমার কাছে কেন এলেন দিদি?

টাকা না দিলে ওঁরা আসেন না ছোট গোঁসাই, বামুন বোষ্টুমে সকলের কি ভক্তি থাকে!

কথার পিঠেই নিঃসঙ্কোচ উত্তর মঞ্জরীর। তবে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নেবার পর অনুপম হেসে জিজ্ঞাসা করল, আমার বুঝি আছে?

নেই?

বলে এমন ভাবে তার মুখের দিকে তাকাল মঞ্জরী যে অনুপমের মুখে আর কথাই ফুটল না। দাড়ি না কামিয়েই রওনা হল সে।

তখনও কানাবাবাজীর কুঁড়েঘরেই মাটির মেঝেতে শুয়ে মুখ দিয়ে লাল ছাড়ছেন কৃষ্ণদাস বাবাজী; কখনও ছটফট করছেন, কখনও একেবারে নিস্তেজ; চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। তবে মঞ্জরীর মুখে শুনে যেমন মনে হয়েছিল অনুপমের তেমন অসহায় আর তিনি নন। ইতিমধ্যে ভক্তেরা কয়েকজন ওখানে উপস্থিত হয়েছেন, খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষও।

আগে কারণ ছিল একটি। সেদিন সুলোচনার কাছে অরুন্ধতীর প্রসঙ্গে অমন অপ্রতিভ হবার পর থেকে আরও একটি কারণে অধ্যাপককে এড়িয়ে চলছিল অনুপম। সুতরাং কৃষ্ণদাসবাবাজীর রোগশয্যার পার্শ্বে তাঁকে উপস্থিত দেখে লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করল সে।

অধ্যাপক কিন্তু তাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন; বললেন, তুমি যখন এসেছ তখন আর ভয় নেই আমার। এখন দেখ তো বাবাজীকে, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি নে!

উত্তর না দিয়ে নিজের কাজেই মন দিল অনুপম।

কিন্তু অধ্যাপক অসহিষ্ণু; ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হবার আগেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি বুঝছ বাবা?

পরীক্ষা শেষ করে তবে উত্তর দিল অনুপম, কিন্তু তা ঠিক উত্তর নয়। গম্ভীর স্বরে সে বলল, ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ব্যাপারটা মনে হয় খুব শক্ত।

অ্যাঁ!

যেন আঁতকে উঠে বললেন অধ্যাপক: শক্ত ব্যারাম! দেবতুল্য মানুষ যিনি, পথের কুকুরের মধ্যেও যিনি কৃষ্ণ-দর্শন করেন, তাঁর হবে শক্ত ব্যারাম?

শুনেই হেসে ফেলেছিল অনুপম, ব্যঙ্গের হাসি তা। ওই হাসি গোপন করবার জন্যই আবার রুগীর দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুপম মৃদুস্বরে বলল, ব্যারামটা তারই ফল হতে পারে মাস্টারমশায়। কুকুর নিয়ে অনেক তো ঘাঁটাঘাঁটি উনি করেছেন,—হতে পারে যে কোনদিন

কোন পাগলা কুকুর ওঁকে দংশন করেছিল। লক্ষণ দেখে আমার মনে হচ্ছে যে রোগটা হাইড্রোফোবিয়া।

তাহলে তো ভাল করে চিকিৎসা করতে হয়।

আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। কিন্তু ভাল চিকিৎসা দূরে থাক কোন চিকিৎসাই আমি করতে পারব না।

কেন?

এখানে না আছে ল্যাবরেটরি, না ওষুধ, না শুশ্রূষা। চিকিৎসা যদি করাতে হয় তো বাবাজীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কলকাতায় হলেই ভাল হয়—অন্ততঃ কৃষ্ণনগর।

যেন এমন একটা কথা জীবনে শোনে নি-কেউ। পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে সকলেই। অধ্যাপকও স্তম্ভিত; অনুপম দ্বিতীয়বার তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই অসহায়ের মত তিনি বললেন, হাসপাতালে কি যেতে চাইবেন উনি—ওঁর যে নানা আচার-বিচার আছে।

তাহলে আচার নিয়েই উনি থাকুন, আমি এখন চলি।

চেষ্টা করেও বিরক্তি গোপন করতে পারে নি অনুপম। কিন্তু পরে ডিসপেনসারিতে কাজ করতে করতে ওই কৃষ্ণদাসবাবাজীর কথাই বারবার তার মনে পড়তে লাগল।

অদ্ভুত লোকটি। সংসার করেন না, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন না, মানুষ ছেড়ে দিনরাত মেতে আছেন বিগ্রহ নিয়ে—অতিমানুষ না অমানুষ তা ঠিক করতে পারে না অনুপম। তাহলেও এখন তো তিনি রুগ্ন, তার নিজেরই রুগী তিনি। শেষ পর্যন্ত কি যে তাঁর হল ভেবে সে উদ্বেগ বোধ করছিল। সুতরাং ডিসপেনসারির কাজ শেষ করবার পর বাড়ির দিকে না গিয়ে সে উলটো পথ ধরল আবার ওই কানা-বাবাজীর আখড়ার দিকেই।

সেখানে তখন আর ভিড় নেই; বাইরে দোরের কাছে মঞ্জরী গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। দূর থেকে দেখে আরও উদ্বিগ্ন হয়েছিল অনুপম। তবে খবর পেয়ে আশ্বস্ত হল সে।

তখন হাসপাতালে যাবার কথা শুনে কৃষ্ণদাসবাবাজী ওই অবস্থাতেও ললাটে করাঘাত করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত আপদ্ধর্মের আশ্রয় পেয়েছেন তিনি। ভক্তেরা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছে।

বলতে বলতে চোখের জল ফেলছিল মঞ্জরী; কিন্তু অনুপম শুনে খুশী হয়ে বলল, ভালই হয়েছে। হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসা হবে বাবাজীর; হলে তিনি ভালও হতে পারেন।

কানাবাবাজীর ভাব মঞ্জরীর বিপরীত। অনুপমের গলার আওয়াজ শুনে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি; অনুপমকে চিনতে পারবার পর হয়ে উঠলেন মুখর।

ওই কৃষ্ণদাসবাবাজীর কথাই বলছেন কানাবাবাজী। অনুপম বুঝতে পারে না যে তিনি তাঁর গুণকীর্তন করছেন, না দোষ—এমনি এলোমেলো সব কথা। কিন্তু হঠাৎ কান খাড়া হল অনুপমের।

চোখ বুজে কানাবাবাজী বললেন, আমার ঠাকুরের লীলা কি কেউ বুঝতে পারে ডাক্তারবাবা? শেষে এই মঞ্জরীর হাত দিয়েই ঠাকুর বাঁচিয়ে দিলেন কৃষ্ণদাস-বাবাজীকে।

মঞ্জরী কিন্তু বিরক্ত হয়ে বলল, ও আবার কি বলছ তুমি?

বলছি ঠাকুর নিজে যা দেখালেন তাই।

বলতে বলতে হেসে ফেললেন কানাবাবাজী। তারপর হাতের একতারাটি উপর দিকে উঠিয়ে তাতে একটি ঝঙ্কার তুলে অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, অথচ এই মঞ্জরীরই মুখদর্শন করেন নি কৃষ্ণদাসবাবাজী, আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা। তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত ছুটে গিয়ে এই মেয়েটা আশ্রয়ের জন্য ওর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বলে ত্রিরাত্রি উপোস করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন উনি।

অনুপম কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে কবে?

উত্তর হল: সে কি আজকের কথা ডাক্তারবাবা, তখনও আমার দাদু ওর পেটে।

প্রশ্নের উত্তর হলেও সম্পূর্ণ নয় তা, বরং জিজ্ঞাসার ইন্ধন। চোখের দৃষ্টিতে উদগ্র কৌতূহল নিয়েই অনুপম তারপর মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু তার ভাব দেখে নিজেকে সংযত করল সে।

হঠাৎ যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মঞ্জরী ; কানা-বাবাজীর মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলল, তুমি চুপ কর তো বাবা, কি সব যা-তা বলছ তুমি ?

বাবাজী একটু নরম হয়ে বললেন, যা-তা আবার কোথায় বললাম, সত্যি কথাই তো।

সত্যি হলেই তা হাটেবাজারে বলে বেড়াতে হয় নাকি ? তুমি চুপ কর।

ফিরে অনুপমের মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে মঞ্জরী আবার বলল, বাবার কি মাথার কিছু ঠিক আছে ছোট গোঁসাই ! ওঁর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না আপনি।

অবিশ্বাস করবার মত কোন কথা বলেন নি কানা-বাবাজী। কিন্তু মনের ওই ভাবটা মুখে আর প্রকাশ করে বলল না অনুপম, যে কৌতূহল তার মনে জেগেছিল তা দমন করল সে। ততক্ষণে মোটামুটি বুঝে নিয়েছে সে যে স্বীয় জীবনের অতীতকে তার সামনে উদ্ঘাটিত করতে চায় না মঞ্জরী। অসঙ্গত নয় ওই অনিচ্ছা। হয়তো কলঙ্কের ইতিহাস, নয়তো নিদারুণ বেদনার। কোন মেয়ে চায় তা প্রকাশ করতে ? অন্যায় হবে অনুপমের পক্ষে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা জানতে চাওয়া, অশোভন তো নিশ্চয়ই। আর তা জানবার তার দরকারই বা কি ! এমনিতেই এই মঞ্জরী বৈষ্ণবী যতটুকু তাকে জড়িয়েছে তা ভয় পাবার মত না হলেও ভাবনার নিশ্চয়ই। সুতরাং নিজেকে সামলে নিয়ে অনুপম বলল, আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।

কথার পিঠেই মঞ্জরীও বলল, তাই যান ছোট গোঁসাই। বেলা তো কম হয় নি—তাতে আবার আমারই জন্য সকালে আজ আপনার খাওয়াও হয় নি।

অনুপমের খাওয়া হয় নি বলে মঞ্জরী উদ্বিগ্ন হয়েছে, না ওখানে সে রয়েছে বলে বিরক্ত ? তা ঠিক বুঝতে না পারলেও কথা আর না বাড়িয়ে যাওয়ারই উপক্রম করেছিল অনুপম। কিন্তু রিক্শাতে একটা পা তুলে দিয়েও তখনই সেটা নামিয়ে নিল সে। যেমন বিস্মিত তেমনি মুগ্ধ অনুপম—হঠাৎ চোখে পড়েছে যে !

আজ আর ধূলিধূসর নয় তার দেহ। ধোয়ামোছা গৌরবর্ণ দেখাচ্ছে কাঁচা সোনার মত। গালে এবং কপালে চন্দন না তিলকের ছাপ ; চূড়ো করে বাঁধা চুলে আবার একছড়া মালা জড়ানো। জোড়া দুই হাতে তার কলাপাতার বড় একটা ঠোঙা, বেশ পরিপাটি করে বাঁধা। অনুপমের চোখ গিয়ে পড়তেই সেই পরিচিত হাসি ফুটল তার মুখে।

মঞ্জরীর ছেলে নিমাই।

নিজের অজ্ঞাতেই অনুপম বলে ফেলল, বাঃ, বেশ তো !

প্রস্ফুটিত একটি চাঁপাফুলের মতই উৎফুল্ল নিমাই, সে তার হাতের ঠোঙাটি আরও একটু উঁচুতে তুলে বলল, দেখ ডাক্তারদাদু, কত প্রসাদ।

কে দিলে ?

ঠাকুমা।

অনুপম তখন ফিরে তাকাল মঞ্জরীর মুখের দিকে, দুই চোখে তার নতুন এক জিজ্ঞাসা।

ছেলের মত মঞ্জরীও উৎফুল্ল। কিন্তু অনুপমের জিজ্ঞাসা বুঝে বুঝি লজ্জা পেল সে। চোখ নামিয়ে সে উত্তর দিল, কি জানি। কার সঙ্গে যে ভাব করেছে ছেলেটা, আজ দুদিন যাবৎ দেখছি এই এত এত প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরছে।

হাসি গোপন করবার চেষ্টা আছে মঞ্জরীর, কিন্তু সার্থক হয় নি তা। সেই জন্যই বুঝি আরও মিষ্টি লাগছে তার হাসি।

তবে তাকে নয়, নিমাইকেই জিজ্ঞাসা করল অনুপম, কে ঠাকুমা ? কোথায় থাকেন তিনি ?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নাড়ল নিমাই—তা সে বলবে না, বলতে নেই।

রহস্যসৃষ্টি তার সার্থক বুঝেই অপার আনন্দ নিমাইয়ের। ঠোঁট চাপলে কি হবে, তার চোখ দুটি থেকে হাসি ঠিকরে পড়ছে।

রিক্শাতে চাপবার আগে অনুপম পরম স্নেহে গাল দুটি টিপে দিল নিমাইয়ের।

[ক্রমশঃ]

পুনর্মূষিকো ভব

শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ

গান্ধীজী ১৯৪৭ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর স্বদেশবাসীকে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে ইংরেজী ভাষাকে যদি দ্রুত স্থানচ্যুত ও অপসারিত না করা যায় তবে উহার চিরস্থায়ী ও মৌরুসী হইয়া থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। গান্ধীজীর এই উদ্বিগ্নতার কারণ তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না। তিনি বলেন, "আমি এই (ইংরেজী) ভাষাকে ভুলিতে ইচ্ছা করি না অথবা সকল ভারতবাসী ইহা ভুলিয়া যাউক বা পরিত্যাগ করুক তাহাও চাহি না। আমি এতদিন জোরের সহিত ইহাই বলিতে চাহিয়াছি যে, ইংরেজী যেন তাহার ন্যায্য অধিকারের বেশি না পায়। ইহা কখনও ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। এরূপ চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের স্কন্ধে কঠিন বোঝা চাপাইয়াছি। আমার যতদূর জানা আছে, এই প্রকার শোচনীয় ঘটনা শুধু ভারতবর্ষেই ঘটিয়াছে। ইংরেজী ভাষার এই দাসত্ব বহু বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। আমার দুঃখ এই যে আমরা ইহা বুঝিতে পারি না, ইহার জন্য লজ্জা অনুভব করি না বা অনুতাপ করি না।"

যাই গান্ধীজী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন অমনই হঠাৎ বিপ্লব—দেশের কথা দেশের নিজস্ব ভাষায় বলা—শুরু হইয়া গেল। তিনি ১৯২০-২১ সনে সমগ্র দেশে সফর করেন এবং শত শত বক্তৃতা দেন, কিন্তু সকল স্থানেই তিনি দেশীয় ভাষা ব্যবহার করেন। জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে আসিবার জন্য ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানীকে তিনি সর্বোপযোগী বাহন বলিয়া গ্রহণ করেন। বিনোবাজীও তাঁহার ভারত পর্যটনে বিভিন্ন বৈঠকে, অধিবেশনে, ভারতের সর্বত্র বার্তালাপ ও বক্তৃতা দেশীয় ভাষা হিন্দীতেই করেন।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী ও বিনোবাজীকে ভুল করিলে চলিবে না। তাঁহাদের কাহারও মাতৃভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী নয়—একজনের মাতৃভাষা গুজরাতি আর একজনের মারাঠী। গান্ধীজী তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হরিজন' ইংরেজীতেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ইংরেজী ভাষার বৈশিষ্ট্য ইংরেজী-ভাষাভাষী দেশের অধিবাসীদের মুগ্ধ করিয়াছে। বিনোবাজী তো ভাষা-প্রেমিক। তিনি একাধিক য়ুরোপীয় ভাষা সমেত পনেরো-ষোলটি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। হাইস্কুলে তাঁহার দ্বিতীয় ভাষা ছিল ফরাসী, সংস্কৃত নহে। ইংরেজী তো ছিলই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও তাদৃশ জননেতাদের দৃষ্টান্ত ও সতর্কবাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে আমরা যেন প্রস্তুত নই। পক্ষান্তরে, আমাদের কোন কোন উচ্চপদস্থ উপরওয়ালা, শিল্পপতি ও সংবাদপত্র মহল হইতে নেতিমূলক কর্মপন্থা ও প্রতিবাদ শুরু হইয়াছে, তাঁহারা ইংরেজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেই হিসাবে চিরস্থায়ী আসনের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

মাদ্রাজে সাহিত্য আকাদেমীতে ভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বাধীন ভারতে ইংরেজীর স্থান সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খুবই চিন্তনীয়। তাঁহার কথামত মনে হয় আমাদের ইংরেজী ভাষা ছাড়া চলিবে না। তিনি বলিয়াছেন, যে সকল স্থান হইতে ইংরেজী ভাষাকে বিদায় দেওয়া হইতেছে বা বিদায় দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল স্থানে ইংরেজী ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এইরূপ উক্তি ইংরেজীর মোহ কাটাইবার পরিবর্তে বরং মোহগ্রস্ত হইবারই সহায়ক।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এইরূপ প্রতিক্রিয়া যে কার্যে পরিণত হয় নাই তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই সেইদিন অবধি যে বরদারাজ্যে যাবতীয় শাসনকার্য গুজরাতি ভাষায় চালিত হইয়া আসিয়াছিল, বোম্বাইয়ে অন্তর্ভুক্তির পর সেখানকার কার্যে বর্তমান 'স্বরাজ' চালকদের নির্দেশানুযায়ী ইংরেজী ভাষা চালু হইয়াছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যেও তথাকার রাজকার্যে আবহমান প্রচলিত বাংলা ভাষা বাতিল করিয়া ইংরেজীর

স্থান করিবার হুকুম জারী হইয়াছে। ফলে ইংরেজী-অজানা গ্রাম্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ অনুভূতি কী বিচিত্র রূপ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইংরেজীর প্রভাব ও মোহ কি করিয়া কাটিবে? এই অবস্থার অবসান করা তো স্বরাজ সংগ্রামের একটা বড় দিক ছিল। তাহা না হইলে স্বাধীনতার অর্থই বদলাইতে হয়। দাসত্বের জীবনে গোলাম প্রভুর জীবনযাত্রার ধরনের অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রভুর বেশভূষা, প্রভুর ভাষা, প্রভুর ভোগবিলাস প্রভৃতি অনেক কিছু অনুকরণ করিতে করিতে মনের অবস্থা এরূপ হইয়া যায় যে অন্য কিছুই তাহার পছন্দ হয় না।

ইংরেজী ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুনীতিবাবু যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হইল ভারতীয় মানসের আধুনিকীকরণ ও জ্ঞানক্ষেত্রে অগ্রগতি। অথচ ইংরেজী ভাষার সাহায্য না লইয়া রুশিয়ার অসাধারণ বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পঁচিশ বৎসরের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশে এই উন্নতি সম্ভব হয় নাই। রুশিয়া ভারতের মত বিপুল ও জনবহুল। সেখানকার ভাষার সংখ্যা ভারতের মতই বিভ্রান্তিকর। "উহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ১৮০টি ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করা সকল ছাত্রের পক্ষেই বাধ্যতামূলক। ইহার ফল বিস্ময়কর হইয়াছে। প্রাচীন রুশিয়ার কৃষকরা এবং রুশ বাদে অন্য সকলের বেশির ভাগই নিরক্ষর ছিল। এখন বেশির ভাগ তাহাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পাইয়াছে এবং তাহারা রুশ ভাষায় বলিতে ও পড়িতে পারে।" (হরিজন পত্রিকা, ৭ই আগস্ট, ১৯৪৯)

জাপানও অল্পদিনের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া জগতের যে-কোন জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষা তাহারা সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিল মাতৃভাষায়, যে ভাষায় জন গান্থারের বিবরণানুযায়ী ৩০০০ লিপি শিখিতে একটি জাপানী শিশুর দশ-বারো বৎসর বয়স হইয়া যায় এবং ঠিকভাবে জাপানী সংবাদপত্র পড়িতে হইলে অন্ততঃ ০০০ লিপি জানা দরকার। তাহাতে তো তাহাদের উন্নতির অসুবিধা হয় নাই।

সুনীতিবাবু তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন, "ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে ইংরেজী ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ব্রিটিশ শাসনকালে অর্জিত জাতীয় ঐক্য রক্ষা করিতে হইবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল ইংরেজীই ঐক্য বজায় রাখিতে পারে।" ইংরেজী ভাষার ন্যায় একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা যথাযথ শিখিতে হয় বলিয়া এক ভাষা শিক্ষাতেই যথেষ্ট সময় যায়, আবার সেই বিজাতীয় ভাষার ভিতর দিয়া এখন পর্যন্ত অধিকাংশ বিষয় শিখিতে হয় বলিয়া ইহাকে ইংরেজী ভাষার অত্যাচার বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং ফলস্বরূপ, জ্ঞাতব্য বিষয়ে ভাসা-ভাসা জ্ঞানলাভ ব্যতীত আর কিছু সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, ভালোমত ইংরেজী শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভাল ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাহাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না? এই অবস্থায় "ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে ইংরেজী ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত" করিবার নির্দেশের অর্থ কি এদেশবাসীকে পূর্ণমাত্রায় পঙ্গু করারই নামান্তর হইবে না?

"ব্রিটিশ শাসনকালে অর্জিত জাতীয় ঐক্যে"র কথা তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলেও বলিতে হয় যে ওই ঐক্য ছিল মুষ্টিমেয় লোকের, যাহারা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে, জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে নাই। এই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেও অধিকাংশেরই শিক্ষাদীক্ষা তো ছিল পুরাতন প্রভুদের সেবার জন্য। তখন কোন কোন রাজনৈতিক নেতা ইংরেজ শাসনের সংস্কার বা সংশোধনের জন্য আন্দোলন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহার বদলে দেশ শাসনের কথা চিন্তা করিতে ভরসা পান নাই। তাঁহারা মনে করিতেন ইংরেজ শাসনের অবসানে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের স্বরাজ ও ইংরেজ শাসনের অবসান এমন কোন দুর্ঘটনা ডাকিয়া আনে নাই। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইংরেজী ভাষার অবসানেও কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে না এবং যাঁহারা মনে করেন ইংরেজী ভাষা গেলে আমাদের অনেক ক্ষতি হইবে, তাঁহাদের ভয়ও অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

সুনীতিবাবু বলিয়াছেন, ভারতের কোন একটি ভাষা স্বাধীন ভারতের ইংরেজীর স্থান যথোপযুক্তভাবে পূরণ করিতে পারে না। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে অব্যবহারের জন্যই আমাদের ভাষার যথাযোগ্য উন্নতি হয় নাই। তাহার জন্য আমাদের ভাষাগুলি দায়ী নয়। এইরূপ ঘটার কারণ হইল এই যে কতকগুলি ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং আমাদের ভাষাগুলির পক্ষে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলতঃ আমাদের ভাষা সেই সব ক্ষেত্রে শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

তারপর, আমরা ইংরেজীতে চিন্তা করিতে, কথা বলিতে অভ্যস্ত। সেইজন্য আমাদের সাধারণ কাজকর্মও যখন নিজেদের ভাষায় চালাইতে অক্ষম হই, তখন প্রায়ই নিজেদের অক্ষমতা আমাদের ভাষার উপর চাপাইয়া দিই। লোকের ব্যবহারেই ভাষার শক্তি। কোন জাতিই স্বীয় শক্তি ভিন্ন সমৃদ্ধশালী হইতে পারে না। কাজেই আমাদের পক্ষে যতশীঘ্র সম্ভব ইংরেজীর পরিবর্তে আমাদের নিজেদের ভাষার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। ইহাতে যদি কোন বাধা থাকে তবে তাহা আমাদের অভ্যাসেরই বাধা। আমাদের ভারতীয় ভাষার বিকাশে শুধু অভ্যাসের বাধাই বাধা নয়, কায়েমী স্বার্থ, কাপট্য এবং মানসিক জড়তার ভাবও সুস্পষ্ট।

সুনীতিবাবু বলিয়াছেন, ভারতের সকল আধুনিক ভাষাকেই সমান সুযোগ দিতে হইবে। কেবল একটি ভাষা সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব চলিবে না। ইহা তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে সময় সময় এইরূপ অভিযোগ উত্থিত হয়। তবে যে রাষ্ট্রভাষা ঐক্যের সহায়ক সেই রাষ্ট্রভাষা লইয়া তিক্ততার সৃষ্টি খুবই পীড়াদায়ক। বিনোবা, মশরুওয়ালা, কাকা কালেলকার প্রমুখ অহিন্দীভাষী সুধী ব্যক্তিদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যদিও রাষ্ট্রভাষার নাম হিন্দী এবং উহার মৌলিক রূপও হিন্দী তাহা হইলেও ইহার গঠন-ভঙ্গীর পরিবর্তন হইতে থাকিবে। এমন হইবে যে ইহা হিন্দীভাষী প্রদেশসমূহের বর্তমান হিন্দী আর থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় হিন্দী এবং প্রাদেশিক হিন্দী বরং পৃথকই হইবে। প্রত্যেক প্রদেশই রাষ্ট্রভাষার উপর আপন আপন ছাপ ফেলিবে। এইভাবেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশের যোগ্যতা অর্জিত হইতে থাকিবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সমস্যাটিকে বিচার না করিয়া শুধুমাত্র নেতিবাদী মনোভাব অনুসরণ করিলে আমরা পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

আজ রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে কিছু লোক ভিন্ন মত পোষণ করে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু মতভেদ হেতু ইংরেজী ভাষাকে আমাদের ভাষার সহিত জড়াইয়া রাখার অভিমত অদ্ভুত ও জাতীয়তাবিরোধী বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ-ভারতীয়দের কোন কোন মহল ইংরেজীকে অনিশ্চিতকালের জন্য চালু রাখিবার দাবি করিয়াছে। তাহাদের নিগূঢ় স্বার্থ আছে। কাজেই আমাদের মধ্যে যাঁহারা দক্ষিণ-ভারতের কথার উপর জোর দিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মস্ত ভুল করিতেছেন না, তাহা নয়। ইংরেজীর মাধ্যমে তো দক্ষিণ-ভারতের পদস্থ কর্মচারী, সাংবাদিক এবং স্টেনোটাইপিস্টগণ ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। হিন্দীর মাধ্যমেও তাঁহারা এরূপ করিবেন। একজন মারাঠী, বাঙালী বা গুজরাতির পক্ষে হিন্দীভাষা শিক্ষা করা যত সহজ তাঁহাদের পক্ষে তত সহজ নয়, বরং অতি কষ্টসাধ্য। কাজেই গান্ধীজী দক্ষিণ-ভারতে হিন্দী প্রচারের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফল দক্ষিণ-ভারতবাসীরা আজ নয়, কাল অবশ্য ভোগ করিবে। অতএব তাঁহারা যে হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিয়া হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাল চালাইতেছেন না, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত ভাষার দক্ষিণ-ভারতীয় উচ্চারণ পদ্ধতি অধিকতর নিখুঁত বলিয়া স্বীকৃত। অদূর ভবিষ্যতে যখন তাঁহারা হিন্দী ভাষায় পোক্ত হইয়া উঠিবেন তখন তাঁহারাই নিজেদের বর্তমান স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য হিন্দীভাষা-মুখর হইয়া উঠিবেন। তখন আমরা দাঁড়াইব কোথায়?

সুনীতিবাবুর মতে "নিজ মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া ভারতীয় ছাত্ররা যদি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে তাহা হইলে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।" ইংরেজী অনুরাগীদের পক্ষে ইহা স্বর্ণ সুযোগ হইয়া দাঁড়ায়। এই সুযোগ লইয়া তাহারা ইংরেজী বজায় রাখিবার জন্য অজুহাত দেখাইতে কসুর করিবে না। ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার কথা যেভাবেই সমর্থন করার চেষ্টা হউক না কেন ইহা সুস্পষ্ট যে আমরা ইংরেজীর দারুণ প্রভাব এখনও ছাড়িতে পারিতেছি না এবং এই মোহ না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের ভাষা কাঙালই থাকিবে। বিদেশী বাহনের সর্বনাশা ফল সম্বন্ধে গান্ধীজীর সতর্কবাণী পাঠকগণের অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশী ভাষার সাহায্যে প্রদত্ত শিক্ষা জাতীয় শক্তি শুষিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্রগণের আয়ু কমিয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে তাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে। শিক্ষা অকারণে ব্যয়বহুল হইয়া উঠিয়াছে। স্যাডলার, উড, অ্যাবট প্রভৃতি বিখ্যাত বিদেশী শিক্ষাবিদগণও যে বিদেশী বাহনের সর্বনাশা ফল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা আমাদের শিক্ষাব্রতীগণের অজানা নয়।

তারপর, আমাদের যে কতিপয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ব্যবসায়-খ্যাতি বা পারদর্শিতা আছে, তাঁহারা বহুদিন হইতে নিজস্ব ভাষায় কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বৃটিশ আমলেও তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইদানীং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী প্রীতিতে অদ্ভুতভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উদ্দেশ্যে রাজপুতানায় অক্সফোর্ড প্যাটার্নে সুবৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও উহার জন্য বিশেষজ্ঞ ইংরেজ আমদানির জন্য কোটি টাকার পরিকল্পনার ত্রুটি হয় নাই। পক্ষান্তরে, ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া কেবলমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নাই,

তাহাদের সাম্রাজ্যলোলুপ সাংস্কৃতিক প্রভাব দ্বারা আমাদিগকে প্রায় সত্তাহারা করিয়া ফেলিয়াছে। এই সাংস্কৃতিক বিজয়ের মধ্যে ইংরেজ বণিকের নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টির উপর তাহাদের নিজেদের যে অসীম বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় রহিয়াছে তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতেছি না। নচেৎ এই আদর্শ পরাণুকরণে উদ্বুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে নিজেদের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত করিত এবং দেশীয় ভাষার পক্ষে যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন হইত না।

ইংরেজী ভাষার স্থিতি সম্বন্ধে আমাদের ইংরেজী পত্রিকায় যে যুক্তিই প্রদর্শিত হউক না কেন তাহা তাঁহাদিগের নিকট নিরর্থক না হইতে পারে। কিন্তু আমাদের কোন কোন দেশীয় সংবাদপত্রে ইংরেজী ভাষাকে দুই নম্বর ভাষারূপে স্বীকৃতিদানের যে দাবি করা হইয়াছে তাহা আত্মঘাতী ও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ইংরেজী সাংবাদিকগণের অনেক রকম সুবিধা আছে। যেমন, তাঁহাদের কাছে সোজা টেলিপ্রিন্টারে খবর আসে এবং উহাই বস্তুতঃ ছাপাখানায় চলিয়া যায়। কিন্তু দেশীয় সাংবাদিকগণকে ওই সকল অনুবাদ করিয়া লইতে হয়, সেইজন্য তাঁহাদের পরিশ্রমও দ্বিগুণ পড়ে। কাজেই তাঁহারা যখন দেখেন যে ইংরেজ সাংবাদিকগণ অধিকতর সমাদৃত হন এবং কম পরিশ্রম করিয়া বেশী উপার্জন করেন তখন দেশী সাংবাদিকগণই বা নিজের মাতৃভাষা লইয়া মাথা ঘামাইবেন কেন? প্রসঙ্গতঃ তাঁহারা সরকারকে বাংলা, মারাঠী ও তামিল এই তিনটি প্রান্তিক ভাষাকেও বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করিবার যে আগ্রহ দেখান তাহাতে কি অন্য প্রাদেশিক ভাষাভাষী লোক নির্বাক বা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? কোথায় যাঁহারা ইংরেজীর প্রভাব হইতে জাতিকে মুক্ত করিবেন, যাঁহারা মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিবেন, তাঁহারাই যদি ইংরেজীর প্রতিষ্ঠার জন্য বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন, তবে উপায় কি?

ইংরেজী ভাষার সহিত আমাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। ভারতে ইংরেজ আধিপত্যই ইংরেজী ভাষার বর্তমান স্থান দিয়াছে—এই স্থান উহার প্রাপ্য নহে। রাষ্ট্রিক মুক্তিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বভাবতঃই ইংরেজী বাদ দিয়া তাহার জায়গায় নিজেদের ভাষাকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একদল লোক কায়েমী স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আজও এই গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করিতেছেন না; ইংরেজীর অনধিকার দখলে তাঁহাদের কোনপ্রকার অস্বস্তি বোধ নাই; বরং উহার পরিবর্তনও তাঁহাদের নিকট অবাঞ্ছনীয়; আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা-উপদেষ্টাগণের মধ্যে অনেকেরই সংস্কার-প্রচেষ্টায় কথা ও কাজের মধ্যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক বৈষম্য সুস্পষ্ট—তাঁহারা প্রকাশ্যে নয়ী তালিমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও ইংরেজী আদব-কায়দা শ্রেয় মনে করেন। অধিকাংশ লোকই অলস প্রকৃতির। এই আলস্য কেবল দেহের নহে, মনেরও। চিরাচরিত অভ্যাসের বাঁধা পথ হইতে আমরা নিজেদের মুক্ত করিতে পারি না। পুরাতন সংস্কারকে অতিক্রম করার চেষ্টাকে শ্রমের অপব্যয় মনে করি। আমরা অনেকেই মানসিক শৈথিল্যের জন্য ভুগিতেছি। যাহা হউক, জনশিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের বিকাশের জন্য আমাদের নিজেদের সুবিধা ও অসুবিধার দিকে নজর না দিয়া আমাদের নিজস্ব ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কাজ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা যেখানে থাকে সেখানে উপায়ের অভাব হয় না।

আলোচ্য বিষয়ের অর্থ এই নয় যে আমরা ইংরেজী বা বিদেশী ভাষা শিখিব না। গান্ধীজী পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, "যাহাদের শিখিবার দক্ষতা আছে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে যত্ন করিয়া ইংরেজী ভাষা শিখিতে বলিব এবং ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ জাতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিতে বলিব।" পৃথিবীর কোন দেশই অন্যান্য জাতির সহিত সম্পর্কবর্জিত হইয়া বাস করিতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ ব্যক্তি থাকা দরকার যাহারা বিদেশী ভাষার সম্পদ আহরণ করিয়া নিজস্ব ভাষায় স্বদেশবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিবে। এইজন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও বিদেশ ভ্রমণ প্রয়োজন। কিন্তু সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন দেশেই থাকিয়া যায়। কাজেই তাহাদের বিদেশী ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা একজনের বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাঁহারা যেন বাকি নিরানব্বই জনের শিক্ষার প্রতি অবহেলা না করেন। মোটের উপর, আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা কোনদিনই আমাদের ভাষাকে স্বাধীন জাতির ভাষার মত যথোচিত স্থান ও সম্মান দিতে পারিব না, যতদিন ইংরেজী ভাষার প্রতি আমাদের দাস-সুলভ অত্যধিক অনুরাগ থাকিবে।

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

২

যে মুহূর্তে রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে ট্রাউজারে ক্যান্সার ঢেকে সমীর ডাক্তারের মনের মধ্য দিয়ে সোনার হরিণ জুতো পরে হেঁটে চলে গেল সেই মুহূর্তে হাজারিবাগ মালভূমির কোন একটা বুনো অংশে সত্ত চুনকাম-করা কংক্রিটের নূতন আবাসগুলোর গায়ে সকাল-বেলার রৌদ্র সমীর ডাক্তারের সঙ্গে নিঃশব্দে হা-হা করে হেসে উঠল।

চতুর্দিকে রুক্ষ, রসহীন, অভ্রচূর্ণ-মেশানো লালমাটি যেন জীবনের প্রতি একান্ত বীতস্পৃহ হয়ে বৈরাগ্যের স্থির ঢেউ তুলে পড়ে আছে। কোনও কোনও ঢেউয়ের মাথায় গাঢ়বর্ণ ধাতব পদার্থের বলিচিহ্ন। ছুটো ঢেউয়ের মাঝখানের খাদে শুষ্ক বিবর্ণগুল্মের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ঝোপ। যেন কপালে ত্রিবলী এঁকে জটাজুট ধারণ করে জীবনে বিগতস্পৃহ কঠোর ধাতব মাটি তপস্যায় বসেছে।

তবু জীবন তাকে আকর্ষণ করতে ছাড়ে নি। কয়েক ধাপ ঢেউয়ের নীচে যেখানে এই বৈরাগী মাটির অন্তঃসলিল ঈষৎ রসসঞ্চার করেছে সেখানে একপ্রস্থ সবুজ অসংখ্য তৃণের ফলকে ফলকে চোখ মেলে চেয়ে আছে। কোথাও একখণ্ড সরস ভূমি এই বৈরাগী মাটির চতুরস্রের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে। এই ভূমিখণ্ডে চতুর্দিকের কাঠিন্য চুঁইয়ে যে রস সঞ্চারিত হয়েছে সেই রসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে বর্ণনাতীত তীব্র সবুজ। যেন সে এই সবুজে নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠেছে।

এই নিঃশব্দ চিৎকার শুনে চারিদিকে দিগন্তের কিনারে কিনারে সবুজ অরণ্য এসে ভিড় করেছে।

এই ভূমিখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে রাজপথ পাতা হয়েছে। অভ্রচূর্ণ-মেশানো লালমাটির অঞ্চলের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ পাড় শিথিল হয়ে পড়ে রয়েছে এই ভূমির পয়োধরের ওপর।

একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বরেন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে ছিলেন এই প্রকৃতির দিকে। ল্যাবরেটরির পথে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মুহূর্তের জন্য তিনি একটা সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অজৈব জৈব দুই পদার্থের পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশের সংগ্রাম। বৈরাগ্যের সঙ্গে বাসনার সংগ্রাম। আজ প্রভাতে সূর্য নতুন করে এই সংগ্রামে সারথ্য নিলেন—উভয় পক্ষেরই সারথ্য।

বরেন নিজের মধ্যে অনুভব করলেন তাঁর জীবনের সারথ্য গ্রহণ করেছে কী এক শক্তি। সেই-ই ধরে রয়েছে চিন্তার রাশ। সেই-ই ইশারা করে বুদ্ধিকে চিন্তাকে অনুভবকে নতুন রহস্যের তীরে টেনে নিয়ে চলেছে। যেমন সমুদ্র-চিল ডেকে নিয়ে চলে সমুদ্রের সান্নিধ্যে।

বরেন ভেবে দেখেছেন এই ল্যাবরেটরিতে তিনি নিজের সংকল্পে আসেন নি। সেই অদৃশ্য শক্তি তাঁকে টেনে এনেছে এখানে।

এই টিলাটা পেরিয়ে একটা স্ফীত ভূমি। যেমন রুক্ষ তেমনি উজ্জ্বল। অভ্রখণ্ডে। কবে পৃথিবীর কোন্ আবেগে স্ফীত হয়েছিল সেই আবেগ হয়তো তার নীচে দাহ্য কয়লায় জমাট হয়ে গেছে। এর ওধারে ইস্পাত নগরী 'আজবনগর'। সামনের ভূমিস্ফীতি একে আড়াল করে রেখেছে। শুধু কয়েকটা ব্লাস্টফার্নেসের মসৃণ মাথা দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার মেঘ, সকালের সূর্যের আলোয় অরুণবর্ণ। না, সূর্যের আলোয় নয়—গলন্ত লৌহমল বিচ্ছুরিত আলোয়।

সহসা চতুর্দিকের স্তম্ভিত শুব্ধতাকে দীর্ণ করে বেজে উঠল আজবনগরের প্রথম শিফ্‌টের সঙ্কেতধ্বনি—নদীতে স্টীমার বা সমুদ্রে জাহাজের ধ্বনির মত।

ওই আলো, এই ধ্বনিতে বরেনের চিত্ত কোথায় যেন সহসা আহত হল। অস্বস্তিভরা চমক লাগল ইন্দ্রিয়ে। যেমন চমক লাগে গভীর রাত্রে অচেনা তীব্র কোনও শব্দ শুনে কিংবা হঠাৎ কোনও আলোর ঝলকে। মনে হল এরা অস্বাভাবিক।

* * *

ল্যাবরেটরির সঙ্গে সংযুক্ত বিরাট বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র। ডায়নামো-ঘরের ভিতর দিয়ে বরেনকে ল্যাবরেটরিতে যেতে হয়। এই ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন একটা অর্ধচক্রাকার ইস্পাতের ঢাকার কাছে দাঁড়িয়ে দুজন কর্মী কথা বলছে। তরল স্বচ্ছ তেলের মত বিজলীর আলো পড়েছে ওদের স্বেদসিক্ত মুখে। অবিচ্ছিন্ন সমুদ্রগর্জনের মত শব্দে সমস্ত ঘরটা পূর্ণ হয়ে রয়েছে। তার মধ্যেই এই দুজনের আলাপ চলেছে।

আকাশের সূর্য দিয়েছে সকাল, দিয়েছে প্রাণ আর তেজ দিয়েছে পদার্থের অন্তরে। মানুষ পদার্থের অন্তর থেকে সেই তেজকে পুনরুদ্ধার করে নতুন সূর্য সৃষ্টি করতে চলেছে। এই নতুন সূর্য কোন নতুন সকাল এনে দেবে?

ওরা দুজন মানুষের সৃষ্ট এই আলোয় দাঁড়িয়ে কী কথা বলছে? এই দুজনকেই ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ এখানে এনে নিযুক্ত করেছেন।

একজন দীর্ঘকায়। পেশীবহুল। প্রকাণ্ড মাথা, রক্তিম মুখ, চোখের তারার চতুর্দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলো সুস্পষ্ট লাল। পুরু ভ্রূ, প্রশস্ত কপাল। কপালের মধ্যস্থলে একটা অগভীর টোল। বাহুর ওপর শিরাগুলো উচ্ছ্বসিত।

যন্ত্রের তাপে গায়ের গৌরবর্ণ পুড়ে তামার মত হয়ে গেছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে মাথার চুল। ঈষৎ বাদামী রঙের, আর কোঁকড়ানো। মুখেচোখে একটা বেপরোয়া দৃষ্টি। তার চেহারায়, চাউনিতে, চলাফেরায় সর্বদা একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। ডাকনাম কর্নেল। আসল নাম কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করে নি।

অপরজনের নাম মুঙ্গেশকর। দোহারা চেহারার সুপুরুষ। চোখের তারায় একটা চাপল্য যেন সর্বদা টলমল করছে। স্বচ্ছ জলের মত দৃষ্টি। শোনা যায় মুঙ্গেশকর খুব ভাল ব্যাঞ্জো বাজায়। নাচেও নাকি চমৎকার। একমাত্র দুর্নাম ওর, স্ত্রীলোকের প্রতি ওর অপ্রতিরোধ্য নেশা। এই কারখানায় স্ত্রীলোক নেই। তাই মুঙ্গেশকর কয়েক মাইল দূরে ইস্পাতনগরী আজবনগরে যায় প্রত্যহ। ডিউটির সময়ের সঙ্গে না বাধলে মুঙ্গেশকর প্রত্যহ বিকেলে তার রেসিং সাইকেলে চড়ে ঢেউখেলানো ভূমির ওপর দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ বেয়ে আজবনগরে যায় আর ফেরে গভীর রাত্রিতে।

পিচঢালা পথ দিয়ে গেলে ওর আজবনগর যেতে বেশী সময় লাগে, তাই বন্ধুর পায়ে-চলার পথে দেবদারু শালপিয়ালের বনের ভেতর দিয়ে পাথরের ঢিবিগুলোকে পাশ কাটিয়ে ঝোপঝাড় ভেদ করে সোজা চলে যায়। মুঙ্গেশকর যখন আজবনগর যায় তখন সারা পথে সাইকেলের ঘণ্টিতে মিঠে আওয়াজ বাজাতে বাজাতে যায়—বাজনার মত। প্রত্যহ যাবার সময় ওর ঘণ্টিতে খুব মিঠে সুর বাজে। কিন্তু এক একদিন রাত্রে ও যখন বাড়ি ফেরে নতুন কলোনীতে তখন বরেন নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বা পড়তে পড়তে শোনেন মুঙ্গেশকরের সাইকেল-ঘণ্টির ঝঙ্কারে বারংবার তালভঙ্গ হচ্ছে। বোঝেন সেদিন ও ঘা খেয়ে ফিরেছে।

মুঙ্গেশকরকে দেখে বরেনের মনে পড়ে আমেদকে। আমেদের লোক অবিমিশ্র ভাবলোক আর মুঙ্গেশকরের লোক যন্ত্রের লোক। তবু কোথায় যেন এদের দুজনের মধ্যে মিল রয়ে গেছে।

তেমনই মিল খুঁজে পান কর্নেল আর মৃণালের সঙ্গে। মৃণালের মত এই কর্নেল ইচ্ছার জোরে প্রকৃতির মধ্যে যা অবাধ্য তাকে নিজের বাধ্য করে আনতে বদ্ধপরিকর। তা সে অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অবাধ্য অনুভূতি হোক বা বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে অবাধ্য পদার্থই হোক। মৃণাল অবাধ্য অন্তঃপ্রকৃতিকে বাধ্য করতে নেমেছে, আর এই কর্নেল নেমেছে বহিঃপ্রকৃতির পদার্থকে শাসন করতে।

কর্নেলের মত যন্ত্রবিৎ দুর্লভ। ওর শিক্ষা কতদূর কেউ জানে না। কিন্তু বিকল যন্ত্র ওকে দেখলেই যেন শঙ্কিত হয়ে সচল হয়ে ওঠে। যন্ত্রের গঠনপদ্ধতি ওর জ্ঞাত হোক অজ্ঞাত হোক কর্নেল কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে আয়ত্তে এনে ফেলে। একবার চোখে চেয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে

যেন যন্ত্রটার প্রকৃতি বুঝতে পারে। মনে হয়, ওর ধ্যানের মধ্যে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সমস্ত যন্ত্রের গঠনরহস্য সুস্পষ্ট। হয়তো ওর চিন্তার সঙ্গে যন্ত্রের কোথাও মৌলিক মিল থেকে গেছে। এক এক মানুষের মস্তিষ্ক যেমন গণিত-যন্ত্রের মত, তেমনি কর্নেলের মস্তিষ্ক প্রয়োগ-যন্ত্রের মত।

বরেন একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওদের আলাপ শুনতে। মুঙ্গেশকর হাসতে হাসতে বলছে, আওরত কী পদার্থ তা তুমি কী বুঝবে কর্নেল? সীতার জন্য রামায়ণ, দ্রৌপদীর জন্য মহাভারত—দু-দুটো মহাকাব্য তৈরি হয়েছে দুজন আওরতের জন্য। ঋষি বাল্মীকি, ঋষি ব্যাসদেব জয়গান গেয়েছেন দুই আওরতের।

কর্নেল উত্তেজিত স্বরে বলল, ওরা পুরনো ঋষি, এ যুগের ঋষিরা আওরতের চেয়ে বড় কিছু দেখেছেন—

মুঙ্গেশ বিশুদ্ধ হিন্দীতে যা বলল তার মর্ম: এ যুগের ঋষিরা ভাব গোপন করেন। এঁরা রাজনীতির ঋষি, রাজনীতিতে প্রেম নেই। তাই এত অশান্তি, এত বার মহাযুদ্ধ একটা শতাব্দীতে।

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা চকচকে ইস্পাতের যন্ত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, এই আমার আওরত!

মুঙ্গেশকর হেসে বলল, মানলাম আমার কমলেশকুমারীর মত ওর চিকন গা. মানলাম তার গায়ের মত ওর গা গরম, মানলাম তার মতই পুরুষের শক্তিকে ও শুষে নেয়, মানলাম তার মতই সুন্দর আর ভয়ঙ্কর···কিন্তু কমলেশ-কুমারী আমাকে আবার নতুন করে তৈরি করতে পারে, নতুন বাচ্চায়। তোমার ওই আওরত তা পারে না।

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বলল, এও আমাকে নতুন করে তৈরি করতে পারে, নতুন বাচ্চায় নয়, নতুন মানুষে।

মুঙ্গেশকর ঈষৎ বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী করে?

কর্নেল বোঝাতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে বলল, সে তুমি কেমন করে বুঝবে? তুমি তো ভালবাস নি ওকে?

মুঙ্গেশকর বলল, না, আমি ওকে ভালবাসি না। ও আমার ঘরে বিজলীবাতি জ্বালাবে। কমলেশকুমারী সেই আলোয় বসে চুল বাঁধবে আয়নার সামনে। সেই আলোয় কমলেশকুমারীর খোঁপার গোলাপটা নতুন করে ফুটবে। তার চোখের নীচে সুর্মার রঙ সরাবের রঙের মত দেখাবে। কানের কাচ হীরের মত ঝকমক করবে। বাস্।

কর্নেল বিরক্ত হয়ে মুঙ্গেশকরের কথার প্রতিধ্বনি করে বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল, বাস্! কী জান তুমি মেয়ে-মানুষের মুঙ্গেশকর?—হঠাৎ কী একটা শব্দে চমকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে কর্নেল কনট্রোলবোর্ডে নিযুক্ত হয়ে গেল।

বরেন সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এখনও ডিউটি করছ কর্নেল?

কর্নেল আওয়াজটাকে বন্ধ করে কপালের ঘাম মুছে বরেনের দিকে চেয়ে বলল, ওকে ছেড়ে যেতে আমার ভরসা হয় না ডক্টর সাহেব!

বরেন পদার্থবিদ্যায় 'ডক্টর' এ কথা কর্নেল জানে।

মুঙ্গেশকর চোখ টিপে কর্নেলকে বলল, কেন? আমাকে বিশ্বাস কর না বুঝি?

কর্নেল অন্যমনস্ক হয়ে বলে, না, তুমি ওকে—তুমি ঠিক ভালবাসতে পার নি। বরেন হাসতে হাসতে নিজের ল্যাবরেটরির দিকে চলে গেলেন।

* * *

ঘরের মাঝখানে ঝকঝকে পালিশ-করা টেবিলে ঘোমটা-পরা একটা বৈদ্যুতিক আলোর সামনে বসে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ কাজ করছেন কাগজপত্র নিয়ে।

বয়সে প্রায় বৃদ্ধ। ঝাঁকড়া, অবিন্যস্ত চুল। তার প্রায় অর্ধেক সাদা। প্রশস্ত কপাল। কপালে কয়েকটা সমান্তরাল ভাঁজ। কপালটা যেন একটা গণিতচিত্র। সুগঠিত সুউচ্চ নাক মুখের তুলনায় ঈষৎ বড়। নাকের দু পাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত দুটো অর্ধবৃত্তাকার ভাঁজ। ঠোঁট দুটো কিন্তু পাতলা—পরস্পর দৃঢ়নিবদ্ধ। চিবুকটা সূচলো—হয়তো নরম। বরেন ঘরে প্রবেশ করতে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ মাথা তুলে বরেনের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তাঁকে ইঙ্গিতে সামনের খালি চেয়ারে বসতে বললেন। বরেন বসলে চিন্তাকুলভাবে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ তাঁকে বললেন, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ ধরে। এই এক-রাশ সমীকরণগুলোর মধ্যে আমি কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক বইপত্র দেখলাম, মূলসূত্রটাকে ধরতে পারলাম না।

বরেন একটু বিস্মিত হয়ে গেলেন, ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌কে তাঁর সঙ্গে এই ভাবে কথাবার্তা বলতে দেখে। ডাক্তারের অহং বিপুল প্রকাণ্ড। কী হয়েছে তাঁর যার ফলে এই অহং আজ সহসা বরেনের কাছে নিজেকে নত করলে? উনি কি জেনেছেন কোলাপোভার সঙ্গে তার—

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ ঈষৎ হেসে বললেন, এই ইকোয়েশন-রাশি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অজস্র ইকোয়েশনের মত একসূত্রে সমাধানের বাইরে—ইনসলিউবল! তুমি যদি পার একবার দেখ।

বরেন একবার চকিতে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের চোখের ওধারে যে মনটা ধিকধিক করে জলছে তার তাপটা আঁচ করার চেষ্টা করলেন। কিছুই বুঝতে পারলেন না। মনে হল ওঁর চোখের আলো নির্জন রাত্রে নগরীর কোন চৌমাথায় নিঃসঙ্গ শুধু শুধুই জলে রয়েছে।

বরেন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনার কাজে তো খুঁত থাকবার কথা নয়।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম এবার রহস্যের মত হাসি হেসে ইংরেজীতে বললেন, কী জান বরেন, আমি একাই প্রকৃতির পক্ষে যথেষ্ট নই বলেই তো তোমার সৃষ্টি। প্রকৃতি আমার পক্ষে প্রচুরের পরেও প্রচুর। কিন্তু আমি? আমি তার পক্ষে একান্তই অপ্রতুল, ডক্টর।

এই প্রথম সুব্রহ্মণ্যম্‌ বরেনকে ডক্টর বলে সম্বোধন করলেন। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, বুঝলে ডক্টর, প্রকৃতি রাক্ষসী, বিপুলতমা নারীর মত। একটা মানুষের বলি এই রাক্ষসীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। একটা পুরুষ এই বিরাটের চেয়েও বিরাট যে নারী তার পক্ষে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

বলে কী রকম একটা তিক্ত হাসি হাসলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে মেঝের ওপর পায়চারি করতে করতে বললেন, দুর্বার তার দাবি, তার তুষ্টিবিধান তোমাকে করতেই হবে নিজেকে ধ্বংস করেও। তাকে তৃপ্ত করতে—জর্মন ভাষায় বললেন, ডু গেয়েষ্ট ৎসুগ্রুণ্ডে (du gehst Zugrunde)।

বরেন নিরুত্তর হয়ে রইলেন। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম আবার জোর দিয়ে বললেন, ডু গেয়েষ্ট ৎসুগ্রুণ্ডে। তার তৃপ্তির জন্যে তুমি নিঃশেষ হয়ে যেতে পার, তাতে তার যায় আসে না কিছুই।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের কথাগুলোর মধ্যে বজ্রগর্ভ মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনির আভাস ছিল যেন। শঙ্কিত হয়ে বরেন তাঁকে সহজ কথাবার্তার সুরে নামিয়ে আনার জন্যে কর্নেল আর মুঙ্গেশকরের তর্ক-বিতর্কের বিবরণ দিতে শুরু করলেন। যেন ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ যা বলছেন তার সঙ্গে ওদের বিতর্কিত বিষয়ের মিল আছে।

পায়চারি করতে করতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ বরেনের বিবরণ শুনলেন, তারপর আবার পায়চারি আরম্ভ করে বলতে লাগলেন, কর্নেলই ঠিক। মুঙ্গেশকর-টাইপের প্রেমিকদের কাছে নারী একটা সিম্‌বল, বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ধারণা মাত্র।

তুমি তো পদার্থবিদ্‌, তুমি তো জান ডক্টর, হরমোনের তারতম্যের ওপর পুরুষত্ব আর নারীত্ব নির্ভর করে। একই মানবিক পদার্থের দুটো বিশিষ্ট রূপ। একে অপরকে গ্রাস করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। উদ্দেশ্য 'রিপ্রোডাকশন'। রিপ্রোডাকশন মানে মূল প্রাণী দুটোর আংশিক ধ্বংস। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কোন রোমান্স নেই। রোমান্স বিজ্ঞানের শত্রু। এই রোমান্সের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ—

উত্তেজিত হয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, যুদ্ধ ঘোষণা করেছি।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ সহসা পাথরের মত শক্ত হয়ে মাটির ওপর ছোট্ট একটা স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে বরেনের স্মৃতিতে ঝলসে গেল কোলাপোভার কয়েকটা কথা: তুমি হয়তো জান না বরেন, আমি সুব্রহ্মণ্যমের রক্ষিতা হলেও তাঁর সঙ্গে আমার কোন দৈহিক সম্পর্ক নেই।

বরেন ও ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ দুজনেই কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে কাগজপত্র দেখতে দেখতে বললেন, এস ডক্টর, তোমাকে এই কাগজপত্রগুলো বুঝিয়ে দিই। ভাবছি গবেষণার জগৎ থেকে আমি এবার রিটায়ার করব। আমার ক্ষমতার শেষ হয়ে গেছে।

বরেন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন তাঁকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্‌ কাগজপত্র বোঝাতে বসলেন।

কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সেগুলো বরেনের হাতে সমর্পণ করে উঠে দাঁড়ালেন যেন এখুনি কোথাও বেরিয়ে চলে যাবেন আর ফিরবেন না।

কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ নিয়ে বরেন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি চলে যাচ্ছেন?

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ বরেনের কথার নিগূঢ় তাৎপর্য যেন ধরতে পেরেছেন। ম্লান হেসে বললেন, না, যাব কোথায়? আজ একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি।

ফেল্ট টুপিটা মাথায় চড়িয়ে ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সুইংডোরটাকে পা দিয়ে ঠেলে। সুইং-ডোরের ওধারে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে বললেন, মনে রেখ বরেন, নারীও একটা পদার্থ মাত্র—যেমন তুমি একটা পদার্থ আমি একটা পদার্থ।

বরেন শুনতে পেলেন তাঁর ভারি পায়ের শব্দ বহুক্ষণ রেশ রেখে গেল পশ্চাতে। সুইংডোরের দিকে চেয়ে দেখলেন, পাল্লা দুটো তখনও দুলছে সমান তালে।

* * *

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ বাংলোয় ফিরে দেখলেন কোলাপোভা বাগানের মধ্যে একটা পুষ্পিত আকাশ-নিমের নীচে পাতা একটা বেঞ্চে বসে আছে কোলে একখানা বই নিয়ে। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের মনের মধ্যে ভেসে উঠল কথা: ফিনিক্স, তোমার ডানা দুটো কোথায়?

বাংলোর পাশের পথ দিয়ে মুঙ্গেশকর সাইকেলে চড়ে কারখানা থেকে ফিরে যাচ্ছে। তার গাড়ির ঘন্টিতে অদ্ভুত মিঠে আওয়াজ উঠেছে। মুঙ্গেশকর খুব ভাল ব্যাঞ্জো বেহালা বাজায়। মিষ্টি হাত—যেখানেই পড়ুক সুর জাগিয়ে তোলে। সাইকেলের ঘন্টিতেও।

কোলাপোভা তাঁকে দেখে বইখানা বেঞ্চে রেখে উঠে এসে তাঁর হাত থেকে ছড়িটা ও টুপিটা নিয়ে বাংলোর ভেতর চলে গেল। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ স্থিরদৃষ্টিতে কোলাপোভার পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। তার কাঁধ থেকে গুল্ফ পর্যন্ত সমস্তটার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল একটা ক্রমশঃ-অপস্রিয়মাণ বাঁধের ওপর বন্যার মতন।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ জানলেন কি জানলেন না—দূরে এই মালভূমির ঢালুতে নতুন গমের শীষে যে ফুলগুলো আজ সকালে ফুটেছে তাদের পরাগ-সংযোগ ঘটে গেছে ইতিমধ্যেই।

কোলাপোভাকে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ একদিন ইংলণ্ডে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কোন একটা পার্কে একটা পত্রবহুল সরল গাছের নীচে একটা সবুজ বেঞ্চে সেদিন দিনান্তে কোলাপোভা কোলে একখানা বই ফেলে নিশ্চল হয়ে বসেছিল। পার্কে অলস পদচারণার সময় ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ তাকে দেখেছিলেন।

সেদিন সেই মুহূর্তে কোলাপোভার মুখের ওপর যে জীবন-উদাস, যৌবন-উদাস, ভবিষ্য-উদাস ভাব দেখেছিলেন তা কোন কবির চোখে পড়লে কবিতায় পরিণত হত, কোন চিত্রকরের চোখে পড়লে চিত্র হয়ে উঠত। কোলাপোভা মুখের ওপর এই ভাবখানা হয়তো ইচ্ছে করেই পরেছিল মুখোশের মত কোন চিত্রকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। ইচ্ছে ছিল মডেল হয়ে কিছু উপার্জন করে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস সে পড়ল পদার্থবিদের দৃষ্টিতে। সেদিন সেই মুখচ্ছবিতে বৈজ্ঞানিক সুব্রহ্মণ্যম্ কী দেখেছিলেন তা তিনি এখন পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে নিজের কাছে পরিষ্কার করতে পারেন নি। শুধু অস্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, চিরগৃহহীন একটা মানবাত্মা পৃথিবীতে একটা কোন স্থায়ী আবাসের সন্ধান করে ফিরছে—ঠিক তাঁরই মত। ডক্টরের মনে হল তিনি এই কালের একটা বিশেষ সৃষ্টি নন, তাঁর মত অনেকেই আজ এই ধরণীর কোণে কোণে দেহ-মন-আত্মার একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুরনো আশ্রয় গেছে ভেঙে, নতুন আশ্রয় গড়ে ওঠে নি।

মাতৃপিতৃহীন বালক বয়স থেকে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করে বেড়ে উঠেছেন।

মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত বংশে তাঁর জন্ম। নিদারুণ অধ্যবসায়ে চিন্তায় ব্যবহারে আধ্যাত্মিকতার শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষে মুছে নিজেকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক বস্তুবাদীতে পরিণত করার প্রয়াসে এতদিনের জীবনটা তিনি ব্যয় করেছেন। এখন নিজেকে তিনি এই বিপুল পদার্থবিশ্বের একটা কণিকামাত্র বলে কল্পনা করেন। নিঃসীম পদার্থব্রহ্মাণ্ডের একটা পদার্থ খণ্ড। চিত্তভূমিতে দিবারাত্র প্রখর বুদ্ধির সূর্য তাপ বিকীরণ করে সেখান থেকে সরস অনুভবের তৃণাঙ্কুর পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে আর সেই মরুভূমিতে তার চেতনা যেন সিংহের মত বিচরণ করছে।

বহু সাধনায় তিনি জীবন ও বিশ্বের প্রত্যেক দিকের সঙ্গে নিজের বাস্তব সমীকরণগুলোকে রচনা করেছেন; কিন্তু এই সমীকরণগুলোর মূলে কোনকিছুই ধ্রুব নেই। জীবন ও চিন্তা তাঁর কাছে চিরকাল পরিবর্তনের প্রবাহে লীন। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের ব্যক্তিগত মুক্তির কামনা নেই; চেতনার নতুন রূপান্তর তাঁর লক্ষ্যের বাইরে। অনুভব মাত্রই তাঁর বিচারে অযৌক্তিক। বুদ্ধির নিষ্ঠুরতায় সদা-শাণিত এই মানুষটি।

ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন কোলাপোভা একটি আকাশ-নিমগাছের নীচে সবুজ বেঞ্চে প্রথম দর্শনের দিনের ভঙ্গীতে নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে আর সেদিনের মতই এক টুকরো আলো তার পায়ের কাছে পড়ে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে তখন সেদিন থেকে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর স্মৃতিতে পুনরাবৃত্ত হল।

কোলাপোভাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু প্রথম দিনেই তাকে বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে তুমি কোনদিন কিছু চেয়ো না, কোন কিছুর আশা করো না আমার কাছ থেকে। আমি এই মুহূর্তের ঝোঁকে তোমাকে আশ্রয় দিলাম, হয়তো পরমুহূর্তের ঝোঁকে তোমাকে ত্যাগ করব। আমি নিজেই নিজের প্রভু নই; অদৃশ্য বাস্তব নিয়মে আমি চলি।

আর, আমিও তোমার কাছ থেকে কিছু চাইব না। তোমাকে সুখ দেবার চেষ্টাও করব না.আবার দুঃখ দেবার ফিকিরও খুঁজব না।

আমার ইচ্ছা হল তোমাকে আশ্রয় দিতে, তাই আশ্রয় দিলাম তোমাকে। কেন ইচ্ছে হল? এর বিশ্লেষণে আমার প্রবৃত্তি নেই। আমি যখন ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এই পার্কে এসেছিলাম তখন তোমার মত কোন মেয়েকে আশ্রয় দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার মনে ছিল না।

নিরাশ্রয় তরুণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ভাগ্যের স্রোতে ইউরোপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত জঞ্জালের টুকরোর মত ভেসে ভেসে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের আশ্রয়ে এসে সে আশ্রয় ত্যাগ করল না। ওই অসম্ভব চুক্তিতেই আশ্রয় গ্রহণ করল।

মানুষের চরিত্রের দুই মেরু। এক মেরু সমাজের দিকে মুখ করে আছে আর এক মেরু আছে সমাজের দিকে বিমুখ হয়ে—যেমন চাঁদের এক পিঠ আছে পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আর এক পিঠ চিরকালের জন্যে অদৃশ্য। যেখানে দৃশ্য মেরুতে উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে অদৃশ্য মেরুতে আছে কঠিন সংযম। প্রকাশ্য মেরুতে যদি থাকে আসক্তি অদৃশ্য মেরুতে থাকবে বৈরাগ্য। মানুষ যখন জীবনের সঙ্গে জীবনমরণ-সংগ্রামে নামে তখন সে অনেক সময় অপর মেরুটাতে গিয়ে দাঁড়ায়।

তাই হয়তো এই সংযম-ভাসিয়ে-দেওয়া তরুণী এই কঠিন বন্ধনকে স্বীকার করে নিল।

কোলাপোভার সমস্ত সময়টা গৃহকাজ দিয়ে ভরে না। এই বাড়তি সময়টাতে স্নায়ুগুলো আপনা থেকেই বেজে চলে। যেমন টান করে বাঁধা বীণা সেতার স্বরোদের তার শুধু হাওয়ার বেগেই কাঁপে সর্বদা। তাই ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ যখন বাইরে থাকেন তখন মাঝে মাঝে একপ্রস্থ নাচের পোশাক বের করে ব্যালেরিনার মত সাজ করে কখনও নগ্ন মেঝেতে কখনও কার্পেটের ওপর নাচে। কখনও ইচ্ছে করে রোদে পোড়ে, কখনও বরফে হাত ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।

কোনদিন হঠাৎ ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ অসময়ে বাংলোয় ফিরে তাকে নাচতে দেখতে পান।

কিন্তু কোনদিন ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ আচমকা একটাও কোমল কথা বলেন না। গম্ভীরভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে পায়চারি করতে থাকেন মাথার টুপি মাথাতে আর হাতের ছড়ি হাতে নিয়েই—কোলাপোভা যতক্ষণ না বেরিয়ে এসে এ দুটো তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। কোনদিন কোনও অবস্থাতেই কোলাপোভার প্রতি কোনও আকর্ষণই প্রকাশ পায় নি তাঁর আচরণে।

কোলাপোভা মাথার টুপিটা ও হাতের ছড়িটা নিয়ে বাংলোর মধ্যে চলে গেল। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ তার ঘাড় থেকে অনাবৃত পায়ের গুল্ফ পর্যন্ত সারা শরীরটার ছন্দটা দেখলেন। সেই ছন্দ যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল। মাটির ওপরে ছড়িয়ে পড়ল। সোজা আকাশের দিকে উঠে গেল। বাংলোর

বারান্দায় ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। এমন কি রোদ্দুরেও লাগল বুঝি।

এ ছন্দটা তিনি আগে লক্ষ্য করেন নি। এটা তাঁর নতুন আবিষ্কার।

আবিষ্কার করেছেন আগের দিন রাত্রে।...... কোলাপোভার চোখে একটা অসাধারণ রাত্রি। সুরার মত রাত্রি। নীল সুরার মত। আকাশ চুঁইয়ে জ্যোৎস্নার ধারায় ঝরছে। পুষ্পিত দেবদারুর সৌরভ মিশেছে এই সুরায়। এই সুরায় ঝাঁজ লেগেছে একদল অচেনা পাখির বিহ্বল চিৎকারে। পাখির দল মধ্যরাত্রিকে উষা বলে ভুল করেছে। ঘুম রয়েছে পাখায় তবু উষা এসেছে এই বুঝেই বুঝি বিহ্বল হয়ে গেছে তারা। ঘুম রয়েছে শ্লথ পেশীতে পেশীতে তবু সকাল হয়েছে, তাই বিহ্বলতা। এই বিহ্বলতায় টলমল করছে রাত্রির সুরাপাত্র—মাটি থেকে নীল আকাশ পর্যন্ত দীর্ঘ। কানায় ফেনার মত সূক্ষ্ম মেঘের আভাস। অদৃশ্য সুরের বুদ্বুদ উঠেছে এই সুরায়। এই সুরা কোলাপোভার শিরায় শিরায় বয়ে গেছে।

কোলাপোভা বসেছে পিয়ানোতে। তার সমস্ত স্নায়ু বিহ্বল হয়ে গেছে। পিয়ানোর ওপর তার দু হাতের আঙুল সুরের ঝড় তুলেছে। উন্মাদ সুরের ঝড়। উদ্‌ভ্রান্ত সুর মাঝে মাঝে যেন চিৎকার করে উঠছে।

এই সুরের ঝাপটায় বিধ্বস্ত হয়েছে ঘুম ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের। তিনি ঘুম থেকে উঠে কোলাপোভার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সমস্ত বাংলোটা যেন থরথর করে কাঁপছে। শুধু বাংলোটা নয়, ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের সারা শরীরটাও কাঁপতে শুরু করেছে। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় চিৎকার করে বললেন, দরজা খোল, দরজা খোল কোলাপোভা!

কয়েক নিমেষ অপেক্ষা করলেন। দরজা তবুও বন্ধ রইল দেখে অসহিষ্ণু হয়ে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। ভিতরে সুরটা যেন ক্রন্দনরত শিশুর মত ধমক খেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে থেমে গেল।

ঘর অন্ধকার। তিন দিকের জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার বান ঢুকে ঘরটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ এই অস্পষ্ট আলোয় ডাইনে-বাঁয়ে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে আলো জ্বাললেন। আলো জেলে দেখলেন পিয়ানোর উপর ভর দিয়ে কোলাপাভা কোনরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দরজা খুলে গেল। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ ঘরে ঢুকে দেখলেন কোলাপোভার সারা মুখ ঘামে ভরে গেছে। কপালে ঘাম, দুই গণ্ডে ঘাম আর অশ্রু উভয়ই। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চোখের জলের মধ্যে নীলতারা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাসছে। বিস্রস্ত চুল কপালে গণ্ডে গলায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঘামে বসে গেছে।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ কঠোর স্বরে বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ?—বললেন বিশুদ্ধ জর্মন ভাষায়। কোলাপোভা মাতৃভাষায় দু-একবার আচ্ছন্নের মত নিজের মনে বলে গেল, পাগল! পাগল! তারপর ছুটে গিয়ে নিজের বিছানার উপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ যন্ত্রচালিতের মত তার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর ডান হাতখানা নিজের অজ্ঞাতসারে এগিয়ে গেল কোলাপোভার পিঠের উপর। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাত-খানাকে সরিয়ে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে তোমার? তুমি কি অসুস্থ?

কোলাপোভা বিছানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি। আমি এই ভালবাসা সহ্য করতে পারছি না।

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ বললেন, ক্ষুধাতৃষ্ণার মত এটাকেও সময়ে সময়ে সহ্য করতে হয়। এবং সহ্য করা যায়। তা ছাড়া আমি আমার নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতে পারি না।

আপনাকে নয়। আমি তাকে ভালবাসি।

কাকে?

বরেনকে।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্। তারপর বললেন, আমি তোমাকে তো ধরে রাখি নি কোনওদিন। আজও ধরে রাখছি না। তুমি তার কাছে চলে যেতে পার। নিঃসঙ্কোচে চলে যেতে পার।

কোলাপোভা দু হাতে মুখ মুছে বিছানার কানায় উঠে বসল।

মৃদু হেসে বললেন ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্, তুমি নিঃসঙ্কোচে

চলে যেতে পার। জান তো আমি সকালের রোদ কত ভালবাসি। সকালবেলায় বাগানে পশ্চিমের বেঞ্চে বসে থাকি যখন, তখন দেখবে রোদ প্রথম আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকে, তারপর সেই রোদ্দুর আমার হাঁটু বেয়ে বুকের ওপর ওঠে, তারপর মুখে মাথায়। তখন আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, সামান্য সরে বসি। তারপর সেই রোদ্দুর একেবারেই সরে যায়। আমার কিছু মনে হয় না। কোন অস্বস্তি হয় না। কোন ঈর্ষাই হয় না।

কোলাপোভা এবার ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল। সুব্রহ্মণ্যম্ বললেন, ঈর্ষাটা অযৌক্তিক—আমার জীবনদর্শনে এর স্থান নেই। আমি সত্যি করেই বলছি তুমি বরেনের কাছে চলে যেতে পার।

আমাকে নেবেন কেন?

সেও তোমাকে ভালবাসে নিশ্চয়ই।—বার দুই উচ্চারণ করলেন, ভালবাসা, ভালবাসা! তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

জানি না।—উত্তর দেয় কোলাপোভা।

তা হলে ক্ষুধাতৃষ্ণার মত এই ভালবাসাটাকেও তোমার সহ্য করতে হবে।—বলে আলোটা নিভিয়ে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কোলাপোভা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ওঠে, আপনি আমায় ভালবাসেন?

ঘরের বাইরে থেকে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের গম্ভীর কণ্ঠের উত্তর এল, না, আমার ইচ্ছে নেই।

* * *

আগের দিনের এই রাত্রিটা আরও কয়েকজনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল। এরা ভাগ্যসূত্রেই হোক বা ঘটনাসূত্রেই হোক পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। ভাগ্যের একই আবর্তে বা ঘটনার একটা ঘূর্ণীতে যে মানুষগুলি একসঙ্গে এসে পড়ে তাদের কাছে কাল বা স্থান অনেক সময় একই ধরনের অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়। হয়তো এই কাল বা স্থানটাই আসল যোগসূত্র। হয়তো কোন অদৃশ্য অপ্রাকৃত নিয়মের এই পরিণতি। কালকে আমরা একটা পটভূমিকা রূপে দেখি। কিংবা একটা সম্পূর্ণ মৃত আধারের মত। আসলে হয়তো কাল জীবন্ত। শুধু আধার নয়, স্রষ্টাও।

এই রাত্রিটা সুস্মিতার বোধের মধ্য দিয়ে দারুণ দুঃস্বপ্নের আকার নিয়ে উপস্থিত হল। অনেক সময় স্বপ্নই একমাত্র অবয়ব যার মধ্যে বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ মিলিত হয়ে উপস্থিত হয়। কিংবা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসঙ্গে।

সুবর্ণপুরের জমিদার রণেন চৌধুরীর কাছারি-বাড়িতে শীলভদ্রের ক্যাম্প হয়েছে, আর অন্দরমহলে এ বাড়ির একমাত্র স্ত্রীলোক বড়বউ রণেন চৌধুরীর পরলোকগত জ্যেষ্ঠের বিধবা স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর শয়নকক্ষের পাশের কক্ষে সুস্মিতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

ধবধবে গৌরবর্ণ, টকটকে লাল ঠোঁট এই রাজলক্ষ্মীর। উঁচু চোয়াল, ছোট্ট কপাল। দেহটায় মজবুত হাড়ের কাঠামো। আঙুলগুলো কী হাতের কী পায়ের বেশ লম্বা ও এদের ছোট্ট ছোট্ট অস্থিগুলোও সাধারণ লোকের থেকে দীর্ঘ। চলবার সময় সামান্য কুঁজো হয়ে চলে। বুকের পরিধির চেয়ে নিতম্বের পরিধি অনেক বেশী। এই সন্তানহীনা নারীকে দেখে মনে হয় প্রকৃতি বহুকলা করেই তৈরি করেছেন।

এই রাত্রি রাজলক্ষ্মী ও সুস্মিতা উভয়ের কক্ষেই একসঙ্গে নদীর দ্বিধাবিভক্ত স্রোতের মত প্রবেশ করল।

এ ঘরের একটা মুহূর্তের সঙ্গে অপর ঘরের মুহূর্তটা এমন ভাবে মিশে গেল যেন একটা মুদ্রার দুটো দিক। সন্তানহীনা বড়বউ আর তার একমাত্র জীবিত দেবর রণেন চৌধুরীর মধ্যে যে একটা দুর্জ্ঞেয়ের মত সম্পর্ক সেই অনুভব সেই সম্পর্ক স্বপ্নরূপকের রূপ নিয়ে সুস্মিতার ঘুমের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। এই রূপক আবার তার নিজের জীবনেরই রূপক। এই দুটো রূপক একত্র মিলে একটা দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি করেছে।

সুস্মিতার শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আর এই দুপুর রাত্রে রাজলক্ষ্মীর শোবার ঘরে দরজা ভেজানো।

সুস্মিতা স্বপ্নে দেখল একটা প'ড়ো বাড়ির ভগ্নস্তূপের মধ্যে একটামাত্র খিলান দাঁড়িয়ে আছে, সেই খিলান পেরিয়ে একটা চাতাল, চাতালটা অন্ধকার, তার মুখে পারার বিন্দুর মত এক বিন্দু আলো পড়েছে।

রণেন রাজলক্ষ্মীর ঘরের দরজায় এসে পাল্লা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে রাজলক্ষ্মী ডানদিকে

পালঙ্কের দূর কান্নায় বসে পাশের জানলায় চিবুক রেখে গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে দু বাহুর ওপর দেহের ভার রেখে। ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে।

এই খিলানটার চতুর্দিকে ভাঙাচোরা লাল রঙের পুরনো ইটের স্তূপ, কোথাও একটা থামের মাথা, কোথাও এক টুকরো ভাঙা দাওয়া। ভগ্নস্তূপের মধ্যে নানা রকম অচেনা ঝোপঝাপ।

পালঙ্কের গদির ওপরে বকের পালকের মত সাদা নরম বিছানা। সেই বিছানায় একটা ঝালর দেওয়া বালিশ। তার খোলের ওপর সূচ দিয়ে লতাপাতার গোলাপী সবুজ প্যাটার্ন তোলা। পালঙ্কের পায়ের কাছে একটা চামড়া-মোড়াই মোড়া। এই পালঙ্ক থেকে বিপরীত দিকের দেওয়ালে, অর্থাৎ বাঁয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা ড্রেসিং টেবিল। এই ড্রেসিং টেবিলের কাঁচের ওপর অস্পষ্ট কম্পমান আলোয় রাজলক্ষ্মীর পিঠের একটা প্রতিবিম্ব কাঁপছে। গায়ে কোন অন্তর্বাস নেই, শুধু একখানা সাদা পাতলা শাড়ি। হাত দুটো মূল থেকেই নগ্ন। সমস্ত পিঠের ওপর একরাশ কালো চুল জোয়ারের জলের মত ফেঁপে উঠেছে।

খিলানটার ওপর একটা গাছ। মানুষের হাতের পাঁচ আঙুলের মত তার পাঁচটা শাখায় ফুল ফুটেছে। গন্ধে সারা পরিবেশের হাওয়াটা এমন ভারী হয়ে গেছে যে স্মিতার দম আটকে যাচ্ছে বারংবার।

রণেন নিদ্রালু চোখে আয়নার দিকে চেয়ে তন্দ্রার ঘোরে ডাকল, বউদি!

রাজলক্ষ্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে বসল। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি ভাবে চেয়ে রইল রণেনের দিকে। কিংবা বিস্ময়ে বুঝি তার বাক্ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

স্মিতা দেখল সেই ভারী সৌরভ সাদা মেঘের টুকরোর মতো বা সাদা ধোঁয়ার মত ছেয়ে দিচ্ছে এই গোটা চাতালটা।

রণেন তন্দ্রার ঘোরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে ডেকেছিলে বউদি?

আধ-বিস্ময়ে আধ-ভয়ে রাজলক্ষ্মী বলল, আমি? কখন?

এঁকটু আগে, আমি তখন—

কী করছিলে এত রাত্রে?

দলিলপত্র দেখছিলাম। নরেন চাষীদের খেপিয়েছে ওরা আমাদের ভাগে বিলি-করা জমি থেকে জোর করে ফসলের তিন ভাগের দু ভাগ কেটে নেবে রাতারাতি। তাই দেখছিলাম এ বছর ওদের কারুর কাছ থেকে কবুলতি নেওয়া আছে কি না।

রাজলক্ষ্মী রহস্যের হাসি হেসে বলল, দুপুর রাত্রে কবুলতি ঘাঁটছিলে? আগেভাগে কেউ কিছু কবুল করেছে কি না তাই দেখতে?

হ্যাঁ, কবুলতি থাকলে ওদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করা চলবে।

আর না থাকলে?

জানি না, এখনও ঠিক করি নি।

তাই, এই দুপুর রাত্রে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলে?

স্মিতা দেখছে বড়বউ এই খিলানটা ধরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশবাস অসম্বৃত, দেহের ওপরটা প্রায় নগ্ন। কোথা থেকে একটা বিরাট কালো কুকুর এসে খিলানের ভিতরের চাতালটায় একটা প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে দাঁড়াল।

বিস্মিত হয়ে রণেন বলল, সে কি! এই মাত্র তুমি তো আমাকে ডেকে আনলে আমার ঘর থেকে! হ্যাঁ, তুমিই তো! বললে, ঠাকুরপো একবার ঘরে এস, আমার শরীরটা কেমন করছে।

রাজলক্ষ্মী অবাক হয়ে বলল, তন্দ্রার ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখছিলে ঠাকুরপো!

সে কি! স্বপ্ন? এই দেখ আমি স্টেথিসকোপটা পর্যন্ত এনেছি।

ওটা তোমার ভান।

মানে? তুমি কি বলতে চাও?

বলব কি? তুমি কী মতলব নিয়ে এসেছ তুমিই তো জান!

মতলব? রণেন ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল, মতলব আমার, না তোমার? এত রাত পর্যন্ত দরজা খুলে রেখেছিলে কেন? এত রাত পর্যন্ত ঘুমোও নি কেন?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রাজলক্ষ্মী: দরজা আমি ইচ্ছে

করে খুলে রাখি নি, আমি বন্ধ করতে ভুলে গেছি। এত রাত পর্যন্ত আমি জেগেও ছিলাম না, ঘুমোচ্ছিলাম সেই সন্ধ্যে থেকে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে, আর ঘুম আসছে না, সারা শরীরে কী ভয়ানক জ্বালা করছে।

সুস্মিতা দেখছে বড় বউ পা মুড়ে বসে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

রণেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। ভাবল, দরজার বাইরে থেকে তবে ডাকল কে? নিশির ডাক? বউদির কণ্ঠস্বরে নিশিতে ডাকল! এ বাড়ির সব অদ্ভুত। ভাবল তার গোটা বংশটাকেই নিশিতে ডেকেছে।

এতবড় বংশটার সমস্ত ধারাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একটা মাত্র অতি ক্ষীণ ধারায় এই বংশের রক্ত বইছে একলা তারই শিরার মধ্যে।

রণেন নিজে ডাক্তার। একটু স্থির চিত্তে বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারত প্রকৃতির আত্মরক্ষার—বংশ-সম্প্রসারণ ক্ষমতার অপহ্নব ঘটছে এই বংশধারার তলে তলে। তাই বুঝি প্রকৃতি তার মধ্যে মাঝে মাঝে রুদ্র রূপ লাভ করে, প্রবৃত্তি উদ্ধত হয়ে ওঠে।

সুস্মিতা দেখছে বড় বউ কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে খিলানের ভিতরের চাতালটা বেয়ে অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল।

রণেন আচ্ছন্নের মত বলে, আমিও ভুল শুনি নি, তুমিও ভুল কর নি। এ বাড়িতে তো দুটো মাত্র প্রাণী। তুমি আর আমি—একজন পুরুষ, একজন নারী। বাইরে সবাই বলে আমাদের মধ্যে আসল সম্পর্কটা অন্যরকম। অন্যে আমাদের যা মনে করে আমরা যদি তাই-ই হই তাতে সামাজিক মতামতের একচুল এদিক-ওদিক হবে না, সমাজ থেকে যেটুকু সমীহ আমরা পেয়ে আসছি তার একতিল কম পড়বে না।

রাজলক্ষ্মী বলল ধীরে ধীরে, তোমার আমার মাঝখানে হয় আর একজন মেয়ে আনতে হবে না হয় আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

সুস্মিতা স্বপ্নের মধ্যে দেখছে বড়বউ যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দিক থেকে মুহূর্তের মধ্যে একপাল কুকুরের ছানা চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল। সুস্মিতা আশ্চর্য হয়ে দেখল এদের সকলের মুখগুলো রণেনের মত। আর দেখল খিলানের বাইরে বড়বউ এই কুকুরগুলোকে স্তন্য দিচ্ছে গভীর স্নেহে।

রাজলক্ষ্মী বলল, চুপ, শোন। ওই কুকুরটা বেরিয়েছে। নরেনের কুকুর ওটা। শুনছ না ডাক? নরেন নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে বেরিয়েছে। তোমার উত্তর মাঠের ফসল লুট করবে বলে। তুমি এখনও আমার ঘরে বসে? যাও, যাও শীগগির, যাও!

সুস্মিতা সভয়ে দেখল স্বপ্নে, দারুণ ঝড় উঠেছে। খিলানের ওপর গাছটা অদৃশ্য ঝড়ের বেগে লুটোপুটি খাচ্ছে। ডালপালাগুলো বিরাট বিরাট সাপের মত দুলছে এদিক ওদিক। মনে হচ্ছে এইমাত্র গলায় ফাঁসের মত জড়িয়ে যাবে!

রণেন প্রায় ছুটে এসে রাজলক্ষ্মীর কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের দিকে চেয়ে রইল।

রণেনের কাঁধের স্পর্শে রাজলক্ষ্মীর শরীরের মধ্যে যা দাহ তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। হঠাৎ ঘুরে দু হাত দিয়ে রণেনের মুখখানা ধরে অতর্কিতে চুম্বন দিয়ে ঠেলে দিল তাকে। যাও, বন্দুক বের করে ওগুলোকে মেরে ফেল।

রণেন একবার জোর করে রাজলক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। রাজলক্ষ্মী তাকে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে দূরে ঠেলে দিল। অশক্ত-শরীর রণেন টলতে টলতে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার কাছে।

যাও, বন্দুক নিয়ে বেরোও, মারো, খুন কর ওদের।

রণেনের মনে হল দূর মাঠ থেকে উত্তেজিত জনতার কোলাহল শুনতে পেল। চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল: বন্দুক, আমার বন্দুক কোথায়?

ভয়ে আতঙ্কে সুস্মিতার ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় একটা কুকুর চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার একটা গোল পদার্থের মত দূরের মাঠে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

ঘুম ভেঙে কাঁপতে কাঁপতে জানলার বাইরে চেয়ে দেখলে নাগকেশর গাছের শাখায় আটকে পড়া পূর্ণিমার শেষরাত্রির চাঁদ পাণ্ডুর চোখে তার দিকেই চেয়ে আছে। বড়বউয়ের ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে কে যেন ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

সুস্মিতা বেরিয়ে বড়বউয়ের ঘরে ঢুকে দেখল ঘরটা শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। প্রদীপ জ্বলছে মিটমিট করে কাঁপতে কাঁপতে। বিস্রস্ত বেশে রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়ে রয়েছে। বিদ্যুতের মত সুস্মিতার মাথায় খেলে গেল, বড়বউকে কেউ খুন করল নাকি! কাছে গিয়ে দেখে বড়বউ উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল সারা গা পুড়ে যাচ্ছে। না, মরে নি।

রাজলক্ষ্মী এই শ্মশানে অপূর্ণ ও অপূরণীয় কামনার চিতায় অঙ্গারের মত জ্বলছে।

[ক্রমশঃ]

—

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' [পাঁচ]

"Art [he declared is not, as the metaphysicians say, the manifestation of some mysterious Idea of beauty or God ; it is not, as the aesthetic physiologists say, a game in which man lets off his excess of stored-up energy it is not the expression of man's emotions by external signs ; it is not the production of pleasing objects ; and, above all, it is not pleasure ; but it is a means of union among men joining them together in the same feelings, and indispensable for the life and progress towards well-being of individuals and of humanity." ['What is art' : Leo Tolstoy : Vol II, Part IV : Earnest J. Simmons]

সময়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে মানব-ইতিহাসের সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের সোনার চিত্র ; কামনায় রক্তিম, ঈর্ষায় কালো, রাগে উজ্জ্বল, অনুরাগে উচ্ছল বাসনার বিচিত্র রূপ তলস্তয়ের অপরূপ 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'। মানব-শোভাযাত্রার করুণ-রঙীন কাব্য ব্যাসের 'মহাভারত', বালজাকের 'দ্য কমেডি হিউমেন', তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'। কোন্ আদিকাল থেকে কোন্ অনাদি-কালের উদ্দেশে অব্যাহত কে বলবে ! মহৎ সাহিত্যমাত্রই অসম্পূর্ণ ; তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'ও তাই আজও সম্পূর্ণ নয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের উপলক্ষ্য মাত্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ পর্বে উচ্চারিত মহাকাব্যের লক্ষ্য মহত্তর। মানবমনের শাশ্বত রঙ্গমঞ্চে ভালমন্দের, শুভাশুভের, সুরাসুরের যে দ্বন্দ্বে মুহুর্মুহু আলোড়িত হচ্ছে ত্রিভুবন, মহাভারত তার বহিঃপ্রকাশ। এক হিসেবে সমস্ত মহৎ কাব্যই দেশে-দেশে কালে-কালে একটি তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর অন্বেষণ। সেই জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ হচ্ছে যুদ্ধ কেন এবং শান্তি কিসে ? তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস,'—ইটার্নাল থিম।

নেপোলিয়োঁর রাশ্যাভিযান 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র উপলক্ষ্য ; কিন্তু লক্ষ্য,—সেই দুর্নিরীক্ষ্য তারার যে আলো, তমসা থেকে যার জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে যার অমৃতে, অসৎ থেকে যার সত্যে উত্তরণের পথ-নির্দেশ সমস্ত মহৎ জীবন ও কর্মের অনিবার্য, অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্য ছাড়া জীবন-শিল্পীর সকল কর্ম অর্থহীন, শিল্পী-জীবনও যে ইঙ্গিতহারা হলে অস্তে, তা অনন্তের আভাস দিতে ব্যর্থ ; এবং শিল্পের শেষ বিচারে তা মহত্ত্বের পর্যায়ে পৌঁছতে অব্যর্থ অসফল। উপলক্ষ্য থেকে লক্ষ্যের দুস্তর ব্যবধানে পারাবার পার হতে, ঘটন-অঘটনের সে মিছিলে অগণ্য চরিত্রের আলো-আঁধারে বারবার দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছেন তলস্তয়। মূল থেকে ছিটকে পড়া হয়েছে অপ্রতিরোধ্য ; শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত হতে হতে মনে হয়েছে, মনে না হয়ে পারে নি যে লক্ষ্যভ্রষ্টতা অনিবার্য। কিন্তু তা হয় নি :

"One of the difficulties a novelist has to cope with more groups than one is to make the transition from one to another so plau-

sible that the reader accepts it with docility. He finds then that he has been told for the time what needs to know about one set of persons and is ready to hear how things have been going with others of whom for a while he has heard nothing. On the whole Tolstoy has managed to do this so skilfully that you seem to be following a single thread of narration."

বহিরঙ্গ বিচারে মহত্তম রচনামাত্রেই বৃহত্তম ত্রুটিতে পূর্ণ। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' তার ব্যতিক্রম নয়; উজ্জ্বলতম উদাহরণ মাত্র। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে পণ্ডিত-মূঢ়রা কখনও কখনও যাঁরা বলেছেন, মহৎ রচনা হচ্ছে তাই যা থেকে একটি শব্দ একটি অক্ষর তুলে নিলেও তার অঙ্গহানি হয়, তাঁরা কখনও বালজাকের হ্য কমেডি হিউমেন, তলস্তয়ের ওয়ার অ্যাণ্ড পীস, রবীন্দ্রনাথের গান, সেক্সপীয়রের নাটক, কালিদাসের শকুন্তলা, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারতের কথা মনে করতে পারেন নি, ওই আপ্তবাক্য উচ্চারণের অবিমৃষ্যকারিতা-কালীন। মহত্তম সাহিত্যে বৃহত্তম ত্রুটি-অসংখ্যের কথা মনে করতে পারলে বরং এই কথাই বলতে পারা উচিত ছিল যে, সমস্ত খাদ বাদ দেবার পরে যা ওজনে কমে কিন্তু মূল্যে বাড়ে, তাই-ই হচ্ছে মহৎ সাহিত্যের সম্বল—সত্য ও সারল্য :

"And always his test was that which he applied to his own writing, that the highest art should be clear, simple, and accessible to all."

এই সারল্য ও সত্যসংবল শিল্পের স্রষ্টা তলস্তয় সমস্ত ত্রুটি, খাদ, মেকী, অসংলগ্নতা, উপেক্ষণীয় ও বর্জনীয় অসারতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন যে কারণে সে রহস্যের সূত্র আত্মগোপন করে আছে তাঁর একটি বিস্মৃত অবিস্মরণীয় উক্তির মধ্যেই :

"One ought only to write, when one leaves a piece of one's flesh in the inkpot each time one dips one's pen in." [Golden Weizer-কে তলস্তয়; Leo Tolstoy: Voll II Part IV: Earnest J. Simmons]

'আত্মানং বিদ্ধি'—মহৎ জীবন ও মহৎ শিল্পের মহত্তম অন্বেষণ।

বালজাক, ডিকেন্স, দস্তয়ভস্কি এবং তলস্তয় কেউই এঁদের নিজেদের ভাষার বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন নি। বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র প্রসঙ্গে সেকথা এর আগে বলা হয়েছে।

"It is generally agreed that Balzac wrote badly....Now it is admitted that Charles Dickens wrote English none too well, and I have been told by cultivated Russians that Tolstoy and Dostoevsky wrote Russian very indifferently. It is odd that the four greatest novelists the world has known should have written their respective languages so ill. It looks as though to write well were not an essential part of the novelist's equipment; but that vigour and vitality, imagination, creative force, observation, knowledge of human nature, with an interest in it and sympathy with it, fertility and intelligence are more important."

উপরে উল্লিখিত যে গুণগুলির জন্যে সাহিত্যের সমাদর, সবিনয়ে সেগুলিকে স্বীকার করেও বলাও চলে, মহৎ সাহিত্য, মহত্তম সৃষ্টি কেবল ওই অঙ্গের সমাবেশমাত্র নয়। তা যদি হত তা হলে বেনেটের ওল্ড ওয়াইভস্ টেল, গলস্‌ওয়াদির ফরসাইট সাগা, মমের অফ হিউম্যান বণ্ডেজ মহত্তম সাহিত্য হত। মহত্তম সাহিত্য কি নয় তা বলা যায়; মহত্তম সাহিত্য কি গুণে তা বিশ্লেষণযোগ্য নয়। কিন্তু সেকথা পরে; তার আগে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র ত্রুটির দিক আলোচনাই এই মুহূর্তে অনেক প্রাসঙ্গিক হবে।

'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র সবচেয়ে বড় ত্রুটি এর আকৃতি :

"In so long a book as War and Peace, and one that took so long to write, it is inevitable that the author's verve should sometimes fail him. I have already remarked that Pierre's adventure into freemasonry is tedius and toward the end of his novel

Tolstoy seems to me to have somewhat lost interest in his characters."

[The world's Ten Greatest Novels]

মহাভারতও বৃহত্তম কলেবরের কারণে এই ত্রুটিমুক্ত নয়। শাখাপ্রশাখায় প্রলম্বিত ভারতকাহিনী মূল লক্ষ্যকে অগ্রসর করবার পরিবর্তে বহু জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কাহিনীর গতিকে, পাঠকের কৌতূহলকে করেছে স্থানচ্যুত; ফলে অলঙ্কার বিচারেও মহাকাব্যের স্বধর্ম পালনে ঘটেছে অনিবার্য স্খলন। কিন্তু মহাভারত কি অলঙ্কার-সম্মত মহাকাব্য? না, তার চেয়ে অতিরিক্ত সংজ্ঞাস্বীকারী অনির্বাচ্য কোনও সৃষ্টি কে বলবে! তা ছাড়া মহাভারতের মূল থেকে প্রক্ষিপ্তাংশকে বিশ্লেষ করা অসম্ভব হেতু বিকেন্দ্রীকরণের অভিযোগ অপ্রযোজ্য। কিন্তু তলস্তয়ের মহাকাব্যাকৃতি 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র অনেক অংশই অনায়াস-ত্যাজ্য। মূল কাহিনীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা ব্যত্যয় না ঘটিয়ে এর বহু জায়গার মূলোচ্ছেদ রসহানি না করে বরং আরও সংযত, সংহত এবং সার্থক-লক্ষ্য করে তোলে। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' আরম্ভে যে উদ্দেশ্যে স্থির ছিল লিখতে লিখতে তার বিস্তৃতি উদ্দেশ্যের সীমাকে অতিক্রম করার পথে যেমন এই কথা-সাহিত্যকে সাহিত্যের চিরন্তন কথায় করেছে পরিণত, তেমনই ঘটিয়েছে ওই বিপত্তি:

"When Tolstoy started upon his novel it was with the notion of writing a tale of family life among the gentry, and the historical incidents were to serve merely as a background."

মূল থেকে মাঝে মাঝে সরে এলেও, "On the whole Tolstoy has managed to do this so skilfully that you seem to be following a single thread of narration,"—মনে রাখতে হবে। মনে রাখলেও, না মেনে উপায় নেই যে, এই বিপুল বিচিত্র ঘটন-অঘটনের মিছিলে যারা এসেছে এবং গেছে তারা সবাই অনিবার্য, অপরিহার্য নয়। কেন?

এই 'কেন'-র উত্তরের মধ্যেই মহৎ সৃষ্টির রহস্যের রঙীন উত্তরীয় উড্ডীন।

জীবনের চিত্রকর হচ্ছে শিল্পী। মানবজীবন ঘরকাটা দাবার ছক নয়, নয় মাপ করা মানচিত্র। বিধাতার মহত্তম সৃষ্টি জগৎসংসারের দিকে তাকালে দেখা যাবে তার অনেকটাই ফালতু; অকারণ পুলকের আতিশয্য। আকাশ অকারণেই নীল। ফাল্গুনের বাতাস হঠাৎ খুশীতে এলোমেলো অকারণেই। জানা ফুলের চেয়ে অজানা ফুলের সমারোহ কম নয়। যে সৃষ্টি বিধাতা এত অনায়াসে এত অকারণ অবারণ পুলকে এত অসংখ্যের ভার বইতে পারেন, তিনি আরও সহজে কেবল অপরিহার্য-অনিবার্যের বিধাতা হতে পারতেন। মানুষের মধ্যে যে পনেরো আনা বাজে, নদীর যে জল স্নানে পানে এবং ধানে লাগে তার চেয়ে অতিরিক্ত এক ফোঁটাও না বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু কবি বলেছেন, কার্পণ্য ঐশ্বর্যের পরিচায়ক নয়; ঈশ্বরের মহিমা অকৃপণতায়। সৃষ্টির বাঁশীতে শূন্যের মধ্য দিয়েই পূর্ণের ঘোষণা ব্যক্ত।

শিল্পী এই জীবনের জয়ধ্বনি-কার। যে জীবন বাহুল্য-ভয়ভীত নয়, যা অনিবার্য ও নিবার্যের, পরিহার্য ও অপরিহার্যের, বচনীয় ও অনির্বচনীয়ের, সসীম ও অসীমের আশ্লেষে অশেষ। এই জীবনের রূপায়ণে বিধাতার মতই শুধু অশুভকে বাদ দিয়ে শুভকে, অসুন্দরকে বাদ দিয়ে সুন্দরকে, দুর্যোধনকে বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে চূড়ান্ত মনে করতে পারে নি কোনও মহৎ শিল্পী যেমন, তেমনই বৈয়াকরণ যাকে মনে করেছেন অতিরিক্ত, তাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকে অতিরিক্ত মনে না করে পারেন নি বিধাতার বিকল্প,—সাহিত্য ও শিল্পাচার্যরা। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির পরিপূরক। আগে বলেছি, 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র অনেক অংশ বাদ দিলে মূলের কোনও হানি হয় না। এখন বলছি, হয়; নিশ্চয়ই হয়। মূলের নয় কেবল, মূল্যের তারতম্য ঘটে যায় সামান্য বিচ্যুতিতে। কেশাগ্রভাগ থেকে পদনখকণা পর্যন্ত শিল্পাবয়বের কোথাও পান থেকে চুন খসাবার যো রাখেন নি ব্যাস, বালজাক, তলস্তয়; কোনও মহৎ বিশ্বসাহিত্যকর্মীই। যার সামান্যতম পরিবর্তন, কর্তন বা পরিবর্ধনের অঙ্গস্পর্শে জাত না যায়, কুলশীলে তা মহৎ সাহিত্যপদবাচ্য নয়। তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' তার ভাষার সমস্ত ত্রুটি, বাহুল্যদোষ, পুনরুক্তির পদস্খলন নিয়েই মহত্তম সাহিত্যের বৃহত্তম পর্যায়ে উত্তীর্ণ। কি করে তা সম্ভব হয়?

এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব হলে যে এর উত্তর জানে সেই-ই লিখতে পারে আর একখানা মহাভারত, ত্য কমেডি হিউমেন, ওয়ার অ্যাণ্ড পীস। কিন্তু তিনখানা বইয়ের কোনটাই দ্বিতীয়বার লেখবার নয়; তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসও' পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় উপন্যাস।

[ক্রমশঃ]

ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট : বিদগ্ধ শর্মা। চিনকো, ১৬৭-এন্, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৯। সাড়ে চার টাকা।

সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনা জাতীয় সাহিত্য খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুখপাঠ্য ভাষায় কিছু তথ্য, কিছু মন্তব্য এবং কিছু ছোট ছোট কাহিনীর মিশ্রণে এমন একটি রচনারীতি, যা সহজেই সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করে। দুঃখের বিষয় অনেক সময়েই রম্যরচনার লেখকগণ স্বল্প তথ্যের উপর সস্তা ভাবালুতার এমন পুরু প্রলেপ লাগিয়ে দেন যা পাঠকের চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে না।

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি রম্যরচনার গতানুগতিক রীতির মধ্যে একটু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। লেখক আবেগবাহুল্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে ছোট ছোট ঘটনার মারফত বর্তমান যুগের এক অনালোকিত রাজ্যের গূঢ় রহস্যকে অনাবৃত করেছেন। বর্তমান যুগ সম্পর্কে এক-কথায় বলা চলে যে এর প্রাণ রয়েছে শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে। অথচ এই রহস্যে ঘেরা রাজ্যটির দিকে আমরা শুধু বিস্মিত চোখে দূর থেকে তাকিয়ে দেখার অধিকারী। আমরা জানি বটে যে ক্লাইভ স্ট্রীটের কয়েকটি বড় বড় বাড়ি শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক জীবনের অনেকখানিই নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের রীতিপ্রকৃতির আভ্যন্তরীণ চিত্র আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এতদিনে দেখতে পাচ্ছি এ সম্পর্কে আমাদের যে অতৃপ্ত কৌতূহল রয়েছে, একজন লেখক তা নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

লেখক নিজে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটু স্থান লাভের আশায় কয়েক বছর ক্লাইভ স্ট্রীটের আনাচেকানাচে ঘোরাঘুরি করেছেন। কাজেই বাণিজ্য-জগৎ সম্পর্কে তিনি কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ক্লাইভ স্ট্রীটে জোয়ার-ভাঁটার আলোড়ন এমন প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে যে স্বল্পপ্রাণ বাঙালীর পক্ষে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বর্তমান লেখকও একদিন সেই তরঙ্গের আঘাতে ছিটকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এ বইয়ের পাতায় পাতায় তা ছড়িয়ে রয়েছে। কাজেই এ বইয়ের তথ্য ও কাহিনীগুলি কল্পনাপ্রসূত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। বইখানি যে একটি নির্ভরযোগ্য দলিল এটাই এ বই সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাণিজ্য-পরিস্থিতি বইখানির প্রধান আলোচ্য বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন কী করে দুর্নীতি সুবিপুল দুঃসাহস আর স্পর্ধার পক্ষবিস্তার করে সমগ্র ব্যবসার জগৎকে গ্রাস করেছে। অনেক বাঙালী উৎসাহসহকারে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটু স্থান সংগ্রহের জন্য এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা যে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন তার কারণ পরিশ্রমবিমুখতা নয়, তার কারণ পশ্চিমাগত ব্যবসায়ীদের মত তাঁরা দেশের প্রতি শুভবুদ্ধি এবং দায়িত্ববোধকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নি। লেখক দেখিয়েছেন যে বাঙালীরাও যে কিছু একটা যুধিষ্ঠিরের বংশধর তা নয়; কিন্তু চৌর্যবৃত্তিকে একটি বৃহদায়তন শিল্পে পরিণত করার মত অতখানি বিবেক-বর্জিত তাঁরা হতে পারেন না।

লেখকের ভাষা সহজ, গতিশীল; অনাবশ্যক অলঙ্করণ-মুক্ত। মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় একটু তত্ত্বালোচনার ঝোঁক লক্ষ্য করেছি। এ জাতীয় রচনায় তার খুব আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু সেটাকে যদি ত্রুটি বলেও ধরি তাহলে বইখানি আগাগোড়া কৌতূহল জাগিয়ে রাখে বলে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। বইখানি প্রত্যেক উৎসাহী পাঠকেরই পড়া উচিত বলে মনে করি।

অচ্যুত গোস্বামী

—

SUNLIGHT
SOAP
Rs.10,000 Reward!

সংবাদ-সাহিত্য

নিবেদন

নানা বিপর্যয় ও আকস্মিক পিতৃবিয়োগের বেদনা সম্বল করিয়া আমাদের নববর্ষের যাত্রা শুরু করিতে হইতেছে। শনিবারের চিঠির পথ তাহার জন্ম হইতেই উপলবন্ধুর এবং কণ্টকাকীর্ণ। সেই অগ্রগতির পথে চলিতে চলিতে শনিবারের চিঠি স্বাভাবিকভাবেই বলিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে এবং পথের বাধাস্বরূপ যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে তাহাকেই ছিন্নভিন্ন করিয়া সাহিত্যের রাজপথকে সর্বদাই মালিন্যমুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। বহু সাহিত্যিকের কর্মের ও মর্মের ইতিহাস শনিবারের চিঠির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হইয়া আছে। শনিবারের চিঠির ইতিবৃত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বৃহৎ অধ্যায়ের দাবি রাখে—যে অধ্যায় ১৯২৪ সনে শুরু হইয়া রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী হইতে বাংলা সাহিত্যের সকল রথী-মহারথীর সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও সম্পর্কের বহু বিচিত্র কাহিনীতে উজ্জ্বল। প্রায় শুরু হইতেই এই শনিবারের চিঠির যিনি পুরোধা ছিলেন সেই সজনীকান্তের পরলোক-গমনের পর অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে শনিবারের চিঠির অস্তিত্ব বজায় রাখার কোনও সার্থকতা আছে কি না। আমরা বলিব, নিশ্চয়ই আছে। শনিবারের চিঠি শুধু একটি মাসিক পত্রিকামাত্র নহে, ইহা একটি বলিষ্ঠ মতবাদের আশ্রয়—একটি ইনস্টিটিউশন। সাহিত্যপথের সকল পথিকই এই ইনস্টিটিউশনে আসিবেন ইহা আমরা আশা করি। শনিবারের চিঠির প্রারম্ভ হইতে যে সকল সাহিত্যিক ইহার গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছেন, শনিবারের চিঠি যাঁহাদের সেবা করিয়া ও সাহিত্যের সেবা করিতে যাঁহাদের সুযোগ দিয়া আসিয়াছে, আজ তাঁহাদের সাফল্যের দিকে চাহিলে এই পত্রিকাটির সাহিত্যিক সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইবে। দম্ভোক্তি নহে, শনিবারের চিঠির অদ্যাবধি ইতিহাস যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা জানেন হিমালয়-ক্রোড়নিঃসৃত গঙ্গার মতই এই পত্রিকাটি এতকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রকে সরস ও কলুষমুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভবিষ্যতেও রাখিবে। শনিবারের চিঠি তাহার পূর্ব আদর্শই বজায় রাখিয়া চলিবে এবং তাহার পূর্বাপর অনুসৃত নীতি হইতে এতটুকু বিচ্যুত হইবে না। সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে প্রিয়জনকে আঘাত করিতেও সে পরাঙ্মুখ হইবে না। সাহিত্যের সেবায় শনিবারের চিঠির জীবন পণ, তাহার সম্বল ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এতাবৎকাল তাহার রক্ষককে হারাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ সংকটসঙ্কুল, সম্মুখের পথ অতি দুর্গম। শনিবারের চিঠিকে এই পথেই চলিতে হইবে।

পুরস্কার

শোক এবং সংকটের মধ্যে আনন্দ-সংবাদ আমাদের চিত্তে প্রফুল্লতার সঞ্চার করিল। এবারের রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্তদের তালিকায় শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুলের) নাম দেখিয়া পুলকিত হইলাম। বনফুল বাংলা সাহিত্যে একটি অতি প্রিয় নাম। এমন কুশলী গল্পলেখক এবং টেকনিকদক্ষ কারিগর বাংলা সাহিত্যে আর কেহ নাই। শনিবারের চিঠির প্রায় সূত্রপাত হইতেই তিনি ইহার একজন স্তম্ভরূপে বিরাজমান। সুখে দুঃখে নানা সম্পর্কে ইহার সহিত তিনি জড়িত এবং সে বন্ধন দিনে দিনে দৃঢ়তর হইয়াছে। তাঁহার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে রসিকমাত্রেই সুখী হইবেন। আমাদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ এতদিনে দূর হইল বলিয়া রবীন্দ্রপুরস্কার-দাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাধুবাদ জানাইতেছি। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের বিলম্বজনিত অপরাধ মাফ করিলাম।

আকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা সুবিদিত। তাঁহাকে আমাদের

যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত

বিদ্যাসাগর-পরিচয়

দাম দুই টাকা

কুমারেশ ঘোষ রচিত

যদি গদি পাই

দাম দু টাকা

বসুধারা গুপ্ত রচিত

তুহিন মেরু অন্তরালে

দাম তিন টাকা

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

তা হয় না

দাম আড়াই টাকা

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের

বহুরূপে—

দাম সাড়ে ছ টাকা

শ্রীসুশীলচন্দ্র সিংহের

সাগর ও ঊর্মি

দাম দেড় টাকা

সুশীল রায় প্রণীত

আলেখ্য-দর্শন

দাম আড়াই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

মনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত ও

সজনীকান্ত দাসের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবন-কথা। সুধীজনপ্রশংসিত সর্বজনপাঠ্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। বোর্ড বাঁধাই। দাম ২·৫০

ভ্রমণ-সাহিত্যে চিরস্থায়ী সংযোজন

রম্যাণি বীক্ষ্য

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

'রম্যাণি বীক্ষ্য' দক্ষিণ-ভারতের সুবিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী। দক্ষিণ-ভারতের ভাষা সাহিত্য, ধর্ম দর্শন, শিল্প স্থাপত্য, সঙ্গীত নৃত্য—সবই এ গ্রন্থে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সাড়া দিয়েছে দক্ষিণের মানুষ। 'রম্যাণি বীক্ষ্যে' ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। দক্ষিণ-ভারতের মর্মকথা মূর্ত হয়ে উঠেছে 'রম্যাণি বীক্ষ্যে'র প্রতিটি পৃষ্ঠায়। ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ বহু চিত্র সম্বলিত। রেক্সিনে বাঁধাই, মনোরম রঙিন জ্যাকেট। নূতন সংস্করণ: সাত টাকা।

●

জীবনের জটিলতম সমস্যা সমাধানে

চিন্তাশীল লেখক দেবী খানের বুদ্ধিদীপ্ত রচনা

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত

চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

উলঙ্গ রাজা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল

দাম আড়াই টাকা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রবন্ধ ও গবেষণা-সাহিত্য তাঁহার সেবায় দিনে দিনে সমৃদ্ধতর হউক এই কামনা করি। এই প্রসঙ্গে তাঁহার এক মিত্র প্রকাশককে বিজ্ঞাপন মারফত "আকাদমি পুরস্কারবিজয়ী ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত" কথাটি ঘোষণা না করিতে অনুরোধ করিতেছি। শশিভূষণ এভারেস্টবিজয়ী তেনজিং নহেন অথবা আকাদমি পুরস্কার লড়াইয়ের পুরস্কার নহে। লড়াই গোপনে গোপনে কাহারও কাহারও মধ্যে হইলেও আকাদমি পুরস্কার নির্বাচনে প্রদত্ত হয়। লড়াইয়ের কলঙ্ক ইহাকে স্পর্শ না করিলেই আমরা সুখী হইব।

কলিকাতার কয়েকটি পত্রপত্রিকা কর্তৃক মিনিয়েচার স্কেলে প্রদত্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম: শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন। আমরা ইঁহাদের সকলকেই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফোটোচিত্রে পঞ্চ'ম'কার-(সকলের পদবীর আদ্যক্ষর) আচ্ছন্ন শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে মোটের উপর মন্দ দেখাইতেছে না। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হইতেছি এই ভাবিয়া যে যাঁহাদের নামে এই সব পুরস্কার, যথা: বৈষ্ণবকুলতিলক প্রফুল্লকুমার সরকার, নিষ্ঠাবান দেশসেবক সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, পুণ্যাত্মা মতিলাল ঘোষ—ইঁহারা কেহই তো জীবিতকালে 'ম'কার-সাধক ছিলেন না। অপটুহস্তে তাঁহাদের এই 'ম'য়ে মজানোর প্রয়াসকে আমরা প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।

পদ্মশ্রী

পদ্মশ্রী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া বহু গবেষণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে ইহা রীতিমত হাই সার্কেলের ব্যাপার না হইয়া যায় না। এবি, এসি, বিসি প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের নানারকম পারমুটেশন-কম্বিনেশন করিতে করিতে উচ্চমার্গে উঠিতে লাগিলাম। তারপর হাইয়েস্ট সার্কেল অর্থাৎ জওহরলাল এবং পদ্মজা নাইডুকে একত্রে মিলাইতেই সমাধান হইয়া গেল। বুঝিলাম, পদ্মজার পদ্ম এবং শ্রীজওহরলালের শ্রী মিলিয়াই পদ্মশ্রীর উদ্ভব। এ হেন পদ্মশ্রীর তক্‌মা যাহাকে-তাহাকে যখন-তখন খুশি দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার এই হাঙ্গামায় টানা কেন? অবাঙালী জওহরলালের পক্ষে শুধু নামটুকু ছাড়া তারাশঙ্করের প্রতিভার পরিমাপ করার অসুবিধা আছে বুঝি। কিন্তু তাঁহার দপ্তরে বাঙালী মিনসে তো অনেকগুলি পুষিতেছেন। অন্য প্রদেশের প্রায়-অজ্ঞাত সাহিত্যিকেরা উচ্চতর খেতাব পান কোন্ মুরুব্বীর জোরে? যায় বন্‌কে চিড়িয়ার অশোককুমার অথবা 'কবি'র তারাশঙ্করে যে আসমান-জমিন ফারাক এ কথাটা বুঝিবার অথবা বুঝাইবার মত সৎসাহস কি দিল্লীশ্বরের আশেপাশে কাহারও ছিল না? সারাজীবনব্যাপী প্রাপ্ত সম্মানের তুলনায় পদ্মশ্রী একটা ফালতুমাত্র হইলেও এই তামাশাটুকু আত্মসাৎ করিয়া তারাশঙ্কর ভদ্রতারই পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু বাংলাদেশের তরফ হইতে সরব প্রতিবাদ উঠিল কই!

গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে

সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যাহার অর্থ—মগধে মদ্যপানে দোষ নাই, কলিঙ্গে অন্নবিচার বা যোনিবিচার নাই, উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ উপভোগে দোষ নাই, গৌড়ে মৎস্য ভক্ষণে দোষ নাই এবং দ্রাবিড়দেশে মাতুলকন্যা বিবাহে আপত্তি নাই। এই প্রবাদের উদ্ভব কোন্ সালে এবং মেয়াদ কতদিন পর্যন্ত তাহা জানা নাই। তবে আজ দেখা যাইতেছে সংস্কৃত ভাষাটাই বিলকুল মরিয়া গিয়াছে। অতএব প্রবাদও মরিল। এখন মগধে মদ্যপান আইনে না হইলেও লোকচক্ষে নিন্দার্হ, কলিঙ্গে অন্ন এবং যোনিবিচার নিশ্চয়ই চালু হইয়াছে, উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ ভোগ আশা করি বেআইনী, এবং দ্রাবিড়ে মাতুলকন্যা বিবাহও সম্ভবতঃ কমিয়া আসিতেছে। গোল বাধিয়াছে গৌড় লইয়া। গৌড়ের মৎস্যকুল উধাও, ফলে দুমূ‌ল্য হইয়া মৎস্য ভোজন তো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র স্বয়ং মৎস্য দপ্তরের ভার লইয়া মৃত প্রবাদটিকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা বাঙালীরা—মাছভাতের বাঙালীরা তাঁহার রাজত্বে এই মাৎস্যন্যায় দূরীভূত হইয়াছে দেখিতে চাই।

ঠক ও পাঠক

আজকাল নাকি আই. এ. এস. পরীক্ষার্থীদের দুইটি নূতন প্রশ্ন করা হইতেছে। (১) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঠক কোন প্রদেশের লোক? যথার্থ উত্তর—পশ্চিমবঙ্গ। (২) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঠকে কোন প্রদেশের লোক? যথার্থ উত্তর—পশ্চিমবঙ্গ।

সংবাদটুকু জানিবার পর হইতেই কেমন একটা অবিশ্বাসের দোলায় মনটা অস্থির ছিল। কিন্তু একদিন পথে বাহির হইয়াই সে সংশয়ের ঘোর কাটিয়া গেল। সহস্রাধিক লোকের এক মিছিল চলিয়াছে। মুখে এক ধ্বনি—কড়ি দিয়ে কানা গরু কিনলাম। লোকগুলির মাথার অর্ধেকটা কামানো, সেই মুণ্ডিত অংশে দধির প্রলেপ। প্রত্যেকের হাতে একগাছি করিয়া দড়ি এমনভাবে ঝোলানো যেন কোনও কাল্পনিক গরুকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বুঝিলাম লোকগুলি কোনও কিছু কিনিয়া প্রতারিত হইয়াছে, তাই এই উন্মাদ অবস্থা। কি কিনিয়া ঠকিয়াছে জানিবার বহু চেষ্টা করিয়া কানা গরু ছাড়া আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কানা গরু কেনার অর্থই তো প্রতারিত হওয়া।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল ঘোষেদের গোহাল হইতে সহস্রাধিক কানা গরু বিক্রয় হইয়াছে। ঘোষেরা বাঙালী। বেচিয়াছে বাঙালীকেই।

—

আমরা চৈত্রসংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করিতে করিতে কাল ৬৮ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফাল্গুন সংখ্যাটি বর্ধিত আকারে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলে বিলম্ব ঘটিয়াছে। চৈত্র সংখ্যাতেও তাহার জের চলিল। বৈশাখ সংখ্যাটিও বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে এবং আশা করিতেছি এই সংখ্যায় আংশিক এবং পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হইয়া আমরা আবার সময় এবং নিয়মানুবর্তী হইতে পারিব। গ্রাহক পাঠক এবং অনুগ্রাহকদিগকে আমরা এই সুযোগে বৎসরারম্ভের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া সবিনয়ে এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে ইংরেজ-শাসনান্তে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও আমাদের কর্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। স্বাধীন দেশে সত্যকার শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বাজাত্যবোধ এখনও আসে নাই। আমরা সকলেই ভবানন্দ কথিত সংগ্রামশীল সন্তানের দল। আমাদের সম্মুখে বিরাট আদর্শ, আরব্ধ কর্ম সম্পাদনই আমাদের গুরু দায়িত্ব ও মহান লক্ষ্য—পত্রিকা প্রকাশে কয়েক দিনের বিলম্ব নিতান্তই গৌণ কথা।

এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত বৎসরান্তিক চাঁদার বিজ্ঞপ্তির প্রতিও গ্রাহকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—

'সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যা'র জন্য প্রেরিত তাঁহার অসংখ্য অনুরাগী ও অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধুগণের বহু রচনা আমাদের দপ্তরে রহিয়াছে। স্থানাভাববশতঃ সবগুলিকে এক সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আমরা আগামী সংখ্যাগুলিতে সুবিধামত একটি দুটি করিয়া সেই সব রচনাদি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 'স্মরণ সংখ্যায়' যাঁহাদের লেখা ছাপা সম্ভব হয় নাই আমরা তাঁহাদের নিকট মার্জনা চাহিতেছি।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮